একচালা

আনাড়ি মাইন্ডস পূজাবার্ষিকী ১৪২৯

সম্পাদনা
সাবর্ণ্য চৌধুরী, রণদীপ নস্কর, সপ্তর্ষি বোস, ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশনা
পিয়া সরকার, সৌপর্ণ দত্ত, অনির্বাণ ঘোষ, সুব্রত কুমার আচার্য্য

অলঙ্করণ ও গ্রাফিক্স
জয়ীতা সরকার, সৌমিক পাল, সায়ন কুঁতি, অনির্বাণ ঘোষ

বর্ণবিন্যাস ও ইবুক
ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
সাবর্ণ্য চৌধুরী

নিবেদনে আনাড়ি মাইন্ডস গ্রুপ

সম্পাদকীয়

সারা বছর বাঙালি দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা করে। বিজয়ার পরের সকাল থেকেই আবার কবে মহালয়া, তার গুনতি শুরু হয়।

আর সেইসঙ্গে অপেক্ষা শুরু হয় 'একচালা'র। চার বছর আগে প্রথমবারের জন্য আনাড়ি মাইন্ডস পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিল একমাত্র প্রিমিয়াম ই-বুক পূজাবার্ষিকী, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পাঠক সাদরে তা গ্রহণ করেছিল। ডাউনলোডের গণনায় বিস্মিত হয়েছিল সবাই। এবার একচালা শৈশব কাটিয়ে হাঁটতে শিখেছে। তার মধ্যেই গত কয় বছরে আমাদের বিষয়, লেখা, বই, ছবি যেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে তাতে আমরা জানি যে আগামীতেও পাঠকেরা আমাদের প্রতি প্রত্যাশা রাখবেন। আমরা প্রত্যয়ী, আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে সর্বাধিক।

জীবিকার তাগিদে এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকলেও আত্মার তাগিদে আনাড়ি মাইন্ডস এর ছেলে মেয়েরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও একচালার জন্য সময় বের করে নেয়। কেউ লেখে, কেউ ছবি আঁকে, কেউ সম্পাদনা করে, কেউ বইটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে তোলে। চলে উদয়াস্ত পরিশ্রম। এই একাত্মতা আছে বলেই এত বড় একটা কাজ আমরা চার বছর ধরে করতে পারছি। বিনিময়ে আমরা অর্থ চাই না। চাই পাঠকের তৃপ্তি, তাদের আন্তরিকতা।

আনাড়িদের দ্বারা পরিবেশিত হলেও, বাংলা সাহিত্যজগতের বহু অভিজ্ঞ রথী-মহারথীই আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের অনুপ্রেরণা। তাঁদের সবাইকে একচালা টিমের পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য অভিবাদন।

আর সবার শেষে সমস্ত পাঠকদের জানাই শারদীয়ার অজস্র শুভেচ্ছা। আপনারা অপেক্ষা করেন তাই একচালা আছে। আপনার আছেন তাই উদ্যম আছে। সবাই সুস্থ থাকুন। আনন্দে থাকুন।

আপনাদের হাতে তুলে দিলাম একচালা পুজোবার্ষিকী ১৪২৯।

সূচিপত্র

বড়গল্প

প্রবন্ধ

রম্যরচনা

অন্য গদ্য

ছোটগল্প

কবিতা

লেখকের কথা

বেশ কিছুমাস ধরে হাওড়ার গ্রামগঞ্জ মফস্বল ঘুরে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের, জীবিকার ও মানসিকতার মানুষদের সঙ্গে গল্প করে, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলাম। পরিবেশ ও চরিত্রের প্রয়োজনে এর অনেকটাই আমার কল্পনাপ্রসূত, তবে মূল ঘটনাগুলি অপরিবর্তিত।

নির্বাণ রায়

সূচিপত্র

মুহূর্তের পূজারী

রাজা ভট্টাচার্য

অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আমাদের ছেলেবেলায় যেটা মহালয়ার প্রকৃত মাহাত্ম্য ছিল, সেটা শুনলে এখন বোধহয় সবাই হাসবে। তা হল— তখন মহালয়া বছরে একবারই শোনা যেত। তার রেকর্ড পাওয়া যেত কিনা জানা নেই; আমাদের বাড়িতে রেকর্ড বা রেকর্ড-প্লেয়ার— কোনোটাই ছিল না। ক্যাসেট বা টেপরেকর্ডার...হে হে...দিল্লি তখনও বহুদূর।

কাজেই আমাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম— ওই ভোরে ওঠা, ঢুলতে ঢুলতে বিরল এক কাপ চা খাওয়া, ঘুমিয়ে পড়া, মাঝখানে ঘুম ভেঙে ফের খানিক শোনা ইত্যাদি। তার উপর, যেহেতু আমি নিজে আদ্যোপান্ত গানের বাড়ির পোলা, মন দিয়ে শুনতাম আসলে গানগুলোই। বলতে লজ্জা হয়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চাইতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা সুপ্রীতি ঘোষ আমাদের কাছে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন; কারণ তাঁরাই 'তব অচিন্ত্য-রূপ-চরিত মহিমা' বা 'বাজল তোমার আলোর বেণু' গানগুলো গেয়েছেন।

বড় হয়ে যখন দু'চার লাইন সংস্কৃত পড়া শুরু হল, তখন ঘোর তাজ্জব হয়ে খেয়াল করলাম, আসলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একটা গোটা গল্প বলেন! এইবার শুরু হল সেই গল্পটাকে খোঁজা। জানা গেল, চণ্ডীপাঠ বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা আবার একটা মস্ত বইয়ের অনেক অংশের মধ্যে একটা। মূল বইটার নাম মার্কণ্ডেয়পুরাণ, তারই একটা অংশে আছে এই গল্পটা, যেটা মহালয়া নামে চলে।

এখন সব্বাই জেনে গেছেন, এই বিশেষ তিথিটার সঙ্গে গল্পটার, বা সেই গল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনুষ্ঠানটার খুব প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই আসলে। পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষ শুরু, তাই এইদিন চণ্ডীপাঠ করলে মঙ্গল হয়— ইত্যাদি নিয়ে মহালয়ার দিন সকাল থেকে সামাজিক মাধ্যম একেবারে সরগরম হয়ে থাকে; না-জেনে ফাঁকি দেওয়ার উপায়ই নেই! একটি অতিখ্যাত পত্রিকার বিশ্ববিখ্যাত কলমচি যেমন 'ফেখক'-দের নিয়ে রবিবাসর না-জমানো পর্যন্ত বইমেলার ভাবটাই আসে না; তেমনই অসুরজাতি, হুদুরদুর্গা এবং পিতৃপক্ষ সম্পর্কিত পোস্ট না-দেখলে আমাদের মনেই পড়ে না— মহালয়া এসে গেছে, সামনেই পুজো।

তা এসব ফাজলামো কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি থাক বরং। মন দিয়ে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি— চণ্ডীপাঠ তো বুঝলাম, কিন্তু ওই কঠিন সংস্কৃত ভাষায় যেটা পাঠ করা হয়, সেটায় আছেটা কী? কী পড়েন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশাই?

আগে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। এমনিতেই আমাদের এই বহু সহস্রাব্দ-প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিটিতে একটা নিয়ম চলেই

আসছে। যে কোনও উপলক্ষে- তা সে যজ্ঞানুষ্ঠান হোক বা ঘরোয়া লক্ষ্মীপুজো: কোনও মহান উপাখ্যান শ্রবণ করতে হয়। আমরা জানি, গোটা মহাভারতটাই আসলে 'শ্রবণ করা হচ্ছে,' শোনা হচ্ছে। অর্থাৎ এই আঙ্গিকেই সমগ্র মহাভারত রচিত। নৈমিষারণ্যে শৌনক মুনি আর তাঁর শিষ্যরা যজ্ঞ করছিলেন। সেইখানে এসে পৌঁছলেন এক সৌতি; মানে ধরুন আমাদের আজকে দিনের ভাষায়— কথক ঠাকুর। এঁর নাম উগ্রশ্রবা। তা তিনি এসে বললেন, তিনি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকেই এখানে এসেছেন; এবং শুনে এসেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত এক আশ্চর্য কথা, যার নাম মহাভারত। বৈশম্পায়নের মুখে শোনা সেই কাহিনী মুনিরাও শুনতে চাইলেন। সৌতির বলে যাওয়া সেই কাহিনীই হল মহাভারত।

ঠিক তেমনই, দেবীপক্ষের প্রথম দিনটিতে শুনতে হয় চণ্ডীপাঠ। শুধু সেই দিনটিতেই নয় অবশ্য, দেবীপক্ষের প্রতিটি দিনেই চণ্ডীপাঠ শোনা যেতে পারে। পুজোর সময়ও প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে শোনা যাবে সেই পরিচিত পাঠ: 'সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ। নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তবাদ্ গদতো মম।।' এই উচ্চারণ ছাড়া দুর্গাপূজার ঢাকে কাঠি পড়ে না, রোদ্দুরে সোনা-রঙ লাগে না, শিউলিতে গন্ধ ফোটে না।

তা নাহয় হল। কিন্তু আছে কী এতে?

বেশ। সহজ করে জেনে নিই বরং সেই কথাটাই। আছেটা কী এই চণ্ডীপাঠে? সম্পূর্ণ কাহিনী নয় অবশ্য; আমরা শুনে নেব শুধুমাত্র দেবী দুর্গার আবির্ভূত হওয়ার কাহিনীটুকুই। সামনেই দুর্গাপূজা, পূজাবার্ষিকীর পাতায় আমরা জেনে নেব— ঠিক কার পূজা করি আমরা।

পুরাকালে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। এ গল্প সেই পৌরাণিক রাজাকে নিয়েই; বলছেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, তাঁর শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে।

দ্বিতীয় মনু ছিলেন স্বরোচিষ। তাঁর বড় ছেলে চৈত্রের বংশে জন্মেছিলেন সুরথ নামে এক রাজা। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তানের মত পালন করতেন। কিন্তু একসময় মহা বিপদ ঘটল। যবন রাজারা তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করল। যবন সেনারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও সেই যুদ্ধে সুরথ হেরে গেলেন। ফিরে এসে তিনি আবার রাজত্ব করতে লাগলেন বটে, কিন্তু স্বভাবতই হীনবল হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে তাঁর অমাত্য-মন্ত্রীরা মিলে তাঁর সেনাবাহিনী, তাঁর ধনভাণ্ডার— সব দখল করে নিল।

রাজ্যহারা সুরথ মৃগয়া করার নামে অরণ্যে চলে গেলেন। সেই বনে তিনি দেখতে পেলেন মেধা নামে এক মহামুনির আশ্রম। রাজা সুরথকে

মেধা মুনি নিজের আশ্রমে ঠাঁই দিলেন আদর করে। সুরথ সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

কিন্তু বনের মধ্যে ঋষির আশ্রমে থাকলে কী হবে, সুরথের মন সারাক্ষণ পড়ে থাকত সেই নিজের রাজ্য নিয়ে। কেবলই ভাবতেন— আমার সেই অতি প্রিয় রাজহস্তী, যার নাম মহাবল, সে কি যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে? যে কর্মচারীরা আমার অনুগত ছিল, এখন হয়তো অন্য রাজার অনুগত হয়েছে। এত কষ্টে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলাম, তা হয়তো দশে মিলে নষ্ট করছে অপব্যয় করে। সারাক্ষণ এই কথা ভাবতেন, আর দুঃখ পেতেন তিনি।

একদিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে ওই আশ্রমেই দেখা হল এক বৈশ্যের। তাঁরও রাজার মতোই বিষণ্ণ দশা দেখে সুরথ তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সেই বৈশ্য বললেন, তাঁর নাম সমাধি। মস্ত ব্যবসা আর অনেক সম্পত্তি ছিল তাঁর। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী আর পুত্রেরা মিলে সে'সব দখল করে নিয়ে তাঁকেই পরিত্যাগ করেছে। মনের দুঃখে তিনি সুরথের মতই বনে এসে বাস করছেন, কিন্তু একইভাবে তাঁরও মন পড়ে রয়েছে নিজের বাড়িতে। যে স্ত্রী-পুত্র তাঁকে ত্যাগ করেছে, তাদের ভালোমন্দ নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তার কোনও শেষ নেই।

সুরথ কিন্তু বৈশ্য সমাধির কথা শুনে ভারী আশ্চর্য হয়ে বললেন,"অবাক কাণ্ড! যে পরিবার আপনাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে এই অরণ্যে চলে আসতে বাধ্য করল, তাদের প্রতি আপনার এত মোহ!"

সমাধি বললেন,"জানি, এমন করা উচিত নয়। কিন্তু কী করি বলুন মহারাজ? আমার চিত্ত আমার বশে নেই। সারাক্ষণ তাদের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা হয়।"

সুরথ বুঝলেন, সমাধির অবস্থাও তাঁরই মতো। তখন তাঁরা দুজনে মিলে গেলেন আশ্রমে, মেধা ঋষির কাছে। ঋষিকে সুরথ বললেন, এখনও তিনি তাঁর হৃত রাজ্যের জন্য মোহগ্রস্ত, যেমন সমাধি তাঁর প্রতারক পরিবারের জন্য ভেবে আকুল। কিন্তু এই মোহের কারণ কী?

ঋষি তখন উত্তর দিলেন,"এ সবই মহামায়ার মায়া। শুধু মানুষ কেন, পশুপাখিও এই মায়ার বাইরে নয়। পাখিরাও তো নিজের বাচ্চাকে কত যত্নে খাইয়ে দেয়! তাকে কি তার নিজের পেট ভরে? সমস্ত প্রাণীকেই এই মহামায়া মোহের গর্তে, মায়ার আবর্তে নিক্ষেপ করে চলেছেন।"

স্বভাবতই সুরথ জিজ্ঞেস করলেন,"এই দেবী মহামায়া কে? কীভাবে তিনি উৎপন্ন হলেন? উৎপন্ন হওয়ার কারণই বা কী? হে মহর্ষি, আপনি মহামায়ার স্বরূপ আমাদের বলুন, আর বলুন কীভাবে তাঁর আবির্ভাব হল।"

মহর্ষি মেধা তখন তাঁদের দুজনকে বললেন,"এই দেবী নিত্যা, অর্থাৎ

তাঁর আদি-অন্ত বা জন্ম-মৃত্যু নেই। এই পৃথিবী আসলে তাঁরই বিরাট মূর্তি। কিন্তু যখন তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূত হন, স্বরূপতঃ নিত্য হলেও তিনি তখন পৃথিবীতে উৎপন্ন— এইরকম বলা হয়।” এই প্রসঙ্গেই মেধা মুনি সেই মহা আবির্ভাবের বৃত্তান্ত বললেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ঠিক এইখান থেকেই আসলে শুরু হচ্ছে প্রকৃত বৃত্তান্ত। একটি মূল গল্পের মধ্যে অপর একটি গল্প, এবং সেই গল্পের চরিত্র আরও একটি গল্প বলেন— এমনিভাবে গল্পের শাখাপ্রশাখা বেয়ে পৌঁছতে হয় আসল গল্পে। এই প্রকৌশল প্রাচীন সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত; বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র থেকে শুরু করে আরব্য রজনী পর্যন্ত সর্বত্র এই ধারা বহমান। অর্থাৎ এতক্ষণে দু’জন বক্তার স্তর অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছে গিয়েছি মূল গল্পে। এবার আমরা জানতে পারব মহামায়ার আবির্ভাবের মূল কাহিনীটি।

আসুন, এইবার আসল গল্পটি শুনে নেওয়া যাক।

প্রলয়কালে অনন্তনাগকে শয্যায় পরিণত করে বিষ্ণু যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময় তাঁর কর্ণমল থেকে উৎপত্তি হয় দুজন ভয়ংকর অসুরের। এরাই মধু ও কৈটভ। জন্মেই তারা দেখতে পেল বিষ্ণুর নাভিপদ্মে থাকা স্বয়ং ব্রহ্মাকে। তাঁকেই তারা হত্যা করতে গেল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কোনমতেই জাগরিত করতে না-পেরে সেই তেজঃস্বরূপা, তামসীশক্তি বিশ্বেশ্বরী যোগনিদ্রারই স্তব করতে লাগলেন।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।।

ব্রহ্মার এই অপরূপ স্তব শুনে মহামায়া যোগনিদ্রা স্বয়ং, বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে ব্রহ্মার সামনে এলেন, যাতে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে উঠেই দেখলেন, মধু আর কৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করতে চলেছে। তিনিও ওই দুই মহাশক্তিশালী অসুরকে আক্রমণ করলেন। পাঁচ হাজার বছর ধরে চলল তাদের বাহুযুদ্ধ। তারপর মহামায়া সেই দুই অসুরকে মোহগ্রস্ত করলেন। তারা বিষ্ণুর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বলল,“তুমি আমাদের কাছে বর চাও।”

বিষ্ণু হেসে বললেন,“যদি বর দাও, তাহলে তোমরা আমার বধ্য হও, আমি যেন তোমাদের বধ করতে পারি।”

মধু আর কৈটভ দেখল, সারা বিশ্ব জলমগ্ন। তাই তারাও বলল,“বেশ! তুমি মহাবীর, তোমার হাতে মৃত্যু হলে তাতে লজ্জা নেই। কিন্তু এমন

কোনও জায়গায় আমাদের বধ করো, যা জলে প্লাবিত হয়নি।"

শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু তখন "তাই হোক" বলে তাদের মাথা নিজের জঙ্ঘার উপরে রেখে সুদর্শন চক্র দিয়ে তা কেটে ফেললেন।

"এইভাবে ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহামায়া।"— বললেন মেধা ঋষি সুরথ এবং সমাধিকে। তারপর তাঁদের বলতে লাগলেন দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের কথা।

"বহুকাল আগে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের সময়কালে ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ, আর অসুরদের রাজা ছিল মহিষাসুর। তখন দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে একশত বছর ধরে চলল এক ভয়ানক যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত দেবতারা পরাজিত হলেন। মহিষাসুর স্বর্গ দখল করে নিল। পরাজিত দেবতারা সব কথা গিয়ে বললেন বিষ্ণু আর শিবের কাছে।

"ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছ থেকে এই অপমানের কথা জানতে পেরে ভগবান বিষ্ণু এবং দেবাদিদেব মহাদেব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তখন প্রথমে বিষ্ণুর, এবং তারপর শিব ও ব্রহ্মার ক্রুদ্ধ মুখ থেকে এক মহাতেজ নির্গত হল। ক্রমে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও বেরিয়ে এল বিপুল তেজ। জ্বলন্ত পর্বতের মতো সেই তেজ ক্রমশ একত্র হয়ে, সংহত হয়ে এক নারীমূর্তির রূপ ধারণ করল। মহাদেব শিবের তেজে গড়ে উঠল সেই দেবীর মুখ, মৃত্যুর দেবতা যমের তেজে গড়ে উঠল তাঁর চুল, বিষ্ণুর তেজে তৈরি হল তাঁর দুই হাত। এমনি করে সমস্ত দেবতাদের তেজঃপুঞ্জ একত্র হয়ে আবির্ভূত হলেন দেবী দুর্গা।

"দেবতারা এই মহাপরাক্রমশালিনী দেবীর আবির্ভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কিন্তু যে দেবীর আবির্ভাবই পীড়িত দেবতাদের উদ্ধার করার জন্য, তাঁর তো অস্ত্র চাই! তখন দেবতারা একে একে দেবীকে অস্ত্র দান করতে লাগলেন। ত্রিশূলধারী শিব নিজের ত্রিশূল থেকে আর একটি ত্রিশূল উৎপন্ন করে তা দেবীকে দিলেন। বিষ্ণু নিজের চক্র থেকে সৃষ্টি করলেন আর একটি চক্র, তা দিলেন দেবীকে। এমনি করে একে একে সমস্ত দেবতারা তাঁকে এক-একটি অস্ত্র দান করলেন। গিরিরাজ হিমালয় দিলেন দেবীকে তাঁর বাহন— সিংহ।

"এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে সিংহবাহিনী দেবী বারংবার অট্টহাস্য এবং গর্জন করতে লাগলেন, সমস্ত আকাশ সেই ঘোর রবে কম্পিত হতে লাগল। সেই গর্জন মহিষাসুর শুনতে পেল। তার সেনাপতিরা— চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, অসিলোমা, বাস্কল, বিড়ালাক্ষ— লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করল। দেবী সাক্ষাৎ কালের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন; তাঁর প্রতি নিঃশ্বাস থেকে

কোটি কোটি দেবীসৈন্য সৃষ্টি হতে লাগল। তাঁর সিংহটিও কালান্তক যমের মতো ভয়ংকর হুংকারে অসুরদের দেহ থেকে প্রাণ বের করে আনতে লাগল। দেবীর আক্রমণে অগণিত অসুর-সেনাপতি নিহত হল।

“নিজের সৈন্যবাহিনীর এমন ছিন্নভিন্ন দশা দেখে মহিষাসুর এক ভয়াবহ মহিষের রূপ ধারণ করে যুদ্ধ করতে এল। তার খুরের আর শিংয়ের আঘাতে দেবীসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শিং দিয়ে পর্বতের চূড়া উপড়ে সে তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল দেবীর, আর দেবীর সৈন্যের দিকে। দেবী চণ্ডী তাকে পাশবদ্ধ করতেই সে মহিষের আকার ত্যাগ করে এক ভয়ানক সিংহের রূপ ধারণ করল। দেবী তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে ফেললেন। এবার অসুর এক খড়্গাধারী পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হল। দেবী শরাঘাতে সেই পুরুষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেই সে এক হাতির রূপ নিল। সেই হাতি তার শুঁড় দিয়ে দেবীর সিংহকে জড়িয়ে ধরতেই দেবী তার শুঁড় কেটে ফেললেন। আর তখনই সে আবার মহিষের রূপ ধরে গর্জন করতে লাগল।

“বারবার অসুরকে রূপ বদল করতে দেখে দেবী লাফিয়ে উঠলেন মহিষাসুরের উপরে। পা দিয়ে তার কণ্ঠ চেপে ধরে তিনি তাকে শূল দিয়ে প্রাণঘাতী আঘাত করলে অসহায় অসুর তার প্রকৃত রূপ ধরে মহিষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে গেল, কিন্তু দেবীর তেজে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেই অর্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থাতেই দেবী খড়্গাঘাতে তার মাথা কেটে ফেললেন। দেবতারা আনন্দে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। অশুভের বিনাশ হল, শুভ আর মঙ্গলের প্রতীক দেবী জয়লাভ করলেন।”

কাহিনীর ঠিক এই পর্যায়ে এসে আমরা বরং শুভাশুভের এই দ্বন্দ্বকে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিই, Pause করে দিই এই আশ্চর্য দৃশ্যটিকে। দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা পা দিয়ে পীড়ন করছেন এক মহিষের কণ্ঠ। সেই মহিষের মুখ থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে এক দুর্দান্ত অসুর, আর দেবী অন্তিম আঘাতে তাকে বধ করতে উদ্যত।

এইবার কিন্তু দৃশ্যটা আমরা চিনতে পারছি। এই দৃশ্যের মৃন্ময়ী রূপ আমরা জন্মাবধি দেখে আসছি মণ্ডপে মণ্ডপে। ইনিই সিংহবাহিনী, অসুরবধে উদ্যত দেবী দুর্গা। অর্থাৎ এই মূর্তির মধ্য দিয়ে আমরা শুধু অসুরবিনাশিনী দেবীর পূজা করি না, পূজা করি সেই অমোঘ মুহূর্তটিকে, ঠিক যখন অশুভকে ধ্বংস করে শুভ জয়লাভ করল। এই আমাদের চিরকালের চিরচেনা মহিষাসুরমর্দিনী।

দুরিতদুরীহ দুরাশয়দুর্মতি দানবদূতকৃতান্তমতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী শৈলসুতে।।

এইবার একটা আশ্চর্য বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদায় নেব। যে দেবীর উৎপত্তি হয়েছে অসুরবধের জন্য, যাঁর সেই কালান্তক অসুরবিনাশিনী মূর্তি পূজিত হয় মণ্ডপে মণ্ডপে, তাঁকেই আমরা, বাঙালিরা, পরিণত করেছি ঘরের মেয়েতে। তাঁরই মধ্যে আমরা খুঁজে নিয়েছি চিরন্তন মাতৃত্বের রূপ। বাঙালি কবি অভিমান করে বলতেই পারেন,“আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী, দুর্গানাম তো কেউ লবে না!” রণরঙ্গিনী এক মূর্তির ভিতর থেকে মাতৃমূর্তি আবিষ্কার করা বাঙালির চিরন্তন বিস্ময়কর এক কর্ম। এখানেই সে অন্য সকলের থেকে পৃথক।

আর তাই আজও যুদ্ধ সেরে দেবী দুর্গা বাঙালি কবির কুটিরে ফিরে আসেন কন্যার মূর্তিতে। মুছে ফেলেন যুদ্ধের চিহ্ন, ঘাম আর রক্ত।

তারপর রামপ্রসাদের হাতে তুলে দেন বেড়া বাঁধার দড়িটা।

ভালো কথা! সেই সুরথ রাজা আর বৈশ্য সমাধির কী হল?

সে কথা বারান্তরে।

সূচিপত্র

তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা
পিউ দাশ
অলঙ্করণ - সাবর্ণ্য চৌধুরী

১
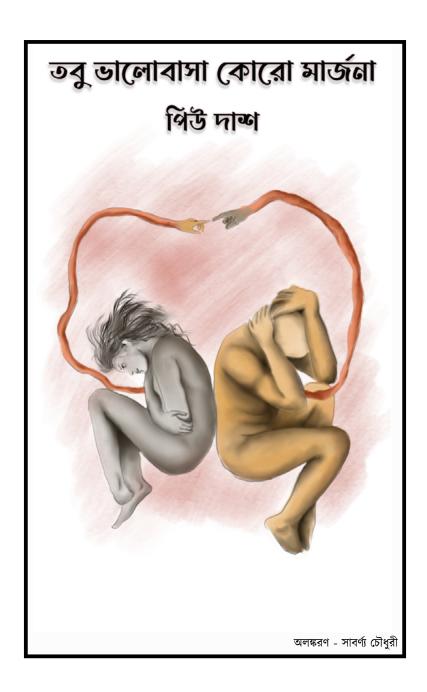
পৃথিবীতে বড় বড় কাহিনীর সূত্রপাত ছোট ছোট ঘটনা দিয়েই ঘটে। অন্ততপক্ষে অম্বার জীবনের ধারা বদলে দিয়েছিল, খুব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, বলতে গেলে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, এমন একটা ঘটনা।

ছেলে জাতিটার প্রতি অম্বার বিতৃষ্ণার কথা কারও অজানা নয়। ওর একগাদা ছেলে বন্ধুরও নয়। লম্বা পাতলা চেহারা, শ্যামলা গায়ের রঙ, নাকের ডগায় চশমা, কালো কুচকুচে চুল ছোট করে কাটা— ওকে দেখলে ওর অনেক ছেলে ভক্ত বা বন্ধু থাকবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আছে। ওর সোচ্চার পুরুষবিরোধিতাও তাদের দমাতে পারে না।

“আমার বাবা শালা কেটে পড়েছে আমার চার বছরের জন্মদিনের আগে। দেওয়ার মধ্যে দিয়েছে এই নামটা। অম্বা! এর চেয়ে নাম দিতে পারত হাম্বা!”

ওর দুটো চেয়ার পরে বসে থাকা ছেলেটার নাম মন্থন। সে ঠোঁট চেপে হাসি গিলে নিয়ে বলেছিল, “আমি শুনেছি ড্রামা ক্লাবের ছেলেরা তোকে হাম্বা বলেই ডাকে।”

যেরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল অম্বার কাছ থেকে তা পাওয়া যায়নি। অম্বা ঘাড় ঝাঁকিয়ে সংক্ষেপে বলেছিল, “জানি, তাই বলছি।”

ক্যান্টিনের বাইরে বসেছিল ওরা। কারও সামনে ডিমভাজা, কারও সামনে কফি টোস্ট। অম্বা নিজের ডিমভাজায় ছুরি চালিয়ে বলেছিল, “সে যাকগে যাক। কথাটা হচ্ছে—”

কথাটা হচ্ছিল অম্বার ব্রেক আপ নিয়ে। ছেলে বিদ্বেষী বলেই যে অম্বা প্রেম বিদ্বেষী তা নয়। বীতাংশু ছেলেটাও ভালোই ছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, অম্বা নিজেও মনে মনে এটা জানে যে বীতাংশু আসলে একটু বেশিই ভালো ছিল ওর পক্ষে। কাজেই একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে অম্বার সঙ্গে আর পোষাচ্ছে না মনে হওয়াটা ওর পক্ষে একেবারেই যে চিন্তার বাইরে ছিল তা নয়। কাজেই —

অম্বার চিন্তায় বাধা পড়েছিল হঠাৎ মৃদু একটা গুঞ্জনের শব্দে। ক্যাম্পাসে ছোটখাটো একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিখ্যাত সমাজসেবী রাজনীতিক দেবপ্রতিম মজুমদার এসেছেন এখানে কোনও একটা কাজে। সবজায়গাতেই 'ফ্যান' প্রজাতির লোকজন থাকে, আর সব সেলিব্রিটি শ্রেণীরই নিজস্ব ফ্যানবেস আছে। সেইরকমই রাজনীতিবিদেরও ফ্যানের দেখা পাওয়া যায় কলেজ ক্যাম্পাসে। তারাই ভিড় জমাতে শুরু করেছে তাঁর আশেপাশে।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল। তারপর আবার

ডিমভাজায় মনোযোগ দিয়েছিল অম্বা।

"বালের! কে না কে রাজনেতা, তার পিছনেও লেই লেই করে বাঁদরগুলো।" একটু জোরেই বলেছিল ও। হাহ! ও হচ্ছে অম্বা, কাউকে ভয় ও পায় না। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিল একটা সাদা কালো স্ট্রাইপ শার্ট পরা গম্ভীর মুখের ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় ওর জোর গলার কথা শুনতে পেয়েছে। ছেলেটাকে অম্বা চেনে না। আগে কখনও ওদের কলেজ ক্যাম্পাসে দেখেছে বলে মনে করতেও পারছে না। দেখলে মনে থাকত। চেহারাটা ঠিক কার্তিকের ছোট ভাই। মানে, গণেশ না, গণেশ না। হ্যান্ডসাম...

একটু থতমত খেয়ে মুখের ডিমভাজাটুকু গিলে নিয়েছিল অম্বা। তারপর হেসে বলেছিল, অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে, বাঁদরেরা তো বাঁদরেরই ভক্ত হবে। সব রাজনেতাই আসলে এক একটি বাঁদর ঠিক কিনা?

ছেলেটার গম্ভীর ঠোঁটদুটো আরও চেপে বসেছিল। গম্ভীর মুখে গোপন একটু হাসির ছাপ পড়েছিল বলে মনে হয়েছিল অম্বার। কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারবে না। একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে সেরকম কঠিন মুখ করেই ছেলেটা বলেছিল, "হুম। এখানকার রাজনেতাটি আমার বাবা। আমার নাম দেবারি মজুমদার।"

***

ওদের প্রথম দেখার কথা যখন মনে করে, দেবারির মুখে এখনও একটা হাসি খেলে যায়।

শ্যামলা রঙের অদ্ভুত প্রাণোচ্ছল মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কালো হয়ে গিয়েছিল। সে একটা মনে রাখার মত দৃশ্য। পৃথিবীতে কম লোককে দেবারি ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রস্তুত করেনি। কিন্তু সেই সমস্ত সময়ের থেকে এটা আলাদা ছিল। কেন তা তখন ও অত ভালো বোঝেওনি।

অম্বার মধ্যে কোন গুণটা ওর ভালো লেগেছিল সেটা ভেবে দেখতে গেলে দেবারি হালে হাঁড়ি পায় না। ওর কাজিন অহনা যখন প্রশ্ন করে চোখ সরু করে, কী বলবে তার উত্তরে, ভেবে পায় না দেবারি।

সত্যি কথা বলতে গেলে অম্বার মধ্যে নারীসুলভ কোনও গুণই নেই। কোথায় কী বলতে হয় তা অম্বা জানে না। ছেলেজাতিটাকে জাতি সুদ্ধ গালি দিতে ওর বাধে না। লজ্জা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সব একসঙ্গে বাদ দিয়ে দিয়েছে নিজের অভিধান থেকে।

আরও গভীরে গিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, সেই জিনিসটাই আকৃষ্ট করেছিল দেবারিকে।

ওর চেনাজানা সমাজে সবকিছুই এত বেশি আইডিয়াল, হালকা গোলাপী অথবা হলুদ জামা পরা ফিসফিসে কথা আর নিখুঁত মাপা হাসির ভিড়ভাট্টার মধ্যে অম্বা একটা সজোর বিদ্রোহের মত। যে বিদ্রোহ দেবারির পাঁজরের তলায় চাপা থাকে, বাইরে বেরোতে পারে না, অম্বা তার একটা সোচ্চার বিজ্ঞাপন।

অম্বা থাকে ওর মায়ের সঙ্গে শহরেরই এক মধ্যবিত্ত পল্লীতে। 'মধ্যবিত্ত' কথাটা একেবারেই কথার কথা যদিও। জায়গাটাকে বস্তিই বলতে হবে। কিন্তু সেখানকার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে। তাদের মা-বাবারাও পড়াশুনো করেছে। কেউ কেউ সরকারি নিচু পদের চাকরি করে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কেউ আইটি সেক্টরে কাজ করছে এবং ভালো রোজগার করছে।

এরা যে শ্রেণীর তাতে মফস্বলে থাকলে এদের বাড়ির উঠোনে তুলসীতলা থাকত। লাল সিমেন্টে বাঁধানো বারান্দা থাকত। এখানেও যে একটা তুলসীতলা নেই তা নয়। কিন্তু সেটা রাস্তার পাশে, বারোয়ারি। সেই কারণেই শ্রীহীন। নিজের নিজের তুলসীতলা করার জায়গা নেই। সংস্কারকেও বারোয়ারি করে তুলতে হয়েছে। কিন্তু সংস্কার বজায় রাখার একটা ক্লান্তিকর চেষ্টা আছে সবকিছুর মধ্যে তীব্রভাবেই।

অম্বা নিজে অবশ্য সংস্কারের পরোয়া করে না। যেটা... দেবারি স্বীকার করবে, খুব একটা সহজপাচ্য ছিল না ওর কাছে ওদের প্রথম পরিচয়ের মাসগুলোতে। জীবনে সংস্কারকে কে কতটা লালন করবে সেটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু মুখে অস্বীকার করাটা খুবই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

ওর আগের প্রেমিকারা সহজেই ওর বিছানায় এসেছিল কিন্তু মুখে হাবভাবটা বজায় ছিল লজ্জার। সমাজ সংকোচের। “বিয়ে করবে তো?” জিজ্ঞাস্য ছিল তাদের বা প্রেমের ভান ছিল আত্মসমর্পণে। দুপক্ষই যদিও জানত ভানটুকু ভানই, তবু নিজের কাছে নিজের পর্দারও তো একটা ব্যাপার আছে! দেবারি আগে কত মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে, কোনওদিনই সেকথার মর্যাদা ওর কাছে ছিল না। ওর বাবা রাজনীতিক, কথার মর্যাদা হয় সেটা ওর বড় হয়ে ওঠার শিক্ষার অন্তর্গত ছিল না কখনওই। কিন্তু কথাকে ব্যবহার করে ইমেজ বজায় রাখাটা শিক্ষার অন্তর্গত ছিল ষোলআনা।

অম্বা প্রেমের ভান করেনি, বিয়ের তো কথাই তোলেনি। ডেট করছি শোবো না কেন, মনোভাবে ওর কাছে এসেছিল। বেপরোয়া। সেটা

দেবারির মত পোড় খাওয়া ছেলেকেও নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিম্বা ও পোড় খাওয়া বলেই হয়তো ও নাড়া খেয়েছিল বেশি। অম্বার সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠার কোনও পথ ছিল না ওর কারণ অম্বা লড়াইয়ে নামেইনি কখনও।

কিন্তু একদিন ওরা যখন বিছানায় ও আচমকাই তাকিয়ে ফেলেছিল অম্বার চোখে। সেচোখের গভীরতায় যে স্নেহ আর প্রেম ছিল দেবারির ছাব্বিশ বছরের জীবনের হাজার হালকা কথা আর বাহারি প্রেম তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে। সেই প্রথম ওর মুখ থেকে বেরিয়েছিল একটা হৃদয় থেকে আসা সত্যি কথা। ভালোবাসি। অম্বার শ্যামলা বুকে মুখ গুঁজেছিল ও কথাটা বলেই। আর তারপরেই অম্বা ফাটিয়েছিল বোমাটা।

"তুই সিরিয়াস?" বলেছিল ও। "শুনেছি পোস্ট নাট ক্ল্যারিটিতে লোকের মোহ কেটে যায়, তোর উল্টো হচ্ছে না তো?"

দেবারির বিরক্ত ঘোঁত করে করা অর্ধস্ফুট আওয়াজে হেসেছিল তারপরে, হাসির দমকে কেঁপে গিয়েছিল ওর উপরে নেতিয়ে থাকা দেবারির শরীরটাও।

তারপর একটু পরে অম্বা বলেছিল, "আমায় ভাবতে দে একটু।"

***

অম্বা ভাবেনি পৃথিবীতে এত এত লোক থাকতে ও প্রেমে পড়বে বেছে বেছে দেবপ্রতিম মজুমদারের ছেলের। রাজনীতি জিনিসটাকে যে অম্বা অপছন্দ করে তা নয়। কিন্তু রাজনীতিকদের করে। দেবপ্রতিমবাবু অবশ্য এই মুহূর্তে যে দলে আছেন সেটা মন্দের ভালো কিন্তু কথাটা সেটা নয়। সকলেই জানে এইসব রাজনীতিকরা দলের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত, আদর্শের কথা তো ছেড়েই দাও। এটাও সবাই জানে যে দেবারিকে তৈরি করা হচ্ছে ওর বাবার উত্তরসূরী হিসেবেই।

কিন্তু সেসব অম্বার হিসেবের মধ্যে ছিল না যখন ও দেবারিকে ডেট করবার কথা ভেবেছিল। সবে বীতাংশু ওকে ছেড়ে গেছে তখন, বা ও ছেড়ে এসেছে বীতাংশুকে... ব্রেক আপটাকে মিউচুয়াল বলেই মনে করতে চায় অম্বা। সে যাক, তো সেই সময়, প্রায় সেলিব্রিটি একটা ছেলে, যাকে, মিথ্যে বলে লাভ নেই, অনায়াসেই বহু মডেলের থেকে ভালো দেখতে, সে ওর প্রতি আগ্রহ দেখাতে সেই সুযোগটাকে অম্বা লুফে নিয়েছিল। ওর মত কালোকোলো কাঠখোট্টা দেখতে একটা মেয়ের

(এটা বাজে কথা। ও নিজেও জানে যে ওকে কালোর মধ্যে দেখতে ভালো) ছিন্ন আত্মসম্মান যেটা কিনা পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির মাধ্যমেই একমাত্র ফিরে আসে সেটার এমন সুবর্ণ খনি পেয়ে ও আর বড় গভীরে গিয়ে কিছু চিন্তা করেনি। দেবারির দিক থেকেও যে ব্যাপারটা সিরিয়াস তেমন মনে করার কোনও কারণ ছিল না। কাজেই মাসদুয়েক তিনেকের একটা ছোটখাটো ফ্লিং তারপর দুই পাখি দুই দিকে এরকমই প্ল্যান ছিল অম্বার।

কিন্তু লোকে ভাবে এক আর হয় এক।

দেবারি নিজেকে মনে করে পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই অম্বার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে মনের দিক থেকে ও একটি শিশু। পৃথিবীর নব্বই শতাংশকে ও জানে না, চেনে না। গরীব লোকেদের প্রতি, সমাজের প্রতি, সামাজিক ইস্যুর প্রতি ওর কোনওরকম সত্যিকারের আগ্রহ নেই কারণ সেসব ওকে স্পর্শ করে না। ও জানে না বা বোঝে না যে মানুষের খিদে পেলেও খাওয়া জোটে না এবং সেটা একটা আসল সমস্যা আমাদের দেশের সমাজে। শিশু যখন আঙুলের চাপে পিঁপড়ে মারে, সেটা কি পাপ? আমাদের বড়রা বলেন শিশুকে পাপ স্পর্শ করে না কারণ সে কিছু বোঝে না। দেবারির পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার প্রতি ঔদাসীন্যও সেই দলের।

ওকে না চিনলে এই ঔদাসীন্যকে ক্ষমা করা হয়তো অম্বার পক্ষে অসম্ভব হত কিন্তু ওকে চেনার পরে... নৈকট্য যেমন মোহ কাটায় তেমনই দৃষ্টিতে স্বচ্ছতাও তো আনে! দেবারির প্রতি অম্বার রাগ আসে বা ফ্রাস্ট্রেশন জন্মায় কিন্তু ঘৃণা জন্মায় না। তাচ্ছিল্য আসে না।

আর একটা জিনিসের ব্যাপারে, অম্বা লক্ষ করেছে, দেবারি সমান শিশুসুলভ। সে জিনিসটা হল নারীর স্নেহ। ওর মা নেই। এবং এমন আর কোনও নারী ওর জীবনে কখনও ছিল না, যেটুকু অম্বা বুঝেছে, যাতে নরম কোমল স্নেহ পাওয়ার কোনও উপায় ওর জীবনে আসে। একটু বড় হওয়ার পরে যেসব নারী ওর জীবনে এসেছে তারা এসেছে অন্য রূপে, অন্য অবতারে। আর যদিও অম্বা বিশ্বাস করতে পারে না যে তাদের কেউ ওকে সত্যিকারের ভালো কখনও বাসেনি, দেবারি যে শিক্ষা সংস্কারে বড় হয়েছে তাতে সেই ভালোবাসা চেনার ক্ষমতা যে ওর জন্মায়নি তাতে অম্বার কোনও সন্দেহ নেই।

দেবারি ওকে আঁকড়ে ধরেছিল এমন একভাবে যেটা দেবারি নিজেও বোধহয় বোঝেনি। কিন্তু অম্বা জড়িয়ে পড়েছিল। যেটা কিনা—

“ভয়ানক! মারাত্মক ব্যাপার। আমি এরকম একটা ব্যাপার কল্পনা করতে পারতাম বীতাংশুর সঙ্গে। মানে বীতাংশু হচ্ছে, যাকে বলে, শিল্পী

মানুষ। মানে একটা শিল্পী সত্তা আছে। মানে যাকে বলে... মানে, কিন্তু দেবারি—"

"তুই প্যানিক করছিস।" ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল তানিয়া।

তানিয়া অম্বার বেস্ট ফ্রেন্ড। এরকম একটা মারাত্মক সময়ে তার কাছে নিজের মন উজাড় করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের মধ্যে তানিয়া অম্বার থেকেও বেশি কাঠখোট্টা। তার কাছে মন উজাড় করে শান্তি নেই। কারণ সে যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। অম্বা থমকে গিয়েছিল এক মুহূর্ত। তারপরে বলেছিল, "করছি।"

"কেন?"

"এতক্ষণ কী শুনলি?"

"শোন," তানিয়া বলেছিল, "আমি বুঝছি ব্যাপারটা সিরিয়াস কিন্তু তুই নিজে থেকে প্যানিক করে কী করবি? দেবারি তো আর তোকে বিয়ে করার কথা তোলেনি রে বাবা! ডেটিংটাকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে? মোর সিরিয়াস? আর লেটস বি অনেস্ট ওর যেরকম ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে খুব বেশি দূর এগোনোর আগে ওর পালানোটাই কিন্তু বেশি স্বাভাবিক। মানে এরা কি পলিটিকাল কোনও ফেভার ইত্যাদি না দেখে বিয়ে টিয়ে করার কথা ভাববে! যতই বল—"

অম্বা ভেবে দেখেছিল, বাইরে থেকে দেখলে সেটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তানিয়া তো দেখেনি দেবারিকে অম্বার সঙ্গে। তানিয়া জানে না দেবারি কেমন গোঁয়ার!

আর তানিয়া জানে না যে বিয়ে করার কথা ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা অম্বা করতে পারবে না। বীতাংশুকে ও ওর সমস্যার কথা বলেছিল প্রথমবার ওর সঙ্গে শোওয়ার আগেই। দেবারিকে বলা হয়নি। এখন—

—

"আগে বলিসনি কেন?" অন্য কোনও প্রশ্ন না করে দেবারি বলেছিল প্রথমেই। টানটান শুনিয়েছিল ওর গলার স্বর।

"বলার দরকার ছিল কি?" অম্বা বলেছিল উড়োস্বরে।

দেবারি সেকথার উত্তর দেয়নি। ফোঁসফোঁস করে দুটো নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপরে ফোন কেটে দিয়েছিল।

অম্বা বড় একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়েছিল তখন। ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল তারপরে। তানিয়া ঠিকই বলেছিল। অম্বাই শুধু শুধু প্যানিক করছিল। দেবারি কখনওই ততটা সিরিয়াস ওর ব্যাপারে হতে পারে না, ঝোঁকের মুখে যা-ই বলে থাক না কেন সেদিন। চোখটা শুষ্ক লাগছিল অম্বার। বুকের থেকে ভার নেমে গেছে ঠিকই কিন্তু বুকটা খালি খালিও লাগছে। এত সহজ হবে ব্যাপারটা তা ও ভাবেনি। দেবারি একটু চেঁচালও না যেটা কিনা ওর চিরদিনের স্বভাব! তাহলে অম্বাও একটু

চেঁচিয়ে হালকা হতে পারত। না! জাস্ট ফোনটা রেখে দিল! এতই সহজ। এতটাই সহজ যোগাযোগ কেটে ফেলা!

আধঘন্টা অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল অম্বা। ওর অনেক কাজ। ও বড়লোক পলিটিসিয়ানের মুখে রুপোর চামচ নিয়ে জন্মানো বাচ্চা নয়। তারপরে রাগ চড়তে শুরু করেছিল মাথায়। একটা ফোন করবে দেবারিকে? অম্বা গরীব বা কালো হতে পারে কিন্তু ব্রেক আপ ও-ই করে লোকের সঙ্গে। লোকে ওর সঙ্গে ব্রেক আপ করে না। এমনকি বীতাংশুও—

এই সময় ফোনটা এসেছিল দেবারির। আধঘন্টাও হয়নি এরই মধ্যে। ভদ্রতা সভ্যতা আছে তাহলে ছেলেটার। ভালোভাবে ব্রেক আপ করতে চায়।

একটু ইতস্তত করে কাঁপা হাতে ফোনটাকে কানে তুলেছিল ও। মন শক্ত করেছিল।

"হ্যালো?"

***

দেবারি ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা শিখেছে তা হল, 'পরিস্থিতি সামাল দেওয়া'। কোনও সমস্যার সমূল সমাধানের চেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ও ভালো জানে এবং পারে। এবং ও এও জানে যে অনেক সময়ই 'পরিস্থিতি' সামাল দেওয়ার দিকে ও এতটাই একাগ্র হয়ে থাকে যে সে সময়ে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে এলে ওর মাথার ঠিক থাকে না।

"হোয়াট ডু য়ু মিন সারোগেসি।" অম্বা চেঁচাচ্ছিল ফোনের ওপারে। অনেকক্ষণ থেকেই ও চেঁচাচ্ছে কিন্তু ঘুরে ফিরে ওর কথার বিষয়বস্তু একই। সারোগেসি জিনিসটা খারাপ। মানুষের দারিদ্র্যের, যে দারিদ্র্য কিনা অন্য মানুষেরই সৃষ্টি করা, তার সুযোগ নেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এটা একটা সমস্যা। এই সমস্ত সিরিয়াস সময়ে এই রকমের ক্লাস প্রবলেম ইত্যাদির কথা শোনার কোনও ইচ্ছা দেবারির থাকে না। আপাতত যে সমস্যা হাতে তাতে সারোগেসিই একমাত্র সমাধান। দেবারি ওর বাবাকে চেনে অম্বার থেকে অনেক বেশি। যতই অম্বা ভেবে থাকুক না কেন ওর মাথায় অনেক বুদ্ধি, দেবারি জানে কোনও সমস্যা সমাধানের বুদ্ধি ওর নেই। ও শুধু জানে সমস্যা তৈরি করতে।

তবু শান্ত মাথায় ও বলার চেষ্টা করেছিল, "আমার বাবা নিজের উত্তরসূরী চাইবেন। রক্তের সম্পর্ক। কাজেই এ্যর আমার লাগবে অম্বা। আর তারজন্য—"

"হোয়াট ডু—" অম্বা বলেছিল ওর কথার মধ্যেই। একটু থেমেছিল

ও, তারপর গভীর একটা শ্বাস টেনে নিয়ে বলেছিল, “দেবারি য়ু হ্যাভনট ইভন প্রোপোজড টু মি ইয়েট! আমি হ্যাঁ-ও বলিনি। এখনই তোমার বাবা কী চাইবেন সেটা বড় প্রশ্ন হল কী করে? আর তার চেয়েও বড় কথা আমি যদি না চাই? আমি যদি বাচ্চা না চাই? আর—”

অন্য সময় হলে কী হত জানা নেই কিন্তু আজকে বিভিন্ন কারণে দেবারি ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে ছিল। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, “ওয়েল! আমি প্রোপোজ করছি এখনই! থিংক অ্যাবাউট ইট! ভাবো! আর সারোগেসির কথাও! ভাবো! থিংক!”

***

“শুধুমাত্র পয়সার জন্য মেয়েগুলো অন্যের বাচ্চা বহন করে। ভাবতে পারছিস কতটা অমানবিক এটা?” অম্বা বলেছিল তানিয়াকে।

“অমানবিক কেন?” তানিয়া বলেছিল। “ওরা তো এটা করছে নিজের ইচ্ছেতেই। তাছাড়া, তুই জানিস এখন কমার্সিয়াল সারোগেসি আইনত নিষিদ্ধ এ দেশে। এখন থেকেই এরকম ভাবছিস কেন যে সেইভাবেই সারোগেসির কথা বলছে দেবারি? হয়তো—”

“নট ইউ টু তানিয়া!” অম্বা বলেছিল, “তুইও এরকম কথা বলিস না! কোথা থেকে কোথায় গেছে বুঝতে পারছিস সমাজের অবস্থা যে এটাও আমাদের চোখে লাগে না যে মানুষকে পয়সার জন্য 'স্বেচ্ছায়' অন্যের বাচ্চা বহন করতে হয়? মানুষকে ইনকিউবেটর হিসেবে ব্যবহার করাটাকে আমরা পয়সার আদানপ্রদানের হিসেবে ভাবতে পারছি! আর—” এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বলেছিল, “আমি দেবারিকে যতটুকু চিনেছি তাতে, ও আইনের তোয়াক্কা করবে না। সব কিছুকেই ও কমার্সিয়ালিই ভাবে। মানে—”

তানিয়া নিজের কপালের রগ চেপে ধরেছিল। ও কম কথার মানুষ। “তুই কী করতে চাস? তোদের ব্যাপারটাই তো অত্যন্ত গোলমেলে। তুই কি দেবারিকে বিয়ে করতে আদপেই রাজি আছিস? তারপরে তো আসবে বাচ্চার কথা!”

চুপ করে গেছিল অম্বা। দেবারিকে কি ও বিয়ে করতে চায়? এই যে আদর্শগত অমিল, এতেই তো সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। আবার বাচ্চা আনার কথা ভাবছে ও এখন থেকেই।

নিজের বিছানায় শুয়ে সারারাত ভেবেছিল অম্বা। কী করবে। অথচ এইটাও ভেবে দেখো। দেবারি। দেবারি মজুমদার যাকে চাওয়ার মত নারীর অভাব পৃথিবীতে নেই, সে অম্বাকে এতটাই চায় যে অম্বা সন্তান

ধারণে অক্ষম জেনে সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান করতে বসেছে কী করে তা সত্ত্বেও অম্বাকে পাওয়া যায়। এতটা আর কোনও পুরুষে ভাববে কি? কোনও সাধারণ পুরুষে ভাববে না। অন্তত অম্বা তা মনে করে না। কিন্তু দেবারির প্রবল পৌরুষ আর আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই বাধা পায় না। পথের সবকিছুকে উড়িয়ে নিয়ে চলে। অম্বার মত মেয়েরা কি ওর চাওয়ার তীব্রতার কাছে খড়কুটোর সমান নয়? সারারাত অম্বা ভেবেছিল আর ভেবেছিল। পাশের ঘর থেকে মায়ের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। চেনা ঘর, চেনা পরিবেশ! অম্বার কোনওদিন, কখনওই স্বপ্নের মধ্যে ছিল না যে এই চেনা পরিবেশে এরকম অচেনা অদ্ভুত একটা বিষয় নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে হবে। বিয়ে! বাচ্চা! ওর এই চব্বিশ বছর বয়স মাত্র!

পরের দিন সকালে বিছানা থেকে উঠে অম্বা তানিয়াকে মেসেজ করেছিল, "ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি।" এক মুহূর্ত ভেবে আরেকটা মেসেজ পাঠিয়েছিল একটু ইতস্তত করবার পরে। "সম্ভবত।"

আর দেবারিকে ফোনে বলেছিল, "সত্যি যদি সারোগেসির সাহায্য নিতে হয় তাতে আমার কথার মূল্য থাকবে কতটা?"

"কতটা মানে? তোরও তো সন্তান!" বিরক্ত স্বরে বলেছিল দেবারি। যেন অম্বার মত বোকা গাধা ও আগে কখনও দেখেনি। যেন এ প্রশ্ন তোলার অর্থই হল অম্বার সঙ্গে কথা বলা অনর্থক। তারপরে বলেছিল, "বিয়ে করার কথা কী ভাবলি আগে বল। তারপরে তো বাচ্চার কথা আসবে!"

২

"তুমি ভালোভাবেই জানো যে আমার জাতের বিচার আছে।" দেবপ্রতিম বলেছিলেন গম্ভীর স্বরে। "সমস্ত রকমের সংস্কার আমি বিসর্জন দিতে পারিনি। চাইও না। এসব সনাতন প্রথার অর্থ আছে। জাতপাতের বিচার ইত্যাদি —এরা নিরর্থক নয়।"

দেবারি চুপ করে ছিল। সনাতন প্রথার বা জাতপাতের অর্থ আছে কি নেই সেটা নিয়ে বাবার সঙ্গে গভীর কোন আলোচনায় যাওয়ার কোনও ইচ্ছা এই মুহূর্তে ওর ছিল না। সে আলোচনায় লাভ নেই। আর ওও যে এই মুহূর্তে তাই নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত তা নয়।

"তোমার এই—" দেবপ্রতিম একটা মুখভঙ্গি করেছিলেন তেতো লেবু

গেলার মত, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়েছিল মুহূর্তের জন্য। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ না করলে বা তাঁকে না চিনলে সেটা কারও নজরে পড়বে না। "তোমার এই" অতি কষ্টে যেন বলেছিলেন তিনি, "গার্লফ্রেন্ড। কী নাম যেন—?"

"অম্বা" সংক্ষেপে বলেছিল দেবারি।

"হ্যাঁ অম্বা। তো এই অম্বা কায়স্থ?" উত্তরের অপেক্ষা না করে বলেছিলেন, "কাজেই সেদিকে ঝামেলা নেই। কিন্তু পিতৃহীন, কোনও রকম কোনও সামাজিক স্ট্যাটাসহীন। আর কী যেন পড়ে? আর্টস? আর্টিস্ট?"

আর্টস আর আর্টিস্ট যে খুবই একটা মূল্যহীন জিনিস সেটা কথার ভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দেবারির তাতে খুব একটা মতের অমিলও যে ছিল তা নয়। আর্ট, বিশেষ করে অম্বার আর্ট দেবারি পছন্দই করে। অম্বা যখন গাল ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ওকে আর্টের ইভোলিউশন বোঝায় ওর ভালোই লাগে শুনতে। কিন্তু সেটা কতটা আর্টের গুণে আর কতটা আর্টিস্টের গুণে তাতে ওর নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই ও এখন চুপ করেই ছিল।

দেবপ্রতিম বলেছিলেন, "এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তুমি ভেবে দেখবে আশা করি।"

দেবারির কাছে তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, অম্বাকে পেতে হলে খুব নিট প্ল্যানিং লাগবে। সন্তান ধারণে অম্বার অক্ষমতার কথাটা আপাতত অবশ্যই চেপে যেতে হবে দেবপ্রতিমের কাছে কিন্তু পরবর্তী কালে অম্বা নিজে বেঁকে বসলে সমস্যা হতে পারে। আগে থেকে পথ পরিষ্কার করে রাখার দরকার।

কারণ দেবারি জানে, অম্বা একবার কোনও কথা দিলে, তা নড়চড় হবে না। এতদিন রাজনীতিতে থেকে এইটুকু মানুষ চেনার ক্ষমতা ওর জন্মেছে।

***

ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা দেবারির প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। ভেবে রাখা ছিল বত্রিশ। বত্রিশে বিয়ে। পঁয়ত্রিশের মধ্যে প্রথম সন্তান। তারপরে ভালোমন্দ বুঝে হয়তো আরেক সন্তান। কেরিয়ার ততদিনে বেশ সলিড জায়গায় পৌঁছে যাবে। পরিবার পরিজন নিয়ে একটা সুখের সংসার থাকবে— সবকিছু একটা নিখুঁত নিটোল ছকে বাঁধা।

অম্বা হিসেবে গোলমাল করে দিয়েছে। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ের জন্য অপেক্ষা করলে বিয়ে করা হয়তো হবে। অম্বাকে বিয়ে করা হবে কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। আর ছকে বাঁধা যে ভবিষ্যৎ দেবারির চোখের সামনে ভাসে, অম্বা তার একটা অংশ না হলে, ওর মনে হয়, সেসব কিছুই নিরর্থক হয়ে যাবে।

***

বিয়ে করা অম্বার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না কখনোই। অঠেরো বছর বয়সে যেদিনকে ও জানতে পেরেছিল যে সন্তান ধারণে ও অক্ষম সেদিনকেই বিয়ে করার প্ল্যান ও বাতিল করে দিয়েছিল জীবন থেকে। বিয়ে মানুষ করে কেন এই পোড়া দেশে? সন্তানকে একটা বৈধতা দিতে। নয়তো জীবনে এমনিতে ঝামেলার অভাব কী যে পুরুষমানুষের বেশে একটা নতুন ঝামেলার আমদানি করতে হবে?

কিন্তু —

বিয়ে হয়ে গেল। ছাব্বিশেই। কেন যে দেবারির জন্য ও নিজের জীবনের ভেবে রাখা, গুছিয়ে রাখা প্ল্যান সব বানচাল হতে দিয়েছিল সে নিয়ে খুব গভীরে গিয়ে ভাবতে অম্বা চায় না। ছাব্বিশ বছর বয়সে লোকে ভুল করতেই পারে। আর সেই ভুল যখন হাল্কা দাড়ি ওলা গাল ওর বুকে গলায় ঘষে তখন যে ব্যথা ও অনুভব করে সেটা সুখের।

কদিনের জন্য সে সুখ যদি উপভোগ করে নেওয়া যায় তাতে ক্ষতি কীসের!

***

সবকিছুই যে সহজ ছিল তা অবশ্য নয়। দেবারির অনেক কিছু, অনেক অনেক কিছু অম্বা পছন্দ করে না। করতে পারে না। ওর মানসিক বেদনা প্রায় শারীরিক বেদনার রূপ নেয়। কোনও আদর্শের প্রতিই দেবারি শ্রদ্ধাশীল নয়। ওর মধ্যে কোনও আদর্শই রূপ নেয়নি।

একটা জিনিস যেটা রীতিমত কষ্টকর অম্বার কাছে তা হল দেবারির টাকা পয়সা ওড়ানোর স্বভাবটা। ফাইভ স্টার হোটেলে ডিনারে গিয়ে অপ্রস্তুত বোধ করা ছাড়া আর কিছুই অম্বা অনুভব করে না। খাদ্য সে যত হাই স্ট্যান্ডার্ডই হোক না কেন তার দাম ওরকম হয় কী করে তা ও ভেবে পায় না। আর তারপরে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গরীব শিশুগুলোর দিকে ও তাকাতে পারে না গভীর একটা লজ্জায়।

আজন্মপালিত সংস্কারে। ব্যাগ থেকে একশ টাকা বের করে ওদের হাতে দিতে গেলে দেবারি বাধা দেয়। বলে, "মারামারি লেগে যাবে।" সহজেই বলে। তারপরে নিজের পকেট থেকে হাজার টাকা বের করে ওদের ড্রাইভারের কাছে সেটা ভাঙিয়ে নিয়ে সেইটাকা ওদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। খবর পেয়ে অন্য গরীব বাচ্চারা ছুটে এলে বলে "কেলো করেছে!" অম্বাকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। সে দৃষ্টির অর্থ, কী বলেছিলাম? কাউকেই অবশ্য নিরাশ ও করে না সেদিন। সেদিনকে ও কল্পতরু হয়ে যায় সেই না খেতে পাওয়া শিশুদের কাছে। তারপর গাড়িতে আসতে আসতে বলে, কত বাচ্চাকে খাওয়াবি? তত টাকাও আমার নেই যে সবাইকে খাওয়ানো যায়। একটা পয়েন্টের পরে বুঝতে হয় কী আমরা করতে পারি। কতটুকু করতে পারি। অম্বা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যতটুকু টাকা আজ দেবারির পকেটে ছিল সব ও দিয়ে এসেছে। আর সেটা করেছে অম্বার জন্যই। অম্বা বোঝে সেটা। শিশুগুলোর মুখের হাসি ওর মনে পড়ে। আর পাশে বসে থাকা লোকটাকে ভালোবাসবে, আদরে আদরে ভরিয়ে দেবে নাকি ঘৃণা করবে, ভেবে পায় না ও। খানিকক্ষণ ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকার পরে দেবারিও হাল ছেড়ে দেয়। কিছু বলে না আর।

কিন্তু সেরাতে মিলনের সময় অম্বা কাঁদে আর কাঁদে। ওর সবটুকু দিয়ে দিতে পারলে ও খুশি হত। কিন্তু কাকে দেবে, কোথায় দেবে? কে নেবে?

দেবারি ওর চোখের জলটুকু চেটে নেয়। ওর গালে নাক ঘষে। কথা ওরা বলে না কিন্তু ওদের আঙুলের নখ পরস্পরের ত্বকে দাগ রেখে যায় না বলা কথার।

***

দেবারি কয়েক মাস পরে একদিন বলে, "বাবা সন্তান চান।" একটা পাঁউরুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে বলে। যেন জীবনের আর পাঁচটা কথার মত সহজেই। কারণ বিষয়টা সহজই ওর কাছে। নিজেকে মনে মনে বোঝায় ও। একটা আলোচনা করে নেওয়া। গেম প্ল্যান কী হবে ওদের। আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় যে কথা উঠছে সেটার মোকাবিলা কীভাবে করবে দুজনে মিলে।

দুঃখের মধ্যে অম্বার মন সেদিন ভালো ছিল না। ও নিজেকে আর্টিস্টই বলে। কিন্তু ওর মূল রোজগার যেখান থেকে আসে সেটা বিদেশী সাদা ক্লায়েন্টদের জন্য ডিজিটাল কমিশন আর্ট। এক অসভ্য ক্লায়েন্টের সঙ্গে

কথা বলে ওর মেজাজ খারাপ ছিল সেদিন। টাকা রিফান্ড করার কথা পর্যন্ত উঠেছে। আর সে টাকার পরিমাণটা কম নয়। তার ওপরে ওর মায়ের কাছ থেকে খবর এসেছে, মা অসুস্থ।

ও বলেছিল, "ও! বাবা সন্তান চান? সে তো ভালো কথা। তোমার একটা ভাই কি বোন আসছে তবে? মা কে?"

আর একটা সময় ছিল যখন ওর এরকম ত্যাঁদড় ফাজলামোতে দেবারি থমকে যেত। তারপরে ওকে চুমু দিত যেন ওর মুখ থেকে আর কোনও কথা বেরোনো আটকাতেই।

এখন প্রতিদিনের টুকরো ঝামেলাতে আর হয়তো অম্বাকে ওর 'পাওয়া' হয়ে গেছে বলেই ও শুধু বিরক্তই হয় এসবে।

"প্লিজ একটা সময়ও কি তোমার একটু সিরিয়াস হতে ইচ্ছে করে না অম্বা? আমার হাতে বেশি সময় নেই এখন।" বলেছিল ও ত্যক্ত মুখে।

অম্বার মাথাও গরমতর হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়ায়। "কী ব্যাপারে সিরিয়াস হব? আমাদের বিয়ে হয়েছে এখনও একবছরও হয়নি। আর আমার বাচ্চার কথা যদি বলো, আমি এখন সন্তান চাই না।"

দেবারি নিজেও চায় না। আর এখনই সে কথা ও বলছেও না। কিন্তু হাবেভাবে একটা দেখানেপানা বজায় রাখতে ক্ষতি কী! "আমরা তো চেষ্টা করছিই!" ইত্যাদি বলে বছর চারেক পাঁচেক কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই। তারপরে— তারপরে অম্বার অক্ষমতার কথা জেনে শুনেও হয়তো চিকিৎসার ভান করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটাকে সইয়ে এনে— কিন্তু অম্বার সঙ্গে এই ধরণের আলোচনা করা অসম্ভব। যাদের সঙ্গে সম্ভব হত তাদের দেবারি নিজেই চায়নি।

অম্বা এটাও জানে না যে দেবারি দেবপ্রতিমকে খুলে বলেনি অম্বার সন্তানধারণে অক্ষমতার কথা।

কিন্তু সেকথা কী করে এখন অম্বাকে খুলে বলবে সেটাই চিন্তার বিষয়।

অম্বা একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে ওর পাশ থেকে উঠে শোওয়ার ঘরে চলে গিয়েছিল। দেবারি আর ডাকেনি ওকে। মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল ওরও।

***

সেরাতে বাড়ি ফিরে কিন্তু দেবারি দেখেছিল অম্বার মুড ভালো আছে। গুনগুন করে গান করছে রান্না করতে করতে। কাছে গিয়ে ওর ঘাড়ে

মুখ গুঁজতে অম্বা হেসেছিল প্রশ্রয়ের হাসি। বলেছিল, “কী! বাবুর আদর খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে?” ঘাড় ঘুরিয়ে দেবারির চুলে ছোট্ট একটা চুমু দিয়েছিল। এটুকুই তো দেবারি চায়। কেন যে সেটুকু থেকেও ওর ভাগ্য ওকে বঞ্চিত করে!

পরে আরও রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বিশ্রামের সময় বলেছিল, “আমার বাবা জানে না তোর অসুবিধার কথা।”

“কী?”

“তোর অসুবিধাটা।” দেবারি বলেছিল আবার।

আর অম্বা হয়তো অন্যমনস্ক ছিল। বা ওর মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওদের সকালের আলোচনাটা। ও বলেছিল ভুরু কুঁচকে, “কীসের?”

“কনসিভিং।” দেবারিকে বলতে হয়েছিল খুলে।

“আহ!” অম্বা বলেছিল। একটু পরে বলেছিল, “বলিসনি কেন?”

“কেন বলব?” দেবারি বলেছিল একটু ক্লান্ত স্বরে। “এটা কি কেউ বাবাকে বলতে যায়?”

অম্বা হেসেছিল প্রাণহীন একটা হাসি। “কে জানে? আমার তো বাবা নেই বা জ্ঞানত কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু যখন তোদের রিলেসনশিপে তোর বাবার এটা ডিমান্ড করার অধিকার আছে যে তুই এ্যর দিবি তখন তোর আগে থেকেই পথ ক্লিয়ার করে রাখারও দরকার আছে। অ্যাজ ইটস ক্লিয়ার যে সন্তানের বেডরুমের খবর তোর বাবা রাখতে চান।”

“মাইন্ড ইয়োর টাং অম্বা।”

অম্বা চুপ করে গিয়েছিল। মনে মনে যে জিভ কাটারও ইচ্ছে করেনি তা নয়। কেন যেন দেবারির ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ও যতটা সহনশীল, দেবপ্রতিমের কথা উঠলেই সেটা ও থাকতে পারে না।

দেবপ্রতিম, যিনি কিনা হাবেভাবে কখনওই এটা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন না যে অম্বা তাঁর পছন্দের নয়। অম্বা ঠিক না। অম্বাকে 'মানায় না'।

অম্বার ইচ্ছে করে ততটাই সোচ্চারে জানিয়ে দিতে যে ও-ও দেবপ্রতিমকে পছন্দ করে না সমান তীব্রতায়।

অনেকক্ষণ, অনেকটা রাত পর্যন্ত বিছানায় জেগেছিল দুজনেই সেদিন। সহজেই বোঝা যায় যখন পাশের জন জেগে থাকে। সজাগ থাকে। তারপরে নিজে থেকেই অম্বা গিয়েছিল দেবারির কাছে। ওর পিঠে মুখ গুঁজে বলেছিল, “কী আমাদের সমস্যা হচ্ছে বল তো? তুই আমাকে কিছু বলতে চাস না। আমিও অনেক কিছুই বুঝি না। কী চাস তুই আমার কাছ থেকে বল। এখনই সন্তান? সত্যিই?”

দেবারি হালকা একটা শব্দ করে হেসেছিল তখন। শেষ একটা বছরে অম্বাকে নির্বাধে পাওয়া ছাড়া আর কিছুই ও চায়নি। কিন্তু সেটা অম্বাকে বললে অম্বা কি ওকে বুঝবে?

“আমি যা চাই তা বললে তুই এতদিনে আমাকে ছেড়ে চলে যেতিস অম্বা। না জেনে বুঝে একটা—”

অম্বা ওর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল। ওর চোখে গালে চুমু দিয়েছিল। “আমার তোকে ছেড়ে না যাওয়াটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট তোর কাছে দেবারি? কারণ আমি বুঝি না। আমি বুঝি না।”

***

এখনই না হলেও, বছর কয়েকের মধ্যে হলেও একজন স্যুটেবল সারোগেট মাদার জোগাড় করাটা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষ করে নতুন সারোগেসি ল চালু হওয়ার পরে। সারোগেট মাদারকে লিগাল মা বাবার পরিচিত মণ্ডলের মধ্যে হতে হবে। বিবাহিত হতে হবে এবং নিজের অন্ততপক্ষে একটি সন্তান থাকতে হবে। এবং অবশ্যই শারীরিক মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হতে হবে। তার থেকেও একটা বড় ব্যাপার হল, দেবারির ক্ষেত্রে, যদি দেবপ্রতিমের সম্পূর্ণ মত নিতে হয় তাহলে সারোগেটকে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হতে হবে।

দেবারি ওর থেকে বছর দশেকের বড় ওদের পারিবারিক ডাক্তারকে বলে রেখেছিল ব্যাপারটা গোপনে তাই। বাবার কানে যেন কথা না যায়। কিন্তু ডাক্তার নিজে যেন একটু লক্ষ রাখেন। এমন কেউ যদি থেকে থাকে আশেপাশের মধ্যে তাহলে দেবারিকে চেষ্টা করতে হবে অম্বাকে রাজি করানোর।

***

সুতপাকে দেবারি ভালোই চিনত। ছোটবেলার খেলার সাথী। কিন্তু সমকক্ষ নয়। ওর বাবা দেবপ্রতিমের ড্রাইভারের কাজ করতেন। এখন আর পারেন না। সুতপা বিবাহিত। এবং কায়স্থ। এমনিতে ওদের অবস্থা এতটাও খারাপ ছিল না যে ওকে সারোগেসির মাধ্যমে টাকা রোজগার করার কথা ভাবতে হত স্বাভাবিক সময়ে। কিন্তু কয়েকদিন আগেই ওর স্বামীর লিভারের প্রবলেম ধরা পড়েছে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। ডাক্তারের কাছে টাকার অঙ্কটা শুনে সুতপার চোখ কপালে উঠেছে। আর ডাক্তারের কাছেই সুতপা খবর পেয়েছিল

দেবারির ব্যাপারেও।

ও এসেছিল অম্বার কাছে নিজেই। অম্বা এটা আশা করেনি। থতমত খেয়ে গিয়েছিল ও।

"তুমি বৌদি হয়তো খেয়াল করোনি। কিন্তু আমি এসেছিলাম তোমার বিয়েতে তো। খেয়ে গেছি।" হেসে বলেছিল সুতপা।

অম্বা ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল নিজের। এরকম গায়ে পড়া খোসগল্প জোড়া মেয়ে যে ও খুব পছন্দ করে তা নয়। ওর ইচ্ছেও ছিল না যে যে দেবারির সন্তানকে বহন করবে সে ওদের এতটা পরিচিত মণ্ডলের মধ্যে হোক। মানে আইন অনুযায়ী সেটা যে একটা শর্ত তা ও জানে, কিন্তু টাকা দিয়ে অনেক আইনকেই যে বুড়ো আঙুল দেখানো যায় সেটাও ও জানে একইভাবে। যদিও নিজের কাছেও নিজে সেটা ও স্বীকার করে না পারতপক্ষে। খুব গভীরে গোপনে ছিল সেই ওর চিন্তাটা তাই। বাইরে সেটাকে এনে ও নিজেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চায় না। কেন ওর এই আপত্তি সেটাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফেলার ইচ্ছা ওর একেবারেই নেই। এখন সুতপা নিজের হলুদের দাগ ধরা চুরিদার আর ফ্যাটফ্যাটে সিঁদুরের দাগ ওলা সিঁথি নিয়ে ওর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সোজা। বলেছিল, "সবাই বলে দেবারিদার বৌ সাক্ষাৎ মা দুর্গা। কেউ খালি হাতে ফেরে না। টাকাটার আমার খুব দরকার দিদি!"

মেয়েটার ত্বক রুক্ষ শুষ্ক কিন্তু গায়ের রং যাকে বলে দুধে আলতায়। অম্বা ভেবেছিল নিজের শ্যামলা গায়ের রঙের কথা। মুখে বলেছিল, "লোকে মা দুর্গা বলে না মা কালি?" সুতপাকে থতমত খেয়ে যেতে দেখে হেসেছিল তারপরে। মুখে বলেছিল, "এটা তো আমি একা ঠিক করতে পারব না। দেবারির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তোমার নাম্বারটা দিয়ে যাও।"

***

দেবারি প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। অম্বা কথা শুরুই করেছিল, "অলরেডি সারোগেট মাদার অ্যাপয়েন্ট করাও শুরু করে দিয়েছিস!" বলে। কাজেই হকচকিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু পরে এটা অম্বা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে ও ততটা রেগে যায়নি এই পুরো ব্যাপারটায় যতটা রেগে যাওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। হয়তো সুতপার মরণাপন্ন স্বামীর কথা মনে করেই রাগটা মাথার মধ্যে জমাট বাঁধার সুযোগ পায়নি। কৌতূহল তাকে তারল্য দিয়েছে। দেবারিকে নিজের দিকটা বলার সুযোগ দিয়েছিল তাই ও।

মনে আবার খটকা লেগেছিল যখন দেবারি বলেছিল, "এ তো ভালো কথা! খুবই ভালো আসলে! যদিও ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলব। আগে আমাকে কিছু না জানিয়ে... মানে কনফিডেন্সিয়ালিটি বলে কি কিছু নেই! তবে হ্যাঁ ভাগ্যের ব্যাপার যে সুতপার এই মুহূর্তে টাকার দরকার।"

কথাটা কেন যেন অম্বার ভিতরে গিয়ে আঘাত করেছিল। হৃদয়ের সেই জায়গায় যেখানে দেবারির না ভেবে চিন্তে করা সমস্ত ইনসেনসিটিভ মন্তব্যই আঘাত করে। সুতপার স্বামী মরণাপন্ন তাই ওর টাকার দরকার। সেটাকে কী করে এরকম উড়োস্বরে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে দেবারি! যতই অম্বা না পছন্দ করে থাকুক সুতপাকে এরকম ভাবে তো ও ভাবতেই পারে না! আর দেবারি নাকি ওকে এতটাই পছন্দ করে যে নিজের সন্তানকে ওকে ধারণ করতে দিতে ওর আপত্তি নেই! কী সেই পছন্দ করার মূল্য যখন ওর এমন একটা দুর্ভাগ্যতে ও খুশি হচ্ছে সেটা ওর নিজের একটু সুবিধা করছে বলেই?

চিন্তাটা যে তিক্ততা এনেছিল মুখে সেটাকে অন্য সময়ের মতই গিলে নেওয়ার চেষ্টা করে অম্বা অন্য প্রসঙ্গ তুলেছিল যদিও।

"কিন্তু ওর তো বাচ্চা কাচ্চা নেই নিজের। ওকে কি করতে দেবে ডাক্তারেরা?"

"বাচ্চা নেই?" ভুরু কপালে তুলেছিল দেবারি। "কে বলল?"

অম্বা থতমত খেয়ে বলেছিল, "মানে ও-ই তো বলল, আমরা দুটি মানুষ দিদি! ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না! কই বাচ্চার কথা তো বলল না?"

"ওঃ সে—" দেবারি বলেছিল উড়োস্বরে, "সে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওর বাচ্চাটা সম্ভবত ওর কোনও আত্মীয়ের কাছে থাকে। আমার অত মনে নেই—"

"ওঃ!" অম্বা বলেছিল। রহস্যজনক ব্যাপার! তারপর বলেছিল অন্য কথা। "এখন না কমার্শিয়াল সারোগেসি বন্ধ? ওকে পয়সা দিচ্ছিস এটা জানতে পারলে—"

"সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি বুঝে নেব।" দেবারি বলেছিল খুব সহজেই। আর এমন নয় যে অম্বা জানত না যে তা-ই ও বলবে। চুপ করে ও সরে গিয়েছিল সেখান থেকে।

ওর চুপ করে থাকাটা কিন্তু দেবারি লক্ষ করেছিল একটু পরেই। বলেছিল, "তোমার কি সুতপাকে পছন্দ হয়নি?"

অম্বা চুপ করেছিল। উত্তর দেয়নি সে কথার। ভাবছিল ও।

শুধু যে সুতপাকে পছন্দ বা অপছন্দ হওয়াটাই অম্বার ইস্যু তা তো

নয়। দেবারি জীবনে একটা করে সিদ্ধান্ত নেয় আর গোঁয়ারের মত সেদিকে এগিয়ে যায় আগুপিছু কিছু না ভেবে। জীবনের প্রতি ওর এই মনোভাবকে যে অম্বা অপছন্দ করে তা নয়। কিন্তু ও নিজে অন্যরকম। ওকে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবতে হয়। ও হ্যাঁ আর না-এর মাঝের দোলাচলে দোলে খানিকটা সময়। সেটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। দেবারি সবকিছুতে একটা সোচ্চার "হ্যাঁ!" চায় সবসময়। সেটা অম্বা ওকে দেবে কী করে?

"তুমি কয়েকদিন ওর সঙ্গে মেলামেশা করে দেখো না!" দেবারি বলেছিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। "ভালো মেয়ে। ওকে দেখলে ওরকম মনে হতে পারে, কিন্তু—"

'ওরকম' মনে হতে পারে! কীরকম মনে হতে পারে? ইচ্ছা করেছিল জিজ্ঞেস করে অম্বার। কিন্তু করেনি।

মনের মধ্যে অভিমান জমা হচ্ছিল ওর। ও জানে একবার যখন দেবারির ভালো লেগেছে আইডিয়াটা, সেটাই হবে। আর এই সন্তান আদপে তো দেবারিরই। ওর উত্তরাধিকারী। এতে অম্বার কীই বা বলার আছে।

রাতে দেবারি অদ্ভুতভাবে, ওর চরিত্রের বাইরে গিয়ে খেয়াল করেছিল ওর চুপ করে থাকা। রাগ করেনি। জ্ঞান দেয়নি। অম্বা কী চিন্তা করছে জানার দাবি জানায়নি। কাছে এসে ওর দুকাঁধে হাত রেখেছিল। ওর গলার কাছে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, "প্লিজ একটু সময় দাও সুতপাকে। আমি চিনি ওকে অম্বা। তোমার ওকে ভালোই লাগবে।" ওর গালে আলতো চুমু দিয়েছিল একটা তারপরে। বলেছিল, "আর ওর কথা ভেবো না। ওর সন্তান এবাড়ির সন্তান বলে গণ্য হবে, আমি জানি এটা তোমার কাছে কোনও বড় বা পজিটিভ ব্যাপার বলে মনে হয় না। বরঞ্চ হয়তো খারাপই। কিন্তু এটা ওর কাছে ভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে হবে অম্বা! তাছাড়া ওর স্বামীও চিকিৎসা পাবে হাইয়েস্ট অর্ডারের। আমি ব্যবস্থা করব। ভেবে দেখো—"

অম্বার ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞেস করে, সেটা দেবারি এমনিই করতে পারে না কেন। কেন তার জন্য সুতপাকে ওর সন্তান ধারণ করার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু করেনি। দেবারি যেন বহুদিন পরে ওর কাছে এসেছে। ওর সঙ্গে আলোচনা করছে। ওকে বুঝতে চাইছে। নিজেকে বোঝাতে চাইছে। অম্বা সেইটুকু হারাতে চায়নি। চোখ বুজে বলেছিল। "আচ্ছা! আচ্ছা!"

***

সুতপাকে পছন্দ করতে কিন্তু অম্বার বেশি সময় লাগেনি। 'ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ লাস্ট ইমপ্রেশন' কথাটা সত্যি হয় তাদের ক্ষেত্রে যারা খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করে না। অন্তত অম্বার বিশ্বাস তাই।

অম্বার ফার্স্ট ইমপ্রেশন কখনওই বেশিদিন টেকে না। এটাও টেকেনি।

সুতপা হাসি খুশি। দয়াভিক্ষার গদগদ ভাব ঝেড়ে উঠতে পারলে ভিতরে একটা চনমনে সুন্দর মন আছে। হাসলে গালে টোল পড়ে। অম্বার সঙ্গে আলাপ একটু জোরদার হতেই গড়গড় করে নিজের জীবনের কাহিনী বলে গিয়েছিল।

"প্রথম বাচ্চাটা আমার হয়েছিল তখন মনে হয় ষোল বছর বয়স আমার দিদি। কিছুই বুঝতাম না। বাচ্চা পেটে এসে গেল। তারপরেই তো এরা সবাই মিলে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিল আমার। তবে বাচ্চাটাকে আমি মানুষ করিনি। আমাকেই কে মানুষ করে তখন তার ঠিক নেই আর—"

"ও আমার বাচ্চা? আমার দিদির কাছে মানুষ সে দিদি! তাকে আমি আগে দুচক্ষে দেখতে পেতুম না। এখন ভাবি—" অতীতের কোন কথা ভেবে চুপ করে গিয়েছিল সুতপা। তারপর বলেছিল, "আমার দিদির দুই মেয়ে। আমারটা ছেলে বলে ওকে খুব ভালোবাসে। জামাইবাবুও খুব ভালো। আমার বরটা লোক খারাপ নয় কিন্তু ওরও টান নেই ছেলের প্রতি। এখনও নেই! কী দোষ দেব, আমারই তার উপর কোনও টান ছিল না এককালে!" "... ওখানে আছে থাক। ভালো আছে।" বলেছিল শেষে।

একটু পরে বলেছিল, "এখানে তোমাদের কাছে আমার ছেলে মানুষ হলে—" বলতে বলতে অম্বার মুখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে একটু চুপ করে গিয়েছিল ও। তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারপরে, "মানে, তোমাদের ছেলে! মানে, বলছি..."

অম্বা মুখে হাসি টেনে এনেছিল। "না না ঠিকই আছে। তোমারও তো বটে। সে এলে সে আমাদের সবারই হবে!"

সুতপা মাথা নিচু করে চুপ করে ছিল খানিকক্ষণ। তারপরে আস্তে করে বলেছিল, "আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ দিদি কী বলতে কী বলে ফেলি।"

"কিচ্ছু ভুল বলোনি তুমি সুতপা!" বলেছিল অম্বা, "তোমার রক্তের সন্তান তোমার গর্ভে মানুষ হবে! তাকে তুমি তোমার বলবে না তো কী? নিশ্চয়ই তোমার। হাজারবার তোমার!" একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও।

সুতপা হেসেছিল তখন। "তুমি একটি ছেলেমানুষ দিদি! আমার তো

বটেই। কিন্তু —”

“কোনও কিন্তু নেই!” জোর দিয়ে বলেছিল অম্বা।

“আচ্ছা! আচ্ছা!” সুতপার মুখে হাসি খেলেছিল একগাল। “ঠিক আছে ঠিক আছে!”

***

কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিল অম্বা। সুতপা খুব ভালো সেলাই করে।

সুতপাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারখানার থেকে আসছিল ও। সুতপার হাত থেকে ওর রুমালটা পড়ে গিয়েছিল কীভাবে যেন। অম্বা নিজেই নিচু হয়ে সেটাকে তুলেছিল মাটি থেকে। একদমই জরাজীর্ণ সে রুমাল। আগে বোধহয় সবজে একটা রং ছিল। এখন প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে। কিন্তু ওর নজর কেড়েছিল সেই রুমালের কোণের দিকে সাদা কালো বাদামী সুতোয় তোলা একটা বিড়াল। তার দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। খুব ভালো সেলাই বললে তার কিছুই বোঝা যায় না আসলে। সেটা আর্ট! “অদ্ভুত তো!” বেরিয়ে গিয়েছিল ওর মুখ থেকে। “অদ্ভুত সুন্দর! কে করেছে এটা? এত ভালো সেলাই? এই রুমালের তো অনেক দাম হবে!”

সুতপা অম্বার হাতে ধরা রুমালটার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হাসি হেসেছিল। যেন অন্যায় করে ধরা পড়েছে এমন একটা হাসি। “হেহে ওটা—” হাত বাড়িয়ে তড়িঘড়ি ও অম্বার হাত থেকে নিয়ে নিতে চেয়েছিল রুমালটা। অম্বা দেয়নি। ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল সুতপার মুখের দিকে।

লজ্জায় লাল হয়ে সুতপা বলেছিল, “দামী রুমাল না ছাই দিদি! ওটা আমি নিজেই করেছি গো।”

“নিজে?” অবাক গলায় বলেছিল অম্বা।

“হ্যাঁ!” সুতপা বলেছিল। যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে।

“কোথা থেকে শিখলে এত ভালো সেলাই?” অম্বা ছাড়েনি প্রশ্ন করা।

“নিজে নিজেই শিখেছি।” মৃদুস্বরে বলেছিল সুতপা। “নিজে নিজেই?” অম্বা অবাক হয়েছিল আরও।

“হ্যাঁ। বিয়ের পরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। বাচ্চাটাও দিদির কাছে মানুষ হচ্ছিল। তখন আর কী করি, সময় কাটাতে এদিক ওদিক থেকে সুতো জোগাড় করে এই কাপড় ওই কাপড়ে কাঁথা বানাতাম। ছেলের কাঁথায় এই ফুলপাতা তুলতাম ইস্কুলে দিদিমনিরা যেমন শিখিয়েছিল। সেই থেকেই। তারপরে এখন তো ইউটিউবে সেলাইয়ের ভিডিও দেখি। এটা ওটা ডিজাইন তোলা শেখায়—”

"অসাধারণ!" বলেছিল অম্বা। সত্যিই কত মানুষের মধ্যে কত প্রতিভা যে লুকিয়ে থাকে! ভেবেছিল মনে। "শোনো তোমাদের মেডিক্যাল প্রসেস তো কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে, তার পরে ইমপ্ল্যান্টেশন। এর মধ্যে তুমি একটা কাঁথা বানাতে শুরু করো। কিন্তু... র‍্যান্ডম ডিজাইন নয়। ডিজাইন বাছতে হবে। হমম সমুদ্র, হ্যাঁ ধরো সমুদ্র — তুমি কী ঢেউয়ের প্যাটার্ন তুলতে পারবে?"

সুতপা হেসেছিল ওর উৎসাহ দেখে, বলেছিল, "ঢেউয়ের প্যাটার্ন তোলা এই কদিন আগেই শিখেছি দিদি। কিন্তু তেমন প্র্যাকটিস হয়নি। প্রচুর সুতো লাগে। লাগবে। আর সুতোর অনেক দাম—"

"আমি দেব দাম!" অম্বা বলেছিল গম্ভীর স্বরে। "কোনও চিন্তা নেই সেদিকে। যত সুতো লাগে আমি দেব।"

সেদিন রাতে অনেকদিন পরে ও উত্তেজিত আলোচনা করেছিল দেবারির সঙ্গে। "ভেবে দেখ। কত ট্যালেন্ট নষ্ট হয় আমাদের এখানে এভাবে। কত ট্যালেন্ট! মানে, সুতোর দামের জন্য! ভেবে দেখ! তুই দেখেছিস ওর সেলাই?"

দেবারি হেসেছিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। "না ওর সেলাই আমি দেখিনি কিন্তু তোর উত্তেজনা থেকে খানিকটা ঠাহর করতে পারছি।"

"বিশ্বাস করতে পারবি না দেবারি। কী অসাধারণ! একটা পাখি তুলেছে একটা শাড়ির পাড়ে! নীলকণ্ঠ পাখি! দেখলে মনে হবে জ্যান্ত! যেন এখুনি ডেকে উঠবে!"

দেবারি স্মিতমুখে চুপ করেছিল। অম্বা বলে চলেছিল। "আমি বলেছি আমি টাকা দেব সুতো কেনার। তা যত টাকাই লাগুক। এই রকম ট্যালেন্ট—" কথা শেষ না করেই ফিক করে হেসেছিল ও তারপরে। "আমি এমন ভাবে বলছি যেন আমি কোন মহারাণী। টাকার গদিতে শুয়ে থাকি।" তারপর দেবারির শরীরে একটা দৃষ্টি বুলিয়ে ঠোঁট কামড়ে দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিল, "মানে এখন থাকি।" একটা হাত নাড়িয়ে ভঙ্গি করেছিল ও। "কিন্তু তবু মানে—"

দেবারি ওর গল্প শুনেছিল খেতে খেতে। তখন কিছু বলেনি। রাতে ওর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে বলেছিল, "তুই আমাকে টাকার গদি ভাবিস?"

"মিথ্যে ভাবি?" হেসে বলেছিল অম্বা। "তোর টাকাতেই তো সুতপার সেলাইয়ের জন্য সুতো কিনব আমি।"

"আচ্ছা!" দেবারি বলেছিল ওর কানের ডগায় আর নিচে অল্প অল্প ছোট কামড় বসাতে বসাতে। "আর সুতোর কথা শুনতে চাই না।"

অম্বা হেসেছিল। "পার্ভার্ট।" বলেছিল ও। "টাকার গরমে তোর হার্ড অন হয়? সুগার ড্যাডি!"

"দেখাচ্ছি তোকে সুগার ড্যাডি।" ওকে বিছানায় ফেলে বলেছিল দেবারি।

আর সত্যিই ওদের বিছানাটা নরম। নরম গদিতে ডুবে যেতে যেতে ভেবেছিল অম্বা। টাকার গদি ছাড়া এত আরাম পাওয়া যায় কি?

***

সুতপাকে পেয়ে অনেকদিন পরে অম্বা যেন মেতে উঠেছে। আগে... মনে হয় যেন বহুদিন আগের কথা, এরকম হাসি খুশি চঞ্চল ও থাকত দেবারির আশে পাশে। বহুদিন ধরে অল্পে অল্পে ওর মধ্যের আলো যেন নিভে আসছিল। কোথাও একটা বাধা ওদের সম্পর্কটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল সেটা দেবারি বোঝে ওকে দেখে এখন। সেই নির্দায় নির্ঝঞ্ঝাট অফুরন্ত আনন্দ আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল, মিলিয়ে যাচ্ছিল প্রতিদিনকার লড়াই আর দিনগত পাপক্ষয়ে!

অম্বা সুতপার মধ্যে ওর একটা লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পেয়েছে। সুতপাও, দেবারি বোঝে, এরকম একজন সমঝদার পেয়ে খুশি। অত্যন্ত বেশি পরিমাণেই খুশি। যেটা... স্বাভাবিক। এবং একজন নারী যাকে দেবারি ভালোবাসে, আর আরেকজন যে ওর সন্তানকে বহন করছে তারা যদি খুশি থাকে তাহলে তাদের খুশিতে ওর নিজেরও খুশি হওয়া উচিত। দেবারি বোঝে সেটা। বোঝায় নিজেকে।

সন্ধ্যায়, সারাদিনের ঝঞ্ঝাটের পরে ঘরে ফেরে, দুটো নারী কণ্ঠের উচ্চকিত হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়।

"দেখো দেখো, অম্বা বলে, এই কাঁথাটার ডিজাইন হচ্ছে সমুদ্রবেলা, এই নুড়িটা দেখো শুধু! একদম আসলের মত না?" সুতপা লাজুক মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটু দূরে। দেবারি দেখে সুতপার মধ্যের বাড়াবাড়ি রকমের সঙ্কোচ ভাবটা আর নেই। ওর মধ্যের একটা গুণ অম্বা আবিষ্কার করেছে এবং তাই নিয়ে মেতে উঠেছে তাতে সুতপাও যেন আবিষ্কার করেছে নিজেকে। ওর মুখচোখের চকচকে ভাবটা শুধু প্রেগনেন্সির প্রভাবে নয়। অম্বারও প্রভাবে। আর দেবারি জানে, অম্বার মধ্যে এই গুণটা চিরদিনই ছিল। মানুষের নিজের মধ্যে সেরা যেটা সেটাকে বাইরে বের করে আনার ক্ষমতাটা ওর ঈশ্বরপ্রদত্ত।

দেবারি ভাবে। অম্বার সঙ্গে ওর চরম অশান্তির দিনগুলোতেও বাড়ি ফিরে প্রথম কাজ ও করত ওর গালে একটা চুমু দেওয়া। অম্বা, যতই রাগ করে থাক না কেন, কোনওদিন ফেরায়নি ওকে। সে এখন আর

হওয়ার জো নেই। বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত সুতপা থাকে ওদের সঙ্গে। তারপরে ও চলে যাওয়ার পরেও অম্বার আলোচনার বিষয়বস্তু জুড়ে থাকে ও-ই। বা ওর পেটের বাচ্চাটা। বাচ্চা ওর পেটে ইমপ্ল্যান্ট করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়েছে। মাঝে মাঝেই স্ক্যানিং হচ্ছে বাচ্চাটা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য। অম্বা সেসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতপা কী খাবে, কী খাবে না, কতটা পরিমাণে খাবে সেই নিয়ে ও আলোচনা করতে চায় দেবারিরি সঙ্গে। ওর কাঁথার আর্ট দেখিয়ে দেবারিকে অবাক করে দিতে চায়।

"তোমার ছেলে বা মেয়ে যাই হোক," দেবারির মন রাখা ঘোঁত করে করা প্রতিক্রিয়া দেখে অম্বা হেসে বলে, "যদি সে একটুখানিও আর্টিস্টিক সেন্স পায় সেটার জন্য আমি সুতপার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব সারাজীবন। নইলে তোমার জিনের উপর আমার একটুও ভরসা নেই। এমন সুন্দর কাঁথাটা দেখে তোমার—" কথাটা ও শেষ করে না। ওর কথায় কোনও তিক্ততা বা সত্যিকারের ব্যঙ্গও নেই। তবু দেবারি আঘাত পায়। সে আঘাতটা এতরকম অনুভূতির মিশ্রণ যে সেটাকে ও ঘেঁটে দেখে না আর। শুধু মনের মধ্যে অল্পে অল্পে ঘুলিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে একটা খুব জটিল ক্ষোভ। অপ্রকাশ্য তাই তীব্র! অম্বার কি মনে এতটুকু ক্ষোভ হয় না যে দেবারির সন্তানকে বহন করছে একটা কে না কে? তাকে মাথায় তুলে ও নাচে কী করে? দেবারির বাচ্চা! দেবারির বাচ্চা! বলতে ওর এতটুকু বাধে না? দেবারিকে ওর বাচ্চা সমেত সুতপার প্রশংসা করতে বলে কেন ও? একটু নারী সুলভ অধিকার ফলানোর ইচ্ছা, হিংসা, সন্তান ধারণে অক্ষমতার ক্ষোভ কিছুই কেন নেই অম্বার মধ্যে? রাতে ওকে ছুঁতে গেলে দেবারির মনে হয় অচেনা কোনও নারী যেন। যে নারী মা না হয়েও মা। যার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের সন্তানের কাছে। যে যেন দেবারিকে দয়া করছে।

***

"তোকে আগেই বলেছিলাম—" অহনা বলে। ওর ঠোঁটে মৃদু একটা হাসি। দেবারির মনে হয় ওর সমস্যাটাকে অহনা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। "বলেছিলাম—" অহনা বলে চলে, "এত তাড়াতাড়ি করিস না। এমন নয় যে তোর সারোগেট পেতে কোনও অসুবিধা হত। ফেলো কড়ি মাখো তেল। আর কড়ির যখন অভাব নেই।"

দেবারি ঘোঁত করে একটা শব্দ করে গলার মধ্যে। কী বলবে? যা বলার সবই অহনা আগে থেকেই জানে। কীভাবে সুতপা হঠাৎই এসে উপস্থিত হয়েছিল ওদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে। কেন সে সুযোগ

ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা দেবারির ছিল না, সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ সবই অহনার জানা আছে।

ও যে রাগ করছে, কষ্ট পাচ্ছে অম্বা ওরই ইচ্ছে অনুযায়ী সবকিছু করছে বলে, দেবারি জানে এটা কতটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষী। অম্বা তো চায়নি এই সন্তান। দেবারির জন্য রাজি হয়েছে। চায়নি সুতপা বহন করুক এই সন্তান, সেটাও দেবারিই একরকম বাধ্য করেছে ওকে। এমনকি ভেবে দেখতে গেলে, অম্বা কি বিয়ে করতে চেয়েছিল এখন? সেটাও দেবারিরই সিদ্ধান্ত ছিল না কি? দেবারি অম্বার জীবনে এনেছে এই সমস্ত কিছু। এখন যদি তাতেই মানিয়ে নিয়ে তারপরে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে অম্বা কিছু একটা নিয়ে খুশি হয়ে ওঠে, তাতে এরকম ক্ষোভ বোধ করার কোনও অধিকার কি আছে দেবারির? কী ধরণের বদ মানুষ হলে হাসি খুশি স্ত্রীর হাসি খুশিকে লোকে ঈর্ষা করে!

কিন্তু গোপনে দেবারি না ভেবে পারে না, যখন প্রতিদিন ওরা অশান্তি করছিল, তখনও সেটা ছিল অম্বার প্রতিক্রিয়া সরাসরি দেবারির প্রতি। দেবারি জুড়ে ছিল ওর মন। এখন সে মনের আশি শতাংশ একটা এখনও না জন্মানো শিশু, তার আধার, আর তার জন্য তৈরি একটা কাঁথা অধিকার করে নিয়েছে।

সেটা তো দেবারি চায়নি। ও এত কিছু করেছে তো অম্বার সবকিছু অধিকার করার জন্যই।

"বাচ্চা!" অন্যমনস্কভাব ভেঙে ও শোনে, অহনা বলে চলেছে, "একটা বাচ্চা কি মুখের কথা নাকি? এখন তুই তোর জীবন কাটাবি এই বাচ্চার মুখের দিকে চেয়ে, যেন ব্যথা না পায়, যেন কষ্ট না পায়। আর তারপরে নিজেকে দোষারোপ করবি যখন কোনও না কোনও ভাবে এই পৃথিবীতে কষ্ট সে পাবেই। কোনও দিকেই রেহাই নেই।"

দেবারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। অহনা যদি বুঝত দেবারির চিন্তার কত অল্প অংশ বাচ্চাটা অধিকার করে আছে! অহনা যদি বুঝত কতটা স্বার্থপর ও আসলে! বাচ্চা! বাচ্চাটা চুলোয় যাক, ও শুধু অম্বাকে চায়।

***

"শোন না, শুনেছিস, অম্বা বলে, দেখ আজকে স্ক্যানের রেজাল্টটা এসেছে। এই দেখ, দেখ এখানে!" অম্বা যেন নিজের উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছে না, "দেখ! তোর সন্তান!"

দেবারি সবে কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছে। ক্লান্ত তখন। ও উত্তর দেয় না।

"দেখবি তো!" অম্বা বলে অধৈর্য স্বরে। ওর হাত ধরে টান মারে একটা। দেবারি মাথা ঘুরিয়ে ওর হাতে ধরা প্লেটটার দিকে তাকায় একবার। কালো প্লেটটার উপরে সাদা সাদা কিছু দাগ। ওর মধ্যে কী যে এত আনন্দের আছে তা ও বুঝতে পারে না। বোঝার ইচ্ছা নেই।

অম্বা বলে চলে, অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে এখন, "আমরা শপিংএ গিয়েছিলাম আজকে। সুতপার একটা বেনারসী শাড়ির ইচ্ছা ছিল নাকি চিরজীবনের কিন্তু ওর বিয়ে তড়িঘড়ি হয়েছিল বলে কেনা হয়নি সেসব। এখন কিনে দিলাম। দেখবি কী কী বাজার করেছি?"

আর কেন যেন দেবারির ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ে যায় ওর এই মৃদুস্বরের ঘরোয়া কথায়। "প্লিজ অম্বা!" ও বলে কণ্ঠস্বর উঁচু করে, "আমি সারাদিন কাজ করি। আমার শপিংএর খবর রাখার সময় বা এনার্জি নেই এখন। শপিং করেছিস ভালো করেছিস। আরও শপিং কর আর কাঁথাতে ফুল ফল তোল তোরা। আমাকে রেহাই দে। রোজ কাজের পরে বাড়িতে এসে তোর সঙ্গে আরেকটা বাইরের মেয়েকে সহ্য করি। এই কারণে আমি বিয়ে করিনি। আমি একটু নিরিবিলি শান্তি ভালোবাসি। এখন—"

অম্বার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। দেবারির কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে ওঠে ও, "কী বলছিস!" গলার স্বর একটু নিচু করে বলে, "সুতপা বাইরেই আছে! শুনতে পাবে!"

সেটা দেবারি জানে। ও শোনাতেই চায়। বলে, "সবসময় এবাড়িতে ডেরা বেঁধে থাকলে তো শুনতে পাবেই। স্বামীর জন্য নাকি ও খুবই চিন্তিত! স্বামী মরতে বসেছে! দেখে তো মনে হয় না স্বামীর কথা কিছু চিন্তা করে! এবাড়িতেই আছে যখন চব্বিশ ঘণ্টা!"

অম্বার মুখ হাঁ হয়ে যায়। মুখ থেকে কথা বেরোতে চায় না যেন। একটু পরে বলে, বোধহয় দেবারিকে একটু শান্ত হওয়ার সুযোগ দিতে চেয়েই একটু সময় নেয় ও, তারপরে বলে। "কী বলছিস ভেবে বলছিস? ওর পেটে তোর বাচ্চা দেবারি!"

"যার জন্য আমি যথেষ্ট পে করছি! আর কী করতে বলিস!"

***

প্রায় দুমাস ওদের মধ্যে কথা বার্তা বন্ধ হয়ে যায় তার পরে। দেবারি বোধহয় বুঝতে পারে না কীভাবে আবার কথা চালু করবে ও। ও হয়তো বুঝেছে কত বড় একটা অসহ্য কাজ ও করেছে। অম্বাও নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, ক্ষমা করতে পারে না দেবারিকে।

দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলে। মাঝে মধ্যে দেবারি বাড়িও ফেরে না দুয়েকদিনের জন্য। কোথায় যায়, কী খায়, জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা হয়, চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না অম্বার, কিন্তু জিজ্ঞেস করে উঠতে পারে না।

সুতপাও সেদিনের পর থেকে কম আসে ওদের বাড়িতে।

"আমার এতটা সময় এখানে কাটানো সত্যিই ঠিক হয়নি দিদি।" লাজুক হেসে বলেছিল ও সেদিনই। "দাদা কিছু খারাপ তো বলেনি! আমরাই ভাবিনি দাদার দিকটা। বাচ্চাটা পেটে আছে বলেই—"

"দাদা খুবই খারাপ বলেছে।" অম্বার গলার স্বর কেঁপে যায়। "এবাড়ি আমারও বাড়ি। আর ওই বাচ্চাটারও বাড়ি!" ওর গলা বুজে আসে। এটাও সত্যি যে এ বাড়ি দেবারিরও বাড়ি। মনে জানে ও। ওরই বাড়ি সবার আগে। কিন্তু এই যে সন্তানকে দেবারি চেয়েছিল, এই যে সংসারকে দেবারি চেয়েছিল, যার জন্য কত কী বিসর্জন দিয়ে অম্বা এখানে এসেছে, চেষ্টা করে চলেছে, তার কি কোনও মূল্য দেবারির কাছে নেই? এই যে গরীব ঘরের মেয়েটা নিজের পেটে ওর সন্তানকে বহন করছে, তার জন্য ওর মনে এতটুকু স্নেহ জন্মায় না? দেবারি কি পাথর? অম্বা কি তবে একটা পাথরকে, স্বার্থপর পাথরকে ভালোবেসেছে?

শুধু সুতপা নয়, সুতপার পেটে দেবারির না জন্মানো সন্তানের জন্য ওর চোখ ফেটে জল আসে। বাচ্চা জন্মানোর আগে কি সে শুধুই একটা কোষের মণ্ড দেবারির কাছে? এই শিশুকে যে ওরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে জোর করে এই পৃথিবীতে আনছে, তার প্রতি দেবারির দায়বদ্ধতা কতটা সে কি ও জানে? এই শিশুর বাড়ি কি নয় এটা? সে বাড়ি থেকে ওকে বের করে দেওয়া নয় কি এটা?

সুতপা বলেছিল, "ঠিক আছে দিদি। কাঁথা তো আর পালাবে না। আমিও না। দাদার মনে হয় কাজের চাপ পড়েছে। একটু খেপে আছে। বাইরের কাজ তো কম নয় দিদি। আমি কদিন একটু কম আসি। তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নাও। চিন্তা কোরো না। আমি কিছু মনে করিনি।"

***

সাতমাসের প্রেগনেন্সির পরে সুতপার গর্ভযন্ত্রণা ওঠে। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। কোনও অসুবিধা ধরা পড়েনি তার আগে পর্যন্ত।

বহুদিন পরে দেবারিকে ফোন করে অম্বা। করতেই হয়। চিন্তায়, অভিমানে, রাগে কেঁদে ফেলে ও কথা বলতে বলতে। "সবকিছু কেন আমাকে সামলাতে হবে? কী করেছি আমি? এত জ্বালা যন্ত্রণা আমারই

কেন? কী করব এখন! কোথায় যাব।" ওর হাত পা কাঁপে থরথর করে।
ফোনের ওপারে দেবারি বলে, "আসছি আমি আসছি আমি আসছি! ভয় পাস না ভয় পাস না।" বলে চলে আর বলে চলে।

***

নার্স মেয়েটির নাম ঝুম্পা। সে ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, খুব মৃদুস্বরে বলে, "ডাক্তারবাবু পাঠালেন আমাকে। আপনাদের বাচ্চাটা ভালো আছে। ছেলে। সুন্দর হয়েছে। ফর্সা টুকটুকে।"
অম্বা চুপ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। দেবারি বলে, "আর? মানে সুতপা?"
মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলে, "মায়ের অনেকটা ব্লাড লস হয়েছে। ডাক্তারবাবুরা চেষ্টা করছেন। আপনারাও প্রার্থনা করুন ঈশ্বরের কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রার্থনা ওরা করে। অন্তত অম্বা করে। যে ঈশ্বরে কোনওদিন এতটুকু বিশ্বাস করেনি সেই ঈশ্বরের কাছেই কেঁদে কেঁদে নিজের আর্তি জানায় ও। আর্তি জানায়। দেবারির বুকে মুখ গুঁজে ওর জামা ভিজিয়ে দেয় চোখের জলে, আর শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তারবাবু বলেন, "নাঃ! কিছুতেই শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।" চিৎকার করে উঠে জ্ঞান হারায় অম্বা।

***

শিশুটার দিকে অম্বা তাকাতে পারে না। কী অর্থ এই সবের? মজুমদার বাড়ির ছেলে বন্ধ্যা অম্বাকে বিয়ে করবে বলে একটা গরীব ঘরের মেয়েকে প্রাণ দিতে হল কেন?
অম্বা জানে এটা অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা। সেটা জেনে ওর মনের অবস্থার খুব একটা পার্থক্য হয় না। সুতপার তৈরি কাঁথাটা ওকে যেন ব্যঙ্গ করতে থাকে। করতেই থাকে।
একটা আয়া রাখা হয়েছে বাচ্চাটার জন্যে। অম্বা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নেই বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার জন্য। পারতপক্ষে ও বাচ্চাটার কাছে যায় না। দিনের পুরোটা সময় আয়া তার দেখাশোনা করে। রাতের বেলাতেও বেশিরভাগ সময় দেবারি তার ডায়াপার পাল্টায়, ঘুম পড়ানোর চেষ্টা করে। প্রায় একমাস চলে এভাবে। তারপরে শিশুটার গলার জোর বাড়তে থাকে। নেতিয়ে পড়ে থাকা কমতে থাকে।
একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়িয়ে ফিক করে সে হেসে

দেয় অম্বার দিকে তাকিয়ে। ফোকলা হাসি।

আর অম্বা জানে ওকে কেমন দেখতে হবে বড় হয়ে তা বোঝার কোনও উপায় এখনই নেই। তবু ওর যেন মনে হয় সুতপার মুখ একদম খাঁজে খাঁজে বসানো শিশুটার মুখে।

সুতপার সন্তান! দেবারিরর সন্তান! শিশুটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার ছোট্ট বুকে মুখ গোঁজে অম্বা।

ভগবান!

৩

বহুদিন পরে তেলরঙে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল অম্বা। ডিজিটাল আর্টে রোজগার ভালোই হয়। বিদেশী ইন্ডি স্টার্টাপেরা আমাদের এখানের হিসেবে ভালো পরিমাণে টাকা দিয়ে আর্ট কেনে। এমনকি, অম্বা যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তাতে রাহুলকে নিয়ে আলাদা থাকার মত টাকা এখন ও রোজগার করে। রাহুল, ওর আর সুতপার সন্তান। দেবারিরও। ওর শরীরের অংশ লেগেছে যখন ওকে তৈরি করতে, তিক্ত হেসে ভাবে অম্বা।

সে যাক, কথাটা হচ্ছিল, ডিজিটাল আর্টে ভালোই রোজগার, কিন্তু তবু অম্বার প্রথম প্রেম ট্রাডিশনাল আর্ট। ছবি আঁকা, মোছা, ডেসপারেটলি একটা অংশকে সারানোর চেষ্টা করা। ছবিতে যে ব্যক্তিত্ব ফোটে, নিজের আত্মার অংশ তাতে রোপণ করি আমরা—

"মা, মাম্মা মাম্মাম, মা মা মা!" নিজের দোলনা থেকে হাত পা নাড়িয়ে বলে ওঠে রাহুল। ও এখন দাঁড়াতে শিখেছে একা একাই। অল্প অল্প কথা বলতে শিখেছে। একবছর বয়স হল ওর প্রায়।

ওর দিকে তাকিয়ে অম্বা হাসে। হাতে রঙ লেগে রয়েছে। ওকে কোলে তুলতে গেলে হাত ধুতে হবে আগে। আর কোলে কোলে বাচ্চা নিয়ে সবসময় ঘোরা ভালোও নয়। অম্বার মা ওকে সাবধান করেছে। কিন্তু রাহুলকে কোলে তুলে বুকের কাছে ধরে রাখতে পারলে অম্বা অদ্ভুত একটা শান্তি পায়। বুকের কাছের খালি খালি ভাবটা চলে যায় যেন কিছুক্ষণের জন্য।

আর খালি খালি ভাবটা ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী এখন। রাহুলকে ছাড়া ওর জীবনে যেন আর কিছুই নেই। কেউই নেই।

রাহুলের নামকরণের ব্যাপারে লড়াই করেছে অম্বা। দেবপ্রতিমের ইচ্ছা ছিল ওর নাম দেবাংশু দেওয়ার। কিন্তু অম্বার মনে পড়েছিল একবার খুব লাজুক লাজুক মুখ করে সুতপা বলেছিল, "আমার ছেলের নাম দেওয়ার ইচ্ছে ছিল রাহুল।" তারপরেই বলেছিল, "এর নাম না,

এর নাম না! তা বলিনি কিন্তু!”

অম্বা হেসেছিল তখন। কিন্তু কথাটা মনে ছিল ওর।

“রাহুল?” দেবপ্রতিম মুখ ভেটকেছিলেন। “একটা ক্লাসলেস নাম। সিনেমা দেখে দেখে—”

“রাহুল কার নাম ছিল আপনি জানেন?” অম্বা এই প্রথম মনে হয় সরাসরি কথা বলেছিল দেবপ্রতিমের সঙ্গে।

দেবপ্রতিম থতমত খেয়ে থাকলে মুখে সেটা প্রকাশ করেননি। অম্বা বলেছিল, “নিজের ছেলের তো নাম দিয়েছেন দেবারি। এদিকে আপনি আবার দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন। জাতপাত মানেন। আস্তিক। দেবারি মানে যে দেবতাদের শত্রু সেটা জেনে নাম দিয়েছিলেন?” অম্বার মুখের দিকে একপলক চুপ করে তাকিয়ে থেকে কী ভেবেছিলেন দেবপ্রতিম তখন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, “তোমাদের সন্তান। যদি মনে করো এই নাম দেবে তো দাও।”

দেবারি কিছু বলেনি। একটা কথাও না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। অম্বা জিজ্ঞাসাও করেনি ওকে। না। রাহুলের নামকরণের ব্যাপারে ও আপোষ করবে না।

কথা এমনিতেও ওর এখন প্রায় হয়ই না দেবারির সঙ্গে। রাহুলের বয়স এখন এক বছর। এই সময়ের মধ্যে কটা কথা ওরা বলেছে বোধহয় আঙুলের কড়েএ গুনে বলা যায়। সন্ধ্যাবেলায় যখন দেবারি ফেরে কাজ থেকে, অম্বা রাহুলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পরে ওদের চিরদিনের রুটিন মত পাশাপাশি বসে টিভি দেখার চেষ্টা করে খানিকক্ষণ। সেই সময়টা দেবারি এতই অন্যমনস্ক থাকে যে ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না। যখন দেবারি নিজে কোনও কথা তোলার চেষ্টা করে তখন বেশিরভাগ দিন সেই কথার অন্ত হয় ঝগড়ায়, দেবপ্রতিমের ওদের জীবনের উপর কব্জা করা নিয়ে, রাহুলকে নিয়ে, আর যদিও ওর নাম ওরা নেয় না, সুতপাকে নিয়ে।

যেকটা কথা ওরা বলে তা বিছানায়। যখন সারাদিনের ক্লান্তির পরে দেবারির শরীর এখনও অম্বার শরীরটাকে চায়, মনে করতে চায় ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। আঁকড়ে ধরতে চায় কারণ বেশ বুঝতে পারে যে ওর হাত থেকে বালির মত ঝড়ে পড়ছে সময়। আর যখন অম্বা ফেরাতে পারে না ওকে। ওর গালে আঙুল ঘষে ক্লান্তভাবে। বলে “দেবারি, দেবারি, দেবারি!”

আজ দেবারি ঘরে ফিরেছিল অন্য দিনের থেকেও দেরিতে। হয়তো কাজ ছিল। হয়তো আগের দিনের ওদের ঝগড়ার কারণে ওর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা ছিল না।

অম্বা জানে, দেবারির মতে আগের দিনের ওদের ঝগড়াটা অর্থহীন। অম্বার সমস্তকিছুতে খুঁত ধরার স্বভাবের থেকে তার জন্ম। কিছুই না, দেবপ্রতিম রাহুলের জন্য একজন গভর্নেস রাখতে চান। অম্বার তাতেই আপত্তি!

অম্বার মাথা ধরে ওঠে। যে গভর্নেসকে দেবপ্রতিম রাহুলের জন্য রাখতে চান তাকে তিনি দয়া করে অম্বার কাছে পাঠিয়েছেন একবার 'দেখে নেওয়ার' জন্য। অবশ্যই রাহুলের লালনপালনের ব্যাপারে অম্বার যে কিছু বলার থাকতে পারে তাতে তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে দয়া তিনি করে থাকেন যখন ইচ্ছা হয়। সে যাই হোক, সেই ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তাই অম্বার সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলার যদি কিছুর অভাব থেকে থাকে তা এম্প্যাথির। একটা রাস্তার বিড়ালকে অকারণে নিজের চকচকে জুতো দিয়ে লাথি কষালেন এখানে আসতে আসতে। অম্বা দেখল ওদের কাচের দরজা দিয়ে স্পষ্ট। সেকথা ও দেবারিকে বলে না কারণ ও জানে দেবারি বোঝার কোনও চেষ্টা করবে না এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এম্প্যাথি কী জিনিস, খায় না মাথায় দেয় সে সম্পর্কে দেবারির কোনও ধারণা নেই। মাথা ব্যথা নেই।

"আমার এখনই রাহুলের জন্য কোনও বাইরের লোককে রাখার ইচ্ছা নেই দেবারি!" ও বলেছিল তাই শুধু। সহজে, সংক্ষেপে।

"মিস তীর্থা এই কাজই করেন। উনি কোয়ালিফায়েড। প্রফেশনাল ডিগ্রী আছে। অভিজ্ঞতা আছে। বাবা না ভেবে চিন্তে কিছু বলেননি।" দেবারি বলেছিল তার উত্তরে।

"কী তিনি ভেবেচিন্তে বলেছেন শুনি?" অম্বা বলেছিল। শান্তস্বরেই বলেছিল ও। "রাহুল মাত্র একবছরের। এখনই ওর প্রফেশনাল গভর্নেস লাগবে না!"

"শোন। যে ব্যাপারে তুই বুঝিস না, সে ব্যাপারে কথা বলিস না। শিশুদের মানুষ করার ব্যাপারে তুই এক্সপার্ট নোস।" রাহুল বলেছিল তাতে।

অম্বা ছিটকে উঠতে উঠতে সামলেছিল নিজেকে। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলেছিল, "আমি জানি আমি এক্সপার্ট নই। কিন্তু অ্যাট লিস্ট তোর বাবার কাছে আমি সন্তান মানুষ করা শিখতে চাই না। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কখনও?"

দেবারি আহত মুখে ওর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু তাতে অম্বা থামতে পারেনি। অনেক কিছু ও সহ্য করেছে। মেনে নিয়েছে। কিন্তু রাহুলের ব্যাপারে দেবপ্রতিমের এই জোরজবরদস্তি ও সহ্য করবে না।

ও বলে চলেছিল, "কী চান তোর বাবা? আর একটা দেবারি তৈরী করতে? যে নিজেই জানে না কী সে চায়? বা জানে না কীভাবে নিজের

জীবনের ভালো জিনিসকে রক্ষা করতে হয়? যে টাকার মূল্য জানে না। খাদ্যের মূল্য জানে না। মানুষের জীবনের মূল্য জানে না? কিছু জানে না, শুধু জানে সবকিছুকে আমার বলে আঁকড়ে ধরতে?"

দেবারি কিছু না বলে উঠে চলে গিয়েছিল ওদের ঘরে।

আর রাতের বেলায় আঁচড়ে কামড়ে অম্বাকে অস্থির করেছিল ও বিছানায়। এতটাই নির্দয়ভাবে যে নিজের ঠোঁট কামড়ে রক্তারক্তি করেছিল অম্বা। বহুদিন পরে দেবারির সমস্ত রাগ দুঃখ অভিমান চেপে রাখা সমস্ত আবেগ অনুভূতি সমস্ত কিছুকে যেন নিষ্ঠুরভাবে উজাড় করে দিয়েছিল ও অম্বার উপরে। আর কাউকে নিজের যে অংশ ও দেখায় না, তা এখনও নগ্ন ও করতে পারে শুধু অম্বার কাছেই। যতই তা কুশ্রী হোক!

আজ ঘরে ফিরে দেবারি অম্বার দিকে তাকায়নি। রাহুলের দোলনার কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়েছিল একবার।

অম্বা ভেবে দেখেছিল কথা বলবে কি না। তুল্যমূল্য বিচার করার চেষ্টা করেছিল একটা। তারপর বলেছিল, "কালকে তোর রাহুলকে নিয়ে সায়েন্স ফেয়ারে যাওয়ার কথা। মনে করিয়ে দিলাম জাস্ট।"

দেবারি ডাইনিং টেবিলের কাছে গিয়ে জলের বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলেছিল, "কালকে হবে না। বাবার একটা জরুরি মিটিং পড়েছে। আমাকে থাকতে হবে।"

"আবার?" অম্বা বলেছিল। দেবারির কাছে কিছু ও আশা করে না আর। তবু ক্লান্তি আসে।

"ওরকম টোনের তো কোনও দরকার নেই।" দেবারি বলেছিল শান্তস্বরে। "মানুষের কাজ থাকে। সকলেই ঘরে বসে এঁকে খাওয়া জোটায় না।"

কীভাবে যে দেবারির খাওয়া জোটে সেকথায় অম্বা যায়নি। কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছা ওর আজকে ছিল না। ওর ক্লান্ত লাগছিল। মৃদুস্বরে বলেছিল, "বেশ। কিন্তু প্রতিবারেই যদি কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারিস, তাহলে কথা দেওয়াটাই বন্ধ করে দে অ্যাট লিস্ট। এভাবে একটা বাচ্চাকে বার বার আশা দিয়ে—"

"প্লিজ!" দেবারি বলেছিল, ওর কণ্ঠস্বরে ঠাট্টার ছোঁয়া, "ওর বয়স সবে একবছর। ও কথা দেওয়া কাকে বলে জানে না। দুদিনে ভুলে যাবে।"

"ও শিশু। ওরা সহজেই কষ্ট পায়।" বলেছিল অম্বা। "ওর তোর উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে। শুধু তোর নয়, সকলেরই উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে। কথার মূল্য বা মর্যাদায় বিশ্বাস করতে শিখবে না।

নিজেও সে মর্যাদা রাখতে শিখবে না।”

“থাক। তোর পপ সাইকলোজির শিক্ষা রেখে দে এখন।” বলেছিল দেবারি।

অম্বা শুকনো একটা হাসি হেসেছিল। “হ্যাঁ। তোকে শিক্ষা দেওয়ার কোনও ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু রাহুল আমারও সন্তান, সে তুই চাস আর নাই চাস, এমনকি আইনের চোখেও। ওর বড় হয়ে ওঠাতে আমার মতামতেরও মূল্য থাকবে। আর আমি তোকে রোজ ওকে কথা দিয়ে কথা ভাঙতে দেব না। ওকে যদি শেখাতে হয় পৃথিবীতে আর সব মানুষ অন্যরকম ওর বাবা বাদে তাই আমি শেখাব। শেখাব যে একমাত্র ওর বাবা-ই জানে না কথার মূল্য।”

“তুই বলিস যে তুই ঝগড়া করতে চাস না, কিন্তু তোর মধ্যে ঝগড়া করতে না চাওয়ার কোনও লক্ষণ তো আমার চোখে পড়ে না অন্ততপক্ষে। তুই কি চাস যে আমি কাজকারবার বন্ধ করে, আমার বাবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তোকে আর তোর ছেলেকে নিয়ে পড়ে থাকি?”

“পড়ে থাকিস?” অম্বা গলার মধ্যে অবিশ্বাসের শব্দ করেছিল একটা। “তুই এটা পর্যন্ত জানিস না যে আগের মাসে রাহুলের জ্বর হয়েছিল!”

এ খবরে দেবারির মধ্যে কোনও বিকার দেখা যায় না। যেন এটাই স্বাভাবিক! যেন রাহুলের জ্বর জারি অসুস্থতার কোনও দায় ওর কখনওই ছিল না।

“ওয়েল।” দেবারি বলে, “সবসময়ই দুজনের মধ্যে একজন পেরেন্ট সন্তানের দেখাশোনা করে, অন্যজন—”

আর ওর কথা শেষ করতে দেওয়ার কোনও ইচ্ছা অম্বার ছিল না। ও দেবারির কথার মধ্যিখানেই বলেছিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আর বলতে হবে না। এখানেই আমাদের এই আলোচনা চুকিয়ে দেওয়া ভালো।”

একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে একটা গভীর শ্বাস টেনে নিয়ে দেবারি বলেছিল, “ইউ নো হোয়াট? কালকে থেকেই আমি এই কথাটা ভেবেছি। ভালো হল যে তুই কথাটা তুললি এখন। সব চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। লেটস এন্ড দিস।”

৪

উকিলের নাম মিস্টার চৌধুরী। চেহারাটা, খুব বেশি স্টিরিওটিপিকাল শোনালেও, ঠিক একটা ধূর্ত শিয়ালের মত। দেবারি যে লোকটাকে খুব বেশি পছন্দ করে তা নয়, কিন্তু দেবপ্রতিম এবং অন্যান্য বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষমানুষই বলেছেন যে ভদ্রলোক খুবই ভালো

নিজের কাজে। এবং সত্যি কথা বলতে, তার চেয়ে বেশি আর কিছু দরকার আছে বলে দেবারি মনে করে না।

শনিবার। উইকেন্ডের বাজার। রাশ আওয়ারও নয়। অথচ তবু রাস্তায় ট্রাফিক আজ খুবই বেশি। একটা গরু গদাইলস্করি চালে চলতে চলতে দেবারি গাড়ির সামনে থেমে গিয়ে জাবর কাটতে শুরু করল। বিরক্তির একশেষ। এদিকে কানের কাছে ইয়ারফোনে মিস্টার চৌধুরী ঘ্যান ঘ্যান করেই চলেছেন। "আমি তোমাকে বলছি, তুমি যেটা করতে চাইছে, এত বেশি দয়া দাক্ষিণ্য করে ডিভোর্স হয় না। তোমার কেসটা জোলো দেখাবে। তুমি যে সে লোক নও। রাজনীতিতে তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। পরে কেউ তোমার রেকর্ড ঘেঁটে যদি দেখে— মানে ভবিষ্যতের কথা বলছি, কিছুই তো বলা যায় না— কেউ যদি দেখে যে তুমি এই পরিমাণ সেটলমেন্টের জন্য খরচ করেছ—"

"দেখুন, এই ব্যাপারে কথা আমি বলতে চাই না মিস্টার চৌধুরী। রাহুল আমার সন্তান। তার জন্য কতটুকু কী করব—"

"এক্জ্যাক্টলি!" মিস্টার চৌধুরী বলে ওঠেন। "রাহুল তোমার সন্তান। বায়োলজিকালি বা ফ্যাকচুয়ালি স্পিকিং মিস বর্ধনের তো রাহুলের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, সেক্ষেত্রে তুমি যদি এত জেনেরাস হও—"

"রাহুল—" কোনওমতে নিজেকে দমন করে বলে দেবারি। কপালের রগ দপদপ করে ওঠে ওর। "রাহুল অম্বার সন্তান। ওর জন্য ও যা করেছে আমি কোনওদিন করিনি আর আমি করতে পারবও না। আমার সন্তানের ভালো মন্দর দায় আমায় বুঝতে দিন।"

"তুমি বুঝছ না—"

"আমি খুবই ভালো বুঝছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সত্যিই কিছু করার নেই। আচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে পরে—" ফোনটা কেটে দেয় ও। ওপক্ষের উত্তরের অপেক্ষা না করেই।

দেবারি বোঝে। আইনের মারপ্যাঁচ বোঝার ক্ষমতা ওর আছে। ওরা মিউচুয়াল ডিভোর্স চায়। আইন অনুযায়ী তার জন্য ওদের অন্তত একবছর আলাদা থাকতে হবে। মাত্র আটমাস হয়েছে তার। তার মধ্যেও প্রথম চারটে মাস কেটেছে ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বুঝতে বুঝতে। ওদের দুজনেরই। কিন্তু তার থেকেও বেশি রাহুলের। হঠাৎ করে কেন যে মায়ের সঙ্গে ওর থাকা চলবে না সেটা ওইটুকু শিশু বুঝবে কী করে। প্রাথমিক ঝোঁকটা কেটে যাওয়ার পরে সেটা বুঝতে দেবারিরও সময় লাগেনি। অম্বার কাছ থেকে রাহুলকে, বা রাহুলের কাছ থেকে অম্বাকে কেড়ে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আর ওর পক্ষে সম্ভব হলেও অম্বাকে ওর সন্তানের থেকে দূরে রাখা অসম্ভব হত।

"হ্যাঁ তুমি কাপে জার্ক অফ করেছিলে। আমি বুকে করে ধারণ করেছি ওকে।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠে বলেছিল ও। অশালীন, ভদ্র সমাজে চলে না যেমন কথা। যেটা, দেবারি জানে, কোণঠাসা হয়ে গেলে অম্বার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। "আমি রাহুলকে দেব না। রাহুল আমারও। ওর মা নেই। আমি ওকে দেব না!"

ওর চোখের কোণে কালি পড়েছিল। তিনদিন রাহুলকে না দেখে থাকার ফলে মানসিক বেদনার ফল সেটা, বুঝতে অসুবিধা হয়নি দেবারির। ও দেখেছে অম্বার মায়ের বাড়িতে টেবিলের উপরে রাখা অম্বার টুকরো হিসেব নিকেশ। কী করে উকিলকে কনভিন্স করা যায় যে হ্যাঁ ওর কাজটা বাঁধা ধরা নয় কিন্তু ও যথেষ্ট নামী ওর কাজে, ওর কাজের অভাব হবে না। আর আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ও অন্ততপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পড়বে। নাই বা ওর নিজের গাড়ি থাক এই মুহূর্তে। একটা বাচ্চা মানুষ করতে গাড়ি লাগে না। প্রাসাদ তো লাগেই না।

আর কোথাও নিজের মনের ভিতরে সেটা দেবারি জানে। কিন্তু দেবপ্রতিম মজুমদারের নাতির যে বড় হয়ে উঠতে গাড়ি লাগবে না সেটা যেকোনও জুরিকে বুঝিয়ে ওঠা কঠিন। তাদের শক্ত চোয়াল আর তীক্ষ্ণ নজরের সামনে গরীব বাড়ির মেয়ে অম্বা থতমত খেয়ে যায়! আর অশ্লীল কথা বলে যা ভারতীয় সনাতন নারীসুলভ নয়। তাতে ওর কথার বা যুক্তির প্রভাব কমে বৈ বাড়ে না।

"ঠিক আছে।" সেই সময় বলেছিল দেবারি। "ঠিক আছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে। একটা ফ্ল্যাটেরও না হয়... ওটা তো বড় কথা নয়! আমাদের ডিভোর্স সেটেলমেন্টে তোমার তো কিছু পাওয়ার কথাই। যতই তুমি অ্যালিমনি না দাবী করো। আর রাহুলের তো বিশেষ করে আরও বেশি দাবী—"

কথার মধ্যেই লক্ষ করেছিল অম্বার চোখ বড়বড় হয়ে গেছে, যেন এটা, এই স্বাভাবিক, ওর ভালো থাকা, ওর দুঃখ কষ্টের দিকে দেবারির নজর রাখাটা ও আশা করেনি। যেন দেবারির ওকে একটা গাড়ি মাত্র গিফট করাটা পর্যন্ত একটা বড় ব্যাপার, দয়া দেখানো ওর প্রতি।

জুরির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছিল। ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকে দেবারি নজর দেয়নি। অম্বার অবাক হওয়াটা বুকের মধ্যিখানে গিয়ে আঘাত করেছিল। আর ওর কৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টি সেই প্রথম আলাপের সময়কার মত ওকে একটা পরিপূর্ণতার আভাস দিয়ে গিয়েছিল বহু বহু দিন পরে। যে পরিপূর্ণতার স্বাদ দেবারি নিজের জীবনে পেয়েছে কিছুদিনের জন্যই মাত্র। অম্বা ওর জীবনে আসার পরে। কয়েকটা চিরস্মরণীয়, চিরস্থায়ী মাস।

কিন্তু দেবারি বোঝে। ওর বুকের মধ্যে অম্বার জায়গা কোথায় সেটা তো জুরি জানতে চায় না। ডিভোর্স নেওয়ার অর্থ সেই জায়গার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। অবশিষ্ট থাকলে সাদা কালো আইনের দেবীর চলে না। দেবারি নিজে থেকে অম্বার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করলে সেটা ওদের কম্পালসরি আলাদা থাকাকে আইনের চোখে প্রভাবিত করতে পারে। জুরিকে কনভিন্স করাতে অসুবিধা হতে পারে যে হ্যাঁ, ওদের পরস্পরের প্রতি কোনও অনুভূতি আর বাকি নেই। কখনওই আর ওরা এক হবে না। উকিলের কাজ শক্ত হতে পারে।

হলে হোক। গাড়ির স্টিয়ারিংএ হাত রেখে ভাবে দেবারি। সেই কাজের জন্যই তো এত এত টাকা ওদের পিছনে ঢালছে দেবারি। আর একটু যদি ওদের ডিভোর্স পিছোয় তাতে দেবারি যে খুব বেশি কেয়ার করে তা তো নয়।

ওর মনের মধ্যের একটা অংশ যেটা নিজের কাছে নিজে সৎ থাকতে চায়, বিশ্বাসঘাতকের মত ফিসফিস করে বলার চেষ্টা করে, ডিভোর্স পিছোলে তাতে যে দেবারি শুধু কেয়ার করে না তাই নয়। সত্যি কথা বলতে সেটাই কি ও চায় না? যতদিন পিছোনো যায় সেটাকে? সেই পেপার ওয়ার্কটুকু? দেবারি নিজের বুকে হাত দিয়ে শপথ করে বলতে পারবে?

মাথার মধ্যের কথাটুকুকে দাবড়ে থামিয়ে দেয় দেবারি। অন্তত চেষ্টা করে।

সত্যি কথা বলতে দেবারি এটাকে অস্বীকারও করে না যে এখন ও ভালো আছে। সপ্তাহে দুদিন রাহুল ওর কাছে থাকে। বাকি পাঁচদিন ওর দেখাশোনার ভার অম্বার। অম্বার কাছ থেকে ওকে দেবারি নিজেই নিয়ে আসে শনিবার। তারপর রবিবার রাতের ডিনার সেরে ওকে দিয়ে আসে অম্বার কাছে।

যখন ওরা একসঙ্গে ছিল তখন এতটা সময় ও কাটাত না রাহুলের সঙ্গে। ইচ্ছাও যে খুব একটা করত তা নয়। এখন, সেপারেটেড সিঙ্গেল ফাদার হিসেবে ও যখন বলে সপ্তাহে এই দুটো দিন আমি ছেলের সঙ্গে কাটাই, তখন সেটাকে খুব আনরিজনেবল কিছু বলে মনে হয় না কারও। এখন ও সহজেই বলতে পারে যে ও ছেলেকে নিয়ে সায়েন্স সিটি যাবে, সুইমিং করতে যাবে, এমনি সময় কাটাবে, আর কারোর, বিশেষ করে দেবপ্রতিমের মনে পড়ে না নতুন কোনও এক মিটিংএর কথা। ব্যস্ততার কথা।

সোম থেকে শুক্র ও সেই ব্যস্ত জীবন কাটায় যা চিরজীবন কাটিয়েছে। কেউ নেই সময় দাবি করার। বা ওকে নিজের যত্ন নিতে বলার। ঠাট্টা তামাশা করার চেষ্টা করার।

এখন দেবারি সুখে না থাক শান্তিতে আছে।

দেবারি জেনেছে যে সুখে থাকলে তার প্রতিদানে শান্তি জলাঞ্জলি দিতে হয়। কারণ তখন কারও ওর প্রতি দয়া দেখানোর কথা মনে পড়ে না। অসুখে থাকলে লোকে দয়া করে একটু সময় দেয়, একটু সুযোগ দেয় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার।

গাড়িটাকে একটা পশ এলাকার কুড়িতলা বিল্ডিংএর সামনে দাঁড় করিয়েছিল দেবারি। এই বিল্ডিংএর ছতলায় একটা ফ্ল্যাট নেওয়ার কথা ওর, নিজের জন্য নয়, অম্বা আর রাহুলের জন্য। রাহুলকে ওর বাবা কী দিতে পারবে আর মা কী দিতে পারবে তার তুল্যমূল্য বিচার হবে ওদের এই ওয়েটিং পিরিয়ড পেরিয়ে যাওয়ার পরে। সেই হিসেবে ও কার কাছে কয়দিন থাকবে তার সিদ্ধান্ত হবে। অম্বার রাহুলের কাস্টডি পাওয়ার জন্য অন্তত এই রকম একটা ফ্ল্যাট, দামী জায়গা, বড়লোকী পরিবেশ দরকার। অম্বা যদিও বলেছে অল্পে অল্পে ও দেবারির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু দেবারি মনে মনে জানে সেটার দাবী ও করতে পারে না। অবিচার হবে সেটা অম্বার প্রতি, অম্বা এখনই বিয়ে করতে চায়নি। হয়তো কখনওই বিয়ে করতে চায়নি। সন্তান চায়নি। কোনও কিছুই চায়নি। দেবারির চাওয়াতেই এই সব হয়েছে। তার দায় কেন সারাজীবন অম্বাকে বইতে হবে, ডিভোর্সী সিঙ্গেল মাদারের জীবন, দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে তার কোনও যুক্তিসম্মত কারণ নেই এছাড়া যে মানুষের জীবন যুক্তি মেনে চলে না। যুক্তিহীনতাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের যথার্থ প্রকাশ।

একথা অবশ্য অম্বাকে ও বলে না কারণ অম্বা এসব 'জোলো' কথা শুনতে ভালোবাসে না। যা ও করেছে তা অন্যের জন্য, অন্য কারও মন রাখার জন্য, অন্য কাউকে ভালোবেসে হলেও তার পুরো দায় অম্বা নিতে চায়। আখেরে গিয়ে বিচার করলে কেউ তো ওর কানে বন্দুক ঠেকিয়ে ওকে বলেনি যে ওকে দেবারি মজুমদারকে বিয়ে করতেই হবে? প্রেমে পড়াটা ওর নিজের দায়। সেই প্রেমের জন্য যদি ও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তার দায়ও ওর নিজের।

অম্বা এখনও এসে পৌঁছয়নি এখানে। ওদের দুজনের একসঙ্গে এই ফ্ল্যাট দেখার কথা। অম্বার পছন্দ না হলে হবে না। রাহুলও আসবে সঙ্গে। এখান থেকেই রাহুলকে নিয়ে যাবে দেবারি নিজের সঙ্গে। হয়তো একসঙ্গে লাঞ্চ করে নেবে তার আগে। সেসব জিনিস করবে, যা ওরা একসঙ্গে থাকার সময় করার কথা ওরা ভাবতেও পারেনি প্রতিদিনের

টেনশনে। মনেও হয়নি। অন্য দায় ছিল, দায়িত্ব ছিল।

দোষ কার ছিল সেটা এখন আর বড় কথা নয়। দোষ হয়তো পরিস্থিতিরই।

গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে দেবারি পছন্দ করে না। কিন্তু যেরকম গরম বাইরে তাতে বাইরে রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকারও মানে হয় না। এটা অন্তত শান্তির ব্যাপার যে অম্বা ভালোই ড্রাইভিং জানে আর দেবারির পছন্দ করে দেওয়া গাড়িটাকে ও বিনা আপত্তিতে নিয়ে নিয়েছে। দামের কথা জিজ্ঞাসাও করেনি। তা নিয়ে মাথাও ঘামিয়েছে বলে মনে হয়নি। কাজেই অন্তত দেবারি নিজে এয়ার কন্ডিশনড গাড়িতে বসে থাকার জন্য কোনও রকম লজ্জা অনুভব করে না। আর কিছু না হোক রাহুল মায়ের গাড়িতে আরামেই থাকবে। অম্বাও— নিজেকে বকুনি দিয়ে থামায় দেবারি। অম্বার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার দেবারির নেই।

অম্বা কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের দেরি করছে। সবসময় সবজায়গায় সময়মত উপস্থিত হওয়ার জন্য যে ওর নাম আছে তা নয় কিন্তু সাধারণত এত দেরি ও করে না। গাড়ি চালানোর সময় ফোন করে ওকে বিরক্ত করতে দেবারি চায় না কিন্তু আস্তে আস্তে ও অধৈর্য হয়ে উঠছিল। একটা কি ফোন করেই দেখবে—

এই সময় ওর ফোন বেজে উঠেছিল। অম্বা।

ফোন কানে নেওয়া মাত্র ওপার থেকে যে শব্দটা প্রথম কানে এসেছিল সেটা রাহুলের চিৎকার। তারপরে অম্বার গলা এসেছিল কানে। "শোন, আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল— যাতে চিন্তা না করিস... আমি কাছেই আছি। আসছি। একটা ব্যাপার—"

চিন্তা না করার বদলে চিন্তা বেড়ে গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা গাড়িকে বাঁক নিতে দেখা গিয়েছিল একটু দূরের মোড়টাতে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল দেবারি গাড়িটার দিকে। গাড়িটার একপাশ তোবড়ানো কিন্তু চেনা গাড়ি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনেছে এটাকে মাসতিনেক আগে। "হোয়াট দ্য হেল!" মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে দেবারির মুখ থেকে ইংরিজি বেরোয়। "হোয়াট দ্য—"

গাড়ির দরজা একটানে খুলে ও বাইরে বেরিয়েছিল, "হোয়াট দ্য—"

অন্য গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল অম্বা। তারপরে নিচু হয়ে কোলে করে বের করে এনেছিল রাহুলকে।

"হোয়াট —"

"অ্যাক্সিডেন্ট। আমি জাস্ট। আমার সিরিয়াসলি কোনও দোষ ছিল

না। অন্য গাড়ির ড্রাইভারেরও দোষ ছিল না কিছু। তার ব্রেক ফেল—”

“হোয়াট ডু য়ু মিন তার দোষ ছিল না কিছু?” বলেছিল দেবারি। “হোয়াট ডু য়ু—”

“চেঁচাস না। রাহুল একেই—” কেঁপে যাওয়া গলায় বলেছিল অম্বা।

“চেঁচাব না মানে। চেঁচাব না। এই গাড়িটার দাম কত জানিস? ষাট লাখ টাকা। আর তার চেয়ে অনেক বড় কথা, আমার ছেলে ছিল এই গাড়িতে। এইরকম যে অবস্থা হয়েছে এই গাড়ির তাতে—”

একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে অম্বা বলেছিল, “হ্যাঁ জানি গাড়ির অনেক দাম। আর তোর ছেলে ছিল ওতে। তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমিও ওই গাড়িতেই ছিলাম।” গলার কাছে হাত নিয়ে গিয়েছিল ও নিজের। যেটা দেবারি জানে, ওর নার্ভাসনেসের লক্ষণ। কোলে রাহুল চুপ করে আছে। বেচারা হকচকিয়ে গিয়েছে মনে হয়। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে উঠে চুপ করে গেছে। দেবারি দেখেছিল অম্বার হাতটা কাঁপছে। আর ওর মনে পড়েছিল, এখন আর ওর অধিকার নেই ওর হাতটাকে চেপে ধরার বা ওকে কাছে টেনে নেওয়ার। চেঁচিয়ে ওদের দুজনকে মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত করা ছাড়া ও আর কিছু করছেও না। নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে ও চুপ করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল একটুক্ষণের জন্য। তারপর বলেছিল, “ইনস্যুরেন্সের ডিটেল সব জেনে নিয়েছিস? ওকে ওকে! চল এদের অফিসে একটু বসা যাক। আমি জাস্ট— কী রে আয় আমার কোলে আয়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাহুলকে কোলে নিয়েছিল ও।”

ফ্ল্যাট দেখার উত্তেজনা থিতিয়ে গিয়েছিল। তবু এসেছে যখন তখন দেখে যাওয়া ভালো। রাহুলকে কোলে নিয়ে দেবারিই ঘুরছিল সমস্ত ফ্ল্যাটটা। অম্বা এখনও পুরোপুরি সহজ হয়নি।

“বাথরুমটা দেখে যা।” দেবারি বলেছিল একবার শুধু।

অম্বা এগিয়ে এসেছিল নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়। তারপর বলেছিল, “ভালো।” একমুহূর্ত ইতস্তত করে কী যেন একটু ভেবে নিয়েছিল তারপরে। তারপর বলেছিল, “শোন। যা দেখবি তাই ভালো। আমাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করিস না প্লিজ। আমি সবসময়ই মনে করব এর থেকে কমে আমার চলে যাবে। তুই জানিস আমার ইতিহাস। আমার ফিনিন্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমার এত কিছু লাগে না। যে কম বেশি চারটে বছর তোর সঙ্গে থেকেছি তাতে আমার অভ্যেস তত কিছু পাল্টে যায়নি। কিন্তু দয়া যখন নিতেই হচ্ছে তখন সেসব বলে লাভ কী। কিছুতেই তো আমি রাহুলকে শুধু পয়সার কাছে হারাতে পারব না। তার জন্য যদি পয়সার কাছে মাথা নোয়াতেই হয় তবে আর

দেখানেপনা করে লাভ কী। যা দিবি তাই হাত পেতে নেব।”

ওর কথাতে তিক্ততা নেই। শুধু গভীর ঔদাসীন্য। দেবারি মনের গভীরে কোথাও আঘাত পেয়ে থাকলেও কিছু বলেনি। ও জানে কিছু বলে কোনও লাভ হবে না।

মিনিট খানেক পরে অম্বা নিজেই বলেছিল আবার। “তুই জানিস না কতটা কৃতজ্ঞ আমি তোর কাছে। থ্যাংকিউ। আমার মনে হয় না আমি রাহুলকে ছেড়ে বাঁচতে পারতাম। আর যতই কেন আমি মাথা ঠুকে মরি, আমি জানি, এটুকু র‍্যাশনালিটি আমার আছে যে আমি জানি, তুই যদি ওকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইতিস আমি ওকে রাখতে পারতাম না।” দেবারি দেখে বলতে বলতে অম্বার চোখ ছলছল করে আসে। মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকায় ও। গলার কাছ অবরুদ্ধ কান্নায় ওঠানামা করে ঘন ঘন।

হয়তো অ্যাক্সিডেন্টটার প্রভাবেই অম্বা এখনও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছে। না হলে এত সহজে ও এত কথা বলে না। ওকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হয় দেবারি। হাত মুঠো করে নিজেকে সামলায় ও।

কিন্তু এটাও লক্ষ না করে দেবারি পারে না: দেবারিকে ছেড়ে না থাকতে পারার কথা অম্বা বলে না। ভাবেও না নিশ্চয়ই। বলে না যে, “তোকে হারানোর পরে রাহুলকেও হারাতে পারতাম না।” কেনই বা বলবে। দেবারি নিজে থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওদের দুজনের সেপারেশনের সিদ্ধান্ত। অম্বার মতামতের তোয়াক্কা তেমনভাবে করেনি। নিজের জুতোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মুখ তুলে ও কিছু বলতে যায়।

কিন্তু তার আগেই নৈঃশব্দ্য ভাঙে অম্বা নিজেই।

“যদি রাহুলকে নিজের কাছে না রাখতে পারতাম, সুতপার কাছে সারা জীবনের মত দায়ী মনে হত নিজেকে।” বলে ও। তারপর মুখ ফিরিয়ে দেবারির মুখের দিকে তাকিয়ে ভঙ্গুর হাসি হাসে একটা।

আর মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভিতরটা তিক্ত হয়ে যায় দেবারির। রাহুলের দাম অম্বার কাছে সুতপার সন্তান বলে! দেবারির সন্তান বলে নয়। সুতপা মারা গেছে। ওর জন্য কোনও রকম তিক্ততা দেবারি নিজের মনে রাখতে চায় না। কিন্তু অম্বার জীবনে ওর নিজের অস্তিত্ব যখন শুধুই সুতপা আর সুতপার বাচ্চার সঙ্গে জোড়া তখন সে সুপ্ত তিক্ততাকে দাবিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতপা, যে কিনা এই সন্তান ধারণ করতে চেয়েছিল শুধু নিজের স্বামীর চিকিৎসার জন্য। আখেরে পয়সার জন্য। অম্বা এমন ভাব দেখায় যেন বেঁচে থাকলে রাহুল ছাড়া ওর জীবনে আর কোনও চিন্তা থাকত না। তারপরেই নিজের

চিন্তাকে সামলায় দেবারি। না। অন্যায় এটা সুতপার প্রতি। অম্বার প্রতিও হয়তো। তবু— তবু? দেবারির জীবনটা কি শুধুই একটা 'তবু'তে পরিণত হচ্ছে দিনে দিনে?

***

মঙ্গলবারে অম্বার ফোন আসে। গলায় অদ্ভুত একটা টেনশন।

"দেখা কর!"

দেবারি বুঝতে পারে না হঠাৎ কী হল। রাহুলের কিছু হয়েছে কি? কোনও বিপদ আপদ? দৌড়ে দৌড়ে ও যায় দেখা করতে। ওদের দুজনেরই পরিচিত একটা রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্টটা অম্বার পক্ষে মারাত্মক হাইফাই নয় আবার দেবারির পক্ষে খুব শ্যাবিও নয়। ওদের ডেটিংএর আমলে ওরা এখানে আসত। এখনও হঠাৎ কোনও কারণে দেখা করতে হলে ওই রেস্টুরেন্টেই ওরা যায়।

আজ যখন রেস্টুরেন্টে পৌঁছায় ও ততক্ষণে অম্বা সেখানে এসে গেছে। এককোণে দুজনের একটা টেবিলে বসে আছে। পাশে একটা ছোট চেয়ারে রাহুল।

দেবারি এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়েই বুঝতে পারে, আবহাওয়া আজ থমথমে। কোনও শারীরিক বিপদ ওদের দুজনের কারও হয়েছে বলে যদিও মনে হয় না। যেটা আশাপ্রদ অন্ততপক্ষে। অম্বা একমুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজের নিচের ঠোঁট কামড়ায়। তারপর বলে, কোনও কুশল সম্ভাষণ ছাড়া একবারেই বলে। "তুই কী চাস বল? কী খেলা খেলছিস?"

দেবারি একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নেয় নিজেকে। একটা ভুরু তুলে হালকা স্বরেই বলে, "হেলো! সুপ্রভাত তোকেও।"

অম্বা মাথা নাড়ায়। ওর সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে যায় ফ্রাস্ট্রেশনে। "আমি বুঝি না তোকে দেবারি। হোয়াট আর ইউ প্লেয়িং অ্যাট? তুই... তুই—" একটু থেমে একটা নিঃশ্বাশ টেনে নিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে যেন। তারপর বলে, "তোর উকিল, হি—"

"আমার উকিল?" এবার চমক লাগে দেবারির।

"হ্যাঁ! তোর উকিল!" অম্বা বলে একটু গলা চড়িয়েই। "রাহুলের হাঁটু ছড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে জেরা করে কী লাভ হবে তার? তুই কি আলটিমেটলি এটাই প্রুভ করতে চাইছিস যে আমি আনফিট ওর যত্ন নেওয়ার জন্য? আমি জানি আমি বেস্ট নই। কিন্তু —"

"ওয়েট এ মিনিট!" দেবারি বলে, মাথার মধ্যে ব্যাপারটাকে একবার

ঝালিয়ে নেয় ও। "কীসের জেরা? কী বলছিস?"

"তুই জানিস না?" অম্বা বলে সন্দিগ্ধ স্বরে।

"অভিয়াসলি আমি জানি না। কী ব্যাপার?" বলে দেবারি। ওর গলার স্বর ওর নিজেরই কানে অধৈর্য শোনায়।

অম্বা ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পুরো একটা মিনিট। তারপরে যা বলে তার অর্থ হল, মিস্টার চৌধুরী ওকে ফোন করেছিলেন সোমবারে। আগের সপ্তাহে রাহুল একবার খেলতে খেলতে সোফা থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটু ছিঁড়েছিল, সেইটার সঙ্গে কালকের অ্যাক্সিডেন্টের কথা জুড়ে তিনি অম্বাকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেছেন। জেরার টোনটা বুঝতে অম্বার অসুবিধা হয়নি। ওকে রাহুলের দেখাশোনা করার পক্ষে আনফিট সাব্যস্ত করাই তার লক্ষ্য।

"অ্যাক্সিডেন্টের কথা উনি জানলেন কী করে? আর রাহুলের পড়ে যাওয়ার কথা তো আরওই বেশি ওঁর জানার কথা নয়।" দেবারি বলে সব শুনে। ভুরু কুঁচকে যায় ওর।

অম্বা চুপ করে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারে দেবারি। অম্বা ভেবেছে যে এক দেবারি ছাড়া আর কারও পক্ষেই এইসব কথা উকিলকে জানানো সম্ভব নয়। যেটা কিনা— স্বাভাবিক। কারণ ওর নিজেরও মাথায় আসে না খানিকক্ষণ কী করে কথাগুলো উকিলের কর্ণগোচর হল, আরও বড় কথা সেই নিয়ে অম্বাকে জেরা করার কথা কেন মনে হল তাঁর। কিন্তু তারপরেই অম্বার পাশে চেয়ারে বসে থাকা রাহুলের হাঁটুতে লাগানো বানি ব্যান্ড এইডটার দিকে নজর যায়। ওটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে রাহুল চোট পেয়েছিল। তার চিকিৎসা হয়েছে। রাহুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেবারি বলে, "রুহু, এটা কী? রাহুল খেলতে খেলতে অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে বলে, "আমি পোএ গেছিলাম। তাই মা লাগিয়ে দেছে এটা। এটা বানি স্টিকার।"

"কীভাবে পড়লে?"

"সোফা থেকে।" মুখ না তুলেই বলে রাহুল। তারপর কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে দেবারির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "গোইএ পোএ গেলাম হা হা!"

তা-ই! রাহুলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে চুলটা একটু ঘেঁটে দিয়ে দেবারি মুখ তুলে তাকায়। অস্বস্তি হয় ওর কথাটা বলতে কিন্তু অম্বা সরাসরি ওকেই সন্দেহ করার চেয়ে এ মন্দের ভালো। "হম।" বলে ও। গলা খাঁকড়ে পরিষ্কার করে নেয় একটু। "আমি বোধহয় বুঝতে পারছি উনি কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন। রাহুলকে নিয়ে রোববারে বাবার কাছে গিয়েছিলাম। উনি রাহুলের সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন

একটু।”

অম্বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। অন্য দিকে তাকায় তারপরে। দেবারি জানে অম্বা রাহুলের দেবপ্রতিমের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটানো পছন্দ করে না। কিন্তু সে কথা এখন বলার অধিকার ওর নেই।

তবু নিজে থেকেই জবাবাদিহি করার স্বরে দেবারি বলে, “ও বাবার নাতি। ওর সঙ্গে উনি সময় কাটাতে চান সেটা স্বাভাবিক।” অম্বা যখন কোনও উত্তর দেয় না একথারও, তখন বলে, “আমি বহুক্ষণ ওঁর সঙ্গে একা ওকে রাখিওনি। হয়তো মধ্যিখানে খানিকক্ষণের জন্য বাথরুমে গিয়েছিলাম। তখনই—” মুখে হাত বুলিয়ে বলে, “আমি বাবার সঙ্গে কথা বলব এটা নিয়ে। মিস্টার চৌধুরীকেও বলতে হবে।”

হাসির মত একটা ভাব করে অম্বা বলে, “বলে কী লাভ হবে? আমি শুধু এটা নিয়েই চিন্তিত যে তোর বাবা কী চান। উনি রাহুলকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তুই কি থামাতে পারবি? আমি কী করে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ দেবপ্রতিম মজুমদারের সঙ্গে পেরে উঠব যদি উনি সত্যিই উঠে পড়ে আমার পিছনে লাগেন?”

দেবারি চুপ করে থাকে। নিজের বাবার সম্পর্কে এমন কথা শুনতে ভালো লাগে না ঠিকই কিন্তু ও-ও জানে কথাগুলো সত্যি। কী-ই বা বলার আছে! কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, “অন্তত রাহুলকে আমি তোর কাছছাড়া হতে দেব না। এই বিশ্বাসটুকু রাখ।”

আর মনে মনে ও জানে, ওর বাবার বিরুদ্ধে ও একমাত্র একক্ষেত্রেই যেতে পারে। উনি সত্যিই যদি অম্বা বা রাহুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সেকথা অম্বাকে বলে লাভ নেই। ও বিশ্বাস করতে পারবে না আর তাতে ওর দোষও নেই। সত্যি কথা বলতে দেবপ্রতিমের সঙ্গে অম্বার নীরব লড়াইয়ে চিরকাল দেবারি দেবপ্রতিমের দিকেই থেকেছে কারণ অম্বাকে পাওয়াটাকেই ও যথেষ্ট মনে করেছিল। বাবার মন রাখার চেষ্টা করাটা তার অন্তর্গত ছিল। এখন যখন অম্বা আর ওর নেই, তখন সেই দায়ও নেই। অম্বাকে রক্ষা করাই বড় দায়।

মিস্টার চৌধুরীকে ফোন করে ও একহাত নেয় সেদিনই। “আমার যদ্দুর মনে আছে কনফিডেন্সিয়ালিটির একটা ব্যাপার ছিল আমাদের কনট্রাক্টে যখন আমি সাইন করেছিলাম।” বলে দেবারি। “আপনি আমার ডিভোর্সের কেস নিয়ে আমার বাবার সঙ্গে কেন কথা বলছেন জানতে পারি কি?”

মিস্টার চৌধুরী একটু থতমত খেয়ে গেলেও সামলে নেন নিজেকে।

"কথা আমরা তোমার কেস নিয়ে বলিনি আসলে। কনফিডেন্সিয়ালিটিটা আমার দিক থেকে।" বলেন তিনি। "আমি অবশ্যই ওঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করিনি এ ব্যাপারে। কিন্তু তুমি জানো উনি আমার বন্ধুও। আমাদের শুধু উকিল আর মক্কেলের বাবার সম্পর্ক নয়। কাজেই উনি আমাকে কথায় কথায়— অবশ্য আমার তোমার বা রাহুলের কথা ভেবে আগ বাড়িয়ে মিস বর্ধনের সঙ্গে কথা বলা উচিত হয়নি। স্বীকার করছি। আই শ্যাল বি মাইন্ডফুল অ্যাবাউট দ্যাট ইনফিউচার।"

ফোনটা রেখে দেবারি ভাবে একবার বাবাকে ফোন করবে কিনা। কিন্তু না। মিস্টার চৌধুরী নিজেই করবেন নিশ্চয়ই ফোন বাবাকে। বাবা নিশ্চয়ই আশা করবেন দেবারি ওঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করবে এরপরে। সেই আশা আশঙ্কার দোলাচলটা বজায় রাখতে দেওয়া যাক। এটা সহজে ছাড় পেয়ে যাওয়া, না দেবারির বিদ্রোহ বাবার প্রতি, সে বিষয়ে দেবপ্রতিম দ্বিধান্বিত থাকলে দ্বিতীয়বার উকিলের মাধ্যমে অম্বার পিছনে লাগার আগে দু'বার ভাববেন।

***

শনিবারে রাহুলকে আনতে যাওয়ার সময় মেজাজটা বেশ ভালোই ছিল দেবারির। বেশিরভাগ দিনে ওই সময়ে ওর মন ভালোই থাকে। অম্বার সঙ্গে দেখা হয়। রাহুল ছুটে ছুটে কাছে এসে কোলে ওঠার বায়না করে। মাকে ছেড়ে আসার সময় যদিও, বোঝাই যায় যে কষ্ট পায় ছেলেটা মনে মনে। কিন্তু দেবারির সঙ্গে আসতেও আপত্তি করে না। এ-বাড়িতে ওর যে সমস্ত খেলনা ইত্যাদি আছে তাদের প্রতি ওর টান আছে। সপ্তাহে দুটি দিনই যে তাদের দেখা মিলবে সেটা বুঝে গেছে ওইটুকু শিশুও।

আর, দেবারি ভাবে, আশা করে মনে মনে, হয়তো বাবার সঙ্গেও দুটো দিন কাটাতে ভালোই বাসে রাহুল।

গাড়িতে করে ওকে আনার সময় প্রতিবারই রাহুল একগাদা কথা বলে। কথা বলতে শেখার পর থেকেই চুপ করে থাকাটাকে ও বড়ই অপছন্দ করতে শিখেছে।

রাহুল বকবক করে চলেছিল। দেবারি অর্ধেক কথা কানে নিচ্ছিল, অর্ধেক কথা বের করে দিচ্ছিল অন্য কান দিয়ে যেমনটা ও করে থাকে সবসময়ই।

আজ হঠাৎ ওর কানে আসে, “মা ম্যাকডোনাতে যাবে পিয়াংশুর সঙ্গে। আমি কেন যেতে পাবব না?”

দেবারি কান খাড়া করে শোনে। ম্যাকডোনাল্ডস। স্বাভাবিক যে অম্বা ম্যাকডোনাল্ডসে যাবে। চিরদিনের ওদের ঝামেলার একটা বিষয় ছিল অম্বার অতিরিক্ত ম্যাকডোনাল্ডসপ্রীতি আর দেবারির ম্যাকডোনাল্ডসবিদ্বেষ। পিয়াংশু। সেটা কে? দেবারির মনে নেই পিয়াংশু বলে অম্বার কোনও বন্ধুর কথা। কৌতূহল চাগাড় দিয়ে ওঠে।

“পিয়াংশু কে?” জিজ্ঞেস করে ও।

শিশুদের এই বিষয়টা সুবিধার। যে কোনও প্রশ্ন ওদের কাছে সোজা সাপটা প্রশ্নই। আলাদা কোনও রকম অর্থ প্রশ্ন বহন করে না। সে জাজমেন্টের ভয় ওদের কাছে নেই।

“পিয়াংশু বাবা!” রাহুল বলে এখন জোর দিয়ে। ওর ছোট্ট ছোট্ট ভুরু দুটো একটু কুঁচকে যায়। “পিয়াংশু?”

আর হ্যাঁ ঠিক আছে। দেবারি একটু তাড়াতাড়িই শিশুদের কাছে জাজমেন্টের ভয় নেই বলে ফেলেছিল কারণ রাহুলের গলায় জাজমেন্টের ছাপ স্পষ্ট। আর সেটা এতটাই ওর নিজের স্বভাবের মত যে দেবারি হাসবে না বিরক্ত হবে ভেবে পায় না।

“পিয়াংশুকে আমি চিনি না তো।” বলে ও।

“পিয়াংশুউউউ” আবার বলে রাহুল। “যে মায়ের গাইতে ধাকা মেএছিল?”

দেবারি কী ভাববে ঠিক করে উঠতে না পেরে হেসে ফেলে। “যে মায়ের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল? তার সঙ্গে মা ম্যাকডোনাল্ডসে কেন যাচ্ছে?”

“জাইঁ না!” রাহুলের গলাটা নাকী নাকী হয়ে গিয়েছিল এবারে। এটা ওর আবাদারের গলা। স্পষ্টতই ম্যাকডোনাল্ডসে যেতে আমন্ত্রিত না হয়ে ও বড়ই ভেঙে পড়েছে। এ ব্যাপারে আর আলোচনা চায় না।

দেবারির মাথার মধ্যে বিষয়টা ঘুরছিল যদিও। পিয়াংশু। সম্ভবত পুরুষ মানুষের নাম। অম্বার গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। এখন অম্বা তার সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ডসে যাচ্ছে। তাতে অবশ্যই দেবারির কিছু এসে যায় না। কিন্তু কথাটাকে মাথা থেকে ফেলে দিতে পারাটাও শক্ত। গাড়ির মধ্যে বকবক করতে করতে রাহুল ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখনও ব্যাপারটাকে মাথা থেকে ফেলে দিতে পারেনি দেবারি। সকালের ভালো মেজাজের বারোটা বেজে গেল।

***

"হ্যাঁ হ্যাঁ! ওটাকে একরকমের অ্যাডভেঞ্চারই বলতে পারিস। বিন দেয়ার ডান দ্যাট।" বলেছিল অম্বা। চোখ ঘুরিয়েছিল একটু।

বীতাংশু "হম" করে গলার মধ্যে একটা শব্দ করেছিল শুধু।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত জাজমেন্টাল হতে হবে না।" অম্বা বলেছিল হেসে।

মনটা চনমনে লাগছে ওর। কোথায় যেন নিজেকে, কাউকে কেয়ার না করা স্বাধীন পঞ্ছী অম্বাকে ও হারিয়ে ফেলেছিল শেষ কয়েকটা বছরে। বিয়ে। তারপরে বছর ঘুরতে না ঘুরতে সন্তান আনার চিন্তা। সুতপা। ওর মৃত্যু। রাহুল। আর তারপরে, তারপরে —

কিন্তু সেসব কিছুই অতীত এখন। অন্তত আজ যখন ও মোটামুটি নিশ্চিত আছে যে রাহুল ওর বাবার কাছে ঠিকই থাকবে, এই রবিবারের সন্ধেয় ওর প্রিয় ম্যাকডোনাল্ডসের ব্রাঞ্চে বসে ওর প্রিয় ম্যাকডোনাল্ডসের চিকেন পপকর্ন খেতে খেতে বীতাংশুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ওর মনে হচ্ছে ও আবার পাঁচ বছর আগে ফিরে গেছে।

"সত্যি বলতে বিশ্বাস করা কষ্টের। তুই একটা দুই বছরের বাচ্চার মা।" বীতাংশু বলেছিল।

"হম। ওইরকমই।" অম্বা বলেছিল। মাথা নিচু করে খাবারে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ও। নিজেকে রাহুলের মা বলে ভাবতে এখনও মনে মনে কোথাও একটা বাধা পায় ও। কিন্তু আবার, ও যদি রাহুলের মা নাই হবে কে তাহলে ওর মা? যে মেয়েটা মরে গেছে? মাথার মধ্যে কেউ বলতে চায়। অম্বা ভাবতে চায় না তাই এই বিষয়টা নিয়ে বেশি। আর রাহুলের মা হওয়ার মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে যেটা একরকম ভাবে যেন ওর অন্য সমস্ত সত্ত্বাকে দমিয়ে দিয়ে একা নিজেকে জাহির করতে চায়। সেটা একইরকম আনন্দের আর তিক্তমধুর একটা অনুভূতি।

"আমার মনে আছে তুই আমার সঙ্গে রিলেশনে যাওয়ার আগে বলেছিলিস, 'নো বাচ্চা। বাচ্চা হওয়া অসম্ভব। তাই নো বিয়ে।' আর পাঁচ-ছ বছর পরে যখন তোর সঙ্গে দেখা তখন তুই ডিভোর্সী উইথ এ কিড! মানে এটা তোর বায়োলজিকাল কিড কিনা এসব কথা তো পরে আসবে। প্রাথমিক হুইপল্যাশটা ভাব একবার!" বলেছিল বীতাংশু ।

অম্বা হেসেছিল, "ট্রুথ ইস স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন ইত্যাদি আরকি।"

"হম সেটাই। খুবই অদ্ভুত।"

অম্বা মাথা নাড়ায় শুধু।

"তা। এই যে ভদ্রলোকটি। তিনি করেন কী?" একটু পরে বলে বীতাংশু। তারপরে অম্বা উত্তর দেওয়ার আগেই বলে, "মানে আমি ভাবছি, এঁর পাওয়ার কী প্রচণ্ড রে বাবা! অম্বাকে এমন কব্জা করা যে

বিয়ে সারোগেসিতে বাচ্চা ডিভোর্স পাঁচ বছরের মধ্যে!"

অম্বা মাথা নাড়িয়ে হাসে একটু। ও নিজেও মাঝে মধ্যে ভেবেছে এটা। সত্যিই অদ্ভুত! তারপরে বলে, "মনে আছে একবার আমি বলেছিলাম, প্রেম ইত্যাদি হরমোনাল ব্যাপারস্যাপার। ওকে অত বেশি আইডিয়ালাইজ করাটা মানুষ জাতির নিজের প্রজাতিকে বহন করে চলার একটা ইনেট প্রবৃত্তি থেকে আসে? ইনস্টিংক্ট? গেস হোয়াট। কেউই আলটিমেটলি সেই প্রবৃত্তির বাইরে নয়। একটা মানুষকে ভালোবেসে শুধু তার মুখের হাসিটুকু বজায় রাখার জন্য নিজেকে মানুষ ক্ষয়াতে থাকে। নিজেও টের পায় না।"

"তাহলে।" বীতাংশু বলে। "তোর গ্রেট ওয়ান লাভ তোর জীবনে ঘটে গেছে। এখন শান্ত হয়ে নতুন নট দ্যাট গ্রেট রিলেশনশিপকে স্বাগত জানাতে তোর মন প্রস্তুত?"

অম্বা হাসে। "গ্রেট ওয়ান লাভে আমি এখনও বিশ্বাস করি না। তবে নিজের ইনস্টিংক্ট দমন করার ক্ষমতার উপরে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেটার দৌড় বুঝে গেছি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি আর পাঁচটা অতিরিক্ত আবেগসর্বস্ব মেয়ের মতই।"

বীতাংশুও হাসে তখন। বলে, "সে আমি জানি। সেই সময়ে যখন আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করেছিলি সেটা তোর কমিটমেন্ট ফোবিয়া থেকেই এসেছিল। হঠাৎ করে তোর মনে হল আমি কোনওদিনই তোকে সেরকম পছন্দ করিনি। তার থেকে নিজের মনে নানারকম ছুতো তৈরি করলি। তারপর—"

নিজের সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয় ও। বলে, "এইকারণেই আমি বোঝার চেষ্টা করছি। তোর এই ভদ্রলোকটি কতটা প্যাথেটিক যে তোকে পাকড়াও করে ফেললেন এইভাবে। তুই ফ্লাইটি। একমাত্র কেউ রীতিমত আষ্টেপৃষ্টে না বেঁধে ফেললে... আর আমি কোনওদিনই সেই টাইপের নই।"

"আচ্ছা হয়েছে হয়েছে। অত সাইকলোজিকাল অ্যানালিসিস করতে হবে না।" অম্বা বলে।

কিন্তু ও জানে, চিরকালই বীতাংশু ওকে একটু বেশিই বুঝে ফেলে। অতটা বুঝে ফেলাটাই একটা অস্বস্তির ব্যাপার ছিল ওর কাছে। ওর বিয়ে ভাঙার পরে অবশ্য এটার পরিণত অম্বা মূল্য দিতে শিখেছে।

এটা ভালো। আরামের। মুখে কিছু বলার আগেই যদি কেউ খানিকটা অন্তত তোমাকে বুঝে যায়। বীতাংশুর আশেপাশে থাকতে অন্য কোনও

রকম চাপ পড়ে না। অম্বাকে ভাবতে হয় না এটা ওটা হাজারটা কথা।

মনে পড়ে যায় বীতাংশু আসলে ওর ফার্স্ট। ফার্স্ট অনেককিছুই। আর তখন নিজের কাছে নিজে স্বীকার না করতে চাইলেও, বীতাংশু সম্ভবত ওর ফার্স্ট লাভও।

ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে অম্বা বলে, "একটা কথা বল, এখনও কি তখনকার মতই আছিস? বোহেমিয়ান? গার্লফ্রেন্ড ইত্যাদির ব্যাপার কী?"

"নেই।" বলে বীতাংশু। "থাকলে আমার এক্সের গাড়িতে ধাক্কা মেরে সেটাকে একটা ডেট সিকিওর করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতাম না।"

অম্বা হাসে। "এটা কি তাহলে ডেট?"

"নয়তো কী?" বীতাংশু তাকায় ওর দিকে মিটিমিটি।

"শিওর না। তাই জেনে নিচ্ছি।" বলে অম্বা। "একটা ডিভোর্সী সিঙ্গেল মাদারকে ডেটে নিয়ে যেতে অনেকেই রাজি হবে না তো।"

ওর কথাটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না বীতাংশু। উত্তর দেওয়ার যোগ্যই মনে করে না। বলে, "একটা কথা বল। তোর মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে বনিবনা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটা?"

"নেই।" অম্বা বলে, "দেবারির কথার নড়চড় হয় না। তুই বলছিলি না, কী করে আমার মত মেয়েকে আটকে ফেলা গেল? কারণ দেবারি মজুমদার যা চায় তা ঠিকই কব্জা করে ফেলে। তখন আমাকে চেয়েছিল। এখন আর চায় না।"

"আর তুই?" বলে বীতাংশু।

অম্বা ঘাড় ঝাঁকায়। "ডিভোর্সটা আমার ইচ্ছায় হচ্ছে না কিন্তু ফিরে যাওয়াটা আমার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করবে। না। আর এ সুতো জোড়ার নয়।"

"বেশ।" বলে বীতাংশু। "নেশার ঝোঁকে তোকে কিস ফিস করে বসলে কিছু মনে করিস না তাহলে।"

সে-রাতেই কিস ওকে করেনি বীতাংশু। কিন্তু অম্বা ভেবেছিল, ও চাইলে অম্বা বাধা দিত না ওকে। অনেক হয়েছে ন্যাকামি। আজ বীতাংশুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে ওর মনে পড়ছিল এককালে র‍্যাশনালিটিকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে সাব্যস্ত করার

জন্য ও অনেক লড়াই করেছিল ওর প্রেমে গদগদ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। জীবনের পাঁচ পাঁচটা বছর কী ভেবে ও নষ্ট করেছে একটা মরীচিকার পিছনে দৌড়ে? আর এখন ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে এটাকে তো অস্বীকার করতে পারে না যে ও চিরকালই জানত ওর আর দেবারির সম্পর্কটা ছিল মরীচিকা মাত্র।

বোকার হদ্দ। ওকে ছাড়া দেবারি ভালো আছে। ও নিজেও ভালো আছে দেবারিকে ছাড়া।

আর জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভালো থাকা। আর কিছুই নয়।

অম্বা একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিয়েছিল। যথেষ্ট হয়েছে। এবারে আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে জীবনে এগিয়ে চলার পালা।

***

শনিবার রাহুলকে আনতে অম্বার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেবারি যে চমকটা পেয়েছিল সেটাকে কোনওভাবেই প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ বলা যাবে না। প্রতিদিনের মত অম্বা দরজা খোলেনি। একটা ঢ্যাঙা লম্বা ছেলে, দেবারির কাছাকাছি বয়সী হবে, দরজা খুলে তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু মুখে। "কাকে চাই?"

আর একজন অচেনা লোকের কাছে "অম্বাকে চাই।" বলাটা যে এত অস্বস্তিকর আর মাথা গরম করা সেটা কে জানত!

ছেলেটার মুখের ভাব মৃদু বিরক্তি থেকে অসীম কৌতূহলে পরিণত হয়েছিল ঠিক এক পলকের মধ্যে। "ও আসুন আসুন। সরি—"

"অম্বা কোথায়?"

"ও ওর মায়ের বাড়িতে গেছে। হঠাৎ ফোন এসেছিল, উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন বাথরুমে। খুব বড় কোনও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেনি। তাহলে আমিও যেতাম।" লিভিং রুমের সোফা থেকে ভিজে তোয়ালে সরাতে সরাতে বলেছিল ছেলেটা।

আর দেবারির মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। কে না কে এক অপরিচিত ছেলে অম্বার বাড়িতে (যে বাড়ির ব্যবস্থা দেবারি করেছে, ওর মাথার মধ্যের আওয়াজ সেটাও মনে করাতে ছাড়ছিল না।) এমনই হাবভাব করছে যেন এ বাড়ি ওরই বাপের সম্পত্তি। অম্বার মা বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেটা একটা চিন্তার ব্যাপার বটে কিন্তু সেরকম জরুরি কিছু হলে অম্বা নিশ্চয়ই ফোন করত। এখন হাতের কাছের এই ভদ্রলোকটি বেশি চিন্তার বিষয় দেবারির কাছে।

"আই অ্যাম সরি।" একটু রূঢ়স্বরেই বলেছিল ও। "আপনাকে তো চিনলাম না? হু আর ইউ?"

ছেলেটা ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল কথা থামিয়ে। পরিষ্কার দৃষ্টি। "আমি বীতাংশু। অম্বার বন্ধু।"

বন্ধু। বন্ধু একা অম্বার বাড়িতে কী করছে যখন অম্বা নিজে সেখানে নেই!

"আমি এসেছিলাম একটা কাজে। আমরা একটা কোলাবোরেটিভ প্রোজেক্ট করছি—" বীতাংশু বোধহয় দেবারির চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন পড়তে পেরেই বলেছিল। "আমিও আর্টিস্ট বাই দ্য ওয়ে। বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। হ্যাঁ তো ওই কারণে এসেছিলাম। এমন সময়ে অম্বার মায়ের ফোন এল। আপনার আসার কথা, চাবি রেখে যেতে পারত কিন্তু— আমার হাতে সময় ছিল তাই বলল আমাকে থেকে যেতে। রাহুল কিছুতেই থাকতে চাইল না আমার কাছে — চা খাবেন?"

দেবারি মাথার মধ্যে নোট করছিল। রাহুল থাকতে চাইল না মানে রাহুলের এখানে একা বীতাংশুর সঙ্গে থাকার কথা অন্ততপক্ষে উঠেছিল। মুখের ভাব যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করে ও বলেছিল। "না ঠিক আছে। ওদের কতক্ষণ লাগবে ফিরতে? কোনও আইডিয়া?"

"হ্যাঁ। চলে আসার কথা এখনই। প্রায় ঘন্টা দুয়েক হল গেছে। আমি বসে বসে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা দেখছিলাম। আচ্ছা বসুন তাহলে। এসে যাবে এখনই।"

টিভিতে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার খেলা চলছে। টিভির সামনে টেবিলে ছড়ানো আছে এক বাটি তেলেভাজা আর মুড়ি। দুটো না ধোয়া চায়ের কাপ। একটা সিগারেটের প্যাকেট আর দুটো ম্যাগাজিন। আর্ট ম্যাগাজিন যতদূর মনে হল দেখে। আর পুরো জিনিসটা যে খুব অস্বাভাবিক তা নয়। কিন্তু অম্বার বাড়িতে বসে দেবারির অপরিচিত একটা ছেলে মুড়ি তেলেভাজা খাচ্ছে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অদ্ভুত। বড়ই অদ্ভুত।

***

"তোর সমস্ত প্রবলেম, কিছু মনে করিস না, অত্যন্ত অদ্ভুত।" অহনা বলেছিল নাক কুঁচকে। "এই মোমেন্টে আমার ছেলের জন্য স্কুলে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি তোর বাবার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা বোধ করছি। তোর ঘ্যানঘ্যানানি শোনার ইচ্ছা নেই।"

দেবারি একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়েছিল। "হম। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। কিন্তু এখন আমার সমস্যা আমার বাবাকে নিয়ে নয়।"

অহনা ঠক করে গরম কফি ভরা কাপ ওর সামনে টেবিলে রেখে বলেছিল, "ভুল। ১০০% ভুল কথা। তোর সমস্ত সমস্যা সবসময়ই তোর

বাবাকে কেন্দ্র করে। এটা তোর ইন্টারনালাইজড করার দরকার।"

দেবারি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল ওর দিকে। "এইমাত্র যে বললি বাবার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা বোধ করছিস, কথাটা তাহলে মিথ্যা ছিল।"

"মিথ্যা কেন হতে যাবে।" অহনা বলেছিল নাকমুখ কুঁচকে, "আমি কমপ্লেক্স ক্রিয়েচার। তোর বাবা রুথলেস পলিটিসিয়ান, স্বার্থপর, কাজের লোক, আমাকে স্নেহ করেন আর এক্সপেক্ট করেন যে আমিও ওঁকে শ্রদ্ধা স্নেহ করব, তোর প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ববান নিজের ধরণে এবং সর্বান্তকরণে তোর ভালো চান এবং ভদ্রলোক তোর জীবনের সব ইস্যু আর ঝামেলার জন্য দায়ী, এই সমস্ত কিছু একসঙ্গে সত্যি হওয়া সম্ভব এবং সত্যিও। সেটা বোঝার মত ঘিলু আমার ঘটে আছে। আমি শুধু প্রার্থনা করি যে এটা বোঝার মত ঘিলু তোর ঘটেও আসুক।"

দেবারি কফিতে চুমুক দিয়ে দেখেছিল অত্যন্ত গরম। জিভ পুড়ে গেল একটু।

"আমি জাস্ট বুঝতে পারছি না যে এইভাবে একটা অচেনা ছেলেকে নিজের ফ্ল্যাটে থাকতে দেওয়ার কথা অম্বার মাথায় এল কী করে। এটা তো মানে... আই ডোন্ট নো...এটা তো স্বাভাবিক নয়—"

"সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যদি তার প্রতি ওর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থেকে থাকে। যদি সে ওর ততটাই ভালো বন্ধু হয়।" বলেছিল অহনা। "এখন তোকে ভাবতে হবে সেটা তুই ফেস করতে রাজি আছিস কিনা। যে অম্বার একজন পুরুষ বন্ধু আছে যার সঙ্গে ও এতটা স্বচ্ছন্দ। প্রবলেমটা এখানে ওর নয়। প্রবলেমটা তোর।"

***

"তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে এইবারে তোর হার্ট অ্যাটাক হবে।" বলেছিল অম্বা।

"কারণ আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ারই অবস্থা। এখানে আসার প্ল্যানটা কার ছিল যেন?"

"তোর ছেলের। ওর সঙ্গে মিটমাট করে নে।"

জয় রাইড ইত্যাদি দেবারি কোনওদিনই পছন্দ করে না। কিন্তু জন্মদিনে ওইটারই আবদার করেছে রাহুল। এই অ্যামিউজমেন্ট পার্কটা নতুন আর তাই বেশ পপুলারও। রাহুলের প্রি-স্কুলের বন্ধু এসেছে পাঁচজন তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে। তানিয়া এসেছে, অহনা, অহনার বাচ্চা সমেত। এমনকি একবার ঢুঁ মেরে গেছেন দেবপ্রতিমও। নাতির তিনবছরের জন্মদিন বলে কথা! এসেছে অম্বার মা, আর বীতাংশু। আর একজন এসেছে যাকে অম্বা এই প্রথম দেখল। হালকা বেগুনী রঙের

উপরে হালকা হলুদ রঙের ফ্লোরাল প্রিন্টের একটা সামার ড্রেস আর ম্যাচিং হ্যাট পরা ওদের সমবয়সী একটি মেয়ে। দেবারির বন্ধু। বন্ধু শব্দটা এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। মেয়েটা হাসিখুশি। হঠাৎ দেখলে মাথার মধ্যে ডেঞ্জার সাইরেন বাজতে থাকে না। রাহুলের সঙ্গে বন্ধুত্বেও তাকে বেশ আগ্রহী দেখাচ্ছে।

রাহুল এই মুহূর্তে দেবারির বন্ধু আর বীতাংশুর সঙ্গে কী আলোচনা করছে কে জানে। খিলখিল করে হাসছে ও। দেবারি জয় রাইড পছন্দ করে না কিন্তু বীতাংশু করে। ও-ই ওকে কোলে নিয়ে দুটো ঢাউস রাইডে চরিয়েছে। বীতাংশুকে রাহুল এমনিতেই পছন্দ করে, এখন একেবারে ফ্যান হয়ে গেছে ওর। কোল থেকে নামতেই চাইছে না। সেদিকেই গটমট করে তাকিয়েছিল দেবারি।

অম্বার বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওর সমস্যাটা কোথায়। রাহুল যে ওর থেকে বীতাংশুর সঙ্গ বেশি পছন্দ করছে এটাই দেবারির বিদ্বেষের কারণ।

খানিকক্ষণ তাতে মজা পেলেও তারপরে খারাপ লেগেছিল ওর। ও জানে এমন অনেক ইস্যু যা অন্যদের কাছে মজার ব্যাপার, দেবারির কাছে তা কতটা সিরিয়াস। ছোটবেলা থেকে কন্ট্রোলিং বাবার আন্ডারে মানুষ হওয়া মাতৃহীন ছেলের পক্ষে সেটা স্বাভাবিকও।

হেসে বলেছিল, "রাহুল বীতাংশুর কোলে কোলে ঘুরছে নেক্সট জয়রাইডে চড়ার আশায়। ওটাকে পারসোনালি নিস না।"

"আমি পারসোনালি নিচ্ছি না কিছু।" দেবারি হাত বাড়িয়ে সামনে টেবিলে রাখা পোড়া আমের সরবতের একটা গ্লাস তুলতে তুলতে বলেছিল।

অম্বা হেসেছিল মনে মনে। "তুই একটা কাজ কর, ওকে নিয়ে হন্টেড হাউসটাতে ঘুরে আয়। ওটা বাচ্চাদের মত ডিজাইন করা। তেমন ভয় পাবে না। কিন্তু তবু অন্য কারও সঙ্গে ওতে আমি ওকে যেতে দেব না। এদিকে বায়না করছে। একমাত্র তুই ওর সঙ্গে থাকলে—"

দেবারি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে মুখভঙ্গি করেছিল একটা। "হন্টেড হাউস!"

আর অম্বার হাসি পেয়ে গিয়েছিল খুব। ও জানে, অন্য কোনও কারণে হলে দেবারি হন্টেড হাউসে যাওয়া তো দূরের কথা, যাওয়ার কথা ভেবেও দেখত না। এখন ছেলের ভালোবাসায় ভাগীদারের আবির্ভাবের আশঙ্কায় বেচারা চাপে পড়েছে।

"হন্টেড হাউসে যাওয়ার জন্য বায়না করছে।" সরবতে চুমুক দিয়ে বলেছিল দেবারি, "আমার ছেলের টেস্ট এরকম কী করে হল! এর জন্য তুই দায়ী!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ!" অম্বা হেসেছিল, "রাহুলের যেটুকু নন বোরিং অংশ পারসোনালিটিতে, সেটার জন্য আমি আর—" বলতে বলতে থমকে গিয়েছিল ও। আজ শুধু রাহুলের জন্মদিন নয়। আজ সুতপার মৃত্যুদিনও। মিথ্যা বলে লাভ নেই, সেই সত্যটাকে মনে মনে এড়িয়ে যেতে চায় ওরা। সেই কারণেই আজকের দিনে জন্মদিন না পালন করাটা রাহুলের প্রতি অবিচার করা হবে বলে মনে করে। কিন্তু, সুতপাকে আজকের দিনে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করাটা কি ওর উপরে অবিচার নয়? অম্বা তাকায় রাহুলের দিকে। এখনও হাসছে খিলখিল করে বাচ্চাটা। ও জানে না। বোঝে না কিছুই। একদিন ওকে বলতে হবে। তখন—

অস্বস্তিকর মুহূর্ত কাটে কয়েকটা। তারপরে দেবারি বলে। "হ্যাঁ তা—হন্টেড হাউস—"

***

পরে। রাহুলকে নিয়ে হন্টেড হাউস থেকে ঘুরে আসারও অনেকটা পরে, দেবারি বলে, "তোর কমলিকার সঙ্গে আলাপ হয়নি? বলছিল।"

"হবে কী করে? তুই করিয়েছিস?" অম্বা বলে হেসে, "বয়ফ্রেন্ডের এক্স ওয়াইফ—"

"কে কার বয়ফ্রেন্ড?"

"তুই!" অম্বা চোখ ঘোরায়। "কমলিকার বয়ফ্রেন্ড। আবার কে?"

"না আমরা।" বীতাংশু বলে মুখে হাত বুলোতে বুলোতে, "মানে আমাদের—"

অম্বা তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। ভাবে। ও নিজেও বীতাংশুর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা দেবারিকে খুলে বলেনি। ওরা যে খুব সিরিয়াস এখনই তা হয়তো নয়। কিন্তু ও বীতাংশুর থেকে সরে আসার চেষ্টা যে করেনি বা করছে না সেটা সত্যি। এমনকি, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে যে শারীরিক সম্পর্কের রসায়ন বীতাংশুর সঙ্গে ওর সেই পুরোনো দিনের মতই আছে। এর মধ্যে যে এতগুলো বছর চলে গেছে, অম্বার জীবনের সবকিছু বদলে গেছে, সেটা যেন কিছুই নয়। বীতাংশু ওর প্রথম সিরিয়াস বয়ফ্রেন্ড। তার সঙ্গে আবার মিটমাটের একটা আভাস দেখা দিয়েছে। আর অম্বার ভালোও লাগছে সেটা। ভালো লাগছে নিজেকেও। কিন্তু চিন্তা রাহুলের জন্যই। বাচ্চা মানুষ ও। মায়ের জীবনে নতুন পুরুষ যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, সেটা ওর উপরে মানসিক ভাবে কী প্রভাব ফেলবে কে জানে! একেই এত ছোটবেলায় মা বাবার ডিভোর্স ওকে দেখতে হচ্ছে।

ছোট একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে অম্বা বলে এখন, "অ্যাট লিস্ট একটা রোমান্টিক সম্পর্কের দিকেই চলছিস তো তোরা? এখনই না হয় বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের লেবেল না-ই দিলি।"

দেবারি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকমুহূর্ত। তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকায়। কোনও উত্তর দেয় না কথার।

অম্বা ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবে একটু। তারপর বলে, "আমিও, আই মিন তুই হয়তো বুঝতেই পারছিস, কিন্তু, মানে আমি তো বলিনি তোকে— আমরা, আমি আর বীতাংশু, উই আর কাইন্ড অফ টুগেদার।"

ও অপেক্ষা করে থাকে দেবারির দিক থেকে কোনও সাড়ার। ভাবে দেবারি বলবে এবারে, "ও হ্যাঁ। আমি আর কমলিকাও ওই আরকি!" কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে কল্পনা করে একটা ভবিষ্যৎ যেখানে ও আর বীতাংশু একসঙ্গে আর দেবারি আর কমলিকাও কাপল।

রাহুলের কেমন লাগবে! ভেবে দেখে, দেবারির সঙ্গে যদি কমলিকার বিয়ে হয়, তাহলে আরও নতুন শিশু আসবে নিশ্চয়ই ওদের জীবনে। রাহুলের প্রতি কি দেবারির টান কমে যাবে তাতে?

দেবারিকে নতুন জীবনের জন্য অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত করে অম্বা নিজেকে মনে মনে।

দেবারি কিন্তু কিছুই বলে না।

***

"উই আর কাইন্ড অফ টুগেদার! উই আর কাইন্ড অফ টুগেদার? হোয়াট ডাজ শি মিন?" পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরানোর চেষ্টা করতে করতে বলছিল দেবারি। ও প্রান্তে অহনা।

"আমরা অলরেডি জানতাম যে ও বীতাংশুকে ডেট করছে দেবা। আর তুই যতই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করিস না কেন যে দুটো ঘটনা আনরিলেটেড, আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে ইউ উড নট ট্রাই টু রিকানেক্ট উইথ কমলিকা যদি না তুই মনে মনে অন্তত সন্দেহ করতিস যে অম্বা বীতাংশুকে ডেট করছে। ওর মুভ অন করার চেষ্টা তোকে মুভ অন করতে মোটিভেট করেছে। নাহলে তুই—?"

কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কথার সুরটা গোপন থাকে না। অহনা বলতে চাইছে দেবারি মুভ অন করতে জানে না। বা চায় না। যাই হোক।

আগে হলে, বছর দুয়েক আগে হলেও দেবারি এরকম একটা অভিযোগ সহ্য করত না। কিছুতেই ভেবে দেখত না অভিযোগটার

সত্যতা কতটা। এখন জীবনের কাছে কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে ও নিজের গভীরে গিয়ে একটু ভাবতে শিখেছে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ও খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। ওপারে অহনাও কিছু বলেনি বা তাড়া দেয়নি। বোধহয় বাড়ির কাজ করতে করতে ইয়ারফোনে কথা বলছে দেবারির সঙ্গে।

কয়েকটা লম্বা মুহূর্ত একটু ভেবে দেখার পরে দেবারি বলেছিল, "যদি তা-ই হয়, তাহলেও... আচ্ছা আমাদের এই ওয়েটিং পিরিয়ডের মধ্যে অন্য কাউকে ডেট করা কি অ্যাডাল্টারির মধ্যে পড়বে? কী মনে হয়?"

মনে হয়েছিল যেন ফোনের ওপার থেকেও অহনার চোখ ঘোরানো দেখতে পেয়েছিল দেবারি। "যদি তা-ই হয়! তুই কি অ্যাডাল্টারির অভিযোগ আনবি নাকি অম্বার বিরুদ্ধে কোর্টে?"

***

অবশ্যই অম্বার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবে না দেবারি। কিন্তু অম্বাকে ওর না ভেবেচিন্তে করা কাজের যে কী পরিণতি হতে পারে সেটা মনে করাতে তো কোনও ক্ষতি নেই?

"অ্যাডাল্টারি?" অম্বা বলেছিল। সত্যিই থতমত খেয়ে বোকা বনে গেছে ও। এটা ভেবে দেখেনি।

"ভুলে যাস না যে আইনের চোখে আমরা এখনও ম্যারেড। আমাদের বিয়ে এখনও নালিফায়েড হয়নি।" দেবারি বলেছিল গম্ভীর স্বরে।

অম্বা তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। "কিন্তু—" বলার চেষ্টা করেছিল ও।

"সেপারেশন মানে ডিভোর্স নয়।" ওর কথা শোনেনি দেবারি, বলে চলেছিল, "উই আর স্টিল—"

"কিন্তু," ওকে বাধা দিয়ে আবার বলেছিল অম্বা। "মানে, আমরা তো একথা কোর্টকে জানাতে যাচ্ছি না। এটা আমাদের নিজেদের মধ্যের ব্যাপার!"

"এগজ্যাক্টলি! কিন্তু তার মানে এটাও যে এই ব্যাপারে অফিসিয়ালি কিছু না বলাই ভালো।" দেবারি বলেছিল অত্যন্ত নিস্পৃহ স্বরে। "যতক্ষণ না আমরা নতুন কোনও রিলেশনশিপের কথা অফিসিয়ালি ঘোষণা করছি আর অ্যাস লং অ্যাস কোনওরকম ফিজিক্যাল, শারীরিক সম্পর্কের কথা সামনে আসছে—" বলার চেষ্টা করেছিল ও। কিন্তু ওর চোখ আটকে গেছিল অম্বার মুখের ভাবে। অম্বার মুখে অস্বস্তির ভাব স্পষ্ট।

"অম্বা?" বলেছিল ও। কীসের অস্বস্তি? তারপর মাথার মধ্যের ধোঁয়াশা কেটে যাচ্ছিল। "আর ইউ? ডু ইউ মিন—"

***

সপ্তাহখানেক অম্বার কাটে গভীর চিন্তায়।

কিছুতেই দেবারির কালো হয়ে যাওয়া ক্লিষ্ট মুখটা মন থেকে সরাতে পারছে না। দেবারি কি তবে এখনও অম্বাকে চায়? অম্বার অন্য কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা ওকে কষ্ট দেয়? অম্বা কি না বুঝে দেবারিকে গভীর আঘাত করে ফেলেছে?

প্রথম দুদিন রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে অম্বা একথাই ভেবে চলে। ভেবেই চলে। দেবারিকে কষ্ট দেওয়া এখনও ওর নিজের কাছে সমান কষ্টকর। সে তো ও কোনওমতেই চায় না! চায়নি!

প্রথম দুদিনের এই ছটফটানি কাটার পরে অম্বা নিজেকে নিয়ে বসে। নিজের সঙ্গে আলোচনা করে। ভেবে দেখে, জীবনটাকে নিয়ে ও কোথায় চলেছে! একটা সময় ছিল যখন দেবারি ওকে চায় জানলেই নিজের সমস্ত গোপন ভয়ভীতি আশঙ্কা দমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ত অজানায়। সেই ভাবেই একের পর এক ভুল করেছে ও। ওরা। তা তো অস্বীকার করার নয়! হ্যাঁ। বিয়ের, সন্তানের, এমনকি ডিভোর্সের সিদ্ধান্তও দেবারির ছিল। অম্বা সমস্তক্ষেত্রে শুধু সেসব সিদ্ধান্ত প্রায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। পরে বলেছে, 'তা সত্ত্বেও' ও সবকিছুর দায় নেবে। কিন্তু তার মধ্যে কি "আমার কোনও ভুল ছিল না, সব দোষ তোর!" এমন একটা গোপন দাবী প্রচ্ছন্ন ছিল না? ও কি মনে মনে ওর নিজের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষমতার দায় দেবারির উপরে চাপায়নি? ভেবে যখন দেখে অম্বা, অস্বীকার করতে পারে না যে দেবারি সত্যিই ওর মতামতের গুরুত্ব দিয়েছে সবসময়। অম্বা— হ্যাঁ, অম্বাই ঠিক থাকতে পারেনি নিজের সিদ্ধান্তে। অম্বাই জানেনি, বোঝেনি, নিজেকে ভাসিয়ে দিলে স্রোতের সঙ্গে ভেসেই চলতে হয়। স্রোত যতই বন্ধুত্বপূর্ণ শান্ত হোক না কেন, ভেসে গেলে তাতে খুঁটি বাঁধা চলে না।

আর এখনও, কী করছে অম্বা? বীতাংশুকে ওর ভালো লাগছে, কিন্তু ও নিজেও জানে দেবারির প্রতি যে পরিমাণে স্নেহ ওর এখনও আছে তার কাছে সেই ভালো লাগাটুকু কোথাও লাগে না। দেবারির জন্য এখনও অম্বা সব দিতে পারে। কেন? সে প্রশ্ন করে তো লাভ নেই! তবে বীতাংশুর সঙ্গে এই খেলা খেলা রিলেশনশিপের মূল্য কি? এর শেষ কোথায়? রাহুলের জীবন এখন অম্বার জীবনের সঙ্গে জড়ানো। মুভ অন

করার জন্য ছেলেমানুষী করার সময় এ নয়। দেবারি ওকে চাক আর নাই চাক, এইরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে যেখানে দেবারির মুড ওর নিজের মুডকে এখনও এতটা প্রভাবিত করে, ও অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গেই সম্পর্কে যেতে পারবে না। অনেক অনেক কিছুর ভালোমন্দ এখন জড়িয়ে আছে ওর সিদ্ধান্তের উপরে। চিরদিনই ছিল।

***

সাতদিনের মধ্যে অম্বা বীতাংশুর সঙ্গে দেখা করেনি। তারপরে দেখা করে ও। নিজের সিদ্ধান্ত জানায়। বন্ধুত্ব রাখতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু যতটা ফ্রি ও নিজেকে ভেবেছিল ততটা বোধহয় ও এখনও নেই। আর নিজেকে নিয়ে যখন ও দ্বিধান্বিত তখন এভাবে এই রিলেশনশিপকে এগিয়ে নেওয়া ওর নিজের প্রতি অন্যায়, দেবারির প্রতি অন্যায়, কিন্তু সবচেয়ে বড় অন্যায় বীতাংশুর প্রতি। আর, রাহুলের কথাটাও তো ভাবতে হবে!

সেই কথাটাই ও বলে।

“রাহুলবাবুর সঙ্গেও তাহলে আমার আর দেখা হবে না?” বীতাংশু বলে ঠোঁট ফুলিয়ে।

অম্বা হাসে। না। বীতাংশুর সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক এত ভালো, এটাকে কেড়ে নেওয়ার কথা তো ও ভাবতেই পারে না!

“যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবি।” বলে ও। আর সত্যিই মনের গভীর থেকেই বলেহ

বীতাংশু হাসে। বলে, “জীবনে কোনদিন সত্যিই বাচ্চা পছন্দ করব ভাবিনি। কিন্তু রাহুলবাবু, হি ইজ আ জিনিয়াস!”

মাতৃগর্বে অম্বার বুক ফুলে উঠতে চায়। হেসে বলে, “হি ইজ! কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নিজের সন্তান সবসময়ই দ্য মোস্ট জিনিয়াস। এখনও ভেবে দেখ। বোহেমিয়ান জীবনই কাটাবি? বিয়ে বাচ্চা এসবেরও কিন্তু একটা—?”

বীতাংশু ওর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তারপরে নিচু হয়ে ওর গালে একটা চুমু দিয়ে বলে, “কোনওদিনই আমার চান্স ছিল না কোনও তাই না?”

অম্বা কী বলবে ভেবে পায় না এক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলতে যায়, “... সরি”

বীতাংশু হাসে, “না ইটসোকে। ইটসোকে।”

***

ফোনটা এসেছিল একটা ইম্পর্ট্যান্ট মিটিংএর মাঝখানে। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বলের দিকে একটা বিশাল জমির খণ্ড পাওয়া গেছে যেখানে একটা হাসপাতাল খোলার ইচ্ছা দেবপ্রতিমের। তার দায়ভার তিনি দেবারিকে দিতে চান। বড় প্রজেক্ট। অত্যন্ত বড়। আর তেমনই দায়িত্বের কাজ। সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল কলকাতার নামী একজন সার্জন এবং একজন বিল্ডারের সঙ্গে। দেবপ্রতিমও উপস্থিত ছিলেন অবশ্যই। এই সময় ফোনটা এসেছিল। প্রথমবার দেবারি ফোনটা ধরেনি। দ্বিতীয়বার ফোন বেজেছিল যখন ততক্ষণে দরকারী কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফোনের স্ক্রিনে অম্বার নামটা দেখে ও ইতস্তত করছিল। তা দেখে ডাক্তারবাবুই ভুরু তুললেন। "কী ব্যাপার?"

"এক্সকিউজ মি। আই থিংক—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! দরকারী ফোন হলে অবশ্যই —"

দেবপ্রতিম অপ্রসন্ন মুখে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি।

"আমার স্ত্রীর ফোন।" দেবারি বলেছিল, সেপারেটেড স্ত্রী সেকথা আর বলেনি। "এইসময় ফোন করার কথা নয়। দরকারী কিছু না হলে—" আর এটা সত্যি কথা। দরকারী বিষয় না হলে অম্বা পরপর দুবার এভাবে রিং করে না। বিশেষ করে ও জানে এটা ওয়ার্কিং আওয়ার।

"ও হ্যাঁ, অফ কোর্স অফ কোর্স! ফ্যামিলি ম্যাটার সবার আগে।" হেসেছিলেন বিল্ডার ভদ্রলোক।

দেবারি ফোনটা তুলেছিল কানে।

স্কুলে খেলতে খেলতে রাহুল পড়ে গেছে। তেমন কিছু নয়, কিন্তু সম্ভবত পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে অল্প। মুশকিলের ব্যাপারটা হল অম্বা ওখানে নেই এখন। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে এক চ্যারিটির সঙ্গে ও গেছে নদীয়ার এক অনাথাশ্রমে। বীতাংশুর রাহুলকে স্কুল থেকে পিক আপ করার কথা ছিল। ওই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

"আমি আসছি।" বলেছিল দেবারি।

"না না ঠিক আছে। তুই কাজে আছিস আমি জানি।" অম্বা বলেছিল। "আমি জাস্ট ভাবলাম —"

"তুই কী ভাবলি সেটা বড় কথা নয়।" দেবারি বলেছিল, "বড়

কথা হল, আমার ছেলে একটা স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে এই সময়ে একা। তোর চ্যারিটিকে গুলি মার। তোর কোথাও যাওয়ার থাকলে আমাকে জানাতে পারিস না? যে কোনও বিপদ আপদ হলে—” নিজেকে সামলে নিয়েছিল ও, “উই নিড টু টক অ্যাবাউট ইট। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি ওখানে।”

অম্বা আর কোনও আপত্তি করেনি। কিছু বলেইনি আর তেমন।

ফোন রেখে দেবারি মিটিং রুমে ঢুকেছিল। “সরি! আমার ছেলে স্কুলে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। ওর মা ওর সঙ্গে নেই। একটা কাজে ও নদীয়াতে। আমাকে যেতে হবে।”

“অফ কোর্স অফ কোর্স!” ডাক্তার বিল্ডার দুজনেই বলেছিলেন। “আমাদের কথা বার্তা তো এখানে হয়েই গেছে। আমি মিটিংএর একটা ব্রিফ বানিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নেব পরে।” বলেছিলেন বিল্ডার।

দেবারি দেবপ্রতিমের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কোথায় নিজের কন্ট্রোল কতটা রাখতে হয়। কীভাবে ব্যালান্স করতে হয় জীবনকে। দেবারি শিখছে। হয়তো অনেক কিছু হারাতে হয়েছে এই শিক্ষার পথে। কিন্তু আশা করা যাক দেবপ্রতিম তাতে গর্বই বোধ করবেন।

***

সত্যিই তেমন বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। অল্পই চির ধরেছিল রাহুলের হাড়ে। “একমাসের জন্য প্লাস্টার থাকলেই হবে।” বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। “আর একদম দৌড়াদৌড়ি নয়। বিশ্রাম নেবে পুরো সময়টা!” রাহুলের থুতনি নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

দুরন্ত ছেলে চুপ থাকতে চায় না। অম্বার কাজ কারবার মাথায় উঠেছিল। দেবারিও একহাত নিয়েছে ওকে ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে চ্যারিটির কাজে একটু দূরে যাওয়ার দোষে।
সেদিনকেই পা ভাঙতে হয়েছে রাহুলকে! না ভেবে পারে না ও! যেমন বাবা তার তেমনই হয়েছে ছেলে। যেকোনও ভাবে অম্বাকে বিপদে ফেলতে পারলেই ওদের আনন্দ!

প্লাস্টার কাটার দিনটায় একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে ভেবেছিল, কিন্তু রাহুল ইতিমধ্যেই বায়না জুড়েছে, ওকে ওইদিনই প্লাস্টার কাটার পরেই 'জলিবানি' অ্যামিউজমেন্ট পার্কে নিয়ে যেতে হবে। এতদিন ও শুয়ে আছে! তার জন্য ওর পুরস্কার চাই। যেন পা ভাঙাটা ওর নিজের দুষ্টুমির সাজা ছিল না! কিন্তু সাড়ে তিন বছরের বাচ্চার সঙ্গে যুক্তিতে পারা যায় না। দেবারিকে অম্বা বলেছিল কথাটা ফোনে। "তোর ছেলে তোর মতই ঠেঁটা হয়েছে। প্লাস্টার কাটার দিনেই জলিবানিতে যাবে বলে লাফাচ্ছে। এতদিন কোনও কাজ হয়নি আমার। পরেরদিনই একটা ডেডলাইন আছে। এখন ওকে নিয়ে জলিবানিতে গেলে পুরো দিনটা—"

"ওকে বল সেদিনই হবে না। পরেরদিনে আমি নিয়ে যাব ওকে। আমার ছুটি আছে সেদিন।" দেবারি বলেছিল ওপার থেকে।

"তুই?" সত্যিই অবাক হয়েছিল অম্বা। "স্বেচ্ছায় অ্যামিউজমেন্ট পার্কে যেতে চাইছিস?" হেসেছিল ও, "না থাক, তোর বিশ্রামের দিন বিশ্রামই নিস। আমি দেখছি—"

"কিছু দেখতে হবে না!" দেবারি বলেছিল, "আমি নিয়ে যাব ওকে। বলে দিস। তবে পরের দিন।"

***

কথাটা কীভাবে অম্বার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল ও নিজেও জানে না। আসলে কথাটাকে ততটা গুরুত্বই ও দেয়নি।

রাহুলের প্লাস্টার কাটার পরেরদিন তাই যখন দেবারি ফোন করেছিল সকালে, "আমি আসছি। রুহুকে রেডি করে রাখ!" অম্বা জিভ কেটেছিল।

"ওই! ও কালকেই গেছিল রে জলিবানিতে, বীতাংশু নিয়ে গিয়েছিল ওকে। আমি ভুলেই গেছিলাম তুই বলেছিলিস নিয়ে যাবি ওকে। আর এমন লাফাল—"

ওর কথার মধ্যিখানে দেবারি ফোন কেটে দিয়েছিল যখন তখন অম্বা বুঝেছিল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

***

সারাটা দিন দেবারি সেদিন বাড়িতেই ছিল। ছুটিটা ও নিয়েছিল ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলে। কিন্তু সে কাজ করার অন্য লোক এসে গেছে এখন রাহুলের জীবনে। অম্বার জীবনে। মনে পড়েছিল বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগের ওদের শেষ ঝগড়ার কথা। সেদিন

দেবারি যা করতে চায়নি বা পারেনি, আজ সে করার অধিকার অম্বা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে।

বা হয়তো দেবারি নিজেই অতি নাটকীয় হয়ে পড়ছে। কে জানে! কিন্তু এই নাটকীয়তা থামানোর ইচ্ছাও ওর নেই। না। বিকেল বেলায় মালের বোতল নিয়ে বসেছিল দেবারি। কালকে থেকে আবার লড়াই, নিজের পায়ের তলায় জমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে। আজকে একটু নিজেকে কষ্ট পাওয়ার সুযোগ দেওয়ার দরকার।

সন্ধেবেলায় দেবারি গিয়েছিল অম্বার বাড়িতে। সন্ধে না। রাত। সাড়ে নটার সময়। রাহুল সাড়ে আটটার সময় ঘুমিয়ে পড়ে। অম্বার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দরকার, সেটা রাহুল আশেপাশে থাকলে হবে না।

অম্বার বয়ফ্রেন্ড যদি থেকে থাকে ওর সঙ্গে, লাথি মেরে তাকে বের করে দেবে দেবারি। হ্যাঁ, রাহুল বীতাংশুকে ভালোবাসে, অম্বাও বীতাংশুকে ভালোবাসে। তাতে দেবারির কী?

দরজা খুলেছিল অম্বাই। আর কেউ আছে ফ্ল্যাটে বলে মনে হয়নি। দেবারিকে ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিল, "এই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এলি?"

"কী অবস্থায়?"

"তুই নেশা করে আছিস দেবারি।"

দেবারি ফুঃ দিয়ে কথাটাকে উড়িয়েই দিয়েছিল। ও যথেষ্ট সোবার আছে। পুরো জ্ঞান আছে ওর। কিন্তু যে কথাটা ও বলতে চায় সেটা বলতে একটু তরল সাহসের দরকার ছিল। অস্বীকার করবে না।

ঘরে ঢুকতে অম্বা এক গ্লাস ঠান্ডা জল এনে দিয়েছিল। "এটা খেয়ে নে।"

দেবারি আপত্তি না করে খেয়ে নিয়েছিল জলটা। তারপরে বলেছিল, "তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এলাম।"

অম্বা ওর দিকে তাকিয়েছিল বড় বড় চোখ করে। দেবারি আর কিছু যখন বলেনি তখন নিজেই বলেছিল, "এটা যদি রাহুলের বীতাংশুর সঙ্গে জলিবানিতে যাওয়ার ব্যাপারে হয়—"

"সেটার ব্যাপারেই।" দেবারি বলেছিল, নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ও। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে হবে না। তারপরে বলেছিল, "তুই কি ইচ্ছা করেই ওকে আমার থেকে সরিয়ে নিতে চাইছিস? কারণ ইফ ইউ আর, আই কান্ট ব্লেম ইউ!" থেমেছিল একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে নেওয়ার জন্য। "হ্যাঁ আমি হয়তো তোর সঙ্গে অন্যায় করেছি। সুতপা— সুতপার সঙ্গে অন্যায় করেছি। আমি জানি

তুই আমাকে কোনওদিন ক্ষমা করিসনি সুতপার ব্যাপারে। আর আমি জানি আমি, আমি ডিজার্ভ করি সেটা। আই ডিজার্ভ ইট! আমি চেয়েছি তোকে আর সেটা... হয়তো সেটা সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে এসেছে তোর জীবনে। সিইং অ্যাস ইউ আর সো হ্যাপি উইথ ইয়োর এক্স। অ্যাস ইউ আর, মানে, আই ক্যান সি! তুই সুখে আছিস, খুশি আছিস অ্যান্ড দ্যাটস ওকে! দ্যাটস মোর দ্যান ওকে! কিন্তু রাহুল তো আমারও। আর আমার একমাত্রও। আমি বুঝছি তুই ওকে আর বীতাংশুকে নিয়ে নতুন করে সব কিছু শুরু করতে চাইছিস কিন্তু আমি... আমি একটা পার্ট ওর জীবনে!”

“দেবারি শোন—” অম্বা বলার চেষ্টা করেছিল।

সেকথায় দেবারি কান দেয়নি। বলে চলেছিল, “আমি জানি এটা হয়তো অন্যায় আবদারের মত লাগবে তোর কাছে। একটা সময় ছিল যখন রাহুল আমার কাছে কিছুই ছিল না। নাথিং! একটা টুল যেটা আমাকে... আমাকে তোকে আমার জীবনে জড়িয়ে রাখার সুযোগ দেবে। জাস্ট— আই ডিডনট ওয়ান্ট হিম! আই ওয়ান্টেড ইউ! কিন্তু এখন—”

“শোন! শোন দেবারি!” অম্বা বলার চেষ্টা করেছিল আবার, “শোন! বীতাংশু রাহুলের জীবনে তোর জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছে না! সেটা অসম্ভব ওর পক্ষে! ভেবে দেখ একবার! এতটা উত্তেজিত হচ্ছিস কেন!”

দেবারি শুনেছিল কিনা কে জানে। বলে চলেছিল, “তুই হয়তো বিশ্বাস করতে পারবি না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি! নিজের জীবনের রাশ নিজের হাতে নেওয়ার। অনেক বিষয়েই অনেক দেরি করে ফেলেছি হয়তো কিন্তু যেটুকু বাঁচাতে পারি আমি চেষ্টা করছি— আমি আমি—”

ওর মুখ দেখে মনে হয়েছিল ও কেঁদে ফেলবে। অম্বা দুপা এগিয়ে গিয়ে ওর একগালে হাত ঠেকিয়েছিল। দেবারি যেন সেটা আশা করেনি। চমকে তাকিয়েছিল ওর মুখে। আর কেন যেন অম্বা নিজের পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঠে ওর কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁটে চুমু দিয়েছিল একটা। “বীতাংশুকে আমি ডেট করছি না। আই ব্রোক ইট অফ। আর যদি করতামও তাহলেও ওর পক্ষে রাহুলের জীবনে তোর জায়গা নেওয়া অসম্ভব হত। এটা না বোঝার মত বোকা তো তুই নোস!”

দেবারি জানে না ঠিক কী মনে করেছিল ও। কী ভেবে নিচু হয়ে

অম্বাকে দ্বিতীয় চুমুটা দিয়েছিল ও নিজেই।

অম্বাকে, অতি চেনা অম্বাকে মনে হয়েছিল অপরিচিত, পরিচিত কিন্তু অপরিচিত। যেন আরও কিছু চেনার আছে ওর মধ্যে। আরও আবিষ্কার করার আছে। আর সেটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি।

বিছানায় যখন পড়েছিল ওরা, দেবারি ভেবে দেখেনি পরেরদিন ও আফসোস করবে কিনা। ওর মাথার মধ্যে যে ক্ষুধা জেগে উঠছে সে বলছে আরও আরও আরও আরও আরও চাই। শরীর ছাড়িয়ে মন, জীবন, সবটুকু! আর এই অনুভূতিটাকে চেনে দেবারি। অম্বাকে জড়িয়ে এই অনুভূতিটা খুব পরিচিত।

ততক্ষণ পর্যন্ত যেন দেবারির জ্ঞান ফেরেনি যতক্ষণ না অম্বা বলেছিল, "কন্ডোম দেবারি! কন্ডোম! নাইটস্ট্যান্ডে—"

তখন থমকে গিয়েছিল ও।

"আমি— আমি—" বলার চেষ্টা করেছিল।

কারণ দেবারি জানে অম্বা শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছে বীতাংশুর সঙ্গে। জেনেছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে, অম্বার শরীরটার দিকে তাকিয়ে, অম্বার লালচে শ্যামলা হালকা ঘামে ভেজা ত্বক, ওর বড় বড় নিঃশ্বাসে কেঁপে ওঠা বুক, বালিশে ছড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এটা ভাবতে পারা দেবারির পক্ষে শক্ত, ভাবতে পারা অসম্ভব যে অম্বাকে অন্য কেউ এইভাবে দেখেছে। আর কেউ এইভাবে পেয়েছে।

আর দেবারি, ও নিজেও তো আর কাউকে চায়নি এইভাবে। ভাবতে পারেনি। অসুস্থ বোধ করেছে ভাবলেও।

অম্বা বলেছিল, "ওঃ দেবারি! সরি! আমি, আমি—"

আর বলেছিল, "দেবারি! দেবারি! দেবারি!" যেমনটা বলত আগে।

"দেবারি! দেবারি! দেবারি!"

৫

ডিভোর্সের পিটিশন ফিরিয়ে নেবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল ওদের কাছে। ওদের ওয়েটিং পিরিয়ডের আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি আছে।

"যেটাতে কম ঝঞ্ঝাট সেটাই কর।" বলেছিল অম্বা। "তবে ডিভোর্সী পেরেন্টসের থেকে সেপারেটেড পেরেন্টস বোধহয় ভালো রুহুর পক্ষে।"

"একই ব্যাপার। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন" বলেছিল দেবারি। "আমি

মিস্টার চৌধুরীর কাছে জেনে নিচ্ছি কী করা যায়। প্রসিডিওর এতটা এগিয়ে নেওয়ার পরে—"

ডিভোর্স হোক বা নাই হোক, দুজনে মিলে ওরা ঠিক করেছে সেপারেটেডই থাকবে ওরা। অকেশনাল সেক্স? সে ঠিক আছে। রাহুলকে যেভাবে মানুষ করছে তা-ই করবে দুজনে আপাতত। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে একসাথে বাস করা বা পরিবার হয়ে ওঠা এই মুহূর্তে আবার? অসম্ভব। বিশেষ করে অম্বা চায় না সেই ঝুঁকি নিতে। একদম নিশ্চিত না হয়ে, সবদিক ভেবে না দেখে। হঠকারী সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া যেত। এখন রুহু জড়িয়ে আছে ওদের জীবনে। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করেই যত ঝামেলা হয়েছিল ওদের। আগে ভালো মা বাবা হয়ে ওঠা শিখুক। পরে ভালো স্বামী স্ত্রী হয়ে উঠতে শিখবে 'খন।

ঠিক হয়েছে শনি রবিবার যেমন দেবারি রাহুলকে নিয়ে যেত নিজের সঙ্গে, সেটাই একটু মডারেশন করে এখন ওইদুটো দিন ওরা তিনজনে একসঙ্গে কাটাবে। বাকি দিনগুলোতে রাহুল থাকবে ওর মায়ের সঙ্গেই। তবে অম্বার নিজেরও মাসে দুমাসে একবার দুবার সম্পূর্ণ নিজের সঙ্গে কাটানোর সময় দরকার। সেটাকে ওদের ভেবেচিন্তে ম্যানেজ করতে হবে।

"একটা কথা তোকে বলা হয়নি।" দেবারি বলে।

"কী?"

"সুতপার বরের ট্রান্সপ্ল্যান্ট সাক্সেসফুল হয়েছিল।"

অম্বা চমকে তাকায়। মাঝে মধ্যে যে ওর ইচ্ছা হয়নি এব্যাপারে দেবারিকে প্রশ্ন করার তা নয়। কিন্তু সাহস হয়নি। সুতপার কথা মুখে আনাই তো একে কষ্টকর। তার উপরে—

"ভালো আছে?"

"হ্যাঁ।" বলে দেবারি। তারপরে একটা ঢোঁক গিলে বলে, "আরেকটা বিয়ে করেছে পরে।"

কথাটা বুকের মধ্যিখানে কোথাও গিয়ে ধাক্কা মারে। মাথা নিচু করে অম্বা বলে শুধু, "আচ্ছা!"

ওরাই যে সুতপাকে মেরে ফেলেছে এই অনুতাপ বোধহয় ওদের কোনওদিনই যাবে না। কিন্তু মানুষকে এই সব অনুভূতির বোঝা নিয়েই বাঁচতে হয়। পালানো যায় না।

একটু পরে দেবারি আবার বলে, "সুতপার বড় ছেলে যে ওর দিদির কাছে মানুষ হচ্ছে, তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাই। দিদিকেও। খুব

বেশি না কিন্তু...” একটু চুপ করে থেকে বলে, “রাহুলের দাদা।”

“হুম।” সংক্ষেপে বলে অম্বা।

“দেখতে চাস ছেলেটাকে? অনেকটা বড়। ক্লাস এইটে না নাইনে পড়ে।”

“নাঃ!”

কেন যেন দেবারির অম্বাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর চুলে মুখ গুঁজতে ইচ্ছা হয় তখনই। অম্বা হাত বুলিয়ে দেয় ওর পিঠে আস্তে আস্তে। ভাঙাচোরা সব জুড়ে যাবে ঠিক। ভাবে ও। মুখে বলে, “ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।”

পাশের ঘর থেকে রাহুলের শিশুকণ্ঠের গান ভেসে আসে, “... আ ডিপ ব্রেথ! কজ এভরিথিং ইজ গন্না বি, অলরাইট!”

সূচিপত্র

ফকিরি সঙ্গীতবাসরে

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অলঙ্করণ - সৌমিক পাল
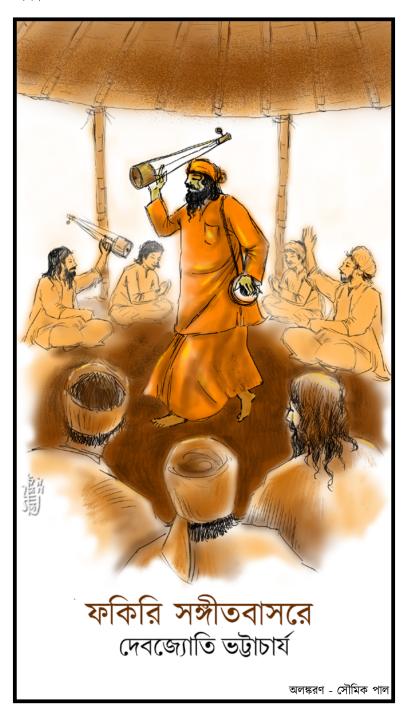
স্থান: টোপলা পরানপুর (নদিয়া) কাল: শরৎ ২০০৭ (কোজাগরী পূর্ণিমা)

স্বীকারোক্তি

লেখার শুরুতে দুটি কথা স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমটি অজ্ঞতা স্বীকার। লোকগানে বিশেষ কোনও পাণ্ডিত্য বা গায়নের অধিকার এই নগরপুষ্ট লেখকের গড়ে ওঠেনি। তার কারণ, এই সঙ্গীতধারা আমার রক্তে নেই। শুনতে ভালো লাগে, ভালো লাগে কদাচিৎ বিভিন্ন ধারার গায়ক বা সাধকদের সংস্পর্শে আসতে। মিষ্টান্নলোভী দরিদ্র মানুষ যেমন। রাজভোগ ও কমলাভোগের গুণগত পার্থক্য তার অভিজ্ঞতার বাইরে। খেতে পেলে জিভে ভালো লাগে দুটিই। স্বাদের তফাৎটিও ভাসা ভাসা সামান্য টের পাওয়া যায়, তবে ওই পর্যন্তই। মিষ্টান্নের মিষ্টস্বাদ জিভে টের পাই শুধু। শিক্ষিত ভাষায় তাকে যথোচিত মর্যাদায় ব্যাখ্যা করবার মত জিহ্বার ক্ষমতা আমার হয়নি; হবেও না সম্ভবত এই জীবনে।

দ্বিতীয়টি কৃতজ্ঞতা স্বীকার। বন্ধুবর সুব্রত বিশ্বাস, লোকগানে যাঁর চৈতন্য আশৈশব পুষ্ট হয়েছে। বাংলার এই ঐতিহ্যময় সঙ্গীতধারা- যা কিনা অগণিত সূক্ষ্মতর ধারার সম্মেলনে এক মহাস্রোত হয়ে বয় গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি চেতনায়, তাতে তাঁর জন্ম ও কর্মগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কল্যাণেই এক দুষ্প্রাপ্য সঙ্গীতবাসরে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তাঁকে এই লেখার শুরুতে কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাত্রা

চলুন, যাওয়া যাক তবে। কয়েকটিমাত্র দিনের ছুটি। তার সিংহভাগ গিয়েছে দূর্গাপূজার আনন্দ উৎসবে। কাল বাদে পরশু ফের কর্মস্থলে প্রস্থান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহুদূরে, আর্যাবর্তের শেষ সীমায় বিন্ধ্যের কাছে আমার প্রবাসের নগরীটিতে ফিরে যাব ফের। শেষ পর্বের গোছগাছ চলছে এমন সময় সুব্রতর ফোন এল- 'যাবেন নাকি? গানের আসর আছে নদীয়া মুর্শিদাবাদ সীমান্তে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে।'

বললাম, 'যাবো।'

গোছগাছ রইল পেছনে পড়ে। আমায় নিশিতে ডেকেছে। এ ডাকের

কাটান নেই। আরেক বন্ধু জ্যোতি গাঙ্গুলিও সঙ্গ নিয়েছেন। পদার্থবিদ এই অধ্যাপকটি আবার এপিস্টেমোলজি বা জ্ঞানতত্ত্বের জিজ্ঞাসু গবেষকও বটেন। লোকগানের আসরে তাঁর কৌতূহল খাতায় কলমে তত্ত্বগত। আর তত্ত্বলোভের খোলস ছাড়ালে আসল টান সেই একই— নতুন নতুন গান শোনবার লোভ—সেই গান, যা তৈরি হয় প্রাণের টানে। যে মাটিতে জন্ম নিই, বেড়ে উঠি, সেই মাটির থেকেই জন্ম নেয়া, গায়কের সহোদরপ্রতিম সেই গান।

নৈহাটি থেকে ট্রেনে চেপে কৃষ্ণনগর। পৌঁছোতে পৌঁছোতে দুপুর পেরিয়ে বিকেল। বাতাসে হালকা ঠাণ্ডাভাব আছে। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে বাসস্ট্যান্ড। সুব্রত অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। রিকশা থেকে নামতে না নামতেই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাসস্ট্যান্ডের ভেতরে। সেখানে নাজিরপুরগঞ্জের বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে ততক্ষণে। ভিড় ছিল। তারই মধ্যে অবশ্য মাফলার আর রুমাল বিছিয়ে জায়গাও করে রাখা ছিল তিনটে। আগে পিছে দুটো জানালার ধারে আমি আর জ্যোতি আর আমার পাশে সুব্রত।

বাস চলতে শুরু করে স্ট্যান্ডের ইটকাঠের আবর্জনাস্তুপ পেরোতেই দু'পাশে ছড়ানো কৃষিক্ষেত্র। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে পূর্বের গাছগাছালির রেখার মাথায়। জংধরা লালচে হলুদ রঙের সুবিশাল গোলক; কোনও এক অদৃশ্য সুতোর টানে ধীরে ধীরে মাথা জাগাচ্ছে দিগন্তরেখা থেকে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে।

এ অঞ্চলে সুব্রতর অনেক চেনা পরিচিতি। মাঝেমাঝেই তাই আমাদের কথাবার্তায় বাধা দেয় কোন সাদর সম্ভাষণ। প্রাকৃত উচ্চারণে কুশলবিনিময়, দু'চারটি স্থানীয় সংবাদের আদানপ্রদান। এহেন লৌকিকতার দাবী মেটাতে ব্যস্ত সুব্রতকে ছেড়ে একসময় জানালার দিকে মন দিই। চাঁদের আলোমাখা প্রান্তর ছুঁয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে বাস। তার জানালায় তীব্র হাওয়ার ধমক। আমার শরীরে তার হিমস্পর্শ আঙুলের সতত সঞ্চার —

নাজিরপুরগঞ্জ পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে সাড়ে সাতটার কাছাকাছি হয়ে গেল। আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল চন্দ্রালোকিত রাজপথ বেয়ে। এইবারে দ্বিতীয় একটি যানে চাপতে হবে। মোটরে চলা ভ্যানরিকশা। সুব্রতর চেনা একটি লোক গিয়েছে তার খোঁজে। সেই ফাঁকে একটা চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে ধূমায়িত গ্লাসে

চুমুক দিতে দিতে তার কাছে আসন্ন সঙ্গীতবাসরের একটা পরিচিতি পাওয়া গেল ।

বে-শরা সাধক ফকির পাঁচুউল্লা বিশ্বাসের দেহান্ত হয়েছে কিছুকাল আগে। আজ, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া বা বর্ষীর আয়োজন হয়েছে ফকিরের টোপলা পরানপুর গ্রামের বসতবাটিতে। আয়োজন করেছেন তাঁর পুত্র ফকির এনায়েতুল্লা বিশ্বাস। বলতে বলতেই সতর্ক গলায় ব্যাখ্যা দেয় সুব্রত— না না দাদা, পারলৌকিক ক্রিয়া বলতে আমরা যা বুঝি সে সব কিছু নয়। এ অন্যরকম ব্যাপার। গিয়ে দেখেন তো বুঝবেন।

কথায় কথায় সময় কাটে। দোকানের একপাশে চায়ের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে জ্যোতি গল্প জুড়েছে অন্য এক খরিদ্দারের সঙ্গে। তার পরিচিত একজন মানুষ—সম্ভবত তার কোন সহপাঠীই হবেন, তিনি নাজিরপুরগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সেরে বেরোবার পর আর কোন সন্ধান মেলেনি তাঁর। তাই আজ চলার পথের পাশে বন্ধুটির গ্রামের দেখা পেয়ে জ্যোতি তাঁর খোঁজে লেগেছে। অন্য খরিদ্দারটি, বোঝা যাচ্ছিল, তার বন্ধুটিকে চেনেন। থেকে থেকেই তাঁর আক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল — মাথাটা গেছে একেবারে। কী যে হয়ে গেল ছেলেটার! কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই থম হয়ে বসে থাকে কেবল। দাদার সংসারে খায়- -বড় ভালো ছেলে আছিল জানেন! বাপমায়ের আশাভরসার স্থল—কী যে হয়ে গেল—

বোঝা যাচ্ছিল, এই গ্রামের এক সম্ভাবনাময় তরুণ, দ্বিতীয় জীবনের সন্ধানে কক্ষপথ বদলে একদা শহরগামী হয়েছিল। শহর তাকে জড়পিণ্ডবত বানিয়ে ফের ছুঁড়ে দিয়েছে তার জন্মভূমিতে। এমনটা তো হবার কথা নয়! শহর তো চিরকাল গ্রামের মানবসমপদেই পুষ্ট হয়! তবে কেন এমন হলো!

এই সব ভাবনা, চিন্তা ও সংলাপ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না অবশ্য। আমাদের বাহন এসে গিয়েছে। তার সামনেটা মোটর সাইকেলের মত দেখতে, আর পেছনদিকটা আমাদের চেনাপরিচিত ভানরিকশা। আমরা উঠে বসতে ধক ধক করে গর্জে উঠল মোটরের ইঞ্জিন, দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ। তারপর, পথের পাশে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া ট্র্যাজেডি ও বান্ধবস্মৃতিকে পথের পাশেই বিসর্জন দিয়ে আমরা রওনা হয়ে গেলাম পাশ দিয়ে ঢুকে যাওয়া একটি গ্রাম্য পথে। ইট ও পাথরকুচির

শাসন কখনো টের না পাওয়া এই পথ এখনও অকলংক ও ফলত বড়ই স্বাধীনচিত্ত ও কিঞ্চিৎ দুর্গম। আমাদের সারথিও দেখা গেল সেই পথের মতই বেনিয়ম ও বে-পরোয়া। ফলত কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুই বেপরোয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশ জমে উঠল। ছুটতে ছুটতে মাঝেমাঝেই শূন্যে লাফিয়ে ওঠে গাড়ি। সারথি নির্বিকার মুখে গান জুড়েছেন। গাড়ির নিজস্ব সারভাইভাল ইনসটিংকটে তাঁর অটুট আস্থা রয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। সুব্রতরও তাই। আমরা দুই বহিরাগত কেবল ভ্যানের পাটাতন আঁকড়ে ধরে বসে ইষ্টনাম জপছিলাম। দু পাশে প্রাচীন বৃক্ষরাজদের ফাঁকে-ফাঁকে চন্দ্রালোকিত, ঘুমন্ত গ্রামগুলির শিলুয়ে দেখা যায় মাঝে মাঝে। মুসলমানপ্রধান এই অঞ্চলে কোজাগরীর নিশিজাগরণের লোক বেশি নেই।

বাতাসে ঠাণ্ডাভাব বাড়ছিল। সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত জানাল, কাছেই নদী। নদীয়ার প্রায় উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আমরা। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে জলঙ্গীর গতিপথ এই জেলার সীমা নির্ধারণ করেছে। অন্য পারে মুর্শিদাবাদ। এপারে, নদীর কাছাকাছিই আমাদের গন্তব্য, টোপলা পরানপুর গ্রাম।

কথা বলতে বলতেই মোটরের গর্জন স্তিমিত হয়ে এল। ঝিমিয়ে পড়েছে তার উজ্জ্বল চোখ। যাত্রা প্রায় শেষ। সামনে এগিয়ে গিয়েছে উঁচুনীচু পথ। সেই পথে চাঁদের আলোয় ইতিউতি লোকের আনাগোনা। সামনে বেশ খানিকটা দূরে মিটমিট করে কিছু বাতি জ্বলছিল। সেই দিকে ইশারা করে সুব্রত বলল, “ পা চালিয়ে চলেন, আসর বসবার আগে গিয়ে ভালো জায়গা ধরতে হবে। নইলে মুশকিল।"

আসর

বেশ ছড়ানো ছিটানো বাড়িটি। একপাশে টিনের চাল দেয়া পাকা ঘর। তার সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। সেখানে বাঁশের ওপর চট খাটিয়ে শেষ আশ্বিনের হিম আটকাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। বাড়ির সামনে মানুষজনের ছোট ছোট জটলা। দু-একটা অস্থায়ী দোকানও দেখা যায়। মূলত তেলেভাজা ও বাদামভাজার পসরা তাদের। লোকসমাগমের সন্ধান পেয়ে এসে জুটেছে বাড়ির সামনে। একটি মেলার বীজের অংকুরোদগম যেন হচ্ছে এখানে।

দোকানদারদের অতিক্রম করে বাড়ির বেড়ার গায়ে খানিকটা খোলা

অংশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসা গেল। ভেতরে হ্যাজাকের উজজ্জ্বল আলো তিনচারটি। চটের আচ্ছাদনের নীচে লোকসমাগম হয়েছে অনেক। তাঁদের মিলিত কথাবার্তার শব্দে গমগম করছে গোটা উঠোন। সুব্রতর চেনাপরিচিতির অভাব নেই দেখা গেল এই সঙ্গীতসমাগমে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই সকলের সাথে তার ভাব-ভালোবাসা আর কুশলের আদানপ্রদান চলে।

ভেতরে এসে দাঁড়াতে পা ধুইয়ে দিতে এগিয়ে এলেন একজন। হাঁ হাঁ করে উঠি আমি। আমার নাগরিক সংস্কৃতিতে অভ্যাগত অভ্যর্থনার এই পথটির সন্ধান জানা নেই যে! স্বাগতকর্তার অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কর্তব্যে অবিচল তিনি। পা ধোবার পর মুখের সামনে ঘুরিয়ে নিলেন জ্বলন্ত ধূপের শলা একগোছা। মৃদু মিষ্টি গন্ধ তার। প্রশ্ন করি, ধূপ কেন? উত্তরে হালকা বকুনি দিলেন বৃদ্ধ, 'ধুপ বলতে নাই বাবা। বলেন আগরবাতি।' পেছন থেকে মৃদু গলায় সুব্রত ধরতাই দেয়, 'আগরবাতি দিয়ে অতিথি অভ্যর্থনা সুফি সংস্কৃতির অঙ্গ। '

"কিন্তু আগরবাতি কেন? ফুল, চন্দন বা এমন অন্য কিছুও তো হতে পারত তার জায়গায়?" এইবারে আমাদের অভ্যর্থনাকারীটি নীরব। উত্তর দিতে নারাজ তিনি এ প্রশ্নের। নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের কোন এক গোপন জবাব হয়তো আছে এই প্রশ্নের, কিন্তু অনধিকারী বহিরাগতের কাছে সে জবাব দেয়া তাঁদের রীতিবিরুদ্ধ।

অবস্থার সামাল দিলেন কাছে দাঁড়ানো দ্বিতীয় একজন মানুষ। বললেন, 'ওতে মন পবিত্র হয় বাবা। বে-শরা ফকিরের রীতিনীতিই এইরকম।'

এনায়েতুল্লা ও তাঁর পিতা ফকির পাঁচুউল্লা বিশ্বাস, এঁরা বে-শরা বা শরিয়তের বিধান না মানা ফকির সমপ্রদায়ের সাধক। বাংলার বে-শরা অলোকপন্থী সাধকদের মধ্যে রয়েছেন ফকির ও আউলিয়া সমপ্রদায়। মূল বিশ্বাসের জায়গাটি এক রেখে ধর্মাচরণ পদ্ধতির নিজস্বতাই তফাৎ গড়ে দেয় ফকির ও আউলিয়ায়। মূল দর্শনগত তফাৎ ও রয়েছে অবশ্যই। তবে সেই তত্ত্বের দুনিয়ায় অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ। পাঁচুউল্লা বিশ্বাসের এই স্মরণসভাটিও আজ হচ্ছে ফকিরি মতেই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে আসরের মাঝখানে বসা গেল। মাটির ওপর ব্যবহারজীর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া প্লাস্টিক শিট পেতে বসবার আয়োজন।

দূরদূরান্তের নানা জায়গা থেকে ফকির, বাউলের সমাবেশ। পরিযায়ী মানুষের এই দলগুলির স্থায়ী ঠিকানা একটা থাকলেও পথেপথেই সময় কাটে বেশি। বাতাসে হিমস্পর্শ লাগল তো পায়ের তলায় সর্ষে। চলো হে আসাননগর, ঘোষপাড়া, কেন্দুবিল্ব কিংবা এমনই আরও কতো কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে... গান হবে— পথে পথে গান, আসরে আসরে বিনিদ্র দর্শকের সামনে আসন্ধ্যাপ্রভাত সঙ্গীতের আসর চলবে। বাংলার বাইরে বিভিন্ন বাংলাভাষী অঞ্চলেও তাঁদের অবাধ যাতায়াত। তেমনই বেশ কিছু দল, পরিক্রমার পথে আজ এইখানে এসে জড়ো হয়েছেন।

বিশুদ্ধ হিন্দু বা মুসলিম কোনও দলেরই তাঁরা নন। আবার তাঁদের ভাবনা ও আরাধনায় এই দুই বিশ্বাসেরই ছাপ। কোন জাতি তুমি? হিন্দু না মুসলমান, কোন পথে ঈশ্বরকে ডাকো? সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় দুটিমাত্র লাইনে

'ডাইনে বেদ বামে কোর-আন মাঝখানে ফকিরের বয়ান।

এই মাঝখানটি কিন্তু বড় সহজ কথা নয়। ঠিক কোন বিশ্বাসটির নিউক্লিয়াস অধিষ্ঠিত আছে দুই ধর্মের দুটি কূলের মধ্যে দিয়ে বহে যাওয়া এই আউল, বাউল, ফকির দরবেশহেন গুরুবাদি মরমীয়া সাধকদের বহুতর সাধনস্রোতে তার সন্ধান পেতে হলে সেই জলে গা ভাসাতে হবে তোমাকেও। কূলে দাঁড়িয়ে তার খোঁজ করলে নদী তার জবাব দেবে না। অনধিকারীর কাছে গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশে নিতান্তই অরাজি মরমীয়া সাধক। সেই অচিন দেশের খবর ধরা থাকবে সংকেতময় সঙ্গীতভাষায়। সাধক গাইবেন,

*তিনজনা সাত পান্থির উপরে / আধা পাচ্ছি আছে ধরা জানগা যা তারে' কিংবা রহস্য করে অজ্ঞেয়কে ব্যাখ্যা দেবেন এই বলে-

“যে লীলা ব্রহ্মাণ্ড পরে কী দিব তুলনা তার / রসিকজনা জানতে পারে অরসিকে চমৎকার।' অধিকার জন্মালে গুরুর হাত ধরে পরবর্তী প্রজন্মের মরমী আপনি বুঝে নেবেন সেই গোপন তত্ত্ব। নইলে, অন্ধকারেই রইলে! গান শুনে খুশি হয়ে ঘরে ফিরে যেও বাপু। বিনিময়ে গায়ক সাধকের গ্রাসাচ্ছাদনটুকুর সম্বল দিয়ে যেও।

একপাশ থেকে উত্তেজিত আলোচনার শব্দ আসছিল। সুদূর অসমে গান গাইতে গিয়ে কোন একটি সম্প্রদায়ের এক বাঁশরিয়া তরুণ দুর্ঘটনায়

মারা গেছেন। সম্প্রদায়ের সন্দেহ, দুর্ঘটনাটি প্রাকৃতিক নয়। মানুষের হাত আছে তাতে। উদ্দেশ্য, বাঁশি বাজিয়ে তার প্যালা পাওয়া সামান্য অর্থটুকুর দখল। যাঁর ওপর সন্দেহের আঙুল, তিনি ফিরে আসেননি এখনো। ফতোয়া জারি হয়েছে সেই মানুষটির বিরুদ্ধে। স্বভূমিতে ফেরবার সাহস তাঁর এখন নেই। আমাদের অন্যপাশে চারপাঁচজনের একটা ছোট দল এসে বসেছেন। সঙ্গে বাঁশি, লাউয়ের একতারা ও একজোড়া খঞ্জনি। মৃদু গলায় গানের শব্দ ভেসে আসছিল তাদের দিক থেকে।

এইভাবে সুরে ও সুরহীনতায়; আনন্দে ও বেদনায় ক্রমশই জমজমাট হয়ে উঠছিল সন্ধ্যার আসর। সভার ঠিক মাঝখানে চারটি কলাগাছের চারা পোঁতা হয়েছে। তাদের চারপাশ কাপড় দিয়ে ঘেরা। ভেতরে, জ্বলন্ত একটি তেলের প্রদীপের সামনে রাখা রয়েছে একটি পথ চলবার ছড়ি। পরলোকগত পাঁচুউল্লা ফকিরের চিহ্ন। আজকের স্মরণবাসরের কেন্দ্রবিন্দু ওই ছড়িটি। তাকে ঘিরেই গান তাকে ঘিরেই উৎসব।

কারা এঁরা? বাংলার ঘটমান ইতিহাসের ধারার বাইরে দাড়িয়ে অরূপের সাধনায় নিরত অলোকপন্থীর দল, গ্রামীণ বাংলার বুকে গানে গানে, ধর্ম-আচরণে, ছড়িয়ে যান ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার বীজ! সহজাত জাতিভেদপ্রবণ গ্রামবাংলার মানুষকে গানে গানে শিক্ষা দেন এই বলে,

'যায় না জাতির অহংকার / চক্ষু মুদলে সব আঁধার।'

আকারে-প্রকারে-খাদ্যে-ভাষায় পরিপূর্ণ বাঙালী এঁরা। অথচ কোথায় যেন একটা তফাৎ থেকে যায়। বহমান বাঙালি জীবনস্রোতের মধ্যে এঁরাও সামিল কিন্তু তেল যেমন জলে ফেলে দিলে জলেই থাকে কিন্তু তার সঙ্গে মেশে না, ঠিক তেমনভাবে। স্রোতের সঙ্গে চলেন, তবে স্রোতের মাথায় ভেসে ভেসে, তার সঙ্গে মিশে না গিয়ে।

ইতিহাসের ধারা

এই তফাতের উৎস খুঁজতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় আট শতাব্দী আগে। মধ্য এশিয়ার তীব্র রাজনৈতিক উত্থানপতনের অভিঘাতে তখন তুর্কি ভাষাভাষী উদ্বাস্তু ও ভাগ্যান্বেষীদের ঢল নেমেছে ইরান ও ভারতের দিকে। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ গোটা আর্যাবর্ত পার করে এসে পৌঁছোচ্ছিলেন সুদূর বঙ্গভূমি অবধি। এই যাযাবর

তুর্কির দল কখনও আসতো যুদ্ধবাজ নেতাদের সঙ্গে তলোয়ার হাতে, আবার কখনও বা কোন সুফি ধর্মগুরুর নেতৃত্বেও। একদিকে তখন তুর্কি তলোয়ারের ধার পরীক্ষিত হচ্ছে ভারতীয় শরীরে, আর তার পাশাপাশি একই সঙ্গে সুফি দর্শনও তার পথটি গড়ে নিচ্ছিল ভারতের মানুষের অন্তরমহলে।

এই সময়, ১২২১ সালে এসে বীরভূমের এক শিলালিপিতে দেখছি, এক সুফি ফকির সেখানে গড়ে তুলছেন একটি আস্তানা। সে আস্তানা কেবল ফকিরের নিজের জন্য নয়। তা হল একটি সুফি গোষ্ঠীরই বাসস্থল বা আহল ই সুফা। যে পাথরের পাটাতে লেখাটা রয়েছে তার উল্টোদিকে আবার রয়েছে একাদশ শতকের পাল শাসক নয়পালের এক সামন্তরাজার একটি লিপি। তাতে, এই অঞ্চলের বহুতর হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। তুর্কি তলোয়ারবাজ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের মাত্রই দেড় দশকের মাথায় হিন্দুমন্দিরের বর্ণনাবিজড়িত প্রস্তরপট্টের অন্যপিঠে আহল ই সুফা-র বিবরণীর অক্ষরপাত, বাংলার ইতিহাসের এক ক্রান্তিমুহূর্তের ইঙ্গিত বহন করে আনে। সেই সঙ্গে উপরিউল্লিখিত দুই শ্রেণীর তুর্কি অভিবাসীর বাংলায় এসে পৌঁছোনর খবরও দেয়।

তারপর ধীরে ধীরে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন সুফি সাধকের দল। ১৩৪৫ সালে, দাক্ষিণাত্য থেকে চীন যাবার পথে · বাংলার মোহনার কাছে পৌঁছে উত্তরদিকে বেঁকে সূর্যা ও মেঘনা নদী উজিয়ে ইবন বতুতা সিলেটে এসে পৌঁছেছিলেন এমনই এক সাধকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ফকির শা জালাল। পীর আহমদ ইয়াসবীর আশীর্বাদ নিয়ে ভাগ্যানুসন্ধানে ভারতে আসা এই মানুষটি দলবল নিয়ে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর পূর্বাঞ্চলে ঢুকে আসতে আসতে একসময় এসে পৌঁছেছিলেন সিলেটে। এইখানের জল-হাওয়া-মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে থিতু হল তাঁর দলবল। স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করে সংসার পাতল এই ভূমিতেই।

পায়ের নিচে সূর্যা উপত্যকার সমতলভূমিতে হিন্দু ধর্মের বিস্তার থাকলেও সিলেটের এই পাহাড়ি এলাকার আদিম জনজাতির সঙ্গে সে সময় সঠিক অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের পরিচিতি ততটা ছিল না। সেখানে রাজত্ব করত জাদুবিদ্যা ও অকাল্টের প্রতি অগাধ নির্ভরতা। শা জালাল সেখানে প্রথম নিয়ে এলেন একটি সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস। ফলে সেই ধর্মবিশ্বাসের বীজ এখানে ছড়াতে তাঁর বিশেষ সমস্যা হয়নি। স্থানীয় আদিম জনজাতিয় বাসিন্দাদের মধ্যে সহজেই

ছড়িয়ে গিয়েছিল ইসলাম ধর্ম।

ইবন বতুতা, সিলেট পাহাড়ে শা জালালের গুহা আবাসে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ফকির তখন বৃদ্ধ। সাক্ষাতকারটি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই বহুদর্শী পর্যটককে। তাঁর ভাষায়,

'এই বহুদর্শী শেখ এক অন্যতম মহান সাধু ও এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জাদুবিদ্যায় এঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। তাছাড়াও বহুতর মহত কর্মের জন্য সমাজে সুনামও রয়েছে।'

একদিকে যেমন এই অভিবাসী সন্তেরা তাঁদের নিজস্ব ধর্মের বীজ ছড়াচ্ছিলেন এ দেশের মাটিতে; অন্যদিকে আবার এই দেশের নানা বিশ্বাস প্রভাবিত করছিল তাঁদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীকেও। মুসলমান এই ফকিরদের নিজস্ব বিশ্বাসের মধ্যেও মিস্টিসিজমের একটা বহতা ধারা বর্তমান থাকায় তাঁরা স্থানীয় জাদু ও তন্ত্রচর্চার বিভিন্ন আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। এই সব স্থানীয় আচার ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে জায়গাও করে নিচ্ছিল তাঁদের ধর্ম-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসে। শুধু কামরূপঘনিষ্ঠ উত্তরবাংলা বা সিলেট এলাকাই নয়, বাকি বাংলাতেও, সদ্যসমাপ্ত সেনযুগের তান্ত্রিক আচার আচরণ ও বৈষ্ণবীয় দর্শনের গভীর প্রভাব তখনও বর্তমান। এদেশে সদ্য শেকড় ছড়াতে থাকা মুসলমান মিস্টিকদের ওপরে এই প্রভাবও যথেষ্টই কাজ করেছিলো। সম্ভবত সে কারণেই তুর্কিবিজয়ের অল্প কিছুকালের ভেতরেই তন্ত্রসম্বন্ধীয় পুঁথি 'অমৃতকুণ্ড' আরবি ও পারসিক ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে এই অলোকপন্থী সাধকদের মধ্যে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফকিরি বিশ্বাসধারায় কেমন করে এ দেশীয় বিশ্বাসের শেকড় ঢুকে গিয়েছিল তার একটা প্রমাণ এই বইটি। এর প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে, ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ বস্তুর সঙ্গে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের একটা তুলনার কথা বর্ণিত হয়েছে। মরমীয়া সাধকের দেহতত্ত্বের গানে যেন সেই বর্ণনারই একটি প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

এই প্রমাণটি বাদেও, সুফি বিশ্বাসের ওপরে সমকালীন এ দেশীয় দর্শনের প্রভাব যে কত গভীরভাবে আসতে শুরু করেছিল তার নিদর্শন মিলছে অমৃতকুণ্ডের পারসিক অনুবাদ বাহার আল হায়াতের একটি সংস্করণের মুখবন্ধে। সেখানে লেখক এক কাল্পনিক ভ্রমণকথায় লিখছেন, দুই সমুদ্র (প্রকৃতি ও আত্মা) পেরিয়ে, সাত পর্বত অতিক্রম করে, চার গিরিপথের শেষে, তিনটি বিপদসংকুল অঞ্চল পার হয়ে

ও পিঁপড়ের চোখের চেয়েও সরু এক পথে চলে তিনি যে দেশে পৌঁছোলেন সে দেশের মন্ত্রী ও রাজাকে তিনি আবিষ্কার করলেন নিজেরই মধ্যে। সাধনার বিভিন্ন কঠিন ধাপ পেরিয়ে, মায়ার আবরণ অতিক্রম করে অবশেষে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবার এই যে যাত্রা, এতে ভারতীয় ভাগবত সাধনমার্গের ক্রমবর্ধমান প্রভাবটি নজর এড়িয়ে যায় না।

সিলেটের গিরিকন্দর ছেড়ে এবারে আসা যাক নগর বাংলায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি দেখছি, দেবকোট, লক্ষণাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক কেন্দ্রে সুরাবর্দি, চিশতি কিংবা ফিরদৌসি ঘরানার সুফিসন্তরা এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। এই এলাকাগুলিতেও সুফিদের রাজনৈতিক ভূমিকাটি নির্ধারিত হয়েছিল সমসাময়িক পারসিক দুনিয়ার ঢঙয়েই। সে ঢঙ প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে। ব্রাহ্মণ যেমন ছিলেন মরজগতে ঈশ্বরের প্রতিভূ, রাজা তাঁদের পায়ে মাথা ঠেকাতেন, ঠিক তেমনই সুফি দর্শনের মূলসুরটিও ছিল এই যে, দিনদুনিয়ার পালক হিসেবেই সন্তদের সৃষ্টি করেছেন দিনদুনিয়ার মালিক। শাস্ত্রজীবী রাজ্যশাসক অতএব তাঁর বশম্বদ হয়ে থাকবেন এটাই কাম্য। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম যুগের ইতিহাসের পাতায় বারংবার এ-ও দেখি যে, কার কপালে রাজতখত রয়েছে তার ভবিষ্যদ্বাণী করে দিচ্ছেন কোন অলোকপন্থী সাধক। এই ভবিষ্যদর্শন আসলে ছদ্মবেশী ভবিষ্যনির্ধারণই ছিল হয়ত বা! সাধক তাঁর বিলায়ত বা মাটির পৃথিবীর বাসস্থানটির ভবিষ্যৎ শাসনভার কার কাছে যাবে তার নির্ধারণ করে দিলেন ভবিষ্যদর্শনের অভিনয়টির মাধ্যমে!

একটা উদাহরণ দেয়া যাক এইখানে। ত্রয়োদশ শতকের ইতিহাসবিদ মিনহাজ অল সিরাজের লক্ষণাবতী ভ্রমণকালীন সংগ্রহ করা গল্প এটি-

আফগানিস্তানের পথে চলতে চলতে গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ দু'জন দরবেশের দেখা পেয়েছিলেন। ক্ষুধার্ত দরবেশদের পেট ভরে খাওয়ালেন তিনি। খেয়ে খুশি হয়ে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, ' হিন্দুস্তানের পূর্বপ্রান্তে মুসলমান ধর্মের প্রভাবসীমার একেবারে সীমান্তবর্তী এলাকার শাসনভার আমরা তোমাকে দিলাম। যাও গিয়ে নিজের অধিকার ভোগ করো।' অতএব গিয়াসুদ্দিন সেই মতো রওনা দিলেন। হিন্দুস্তানের পূর্বপ্রান্তে, মানে বাংলায় এসে সেই মতো রাজত্বও গড়লেন একসময়।

এই গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজের আসল নাম হল হুসামুদ্দিন ইওয়াজ

খলজি। বখতিয়ার খলজির এই সহযোদ্ধা, বখতিয়ারের মৃত্যুর দু'বছর পরে ১২০৮ সালে বাংলার সুলতানের গদি দখল করেন। ১২১০ সালে, কুতুবউদ্দিন আইবকের মদতপুষ্ট বখতিয়ারের অপর সহযোদ্ধা (মতান্তরে বখতিয়ারের হত্যাকারী) আলি মর্দান দিল্লী থেকে বাংলায় ফিরলে দেবকোটের গদি ছাড়তে হয় হুসামুদ্দিনকে। ১২১২ সালে আলি মর্দান খুন হয়ে যান। এইবার হুসামুদ্দিন খলজি ফের দখল করে নেন বাংলার সিংহাসন। সুলতান হয়ে তিনি নতুন নাম নিলেন গিয়াসুদ্দিন।

এহেন বারংবার ভাগ্যপরিবর্তনের অনিশ্চয়তাকে দূর করে চঞ্চলমতি রাজলক্ষ্মীকে নিজের অন্তঃপুরে বন্ধ করবার জন্যই কি তবে তাঁর এই সন্তদের থেকে রাজ্যাধিকারপ্রাপ্তির কাহিনী প্রচার? হতে পারে। না-ও হতে পারে। কিন্তু ঘটনা হল, এরপর দেড় দশক ধরে নিষ্কন্টক রাজত্ব করেছিলেন তিনি। মিনহাজ অল সিরাজের গল্প কতটা আক্ষরিক সত্যি সে বিচারে না গিয়েও একটা কথা নির্দ্বিধায় বলে ফেলা যায়— তা হল, রাজতখতকে অটুট করবার জন্য প্রথমদিককার তুর্কি শাসকের অটুট ভরসা ছিল সুফি সন্তদের থেকে সে ব্যাপারে আশ্বাস পাওয়া বা আশ্বাস পেয়েছেন এই সংবাদটি জনমধ্যে প্রচারে।

চলে আসা যাক এক শতাব্দী পরে, চতুর্দশ শতকে। তুর্কি শাসন তখন বেশ ভালো করে শেকড় ছড়িয়ে বসেছে বাংলার বুকে। এই সময়, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছে শিক্ষান্তে, আইনা-ই-হিন্দুস্তান এই উপাধি নিয়ে ১৩২৫ সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ে জন্মভূমি বাংলায় ফিরে আসেন ফকির আখি সিরাজ-অল-দিন। রাজা-মন্ত্রীর দুনিয়ার দিকে পা বাড়ান নি এই সাধক। কিন্তু তাঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী শেখ আলা-আল হক, বাংলার রাজনীতিতে ঘটনাচক্রে এক প্রধান ভূমিকা নিয়ে বসেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানবংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-কে নিজের শিষ্য ও আশীর্বাদধন্য বলে গ্রহন করেন তিনি। দিল্লীতে তখন তুঘলকি রাজত্বে কিছু টালমাটাল দশা চলছে। এই সময়, নিকটবর্তী সাতগার তুঘলকি প্রদেশপাল মারা যেতে ইলিয়াস শা সেই সুযোগটা নিয়ে নেন। ১৩৪২ সালে পাণ্ডুয়ার শাসক আলি শা-কে হত্যা করে স্বাধীন রাজত্ব গড়লেন তিনি। ওই বছরেই নিজের নামাংকিত মুদ্রা বের করলেন পাণ্ডুয়ার টাঁকশাল থেকে।

সিংহাসনে আরোহনের বছরটিতে ইলিয়াস শা দক্ষিণবঙ্গে একটি মসজিদ গড়েন। সেটি তিনি উৎসর্গ করেন গুরু আলা-আল হক-কে। এর উৎসগলিপিতে দেখা যাচ্ছে আলা-আল হক-এর প্রতি নতুন

সুলতানের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রকাশ। আলা-আল হকের আশ্রমটি এর পর হয়ে ওঠে রাজপ্রাসাদের বাইরে ইলিয়াস শাহী জমানার এক স্বাধীন শক্তিকেন্দ্র। সেই শক্তির উৎস ছিল ফকিরের বিপুল ধনসম্পত্তি। এই সম্পত্তির উৎস ছিল রাজত্বের ধনী মানুষের দান এবং তা ব্যয় হত দরিদ্র মানুষকে দান করে। এইভাবে, আলা-আল হকের আশ্রমটি সাম্রাজ্যের এক প্রধান অর্থ পুনর্বন্টন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে। একদিকে সুলতান আর অন্যদিকে সাধারণ প্রজা- এই দুয়েরই আস্থা ও স্বার্থের রক্ষক হিসেবে এইভাবেই মুকুটহীন সুলতানের গদিতে আসীন হয়েছিলেন রাজফকির আলা- আল হক।

অলোকপন্থীদের ক্ষমতা গোটা ইলিয়াসশাহী জমানাতেই অটুট ছিল। ইলিয়াস শাহের নাতি গিয়াসুদ্দিন আজম শা-র আমলে এসে আরও একটু উদাহরণ দেখছি এই ক্ষমতার। সুফি সন্ত মুজফফর সামশ বলকি তখন চট্টগ্রাম থেকে মক্কা যাবার জাহাজ ধরবার রাজঅনুমতির জন্য পাণ্ডুয়ায় এসে কিছুদিনের জন্য রয়েছেন। এই সময় গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সামান্য কিছুদিনের অতিথি, যিনি আবার সুলতানেরই অনুমতি ভিক্ষা করতে এসেছেন রাজধানীতে, তিনি স্বয়ং সুলতানকে কী ভাষায় চিঠি লিখছেন দেখুন— আমার চিঠিপত্রগুলো রয়েছে আবদুল মালিকের কাছে। খুঁজে পেলে তার অনুমতি নিয়ে তুমি সেগুলো পড়তে পারো পুত্র। পড়লে পরে আমার অন্তর্লোকের কিছু খবর পাবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারো কাছে তা প্রকাশ করা তোমার পক্ষে সমীচীন হবে না।'

একজন রাজঅনুমতিপ্রার্থী অলোকপন্থী ফকিরের তবে অতি সামান্য পরিচয়েও স্বয়ং সুলতানকে পুত্র সম্বোধন করে নির্দেশ ও উপদেশ দেবার অধিকার ছিল সেই সময়ে। শাসকের ওপর সন্তের প্রভাবের এই উদাহরণটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তাই।

রাজতন্ত্রের ওপর ফকিরদের এই গভীর প্রভাব প্রথম ঘা খেল রাজা গণেশের আমলে এসে। ইলিয়াস শাহী জমানাকে উচ্ছেদ করে সিংহাসনে এসেছিলেন ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিন। ১৪১৫ সালে তিনি নিহত হলে আজম শা-র অমাত্য ও ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশ সেই সুযোগে ক্ষমতা দখল করে হিন্দু অধিকার স্থাপন করলেন বাংলার বুকে। শুরু হল প্রভাবশালী ফকিরদের ডানা ছাঁটবার কাজ। সে সময় বাংলার সুফিকুলের প্রধান ছিলেন আলা-আল হকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নূর কুতব ই আলম। তাঁর পুত্র শেখ আনোয়ারকে গণেশ পাণ্ডুয়া থেকে নির্বাসন দিলেন

সোনারগাঁয়ে। কুতব ই আলম কিন্তু দমবার পাত্র নন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কির কাছে চিঠি গেল তাঁর— দীর্ঘ তিন শতাব্দী বাদে সপ্ত আকাশের পারের ইসলামের দেশ বাংলা, অবিশ্বাসী কাফিরদের দখলে এসেছে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা আজ বহিষ্কৃত— রাজা গণেশের তোলা অবিশ্বাসের ঝড়ে নিভে গিয়েছে ইসলামের প্রদীপ- অতএব, সসৈন্যে এসে অবিশ্বাসীর হাত থেকে রক্ষা করুন ইসলামকে। ধর্মের নামে এই আবেদন অস্বীকার করতে পারলেন না শার্কি। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে সমুচিত শিক্ষা দিলেন গণেশকে। তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামে দিক্ষিত করে জালালুদ্দিন নাম দিয়ে সিংহাসনে বসালেন।

শার্কি চলে যাবার পর গণেশ ফের ছেলেকে নিজের ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন বটে; কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে যদু ফের ফিরে গিয়েছিলেন মুসলমান ধর্মবিশ্বাসে। সপুত্র শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন কুতব ই আলমের। এবং সেই পথেই বাংলায় ইসলামী শাসন ফিরে এসেছিল ফের, তবে বিচিত্রগতি ইতিহাসের সেইসব উত্থানপতন এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। অতএব সেইদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমরা ফের ফিরে আসব কুতব ই আলমের কাছে।

জনসমক্ষে ইসলামের রক্ষার জন্য একদিকে যখন পড়শি দেশের সৈন্য ডেকে পাঠাচ্ছেন তিনি, ব্যাক্তিগত জগতে কিন্তু তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এক সুগভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সেই বদলের ইঙ্গিত পাচ্ছি নির্বাসিত পুত্রকে এই সময়ে লেখা তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে। তিনি লিখছেন, 'ইসলামের রাজত্ব নষ্ট হল। বিশ্বাস ও ভজনা করে বিশ্বাসীদের কোন লাভ হল না, কাফিরদের অবিশ্বাসও তাদের ওপর ডেকে আনল না কোন শাস্তি। তার মানে বিশ্বাস, আরাধনা কিংবা অবিশ্বাস, কোনটাতেই তাঁর কিছু যায় আসে না! হায় —

বক্তব্যটি থেকে বাংলার সুফি সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী 'ইন্টরেস্টেড ও ইনভলভড' ঈশ্বরের জায়গায় এক নৈর্ব্যক্তিক ও উদাসীন সর্বশক্তিমান চরিত্র হিসেবে ঈশ্বরকে দেখতে শুরু করবার মধ্যেই রয়েছে সেই ইঙ্গিতের স্বাক্ষর। এই ঈশ্বর রাজনৈতিক দুনিয়ায় কোন সাহায্যে আসবার নন। অতএব বলা যায়, এই বিন্দুটিতেই অঙ্কুরিত হল রাজবৃত্ত থেকে বাংলার অলোকপন্থীদের দূরে সরে যাওয়ার বীজটি।

এর পর থেকেই দেখছি বাংলার ইসলাম নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দুনিয়ায় ফকিরদের প্রভাব দ্রুত কমে আসছে।

তার দুটি পরস্পর পরিপূরক কারণ মিলছে। এবারে সেই দুটি কারণকে একটু কাছ থেকে দেখা যাক-

প্রথমটি হল বাংলার রাজবৃত্তে এক গভীর জাতিগত পরিবর্তন। রাজা গণেশের সময় থেকেই বাংলার মসনদে অ-তুর্কি মুসলমানদের শাসন শুরু হয়। ১৪৫২ থেকে ১৪৮৭ সাল অবধি দ্বিতীয় ইলিয়াসশাহী জমানার ৩৫ বছর বাদ দিলে গণেশের থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের বাংলার স্বাধীন কিংবা দিল্লীর অধীন মুসলিম শাসকরা ছিলেন স্থানীয় ধর্মান্তরিত হিন্দু (গণেশের বংশধরেরা), হাবশি, আরব বংশোদ্ভূত (হুসেন শাহী জমানা), আফগান অথবা মুঘল। তুর্কি সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত সুফি ফকিরেরা অ-তুর্কি শাসকদের আমলে রাজশক্তির ওপরে সেই তুর্কি জমানার মত নিয়ন্ত্রণ যে খাটাতে পারবেন না সে তো বলাই বাহুল্য। তবে, জনমানসে সুফি সাধকদের প্রভাব অবশ্য অটুট ছিল। গোষ্ঠীমানব এক অন্ধ শক্তি। ব্যক্তি মানুষের তুলনায় তার জাড্য অনেক বেশি। তাই ব্যক্তিমানুষ সহজেই দল বদলাতে পারলেও গোষ্ঠীমানব একবার যাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসায়, তাঁকে সেখান থেকে সরাতে সময় তার ব্যক্তিমানুষের চেয়ে অনেকটাই বেশি লাগে। কাজেই রাজশক্তি সুফি আনুগত্য বিসর্জন দিলেও সুফিরা তখনও জনতার শ্রদ্ধার বলে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি বটে। ফলে তুর্কি পরবর্তী মুসলমান যুগে এসে দেখছি, রাজশক্তিকে, অন্তত বহিরঙ্গে আনুগত্য বজায় রেখে চলতে হয়েছে এই আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতি। ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, যদু ওরফে জালালুদ্দিন থেকে শুরু হয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী বংশ শেষ হওয়া অবধি সুলতানরা পুরুষানুক্রমে আলা আল হকের শিষ্যত্ব নিচ্ছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ নাগাদ দেখা যাচ্ছে, কুতব ই আলমের সমাধি প্রায় এক জাতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। হুসেন শা সেখানে আসতেন বার্ষিক তীর্থদর্শনে। তবে ওপর ওপর শ্রদ্ধাটা বজায় থাকলেও দেশের রাজনীতি কিংবা অর্থনীতিতে আর সুফিরা আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন না তখন। রাজাদের ভাগ্যনিয়ন্তার জায়গা থেকে সরে এসে, রাজবৃত্ত ছেড়ে, তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে ধূলোমাটির পথে, জন-অরণ্যের অভিমুখে।

রাজশক্তির ওপর প্রভাব কমবার দ্বিতীয় কারণটি ছিল ফকিরদের ঈশ্বরবিশ্বাসের ঢঙয়ে এক গভীর দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন । ধীরে ধীরে তাঁরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করছিলেন স্থানীয় ভাষা, আচার, সংস্কৃতি

ও ধর্মবিশ্বাসকে; তারপর নিজস্ব বিশ্বাসের জারকরসে তাকে আত্তীকরণ করে গড়ে তুলছিলেন এক সঙ্গীত ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারা। বদলটার এক কালানুক্রমিক ছবি দেখা যাবে সুফি সাধকদের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস থেকে। পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে কুতব আলমের শার্কিকে লেখা চিঠিতে যেখানে দেখেছিলাম তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের স্পর্শ, সেখানে এক শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ শতকে শুরুতে আবার দেখা যাচ্ছে অলোকপন্থী ফকির সাধকের হাত দিয়ে বার হচ্ছে জ্ঞানপ্রদীপ', 'জ্ঞানচৌতিশা' ও ‘যোগকালান্দর'-এর মত কাব্য। তার পরের শতকে শেখচাঁদ লিখলেন 'হর-গৌরী সংবাদ। এই সময়েই লেখা হল। আবদুল হাকিমের ‘চারি মকাম ভেদ'। অষ্টাদশ শতকে এসে লেখা হল আলি রাজার 'আগম' ও 'জ্ঞানসাগর'। প্রাচীন আর্য দর্শনের ধারা থেকে শুরু হয়ে হিন্দু তান্ত্রিক বিশ্বাসের দেহভিত্তিক সাধনার ছাপ ধীরে ধীরে ধরা পড়ছিল এই কাব্যগুলিতে। এর দুটো উদাহরণ দেবো। প্রথমত, ১৪৯৮তে লেখা শেখ জাহিদের ‘আদ্য পরিচয়'-এর কথা। জাহিদ বলছেন, শুরুতে ছিল কেবলই শূন্য। তারপর শূন্য থেকে সৃষ্ট হলেন ঈশ্বর ও তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্টি হল বিশ্ব। একই বইতে তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য, 'দেহ'ই হল সব সত্যের মূল কথা। অথবা, পূর্বোল্লিখিত যোগকালান্দর কাব্যটির কথাই ধরুন। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মরমী কবি মুর্তজার রচনা এটি। এর মূল কথাটি হল, মানবদেহই হচ্ছে পরমাত্মার আবাস। যোগসাধন ও আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়েই জীবাত্মা সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই সাধনের জন্য যে চারটে মূলতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা হল দেহ, বোধি, শক্তি ও নেতি বা যথাক্রমে নাসাৎ, মালাকাৎ, জাবারাৎ, ও লাহা। পরিবর্তিত এই বিশ্বাসধারা রিয়ালিজমের জমানা ছেড়ে মিস্টিসিজমের পথে রওয়ানা দিয়েছে। তার ঈশ্বরও বরদান ও দণ্ডদানের সহজ পথ ছেড়ে ক্রমশ হয়ে উঠছেন অবাংমানসগোচর অস্তিত্ব। এই ঈশ্বরের সাধক রাজনীতির কাদাজলে মুখ গুঁজে থাকতে পারবেন না। তাঁর উড়াল এর বহু উঁচুতে, ভাবরাজ্যের আকাশমার্গে। বিশ্বাসের দুনিয়ায় এই সুগভীর পরিবর্তনও বাংলার সুফি সাধকদের ক্রমশই রাজবৃত্ত থেকে আরও বেশি দূরে ঠেলে দিচ্ছিল ।

ওপরে বর্ণিত এই দুটি পরিপূরক কারণের মিলিত প্রভাব বাংলার অলোকপন্থী সাধককে ইসলামী রাজবৃত্তের ঘনিষ্ঠতা থেকে সরিয়ে আনল ধুলোমাটির পথে, বাংলার সাধারণ মানুষের একেবারে কাছে। রাজনিয়ন্ত্রক এক ইসলামনির্ভর ধর্মীয় পন্থা, ইসলামের রক্ষার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতেও যে দ্বিধা করত না এককালে, সে এইবারে বিবর্তিত হল এক উদাসী মিস্টিক বিশ্বাসের ধারায়। হিন্দুধর্মও আর

কাফিরের ধর্ম রইল না তার চোখে। তার দর্শনকে সে নিজের আত্মাতেও ধরল।

এই সাধকের দলের প্রতি রাজশক্তির যেটুকু ভক্তিভাব ছিল তার পরিপূর্ণ অবসান ঘটল বৃটিশ যুগের সূচনায়। আঠারো শতকের শেষাশেষি এসে দেখছি বাংলার মরমীয়া সাধকের দল সম্পূর্ণ যোগাযোগ হারিয়েছেন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে। সমুদ্রপার থেকে আসা ফিরঙ্গীরা তখন অস্ত্রের জোরে দেশের কর্তৃত্ব তুলে নিচ্ছে নিজের হাতে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে নতুন ধর্মের বই হাতে নব্য পুরোহিতের দল। ইতিহাস ফের নিজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। নতুন সেই অধ্যায়ে, আগের অধ্যায়ের রাজমূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে আস্তাকুঁড়ে। তাঁদের উপদেষ্টা ও ধর্মগুরুদেরও অতএব আর কোনও মূল্য নেই দেশের নতুন মালিকদের কাছে।

রাজসান্নিধ্যের উত্তুঙ্গ অবস্থান থেকে সুদীর্ঘ এক কালখণ্ড ধরে যাত্রা করে এইবারে তাঁদের অস্তিত্বের ধারা জনসমুদ্রের মোহনায় এসে উপস্থিত। অজস্র শাখা উপশাখায় বিভক্ত, বহু স্থানীয় বিশ্বাস-আচার-ভাষারীতিতে পুষ্ট মরমীয়া সাধনধারা এইবারে মিশে যাচ্ছে গ্রামবাংলার জীবনসমুদ্রে।

তবু বহিরঙ্গে আদ্যন্ত বাঙালী হয়েও এঁদের অন্তরঙ্গে যেহেতু ধরা থাকে এক ভিনদেশীয় উৎসের জিন, তারই প্রভাবে তাই এঁরা কোথায় যেন একটু আলাদা, বাঙালি জীবনস্রোতের মধ্যে সামিল হয়েও জলের মধ্যে মেশা তেলের মতোই, স্রোতের সঙ্গেই চলেন, তবে স্রোতের মাথায় ভেসে ভেসে, তার সঙ্গে মিশে না গিয়ে।

অতঃপর সুরসন্ধ্যা

তত্ত্বকথা বরং থাক এবারে। চলুন ফিরে যাই আমাদের গানের আসরে। ধামা হাতে ভরা আসর ঘুরতে ঘুরতে এতক্ষণে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কিঞ্চিৎ জলযোগের বন্দোবস্ত। মুড়ি, বাতাসা ও একটি করে কলা। তাদের আচারবিধি অনুযায়ী এই আহার্যের জন্য পাত্র সংগ্রহ করতে হবে অতিথিকেই। গায়ের পাতলা চাদরের কোণাটা অতএব পেতে দিই সামনে। জ্যোতি তার পাঞ্জাবির নিচের অংশটা বাড়িয়ে ধরেছে। সুব্রতর তার ব্যাগ থেকে বের করে এনেছে একখণ্ড খবরের কাগজ। সে তৈরি হয়েই এসেছিল।

খাবার দিয়ে বৃদ্ধ পেছন ঘুরতেই কাঁধে সুব্রতর স্পর্শ পেলাম। মৃদু গলায় সে জানাল, খেতে শুরু করবার আগে একটু অপেক্ষা করা প্রয়োজন। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, সামনে খাবার নিয়ে প্রত্যেকেই নি:শব্দে কীসের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, প্রয়াত ফকিরের যষ্টিটির সামনে এসে বসেছেন গম্ভীর চেহারার, চশমা পরিহিত একজন মধ্যবয়সি মানুষ। পরিচিত অতিথিদের তাঁর প্রতি সম্বোধন থেকেই জানা গেল, তিনি এনায়েতুল্লা বিশ্বাস। পূর্বজের স্মৃতিচিহ্নের সামনে সামান্য আহার্যের পাত্রটি নিয়ে বসে পাত্রে হাত ছুঁইয়ে তিনি এইবারে বলে উঠলেন, 'আল্লা আলেক।'

সহজ কথা। ঈশ্বর রাজা নন, মালিক নন, তিনি আমার কাছের জন। আমার প্রিয়জন। সমস্ত সভা এইবারে একযোগে উচ্চারণ করল সেই মন্ত্র- 'আল্লা আলেক — তারপর, ঈশ্বর যে কাছের জন সেই শ্রেষ্ঠতম সত্যটিকে এইভাবে আরও একটিবার স্মরণ করে ও করিয়ে দিয়ে সকলে ফলারে মন দিলেন।

আহারান্তে সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সূচনা হল এনায়েতুল্লার প্রার্থনাসঙ্গীত দিয়ে। হাতদুটি কানের লতিতে স্পর্শ করবার মাধ্যমে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন গায়ক, নিজের গুরু কিংবা ঈশ্বরের কাছে— আগামী সঙ্গীত পরিবেশনে ভুলত্রুটি যদি কিছু করে থাকি তবে নিজগুণে ক্ষমা করে নিও প্রভু। তারপর, কোন ভূমিকা ছাড়াই গানে ঢুকে এলেন সরাসরি-

নয়ন ফিরাও, রূপ দেখি/ দেখি-হে দয়াল বন্ধু। / নয়ন ফিরাও রূপ দেখি / এ পারে সে পারে নদী / না জানি সাঁতার হস্ত ধরি করো পার / আমি অধম গুণাগার / এপারে সেপারে নদী / উথলিছে ঢেউ / কাকুতি মিনতি করি / সঙ্গে নাই কেউ—

লালনশিষ্য পাঞ্জু শা রচিত এই এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের গান আসরটির মূল সুর বেঁধে দিয়ে গেল। এরপর একে একে আসর নিতে শুরু করলেন বিভিন্ন অতিথি গায়ক শিল্পীর দল। সেই যষ্টিটির সামনে এসে সামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, তারপর সরাসরি গানে ঢুকে যাওয়া। পদকর্তার কখনও হিন্দু নাম, কখনও বা মুসলমান নাম। গানের ভাষা ও চরিত্রও বদলে যাচ্ছিল মুহুর্মুহু। এক সুবিশাল ক্যালিডোস্কোপের কাচে চোখ রেখেছি যেন। এক একটি ধাক্কায় বদলে যাচ্ছে তার ভেতরের প্যাটার্নগুলি, গড়ে উঠছে নতুন নতুন নকশা, নতুন নতুন বর্ণচ্ছটা।

কখনও ভারী মোটা কণ্ঠে ফুলবাশউদ্দিনের সহজ মানবধর্মী পদ গাইছেন কেউ-

যায় না জাতির অহংকার / চক্ষু মুদলে সব আঁধার / এই জগন্নাথের চণ্ডালের হাতে /ছত্রিশ জাতে খাই এবার।

আবার পরমুহূর্তেই অন্য কোন তীক্ষ্ণ, তরুণ ও তেজবান গলায়, জীতেন্দ্রর সাংকেতিক পদের রহস্যময় ইঙ্গিতধর্মী শব্দগুলি ছড়িয়ে যায় রাত্রির বাতাসে-

কী তামাশা দেখলাম গিয়া রে / সাপের মাথায় ব্যাঙের নৃত্য / ময়ূর কেমন নাচে—

অথবা পুষ্পের রূপক-এ কোন অজ্ঞেয় সাধনতত্ত্বের আভাস আসে শরত ফকিরের এই পদটিতে- চার রঙা এক ফুল ফুটেছে / এক ফুলেতে জরদ লাল / আরেক ফুলে মধু / চার রঙা এক ফুল ফুটেছে রাত এগারোটা নাগাদ আসর ছেড়ে বাইরে এলাম। একটু হাত পা খেলিয়ে নেয়া আর কি। জ্যোতিও উঠে এসেছে। বাইরে চাঁদে ছাওয়া নির্জন রাত শাঁ শাঁ করছে। নির্মেঘ আকাশে আজ কেবলই চাঁদের রাজত্ব। একটা তারারও

দেখা নেই।

বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে পথে বার হয়ে নজর গেল উল্টোদিকের বাড়িটির দিকে। তার নিস্তব্ধ ঘরগুলির চাল ও আশপাশের গাছপালার ডালপাতা বেয়ে চুঁইয়ে নামছে কোজাগরীর ঘন, রূপোলি জ্যোৎস্না। উঠোনে একটা ছইখোলা গো'গাড়ি। তার ওপর গিয়ে জুত করে বসা গেল। এই বাড়ির মানুষজন সকলেই আজ গান শুনতে গিয়েছেন।

এখান থেকে ফকির এনায়েতুল্লার বাড়ির সঙ্গীতমঞ্চ দেখা যায়না। ভেসে আসছিল কেবল অশরীরী সঙ্গীত। কোন বৃদ্ধ গায়ক ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে গান ধরেছেন তখন—হাউরের বিখ্যাত সেই পদ- গুরু কোন রূপে দয়া করো ভুবনে / অনন্ত অপার লীলা তোমার মহিমা কে জানে / তুমি রাধা তুমি কিষ্ট মন্ত্রদাতা তুমি ইষ্ট / মন্ত্র জানিতে সঁপে দিলে সাধু বৈষ্ণবের চরণে।

বৈষ্ণবীয় দর্শনের কাছে মরমীয়া বাউল সাধকের বিনম্র ঋণস্বীকার।

ভাবের ঘরে প্লেগিয়ারিজমের দোষে দুষ্ট নয়। এই সাংস্কৃতিক ধারা। তবে, সেই ঋণস্বীকারও আসলে নিজ গুরুর কাছেই কৃতজ্ঞতাস্বীকার। তাঁর ইচ্ছেতেই তো সাধু বৈষ্ণবের কাছে শিষ্যত্ব পাওয়া সম্ভব হলো! তিনি সঁপে না দিলে কি কিছু হতো!

রাত বাড়ে। ঘড়ির খেয়াল রাখিনি। কুয়াশার সোঁদা ও মিষ্টি গন্ধ মাখানো সেই চন্দ্রোজ্জ্বল রাত আর ভেসে আসা সঙ্গীতমালার সুরধারা, দুই মিলে এক মিশ্র অনুভূতি গড়ে তুলছিল। স্থানকাল সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। নেশাগ্রস্তের ডিজওরিয়েন্টেশান যেন। কোথায় এসেছি আমরা? একবিংশ শতকের ভারতবর্ষ বলে নিজের যে দেশটাকে চিনে এসেছি চিরকাল, তার সঙ্গে চন্দ্রোজ্জ্বল ও সঙ্গীতমুখর এই স্থানটির কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না কেন? অথবা, পরিচিত পরবাস থেকে দীর্ঘকাল বাদে প্রকৃত স্বদেশেই ফিরলাম নাকি, মাত্রই কয়েকটি ঘন্টার জন্য? দুটি সুদীর্ঘ নিদ্রা ও স্বপ্নজগতে বিচরণের মাঝখানে কয়েকটি ঘন্টার জন্য প্রকৃত বাস্তবে জেগে ওঠা, নাকি বাস্তব দুনিয়া থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি নিয়ে কোন অলৌকিক মিডল আর্থ-এ ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নভ্রমণে এসেছি আমরা-

—মৃদু গলায় নাম ধরে ডাকাডাকির শব্দে হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখলাম, সুব্রত এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এবাড়ির ভেতরে আসছে। গাড়ি থেকে নেমে হাত নাড়িয়ে ডাকলাম। কাছে এসে বলল, চলুন তাড়াতাড়ি। এই গানটার পরেই লাস্ট আইটেম শুরু হচ্ছে। পাল্লাগান। গানবাড়ির ভেতর থেকে তখন ক্লান্ত, সুরেলা গলায় ভেসে আসছে পাঞ্জু শার বাঁধা সেই চিরকালের গান-

কাল কাটালি কালের বশে / মিছে মায়ায় এ ভববন্ধনে।

নির্জনবাসের আশ্রয়টি ছেড়ে উঠে আসি আমি। জ্যোতি যাবে না এখন। তাকে চাঁদের নেশায় পেয়েছে। সুব্রতর

পিছু পিছু ফিরে চলি গানের আসরের দিকে।

পাল্লাগান, বাংলার লোকসঙ্গীতধারার এক বিশিষ্ট সম্পদ। দুই গায়কে সঙ্গীতের পাল্লা—তাই এ হেন নাম। বিভিন্ন পদকর্তার তৈরি গানের কোলাজ এই পাল্লাগান, নিছক কবিগানের উতোর চাপান নয়। গানে গানে গড়ে ওঠে তত্ত্ব ও দর্শনের বিবিধ কূট প্রশ্ন, তারপর ফের গানে

গানেই হয় তার মীমাংসা। তারপর তারই সূত্র ধরে ফের নতুন প্রশ্ন, নতুন সমস্যার অবতারণা এবং তার উত্তর ও সমাধান। আর্যসংস্কৃতির যে পণ্ডিতি এবং দার্শনিক তর্কসভার কথা বিদগ্ধমহলে বহুবিদিত, তারই এক সাঙ্গীতিক রূপ বলা যায় পাল্লাগানকে। বিষয় নির্বাচনের ভিত্তিতে পাল্লা হতে পারে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক, গুরু-শিষ্য সংবাদ, শরা-বেশরা দ্বন্দ্ব, ইসলামী সঙ্গীতভিত্তিক, কিংবা নিছকই দৈন্যপদ, অর্থাৎ দুটি মানুষের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনা। কয়েকবছর আগে আসাননগরে লালনমেলায় এক ভোররাতে পাল্লা শুনেছিলাম, তা ছিল রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। তাতে বাস্তবজীবনের এক গুরু তাঁর নিজের শিষ্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনঘন্টাব্যাপী সেই সুরময় দ্বৈরথ আমার স্মৃতিতে খোদাই হয়ে আছে। আজকের পাল্লার বিষয়টি আলাদা। আজ হবে গুরু-শিষ্য সংবাদ। মুখোমুখি হয়েছেন দু'জন গায়ক। একজন গুরুর চরিত্রটা করবেন। অন্যজন হবেন শিষ্য।

আসরে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই পাঞ্জুশা'র পদগানটি শেষ হয়ে গেল। গায়ক বসে পড়লেও বাজনদাররা বাজনা থামাননি। বাঁশি ও হারমোনিয়ামের খণ্ড খণ্ড মৃদু সুর বিগত গানটির সুরদেহকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে নতুন একটি রূপ নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ এক অসংজ্ঞাত সরগম বাজিয়ে এইবার তা আবার একটি সুনির্দিষ্ট চেহারা নিতে শুরু করল। দৃঢ়বদ্ধ চালে এক বিশেষ মুখড়া ফুটে উঠছিল তাদের যুগলবন্দিতে—

—প্রথম যিনি উঠে দাড়ালেন, তিনি শিষ্য। জ্ঞানপিপাসু এবং ভক্ত এক শিষ্যের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তীক্ষ্ণ, সুরময় গলায় তিনি তাঁর প্রশ্ন রাখলেন গুরুর কাছে-

গেড়ে গাঙের ক্ষ্যাপা / হাপুস হুপুস ডুব পাড়িলে / এবার মজা যাবে বোঝা / কার্তিকের ওলানের কালে — সংসার নামক গেড়ে গাঙ অর্থাৎ অগভীর জলকুণ্ডে ক্রমাগত ডুবে থাকলে, জীবনসায়াহ্নে যখন হিমঋতু আগতপ্রায় হবে তখন জীবাত্মা সুখ হারিয়ে অ-সুখে ভুগবে যে! এ রোগের কাটান কী তুমি বলে দাও গুরু!

প্রশ্নটি নতুন নয়। মায়ার হাত থেকে জীবাত্মার মুক্তির পথ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন ও আধুনিক যুগে বহু মনীষীই বহুতর উত্তর রেখে গিয়েছেন। পাল্লাগানে কিন্তু সেইসব উত্তর সরাসরি দেওয়া চলবে না। সঠিক উত্তর আসতে হবে কোন মরমী সঙ্গীতের মাধ্যমেই। প্রশ্ন করে শিষ্য বসে পড়তে গুরু উঠে দাড়ালেন। কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে

বাজনদারদের সঙ্গতের বোল বদলে গেছে সঙ্গেসঙ্গেই। আসরের দিকে চোখ ফেলে গুরু তাঁর জবাব দিলেন-

দম কষে তুই পড়না ক্ষ্যাপা প্রেমের পুকুরে / ধরবি যদি মীন মকরা কাম রেখে দে তফাতে / গহীন জলে বাস করে মীন / গুরুবলে ছড়াতেছে ঝিম / যে চিনেছে সেই জলের হিম মীন ধরা দেয় তার হাতে।

অর্থাৎ সংসারকে ছাড়লে চলবেনা হে। মুক্তির পথ নির্জন অরণ্যে নয়। সে পথ গিয়েছে তোমার আমার গ্রামশহরের মধ্যে দিয়েই। তবে হ্যাঁ, গেড়ে গাঙ বা অগভীর পুষ্করিণীতে নয়, প্রেম রূপ গহীন জলাশয়ের গভীর অন্তরমহলে ঢুকতে পারলে তবেই দর্শন মিলবে মোক্ষরূপ মৎস্যরাজের। তাঁকে ধরতে যদি চাও তবে দুটি শর্ত আছে আরো। প্রথমটি, চিরপুরাতন ঈশোপনিষদীয় উপদেশ — তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা:- ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভোগ, কামরহিত প্রেম। কামনাকে তফাতে রেখে প্রেমে মজতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্তটি আরও কঠিন—'প্রেম'পুকুরের 'হিম'কে চিনতে হবে, অর্থাৎ সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে কামনার প্রকৃত স্বরূপটিকে। চিনতে না পারলে তাকে পরিপূর্ণ ত্যাগ করবে কীভাবে? প্রেমের গভীরতম স্তরে বাস করেন যে পরমাত্মা, মায়ার আবরণ ছড়িয়ে রেখেছেন তিনি নিজের চতুষ্পার্শে। কামনার স্বরূপটিকে যিনি চিনতে পারবেন, মায়ার আবরণ বা 'ঝিম'কে অতিক্রম করে তিনিই কেবল পাবেন সেই পরমাত্মার সন্ধান, মোক্ষ বা মুক্তি মিলবে কেবল তেমন মানুষেরই।

এই যে প্রেমকে আশ্রয় করে, কামনাকে জয় করে সগুণ ব্রহ্মকে (সগুণ বলছি গানের মধ্যেকার এই ইঙ্গিতটি থেকে যে, ব্রহ্ম বা মীনকে এ গানে বারংবার কর্তৃকারকে ব্যবহার করা হয়েছে— যথা বাস করে, ছড়াতেছে হিম, ধরা দেয়। তিনি নিজে থেকে কিছু কাজ করছেন। নির্গুণ হলে তা সম্ভব হত না।) পাবার পদ্ধতিটি, এর মধ্যে তিনটি কাজ করবার উপদেশ দিচ্ছেন গুরু— দম কষে প্রেমের পুকুরে ঝাঁপ অর্থাৎ প্রপত্তি বা শরণাগতি, ‘কাম’কে তফাতে রাখা, অর্থাৎ নিষ্কাম সাধনা, এবং জলের হিমকে চিনতে শেখা, অর্থাৎ কামনার স্বরূপকে চিনতে শেখা। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্বটির সঙ্গে এর গভীর মিল রয়েছে। তাঁর শ্রীভাষ্যের সারাৎসারটিও তো সেই একই— ব্রহ্ম সগুণ, তিনি এক হয়েও জীবজগতবিশিষ্ট, মায়া তাঁর শক্তি হলেও অনির্বচনীয় নয়। তাকে অতিক্রম করে তাঁর নাগাল পাওয়া যায় শরণাগতি ও নিষ্কাম

সাধনার মাধ্যমে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের 'লাভ মিস্টিক' কবিরা কিন্তু একই সময়কালে দেখছি চলেছেন এক ভিন্ন রাস্তায়। মোক্ষ বা পরমাত্মাকে পাবার তীব্র কামনায় তাড়িত জীবাত্মা, সুদীর্ঘ অভিসারের পথচলা ও বিরহের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হয়ে অবশেষে ভাবসম্মেলনের মোহনায় পৌঁছে ছিন্ন করে মায়ার আবরণ ও নিজেকে চিনতে পারে আসলে সেই অধরা পরমাত্মারই একটি অংশ বলে। কবি লেখেন, 'অনুখন মাধব মাধব সুমরায়িত সুন্দরী ভেলি মাধাই'— জীবাত্মার প্রতীক শ্রীরাধা একসময় নিজেই হয়ে যান মাধব জীবাত্মা নিজেকে চিনতে পরে পরমাত্মার অংশ হিসেবে। আসলে ভেদ নেই কোন, দুই-ই এক, শুধু আত্মলীলা আস্বাদনের লোভে এই মায়ার আবরণের সৃষ্টি। একই ঐতিহাসিক সময়কালে একই বাংলার বুকে এইভাবে তুর্কি উৎস সঞ্জাত (যদিও বহু শতাব্দীর প্রভাবে বহুলাংশে দেশীভূত) বডি মিস্টিক অলোকপন্থীরা পৌঁছে গেলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দার্শনিক ভূমিতে, আর, এদেশের মাটির একান্তই নিজস্ব সন্তান পদাবলীর লাভ মিস্টিক বা প্রেম মরমীয়া কবিরা গ্রহন করলেন অচিন্ত্যভেদাভেদের ঈশ্বরব্যাখ্যাকে। এক বিশ্বাসে জীবাত্মা পরমাত্মার নাগাল পায় কঠোর নিষ্কাম সাধনায়, আর অন্য বিশ্বাসে প্রেমের তীব্র আকর্ষণে, বিরহের আগুনে পুড়ে পরিশুদ্ধ জীবাত্মা অচিন্ত্যভেদাভেদের আবরণ সরিয়ে নিজেকে চিনতে পারে পরমাত্মার অংশ বলে। ঈশ্বরের সন্ধানে, সংসারকে ত্যাগ না করে নিষ্কাম প্রেমের মধ্যে দিয়ে ঋজু অনুসন্ধানের পথ নিয়েছেন অলোকপন্থী ফকির। আর অন্যদিকে, অহৈতুকি প্রেমের মধ্যেই গৌড়িয় বৈষ্ণব খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির পথ। সে পথে যাবার জন্য ঘর সংসার সব জলাঞ্জলি দেয়া চলে।

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ এই দুটি ধারাকেই পরম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় নিজেদের জীবনে ঠাঁই দিয়েছেন। বাউল বা বৈষ্ণব কারোই মুষ্টিভিক্ষার অভাব হয়নি কখনো এই ভূমিতে। বাউলের গান থেকে গভীর জীবনবোধের শিক্ষা নিয়েছেন, আবার পদাবলী শুনে কেঁদেও ভাসিয়েছেন তাঁরা। নগরবাংলায় বসে বিশ্বাস করা একটু মুশকিল হলেও একথা সত্যি যে আজও এই দৃশ্যটি কিন্তু খুব বেশি বদলায় নি। রাতের তৃতীয় প্রহরেও জনাকীর্ণ সেই আসরের অজস্র উদগ্রীব নিদ্রাহীন চোখ সেই ভালোবাসারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। নিশ্চুপ আসর মগ্ন হয়ে উপভোগ করে চলেছিল সেই সাঙ্গীতিক দ্বৈরথ।

অন্ত্যপর্ব

প্রায় ঘন্টাদেড়েক পরে শেষ হল পাল্লা-পাল্লির টানাপোড়েন। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছিল রাত দুটোর কিছু বেশি। দর্শকরা উঠে পড়ে ইতি-উতি ছড়িয়ে গিয়েছেন আসরের ভেতরে-বাইরে। হাত পা একটু খেলিয়ে নিয়ে বিড়িতে দু'একটান মেরে জড়তা ছাড়িয়ে নেওয়া। বাড়ির একপাশে চাপাকল একখানা। তার জলে হাত মুখ ধুয়ে আবার আসরে ফিরলাম ফের। অন্য অতিথিরাও ফিরে আসতে শুরু করেছেন একে একে। আসরশেষে এবারে নৈশভোজের পালা। উঠোনে সারি বেঁধে বসেছি সবাই। আমার বাঁপাশে জ্যোতি ও সুব্রত, ডানপাশে বসেছেন যে বৃদ্ধটি, তাঁর বার্ধক্য কেবল সফেদ চুলদাড়িতেই। তা বাদে পেটানো পেশল শরীরে, ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটিতে, কোথাও বয়সের বিশেষ ছাপ নেই। মেঘগর্জনের মত গলা। নাম বললেন মহসিন। হাসিটি ভারী মিষ্টি। পঞ্চরসের গান করেন। আসর চলাকালীনই অন্য লোকজনের কথাবার্তায় এই মানুষটির অন্য একটা পরিচয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। ডোমকল অঞ্চলের মানুষ মহসিন একদা দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। এখন এই উত্তরজীবনে তাঁর কণ্ঠে শুধুই গান। সেই গানের টানেই আসরে আসরে নিশিযাপন।

কোথা হতে আগমন, কী করা হয় ইত্যাদি পরিচয়ের আদানপ্রদান চলতে চলতেই সামনে পদ্মপাতার পাত পড়েছে। লাল লাল মোটা চালের ভাত, সামান্য ডাল, মলম ও মাছভাঙা—এই হল মেনু। পাঁচ তরকারী সেদ্ধ করে সম্বরা দিয়ে তারপর একেবারে পিষে ফেলে তৈরি হয় সার্থকনামা পদ মলম। অল্প পরিমাণ দিয়ে অনেক ভাত খাওয়া যায়। আবার, তরকারির ঝোল বানিয়ে তাতে কুড়মুড়ে করে ভাজা মাছ গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়ে মাছভাঙা রান্না করা হয়। মাছ দেখা না গেলেও মাছের গন্ধটা মেলে এই পদে। চার পাঁচ কেজি যেকোন প্রকার মাছ দিয়ে একটি ভোজবাড়ির সমস্ত অতিথির জন্য মাছভাঙা তৈরি করা চলে। গরীবের ভোজসভায় কম খরচে বেশি মানুষ খাওয়াবার জন্য এতদঞ্চলে এই সুস্বাদু পদ দুটির বহুল প্রচলন আছে বলে জানা গেল।

বিশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ। স্থানীয় মানুষেরা ফিরে গেছেন নিজের নিজের ঘরে। রয়ে গিয়েছি আমরা, ও দূরদূরান্ত থেকে আসা অতিথি গায়কদের দল। ঘুম পাচ্ছিল। পায়ের নিচে মলিন প্লাস্টিক ধুলোয় আচ্ছন্ন। তবু, তার ওপরেই গায়ের চাদরটি বিছিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়া গেল। মহসিনের দলটিও ঘাঁটি গেড়েছেন আমাদের

ঠিক পাশটিতে। শীত লাগছিল বেশ। মহসিন বোধ হয় তা খেয়াল করেছিলেন। হঠাৎ গায়ের ওপর কিছু একটা ঝপ করে এসে পড়ল। চোখ খুলে দেখি দুটি কর্কশ হাত বড় মমতায় একটি শতচ্ছিন্ন কাঁথা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার শীতার্ত শরীরে। ডাকাতই বটে। ডাকাতি করে মন কেড়ে নিয়ে যায়।

বেশিক্ষণ শোওয়া অবশ্য আমার কপালে ছিল না সেই রাতে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাতাস ভারী হয়ে উঠল গঞ্জিকার গন্ধে। চারপাশে কলকে জ্বলেছে বেশ কিছু। এই হারে প্যাসিভ স্মোকিং বেশিক্ষণ চলতে থাকলে কাল ভোরে বাড়ি ফেরা দুষ্কর হতে পারে, সেই ভয়ে উঠে পড়া গেল।

বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুদূর হেঁটে পথের পাশে একটা বাঁশের মাচা পেয়ে তাতে চেপে বসলাম তিনজনে। মাথার ওপর দিব্যি খড়ের ছাউনি। এই গ্রামের আড্ডাস্থল। শেষরাত্রে জনহীন অবশ্য। খানিক বাদে শুয়ে পড়লাম সেইখানেই। কাগজে পড়েছিলাম, ২০০৭-এর সেই কোজাগরীর রাতে চাঁদ নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবার কথা । সে খবরের প্রভাবে কিনা জানিনা, রাত তিনটের সেই চাঁদকে সত্যিই অতিকায় লাগছিল। তার তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। খানিক পরে সুরত ঘুরে এসে আমার মুখের ওপর ছায়া দিয়ে বসল। বলল, 'আপনি ঘুমোন, আমি বসছি।' বললাম, 'তুমি?'' সে মৃদু হেসে বলল, “ আমার অভ্যাস আছে। এমন কত রাতই তো জেগে কাটে আসরে আসরে।' আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজলাম। আমার স্বপ্নে তখন সদ্যসমাপ্ত গানের আসরটি ফের জেগে উঠেছে। বুড়ো বাউল আনন্দলহরীতে ঘা দিয়ে ঘুঙুর পরা পায়ে টোকা মেরে ভারহীন ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে আসরে ছড়িয়ে দিচ্ছে অভয় দাসের উজ্জ্বল শব্দমালা-

আছে হাজার হাজার সখের বাজার / এক এক দ্রব্যের নিশানী / সাড়ি সারি বসে দোকানী / তারা করতেছে আমদানী মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া / নিচ্ছে সব ধনী

উত্তরকথন

দিনতিনেক পরে বাংলা ছেড়ে কর্মস্থলে ফিরে এলাম ফের। দফতরের টেবিলে একটা নিমন্ত্রণপত্র পড়ে ছিল। সরকারী সঙ্গীতসম্মেলনে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান। সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম অনুষ্ঠানস্থলে। একটি আলোকোজ্জ্বল স্টেডিয়ামের ভেতর সুপ্রশস্ত মঞ্চে হাজারো ওয়াটের

আলোর নীচে সঙ্গীতের এলাহি আয়োজন। গায়ক এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গজলিয়া। সেইদিনই সকালে বিলেত থেকে প্রোগ্রাম সেরে দেশে ফিরেছেন। সরকারী কর্তাদের অনুরোধ নিতান্তই ঠেলতে না পেরে মত দিয়েছেন এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। মঞ্চ জুড়ে অজস্র বিচিত্র যন্ত্রপাতির ভিড়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বৃন্দবাদ্যের সঙ্গত ও শব্দপ্রক্ষেপণের সুবন্দোবস্তও আছে। নির্দিষ্ট সময়ে ঝলমলে ট্র্যাডিশনাল মেক আপ নেওয়া মঞ্চসঙ্গিনী ঝকমকে ইংরিজি ও হিন্দিতে গায়কের ঘরানা ও সাফল্যের বিবরণী দিয়ে সরে গেলেন পেছনে। উজ্জ্বল রূপোলী জরির কাজ করা কালো জোব্বাপরিহিত গায়কের শরীরে এবার পাদপ্রদীপের আলো এসে পড়েছে। হারমোনিয়ামে লঘু আঙুল চালিয়ে নিলেন একবার গায়ক। তারপর দর্শককে অভিবাদন। এইবার, গান শুরু করতে যাবার মুহূর্তে হঠাৎই, প্রফেশনালিজমের খোলস ভেদ করে তাঁর হাতদুটি উঠে এল ওপরে। মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল দু'কানের লতি। তারপর ফের তা নেমে এসে আশ্রয় করল সুরযন্ত্রের শরীর।সঙ্গে সঙ্গে, বাহাত্তর ঘন্টা আগের অন্য একটি সঙ্গীতবাসরের সেই সূচনার মুহূর্তটি ফিরে এল বিদ্যুচ্চমকের মতই। আলোকোজ্জ্বল এই নাগরিক সঙ্গীতবাসর থেকে সহস্রযোজন দূরে বাংলার এক অজ গ্রামে, মিটমিটে হ্যাজাকের আলোয় এক আত্মমগ্ন শিল্পীও গান শুরু করবার পূর্বমুহূর্তে এমনি করেই স্পর্শ করেছিলেন নিজের কানের লতি। গুরু ও ঈশ্বরের কাছে আগাম ক্ষমাপ্রার্থনা— যদি কোন ভুলত্রুটি করে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা কোরো গুরু হে—

সংস্কৃতির এক সুদূরসঞ্চারী সূত্র মুহূর্তে একসঙ্গে জুড়ে দিল সহস্রযোজন দূরত্বে থাকা একটি বঙ্গীয় গ্রাম ও বিন্ধ্যসংলগ্ন এক মহানগরকে।

সংস্কৃতির এই কনটিনুইটিই ভারতবর্ষের আত্মার প্রকৃত সাক্ষর।

পুঁথিগত ঋণস্বীকার:

১। দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যাণ্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার - রিচার্ড এম ইটন
২। বৈষ্ণব সাহিত্য: ত্রিপুরাশংকর সেন
৩। বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস- চক্রবর্তী ও শাহনওয়াজ
৪। বাংলাপিডিয়া

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - রণদীপ নস্কর
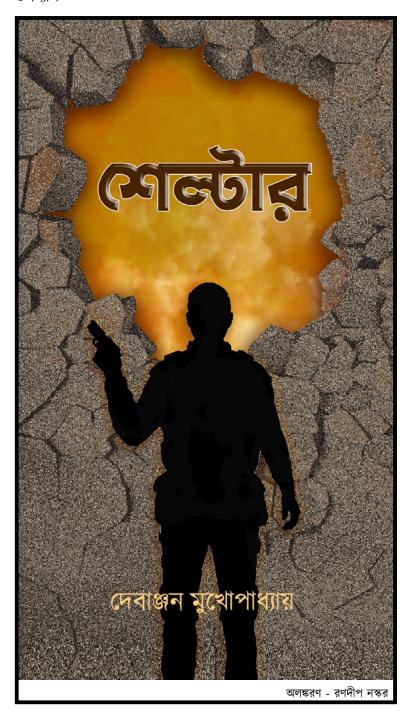
পিঠে একটা মশা হুল ফোটাতেই তাপসের কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল। চারদিক অন্ধকার। কেবল পাশের ঘর থেকে মোমবাতির হলদেটে আলো আসছে। মোবাইলের সুইচ টিপে সময় দেখলেন তাপস। রাত ন'টা বেয়াল্লিশ।

"বাবা, সেই কখন গেছে! এখনো আসার নাম নেই!" বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি। সন্ধে সাতটার সময় লোডশেডিং হয়েছিল। আজকাল প্রায় রোজই এমন হচ্ছে সন্ধেবেলায়। কিন্তু আজকের মতো এতক্ষণ ধরে লোডশেডিং থাকে না কোনোদিন। মাটিতে মাদুর পেতে শুয়েছিলেন তাপস। উঠে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ঝিমলি ঘরের জানলার সামনে বসে আছে। তার দৃষ্টি জানলার বাইরে। কী যে হয়েছে মেয়েটার গত দুদিন ধরে। এমনিতে সে বেশ হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছ্বল মেয়ে। কিন্তু পরশু থেকে একেবারে গুম মেরে রয়েছে। তাপস অনেকবার জানতে চেয়েছেন। বারবারই ঘাড় নেড়ে ঝিমলি বলেছে,

"কিছু হয়নি।"

তাপস মেয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে তার মাথায় একটু হাত বোলালেন। তারপর পিঠে হাত রেখে বললেন,

"দশটা প্রায় বাজে রে ঝিমলি। আলো আজ সহজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। চল খাওয়াটা সেরে নিয়ে শুয়ে পড়ি।"

ঝিমলি উত্তর দিল না। তাপস এবার একটা আলতো ঠেলা দিলেন ঝিমলিকে। সে বলল,

"তুমি খেয়ে নাও বাবা। চলো তোমায় খাবার বেড়ে দিই।"

"তুই? তুই খাবি না!"

"না বাবা, আমার খিদে নেই। ভাল লাগছে না। পরে ইচ্ছে করলে খাবো।"

তাপস জানেন তার মেয়ে জেদি প্রকৃতির। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তার থেকে সহজে নড়ানো যায় না তাকে। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। হ্যারিকেন জ্বেলে পাশের ঘরে খেতে বসলেন। সাড়ে দশটা নাগাদ একটা শব্দ শুনে আবার ঘুম ভেঙে গেল তাপসের। ঝিমলির নাম ধরে কেউ ডাকছে। খুব কাছ থেকেই আসছে গলাটা। তিনি উঠে বসলেন। দেখলেন ঝিমলি দরজার দিকে যাচ্ছে।

"কে রে ঝিমলি? এত রাতে ডাকাডাকি করছে?"

"বুঝত পারছি না বাবা। তুমি শোও, আমি দেখে আসছি।"

ঝিমলি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত গড়িয়ে গভীর রাত, তারপর শেষ রাত পেরিয়ে সকাল হল। ঝিমলি

ফিরে এল না। আতান্তরে পড়লেন তাপস। স্ত্রী গত হয়েছেন বছরখানেক আগে। বাপ মেয়ে কোনোরকমে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ঝিমলি কোথায় গেল? লোডশেডিংয়ের রাতে কে ডাকতে এসেছিল তাকে?

উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তাপস।

***

শীতের রাতে নিউ ফারাক্কা জংশন স্টেশনে বসে ঘুমে ঢুলছিল রঞ্জন। কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে কোনোরকমে ডিনার সেরে রাত আটটায় এসে পৌঁছেছিল স্টেশনে। কিন্তু ট্রেনের দেখা নেই। স্টেশনের লাউডস্পিকার থেকে রাত নটা নাগাদ ঘোষণা করেছিল অনিবার্য কারণে ট্রেনটি সাড়ে চার ঘন্টা দেরিতে চলছে।

স্টেশনের স্টল থেকেই একটা পত্রিকা কিনে নিয়েছিল রঞ্জন। মহিলাদের পত্রিকা, কিন্তু তার বেশ ভাল লাগে পড়তে। দারুণ দারুণ সব ছবি থাকে মডেলদের। কিন্তু পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা সুন্দরীদের গরম ছবিও এই মালদা স্টেশনে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বেশিক্ষণ উষ্ণ রাখতে পারেনি। মোটা গেঞ্জির কাপড়ের টি-শার্টটার সঙ্গে হুডি আছে। সেটা দিয়ে কান মাথা ঢেকে নিয়েছিল এক সময়। তারপর কখন যে ঘুম এসে গেছে, তা আর টের পায়নি রঞ্জন।

ঘুমটা ভাঙল একটা জবরদস্ত ধাক্কায়। চোখ খুলতেই রঞ্জন বুঝতে পারল ঘুমে সে তার পাশের লোকটির গায়ের উপরে ঢলে পড়েছিল। লোকটি বলল,

"উঠুন মশাই, উঠুন। ট্রেন ঢুকছে, ওই দেখুন। বাকি ঘুমটা না হয় নিজের বার্থেই ঘুমোবেন!"

দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা। চোখ কচলে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল রঞ্জন। স্লিপার ক্লাস কামরায় যেতে হবে, এটা ভেবেই বিরক্ত লাগছে তার। নিদেনপক্ষে এসি থ্রি টায়ার ছাড়া সে ট্রেনে সফর করে না। কিন্তু এবার কোনোভাবেই একটা টিকিট সে ম্যানেজ করতে পারেনি। কর্মসূত্রে রঞ্জন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সেখানে এক ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে তার ভাল পরিচিতি আছে। রঞ্জনের বাড়ি কলকাতায়। প্রায়ই তাকে সেখানে যেতে হয়। প্রতিবারই টিকিটের ব্যবস্থা করে দেয় সেই এজেন্ট। কিন্তু এবার সে প্রথম থেকেই হাত তুলে দিয়েছিল। রঞ্জনও প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিল বাগডোগরা থেকে ফ্লাইটেই কলকাতা যাবে। কিন্তু দিনকয়েক আগে সেই এজেন্ট জানায় শিয়ালদহগামী একটা ট্রেনে নিউ ফারাক্কা জংশন

থেকে কয়েকটা টিকিট ক্যানসেল হয়েছে। আর দেরি করেনি রঞ্জন। তাকে ফারাক্কায় আসতেই হতো একটা কাজে। আজই সেই কাজ সেরে পড়ি কি মরি করে সে ছুটে এসেছে স্টেশনে। এবং তারপর এই শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে চার ঘন্টা কাটানোর পর অবেশেষে ট্রেনের দেখা পেয়েছে সে।

কিন্তু গভীর রাতে ট্রেনের কামরায় নিজের সিট খুঁজে বের করা এক ঝঞ্ঝাট। কামরার ভিতরে আলো বলতে কেবল নীল নাইটল্যাম্পের মায়াবী এক আলো আঁধারি। সেই আলোয় দেওয়ালে ধাতুর ছোট্ট প্লেটে খোদাই করা নম্বর দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

বাধ্য হয়ে মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সিট খুঁজতে শুরু করল রঞ্জন। নিজের সিট দেখতেও পেল এক সময়। কিন্তু এ কী!তার লোয়ার বার্থে গুটিসুটি মেরে একজন ঘুমিয়ে আছে। এই এক সমস্যা মাঝরাস্তা থেকে ট্রেনে ওঠার। পয়সা খরচ করে রিজার্ভ করা সিট অবধারিতভাবে জবরদখল হয়ে যাবে।

"ও দাদা, দাদা! উঠতে হবে দাদা, এটা আমার সিট," কম্বল মুড়ি দেওয়া ঘুমন্ত মানুষটাকে আলতো ঠেলা দিয়ে বলল রঞ্জন। একবার, দুবার...কোনো সাড়া নেই। এবার বাধ্য হয়েই অঞ্জন মানুষটার পা ধরে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে দিল।

"আরে, সিটটা ছাড়ুন দাদা, রিজার্ভ আছে!" গলা চড়াল সে।

এবার কাজ হল। কম্বলের ভিতর থেকে নড়াচড়া টের পাওয়া গেল। তারপর মুখের উপর থেকে সরে গেল আড়ালটা।

রঞ্জনের মোবাইলের টর্চ এখনো জ্বলছে। সেই আলোয় মানুষটার চেহারা দেখেই চমকে উঠল সে।

এ কী! এ তো কোনো দাদা নয়, একজন ভদ্রমহিলা। দু'চোখে ঘুম জড়ানো মুখখানা দেখে এক মুহূর্তের জন্য একটু খারাপ লাগল রঞ্জনের। তার গলা নেমে এল কিছুটা—

"এটা আমার সিট। একটু ছেড়ে দিতে হবে যে!"

কাঁচা ঘুম ভাঙলে চোখে মুখে যে বিরক্তিটা ছড়িয়ে পড়ে সেটাই এই মুহূর্তে ভদ্রমহিলার অভিব্যক্তিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রঞ্জনের খারাপ লাগছিল। ভদ্রমহিলার বয়স তার মতোই হবে। রঞ্জনের এখন ত্রিশ, এর হয়তো আরো একটু কম। মেয়েই বলা চলে। একা ট্র্যাভেল করছে হয়তো। কনফার্মড টিকিট পায়নি তাই এই লোয়ারটা ফাঁকা দেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মেয়েটি তার পাতলা কম্বলখানা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ঢুলতে ঢুলতে সাইড লোয়ারে গিয়ে আরেক ঘুমন্ত ব্যক্তির সিটের এক কোণায় কোনোরকমে পিছন ঠেকালো।

রঞ্জন টর্চ নিভিয়ে ঝটপট সিটের নিচে তার বড় ট্রলিব্যাগখানা ঠেলে দিয়ে সিটের উপরে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে টান হলো। তার খারাপ লাগছে বটে কিন্তু এই নিয়ে আর ভাবতে চায় না রঞ্জন। সে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেছে, খামোখা অপরাধবোধে ভোগার কোনো মানে হয় না।

মালদা ছেড়ে ট্রেন গতি নিতেই ঘুমে রঞ্জনের দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। ট্রেন দেড় ঘন্টা লেটে মালদায় ঢুকেছে আজ। স্টেশনে বসেই বারবার পাশের লোকের গায়ে ঢলে পড়ছিল সে। সারাদিন অসম্ভব পরিশ্রম যায় অফিসে। তারপর ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসে হাঁ করে ট্রেনের পথ চেয়ে বসে থাকো। বিরক্তিকর!

ঘুম পায় বটে কিন্তু চলন্ত ট্রেনের কামরায় কোনোদিনই খুব ভাল ঘুম হয় না রঞ্জনের। আজও হল না। আর তাই কিছুক্ষণ পরেই তার কানে এল কিছু শব্দ। সে বুঝতে পারল সাইড লোয়ারে যে ব্যক্তি শুয়ে আছেন তিনি মেয়েটিকে উঠে যেতে বলছেন। মেয়েটির গলা শুনতে পেল সে—

"থোড়ে সে জাগা লে কর তো বৈঠে হ্যায় ভাইয়া। অব কেয়া করে বাতাইয়ে? জানা আপকো ভি হ্যায়, হামকো ভি হ্যায়। আপ লেটে রহিয়ে আরামসে। বাস থোড়ে অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে ভাইয়া। ম্যায় ইতনি সে জাগাহ সে কাম চালা লুঙ্গি। "

মাঝে মাঝেই জানালা দিয়ে আলোর ঝলক এসে পড়ছে কামরার ভিতরে। সেই আলোয় রঞ্জন দেখল মেয়েটির নিতম্বের দশ ভাগের মাত্র তিন ভাগ সিটে আছে, বাকিটা বাইরে। অতি কষ্টে সেভাবেই সে বসে বসে ঢুলছে আর মাঝে মাঝেই ট্রেনের দুলুনির কারণে তার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মেয়েটিকে সাইড লোয়ারের ব্যক্তি বাধ্য করলেন উঠে যেতে। অসহায় অবস্থায় সে এবার উঠে গিয়ে টয়লেটের দিকে চলে গেল। আর দেখা গেল না তাকে। সাইড লোয়ারের ব্যক্তিটিও উঠে বসেছেন। কথাবার্তার শব্দে মিডিল বার্থের প্যাসেঞ্জার কুপের আলো জ্বেলে দিয়েছেন। রঞ্জন দেখল সাইড লোয়ারের প্যাসেঞ্জার টয়লেটের দিকে গলা বাড়িয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে বলছেন,

"হ্যাঁ, ওটাই ঠিক জায়গা। বে-আইনিভাবে চলাফেরা করাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে এদের। ভেবেছে কি, সব জায়গায় রূপ বেচে কাজ হাসিল হয়ে যাবে। আহা, সুন্দরী মহিলা; খারাপ ব্যবহার করবো? একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই। এদের সঙ্গে যত নরম হবেন তত এরা পেয়ে

বসবে।"

রঞ্জনের মনে হলো শেষের কথাগুলো বলা হলো তাকে উদ্দেশ্যে করেই। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠল এবার। সে সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখল মেয়েটি আয়নার উল্টোদিকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে ঘুমোচ্ছে। মুখটা অর্ধেক হাঁ হয়ে রয়েছে তার।

রঞ্জন বলল,

"এই যে ম্যাডাম উঠে আসুন তো, উঠে আসুন।"

মেয়েটি চমকে তাকাল তার দিকে।

"হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। উঠে আসুন। দেখুন, গোটা সিটটা তো দিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু আমি দেওয়ালের দিকে সরে শুতে পারবো। আপনি ভালভাবে বসতে অন্তত পারবেন। আর আমি ভোরবেলা উঠে পড়ি। তখন আপনি নাহয় টান হয়ে নেবেন। আর তো ঘন্টা তিনেক। আসুন, উঠে আসুন।"

মেয়েটির চাহনিতে অসহায়তা আর কৃতজ্ঞতা একসঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছিল। সে উঠে এল। রঞ্জন রোগা পাতলা মানুষ, সে লোয়ার বাঙ্কে উঠে দেওয়ালের দিকে সরে যেতে মেয়েটি বসার জন্যে যথেষ্ট জায়গা পেল। রঞ্জনের টান করা পায়ের উপর দিয়ে দেওয়ালে মাথা এলিয়ে দিয়ে কম্বল পেঁচিয়ে নিল সে।

(২)

মাঝরাস্তায় লেট করলেও সকালে শিয়ালদহে মোটামুটি ঠিক সময়ই ঢুকে গেল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। রঞ্জন উঠে পড়েছিল বর্ধমান পেরোতেই। মেয়েটিকে তার জায়গায় শুতে বলায় সে কুণ্ঠা বোধ করছিল বটে কিন্তু শেষ অবধি একটা মিষ্টি হাসির সঙ্গে থ্যাঙ্ক ইউ বলে টান হয়েছিল। সেই যে টান হয়েছে, এখনো ওঠার নাম নেই তার। ট্রেন যে শিয়ালদহে ঢুকে গেছে তাও টের পায়নি নির্ঘাত। সাইড লোয়ারের ভদ্রলোক দরজার দিকে যেতে যেতে লক্ষ করছিলেন রঞ্জন চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। ব্যঙ্গের সুরে বললেন,

"মশাই, সবই তো করলেন। এবার ঘুমটাও ভাঙিয়ে দিন। লজ্জা পাচ্ছেন কেন? বড় দয়ার শরীর আপনার!"

রঞ্জন অসহায়ভাবে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। তার বলতে ইচ্ছে করছিল "তাতে আপনার কী অসুবিধে হচ্ছে দাদা?" কিন্তু সে সামলে নিল নিজেকে। কথাটা ভদ্রলোক ভুল বলেননি। ট্রেনে চলার পথে এমন অনেক আলাপ পরিচয়পর্ব আসে যার মেয়াদ ফুরিয়ে যায় প্ল্যাটফর্মে পা দিলেই। স্মৃতি থেকে দ্রুত মুছে যায় মুখ, ঘটনাগুলোও হয়ে ওঠে

আবছা।

তবু কামরা ছাড়ার আগে একবার মেয়েটির পায়ে ঠেলা দিল রঞ্জন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর আরো দুবার একই কাজ করার পরে সে নড়েচড়ে উঠল। মুখ থেকে চাদরের আড়াল সরাতে রঞ্জন হেসে বলল,

"ম্যাডাম, শিয়ালদহ এসে গেছে। ট্রেন কিন্তু আর যাবে না!"

ঘুমের ঘোর কাটতে কয়েক সেকেন্ড লাগল, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। তাই তো! বাইরে প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে। অনেক মানুষ লটবহর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কুলিদের দেখা যাচ্ছে মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে ছোটাছুটি করতে। ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলছেন তাহলে।

একটা লাজুক হাসি হেসে মেয়েটি বলল,

"থ্যাঙ্ক ইউ!"

রঞ্জন লক্ষ করল মেয়েটির সঙ্গে খুব বেশি সরঞ্জাম নেই। উল্টোদিকের লোয়ার বার্থের নিচ থেকে সে কেবল একটা ক্রুজ ব্যাগ বের করে নিল। রঞ্জনের মনে পড়ল ভোররাতে সাইড লোয়ারের যাত্রীটির সঙ্গে সে মেয়েটিকে হিন্দিতে কথা বলতে শুনেছিল। সে জিজ্ঞেস করল,

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপ জায়েঙ্গে কহা?"

মেয়েটি জবাব দিতে যাবে, ঠিক এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। সে জিন্সের পকেট থেকে মোবাইল বের করে রিসিভ করল কলটা।

"জি ভাইয়া, পহোচ গয়ে!"

...

" নহি, অভি তো ঠেহেরনে কি জগাহ নহি হ্যায়। ঢুঁড়না পড়েগা"

...

"নেহি, মেরা এক দোস্ত হ্যায় ইধার। কোই মাগ্নিকতলা নাম কা জগাহ হ্যায়, উধার রহতা হ্যায়। উসনে কহা হ্যায় কি শিয়ালদহ স্টেশন কে আসপাস ছোটামোটা হোটেল মিল জায়েগি। দেখতে হ্যায়। এক দো দিন উধার রহে লেঙ্গে। অগর ইন্টারভিউ ক্র্যাক হো গয়ি, তব তো ঘর লেনা হি পড়েগা!"

...

"হাঁ। লিখ লিজিয়ে। নহি নহি, নট জে। ওয়াই, এ, এস, এম, আই, এন, আর, এ, ইউ, টি, এইচ; ইয়াসমিন রৌত! ঠিক হ্যায় না?

...

" ওক্কে ভাইয়া। হা, আপ ডকুমেন্ট ভেজ কে মুঝে এক হোয়াটস অ্যাপ ভেজ দে না। বাই।"

রঞ্জন তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছিল। সে নেমে যেতে পড়তে

ট্রেন থেকে। কিন্তু ইয়াসমিনের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ।

শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে এসে রঞ্জন বলে দিল এখানে হোটেল খুঁজতে ইয়াসমিনকে কোন কোন রাস্তায় যেতে হবে। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল তার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মেয়েটা কলকাতা শহরে প্রথম আসছে। ফোনের কথোপকথন শুনে মনে হল চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু একা একটা অল্পবয়সী মেয়ের জন্য শিয়ালদহ অঞ্চলের হোটেলগুলো কি আদৌ নিরাপদ?

তবে ট্যাক্সি শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরকে পিছনে ফেলে মৌলালির দিকে এগোতেই সেসব চিন্তা ফিকে হতে লাগল ক্রমশ। নিজের শহরে পা রাখলেই মনের মধ্যে যেন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত একটা অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে যায়। চেনা রাস্তা, পরিচিত মোড়, বহুবার ঘোরা দোকান আর শপিং কমপ্লেক্সের দিকে চোখ গেলেই রঞ্জনের মনে হয় বাব্বা! এত মাস কেটে গেছে মাঝে! এই তো সেদিন এইসব রাস্তা ধরে শিয়ালদহ স্টেশনে গেছিলাম।

রঞ্জনের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে। তার বাবা মা নেই, কাকা কাকিমার কাছেই সে মানুষ। কাকিমা সুরঞ্জনা কলকাতার এক নামী বেসরকারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। আর কাকা প্রত্যয় ভট্টাচার্যের দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যাবসা। কাকার কোম্পানির পণ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করা হয়। বাজারে চাহিদাও দারুণ।

রঞ্জন কাকার ব্যাবসার সঙ্গেই যুক্ত। তবে সে উৎপাদনের দিকটা দেখে না। তার কাজ উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতে কোম্পানির ব্যাবসার দেখভাল করা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় কোম্পানির অফিসে সে বসে। তার অধীনে কাজ করে পনেরোজন কর্মী। মাঝেমাঝেই ব্যাবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে তাকে এদিক ওদিক যেতে হয়।

এবারও রঞ্জনের একটা লম্বা ট্যুরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দিন সাতেক আগে কাকা বলেছিলেন জরুরি কিছু আলোচনার জন্য রঞ্জনের সঙ্গে তিনি বসতে চান। আর সেই আলোচনার জন্যই এবার তার শহরে আসা।

কাকার একমাত্র মেয়ে দেবস্মিতা ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করে। তারও কলকাতায় আসার কথা। রঞ্জনের মনে কাকার এই জরুরি তলবকে ঘিরে একটা অনুমান ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

নানান কথা তার মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। চিন্তার জাল ছিঁড়ল মোবাইল বেজে ওঠায়। কাকিমা ফোন করছেন। জিভ কাটল রঞ্জন। 'এই রে, ট্রেন থেকে নেমে কাকিমাকে জানানো হয়নি!'

(৩)

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এক পরিচিতের দেওয়া পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করে একটা হোটেল খুঁজে পেল জেসমিন। সে শুনে এসেছে এই হোটেল একা একটা মেয়ের থাকার পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। কথাটা যে ভুল নয়, তা জেসমিন হোটেলের রিসেপশনে দাঁড়িয়ে ফর্ম্যালিটি পূরণ করার সময়ই টের পাচ্ছিল। নামেই রিসেপশন অবশ্য। রাস্তা থেকে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে মিশেছে একটা লম্বাটে প্যাসেজে। তারই এক কোণে একটা ডেস্ক। তার উপরে একটা মোটা রেজিস্টার আর একটা কম্পিউটারের মনিটর রাখা। ডেস্কের ওপারে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি এতক্ষণ মনিটরে ছিল। সেখানে হোটেলের বিভিন্ন জায়গায় বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার লাইভ ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। এখন যে তাঁর স্থির দৃষ্টি জেসমিনের উপরে নিবদ্ধ, তা সে রেজিস্টারের পৃষ্ঠায় চোখ রেখেও দিব্যি অনুমান করে নিতে পারছে। প্যাসেজের ধার ঘেঁষে একটা ইংরিজির 'এল' আকারের সোফা পাতা। তার উপরে দুজন লোক বসে আছে। একজনের পরনে বারমুডা আর ফুলহাতা গোল গলা গেঞ্জি। আরেকজন লুঙ্গি পরা। সেই লুঙ্গি প্রায় হাঁটু অবধি গোটানো। শরীরের উপরের অংশ ঢাকা পড়েছে হাফ শার্ট আর তার উপরে চাপানো হাফ সোয়েটারে। রেজিস্টারে সই সাবুদ সেরে আইডি জমা দেওয়ার সময় একবার তাদের দিকে তাকাল জেসমিন। তাদের চাহনি দেখে তার খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল রায়গঞ্জের মাছের বাজারের কথা। মাছের স্টলগুলোর আশেপাশে অনেক বিড়াল গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। হুবহু এমন চাহনি তাদের চোখে দেখেছে জেসমিন।

রিসেপশনে জিজ্ঞেস করে জেসমিন জানতে পারল এই হোটেলে ব্রেকফাস্টের কোনো বালাই নেই। শুধু লাঞ্চ আর ডিনার পাওয়া যায়। তবে ভদ্রলোক তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে জানিয়ে দিলেন আশেপাশে কোথায় সে সস্তায় জলখাবার পেতে পারে। 'দুলাল' বলে হাঁক পাড়তে মোটাসোটা একটা লোক প্যাসেজের আরেক প্রান্তের দরজা দিয়ে এগিয়ে এল।

"চোদ্দ নম্বরটা খুলে দে, আর এই ম্যাডামের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যা," তাকে বললেন ভদ্রলোক।

দুলালকে অনুসরণ করে যেতে যেতে জেসমিন শুনতে পেল সোফায় বসা দুজনের একজন বলছে,

"বাবা! একেবারে সকাল সকাল!"

দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল,

"মানে!"

"মানে আবার কী? বুঝলে না? এসব হোটেলে একা মেয়েছেলে থাকতে আসে, এমন দেখেছ কখনো? ফিগারখানা দেখেছ? মাল পুরো, মাল। নিশ্চয়ই কোনো কোম্পানির তরফে এনে তোলা হয়েছে। একটু পরেই দালাল এসে সাজিয়ে টাজিয়ে ক্লায়েন্টের কাছে নিয়ে যাবে।"

ঘরখানা মন্দ নয়। বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাথরুমটাও যে সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে টাটকা ফিনাইলের গন্ধে। দরজা দিয়ে ঢুকে একপাশে বিছানা। আরেক পাশে একটা কাঠের টেবিল আর দুটো ফাইবারের চেয়ার। তার পাশে একটা ওয়ার্ডরোব। তার উপরে স্ট্যান্ডে বসানো এলসিডি টিভি।

যতদিন না একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়, এতে দিব্যি চলে যাবে জেসমিনের। সে ঘড়ি দেখল। এখন বাজে সাড়ে আটটা। তাকে এগারোটা নাগাদ পৌঁছতে হবে এক জায়গায়।

লক্ষ্মণ জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জেসমিন ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল,

"ভাইয়া, হামি বরাসত যাব! ট্রেন মিলে যাবে না?"

"বরাসত না, বারাসত। হ্যাঁ, ট্রেন, বাস সবই আছে," লক্ষ্মণ জবাব দিল। তার কাছ থেকে বনগাঁ লাইনের। ট্রেনের টাইমটেবিলও পেয়ে গেল জেসমিন। হোটেলটা বাজার এলাকার মধ্যে। বড্ড ঘিঞ্জি আর নোংরা। জেসমিন ঠিক করল এখানে সে কিছু খাবে না। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার আছে। তাই দিয়ে আপাতত চলে যাবে তার।

মিষ্টি একটা 'টুং' শব্দ করে উঠল তার মোবাইল। বান্ধবী অস্মিতা মেসেঞ্জারে লিখেছে—

"লে, বন গয়ি তেরি প্রোফাইল। পিকচার উইকচার সব ডাল দি হ্যায় মেয়নে। ইয়ে রহি ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড। যা সিমরন যা, জি লে আপনি জিন্দেগি!"

আইটি প্রফেশনাল বান্ধবীর মেসেজের জবাবে জেসমিন শুধু একটা লাল হৃদয় পাঠাল তাকে।

(৪)

বিকেলের বাজারে সবজির পসরার উপরে জলের ছিঁটে দিচ্ছিল অক্ষয়। কে বলবে এটা নভেম্বরের শেষ? এখনো কী গরম! সব্জি ঘেমে উঠছে। গতকাল কয়েকখানা বাঁধাকপি পচে গিয়েছিল। কী যে দিনকাল

পড়ল। শীতকাল টাটকা শাক সব্জির সময়। আর এই বাজারে কিনা সেই সব্জিকে জলের ছিটে দিয়ে তাজা দেখাতে হচ্ছে।

হৃদয়পুর স্টেশন সংলগ্ন এই সন্ধ্যাবাজারে অক্ষয়ের অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। শীতের দিনে বেলা ছোট তাই, তাই পাঁচটা থেকেই বাজারে ভিড় বাড়তে শুরু হয়। অফিস ফেরত খদ্দেররা ট্রেন থেকে নেমে বাজারের থলে ভর্তি করে বাড়ি ফেরেন। গরমের দিনে ছটার আগে কেউ দোকান খোলে না। কিন্তু কালিপুজোর পর থেকেই এই বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বালব জ্বলে ওঠে সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই।

দুজন মানুষকে বাজারে ঢুকতে দেখে অক্ষয়ের মুখে হাসি ফুটল। এই দুজন তার দোকানের নিয়মিত ক্রেতা। মাস তিনেক হল এখানে এসেছে। লাইনের ওপারে বড় রাস্তার কাছ্র একটা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। সেখানেই রাজমিস্ত্রীর কাজ করে ওরা। একজনের নাম কানাই, আরেকজন সন্তোষ। কিন্তু আজ যেন বড্ড তাড়াতাড়ি দেখা দিয়েছে ওরা।

"কী ব্যাপার, আজ জলদি ছুটি হয়ে গেল মনে হচ্ছে," অক্ষয় হেসে প্রশ্ন করল। সন্তোষ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল,

"হ্যাঁ, কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর কি! হেডমিস্ত্রী বলল যে যার ঘরে ফিরে যাও।"

"কাজ বন্ধ হয়ে গেল! মানে?"

"কে জানে! কতগুলো বাইক এল। পার্টির পতাকা ফতাকা নিয়ে দুদ্দাড় করে কতগুলো লোক উঠে এল। প্রোমোটারের সাথে খুব কথা কাটাকাটি হল খানিকক্ষণ। তারপর কাজ বন্ধ হয়ে গেল," কানাই শুকনো মুখে বলল।

অক্ষয় বুঝে গেল বৃত্তান্তটা। নিশ্চয়ই ওদের থেকে কাঁচা মাল কেনেনি প্রোমোটার, তাই বাওয়াল। এ এক নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে এলাকায়। সব কাজে পার্টির ছেলেরা নাক গলাবে। ওদেরকে টাকা দিতে হবে, ওদের বলে দেওয়া দোকান থেকে বালি সিমেন্ট কিনতে হবে। মামাবাড়ির আবদার একেবারে!

"ওহ, ওই ব্যাপার? কিচ্ছু ভেবো না। একটু চমকেছে। প্রোমোটার সুড়সুড় করে টাকা বের করে দেবে, আবার কাজ চালু হয়ে যাবে।"

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বলল,

"না না, প্রোমোটারবাবু ছাড়নেওয়ালা লোক নয়। ওদের সাথে গলা তুলে কথা বলছিল।"

অক্ষয় হেসে ফেলল এবার,

"ছাড়ো তো! প্রোমোটার কেন, ওর বাপেরও ক্ষমতা নেই ওদের

সঙ্গে লড়াই করার। আরে রুলিং পার্টির দাপট, বুঝলে না? ওদের সাথে আপস করে না চললে এলাকায় টিকতে পারবে ভেবেছ?"

অক্ষয়ের যুক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝে কানাই আর সন্তোষ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর সব্জি কিনে মুরগির স্টলের দিকে এগিয়ে গেল। আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে ওদের। অন্যান্য দিন বাড়ি ফিরে আর রান্না করে খাওয়ার শক্তি বা মানসিকতা, কোনোটাই থাকে না। সারাদিন সাইটে অমানুষিক পরিশ্রিম যায় ওদের। রাজমিস্ত্রীদের অনেকে সাইটেই থাকে। তাই ভাগ বাটোয়ারা করে রান্নাবান্না করে নিতে পারে। সন্তোষ আর কানাই ওই বিষয়ে আপস করেনি। ওরা হৃদয়পুর স্টেশনের কাছেই একটা পুরোনো বাড়িতে ভাড়া থাকে। খুব কম পয়সায় পেয়ে গেছে বাড়িটা। সাইট থেকে হেঁটে যাতায়াত করা যায়, তাই রাতে বাড়িতেই ফিরে আসে। কিন্তু সব সুবিধে তো আর একসাথে পাওয়া যায় না। ঘরে ফিরে এসে তাই ক্লান্ত শরীরেই ফের স্টোভ জ্বেলে বসতে হয় রান্না করতে।

এই এলাকার বেশিদিনের বাসিন্দা না ওরা, কিন্তু এই বাজারের অনেকের সঙ্গেই ভাল পরিচয় হয়ে গেছে। অনেকেই ধারবাকিতে জিনিস দেয় ওদের। ওরা পয়সা মারবে না, সে বিশ্বাস সকলেরই আছে।

স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ওদের ভাড়াবাড়িতে পৌঁছতে লাগে মিনিট পাঁচেক। বেশ পুরোনো একটা দোতলা বাড়ি। দোতলা, তবে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তৈরি। দেখতে অনেকটা স্কুলবাড়ির মতো। একটা টানা বারান্দা চার চৌকো করে ঘিরে রেখেছে একটা বড় উঠোনকে। সেই টানা বারান্দা ধরে হাঁটলে পরপর সব ঘরের দরজা পড়বে। প্রতিটা ঘরের সাইজ এক, জানলা দরজার নকশাও একই। ঘরগুলোর বেশিরভাগই বন্ধ। একমাত্র উত্তরদিকের কয়েকটা ঘরে কিছু মানুষের আনাগোনা আছে। কানাই আর সন্তোষ যে ঘরে থাকে তার ঠিক বাঁপাশের দুটো ঘর জুড়ে একটা ছাপাখানা আর ডানদিকে দুটো ঘরে এক দম্পতি থাকে। ভদ্রলোকের অফিস বাগুইয়াটিতে। তাঁর স্ত্রী অবশ্য সারাদিন বাড়িতেই থাকেন। সাধারণত ঘরের বাইরে বেরোন না। এলাকার অনেকেই জানে ভদ্রমহিলার একটা মাথার গণ্ডগোল আছে।

ওরা যখন বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তার ধারের আলোটাও ঝপ করে নিভে গেল। এই এক সমস্যা এই অঞ্চলে। দিনের মধ্যে কতবার যে লোডশেডিং হয়!

ঘরে ঢুকে এমার্জেন্সি লাইট জ্বেলে দিল কানাই। কতক্ষণে কারেন্ট আসবে কে জানে! এই আলোয় রান্না করা এক ঝকমারি। বাইরের পোশাক পালটে কানাই স্টোভে চায়ের জল চাপাল। সে সিগারেট, বিড়ি

ছোঁয় না। কিন্তু চা ছাড়া তার একটি ঘন্টাও চলবে না।

(৫)

দুপুরে কাকিমার হাতের রান্না একেবারে চেটেপুটে খেয়ে ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুম লাগিয়েছিল রঞ্জন। সন্ধেবেলা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা করার কথা সাদার্ন এভেনিউতে। ওখানে একটা রুফটপ রেস্তোরাঁ আছে। ওদের আড্ডার জায়গা ওটাই।

বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ রঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল কিছু শব্দে। বিছানা থেকে নেমে শব্দটাকে অনুসরণ করে বারান্দায় গিয়ে সে দেখল রাস্তা দিয়ে একটা অটো রিক্সা যাচ্ছে। তার মাথায় একটা লাউডস্পিকার বাঁধা। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। মাসদুয়েকের মধ্যে শহরে পুরভোট। তার আগে বাজার গরম করার কাজ চালাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।

বিরক্ত বোধ করল রঞ্জন। একটু ঘুমোনোর উপায় নেই! যে কদিন এখানে থাকবে এই উৎপাত সইতে হবে তাকে?

বিছানায় ফিরে এসে রঞ্জন দেখল একটা হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ এসেছে। সেটা পাঠিয়েছে শাকিল। রঞ্জনের সমস্ত টিকিটের বুকিং এই শাকিলই করে দেয়। শিলিগুড়ির ছেলে। খুব সেয়ানা। যতই প্যাসেঞ্জারের চাপ থাক, শাকিল ঠিক কনফার্মড সিটের ব্যাবস্থা করে দেয় তাকে।

শাকিল লিখেছে, "দাদা ঠিকমতো পৌঁছেছ তো? কোনো অসুবিধা হয়নি তো তোমার?"

এ আবার কেমন প্রশ্ন? অসুবিধে আবার কীসের? শাকিল তো কোনো দিন এভাবে খোঁজ নেয় না। রঞ্জন ভাবল হয়তো মাঝরাস্তা থেকে সে ট্রেনে উঠেছে বলে শাকিলের একটু চিন্তা ছিল। অসুবিধে আর কী? শুধু নিজের গ্যাটের কড়ি খরচ করে বুক করা সিট উইদাউট টিকিট প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়েছে।

কথাটা মনে হতেই সকালের দৃশ্যটা মনে পড়ল রঞ্জনের। শিয়ালদহ স্টেশনে সে যখন মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলছিল, সে তখন চাদরের মোড়কে ঘুমে কাদা। ঘুম ভেঙে উঠে সে যখন চাদরটা সরায়, সকালের নরম আলো এসে পড়ছিল তার মুখে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে। চেহারাও সুন্দর তার। চোখদুটোয় একটা আবেদন আছে। উচ্চতাও মেয়ে হিসেবে বেশ ভাল।

কী যেন নামটা বলছিল ফোনে? রঞ্জন মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না সে। শিয়ালদহের মতো জায়গায় একটা হোটেলে থাকা একটা মেয়ের পক্ষে খুবই রিস্কি। কে জানে,

কেমন আছে সে?

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় রঞ্জনের মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল। তার ঘর দোতলায়। খাওয়াদাওয়া আর রান্নাবান্না একতলায় হয়। রঞ্জন একতলায় নেমে রান্নাঘরে উঁকি দিল। বাসন্তী থেকে ওয়াটার ফিল্টার থেকে সব বোতলে বোতলে জল ভরছে। বাসন্তীকে তার ঘরে এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলল রঞ্জন। তারপর জিজ্ঞেস করল,

"কাকার আজ কটার সময় ফেরার কথা রে বাসন্তী?"

বাসন্তী বলল,

"দেরি হবে মনে হয়। বৌদি বলল দাদামণি ফোন করেছিল দিল্লি থেকে। ওখানে নাকি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, তাই প্লেন দেরিতে ছাড়বে।"

যাহ, তার মানে সেই রাতে খেতে বসার আগে কাকার সাথে দেখা হবে না! ব্যাপারটা ভাল লাগল না রঞ্জনের। তার ইচ্ছে ছিল আজ ডিনারটা বাইরে বন্ধুদের সঙ্গেই সেরে আসবে। কাকার সঙ্গে তার দুপুরেই দেখা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাকে সাত তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়ে কাকা নিজেই দিল্লি থেকে ফিরছে একদিন দেরি করে। এদিকে পায়েলও এসে পৌঁছবে আগামীকাল। পায়েল রঞ্জনের খুড়তুতো বোন দেবস্মিতার ডাকনাম।

ঘরে বসে চা খেতে খেতে ল্যাপটপ খুলে ফেসবুকে লগ ইন করল রঞ্জন। বন্ধু তো আছেই। তাদের পাশাপাশি রঞ্জনের বান্ধবীর সংখ্যাও বড় কম নয়। কয়েকজনের সঙ্গে তো রীতিমতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার। কাকা কাকিমা এখানে বসে কিছুই টের পান না। শিলিগুড়িতে রনিতার সঙ্গে তার ব্যাপারটা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। রনিতা শিলিগুড়ির বড় বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বড় পোস্টে আছেন তিনি। বিবাহিতা, এবং এক পুত্রের মা। কিন্তু ইদানীং রঞ্জনের সঙ্গে অনেকটাই সময় কাটান তিনি। বয়সে রঞ্জনের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, কিন্তু বিছানায় সেসব মনে থাকে না ওদের।

রনিতা এবার তাকে আসতেই দিতে চাইছিলেন না প্রায়। কিন্তু রঞ্জন বারণ শোনেনি। কাকার আদেশ অমান্য করার হিম্মত তার নেই। তা ছাড়াও কিছু জরুরি ব্যক্তিগত কাজ আছে তার। আর কলকাতায় অন্যান্য বান্ধবীরাও তার সংস্পর্শ চায়। মাঝেমাঝে তাদের কোমরে একটু হাত না বোলালে জীবন বড় আলুনি লাগে যে। রনিতা ভাল, বেশ ভাল। কিন্তু প্রতিদিন দুবেলা খেলে এক সময় বিরিয়ানিও তো একঘেয়েই লাগে।

সমান তালে তিন বান্ধবীর সঙ্গে মেসেঞ্জারে চ্যাট করে চলেছিল রঞ্জন। এবং সেটা করতে করতেই এক সময় তার মনে পড়ে গেল ট্রেনের মেয়েটার নাম। দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল স্পষ্ট। কাউকে ফোনে নিজের নামটা স্পেল করে করে বলছিল সে। মনে করে

করে মেয়েটার নাম পদবী ফেসবুকের সার্চ বারে টাইপ করল রঞ্জন। একই নাম পদবীর পাঁচটা প্রোফাইল রয়েছে। প্রোফাইল পিকচারগুলো দেখতে দেখতে দুটো ছবি খুব কাছাকাছি মনে হল তার। এদের একজন চণ্ডিগড়ের বাসিন্দা। আরেকজনের বাড়ি ইসলামপুরে। নিশ্চয়ই এ'ই হবে।

চট করে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিল রঞ্জন। মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায় কলকাতা শহরের কিছুই সে চেনে না। আর স্বভাবও একটু নরম গোত্রের। ট্রেনের পুরুষমানুষগুলো খুব হেনস্থা করছিল। সেভাবে জবাব দিতে পারেনি বেচারি। অন্য অনেক মেয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া লাগিয়ে দিত। যদি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট করে, তাহলে জানতে চাইবে সে কী কারণে কলকাতায় এসেছে, কোথায় থাকছে। মহিলাদের যে কোনো ধরনের সাহায্য করতে রঞ্জন সবসময় তৈরি।

চা কাপের তলায় গিয়ে পৌঁছেছিল। কাপ রেখে পোশাক বদলে, মাথায় জেল আর গায়ে দামি পারফিউম মেখে সন্ধের হ্যাং আউটের জন্যে তৈরি হয়ে নিল রঞ্জন। একটা বেজ কালারের সামার কোট একেবারে নতুন অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওয়ার্ডরোবে। কাকিমা জন্মদিনে দিয়েছিলেন। বাইরে ঠান্ডা তো ঘন্টা পড়েছে! সামার কোটই ঠিক আছে। কে বলবে আজ নভেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ? শিলিগুড়িতে সূর্য ডুবলেই একটু একটু শিরশিরানি টের পাওয়া যায় বছরের এই সময়ে।

(৬)

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে জেসমিনের হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। রিস্টওয়াচে সময় দেখাচ্ছে বিকেল পাঁচটা পঁচিশ, কিন্তু অন্ধকার হয়ে এসেছে। হোটেলের সামনে রাস্তার উপরে প্রচুর হকারের স্টল। আলো জ্বলে উঠছে সেখানে। হোটেলের দুপাশে ফুটপাথের ধারে সারি সারি দোকান। সেখানে চলছে বিকিকিনি। রাস্তার উল্টোদিকেই প্রকাণ্ড ফ্লাইওভার। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় ল্যান্ডিংয়ে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিল জেসমিন। সে দেখেছিল ফ্লাইওভারের উপরে বিরাট ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ফিরে বাইরের পোশাক বদলে ফ্যান চালিয়ে শুয়ে পড়ল জেসমিন। বাপ রে বাপ! এই শহরে কি ঠান্ডা পড়ে না? নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও এভাবে ঘাম ছুটে যাচ্ছে! তাদের অঞ্চলে তো পুজোর পর থেকেই সূর্য ডুবলেই তাপমাত্রা ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। যে কাজের জন্য সে এসেছে সেটা সফল হবে কিনা জেসমিন জানে না। বেশি সময় নেই তার হাতে। দু-তিনদিনের মধ্যে একটা ফয়সলা না হলে

অন্য উপায় দেখতে হবে তাকে। যার কথায় সে এসেছে এখানে তিনি এখনো বলছেন তাঁর উপরে ভরসা রাখতে। কিন্তু ভরসা রাখতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেই সংশয় ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে জেসমিনের মনে।

ফেরার সময়ে কিছু হালকা খাবার নিয়ে এসেছিল জেসমিন। সাতটা নাগাদ সেগুলো খেয়ে নিয়ে মোবাইলে নেট অন করল সে। এই রুমের চার্জিং পয়েন্টটা গোলমেলে। সকালে ফোন চার্জে বসিয়েছিল সে, কিন্তু বেরোনোর সময় দেখে সামান্য চার্জ হয়েছে। নেট অন থাকলে মোবাইলের ব্যাটারি আরো দ্রুত ফুরোয়, তাই অফ করে রেখেছিল জেসমিন।

টং করে ঘন্টা বেজে উঠল। জেসমিন দেখল ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছে। পাঠিয়েছে রঞ্জন মজুমদার নামের কেউ।

রুফটপ রেস্তোরাঁয় হ্যাং আউট জমে উঠেছিল। তিন পেগ স্কচের মৃদু প্রভাব হতে শুরু করেছিল রঞ্জনের উপরে। সে কোনোদিনই খুব বেশি টানতে পারে না। গোলমাল এড়াতে আজকাল বিয়ারই বেশি পান করে সে। কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে করছিল।

বন্ধু-বান্ধবীরা খোলা ছাদে নাচছে। কয়েকজন যে ইতিমধ্যেই বেসামাল হয়ে পড়েছে, তা তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। রঞ্জনেরও যে ইচ্ছে করছে না, তা নয়। তার এক বান্ধবী তানিয়া অনেকক্ষণ থেকেই চোখের ইশারায় কাছে ডাকার চেষ্টা করছে রঞ্জনকে। তার ডিপ নেক টপ আর স্লিট স্কার্টের আবদনকে উপেক্ষা করতে রঞ্জনকে নিজের সঙ্গে বেশ লড়াই করতে হচ্ছে। করার প্রয়োজন হতো না, যদি না বাড়ি ফিরে ডিনার টেবিলে কাকার মুখোমুখি হতে হতো। তানিয়া নিউটাউনে তার বিরাট ফ্ল্যাটে একাই থাকে। রাতটা জমে যেত। কিন্তু আজ ভাগ্য সহায় নয়।

এখন টেবিলে রঞ্জন একা। তানিয়া বসেছিল একটু দূরের টেবিলে। উঠে এসে রঞ্জনের পাশে বসল। ভাল লাগছিল রঞ্জনের। কাচের প্লেটে নোনতা সাইড ডিশ ফুরিয়ে গিয়েছিল। রঞ্জন হাতের ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে ফাঁকা ডিশ দেখিয়ে বলল,

"রিপিট!"

মোবাইলটা টেবিলের উপরে রাখা ছিল। তানিয়ার সঙ্গে গল্পে মজে ছিল রঞ্জন। এক সময় নোটিফিকেশনের ঘন্টি বাজল। মোবাইলের স্ক্রিনের একেবারে উপরদিকে ভেসে উঠল ফেসবুকের বার্তা—"জেসমিন রৌতেলা অ্যাক্সেপ্টেড ইয়োর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট!"

রঞ্জন দ্রুত আনলক করল মোবাইলটা। তানিয়া উল্টোদিকের চেয়ারে

বসে মিটিমিটি হাসছিল। হুইস্কির গেলাসে মৃদু চুমুক দিয়ে চোখ মেরে জিজ্ঞেস করল,

"নিউ গার্ল?"

বন্ধুদের প্রবল আপত্তি ও বাধা অগ্রাহ্য করে নটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসেছিল রঞ্জন। নিজের ঘরে গিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে বসেছিল ডিনার টেবিলে। সে যা অনুমান করেছিল তাই হয়েছে। কাকা পায়েল আর অনীকের এনগেজমেন্ট পার্টি করতে চান। অনীকের সঙ্গে পায়েলের সম্পর্ক বছর পাঁচেকের। কলেজের বন্ধুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেটা প্রেমে পরিণত হয়। বিয়ে করার তাড়া ওদের ছিল না, কাকাও গত বছর অবধি কিছু বলেননি। কিন্তু ইদানীং তিনি চাইছিলেন ব্যাপারটা প্রকাশ্যে সিলমোহর পাক। অনীক ভাল ছেলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় উঁচু পদে সে চাকরি করে। তার পরিবারকেও রঞ্জনদের বেশ পছন্দ।

কাকার ইচ্ছে আগামী দিন আট দশেকের মধ্যেই ব্যাপারটা সেরে ফেলার। সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যই রঞ্জনকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। একটু অবাক হয়েছিল রঞ্জন। হঠাৎ কাকার এত তাড়াহুড়ো কেন? আর আলাদা করে এনগেজমেন্ট পার্টি করারই বা প্রয়োজন কোথায়? সরাসরি বিয়ের ব্যবস্থাই তো করা যেত!

প্রশ্নটা কাকাকে করার সাহস পায়নি রঞ্জন। রাত্রে যখন ঘরে শুতে যাচ্ছে সে, দেখল কাকিমা দোতলার বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন। রঞ্জনকে দেখে এগিয়ে এলেন।

"কী ব্যাপার বলো তো কাকি? কাকু হঠাৎ পায়েলের এনগেজমেন্ট পার্টি করতে চাইছে কেন? তাও এত শর্ট নোটিসে?"

কাকিমা ঠোঁট উলটে বললেন,

"ভগবান জানে! এমন ভাবনা যে ও ভাবছে সে আঁচ তো আমিও পাইনি আগে। এই তো দিন পাঁচেক হল বলা শুরু করেছে। মনে হয় কোনো বিজনেস ইন্টারেস্ট, বুঝলি তো!"

"বিজনেস ইন্টারেস্ট! কীসের বিজনেস ইন্টারেস্ট? বুঝলাম না!"

"বুঝলি না? পার্টিতে সব বিজনেসম্যানদের ডেকে একটু নিজের প্রতিপত্তি দেখানো। আজকাল আবার মিনিস্টারের সঙ্গে ওঠাবসা বেড়েছে কিনা। তিনিও আমন্ত্রিতদের তালিকায় থাকবেন নিশ্চয়ই," কাকিমা একটু তির্যকভাবে বললেন।

রঞ্জন জানে রাজ্যের এক মন্ত্রীর সঙ্গে কাকার ইদানীং খাতির বেড়েছে। আলাপ আগেই ছিল, এখন দহরম-মহরম একটু বেশি।

ব্যবসা করতে গেলে উপরমহলে একটু কানেকশন লাগে। কিন্তু মন্ত্রীর সঙ্গে ওঠাবসা আছে বলে হঠাৎ মেয়ের এনগেজমেন্ট পার্টি করার কী প্রয়োজন সেটা রঞ্জন বুঝতে পারল না। পার্টিই যদি দিতে হয়, তার জন্য তা হাজার রকমের অজুহাত খুঁজে বের করা যায়।

রঞ্জনের ভাবনাটাকে কাকিমা যেন তার চেহারায় অক্ষরের মতো পড়তে পারলেন। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

"মোচ্ছব করতে চায় করুক। কিন্তু তার জন্য আমার মেয়েটাকে ধরে টানাটানি না করলেই পারত। বেচারির একদম আসার ইচ্ছে ছিল না জানিস! ও চেয়েছিল ক্রিসমাসের ছুটিতে আসতে। এখন আসছে বলে তখন হয়তো আর পারবে না।"

রঞ্জনের ঘুম আসছিল না। রণিতার সঙ্গে কথা বলল কিছুক্ষণ। তারপর মনে হল ট্রেনের মেয়েটার কথা। সে মেসেঞ্জারে লিখল

'হাই!"

মিনিট দুয়েক বাদে জবাব এল

'হ্যালো'

রঞ্জন সকালের কথা বলতেই তাকে চিনতে পারল জেসমিন। তাকে জিজ্ঞেস করে রঞ্জন জানতে পারল সে এখানে এসেছে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। আজ ইন্টারভিউ ভালই হয়েছে, তবে কর্তৃপক্ষ বলেছেন তারা সে যদি নির্বাচিত হয় তবে আগামীকাল সেকেন্ড হাফে তাকে ফাইনাল রাউন্ডের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে। রঞ্জন জিজ্ঞেস করল শিয়ালদহের মতো জায়গায় একটা সাধারণ হোটেলে তার অসুবিধে হচ্ছে কিনা। জেসমিন জানাল এই বিষয়টা নিয়ে সে খুবই চিন্তায় আছে। আজ বাইরে থেকে ডিনার করে ফেরার সময় সে নাকি দেখেছে একটা লোক পাশের ঘরের দরজা ফাঁক করে তার দিকে চেয়ে আছে।

এমনটা যে হতে পারে, তা আগেই অনুমান করেছিল রঞ্জন। জেসমিন সুন্দরী। রীতিমতো মডেলদের মতো চেহারা। পুরুষমানুষরা যে তাকে দেখে ছোঁকছোঁক করবে, এ আর বলে দিতে হয় না।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর রঞ্জন টাইপ করল,

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, মে আই হ্যাভ ইয়োর নাম্বার?"

রঞ্জনের সন্দেহ ছিল জেসমিন হয়তো তার ফোন নাম্বারটা দেবে না। মিনিট দু'তিনেক কোনো সাড়াশব্দ করল না মেসেঞ্জার। তারপর তিনটে বিন্দু নাচানাচি করতে শুরু করল স্ক্রিনে।

নাম্বার দিল জেসমিন। রঞ্জন লিখল আগামীকাল সন্ধেবেলা সে ফোন করবে। যদি চাকরিটা সে পেয়ে যায়, তাহলে অন্য কোথাও তার থাকার

ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা রঞ্জন দেখবে।
জেসমিন একটা স্মাইলি দিল। তারপর লিখল
'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। গুড নাইট!'

(৭)

পরদিন দুপুরে একটা কাজে ক্যামাক স্ট্রিট গিয়েছিল জেসমিন। সেখানে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তার। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও কেনার ছিল। সব কাজ মিটতে মিটতে প্রায় চারটে বেজে গেল। ক্যামাক স্ট্রিট থেকে যখন হোটেলে ফেরার জন্য ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছে সে, তখন মোবাইলে রিং টোন বেজে উঠল। ট্রু কলারে নাম দেখাচ্ছে রঞ্জন মজুমদার।

কল রিসিভ করতেই ওপার থেকে পুরুষকণ্ঠ বলল,
"হা ম্যাডাম, আপ কা ইন্টারভিউ ক্যায়সা রহা?"

জেসমিন জানাল তার চাকরিটা হয়ে গিয়েছে। অফার লেটার তাকে মেইল করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নতুন অফিস। ডিসেম্বরের এক তারিখে তাকে জয়েন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ভাল ড্রেস সংখ্যায় খুব বেশি নেই, তাই সে শপিং করতে এসেছিল ক্যামাক স্ট্রিটে।

রঞ্জন উৎসাহিত হল। সে'ও এই মুহূর্তে চাঁদনি চকে রয়েছে। জেসমিনকে দেখা করতে বলল সে। মৃদু আপত্তির পরে দেখা করতে রাজি হল জেসমিন। মেয়েটা কলকাতা শহরের কিছুই চেনে না, তাই রঞ্জন তাকে বলল ফোনটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিতে। আলিয়া রেস্তোরাঁর সামনে জেসমিনকে নামিয়ে দিতে বলল সে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ট্যাক্সি এসে থামল নির্ধারিত জায়গায়। জেসমিনকে চমৎকার দেখাচ্ছে শার্ট আর ট্রাউজারে। তবে চুলের কায়দাটায় একটা মফঃস্বলের ছাপ খুব স্পষ্ট। রেস্তোরাঁয় বসে কথা শুরু করেই প্রথমে রঞ্জন এই বিষয়টায় তাকে নজর দিতে বলল। রঞ্জন হিন্দি ভালই বলতে পারে তবে 'হুয়া' 'হুয়ি'তে এখনো গোলমাল হয়ে যায় তার। জেসমিন হেসে ফেলছিল তার এই গুলিয়ে ফেলা দেখে। তারপর বলল রঞ্জনকে এত কষ্ট করে হিন্দিতে কথা বলতে হবে না তার সাথে। সে বাংলা ভালই বোঝে এবং দিব্যি বলতে পারে।

তবে জেসমিনের হাসি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল না। রঞ্জনের মনে হচ্ছিল কিছু একটা চিন্তা তার মনোযোগকে আকর্ষণ করছে। সে জানতে চাইল কী সেই ভাবনা যা জেসমিনকে এত উদ্বীগ্ন করে তুলেছে।

জেসমিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। রঞ্জন জোর করায় শেষে বলল,

"এই হোটেলে থাকা পসিবল হবে না আমার পক্ষে। সবসময় কতগুলো লোভী চোখ যেন ফলো করছে আমাকে। কিন্তু এখানে একমাত্র মানিকতলার এক বন্ধু ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। আর এখান থেকে অফিসটাও কাফি দূরে। এতদূর থেকে রোজ ট্র্যাভেক করব কী করে সেটাও একটা টেনশন!"

রঞ্জনের মনে পড়ল হোটেলের সমস্যার কথা মেয়েটা গতকালও বলেছিল। সে জিজ্ঞেস করল,

"তোমার অফিস কোথায়?"

"বারাসতে। কী সাম বাংলো না ডাকবাংলো মোড়...ইটস দেয়ার!"

রঞ্জন চোখ বড় বড় করে বলল,

"ডাকবাংলো মোড়! যাহ, আগে বলবে তো। যাও তোমার প্রবলেম সলভড!"

"মতলব...আই মিন তার মানে?" বিস্ময় প্রকাশ করল জেসমিন।

"মানে তোমাকে জানতে হবে না। আজকের রাতটা কোনোরকমে কষ্টশিষ্ট করে হোটেলে থেকে নাও। সব গুছিয়ে রাখবে। কাল সকালে একটা গাড়ি যাবে। তুমি জিনিসপত্র সব নিয়ে উঠে পড়বে, ব্যস! একদম বড়িয়া বিস্তর বাঁধকে, ঠিক আছে?"

জেসমিন হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে রঞ্জন হেসে বলল,

"আরে বাবা, এত অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের নিজেদের বাড়ি আছে হৃদয়পুর স্টেশনের কাছে। বিরাট বাড়ি। প্রায় ফাঁকাই পড়ে আছে। সেখানে দুটো ঘরে তুমি দিব্যি থাকতে পারবে। তোমার জন্যে সুবিধেই হবে। হৃদয়পুর স্টেশন থেকে ডাকবাংলো মোড় কাছে।"

জেসমিন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল রঞ্জনের দিকে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না এই বিশ্রী পরিবেশটা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে।

রঞ্জন বলল,

"দেখো, খুব ল্যাভিশলি হয়তো থাকা যাবে না। পুরোনো বাড়ি তো, সেটিংও সেরকম। যদি অসুবিধে মনে হয় তোমার অফিসের আশেপাশে কোথাও পিজি দেখে নিও কদিন পরে। সেই কটা দিনের জন্য এটা একটা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট ধরে নাও। যে হোটেলের কথা বলছ, তার চেয়ে তো অ্যাট লিস্ট সেফ আমাদের বাড়ি!"

জেসমিন যে স্বস্তি পেয়েছে তা তার মুখ দেখেই দিব্যি বুঝতে পারল রঞ্জন। উদ্বেগের কালো মেঘ সরে গিয়ে যেন রোদ ঝলমল করছে এখন।

"থ্যাঙ্ক ইউ দাদা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমার উপর অনেক প্রেশার। বাবা বেড রিডেন। মা একটা প্রাইভেট স্কুলে জব

করত। লকডাউনের পরে সেই জব চলে গেল। উই হ্যাভ নো ইনকাম। বাবার ট্রিটমেন্টের জন্য একজনের কাছে থেকে সেভেন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড রুপিজ নিয়েছিলাম। সে এখন রোজ ফোন করে থ্রেট করে। কী বলছে জানেন?"

"কী বলছে," রঞ্জন কৌতূহল প্রকাশ করল।

"বলছে টাকা না দিতে পারলে আমার ব্যবসায় ঢুকে যাও। তোমার লুক আছে, ফিগার আছে। আমার টাকাও উঠে যাবে আর তোমারও একটা ফিক্সড ইনকামের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে! আমার মনে হচ্ছে ও আমার পিছনে লোক লাগিয়ে রেখেছে। সে এখান অবধি এসেছে। খুব আনকমফর্টেবল লাগছে আমার। আই নিড দিস জব ব্যাডলি। অ্যান্ড আই হ্যাভ টু মুভ টু সামহোয়্যার এলস!"

রঞ্জনের খারাপ লাগল জেসমিনের অবস্থা শুনে। নাহ, এই মেয়েটার সমস্যার সমাধান দ্রুত করতে হবে। অসুবিধে কিছু নেই। হৃদয়পুরে তাদের পৈত্রিক বাড়িতে দুটো ঘর স্রেফ একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। সে ফোন করল দীনেশদা'কে। হৃদয়পুরের বাড়ির দেখাশোনা করে দীনেশদা। অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ।

জেসমিন রাস্তা চিনে হোটেলে ফিরে যেতে পারবে বলেছিল। কিন্তু রঞ্জন শুনল না। তার গাড়ি পার্ক করা ছিল কাছেই এক বন্ধুর অফিসের নিচে। গাড়ি যখন মৌলালির কাছাকাছি, তখন জেসমিনের মোবাইল বেজে উঠল। নাম্বারটা দেখামাত্র তীব্র বিরক্তি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। রঞ্জন সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল,

"সেই লোক নাকি?"

জেসমিন ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বোঝাল। রঞ্জন বলল

"রিসিভ করো কলটা। আর ফোনটা স্পিকারে দাও তো!"

জেসমিন কল রিসিভ করে স্পিকার অন করতেই ওপার থেকে একটা কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ বলল,

"কেয়া সোচি? কিউ ফালতু কা টাইম ওয়েস্ট কর রহি হ্যায়? মেরা পইসা ওয়াপস কর ইয়া ফির লাইন মে আ যা! অফার দিয়া না তুঝে?"

জেসমিন বলল,

"থোড়া টাইম দিজিয়ে না ভাইয়া। ম্যায় পেয়সে কা ইন্তাজাম কর লুঙ্গি।"

ধমকে উঠল পুরুষ কণ্ঠ এবার,

"অওর কিতনা টাইম চাহিয়ে তুঝে? শুন বহেন! আজ গুরুবার হ্যায়। ইস সানডে তক আগর মেরা প্যায়সা মুঝে ওয়াপস নহি মিলা তো তেরা ঘর বরবাদ হো গা। সমঝ লে। অভি তক তো তুঝে বহেন বুলা রহা হু। সানডে কে বাদ কুছ অওর বোলকে পুকারনা পড়েগা।"

(৮)

শীতের রাতে পাড়া নিঝুম হয়ে এসেছে। একটু দূরে হট্টগোল করছে কয়েকটা কুকুর। আজ দুপুরের দিকে মিনিট পনেরো বৃষ্টি হয়েছে। তারপরই ঝপ করে অনেকটা নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা।

সাইকেল চালিয়ে মালবাজার থানার পথে চলেছেন তাপস মল্লিক। চাদর দিয়ে তাঁর কান মাথা ঢাকা। তবু ঠান্ডায় গা শিরশির করছে। পঞ্চান্ন বছরের তাপস পেশায় শিক্ষক। অসুস্থতার কারণে স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বছর খানেক আগে। এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করেন। আটজন ছাত্র ছাত্রীকে পড়ান তিনি। তারা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ে। স্যরকে খুব শ্রদ্ধা করে তারা। ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাভকেরাও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকান তাপসবাবুর দিকে। কিন্তু ইদানীং সেই সম্ভ্রমের সঙ্গে কিছুটা সহানুভূতি এবং করুণা মিশছে।

থানার বাইরে সাইকেল স্ট্যান্ড করলেন তাপস। সাইকেলের বেলের শব্দেই থানার ভিতরে ইন্সপেক্টর অতীন্দ্র বর্মন টান হয়ে বসলেন। তিনি অনুমান করে নিয়েছেন কে আসছে। গত দু'মাসে এটা একটা রুটিনে পরিণত হয়েছে। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন তাপসবাবু আসেন এখানে। ছিপছিপে চেহারার তাপস মল্লিকের স্বাস্থ্য ইদানীং কিছুটা ভেঙেছে। হাঁটাচলায় আগে যে আত্মবিশ্বাসটা প্রকাশ পেত, সেটা টোল খেয়েছে কিছুটা। তাঁকে দেখে অতীন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন।

"স্যর, এই শীতের রাতে রোজ রোজ কষ্ট করে কেন আসেন আপনি? কিছু খবর হলে আপনাকে তো জানাবই," তিনি বললেন।

তাপস টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

"কী করি বলুন? দায়িত্ব থেকে তো পিছপা হইনি কোনোদিন। এটা আমার দায়িত্ব। মেয়ে হারানো বাপের কি ঘরে পায়ের উপরে পা তুলে বসে থাকা সাজে?"

তাপসের মেয়ে ঝিমলিকে সেপ্টেম্বর মাসের আঠাশ তারিখ থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মোবাইলটাও বন্ধ হয়ে রয়েছে সেই থেকে। ঝিমলিও তার বাবার মতো প্রাইভেট টিউশনি করতো। তা ছাড়াও গান, আবৃত্তি, নাটক নিয়ে মেতে থাকত সারাক্ষণ। পাড়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় মেয়ে ছিল সে। যেমন তার রূপ ছিল, তেমনই গুণ। পাড়ার যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঝিমলির উপস্থিতি ছিল বাধা। ঝিমলি খুবই দায়িত্বশীল মেয়ে ছিল। হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়ে তার বাবা যখন শয্যাশায়ী, তখন রোজগারের জন্যই সে প্রাইভেট টিউশনি শুরু করেছিল। তাপসবাবু যুক্ত ছিলেন একটি বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে। সেই সময় স্কুল এমনিতেই কর্মী ছাটাইয়ের পথে হাঁটার কথা ভাবছিল।

তাপসের অসুস্থতাটা সহজ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে।

"কোনো খবরই কি পাওয়া যাচ্ছে না স্যর," নরম গলায় প্রশ্ন করলেন তাপস।

অতীন্দ্র বর্মন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। হাতজোড় করে বললেন,

"প্লিজ, আমাকে স্যর বলে সম্বোধন করে আর লজ্জা দেবেন না! আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করি। সত্যি বলতে কি স্যর, আপনাকে দেওয়ার মতো কোনো খবর আমার কাছে এখনো নেই। মিথ্যে আশ্বাস আমি দিতেই পারি, কিন্তু সেটা আপনাকে ঠকানো হবে। সৌমেনবাবুও নিয়মিত ঝিমলির ব্যাপারে খোঁজ নেন। চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি স্যর, এটুকুই রোজ বলি আপনাকে। আজও এটুকুই বলতে পারব।"

সৌমেন নস্কর তাপসবাবুদের এলাকার দাপুটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের তরফ থেকে তাঁর টিকিট একেবারে পাকা বলে মনে করেন অনেকেই। তাপস বললেন,

"ওঁর মতো বড়মাপের মানুষ এই ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন, এ আমার সৌভাগ্য। ওঁর উপর দিয়েও তো কম বড় ঝড় গেল না।"

সৌমেন নস্করের স্ত্রী গোপা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। সংসারে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে তেমন অশান্তি ছিল বলে কেউ কখনো শোনেনি। ঠিক কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা এক রহস্য। ঝিমলি সৌমেননাবুর দুই মেয়েকেও পড়াত, তাই দুই পরিবারের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে। ভদ্রলোক তাপসকেও বারকয়েক ফোন করে জানতে চেয়েছেন ঝিমলির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল কিনা।

তাপস কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্য প্রসঙ্গে গেলেও আবার ফিরে এলেন মূল বিষয়ে,

"দু'মাস হতে চলল। কোনোরকম কোনো আভাস, কোনো সন্দেহ বা অনুমান, কিছুই কি বলার মতো নেই আপনার কাছে?" কন্যাহারা পিতার গলা করুণ শোনালো।

অতীন্দ্র বর্মন কয়েক মুহূর্ত জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে ভেসে আসছে দূরপাল্লার ট্রেনের দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়ার শব্দ। সেই শব্দটাকে অনুসরণ করে তিনি বললেন,

"আমার এখনো স্থির বিশ্বাস ঝিমলি যেখানেই থাকুক, সুস্থ আছে। নর্থ বেঙ্গলে সে নেই বলেই আমার মনে হয়। থাকলে এতদিনে কিছু না কিছু লিড ঠিক পেতাম।"

"তবে সে কোথায় আছে? কোথায় থাকতে পারে? কিছু নিশ্চয়ই আপনারা জানতে পেরেছেন!"

"সম্ভবত সে কলকাতায় আছে। এর বেশি কিছু এখনই বলার নেই। একটা কথা আপনাকে দিতে পারি স্যর। সময় লাগলেও ঝিমলিকে খুঁজে আমরা ঠিকই বের করবো। এটা আমার কাছেও চ্যালেঞ্জ। আপনার মতো মানুষের এই হয়রানি আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। আপনি বাড়ি যান স্যর। এভাবে রোজ আসার দরকার নেই। সামান্য একটা খবর পেলেও আমি আপনার বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসব, এটা এই অতীন্দ্র বর্মন আপনাকে কথা দিচ্ছে।"

তাপসের জন্য চা আনিয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোক আপত্তি করেননি। চা শেষ করে ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটা থানার দরজা অবধি গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন,

"আসি কি আর সাধে স্যর? আমার তো ওই একটিই। ঝিমলির বয়সী কোনো মেয়ের গলা পেলেই ছুটে যাই দরজার কাছে। ভাবে এই বুঝি মেয়েটা ফিরে এল। রোজ যখন পড়িয়ে বাড়ি ফিরি, ভাবি আজ বুঝি গিয়ে দেখব সে বসে আছে দরজার সামনে। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। আসি। শুভরাত্রি!"

তাপস মল্লিক চলে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন অতীন্দ্র। এই থানায় তিনি নতুন এসেছেন। একমাস মোটে হয়েছে। এখনো এলাকার সবকিছু তাঁর নখদর্পণে নেই। ঝিমলির কেসটা নিয়ে তিনি যে চিন্তা করেন না, এমন নয়। খোঁজখবর করে তিনি জানতে পেরেছেন মেয়েটার অভিনেত্রী হওয়ার শখ ছিল। মেয়েদের এই একটা দুর্বলতার সুযোগ প্রায়শই নিয়ে থেকে কিছু অসাধু মানুষ। উত্তরবঙ্গে সেরকম মানুষদের বেশ কয়েকটি চক্র আছে। এদের কাজই মেয়েদের বিলাসবহুল জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে কব্জা করা এবং তারপরে অনত্র পাচার করে দেওয়া। ঝিমলি সেরকমই কোনো চক্রের খপ্পরে পড়েছিল বলে অতীন্দ্রর অনুমান। কিন্তু এখনো এই ভাবনাকে সমর্থন জানানোর মতো কোনো তথ্য তাঁর হাতে আসেনি।

(৯)

কথামতো সকালেই শিয়ালদহের হোটেলে গাড়ি পাঠিয়ে দিল রঞ্জন। গাড়ির ড্রাইভার হোটেলে এসে জেসমিনের সমস্ত জিনিস নিয়ে নেমে গেল। গাড়িটা নাকি একটু দূরে কোথাও সে পার্ক করেছে।

রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময় একবার পিছন ফিরে তাকাল জেসমিন। তার দুটো রুম পরে যে রুমের দরজা, সেখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল। জেসমিন কেবল তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর নেমে গেল নিচে। রঞ্জন গাড়িতেই বসেছিল।

জেসমিনকে আসতে দেখে সে গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই জেসমিন কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল,

"থ্যাঙ্কস। আপনি সত্যিই খুব ফেভার করলেন। ডোন্ট নো হাউ টু রি-পে ইউ। এই হোটেলে আর একদিনও থাকতে হলে আমাকে সব ফেলে বাড়িই ফিরে যেতে হতো। ইউ নো, আই কলড মাই ফ্রেন্ড লাস্ট নাইট। খুব গালি দিলাম ওকে। বললাম ইউ কুড হ্যাভ সাজেস্টেড স্টেয়িং অ্যাট দ্য স্টেশন ইয়ার। দ্যাট উড হ্যাভ বিন ফার বেটার। এই হোটেলে থাকা! জাস্ট ইমপসিবল।"

রঞ্জন হেসে বলল,

"বাদ দাও না। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে একবেলা থাকলে দেখবে এই হোটেলের দুই রাতের কথা আর মনেই থাকবে না তোমার।"

হৃদয়পুর পৌঁছতে প্রায় একঘন্টা লেগে গেল। ট্র্যাফিক জ্যামের কারণে এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেট থেকে বিরাটি মোড় যেতেই ওদের লেগে গিয়েছিল আধঘন্টা। বিরাট চওড়া রাস্তা দিয়ে এতক্ষণ এসেছে গাড়িটা। এক জায়গায় সেটা যখন বাঁদিকে টার্ন নিচ্ছে, তখন রঞ্জন সামনে দেখিয়ে বলল,

"এই আমরা হৃদয়পুর স্টেশনের দিকে ঘুরে যাচ্ছি। আর এই বাঁদিকে টার্ন না নিয়ে সোজা গেলেই ডাকবাংলো মোড়। সোজা তাকাও। দেখতে পাচ্ছ একটা উঁচু বাড়ি?"

জেসমিন বলল,

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"ওটাই ডাকবাংলো মোড়। তুমি কাল ট্রেনে এসেছিলে, না? বারাসতে নেমেছ নিশ্চয়ই? ওই জন্যই এদিক থেকে দেখে চিনতে পারছ না!"

জেসমিন হেসে বোঝাল রঞ্জনের অনুমান সঠিক। রঞ্জন বলল,

"তোমাকে আমাদের বাড়ির ওখান থেকে রিকশা বা টোটো নিতে হবে। বেশিক্ষণ লাগে না।"

রেলগেট পেরিয়ে মিনিটখানেক এঁকেবেঁকে চলার পরে ড্রাইভারকে একটা বড় দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল রঞ্জন। জেসমিনকে নামতে ইশারা করল সে। রাস্তার ধারে বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে লাগানো একটা লোহার গেট। সেটার উচ্চতা জেসমিনের মাথা ছুঁই ছুঁই। গেটের পাশে দেওয়ালের থামের উপরে মার্বেলের ফলক লাগানো। তাতে লেখা 'মায়া ভবন'। গেটের ওপারে বিরাট বাগান আর তারপরে বাড়ি। লম্বা টানা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। সেই বারান্দা বরাবর পরপর সব ঘর। সবকটারই দরজা বন্ধ। বাড়িটা বেশ পুরোনো। তার দেওয়ালের গায়ের রং যে সাদা সেটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু শ্যাওলার আস্তরণ তার অস্তিত্ব সংকটে ফেলেছে। ছাদের দিকে দেওয়াল থেকে

বুনো গাছ বেরিয়ে দিব্যি ডালপালা মেলেছে।

জেসমিন সেদিকেই চেয়ে আছে দেখে রঞ্জন হেসে বলল,

"ডোন্ট ওয়ারি! উপরটা একেবারেই ফাঁকা পড়ে আছে বলে কোনো মেন্টেনেন্স হয় না। তোমার ঘর একতলাতেই। ওদিকটা পরিষ্কারই আছে।"

জেসমিন দেখল একজন ষাট-পয়ষট্টি বছরের মানুষ এগিয়ে আসছে বাগানের মধ্যে দিয়ে। রঞ্জন বলল,

"ওই তো দীনেশদা চলে এসেছে শব্দ পেয়েই। উনিই এ বাড়ির কেয়ারটেকার। সুবিধা অসুবিধা সব ওনাকেই বলবে। খুব ভাল মানুষ। আর দারুণ বাঁশি বাজান, জানো?"

জেসমিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে দীনেশদা তার কাঁধের ব্যাগখানা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

বাইরে থেকে যে পরপর ঘরগুলো জেসমিন দেখতে পেয়েছিল, তারই দুটো ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

রঞ্জন সেই ঘরে ঢুকেই সুইচবোর্ডে এলোপাথাড়ি হাত চালাতে লাগল। দীনেশদা বলল,

"সব ভুলে মেরে দিয়েছ! কতকাল আসো না, সে খেয়াল আছে?"

রঞ্জন হাসল। তারপর জেসমিনকে ঘরের এক কোণের একটা দরজা দেখিয়ে বলল,

"নাও, তোমার জন্য অ্যাটাচড বাথরুমওয়ালা ঘরই দিলাম। এ বাড়ির সব ঘরে এরকম অ্যাটাচড বাথরুম নেই কিন্তু। অ্যাকচুয়ালি এই ঘরদুটো ছিল আমার ছোটপিসির। পিসির কিছু ফিজিক্যাল প্রবলেম ছিল। বেশি হাঁটাচলা করতে পারত না। তাই তার জন্য পরে ঘরের মধ্যে দেওয়াল তুলে আলাদা বাথরুম করা হয়েছিল।

জেসমিন চটপট চোখ বুলিয়ে নিল ঘরে। একা একটা মেয়ের জন্য অনেকখানি জায়গা। এক ঘর দিয়েই আরেক ঘরে যাওয়া যায়। যে ঘর দিয়ে ওরা ঢুকেছিল তাতে একটা চৌকি পাতা আছে। তার উপরে গুটিয়ে রাখা রয়েছে তোষক। দীনেশদা কোথা থেকে যেন একটা বেড শিট নিয়ে এসে তোষক পেতে বিছানা করে দিল। এ ছাড়া এই ঘরে রয়েছে একটা কাঠের আলমারি। তার ভিতর থেকে বালিশ, গায়ে দেওয়ার চাদর, একটা পাতলা কম্বল আর ভাঁজ করা মশারি বের করে দীনেশদা রাখল বিছানার উপরে। পাশের ঘরে বিশেষ কিছুই নেই একটা কাঠের টেবিল আর দুটো চেয়ার ছাড়া। দেওয়ালের গায়ে কতগুলো তাক রয়েছে। তার দুটোতে কিছু বই খাতা শোয়ানো অবস্থায় রাখা রয়েছে। বাথরুমটা এই ঘরের সঙ্গেই।

জেসমিন বাইরের ঘরে ফিরে এল। এই ঘরে দরজার অপর প্রান্তে

রয়েছে আরেকটা দরজা, আর তার পাশেই জানলা। জেসমিন সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে বাড়ির ভিতর দিকটা দেখা যাচ্ছে। এদিকেও বাইরের দিকের মতোই একটা টানা বারান্দা রয়েছে। সেটা একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে। মাঝখানে সবুজ জমি। তার উপরে শীতের দুপুরের নরম রোদ এসে পড়ছে। এরকম নকশা হয় স্কুলবাড়ির। টানা বারান্দা বরাবর পরপর সব ক্লাসরুম থাকে। স্কুলবাড়ির মতোই টানা এই বারান্দার মাঝে মাঝে কোল্যাবসিবল গেট দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোয় তালা ঝুলছে।

রঞ্জন জেসমিনের পাশে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল,

"কী ভাবছ? খুব অসুবিধে হবে।"

জেসমিন জিভ কেটে বলল,

"ইস, ছি ছি! একেবারেই অসুবিধা হবে না। আসলে আমার স্কুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এত বড় বাড়ি মানুষ জাস্ট নিজের থাকার জন্য বানিয়েছে, এটা জাস্ট ভাবা যায় না।"

দীনেশদা সামান্য জলখাবারের ব্যবস্থা করেছিল। সেটা খেতে খেতে এ বাড়ির গল্প শুনছিল জেসমিন। রঞ্জনদের ঠাকুরদারা ছিলেন ছয় ভাই। তাঁদের বাবা এই বাড়ি তৈরি করেন। এক সময় এই বাড়ির সদস্য সংখ্যা ছিল তিয়াত্তর। কালে কালে সকলেই এই বাড়ি ছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এত শরিক হওয়ার কারণে কারোর সাথে কারোর মতের মিল হয় না। কেউ এই বাড়ির অধিকারও ছাড়তে রাজি নয়, আবার বাড়ির একটা গতি করার বিষয়েও আগ্রহ নেই কারোর।

দীনেশদা বলল,

"দোতলায় কার্তিকের অংশে গোটা পনেরো ছেলে মেস করে থাকত। ওরা যতদিন ছিল, তবু বাড়িটার একটু প্রাণ ছিল। গান বাজনা, হৈ হুল্লোড় করত। কোনো অসভ্যতা করতো না। কিন্তু তারাও যে সেই লকডাউনের সময়ে চলে গেল যে যার বাড়ি, আর ফিরে এল না। এখন প্রাণী বলতে আমি, ওইদিকে প্রেসের কয়েকজন, তার পাশের ঘরে দুটো রাজমিস্ত্রী আর একটা ঘরে স্বামী স্ত্রী। তাও স্বামীটা তো থাকেই না প্রায়। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন হয়তো আসে।"

রঞ্জন বারোটা নাগাদ উঠে পড়ল। জেসমিনকে বলে গেল সে মাঝেমাঝেই খোঁজখবর নেবে তার। দীনেশদা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে? জেসমিন বলেছে দুপুরের খাবার সে অফিসেই খাবে। রাত্রে সে দুটো রুটি খায়। সেটার ব্যবস্থা দীনেশদাই করবে। রঞ্জন কিছুতেই ভাড়া বাবদ কোনো টাকা নিতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু জেসমিনও এভাবে একতরফা সুবিধে নিতে রাজি নয়। শেষমেশ তার জেদের কাছে হার মানল রঞ্জন।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোমার যা সুবিধে মনে হয়, দীনেশদার হাতে দিও। তাই বলে এক্ষুণি দরকার নেই। নেক্সট মাসে স্যালারি পাওয়ার পরে দিও। এবার ঠিক আছে তো? আর কোনো অস্বস্তি নেই তোমার, আই হোপ!"

ওরা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পরে দরজা ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল জেসমিন। নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথার মধ্যে। বাড়ি তো পাওয়া গেল। এবার তো কাজটাও ঠিক করে করতে হবে। নাহলে সবই মাটি। একটা জেদ নিয়ে সে এসেছে। কিছু করে দেখাতে চায় সে। পারবে কি সে? একা একটা মেয়ের পক্ষে কাজটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু জেসমিন চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায়নি কোনোদিন।

উঠে বসল জেসমিন। হোয়াটস অ্যাপে নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্টের প্রোফাইলে ক্লিক করল। মেসেজ বক্সে টাইপ করল,

"লেভেল ওয়ান কমপ্লিট!"

ওপার থেকে প্রথমে একটা বুড়ো আঙুল দেখানো ইমোজি এল। তারপর ভেসে উঠল মেসেজ,

"প্লে ওয়েল!"

(১০)

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাতটা শহরেই থেকে যাবেন বলে স্থির করলেন সৌমেন নস্কর। হাকিমপাড়ায় তাঁর একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট আছে। এমনিতে খালিই থাকে সেটি। দেখাশোনার জন্য অজয় নামের একটি ছেলেকে তিনি রেখেছেন সেখানে। পার্টির কাজ বা অন্যান্য প্রয়োজনে শিলিগুড়ি এলে মাঝেমাঝে সেখানে এক দু'দিন সেখানে থেকে যান সৌমেন।

শিলিগুড়ির হাসপাতালে ভর্তি আছেন সৌমেনের এলাকার বিধায়ক পবিত্র বর্মন। শরীরে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছিল সপ্তাহখানেক আগে। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় ডাক্তার গত পরশু তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। আজ সৌমেন পবিত্রবাবুকে দেখতে এসেছিলেন। ডাক্তাররা কোনো আশার কথা শোনাননি। বিধায়কের পরিবারবর্গকে তাঁরা বলেছেন বিপর্যয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে। ভিজিটিং আওয়ারের পরে পবিত্রবাবুর স্ত্রী ও দুই পুত্রের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন হাসপাতালের ডাক্তাররা। তাঁদের সঙ্গে ডাক্তারের কেবিনে সৌমেনও ছিলেন। মালবাজার থেকে তাঁর গাড়িতেই এসেছিলেন ওঁরা। হাকিমপাড়ায় ফ্ল্যাটের কাছে সৌমেনকে নামিয়ে গাড়ি ওদের নিয়ে

মালবাজার ফিরে গেল। দলের বর্ষীয়ান নেতা পবিত্রবাবু একজন আদ্যন্ত সৎ মানুষ। রাজনীতির ময়দানে আছেন বলে বলে বিরোধীদের সমালোচনা ও আক্রমণের মুখে প্রায়শই তাঁকে পড়তে হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তি পবিত্র বর্মনকে তাঁরাও শ্রদ্ধা করেন। দলের দীর্ঘদিনের নেতা এবং গত সাত বছর ধরে বিধায়ক তিনি। তবু আজও বাস করেন একটা একতলা বাড়িতে। পার্টি অফিসে আসেন সাইকেল চালিয়ে। সৌমেনকে রাজনীতিতে তিনিই এনেছিলেন। পবিত্রবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে জামাকাপড় বদলে সৌমেন অজয়ের হাতে টাকা দিলেন কিছু জিনিস আনার জন্য। আজ এখানে থাকবেন বলে দুজন পরিচিতকে সন্ধেবেলা ফ্ল্যাটে আসতে বলেছেন তিনি। একেবারে নৈশভোজ অবধি আজ তাঁদের নিমন্ত্রণ এই বাড়িতে। কিছু জরুরি আলোচনার জন্যই তাঁকে আজ এখানে ডেকেছেন সৌমেন। মালবাজারের বাড়িতে সবাইকে আসতে বলতে পারেন না তিনি। অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগের জন্য আজকাল তাঁকে ভরসা করতে হয় ভিডিও কলের উপরে। এই মুহূর্তে ফ্ল্যাটে তিনি একা, তাই কয়েকটা জরুরি ফোনকল সেরে নিলেন সৌমেন। একটা বিষয় সম্প্রতি তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বেশিদিন এই চিন্তাটাকে বয়ে বেড়াতে চান না সৌমেন। কিছু একটা ব্যবস্থা খুব দ্রুত তাঁকে করে ফেলতে হবে।

বিষয়টা নিয়ে দুই পরিচিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিয়ে অতিথি আপ্যায়নের জন্য দামি কাচের গেলাস ও স্ন্যাক্স ঢেলে রাখার জন্য পোর্সিলিনের ট্রে আলমারি থেকে বের করে বসার জায়গায় কাচের টেবিলের উপরে রাখলেন সৌমেন।

অজয় জিনিসপত্র নিয়ে এসে পড়ল আধঘন্টার মধ্যেই। তার কিছুক্ষণ বাদেই বেজে উঠল কলিং বেল। অজয় দরজা খুলে দিতেই হাসিমুখে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলেন এক পুরুষ ও এক মহিলা। পুরুষটির বয়স চল্লিশের আশেপাশে। তাঁর উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রং ফর্সা, চেহারা ছিপছিপে। মহিলাকে বেশ সুন্দরী বলা চলে। তাঁর বয়স পয়ত্রিশের বেশি হবে বলে অজয়ের মনে হল না। সৌমেন ফোনে কথা বলছিলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে। অতিথিরা এসে পড়েছেন দেখে কল ডিসকানেক্ট করে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এমন অতিথি সমাগমের সঙ্গে অজয় পরিচিত। এরকম দিনে সন্ধেবেলা অজয়ের ঘন্টাদুয়েকের জন্য ছুটি হয়ে যায়। সে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ফ্ল্যাটে ফিরে আসে রাত দশটা নাগাদ। আজও তার অন্যথা হল না। অজয় খুশিই হল। স্যর আজ সকালে ফোনে জানিয়েছিলেন

বিকেলে একবার ফ্ল্যাটে আসতে পারেন। অজয় তখনই তার বান্ধবীকে বলে রেখেছিল সন্ধেবেলা দেখা হতে পারে। স্যরের কড়া নির্দেশ আছে। তাঁর অনুমতি ছাড়া বাইরের কোনো লোককে সে এই বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারবে না। তার বান্ধবী শিলিগুড়িতে একটি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে। সম্পাদকীয় দফতরের কাজ না হলেও অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে তার প্রায়ই রাত আটটা বেজে যায়। তাই ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয় না নিয়মিত। প্রেমালাপের মাধ্যম হিসেবে ওদেরকেও নির্ভর করত্ব হয় সেই ভিডিও কলের উপরেই। আজ তার বান্ধবীর উইকলি অফ ডে। তাই সন্ধেবেলার এই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ছুটিটার সদ্ব্যবহার করতে পারবে অজয়। স্যর হুইসকির বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে চোখের ইশারায় তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলায় সে খুশি মনে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেশ ঠান্ডা ভাব আছে বাইরে। ফুলহাতা টি-শার্টের হুডিটা দিয়ে কান ঢেকে নিল সে।

বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে ডিনার সেরে অজয় যখন ফ্ল্যাটে ফিরল তখন সোয়া দশটা বাজে। স্যর একটু আগে তাকে ফোন করে বাড়ি আসতে। এটাও পুরোনো নিয়ম। তার কাছেই ফ্ল্যাটের চাবি থাকে। চুপচাপ ফ্ল্যাটে ঢুকে অজয় তার ঘরে চলে গেল। স্যরের ঘরে দরজা বন্ধ। তবু ভিতর থেকে কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে। অজয় শুনতে পেল একটি পুরুষকণ্ঠ—

"আপনি বেকার হ্যাঙ্গামটা ঝেলছেন এতদিন ধরে। আপনাকে তখনই বলেছিলাম কেসটা সালটে দিই! বেফালতু একটা ফোঁড়াকে পাঁকতে দেওয়ার কোনো মানে হয়?"

কয়েক মুহূর্ত পরে স্যর জড়ানো গলায় জবাব দিলেন,

"না ধীমান, রিস্ক ছিল। কেউ কোনোভাবে কিছু জানতে পারলে গণ্ডগোল হয়ে যেত। আর এখন তো ওই পথে হাঁটার কথা ভাববই না। পবিত্রদার এখন তখন অবস্থা। আজ যা শুনে এলাম তাতে আর এক সপ্তাহও টানবে বলে মনে হয় না। টপকে গেলে তিন মাসের মধ্যে বাই-ইলেকশন। আমার টিকিট পাকা। এই সিচ্যুয়েশনে কোনো ফালতু লাফড়ায় আমি যাব না।"

পুরুষকণ্ঠটি ফের বলল,

"দেরি করে ফেলছেন না তো?"

(১১)

রাত্রে খাবার টেবিলে কাকার সঙ্গে নানারকম কথা হচ্ছিল রঞ্জনের। কাকা ভাত খান না, তাঁর জন্য দু বেলাই রুটির ব্যবস্থা থাকে। কাকিমার

সদ্য সেঁকে আনা ফোলা রুটির একটা টুকরো বেগুনভাজার উপরে রাখতে রাখতে তিনি বললেন,

"ও, ভাল কথা! আমাকে দীনেশ ফোন করেছিল বিকেলে। বলল তুমি নাকি ও বাড়িতে একটা মেয়ের থাকার ব্যবস্থা করেছ! আমাকে বলোনি তো কিছু!"

রঞ্জন একটু অস্বস্তিতে পড়ল। সে চায়নি বিষয়টা কাকার কানে যাক। দীনেশদার উপরে খুব রাগ হল তার। কাকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন দেখে সে বলল,

"থাকার ব্যবস্থা করেছি বলা ঠিক না কাকু। মেয়েটা বাইরে থেকে এসেছে। বারাসতে একটা চাকরি পেয়েছে। এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। শিয়ালদহে একটা হোটেলে থাকছিল। ওটা কি একটা মেয়ের একা থাকার পক্ষে সেফ, তুমি বলো? তাই কটা দিনের জন্য একটু মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছি। জাস্ট কদিনের একটা শেল্টার। ও কাছাকাছি একটা পিজি খুঁজে নেবে। আমি চন্দনকে বলে দিয়েছি আজই। ও একটা পিজি খুঁজে দেবে মেয়েটাকে। যেদিন পাবে, সেদিনই চলে যাবে ও।"

চন্দন হৃদয়পুরের মায়া ভবনের এক শরিকের নাতি। বাড়িঘরের দালালি করা তার পেশা। রঞ্জন আর সে একেবারে সমবয়সী, তাই ছোটবেলা থেকেই খুব ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু চন্দনকে প্রত্যয় পছন্দ করেন না কোনোদিনই। তার একাধিক কারণ আছে। হৃদয়পুরের পাট চুকিয়ে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে এলেও সেখানকার খবর তিনি পান। চন্দনের সম্বন্ধে ইদানীং খুবই খারাপ কিছু খারাপ কথা তাঁর কানে এসেছে।

রঞ্জন লক্ষ করল কাকা আর কাকিমার দ্রুত চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। কাকিমা বললেন,

"এসব ব্যাপার কিন্তু খুব রিস্কি। আজকাল বাড়িভাড়া দেওয়ার আগে অনেক রকমের ভেরিফিকেশন করে নিতে বলে। দুমদাম যাকে তাকে বাড়িতে এনে তোলে কেউ? কার মনে কী আছে, কে বলতে পারে! কে মেয়েটা? তোর মুখে এর কথা আগে শুনিনি তো!"

রঞ্জন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বলল,

"শুনবে কী করে কাকিমা? আমি কি তাকে চিনতাম? এবার ট্রেনে আসার সময় আলাপ হয়েছে। আমি এত ভাবিনি। ভাবতামও না যদি না মেয়েটা বলত ওর ডাকবাংলো মোড়ের কাছে অফিস। আমাদের বাড়িটা তো খালিই পড়ে আছে। ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট জায়গা নিয়ে। কটা দিন একটা মানুষ যদি একটু সেফলি থাকতে পারে, কী অসুবিধে আছে বলো?"

প্রত্যয় তাঁর আদরের ভাইপোকে ধমকে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাঁধে আলতো স্পর্শ করে থামালেন সুরঞ্জনা। ছেলেটা অনেকদিন বাদে একটু লম্বা সময়ের জন্য কলকাতায় এসেছে। এর মধ্যে বাড়িতে রাগারাগি তিনি চাইছেন না। তবে এই বিষয়টা তাঁরও ভাল লাগেনি। আজকাল যে কোথা থেকে কোন বিপদের আবির্ভাব হয়, আন্দাজ করা কঠিন। তিনি ঠিক করেই রেখেছিলেন আজ রঞ্জনকে আলাদা করে ডেকে বোঝাবেন।

স্ত্রী'র ইশারা বুঝে প্রত্যয় সংযত হলেন। রঞ্জনের কথাটা একেবারে ভুল নয়। সত্যিই, অত বড় বাড়িটা অবহেলায় পড়ে আছে। অন্যান্য শরিকরা তবু ভাড়া টাড়া বসিয়ে কিছু রোজগার করে নিচ্ছে। তাঁর অংশটা পড়ে আছে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়ে। মাঝেমাঝে তিনিও ভাবেন ওখানে তাঁর কোম্পানির একটা অফিস খুলবেন।

প্রসঙ্গ বদল করলেন প্রত্যয়। আলোচনায় এল পায়েলের এনগেজমেন্ট। দেখা গেল কাকিমার অনুমানই ঠিক। রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় পা রাখার একটা ধাপ হিসেবে তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন মেয়ের এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠানকে। ক্রমশ প্রত্যয় গোপনীয়তা ভেঙে আভাস দিলেন আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম থাকতে পারে।

(১২)

রাতের খাওয়া সেরে দীনেশদার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছিল জেসমিন। শুরুতে একটু আড়ষ্ট থাকলেও ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তিনি। এই বাড়ি সম্পর্কিত নানারকম ঘটনার কথা তিনি বলছিলেন জেসমিনকে। মেয়েটা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল।

দীনেশেরও ভাল লাগছিল কথা বলতে। একা একা এই ভূতের বাড়িতে তাঁর আর ভাল লাগে না। তবু আছেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মালতীপুরে। আগে মাসে অন্তত দুদিনের জন্য যেতেন। কিন্তু কোভিডের প্রকোপে স্ত্রী চলে গিয়েছেন গত বছর। তারপর থেকে আর ওখানে যান না তিনি। একমাত্র ছেলে গাজিয়াবাদে চাকরি করে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে'ও আর বাড়িতে আসার বিষয়ে গরজ দেখায় না। বাপ ব্যাটার মধ্যে যোগাযোগটুকু কোনোরকমে টিকে আছে ফোনের মাধ্যমে।

জেসমিন জিজ্ঞেস করল,

"আচ্ছা দীনেশদা, এক বাত বাতাও। এই বাড়ির করিডরে এতগুলো কোল্যাবসিবল গেট কেন লাগানো? বিচ বিচ মে অ্যায়সি গেট লাগানে কা কেয়া মতলব?"

দীনেশদা হেসে ফেলল এই হিন্দি-বাংলার জগাখিচুড়ি শুনে। বলল,

"আর মতলব! এক কালে মিলমিশ ছিল সব শরিকে। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা হৈ হৈ করে কাটাত। সে সব আমিও অল্প বয়সে দেখেছি। এখন কারোর সাথে কারোর কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু কেউ কারোর হক ছাড়বে না! তাই এভাবেই সবাই তাদের অংশ আলাদা করে নিয়েছে। যে যার ভাগ হয় ফেলে রেখেছে তালাবন্ধ করে আর নয়তো ভাড়া খাটিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মতো পড়ে আছে এই বাড়িটা। আর পড়ে আছি অগতির গতি এই আমি!"

জেসমিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাওয়া সারছিল। খাওয়া যখন শেষের দিকে, তখন গেটের দিক থেকে একটা বাইকের শব্দ ভেসে এল। দীনেশদা ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে দেখে বললেন,

"ওই, নবাবপুত্তুর এলেন! আজ অনেক জলদি জলদি, কী ব্যাপার? চোলাইয়ের ঠেকে পুলিশে রেড করল নাকি?"

এই ঘরে কেউ আসছে অনুমান করে দীনেশদাকে গুডনাইট বলে জেসমিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে তার দেখা হয়ে গেল বছর চল্লিশেকের একটা লোকের সঙ্গে। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, একমুখ দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটা মুশকো চেহারা তার। রাত্রে দীনেশদা'র ঘর থেকে একটা অল্পবয়সী মেয়েকে বেরোতে দেখে সে যে বেশ হতচকিত হয়ে গেছে, সেটা জেসমিনের তার চাহনি দেখে দিব্যি বুঝতে পারল।

সে শুনতে পেল ভিতর থেকে দীনেশদা বলছে,

"দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বোস। তারপর সব বলছি।"

ঘরে ফিরে এসে জেসমিন তার ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করল। এটা তার চ্যাটিংয়ের সময়। রাত এগারোটা নাগাদ মেসেঞ্জারের ঘন্টি বেজে উঠল। রঞ্জন পিং করেছে। তাকে 'হাই' লিখতেই ওপার থেকে প্রশ্ন ধেয়ে এল,

"তুমি অ্যাক্টিংয়ে ইন্টারেস্টেড? তোমার প্রোফাইলে দেখলাম কয়েকটা পোস্ট।"

জেসমিন জানাল অ্যাক্টিংয়ে সে কেবল ইন্টারেস্টেডই নয়, ওটাই তার স্বপ্ন ছিল। সে বোঝে ওই স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে চিরকাল, তবু সেটাকে বুকে আগলে ধরে রেখেছে সে। বিভিন্ন ছোট ছোট মডেল হান্ট ইভেন্টে সে অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে সাফল্যও পেয়েছে। কথাগুলো যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ জেসমিনের প্রোফাইলেই পেয়েছে রঞ্জন। গত সপ্তাহেও সেরকম একটা ইভেন্টে সে ফার্স্ট রানার আপ হয়েছে। মাথায়

রানার আপের ক্রাউন পরা ছবি পোস্ট করেছে সে।

রঞ্জন বলল, সে চেষ্টা করবে জেসমিনের এই স্বপ্নকে সফল করতে। সে আরো কথা বলতে চাইছিল কিন্তু জেসমিন বলল,

তার খুব ঘুম পাচ্ছে। সে শুয়ে পড়বে এখন।

জেসমিনকে গুডনাইটা বলার পরে তার প্রোফাইল থেকে কয়েকটা ছবি মোবাইলে ডাউনলোড করল রঞ্জন। তারপর সেগুলো এক জায়গায় পাঠাল। তারপর লিখল,

"হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক?"

ওপার থেকে ইতিবাচক সাড়া আসতে বেশি সময় লাগল না।

শীতের রাতে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল। জেসমিনের ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ রয়েছে। তবু একটা শব্দ তার কানে আসছিল। ধাতুর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করার শব্দ। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? জেসমিন সেটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল। দীনেশদা বলছিল বাড়ির দক্ষিণ দিকের দুটো ঘরে প্রেসের কাজ হয়। কিন্তু এখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। এত রাত অবধি প্রেস খোলা থাকে?

(১৩)

পরদিন সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বিছানা থেকে নেমে এল জেসমিন। দরজা খুলে দেখল বাঁহাতে প্লেটের উপরে কাপ নিয়ে দীনেশদা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল,

"ঘুম হল?"

জেসমিন মিষ্টি হেসে প্লেটটা নিল দীনেশদার হাত থেকে।

"আমার ঘরে বিস্কুট ফুরিয়ে গেছে। একদম খেয়াল ছিল না। এত সকালে তো দোকানও খোলেনি। তোমার সঙ্গে বিস্কুট টিস্কুট আছে?" দীনেশদা জানতে চাইল।

জেসমিন ঘাড় নেড়ে বোঝাল বিস্কুট আছে তার কাছে। ইতিমধ্যেই চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে ফেলেছে। এত ভাল চা গত দুদিনে সে খেতে পায়নি। চায়ের প্রশংসা করতে দীনেশদা বলল,

"সে আজ দিতে পারলাম, তাই দিয়ে গেলাম। আমার আবার বেলা করে ঘুম ভাঙে। আজ কে জানে কেন সাড়ে পাঁচটায় চোখের পাতা খুলে গেল। তোমাকে বাপু সকালের চায়ের ব্যাবস্থাটা নিজেকেই করে নিতে হবে। আমার ভরসায় থেকো না। একটা হিটার ঠিটার কিছু জোগাড় করে নিও। আর নয়তো এখন ওই যে কী সব উঠেছে, ইন্ডিকেশন না কি যেন, ওই। বিরাট কিছু তো দাম না শুনেছি।"

জেসমিন খিলখিল করে হেসে উঠে বলল,

"ইন্ডিকেশন নহি, ইন্ডাকশন কুকার কেহতে হ্যায় উসে।"

ওই হল। যাক গে! আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। তোমার অফিস যাওয়া আজ থেকে নাকি কাল থেকে? রঞ্জনবাবু বলে গেল বটে, কিন্তু আমার খেয়াল নেই।"

জেসমিনের অফিস আগামীকাল থেকে শুরু জেনে দীনেশদা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন,

"আমি বেলায় বাজারে যাব, বুঝলে? আজকের দিনটা আমার ঘরেই খেয়ে নিও না হয়। কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা। আর শোনো। রোজ বেরোনোর সময় বাইরের গেট লাগিয়ে দেবে। আর নিজের ঘরের দায়িত্ব কিন্তু নিজেকেই নিতে হবে। এখানে চোরের খুব উৎপাত। একটা ভাল দেখে তালা কিনে এনো। বা আমায় টাকা দিলে আমিও এনে দিতে পারি। এতদিন ঘর ফাঁকা ছিল, সে এক কথা। কিন্তু এখন তুমি থাকবে, তোমার জিনিস থাকবে। ওই মর্চে ধরা তালার ভরসায় থেকো না।"

দীনেশদা কথা শেষ করে নিজের দিকে পা বাড়িয়েছিল। জেসমিন বলল,

"একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কী? বলো শুনি!"

"উস তরফ যো প্রেস আছে, ওখানে কি হোল নাইট কাজ হয়?"

দীনেশদার কপালে ভাঁজ পড়ল এবার। চোখ ছোট করে সে জবাব দিল,

"তা কখনো সখনো সাড়ে নটা দশটা অবধি হয়। কেন বলো তো?"

জেসমিন ঘাড় নাড়ল,

"না, কিছু না। ঠিক আছে দীনেশদা, এবার চায়ে কনসেন্ট্রেট করি।"

"হ্যাঁ, তাই কোরো," বলে দীনেশদা পিছন ফিরল।

ঘরে ফিরে এসে চায়ের কাপ হাতে জানলার সামনে দাঁড়াল জেসমিন। জানলার ওপারের বারান্দাটায় যাওয়া খুব দরকার তার। সেখানে যাওয়ার একটা দরজাও আছে এই ঘরে, কিন্তু সেটায় বাইরে থেকে তালা লাগানো। জেসমিন গতকাল রাতেই জিজ্ঞেস করেছিল এই দরজাটা খোলা যায় কিনা। দীনেশদা বলেছেন রঞ্জনকে এই ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোলো জেসমিন। দীনেশদার ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। নিজের ঘরে তালা দিয়ে দীনেশদার নির্দেশমতো বাইরের গেট লাগিয়ে সে বেরোলো। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে একটা বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তাটার গা দিয়েই

একটা সরু রাস্তা ঢুকেছে। সেই রাস্তার উপরেই মায়া ভবন। রাস্তার শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছেছে জেসমিন, সে দেখল উল্টোদিক থেকে দুজন লোক হেঁটে আসছে। এদের মধ্যে একজনকে গতকাল রাতে দীনেশদার দরজার বাইরে দেখেছে সে। লোকটার চাহনি ভাল না। তার সঙ্গে যে রয়েছে তার বয়স জেসমিনেরই মতো। ওরা যখন জেসমিনকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে শুনতে পেল দ্বিতীয় লোকটি গতকালের লোকটিকে বলছে,

"দাদা, আমি কিন্তু বেশি সেলামি দিতে পারব না। দুজন ব্যাচেলর ছেলে থাকব, একটু ছিমছাম একটা দুই কামরার বাড়ি দেখাবেন। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ। শুধু রাতটায় একটু মাথা গোঁজা। বেশি হাইফাই কোনো জায়গায় নিয়ে যাবেন না প্লিজ।"

(১৪)

মায়া ভবনের একতলায় দুটো ঘর জুড়ে আদিত্য প্রেসের কর্মকাণ্ড চলে। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যেই কাটায় এই প্রেসের তিনজন কর্মচারী। যন্ত্রের খুটখাট শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। নানারকম ছাপার কাজ হয় এখানে। ইদানীং কিছু মাঝারি মাপের প্রকাশনা সংস্থা তাদের বইয়ের কাজও করাতে আসছে আদিত্য প্রেসে। মায়া ভবনের পিছন দিক দিয়েও একটা সরু রাস্তা গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়েও বাড়িতে ঢোকা যায়। এদিকে লোহার গেট নেই, আছে একটা কাঠের দরজা। প্রেসের কর্মচারী ও বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাকি বাসিন্দারা এই দিক দিয়েই যাতায়াত করে।

বেলা বারোটা নাগাদ প্রেসের কর্মচারী বটুক লক্ষ করল কাঠের দরজার বাইরে থেকে বছর ত্রিশ পয়ত্রিশের একজন ভদ্রলোক উঁকি দিচ্ছেন। রোগা পাতলা চেহারা ভদ্রলোকের, গালে চাপ দাড়ি, চোখে চশমা। গায়ে একটা পাতলা পাঞ্জাবির উপরে জিনসের জ্যাকেট চাপানো। কাঁধে একটা ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ। বটুক প্রেসের দরজার কাছে এসে বলল,

"কাউকে খুঁজছেন?"

ভদ্রলোকের গলাও চেহারার মতোই পাতলা। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে এসে বললেন,

"এটাই আদিত্য প্রেস তো? রামেশ্বর দত্তের প্রেস?"

"হ্যাঁ, এটাই। কী দরকার বলুন?"

ভদ্রলোক তাঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন,

"এখানে বই ছাপানো হয় তো? লিটল ম্যাগাজিন?"

"আপনি ভিতরে আসুন," বটুক বলল। তারপর ভিতরে গিয়ে রামেশ্বরকে জানাল নতুন পার্টি এসেছে। রামেশ্বর সকাল থেকে দুপুর অবধি খবরের কাগজে ডুবে থাকেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটা খবর পড়েন। নতুন পার্টিকে দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখে তিনি কাগজ ভাঁজ করে তাঁর বসার জায়গা থেকে উঠে এলেন।

"হ্যাঁ, বলুন কী চাইছেন আপনি?"

ভদ্রলোক তাঁর হাতের ফাইলখানা দেখিয়ে বললেন,

"বই করাতে চাই।"

রামেশ্বরের চোখ পড়েছে ফাইলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে থাকা কয়েকটা কাগজের দিকে। নীল কালিতে লেখা কিছু লাইন দেখতে পেয়েছেন তিনি।

"আমাদের এখানে কিন্তু ডিটিপি হয় না। মানেটা বুঝলেন তো?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি। কম্পোজের কাজ হয় না বলছেন, তাই তো? সে অসুবিধে নেই। আমি যদি পেন ড্রাইভ বা সিডি দিই, তাহলে চলবে তো," ভদ্রলোক রামেশ্বরের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

"হ্যাঁ, তাহলে চলবে। দেখি, কেমন কী কাজ আছে আপনার।"

রামেশ্বর ভদ্রলোককে প্রেসের এক কোণে তাঁর কাজের জায়গায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু কথা বলার সুযোগ পেলেন না। টেবিলের উপরে রাখা তার মোবাইলটা বেজে উঠেছিল। সেটাকে কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইলেন তিনি। তারপর "আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি" বলে প্রেসের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। বটুককে বলে গেলেন,

"আমি একটু স্টেশন থেকে আসছি বুঝলি। ওনার সাথে একটু কথা বলে নে তো। কীরকম কী চাইছেন ভাল করে বুঝে টুঝে নিয়ে এস্টিমেট দিবি। তার মধ্যে আমি ফিরে আসব।"

রামেশ্বর বেরিয়ে যেতে বটুক তার কাজের জায়গা থেকে গলা বাড়িয়ে বলল,

"একটু বসুন দাদা। হাতের কাজটা সেরে আসছি। দু’ মিনিট লাগবে।"

রামেশ্বরের টেবিলের ঠিক উলটো দিকে একটা দরজা আছে। কোনো পাল্লা নেই দরজায়, স্রেফ দেওয়ালের গায়ে ফাঁকা জায়গা করা আছে। সেই ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরটা দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরের মেঝেতে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া অনেকগুলো কাগজের বান্ডিল রাখা রয়েছে। বান্ডিলগুলো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

রামেশ্বরের নতুন পার্টি তাঁর ফাইলের ভিতরে রাখা কাগজপত্র গুছিয়ে

নিচ্ছিলেন। হঠাৎই তাঁর হাত ফসকে ফাইলটা পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকটা কাগজ উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের ঘরে।

"এই রে! বোঝো কাণ্ড," বলে তিনি ছুটে গেলেন পড়ে থাকা কাগজ কুড়িয়ে আনতে। একটু সময় লেগে গেল তার সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। বটুক শুনতে পাচ্ছিল ভদ্রলোক ফোনে কাউকে বলছেন,

"দাদা, আপনি এই আদিত্য প্রেসের কথাই আমাকে বলেছিলেন তো?"

বটুক তার কাজ সেরে এসে বলল,

"এই তল্লাটে আর দ্বিতীয় প্রেস নেই। আপনার কেন মনে হচ্ছে আপনি ঠিক জায়গায় আসেননি?"

ভদ্রলোক যেন লজ্জা পেলেন, জিভ কেটে বললেন,

" এ হে, আপনি শুনে ফেলেছেন? না মানে আমাকে যিনি খবর দিয়েছিলেন তিনি তো বলেছিলেন অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রেস। কিন্তু এ তো খুব বেশি জায়গা না। তাই ভাবলাম আমি হয়তো অন্য কোথাও চলে এসেছি।"

বটুক যেন একটু রেগে গেল এই কথায়। অনুভূতিটা প্রকাশ পেল তার জবাবে,

"যিনি বলেছেন তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনিও ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। প্রেস অনেকটা জায়গা জুড়েই ছিল। ওইনপাশের ঘরটাও আগে এই প্রেসেরই অংশ ছিল। লকডাউনের পরে কাজ কম তাই কিছুটা জায়গা পাশের ভাড়াটেদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ভদ্রলোকের চাহিদা বুঝে তাঁকে এস্টিমেট দিয়ে দিল বটুক। তিনি বলে গেলেন আজ বিকেলে বা কাল সকালে পেন ড্রাইভে করে সমস্ত ফাইল নিয়ে আসবেন। রামেশ্বরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। রামেশ্বর বললেন,

"কথা হয়ে গেছে তো? বটুক বুঝে নিয়েছে সব?"

ভদ্রলোক জবাবে কেবল একদিকে ঘাড় কাত করে হেঁটে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট বাদে স্টেশনের কাছাকাছি একটা নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কল করলেন একজনকে। কল কানেক্ট হতেই বললেন,

"খবর ঠিক ছিল স্যর। মাল ঘরেই রয়েছে। আমি ছবি পাঠাচ্ছি আপনাকে।

(১৫)

মাঝের দিনটা দীনেশদার সঙ্গে গল্পগুজব করেই কেটে গিয়েছিল

জেসমিনের। বিকেলের দিকে তাকে পাড়া চেনাতে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন দীনেশদা। বেশ নিরিবিলি একটা পাড়া। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে খুব একটা মিলমিশ নেই। যে যার নিজের মতো আছে। অনেক মানুষই চোখে পড়ছিল জেসমিনের। পাড়ায় একটা নতুন মানুষ এলে, বিশেষত সে যদি একজন সুন্দরী মহিলা হয়, তাহলে বাসিন্দাদের চাহনিতে কৌতূহল খেলা করে। কিন্তু এই পাড়ার মানুষেরা সেরকম নয়। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছিল না জেসমিনের দিকে।

দীনেশদা একটা মুদি দোকানে নিয়ে গিয়ে মালিকের সঙ্গে জেসমিনের আলাপ করিয়ে দিল।

দোকানের উল্টোদিক দিয়ে একটা রাস্তা ঢুকেছে। দীনেশদা সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই জেসমিন আবিষ্কার করল সে মায়া ভবনের পিছনদিকে চলে এসেছে। একটা কাঠের দরজা দেখতে পেল সে। দুজন লোক সেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। দরজার সোজাসুজি দেখা যাচ্ছে প্রেসটা। জেসমিন বলল,

"আচ্ছা, তো ইধার সে হি আওয়াজ আ রহি থি কল!"

মায়া ভবনের দরজার ঠিক উল্টোদিকেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। দীনেশদা জেসমিনকে জিজ্ঞেস করল সে চা খাবে কিনা!

চায়ে সে কখনোই আপত্তি করে না। ঘাড় কাত করে হেসে হ্যাঁ বলে জেসমিন রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। বাড়ির সামনের দিকের মতো পিছনদিকেও বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া। বেশ উঁচু পাঁচিল। ওপারে পরপর কয়েকটা জানলা দেখা যাচ্ছে। জেসমিন জানলাগুলোর দিকেই তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা জানলা দিয়ে একটা মেয়ে মুখ বাড়িয়েছে। জেসমিনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই মেয়েটা বলে উঠল,

"এই মেয়ে এই মেয়ে, একটু শোনো না, শোনা না গো একটু এদিকে।"

মেয়েটার গলা পেয়েই দীনেশদা ছুটে এল চায়ের দোকান থেকে। জেসমিনের হাত ধরে একটা টান দিয়ে বলল,

"তোমাকে নতুন পেয়ে ধরেছে। চলে এসো!"

জেসমিন শুনতে পাচ্ছিল মেয়েটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে,

"এই মেয়ে, তোমার মোবাইল আছে? আমাকে একটু দেবে? একটা ফোন করবো?"

"উনি ওরকম করছেন কেন দীনেশদা? মাথা খারাপ আছে নাকি?"

দীনেশদা চা ভর্তি কাগজের কাপ জেসমিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

"তাই তো মনে হয়। পাগল আছে। ওর বরটা ওই জন্য সারাদিন

ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয়। একেকদিন একটু চিৎকার কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পাই। বরটা মারে বোধহয়।"

শীতের বিকেলে বাইরে আলো পড়ে এসেছিল। মেয়েটা যে ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আলো জ্বলছিল না। মেয়েটার মুখ স্পষ্ট দেখতে পায়নি জেসমিন। কিন্তু যতটুকু দেখেছে ততটুকুতেই চিন্তার খোরাক পাচ্ছে সে।

সন্ধেবেলা রঞ্জন ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ কথা হল ওদের। রঞ্জন আগামী রবিবার জেসমিনকে তার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে চায়। বন্ধুর ফিল্ম লাইনে খুব ভাল কানেকশন আছে। কয়েকটা নতুন প্রোজেক্টের জন্যে কিছু প্রোডাকশন হাউজ নাকি নতুন মুখ খুঁজছে। রঞ্জনের বক্তব্য জেসমিনের ছবি সে তার বন্ধুকে পাঠিয়েছিল। বন্ধু নাকি বলেছে একটা প্রোডাকশন হাউজ এরকমই কাউকে খুঁজছে।

কথায় কথায় জেসমিন জানতে চেয়েছিল তার ঘরের যে দরজাটা দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় যাওয়া যায়, সেটা খোলা যায় কিনা। রঞ্জন বলেছে সে দীনেশদাকে বলে দেবে।

পরদিন সকালে ঠিক সাড়ে নটায় জেসমিন বেরিয়ে পড়ল ডাকবাংলো মোড়ের উদ্দেশে। আজ কাজের জায়গায় প্রথম দিন, তাই দীনেশদা একটু খাবার করে দিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গে। অফিসে পৌঁছেই ফ্লোর ম্যানেজারের সঙ্গে তার দেখা করার কথা। অচেনা অফিসে তাঁকে খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। জেসমিন নিজের পরিচয় দিতে তিনি নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন তাকে। জেসমিনের সঙ্গে ছিল একটা চিঠি। সেটা সে এগিয়ে দিল ফ্লোর ম্যানেজারের দিকে। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত তাকে মন দিয়ে জরিপ করলেন। তারপর ইন্টারকমে ফোন করে কাউকে আসতে বললেন তাঁর কেবিনে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জেসমিনেরই বয়সী একটি মেয়ে কেবিনের কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল।

"প্রিয়া, এ হল জেসমিন। আওয়ার নিউ জয়নি। এক কাজ করো। ফর দ্য টাইম বিইং ওকে হেমন্তের কিউবিকলে বসাও। পরে পার্মানেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যাবে।

প্রিয়া অবাক হল ফ্লোর ম্যানেজারের এমন নির্দেশে। হেমন্তের কিউবিক্যালটা চারদিক দিয়ে ঘেরা। হেমন্ত চাকরি ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে ওই কিউবিক্যাল ফাঁকাই পড়ে আছে। বারবার বিভিন্ন কর্মী ওখানে বসার অনুমতি চাইলেও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি ম্যানেজারের তরফ থেকে। হঠাৎ একটা মেয়ে নতুন জয়েন করেই এই বিশেষ সুবিধে কী করে পেয়ে যেতে পারে? এই তো সবে এল মেয়েটা। এইটুকু সময়তেই

কী জাদু করল রে বাবা! হ্যাঁ, একটা অ্যাপিল আছে বটে। পুরুষমানুষ ঘায়েল হতেই পারে। কিন্তু তাদের ফ্লোর ম্যানেজারকে এত অল্পে বশ হয়ে যাওয়ার পার্টি বলে প্রিয়ার এতদিন মনে হয়নি।

জেসমিন তার চারদিক দিয়ে ঘেরা কিউবিক্যালে গিয়ে বসল। প্রিয়া তাকে কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে। কম্পিউটার চালু করল সে। শুরু করে দিল তার কাজ। আশপাশের কিছু কথা তার কানে আসছিল। একটা মহিলা কণ্ঠ বলল,

" কী নাম রে মালটার। খুব ঠাঁট দেখছি।"

দ্বিতীয় মহিলা কণ্ঠ জবাব দিল,

"জেসমিন। নর্থ বেঙ্গল থেকে এসেছে।"

"ও জেসমিন! তাই এত গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাজা ফুল তো, তাই! তা ভাল। গন্ধ ছড়াক। পাঁপড়ি দুদিনেই শুকিয়ে যাবে।"

মোবাইলে জ্যাক গুঁজে কানে ইয়ারফোন লগিয়ে নিল জেসমিন। কিছুটা সময় তাকে কাটাতে হবে এখানে। পছন্দের মিউজিক চালিয়ে মনিটরে চ্যাটিংয়ের আইকনে ক্লিক করল সে। তার জন্যে এই কম্পিউটারে বিশেষ চ্যাটিং অ্যাপ আগে থেকেই ইনস্টল করা ছিল।

ঘন্টাখানেক বাদে ফ্লোর ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন জেসমিনকে। সে চেয়ারে গিয়ে বসতেই তিনি হেসে বললেন,

"আই হোপ আপনার প্রবলেম হচ্ছে না?"

"নট অ্যাট অল। কিন্তু এরকম ফাঁকা বসে থাকাটা অকোয়ার্ড দেখাচ্ছে। আপনি যা জানেন, ফ্লোরের বাকিরা তো তা জানে না," জেসমিন জবাব দিল।

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমি এক কাজ করছি। কয়েকটা ফাইল দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো আপনি জাস্ট স্টাডি করুন। এক্ষুণি এর বেশি কিছু মাথায় আসছে না আমার। কাল কিছু একটা ভাবা যাবে।"

কথা বলতে বলতেই ফ্লোর ম্যানেজার তাঁর ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ট্র্যান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের ফাইল বের করে জেসমিনকে দিলেন। সেগুলো নিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এল সে। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে একটু বেশিই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছে সে। এরকম কাজ সে এই প্রথম করছে। একটু অস্বস্তি হচ্ছে জেসমিনের। কিন্তু তাকে মানিয়ে নিতে হবে। সামনে একটা বিরাট লক্ষ্য। সেটা পূরণ করতে হলে একটু পরীক্ষা তো দিতেই হবে।

(১৬)

সকালে জলখাবার খেয়েই গাড়ি নিয়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের

উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন। আজকের দিনটা তার চরম ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। কাকার ডেয়ারির ব্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার একটা নিজস্ব ব্যবসাও আছে। বছর পাঁচেকের ব্যবসা। ভালই চলছিল। মাঝখানে দীর্ঘ লকডাউনের ফলে গ্রাফ হুড়হুড় করে নিচে নামলেও এখন আবার সেটা একটা ভদ্রস্থ জায়গায় এসেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। সেই সমস্যার সমাধান করতেই তড়িঘড়ি কলকাতায় এসেছে সে। নাহলে স্রেফ কাকার তলবে সে এই সময়ে শিলিগুড়ি থেকে কখনোই আসত না।

রঞ্জনের একজন পার্টনার আছে উত্তরবঙ্গে। আর ব্যবসার দৈনন্দিন কাজকর্ম তদারকি করে দুজন। আজ সেই ব্যবসা সংক্রান্ত একটা খুব জরুরি কাজেই সে বেরিয়েছে সকাল সকাল। রঞ্জনের এই ব্যাবসার বিষয়ে কাকা কাকিমা কিছু জানেন না। নিজের চেষ্টায় ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে সে। কাকার ব্যবসা থেকে তার রোজগার মন্দ হয় না। কিন্তু সেই কাজ বড্ড একঘেয়ে। রঞ্জন উত্তেজনা ভালবাসে। সে নিজের দিকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ পায়। এই মুহূর্তেও সে তেমনই একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বোধ করছে না। সাময়িক বাধা কাটিয়ে সে ঠিক এগিয়ে যেতে পারবে। সেই আত্মবিশ্বাস রঞ্জনের আছে।

গাড়িতে বসে ফেসবুক স্ক্রল করছিল সে। জেসমিন একটা সুন্দর পোস্ট দিয়েছে। আজ কাজের জায়গায় তার প্রথম দিন। রঞ্জনের গতকালই ভেবে রেখেছিল সকাল জেসমিনকে একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবে। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকেই অন্য চিন্তায় ডুবে যেতে হয়েছে তাকে। ফলে জেসমিনের বিষয়টা চাপা পড়ে গিয়েছে। পার্টনার ফোন করেছিলেন। একটা কাজ বেশ কিছুদিন ধরে আটকে ছিল। কিন্তু পার্টনার আজ বলেছেন আগামী ছয়-সাতদিনের মধ্যেই সেটা মেটাতে হবে। রঞ্জনের ব্যবসায় তিনি সমান অংশীদার। ওদের মধ্যে ভাল বোঝাপড়াও খুব ভাল। সচরাচর কোনো দাবি তিনি চাপিয়ে দেন না রঞ্জনের উপরে। এক আধ সময় কিছু বললে, রঞ্জন সেই দাবি মেটানোর চেষ্টা করে থাকে।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে একটা বহু পুরোনো বাড়ির তিনতলায় একটা ঘর দেখতে এসেছে সে। যে ঘরটার খোঁজ দিয়েছে সে অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল রঞ্জনের জন্য।

ঘরটা দেখে ঠিকঠাকই মনে হল রঞ্জনের। ঘরের দক্ষিণ আর পশ্চিমে দুটো বড় জানলা আছে। সেগুলো খুলে দিয়ে আশপাশ দেখে নিল সে। গায়ে গায়ে সব বাড়ি এখানে। পুরোনো কলকাতার ঐতিহ্যকে বুকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। পশ্চিমের জানলা খুললেই দু-

হাত দূরত্বে পাশের বাড়ির টানা বারান্দা। আর কিছু দেখার নেই। তবে দক্ষিণ দিক থেকে রাস্তা দেখা যায়। ঘর দেখাতে যে এনেছে, সে জিজ্ঞেস করল,

"কী? আপনার এতে চলবে তো?"

রঞ্জন হাত থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,

"হ্যাঁ, চলবে। তবে তোমাকে একটু দায়িত্ব নিতে হবে। অন্তত প্রথম কয়েকটা দিন।"

লোকটি হেসে জবাব দিল,

"সে সব চিন্তা করবেন না। আমার হাতের মধ্যেই আছে সব। কাপলদের নিয়ে এমনিতেই সমস্যা বেশি হয় না। শুধু বলবেন অকারণে বেশি কথা না বলতে।"

"কলকাতা শহরে নতুন আসছে দুটো মানুষ। কাউকে সেভাবে চেনে না। কার সাথে কথা বলতে যাবে? বললাম তো তোমাকে, প্রথম প্রথম তুমি একটু দরকারে অ-দরকারে পাশে থেকো। তারপর ওরা গুছিয়ে নেবে," অসন্তোষ প্রকাশ পেল রঞ্জনের কথায়।

এখানে কাজ শেষ। রঞ্জনের পরবর্তী গন্তব্য নিউ টাউন। ড্রাইভারকে বেলেঘাটার রাস্তা ধরতে বলে হোয়াটসঅ্যাপে মনোযোগ দিল সে। পার্টনারের সঙ্গে জরুরি কিছু কথা এই বেলা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। গাড়ি যখন ই এম বাইপাসের কাছাকাছি, তখন চন্দন ফোন করল।

"কী গুরু, এ কাকে এনে তুলেছ ও বাড়িতে? পুরো আইটেম তো, বস!" চন্দন বলল।

"তোর মুখের ভাষা আর শুধরোলো না ভাই। এনে তুলেছি আবার কী? একটা মেয়ের এই মুহূর্তে মাথা গোঁজার জায়গা নেই শহরে। বাড়ি খালি পড়ে আছে তাই কটা দিনের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। তোকে তো সেদিন বললাম সব?"

"হ্যাঁ, তা তো বলেছিস! কিন্তু আমার তো লস হয়ে গেল পুরো। আমি আজই দুটো পার্টি পেয়েছি। দুজনই ব্যাচেলর; একসাথে থাকবে। ওদের যা চাহিদা আর বাজেট, তাতে তোদের পার্টের ওই দুটো ঘর একদম পারফেক্ট হতো। কিন্তু তুই শালা ঘরদুটো ব্লক করে দিলি!"—চন্দন রসিকতা করে বলল।

কিন্তু আজ রসিকতার মুড নেই রঞ্জনের। তার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে। সে বলল,

" ভাই, আমি এখন রাখছি, হ্যাঁ। হ্যাজাতে ভাল লাগছে না এখন। তোকে তো বলেইছি। তুই একটা পিজি খুঁজে দে না! তাহলেই তো ও সেখানে চলে যাবে। তারপর তুই যাকে খুশি ভাড়া দিস। ম্যাক্সিমাম এক মাসের তো ব্যাপার। তারপর আবার ফাঁকা! তুই খুশি তো? নে,

এখন ফোট!"

হৃদয়পুর স্টেশনে তখন চন্দনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তার নতুন পার্টি। সে মোবাইলটা প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল,

"ভেবে দেখুন আপনারা কী করবেন। আমি যে বাড়ির কথা বলছি সেখানে ঘর নিতে গেলে এক মাস আরো অপেক্ষা করতে হবে। যদি রাজি থাকেন তো বলুন। আর না হলে যে বাড়িটা আজ দেখালাম সেটা নিয়ে নিন। টাকা কিছু কমসম করা যাবে। সে আমি কথা বলে নেব বাড়িওয়ালার সঙ্গে।"

বছর পয়ত্রিশ-ছত্রিশের লোকটি কাঁচুমাচু মুখ করে বলল,

"না দাদা, এক মাস অপেক্ষা করতে পারব না। এখন যেখানে আছি সেখানে একেবারে অতিষ্ঠ অবস্থা। আর দুদিনও সেখানে থাকতে চাই না আমরা। আপনি আজ ব্যবস্থা করলে আমরা আজই চলে আসব। ওই বড় বাগানওয়ালা বাড়িটা হলে ভাল হতো। কিন্তু সে আর কী করা যাবে? আপনি যেটা দেখালেন সেটা ধরেই এগোন। কিন্তু বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলা অনেক সেলামি চাইছেন। অত আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আপনি না পারলে বলে দিন। আমরা অন্য দালাল ধরবো তাহলে।"

(১৭)

দুপুরে কাজের ফাঁকে ফ্ল্যাটবাড়ির খোলা ছাদে বসে রুটি তরকারি খাচ্ছিল কানাই আর সন্তোষ। আজ বাতাসে একটা শীত শীত ভাব আছে। দুপুরের রোদ্দুরটা বেশ আরাম দিচ্ছে ওদের পিঠে।

আজ চারতলার পিলার গাঁথার কাজ চলছে, তাই ওদের ব্যস্ততা অন্য দিনের তুলনায় বেশি। লোহার রডের কাঠামাগুলোকে কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল গতকালই। আজ সেই ঘেরাটোপের মধ্যে মশলা ঢালা চলছে। এরকম ব্যস্ত দিনে এই নির্মীয়মাণ বহুতলের কর্তব্যরত মিস্ত্রীরা পালা করে দুপুরের খাবার খায়। এখন সন্তোষ আর কানাইয়ের পালা চলছে। একটু পরেই ওরা কাজে হাত লাগাবে, বদলে অন্য দুজন খেতে বসবে।

মেহবুব নামের এক ছোকরা আছে ওদের মিস্ত্রীদের দলে। ভারি মজার মজার কথা বলে সে। দুনিয়ার জোকস তার পকেটে থাকে। এক এক দিন তো এত হাসায় সকলকে যে কাজ করতেই অসুবিধে হয়।

আজও সে বেশ গুছিয়ে বসতে যাচ্ছিল একটা 'লেটেস্ট' জোক শোনাবে বলে, কিন্তু তার কাজে বাধা পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। সঙ্গে এক মহিলা। ভদ্রলোক তাঁর মোবাইলটা এমনভাবে ধরেছিলেন যে মেহবুবের মনে হল তিনি ভিডিও রেকর্ডিং করছেন।

সন্তোষ তখন খাওয়া শেষ করে তার টিফিনবাক্স মাজতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

"অসীমবাবুকে কোথায় পাব?"

অসীমবাবু এই প্রপার্টির প্রোমোটার এবং ডেভেলপার। থাকেন আমডাঙায়। রোজ সকালের দিকে একবার আসেন, তারপর বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান বারোটা নাগাদ। কোনো কোনো দিন আবার তিনটে নাগাদ আসেন। সন্তোষ বলল,

"স্যর তো এখন নেই!"

"সে কী! আমাদেরকে যে উনি দুটো নাগাদ আসতে বলেছিলেন," ভদ্রলোক বললেন।

সন্তোষ মেহবুবের দিকে চাইল,

"হ্যাঁ রে, স্যর কি আজ দুপুরে আসবেন? এনারা বলছেন স্যর আসতে বলেছেন।"

মেহবুব বসেছিল ছাদের এক কোণে। সে এগিয়ে এল এবার। ভদ্রলোককে বলল,

"স্যর সকালের দিকে আসেন। দুপুরে তো থাকেন না। আপনারা ফোন করে দেখুন একবার, যদি বিকেলে আসেন। আমাদের কিছু বলে যাননি তো!"

সন্তোষ চলে গিয়েছিল ছাদের ধারে রাখা জল ভর্তি ড্রামের কাছে। এখানে মগের কোনো বালাই নেই। বাসন কোসন মাজার জন্য একটা বাতিল করে দেওয়া বড় কৌটের নিচের অংশ কেটে নিয়ে সেটাকেই মগ হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। সন্তোষ সেই কৌটোয় করে জল তুলে তার টিফিনবাক্সে ঢালছিল। সন্তোষের মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। কানাইও ততক্ষণে ড্রামের কাছে পৌঁছে গেছে। তারও একটু অস্বাভাবিক লাগল ভদ্রলোকের চাহনিটা।

এবার ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল। তিনি মেববুবকে বললেন,

"আচ্ছা ভাই, অসীমবাবু বলছিলেন ফার্স্ট ফ্লোর পুরোটা আর সেকেন্ড ফ্লোরের একটা ফ্ল্যাট অলরেডি বুক হয়ে গেছে। কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোরে তো চারটে ফ্ল্যাট দেখলাম। কোন দুটো বুক হয়নি, আপনি বলতে পারবেন? তাহলে একটু ঘুরে দেখতাম আর কি! উনি টাইম দিলেন বলেই তো আমরা এসেছি। আর এসেছিই যখন, একটু দেখেই যাই। তারপর ওনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল।"

এই প্রোজেক্টের হেড মিস্ত্রী কালীচরণ। ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু স্বাস্থ্য দেখলে সেটা বোঝার উপায় নেই। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কাজের কথা ছাড়া অন্য মিস্ত্রীদের সঙ্গে বেশি কথা বলে না সে। এমনিতেই

মিশুকে নয় সে, তার উপর গত মাসে এই ফ্ল্যাটেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে তার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে একেবারেই গুম মেরে গিয়েছে। লিফটের জন্য সিঁড়ির পাশ দিয়ে যে ফাঁকা জায়গাটা রাখা হয়েছে সেখান দিয়ে কী করে যেন গলে পড়ে গিয়েছিল সে। তিনতলা থেকে পড়েছিল নিচে স্তূপ করে রাখা স্টোনচিপ আর লোহার রডের উপরে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনদিন বেঁচেও ছিল। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে শেষমেশ আর যুদ্ধটা জিতে উঠতে পারেনি সে। ছেলেটার একটু নেশা করা অভ্যেস ছিল। এখানে সকলেই মনে করে নেশার ঘোরেই টাল সামলাতে না পেরে ওই ফাঁকে পড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু কালীচরণের মন মানতে চায় না।

মেহবুব হাঁক পাড়ল,

"কালীদা, ও কালীদা। এদিকে একটু শুনুন না!"

কালীচরণ একমনে ছাদের ধারে বস্তা কেটে সিমেন্ট ঢালছিল স্টোনচিপের উপরে। মেহবুবের ডাক শুনে এগিয়ে এল।

"দেখুন তো এনারা কী জিজ্ঞাসা করছেন! আপনি জানেন এ সব। আমরা কি আর খবর রাখি?"

কালীচরণ ভদ্রমহিলার প্রশ্ন শুনে তাঁদেরকে তিনতলায় নিয়ে চলল।

(১৮)

ঘুমন্ত রঞ্জনের অনাবৃত বুকের উপরে হাত বোলাচ্ছিল তানিয়া। তার মনের মধ্যে নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। রঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকদিনের। আজ দুজনের কাজের জগৎ আলাদা হয়ে গিয়েছে। তানিয়া জানে শিলিগুড়িতেও তারই মতো একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে রঞ্জনের। তবু এই পুরুষকে তার জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে পারেনি সে। আগে রঞ্জন তার সমস্ত কথা, ভাবনাচিন্তা তানিয়ার সাথে ভাগ করে নিত। ইদানীং অতটা আর মেলে ধরে না নিজেকে। তবে কলকাতায় এলে এক-দু'রাত তানিয়ার সঙ্গে না কাটিয়ে রঞ্জন ফেরে না। তানিয়াও বাধা দেয় না রঞ্জনকে। জীবনে সব সম্পর্ককেই আইন আর শাস্ত্রের সিলমোহর পেতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে। দুজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ একে অপরের চাহিদাগুলো বুঝে মিটিয়ে দিতে পারলেই হল।

তানিয়া জানে রঞ্জন তাকে ঠকিয়েছে। শিলিগুড়িতে তাকে ডেকে নিলে তানিয়া খুশি মনে চলে যেত। কিন্তু সে পথে রঞ্জন হাঁটেনি। সেই শহরে নিজের অন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। কিন্তু তার মন ভেঙে গেলেও এতদিন রঞ্জনের বিশ্বাস ভাঙেনি তানিয়া। কিন্তু আজ...

বিছানা থেকে বেডরুমের দরজার ওপাশে একটা চেয়ার দেখা যায়। আজ রঞ্জন এসে পৌঁছনোর আগে ওই চেয়ারে বসে ছিল অন্য এক পুরুষ। তার সঙ্গে এর আগে ফোনে কথা হয়েছে তানিয়ার। সেই পুরুষের পাঠানো দুজন সঙ্গীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেছে সে। কিন্তু আজ সে নিজে এসেছিল। তারই নির্দেশে রঞ্জনকে আজ তার নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে আসতে বলেছে সে। তার রেখে যাওয়া একটি ছোট্ট শিশি থেকে চার ফোঁটা তরল রঞ্জনের কফিতে মিশিয়ে দিয়েছিল তানিয়া। কিন্তু এবার তাকে আসল কাজ শুরু করতে হবে।

তরলের শিশি যে রেখে গিয়েছে, তার দাবি এ জিনিস একবার শরীরে প্রবেশ করলে ঘন্টাতিনেকের জন্য নিশ্চিন্ত।

তানিয়া ঝুঁকে পড়ল রঞ্জনের উপরে। হাত গলিয়ে দিল তার বালিশের তলা দিয়ে। পেয়ে গেল রঞ্জনের মোবাইল। সেদিন সাদার্ন এভিনিউয়ের রুফটপ রেস্তোরাঁয় তানিয়ার তীক্ষ্ণ নজর ছিল রঞ্জনের হাতের দিকে। প্রথম দুবার ভুল হলেও তৃতীয়বারের চেষ্টায় সঠিক পিন এন্টার করল সে। খুলে গেল রঞ্জনের মোবাইল। তানিয়ার ফ্ল্যাটের বাইরে একজনের দাঁড়িয়ে থাকার কথা মোবাইলটা নেওয়ার জন্য। তানিয়া বিছানা থেকে নেমে ছুটল ফ্ল্যাটের এন্ট্র্যান্সের দিকে।

সেই সময়ে নারকেলবাগানে টাটা মেডিকেল সেন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা কালো বোলেরো গাড়ি। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে একটা ফোনকলের অপেক্ষায় বসে ছিল একজন মানুষ। বাইরে ফুটপাথের একটা অংশ জুড়ে পরপর সব স্টল বসেছে। কোনো স্টলে চা, বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে, কেউ বিক্রি করছে ফল। কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গে গাড়িতে বসা মানুষটার চোখাচোখি হচ্ছে মাঝেমাঝে। কিন্তু তার চেহারায় এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যা কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সে'ও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষেরই মতো। দুঃখ, আনন্দ, হতাশা, ব্যর্থতা তার হৃদয়কেও স্পর্শ করে। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে একটা উৎকন্ঠায় ভুগছে সে। কিন্তু বাইরে থেকে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই কারোর।

দুপুর দুটো বেজে তেরো মিনিটে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। সেটাকে হাতে তুলে কল রিসিভ করল মানুষটা। ওপার থেকে একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

"স্যর, আমার মনে হচ্ছে ইনপুট ঠিকই ছিল।"

এদিক থেকে প্রশ্ন গেল,

"কত পারসেন্ট মনে হচ্ছে?"

"নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট। ফাইভ পারসেন্ট মার্জিন অব এররের

বেসিসে অ্যাকশন নেওয়াই যায়।"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ওপারের ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের গতি বাড়িয়ে তুলছিল। তারপর আবার প্রশ্ন ছুটে এল,

"কবি কত দূরে?"

"পৌঁছে গেছে স্যর। আমাকে জানিয়েছে।"

"ওকে, বি প্রিপেয়ার্ড!"

কুঁ কুঁ শব্দ করে লাইনটা কেটে গেল। গাড়ির ফ্রন্ট সিটে বসা মানুষটার মনের মধ্যে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। হাতে সময় বেশি নেই। যা করার এবার করে ফেলতে হবে। কিন্তু এখনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কনফার্মেশন আসা বাকি।

মোবাইলে মেসেজ টাইপ করতে শুরু করল মানুষটা।

ডাকবাংলো মোড়ের অফিসে সেই মুহূর্তে তার কয়েকজন পরিচিতের কাছ থেকে একটি তথ্য আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠছিল জেসমিন। অবশেষে এসে পৌঁছল সেই তথ্য। একটি ছবি। দেওয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে ছবিটা তোলা হয়েছে। খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এতেই জেসমিনের কাজ চলে যাবে। পাঁচ মিনিট ধরে ছবিটা খুব ভাল করে দেখল সে। তার মন বলছে সে ঠিকই ভাবছে। ইন্টারনেট ঘেঁটে একটা ফোন নাম্বার বের করল জেসমিন।

দুপুর দুটো পাঁচ নাগাদ মালবাজার থানায় কর্কশ শব্দে বেজে উঠল মান্ধাতার আমলের রিসিভার। ফোন তুললেন ইনস্পেক্টর অতীন্দ্র বর্মন।

(১৯)

মাসের প্রথম দিনই কামাইয়ের সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না চন্দনের। এই কোভিড এসে নানারকমভাবে মানুষের পেটে লাথি মেরেছে। তাদের এলাকায় এখন লোকে সহজে কাউকে ঘর ভাড়া দিতে চায় না। আগে বাড়িওয়ালাদের বাঁধাধরা প্রশ্ন থাকত ভাড়াটে সরকারি চাকরি করে কিনা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত, ইত্যাদি। এখন সেসবের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যে বাড়ি ভাড়া নিতে আসছে তার ডবল ভ্যাক্সিন নেওয়া আছে কিনা, কোভিড হয়েছিল, হয়ে থাকলে হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছিল কিনা, সেই প্রশ্ন।

মায়া ভবনের উল্টোদিকের একতলা বাড়ির মালিককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকালের পার্টির চলে আসার ব্যবস্থা করে ফেলল চন্দন। যার সঙ্গে চন্দনের কথা হয়েছিল সে তার অফিস কলিগকে নিয়ে তিনটে

নাগাদ চলে এল। সঙ্গে জিনিসিপত্র বিশেষ কিছুই নেই। দুটো বড় ট্রলিব্যাগ আর দুটো কাঁধের ব্যাগ নিয়ে এসেছে।

"ব্যস, এটুকুই? খাট, বিছানা, আলমারি কিচ্ছু নেই আপনাদের?"

সকালের লোকটি বলল,

"একটা চৌকি কিনেছিলাম ওখানে। ফাইবারের একটা আলমারিও আছে। কিন্তু কোনো ভ্যান ট্যান পেলাম না এখন। কাল সকালে গিয়ে আলমারিটা নিয়ে আসব। চৌকি একটা নতুন কিনে নেব এখানে। ওটার অবস্থা এমনিতেই খারাপ হয়ে এসেছিল। এখানে ধারেকাছে চৌকি বা রট আয়রনের বেড পাওয়া যাবে কোথাও?"

চন্দন একটা গুটখার পাউচ মুখে ঢেলে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে বলল,

"এখনই এসব দরকার লাগবে না। আমি বাড়িওয়ালাকে বলে রেখেছি। আপাতত দুটো দিন মাটিতে তোষক পেতে বিছানার ব্যবস্থা উনি করে দেবেন। তবে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন। একটা ম্যাট্রেস কিনে আনতে পারেন। দিলেও পুরোনো তোষক দেবে, বুঝতেই পারছেন! তার চেয়ে কম খরচে ম্যাট্রেস হয়ে যাবে।"

চন্দন বাড়িওয়ালার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল তার চেনা দোকান আছে। ওরা বললে সে কমসম করে ম্যাট্রেস কিনিয়ে দিতে পারবে। চন্দনের বাইকের শব্দ মিলিয়ে আসতেই বাড়িওয়ালা ওদের দুজনকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন। তারপর ওদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন,

"কেসটা কী একটু খুলে বলুন তো এবার! আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। কোনো গোলমাল হবে না তো?"

দুই ভাড়াটের একজনের নাম বিনোদ, দ্বিতীয়জন দিলীপ। বিনোদ বলল,

"কাল আপনার অফিসে গিয়ে যিনি কথা বলে এসেছেন তাঁকে দেখে আপনার মনে হয়েছে কোনো গণ্ডগোল হতে পারে?"

বাড়ির মালিক বিকাশ দত্ত ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন,

"না না, আমি সেই গণ্ডগোলের কথা বলছি না। আমি বলছি প্রাণহানির ভয় নেই তো!"

এবার দিলীপ বলল,

"ওসব আমাদের উপরে ছেড়ে দিন। আপনাকে আমরা যা যা করতে বলবো, আপনি শুধু সেটা সেটা করবেন।"

গতকাল যিনি বিকাশের অফিসে এসেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল আজ বিকেলের মধ্যে যে কোনো উপায়ে দুজন লোককে এই বাড়িতে

ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেটা করতে এমন ভাবে যাতে দালাল চন্দনের মনে কোনোওভাবেই কোনো সন্দেহ না দানা বাঁধতে পারে। চন্দনের আচরণ দেখে আজ দুপুরে বিকাশের মনে হয়নি সে কিছু সন্দেহ করেছে বলে। এরপর আর কী কী বিকাশকে করতে হবে বিনোদ আর দিলীপ সে সব বুঝিয়ে বলছিল তাঁকে। ওদের নির্দেশ শুনতে শুনতে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু তার পাশাপাশি একটা ভয়ও আঁকড়ে ধরতে চাইছিল বিকাশ দত্তকে। সাতে-পাঁচে না থাকা এক নিরীহ মানুষ তিনি। বাপ মা নেই, বিয়ে করেননি। বাবার করে যাওয়া বাড়ি একা একা ভোগ করছেন। কিন্তু এরা যে কোথা থেকে তাঁর বিষয়ে এত খবর জোগাড় করেছে, তা গতকাল ভেবে পাচ্ছিলেন না বিকাশ।

উল্টোদিকে বসা মানুষ দুটোকে যত দেখছিলেন ততই অবাক হচ্ছিলেন বিকাশ। কারোর সাধ্য নেই যে বোঝে এরা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয়। এরা তাঁর এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আদৌ আসেনি, এসেছে এক বিশেষ কাজে। না এদের চেহারায় কোনো চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট আছে, না গলার স্বরে।

মিনিট দশেক কথা বিকাশের সাথে কথা বলে বিনোদ আর দিলীপ তাদের জন্য খালি করে রাখা ঘরে চলে গেল। এখন অনেক কাজ তাদের। ট্রলি ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে নিল ওরা। সব কিছু গুছিয়ে নিতে আরো মিনিট পনেরো লেগে গেল।

সাড়ে তিনটে নাগাদ বিনোদের ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে উঠল চ্যাটবক্সের ছোট্ট উইন্ডো। তাদের টিমের অন্যতম সদস্য লিখেছে—

"অ্যারাইভিং!"

(২০)

কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি হোটেলের ঘরে গোপন মিটিং চলছিল। ইঁদুরকে ফাঁদে ফেলার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ইঁদুরকে ইতিমধ্যেই একটু চঞ্চল করে তোলা গিয়েছে। কিন্তু তাতেও মিটিংয়ে বসা তিনজন পুরুষ ও এক মহিলা নিশ্চিত হতে পারছে না ইঁদুরের গতিবিধি সম্পর্কে। সে যদি কোনোক্রমে আঁচ করতে পারে তার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, ঠিক এড়িয়ে যাবে।

ইঁদুরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ হাতে এসেছে, কিন্তু এখনো সবচেয়ে জোরালো দুটো প্রমাণ পাওয়া বাকি আছে ওদের। ইঁদুরকে ধরার জন্য গড়া হয়েছে একটি বিশেষ টিম। ধাপে ধাপে কাজ এগিয়েছে টিমের সদস্যরা। ইঁদুর যদি এই টিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাঁদে পা

দেয়, তাহলে আর বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে এই অপারেশনের যবনিকা পতন হবে। সকলের মতামত নিয়ে প্ল্যান অব অ্যাকশন ছকে ফেলল টিমের মাথা। সকলকে সে বুঝিয়ে দিল তাদের দায়িত্ব। এবার শুধু চূড়ান্ত প্রমাণটা এসে পৌঁছনোর অপেক্ষা।

আড়াইটে নাগাদ বাইরের গেটের শব্দ পেয়ে দীনেশদা বেরিয়ে এসেছিলেন। জেসমিনকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন,

"কী ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি অফিস হয়ে গেল?"

জেসমিন দাঁড়াল না। ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে গেল,

"হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি আজ একটা পার্টি আছে অফিসের। কোম্পানির সাকসেস পার্টি। সবাই পার্টি করতে গেল সল্টলেকে।"

"তোমাকে নিল না?" দীনেশদা প্রশ্ন করলেন।

"বুলায়া থা উন লোগো নে! কিন্তু আমি তো কাউকেই চিনি না। আই ওয়াজ নট কমফর্টেবল। তাই ঘর চলে এলাম।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে দৌড়ল জেসমিন। গতকাল দুপুরে একবার দীনেশদার সঙ্গে ছাদে গিয়েছিল সে। একটা কাঠের দরজায় স্রেফ শিকল তোলা থাকে। কোনো তালার বালাই নেই। ছাদে তার কাজ সেরে নামার সময় ফের দীনেশদার সামনে পড়ল জেসমিন।

"কী ব্যাপার? তুমি ছাদে কেন গিয়েছিলে?"

দীনেশদার গলা যেন অন্যরকম শোনাল। জেসমিন প্রথমে উত্তর দিল না। সে গেটের দিকে দৌড়ল। দীনেশদা ছুটে এল তার পিছনে। খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল।

"কী হল? জবাব দিচ্ছ না যে! তোমাকে কী জিজ্ঞেস করলাম? তুমি ছাদে কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বলেছি না, আমাকে জিজ্ঞেস না করে এ বাড়ির যেখানে সেখানে যাবে না!"

জেসমিন এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,

"কী করবো দীনেশদা? তোমাকে কত করে বললাম ওদিকের দরজাটা একটু খুলে দাও। ওদিকের বারান্দায় দুপুরে রোদ আসে। আমি ভেজা জামাকাপড় কোথায় মেলব বলো?"

দীনেশদা ধমকে উঠল এবার,

"এখন কেন বলোনি? আমি খুলে দিতাম দরজা। আমাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি কোন সাহসে উপরে চলে গেল?"

জেসমিন ততক্ষণে গেট অবধি পৌঁছে গেছে।

"আবার কোথায় যাচ্ছ," দীনেশদা গলা চড়াল।

"আরে দীনেশদা, আমার জিনিস পড়ে গেছে নিচে। নিয়ে আসি,

তারপর তুমি যত খুশি বকাবকি কোরো।"

মায়া ভবনের পিছন দিকের দরজার সামনে জেসমিনকে দেখে প্রেস থেকে গলা বাড়াল বটুক। জেসমিন তাকে বলল,

"ভাইয়া, এক হেল্প করোগে?"

"কেয়া হেল্প," বটুক এগিয়ে এল দরজার কাছে।

"মেরি না এক চিজ গিড় গয়ি হ্যায় গলি মে। লা দোগে?"

জেসমিন আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিল তার জিনিস কোথায় পড়েছে। বটুক দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়েই গলির মধ্যে জিনিসটা দেখতে পেল। সে এক পা বাড়িয়েওছিল সেটা তুলে আনতে। কিন্তু তারপর থমকে দাঁড়াল। জিনিসটা একটা মহিলাদের অন্তর্বাস। পুরুষমানুষের হলে তবু কথা ছিল। কিন্তু ওটা সে নিজে হাতে ধরতে পারবে না। বটুক জেসমিনের চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

"আপনি ভিতরে এসে নিয়ে যান!"

কথাটা কোনোরকমে বলেই বটুক প্রায় পালিয়ে গেল প্রেসের ভিতরে।

জেসমিন স্বস্তি পেল। তার চালটা কাজে লেগে গেছে। এই গলির মধ্যে একা ঢুকে পড়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। তার ট্রাউজারের পকেটে ছিল একটা ছোট্ট যন্ত্র। বাউণ্ডারি ওয়ালের ভিতর দিকে ইটের ফাঁক দিয়ে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে। সবুজ পাতার ঘন জঙ্গল আংশিকভাবে উধাও করে দিয়েছে দেওয়ালের শরীরটাকে। জেসমিন সেই গাছের সামনে পৌঁছে নিমেষের মধ্যে তার পকেট থেকে বের করে নিল মিনি ক্লিপ ক্যামেরা। অশ্বত্থ গাছের পাতার আড়ালে আটকে দিল ক্লিপটা। ঝাকড়া হয়ে ওঠা গাছের গায়ে লেগে থাকা ক্যামেরা কারোর চোখেই পড়বে না। কিন্তু সে দিব্যি দেখতে পাবে উল্টোদিকের যে দুটো জানলার, তার ওপাশে, ঘরের ভিতরে কী আছে।

অন্তর্বাসটা জামার তলায় লুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জেসমিন। বটুককে বলল,

"হো গয়া ভাইয়া, থ্যাঙ্ক ইউ।"

রাস্তার উল্টোদিকে বিকাশ দত্তের বাড়ির নতুন ভাড়াটেরা সজাগ ছিল। জেসমিনের গলা পাওয়ামাত্র তারা কাজে লেগে পড়ল। ক্যামেরা একা দেখলে তো আর হবে না, তার পাঠানো লাইভ ফুটেজকে ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে তাদেরকেও তো দেখতে হবে।

(২১)

বাড়ির গেট ঠেলে ঢোকার সময় জেসমিন দেখল দীনেশদা কটমট

করে চেয়ে আছে তার দিকে। এই দীনেশদাকে গত তিনদিনে সে দেখেনি। কোমরে হাত দিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক্ষুণি স্কুলের টিচারদের মতো হাতে রুলারের বাড়ি দেবে।

"তুমি তো দেখছি মহা বেয়াড়া মেয়ে! তোমাকে এই বাড়ির দুটো ঘর ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছ কেন? এবার তো তবে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়!"

দীনেশদা'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জেসমিন তার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। পিছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নেই, সে দিব্যি অনুমান করতে পারছে যে দীনেশদা আসছে তার পিছন পিছন। দ্রুত ঘরে ঢুকে বিছানার তোষকের তলা থেকে তার পিস্তলটা বের করে কোমরে গুঁজে নিল জেসমিন। শার্টের আড়ালে চলে গেল ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র।

দীনেশদা জেসমিনের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটা মানুষ মাত্র দশ মিনিটে কতটা বদলে যেতে পারে, সেটা ওঁর চাহনিতেই স্পষ্ট হচ্ছিল।

"শোনো মেয়ে, তোমার ভাবগতিক আমি ভাল বুঝছি না। আজকের রাতটা সময় দিচ্ছি। কাল সকালে নিজের ব্যবস্থা অন্য কোথাও করে নিও!"

জেসমিনের চাহনিও বদলে গেল এবার। তার মুখে ফুটে উঠল একটা ক্রুর হাসি। দীনেশ হকচকিয়ে গেলেন এই দৃশ্যে।

"আজকের রাতটা সময় দিচ্ছেন তাহলে? থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আজকের রাতটা খুব ক্রুশিয়াল, জানেন?"

"মানে? কী বলতে চাইছ? মতলবটা কী তোমার," গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করতে করতে ঘরের ভিতরে ঢুকে এলেন দীনেশদা। এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল জেসমিন। বিদ্যুতের গতিতে তার ডানহাত খামচে ধরল দীনেশদার শার্টের কলার। এক ঝটকায় পয়ষট্টি বছরের প্রবীণকে টেনে এনে বিছানার উপরে ফেলে দিল প্রশিক্ষিত জেসমিন। তারপর শার্টের আড়াল থেকে বের করে নিল তার গ্লক সেভেন্টিন পিস্তল।

দীনেশের দু'চোখে এখন শুধুই অবিশ্বাস। বন্দুকের নল তাক করব তাঁর দিকে। সারা শরীরে একটা তীব্র কাঁপুনি অনুভব করছেন তিনি।

জেসমিন ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বলল,

"সরি দীনেশদা! এটা আমাকে করতে বাধ্য না করলেই পারতে! আমি জানি তুমি আমাকে স্নেহ করো। নিজে হাতে চা করে খাইয়েছ আমাকে। লাঞ্চবক্সে খাবার প্যাক করে দিয়েছ। আমি জানি তুমি ভাল মানুষ। কিন্তু তোমার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কয়েকজন শয়তান এই বাড়িটা জুড়ে যে কারবার চালাচ্ছে, সেটা তো আর চলতে দেওয়া যায়

না!"

দীনেশ ধীরে ধীরে উঠে বসলেন বিছানায়। জেসমিন ঘরের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। জানলার কাছেই রাখা ছিল তার ট্রাইপড। সেটাকে দীনেশের সামনে বসিয়ে তার উপরে সেট করে দিল নিজের মোবাইল। ক্যামেরায় ভিডিও মোড অন করে সে বলল,

"নাও দীনেশদা, শুরু করো। এই বাড়িতে কে কী কারবার চালাচ্ছে সব টুক টুক করে বলে ফেলো তো দেখি!"

দীনেশ মুখ খুললেন না, মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জেসমিন এগিয়ে এল তার সামনে। পিস্তলটা দীনেশদার কপালের ডানদিকে ঠেকিয়ে বলল,

"বোকামো কোরো না দীনেশদা! জগতের নিয়ম জানো তো? যখনই অশুভ শক্তির হাত ওঠে, সবার আগে মরে গরীবেরা। তুমি যাদের বাঁচানোর জন্য মুখ বুজে আছ, ধরা পড়লে প্রথমেই তোমার ঘাড়ে দায়টা ঠেলে দেবে তারা। তুমি এ বাড়ির কেয়ারটেকার, তাই সব দোষ তোমার! তুমি ভাবছ ওরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। কিন্তু তুমি অলরেডি জালে জড়িয়ে আছ অনেকটা। শাস্তি তুমি এড়াতে পারবে না কোনোমতেই। বরং আমার সামনে মুখ খুললে তোমার দুর্ভোগ যাতে কিছুটা কম হয়, সেটা আমি দেখব।"

দীনেশ বুঝতে পারছিলেন মুখ খোলা ছাড়া তাঁর সামনে আর গত্যন্তর নেই। লম্বা একটা শ্বাস নিলেন তিনি। মোবাইলের ক্যামেরা রেকর্ড করতে শুরু করল মায়া ভবনের কেয়ারটেকারের জবানবন্দি!"

কুড়ি মিনিট ধরে জেসমিনের সব প্রশ্নেরই জবাব দিলেন দীনেশ। রেকর্ডিং ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে নিয়ে জেসমিন এসে বসল দীনেশদার পাশে। তাঁর পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলল,

"তুমি অনেক হেল্প করলে দীনেশদা। এবার একটা ফাইনাল হেল্প চাই। আমি জানি তুমি না করবে না!"

দীনেশ অসহায়ভাবে চাইলেন জেসমিনের দিকে। প্রবীণ মানুষটার চোখের কোণে জল এক মুহূর্তের জন্য জেসমিনের ইস্পাত কঠিন হৃদয়কে আঘাত করল।

(২২)

বিনোদের কাছ থেকে বিকাশ সিগন্যাল পেলেন সাড়ে চারটে নাগাদ। তিনি চন্দনের নাম্বার ডায়াল করলেন। চন্দন তখন দত্তপুকুরের দিকে যাচ্ছিল একটা কাজে।

"হ্যাঁ দাদা বলুন। কোনো প্রবলেম?" চন্দন প্রশ্ন করল। বিকাশ

জবাবে বললেন,

"ভাই, একটা কথা বলো তো! আমাদের পাড়ায় কি কোনো টেনশন চলছে কিছু নিয়ে?"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল বিকাশ আর চন্দনের মাঝে। তারপর যখন মুখ খুলল চন্দন, বিকাশের মনে হল তার গলার স্বর বদলে গেছে—

"কেন? হঠাৎ এরকম কেন বলছেন?"

"না, আমি গত দুদিন ধরে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখছি। কেমন যেন লাগছে তাদের আচরণ। যেন কোনো কিছুর উপরে নজর রাখছে। আজও দেখলাম। একটা মেয়ে তোমাদের বাড়ির পিছনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। একে আমি আগে দেখিনি। গতকাল বিকেলে বোধহয় একবার দেখেছিলাম, দীনেশদার সঙ্গে আমাদের রাস্তায় ঘুরছিল। তুমি তো খবরটবর রাখো, তাই বললাম আর কি!"

"আচ্ছা! একটা মেয়ে ঢুকেছিল। দীনেশদার সঙ্গে দেখেছেন? ঠিক দেখেছেন," চন্দনের ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে।

"হ্যাঁ, একেই দেখেছি।"

"ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। আমাদের পাড়া তো বরাবরই পিসফুল। এখন রাস্তা দিয়ে কে ঘোরাফেরা করছে তাই নিয়ে হেডেক নিয়ে লাভ নেই দাদা, বুঝলেন তো?"

বিকাশের এইটুকুই বলার কথা ছিল। তিনি কাজ শেষ করে বিনোদকে চন্দনের জবাবগুলো জানিয়ে দিলেন। তারপর রোজকারের মতো বাড়ি থেকে বেরোলেন সন্ধ্যা বাজারের উদ্দেশে। রেলগেটের কাছে দেখা হয়ে গেল কানাই আর সন্তোষের সঙ্গে। খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও ওদের সঙ্গে প্রায়ই একটা দুটো কথা হয় বিকাশের। এক একদিন তো ওদের সাথে কথা বলতে বলতেই তিনি বাজার থেকে ফেরেন। কিন্তু আজ যেন কথা বলা হয়ে উঠল না বিকাশের। তাঁর মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওরাও দ্রুত পায়ে চলে গেল বাড়ির দিকে। বিকাশের সঙ্গে চোখাচোখি হতে কানাই কেবল ঘাড়টা একদিকে সামান্য হেলিয়ে একটু হাসল।

সেই সময় তানিয়ার বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল রঞ্জন। মাঝখানে যে তার মোবাইলটা অন্য একজনের হাতে চলে গিয়েছিল, তা সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তবে তানিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে এসে একটা দুপুর ঘুমিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে, এটা ভেবে তার আক্ষেপ হচ্ছিল। তানিয়া কিচেনে সন্ধের জন্য স্ন্যাক্স বানাচ্ছিল। রঞ্জনের মোবাইলের

রিংটোন শুনতে পেল সে। তানিয়া মিক্সারের জারে আদা, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে সুইচ অন করতে যাচ্ছিল। মোবাইলের শব্দ পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিল সুইচ থেকে। কিচেনের দরজার কাছে চলে এল সে। শোনার চেষ্টা করল রঞ্জনের কথা...

"হ্যাঁ, বল!"

...

"কে? কোন বাড়ি? হ্যাঁ, কী বলেছে?"

...

"ঠিক দেখেছে?"

...

"না, আমি কিছু জানি না। ঠিক আছে, তুই রাখ। আমি দীনেশদাকে ফোন করে জানছি!"

...

"ছাড় তো! কাকে দেখতে কাকে দেখেছে! এত শিওর হয়ে বলছে কী করে মালটা?"

...

"তুই রাখ, আমি কথা বলছি। তোকে পরে কনফার্ম করছি। বেফালতু টেনশন নিস না!"

...

"না, তুই কিছু করবি না। কিছু করার হলে আমি করবো!"

এরপর কিছুক্ষণ বেডরুম থেকে আর কোনো শব্দ ভেসে এল না। ডিনারে কী আনাবে জিজ্ঞেস করতে এসে তানিয়া দেখল রঞ্জন শার্টের উপরে হাফ জ্যাকেট চাপাচ্ছে।

"কী হল? কোথায় যাচ্ছ," তানিয়া প্রশ্ন করল। রঞ্জন উত্তর দিল না। তার আচরণে একটা অস্থিরতা লক্ষ করল তানিয়া।

সে আবার প্রশ্ন করল,

"এনিথিং রং?"

এবারও জবাব দিল না রঞ্জন। সে এন্ট্র্যান্সের দিকে পা বাড়াল। তানিয়া গেল তার পিছন পিছন। পায়ে জুতো গলাতে গলাতে রঞ্জন বলল,

"আই উইল বি ব্যাক। হয়তো একটু দেরি হবে, বাট আমি আসব!"

তানিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছুটা দূরে একটা বাদামি রঙের ডাস্টার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। রঞ্জন তার গাড়িতে উঠে রওনা দিতেই ডাস্টারের হেডলাইটও জ্বলে উঠল।

হৃদয়পুরে বিকাশ দত্তের বাড়িতে ল্যাপটপে চোখ রেখেছিল বিনোদ। সেই দুপুর থেকে গাছের আড়ালে লুকোনো ক্যামেরা কেবল মান্ধাতার আমলের কাঠের জানলার ফ্রেমকে লেন্সবন্দি করছিল। মিনিটখানেক হল জানলাটা খুলেছে। ঘরের ভিতরের গতিবিধির লাইভ ফুটেজ পাঠাতে শুরু করেছে ক্যামেরাও। ফুটেজের সঙ্গে ওরা মিলিয়ে দেখে নিল কয়েক ঘন্টা আগের একটা রেকর্ডিং আর কিছুদিন আগে এক সোর্সের কাছ পাওয়া কয়েকটা স্টিল ছবি। মিলে যাচ্ছে সবকিছু।

বাদামি ডাস্টারের ভিতরে বেজে উঠল ফোন। দু'মিনিটের একটা ছোট্ট কথোপকথন সেরে নিল দুই পক্ষ।

বিকেল পাঁচটা পঞ্চান্নঃ বিধাননগরে এন এ টি সি'র অফিসে স্টেশন অফিসারের ডেস্কে সাইলেন্ট করে রাখা মোবাইলের স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। ফুটে উঠল কলারের নাম—

'HAWK'!

অ্যাকশনে নামার চূড়ান্ত নির্দেশের অপেক্ষায় অফিসে বসে ছিল হকের টিমের দুই সদস্য। তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এন এ টি সি'র অফিসের সামনে এসে থামল কালো বোলেরো গাড়ি। সামনের সিট থেকে লাফিয়ে নামল হক। বিদ্যুতের গতিতে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে পৌঁছে গেল তার লকারের কাছে। লকার থেকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট বের করে গায়ে চাপিয়ে নিল সে। জ্যাকেটের পকেটে ভরে নিল অতিরক্ত চারটে ম্যাগজিন। ওয়ালথার পি নাইন নাইন পিস্তল বসে গেল ট্রাউজারের সঙ্গে আটকানো হোলস্টারে।

গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে একবার অফিসের দরজার দিকে তাকাল হক। দরজার বাইরেই দেওয়ালে গ্র্যানাইটের ফলকে খোদাই করা আছে এন এ টি সি'র এমব্লেম। বছর চারেক আগে এই অফিস যখন নির্মীয়মান অবস্থায়, তখন ঠিক এই জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল একটি জঙ্গিগোষ্ঠী! তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি সেদিন। আজ আবার এই শহরের অনতিদূরে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। আবারও দুর্যোগের মোকাবিলা করতে ময়দানে নামতে হচ্ছে তাকে।

সাড়ে ছটা নাগাদ একটা ছোট কারগো ভ্যান মায়া ভবনের পছনদিকের গলি দিয়ে ঢুকল। সেটা এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজার সামনে। বিকাশ

দত্ত তখন তাঁর দুই ভাড়াটের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে। বিনোদের দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে বললেন,

"আপনাদের দারুণ লাক মশাই। আপনারা আজই এলেন আর এসেই এই ভ্যানের দর্শন পেয়ে গেলেন! রোজ কিন্তু আসে না এই গাড়ি। সপ্তাহে দু'বার!"

দিলীপের চোখ ছিল তার পকেট বাইনোকুলারে। সেটাকে চোখে লাগিয়ে রেখেই সে বলল,

"আজ তো ওকে আসতেই হতো!"

(২৩)

সন্ধে সাতটা নাগাদ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল জেসমিন। দীনেশদার ঘরের দিক থেকে কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছে। জেসমিন দ্রুত তার ইস্পাত কঠিন ভাবমূর্তির উপর সরল সিধে মেয়ের মুখোশটা চাপিয়ে নিল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। শার্ট প্যান্ট ছেড়ে হাউজকোট আগেই পরে নিয়েছিল জেসমিন। ছিটকিনি খুলতে যাওয়ার সময় আয়নার নিজের প্রতিবিম্বটা এলবার দেখে নিল জেসমিন। বুকের ক্লিভেজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তার সামনে এসে যে দাঁড়াবে সে আরো স্পষ্ট দেখতে পাবে।

দরজা খুলতেই দ্রুত ঘরে ঢুকে এল রঞ্জন। কয়েক মুহূর্ত অপলক নেত্রে সে চেয়ে রইল জেসমিনের দিকে। তার ঢেউ খেলানো চুল পাহাড়ি ঝর্ণার মতো নেমে গিয়েছে বুকের উপর দিয়ে। সিল্কের হাউজকোট শরীরের উপর টাইট হয়ে বসেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি কার্ভ।

রঞ্জন জেসমিনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল,

"তোমার জন্য একটা গুড নিউজ নিয়ে এসেছি!"

"গুড নিউজ? ক্যায়সা গুড নিউজ," জেসমিন ভ্রুঁ নাচাল।

"আমার সেই ফ্রেন্ডের কথা তোমাকে বলেছিলাম না? তোমার পোর্টফোলিও ওর পছন্দ হয়েছে। ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড অ্যাজ আ মডেল ফর অ্যা গ্রোয়িং এফএমতিজি ব্র্যান্ড!"

জেসমিন রঞ্জনের সঙ্গে তার শারীরিক দূরত্ব কমাল। তার দু চোখে ফুটে উঠল আনন্দের সরল অভিব্যক্তি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন আপনি?"

রঞ্জন তার দুই হাতে জেসমিনের দুই কাঁধ স্পর্শ করল। তার মুখে এক অচেনা হাসিকে ফুটে উঠতে দেখল জেসমিন।

"হ্যাঁ সত্যি। একদম সত্যি। আরো ভাল ব্যাপার কী জানো? এই

পুরোনো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে তোমাকে আর কষ্ট করে থাকতে হবে না। আমার বন্ধুকে তোমার সব কথা বলেছি। ও তোমার জন্য একটা অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করেছে। একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট। মিনিমাম রেন্টে পাবে তুমি। অব তো খুশ হো না?"

জেসমিন সরল হাসি হাসল। রঞ্জন বলল,

"আরে তাকিয়ে দেখছ কী? প্যাকিং শুরু করে দাও।"

"মতলব... আই মিন, মানে?"

"মানে আবার কী? আজই নিয়ে যাব তো তোমাকে। তোমার তো বিলংগিংস তেমন কিছুই নেই। এক্ষুণি হয়ে যাবে।"

জেসমিন যেন কৃতজ্ঞতায় ডুবে যাচ্ছে। সে মাথা নিচু করল। রঞ্জন তার দুই আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলল তার থুঁতনি। তার চোখের চাহনি বদলে গেছে। ঝোপের আড়ালে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকা বিড়ালের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

"কিন্তু, এতকিছু যে আমি করলাম বা করে যাচ্ছি, ইন একসচেঞ্জ আমি কী পাবো," রঞ্জন প্রশ্ন করল।

রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার সময় কান সজাগ রেখেছিল জেসমিন। একটা বাইক থামার শব্দ পেয়েছে সে। এবার জুতোর শব্দ পাচ্ছে সে। শব্দটা বাগানের দিকে থেকে এই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বিদ্যুতের গতিতে ঢুকে এল চন্দন। রক্তজবার মতো লাল হয়ে রয়েছে তার দুটো চোখ।

"শালা চুতিয়া! আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে আর তুই এখানে এই মাগির সঙ্গে প্রেম মারাচ্ছিস!"

চিৎকার করে বলল চন্দন। বলতে বলতেই ডান হাত পিছনে করে সে তুলে নিল রিভলভার। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল যে জেসমিন সরে যাওয়ার সুযোগ পেল না। গর্জে উঠল রিভলভার। বাঁদিকের পাঁজরে একটা তিব্র যন্ত্রণা অনুভব করল সে।

চন্দন বাঘের মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিল। রঞ্জন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল।

"কী করলি এটা চন্দন? তোকে বলেছিলাম না আমি কেস সালটে দেব। গুলি চালালি কেন?"

চন্দন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে ধাক্কা মেরে রঞ্জনকে ছিটকে ফেলল বিছানায়। আবার জেসমিনের দিকে তাক করল তার রিভলভার। জেসমিন মাটিতে বসে পড়েছিল পাঁজর চেপে। তার পিস্তল রয়েছে খাটের হেডিবোর্ডের দিকে। আর সে বসে আছে ঘরের অপর প্রান্তে।

ফের গর্জে উঠল পিস্তল। কিন্তু এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার নাল। রঞ্জন

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চন্দনের উপরে। চিৎকার করে বলল,

"চন্দন, তোকে না করছি তো। মহিলাদের শরীরে কোনো দাগ আমি পছন্দ করি না। ইটস অ্যান অ্যাসেট!"

চন্দনের রিভলভার ধরা ডানহাতের মুঠো আছড়ে পড়ল রঞ্জনের চোয়ালের উপরে। ছিটকে পড়ল সে। জেসমিন নিজেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় নেই। চন্দনের হাত চলে গিয়েছে ট্রিগারে। রিভলভারের ধাতব চোখ চেয়ে আছে জেসমিনের দিকে।

'ঠুস'

চাপা একটা শব্দ শুনতে পেল জেসমিন। তারপর দেখল চন্দনের মুখে একটা বিকৃতি ফুটে উঠছে। ধীরে ধীরে তার শরীরের উচ্চতা কমে এল। হাঁটু ভাজ হয়ে যাচ্ছে তার। বাতিল ঠোঙার মতো কে যেন দুমড়ে দিচ্ছে তাকে।

চন্দন মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই জেসমিন দেখতে পেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হক স্যর। তাঁর ডানহাতে ধরা ওয়ালথার পি নাইন নাইনের মুখে লাগানো সাইলেন্সর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল জেসমিনের। সে শুধু দেখতে পেল একটা মেয়ে হক স্যারকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে।

হকের দুই সঙ্গী ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিল বাড়ির দক্ষিণ দিকে। দীনেশদার কাছে এই বাড়ির প্রতিটা কোল্যাবসিবল গেটে ঝোলানো তালার চাবি থাকে। জেসমিনের কথামতো তিনি উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে যাওয়ার টানা বারান্দার দুটো গেটই খুলে রেখেছিলেন। ঘন ঘন দুবার গুলি চলার শব্দে বিচলিত হয়ে পড়েছিল বাড়ির দক্ষিণদিকের ঘরের দুই বাসিন্দা। তারাও হাতে পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে দুই শিকারী যে এসে তাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা তার জানবে কেমন করে?

হকের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল টিমের আরো তিন সদস্য— ওয়াসিম, গৌতম আর সুচন্দ্রা। সে জসমিনের আঘাত পরীক্ষা করে বলল,

"গুলি লেগেছে স্যর! আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সল্টলেকে।"

ওয়াসিম এসে চন্দনের পালস চেক করে বলল,

"এখনো আছে!"

"শাকিলকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচার নিয়ে আসতে বল। কুইক! দিস বাস্টার্ড মাস্ট সারভাইভ টু স্পিক," বলল হক।

রঞ্জনের সমস্ত হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছিল। কী ঘটছে এই ঘরের মধ্যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু চন্দনের সামনে হাঁটু মুড়ে বসা

লোকটার মুখ খুব চেনা লাগছে তার। কোথাও দেখেছে এই মুখটা। খুব শিগগিরি!

অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে ওয়াসিম এসে দাঁড়াল রঞ্জনের সামনে। তার কলারটা খামচে ধরে বলল,

"কী বস? মেয়েমানুষ দেখলেই ঘন্টি বেজে ওঠে, না? চোখ চকচক করে, জিভে জল আসে? বসেছিল ট্রেনের টয়লেটের সামনে। দরদ উথলে উঠল তোমার! এবার দাও খেসারত!"

মায়াভবনকে এন এ টি সি'র সাদা পোশাকের কোম্যান্ডোরা ঘিরে ফেলেছিল কারগো ভ্যানটা গলিতে ঢোকার সময়ই। আদিত্য প্রেসের পাশের ঘরে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা দুই ছদ্মবেশী অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য আরো দুজন ঢুকে এসেছিল বাড়ির পিছনদিকের এন্ট্র্যান্স দিয়ে। তাদের হাতে ছিল ফুললি লোডেড এম পি ফাইভ! ওয়াসিম আর গৌতম রঞ্জনকে নিয়ে গিয়ে তুলল গাড়িতে। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল রঞ্জন।

এতদিনের পরিচিত এজেন্ট শাকিল কেন সেদিন নিউ ফরাক্কা থেকে তার ট্রেনে সিট আছে বলেছিল, সেটা রঞ্জন বুঝতে পারেনি। পরদিন শাকিল জানতে চেয়েছিল তার ট্রেনে কোনো অসুবিধে হয়েছিল কিনা। এক মুহূর্তের জন্য খটকা লেগেছিল রঞ্জনের মনে। ড্রাইভারের সিটে বসে আছে গৌতম। সেদিন সে'ই লোয়ার বার্থ থেকে জেসমিনকে খেদিয়ে দিয়েছিল। সবটাই ছিল নাটক, একটা সাজানো ঘটনা!

হক গিয়ে পৌঁছল তার দুই টার্গেটের সামনে। শওকত মণ্ডল এবং করিম আনসারি; উত্তর চব্বিশ পরগণার এই নিরিবিলি পাড়া ও হাইওয়ের ধারের রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্টের অন্যান্য রাজমিস্ত্রীরা যাদের সন্তোষ ও কানাই নামে চেনে। হাতকড়া পরিয়ে বোলেরা গাড়িতে তোলা হল তাদের। বিনোদ আর দিলীপ হকের সঙ্গে ফিরে এল মায়া ভবনে। যে ঘরে ওরা দুজন ছিল, তার মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা। দুটো দিন আনা দিন খাওয়া রাজমিস্ত্রীর ঘরে এমন কার্পেট বেমানান। তবে হক একেবারেই অবাক হল না। নির্ভুল অনুমানে কার্পেটটাকে সরিয়ে নিতেই তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট কাঠের বোর্ড। তার এক ধারে একটা ছোট্ট কড়া লাগানো। কড়া ধরে টানতেই বোর্ড উঠে এল। দেখা দিল এক গভীর গর্ত। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল হক। সাদা আলো গিয়ে পড়ল গর্তের গভীরে। দেখা গেল থরে থরে সাজানো রয়েছে দেশি পিস্তল ও মাস্কেট।

এন এ টি সি'র কাজ এখানেই শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু জেসমিন হককে জানিয়েছিল করিম আর শওকতের পাশের ঘরে একটা মেয়েকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালবাজারের মেয়ে সে। দরজা খুলে তাকেও উদ্ধার করল হক ও তার সঙ্গীরা। সিডেটিভের কড়া ডোজের প্রভাবে বেচারি তখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল ঘরের এক কোণে।

(২৪)

ঘটনার দিন রাত্রে এন এ টি সি'র অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন চলছিল। বড় কনফারেন্স হলে রাউণ্ড টেবিলে সাংবাদিকদের গোটা অপারেশন সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন চিফ অফ স্টেশন সুরিন্দর চাওলা।

গত জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। সেই ঘটনায় জঙ্গিযোগ প্রমাণিত হতেই তদন্তে নেমেছিল এন এ টি সি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল চার ব্যক্তি। তাদের দুজনকে অক্টোবর মাসে নবদ্বীপ থেকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এস টি এফ বাহিনী। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি বাকি দুজনের। তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল এন এ টি সি'র টিম। কোথায় কোথায় গিয়ে তারা গা ঢাকা দিতে পারে, তার একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। চারটে জায়গাকে চিহ্নিত করেছিল হক এবং তার সঙ্গীরা। কিন্তু অনুসন্ধানের পর তিনটি জায়গা তালিকা থেকে বাদ পড়ে। বাকি ছিল হৃদয়পুর স্টেশনের কাছে অবস্থিত মায়া ভবন।

এন এ টি সি জানতে পারে শওকত ও করিম যে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের পশ্চিমবঙ্গের কম্যান্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে মালবাজারের রাজনীতিবিদ সৌমেন নস্করের। অনুসন্ধানে এটাও জানা যায় যে সৌমেনের এক গোপন ব্যাবসা আছে, যার পার্টনার শিলিগুড়ির রঞ্জন মজুমদার নামের একজন। ইতিমধ্যেই এন এ টি সি'র কাছে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সূত্র মারফৎ খবর আসে যে ভগবানগোলা থেকে উধাও হয়ে যাওয়া সেই দুজন, অর্থাৎ শওকত মণ্ডল ও করিম আনসারিকে মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় দেখা গেছে। একটা ছবিও পাঠায় সূত্র। অনুসন্ধান শুরু হয়।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জুড়ে এন এ টি সি'র এজেন্টরা কাজ শুরু করে। জানা যায় হৃদয়পুর অঞ্চলে স্টেশনের কাছে একটা পুরোনো বাড়ির একতলায় মাসদুয়েক ধরে থাকছে দুজন রাজমিস্ত্রী। অত্যন্ত সাদামাটা দুজন মানুষ, সকালবেলায় কাজে বেরিয়ে যায়, বিকেলে ফিরে আসে। কিন্তু কোথায় যায় তারা, সে খবর এজেন্টরা বের করতে

পারছিল না। অবশেষে জানা যায় এই পুরোনো বাড়িরই এক শরিক চন্দন বাড়ি ঘরের দালালি করে। সে এখন অন্য বাড়িতে থাকে আর তার বাড়িতে একটা ঘর সে ভাড়া দিয়েছে এই দুজনকে, পাড়ায় যারা সন্তোষ ও কানাই নামে পরিচিত।

চন্দন সম্পর্কে রঞ্জন মজুমদারের আত্মীয় হয়, এটা জানার পরেই এন এ টি সি এই বাড়িতে রেইড করার পরিকল্পনা সাজায়।

এই অবধি বলে "ওভার টু ইউ" বলে হকের দিকে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিলেন সুরিন্দর চাওলা। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,

"আপনাদের একজন টিম মেম্বার আজ এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি সম্প্রতি ওই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন। এই বিষয়টা একটু খুলে বলবেন?"

টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাগুলো হকের ক্লোজ আপ ধরল। বাড়িতে টিভির সামনে বসে ছিলেন বিকাশ দত্ত। তাঁর মনে পড়ছিল পরশু দুপুরের কথা। এই ভদ্রলোক তাঁর অফিসে এসেছিলেন। গায়ের রং চাপা, উচ্চতা মাঝারি, চেহারা ছিপছিপে, তবে মনে রাখার মতো নয়। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখদুটো যেন সমুদ্রের মতো গভীরে। ভদ্রলোক তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড দেখানোর পরে বিকাশ কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো বসে ছিলেন চেয়ার। তারপর অফিসে তাঁর কেবিনেই বিনোদ আর দিলীপের তাঁর বাড়িতে এসে পোজিশন নেওয়ার পরিকল্পনাটা সাজানো হয়েছিল।

হক বলতে শুরু করল,

"যে দুজনকে আমরা খুঁজছিলাম তারা ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। অ্যান্ড দে আর ভেরি স্মার্ট। আমরা একটা অনুমানের ভিত্তিতে এগোচ্ছিলাম। এই অনুমান ভুল হলে ওরা আরো অ্যালার্ট হয়ে যেত। তাই ফাইনাল অ্যাকশনের আগে আমরা নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে ওই বাড়িতে যে দুজন থাকছে তারাই আমাদের টার্গেট। সেই কাজের জন্যই আমাদের একজন টিম মেম্বার আগে থেকে ওই বাড়িতে থাকছিলেন।"

ফের প্রশ্ন ধেয়ে এল,

"ওরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত? আপনারা প্রেস থেকে কিছু ডকুমেন্ট রিকভার করেছেন বলছেন। সেগুলো কাদের?"

শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের গা ঘেঁষা হোটেল লাভলির ম্যানেজার সত্যচরণ ঘড়াই তখন বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন। কর্মচারী দুলাল ছুটে এসে বলল,

"ও বড়দা ও বড়দা, একটা জিনিস দেখবেন আসেন!"

দুলালের পিছন পিছন সত্যচরণ রিসেপশনে এলেন। টিভিতে নিউজ চলছিল। দুলাল টিভির দিকে দেখিয়ে বলল,

"এই...এই লোকটা আমাদের হোটেলে ছিল দাদা, জানেন? দোতলায় ছিল।"

একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে সত্যভরণ চাইলেন দুলালের দিকে। সে গলার কাছে হাত নিয়ে বলল,

"এই মা কালীর দিব্যি খেয়ে বলছি। দোতলায় ষোল নম্বর ঘরে ছিল লোকটা। একদম কনফার্ম!"

হক জবাব দিল,

"এরা কারেন্টলি ই আই এম নামের টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এর আগে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে এরা কাজ করেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান দুজন। এবং অসম্ভব হিংস্র। কেউ কোনোভাবে এদের আসল আইডেন্টিটি ধরে ফেলেছে বুঝলে তাকে স্রেফ শেষ করে দেবে। কারেন্টলি যে প্রোজেক্টে এরা মিস্ত্রীর কাজ করছিল সেখানে মাসখানেক আগে আরও কয়েকজন মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উই হ্যাভ এভরি রিজন টু বিলিভ এটা এই দুজনেরই কাজ। নিশ্চয়ই সেই লোকটি কোনোভাবে কিছু আঁচ করেছিল। আর ডকুমেন্ট যা পেয়েছি সেগুলো এই অর্গানাইজেশনের ভিশন ডকুমেন্ট, যেগুলো ওই বাড়ির একতলার প্রেস থেকেই ছাপানো হয়েছিল। ই আই এম কীভাবে আগামী দশ পনেরো বছরে ধাপে ধাপে গোটা ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে তাই তুলে ধরা হয়েছে এই ভিশন ডকুমেন্টে। আমাদের ওয়েবসাইটে সেটা আপলোড করা হবে।"

রঞ্জন মজুমদারকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই প্রশ্নও উঠল।

"রঞ্জন মজুমদার আর সৌমেন নস্কর এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গলে একটা ব্যবসা চালাত। নারী পাচারের ব্যবসা। তাদের হাত লম্বা হতে হতে আসাম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও পৌঁছে গেছিল। এবং সেই টাকা দিয়ে তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সাহায্য করতো। অর্থাৎ রঞ্জন মজুমদার যে শুধু তাঁর বাড়িতে দুজন ওয়ান্টেড টেররিস্টকে শেল্টার দিয়েছেন তাই নয়, হি অ্যান্ড হিজ পার্টনার ওয়াজ অলসো ইনভলভড ইন টেরর ফান্ডিং। যে ঘর থেকে শওকত আর করিমকে গ্রেফতার করি আমরা, সেই ঘরের মেঝের নিচে হিডেন চেম্বার পাওয়া গেছে। সেখানে প্রচুর ফায়ার আর্মস মজুত করা ছিল। দিনের বেলায় মিস্ত্রীর কাজ করতো ওরা আর রাত্রে এই বাড়িতে বসে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতো। আদিত্য প্রেসের জন্য বরাদ্দ দুটো ঘরের একটা অংশ দখল করে নিয়েছিল ওরা। কাঠের পার্টিশন দিয়ে সেখানেই অস্ত্র তৈরির ছোট কারখানা গড়ে তুলেছিল। প্রেস থেকে ছাপানো কাগজপত্র যখন ভ্যানে লোড হতো তখন তার সঙ্গেই পাচার হয়ে যেত বে-আইনি

অস্ত্র। কলকাতায় আর দু'মাসের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন। উই সাসপেক্ট এদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ইললিগ্যাল ফায়ার আর্মস সমাজবিরোধীদের কাছে গিয়েছে এবং সেগুলো ইলেকশনের সময় ব্যবহারও হতে পারে। রঞ্জন মজুমদার সবই জানতেন। সো হি ইজ ভেরি মাচ আ পার্ট অব দিস কেস!"

তানিয়া টিভি চালাননি। আজ রঞ্জন চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর মনটা ভাল নেই। রঞ্জন তাঁকে ঠকিয়েছে কিন্তু তাঁর মনের কোনো এক কোণে আজও একটু জায়গা রয়ে গিয়েছে ওর প্রতি। তানিয়ার এক বান্ধবী টিভির সামনে বসে সমানে রিলে শোনাচ্ছিলেন তাঁকে মোবাইলে। আজ সকালের কথা মনে পড়ছিল তানিয়ার। এক ভদ্রলোক সটান এসে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছিলেন তাঁকে। রঞ্জনের সমস্ত বে-আইনি কাজকারবার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাঁর গভীর দুটো চোখের দিকে চেয়ে আজ প্রথমবার তানিয়ার মনে হয়েছিল রঞ্জনের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে একজন অপরাধী। গ্রাম ও জেলার অল্পবয়সী মেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন থাকে। অনেকের তার চেয়েও বেশি থাকে প্রয়োজন। সেই সব মেয়েদের দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে রঞ্জন ও তার পার্টনার তাদের চিরকালের জন্য অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কাউকে ফিল্মে বা মডেলিংয়ে চান্স পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কাউকে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় পোস্টে চাকরি করিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তুলে আনে। বিভিন্ন বড় ফ্ল্যাটে হোটেলে রাখে তাদের। তারপর তারা স্রেফ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় একদিন।

তানিয়ার বান্ধবী শর্মিষ্ঠা এন এ টি সি'র প্রতিনিধির বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আজ সকালে ডাইনিং যিনি এসেছিলেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে শর্মিষ্ঠার বর্ণনা।

সাংবাদিকেরা আরো প্রশ্ন করতো কিন্তু এমন সময় বিনোদ এসে হকের কানে কানে বলল জেসমিনের জ্ঞান ফিরেছে।

"নো মোর কোয়েশ্চেনস প্লিজ!"

হক উঠে দাঁড়াল। এক সাংবাদিক তবু ছুটে এল তার পিছন পিছন। হক ফিরে তাকাল তার দিকে। সাংবাদিক প্রশ্ন করল,

"স্যর, আজকের এই ঘটনার পরে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?"

উত্তর এড়িয়ে যেতে পারত হক। কিন্তু তার মনে হল উত্তরটা দেওয়া

উচিত।

"মানুষকে সচেতন হতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে মানুষ আর আশপাশ দেখছে না। মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখতে রাখতে মানুষের মাথা ক্রমশ নিচু হয়ে যাচ্ছে। সামনে, পাশে, কাছে, দূরে কী হচ্ছে, কিছুই সে আর ভাবছে না। পাড়ায়, এলাকায় মানুষে মানুষে মেলামেশা কমে যাচ্ছে। সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত। আর এই গা ছাড়া মনোভাবকে হাতিয়ার করছে শওকত, করিমের মতো জঙ্গিরা। এরা সবসময় এমন এলাকায় শেল্টার নেয় যেখানে মানুষে মানুষে মিলমিশ কম, আলাপ আলোচনা কম। তাই কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে, প্রপার্টি বিক্রি করার আগে সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে সবার আগে আপনার নিজের, তারপর পুলিশের।"

এন এ টি সি'র অফিসের তিনতলাতেই প্রাথমিক চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা আছে কর্মীদের জন্য। হকের এই মিশনের ট্রাম্প কার্ডকে সেখানেই রাখা হয়েছিল। তার কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল হক। তার বেডের পাশে তখন সুচন্দ্রা বসে ছিল। হক স্যরকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। হক এসে তার ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। পাল্টা হাত বাড়াল সে।

"গ্রেট জব, এজেন্ট আইরিন," অভিবাদনের সুরে বলল হক।

আইরিন কষ্ট করে হাসল। সাফল্যের হাসি! এই মিশনে তাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা যখন করা হয়, আইরিন অসম্ভব উত্তেজিত ছিল। সে চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিল নিজেকে। সফল হয়েছে সে। সেই ট্রেনের কামরা থেকে 'জেসমিন' হয়ে তাকে কাটাতে হয়েছে এই কটা দিন। জেসমিন রাউত নামে একটা ফেক প্রোফাইল তার আগেই তৈরি করা ছিল। বান্ধবী অস্মিতাকে দিয়ে সেই প্রোফাইলে ব্যাকডেটে গিয়ে কিছু ছবি আপলোড করিয়েছিল সে। রঞ্জন যে তাকে ফেসবুকে খোঁজার চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল। কায়দা করে ট্রেনে জেসমিন রাউত নামটা রঞ্জনের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে।

মায়া ভবনে গিয়ে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত খেলাটা একরকম ছিল। তারপরেই সেটা পুরোপুরি বদলে যায়। ওই বাড়ির দক্ষিণ দিকের দুটো ঘরে কী হয়, তা কিছুতেই ধরতে পারছিল না আইরিন। রাতের অন্ধকারে জানলা ফাঁক করে সে শুধু দেখেছিল ওই ঘরের দুই বাসিন্দার একজন পাশের ঘরে মেয়েটার কাছে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ

বাদে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যাচ্ছে। হাজব্যান্ড, ওয়াইফের গল্পটা একেবারেই বানানো। আসলে ওই মেয়েটাকে নজরবন্দি করে রেখেছিল ওই দুজনই। সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি করেছিল মায়া ভবনের বিচিত্র নিয়ম। জায়গায় জায়গায় কোল্যাবসিবল গেট, দরজায় তালা। দক্ষিণের বারান্দার অ্যাকসেসটা আইরিনের খুব দরকার ছিল। বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দুই সন্দেহভাজনের ঘরের ঘুলঘুলিতে ড্রোন পাঠানোর ব্যাবস্থা তার সঙ্গেই ছিল, কিন্তু জিনিসটা কোনোভাবে কাজেই লাগাতে পারেনি সে। দীনেশদা সব জানতেন বলেই সে বলা সত্ত্বেও বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে দিতে চাইছিলেন না। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল সে, ভাবছিল হয়তো সে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে উঠতে পারবে না। কিন্তু হক স্যর বারবার বলেছিলেন ধৈর্য্য ধরতে।

এই একটা অদ্ভুত মানুষ। মনের মধ্যে যে কী চলছে তা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে, সে সাধ্যি কার আছে? ছায়ার মতো মানুষটা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে মিশনের শুরু থেকে। রঞ্জন মজুমদারের মতো সেয়ানা মাল জেসমিনের গতিবিধির উপরে নজরদারি চালাতে পারে, এটা ধরে নিয়েই স্যর তার এক বন্ধুর কোম্পানির ব্যাক অফিসে আইরিনের একটা বসার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। রঞ্জন যদি সত্য যাচাই করতেও সেখানেও যেত'ও জেসমিনের কথায় মিথ্যে খুঁজে পেত না।

হক বলল,

"তুমি বড় কিছু করতে চাইছিলে। সাধ মিটেছে তো? এখন রেস্ট নাও। চটপট আবার ফিট হয়ে মাঠে নেমে পড়তে হবে কিন্তু। গেট ওয়েল সুন!"

কাজ শেষ করে পিছন ফিরল হক। ধৃতদের কোর্টে তোলা এবং পরবর্তী ধাপে যা যা করার তা অফিস করবে। অনেক রাত হয়ে গেছে। হোটেলে কয়েক ঘন্টা একটু গড়িয়ে নিয়েই কাল সকাল থেকে আবার নেপালে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করতে হবে তাকে। নেপালের ধুলিখেল থেকে কিছু ইনপুট এসেছে। সরকারি গোয়েন্দাদের পরিভাষায় সেখানকার পরিস্থিতি 'অ্যালার্মিং'! তাই নয়ডা সেক্টর টুয়েন্টি ফোরের হেড অফিস থেকে তার কাছে এসে পৌঁছেছে ছোট্ট বার্তা—

"সিচ্যুয়েশন অ্যালার্মিং! রাশ টু ধুলিখেল! এ এস এ পি!"

***

পরদিন সকালে মালবাজার থেকে পুলিশের একটি দল এসে

পৌঁছেছিল কলকাতায়। প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজপত্রে সইসাবুদের পরে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ঝিমলিকে। দু মাস ধরে ক্রমাগত কড়া ডোজের সিডেটিভ তার শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক হতে সপ্তাহখানেক লেগে গিয়েছিল ঝিমলির। অতীন্দ্র বর্মনকে সে জানিয়েছিল সেপ্টেম্বরের ছাব্বিশ তারিখে সৌমেন নস্করের বাড়িতে সে ঘটনাচক্রে দেখে ফেলেছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য। সৌমেনবাবুর মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে সে ভুল করে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সে দেখেছিল সৌমেন তাঁর স্ত্রী'র গলায় দড়ির ফাঁস পড়াচ্ছেন। সৌমেনবাবু এলাকার প্রভাবশালী নেতা, তাই তাঁর স্ত্রীর পোস্টমর্টেম করা হয়নি। ঘটনাটাকে তাই দিব্যি তিনি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে এসেছেন এতদিন। সৌমেনের স্বরূপ প্রকাশ পেতে তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তাঁকে প্রাণ দিতে হয়, এমনটাই তার অনুমান বলে জানিয়েছিল ঝিমলি। টেরর ফান্ডিংয়ের কেসে সৌমেন নস্কর তখন এন এ টি সি'র হেফাজতেই ছিলেন। অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তিনি।

শিলিগুড়ি থেকে সৌমেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান ও তাঁর সঙ্গিনীকে গ্রেফতার করেছিল এন এ টি সি। কীভাবে নারীপাচারের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল, কাদের মাধ্যমে সেই টাকা চলে যেত জঙ্গি সংগঠনগুলির হাতে, সব তথ্য জেরায় ফাঁস করে দিয়েছিল তারা।

সপ্তাহখানেক বাদে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে বসেছিল আইরিন। খুড়তুতো বোনের বিয়ে ডিসেম্বরের আট তারিখ। সেই উপলক্ষে দশদিনের ছুটি চেয়েছিল আইরিন। হক স্যর পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন ছ'দিনের বেশি ছুটি নেওয়া যাবে না। একটু দমে গিয়েছিল আইরিন।

নির্ধারিত সময়ে ট্রেন ঢুকল স্টেশনে। বি ফোর কামরায় উঠে পড়ল আইরিন। তার সিটের নম্বর সাতচল্লিশ। আজ আর তাকে অন্যের সিটে আগেভাগে গিয়ে উঠতে হবে না।

সূচিপত্র
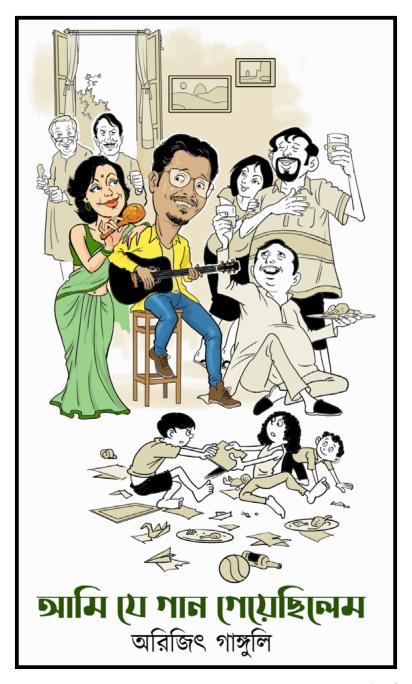
অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সেদিন একটা ঘরোয়া আড্ডায় আবদার উঠল গান ধরার। আমি এমনিতে মুখচোরা মানুষ। আড্ডায় ভালো শ্রোতা হিসেবে আমাকে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক জায়গায়। সুরার ঘোরে সুখ দুঃখের কথা ধৈর্য্যে ধরে কজন আর শোনে এখন? পাশের জনও নেশায় চুর হয়ে থাকলে কাঁচা খিস্তি মেরে থামিয়ে দেয়, "ফোট সালা, এ কেমন দুঃখ তোর! আমারটা সোন, পুরো সরোচ্চন্দো ফিল পাবি, হুইস্কিতে আর বরফ দিতে হবে না, চোখের জলে ডাইলুট হয়ে যাবে।"

এইভাবে কেউ কারুর কথাই মন দিয়ে শোনে না। একটা শূণ্যস্থান রয়ে যায়। সেই শূন্যস্থান আমি পূরণ করি। মন দিয়ে শুধু শুনিই না, উলটে ফিরতি প্রশ্ন করি, সহমর্মিতা জানাই, সামনের জন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে, উঠে তাকে টিস্যু এনে দিই, মোছা হয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসি, আরো পেগ চাইলে গৃহকর্তাকে অর্ডার দিই। মানে, সম্পূর্ণ ভরসার কাঁধওয়ালা সার্ভিস প্যাকেজ নিয়ে হাজির থাকি। তাই এমন আড্ডায় আচমকা গানের অনুরোধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

বিয়ার আর হুইস্কির ফোয়ারা ছুটছিল সেদিন। আমি সবেধন নীলমনি একখানা গ্লাস আগলে রেখে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে চলেছি। সিঙ্গল মল্ট টলমল করছে তাতে। গ্লাসে পাথর, থুড়ি বরফ ঠোকাঠুকি খাচ্ছে, অন দ্য রক্স বলে কথা। সবাইকে মেপে রাখছি। কখন কে ইমোশনাল হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে গিয়ে আসন নিয়ে নেব। আরো নিংড়ে তার বেদনাদায়ক ইতিহাস বের করে বাতাসে মিলিয়ে দেব। এক ফুরফুরে মেজাজে সে পরেরদিন থেকে আবার নতুন জীবন শুরু করবে। যদিও পরেরদিন সেই কথা মনে করালে দেখি তাদের কিছুই মাথায় থাকে না। "আমি এইসব বলেছিলাম! ধুস না না, ও আমার কেউ নয়, পিসতুতো বোন হয়। কী যে বলেছি ছাইপাঁশ মালের ঘোরে, বাদ দে ওসব।"

রিটার্ন কাস্টমারের তালিকায় উঠে যায় তারা। নেক্সট টাইম ফির জমেগা রঙে যব মিল... যাকগে। টপিকে ফিরে আসি।

চার পাঁচ পেগের পর সোফার কোনা থেকে ভুঁড়িওয়ালা এক সিনিয়র দাদা বলে উঠলেন, "আরে, এখানে তো একপিস গায়ক আছে। গান টান নাহলে হয় নাকি! ধরো ধরো, লজ্জা পেয়ো না।"

বুঝলাম আমার সার্ভিস প্যাকেজ আর সুবিধা করতে পারবে না

আজ। একজন ভোলেভালা বাথরুম সিঙ্গারকে হাতের কাছে পেয়েছে এরা, তাই ছাড়বে না। গিটার বগলদাবা করে টিউন করতে গিয়ে বুঝলাম এই ঘরে তা সম্ভব নয়। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু বিষয় সবার আলাদা। পুরো ফিউশন। অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে আমার কন্যা আর কচিকাঁচা সবাই মিলে গিটার ধরে ঝুলে পড়ল। কেউ ঝ্যাং করে একখান বারি মারল স্ট্রিংয়ে, কেউ সাউন্ডহোলের ভেতর পিংপং বল পুরে দিয়ে তাকে পুনরায় বের করায় চেষ্টায় মেতে উঠল। গিটারকে উল্টেপাল্টে বল বের করতে গিয়ে ফ্রেটবোর্ডের ধাক্কায় আশেপাশে দু একটি বাচ্চা জখম হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। ভ্যাঁ করে দুদিক থেকে দুজন কেঁদে উঠল। আমি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আশা এই যে এরা পাঁচ মিনিট বাদে গিটারকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে অন্য খেলায় চলে যাবে। তখন আমি আহত ক্ষতবিক্ষত গিটারবাবুকে সেবা শুশ্রূষা করে পারফর্ম করতে যাব পাশের ঘরে।

টিউন ফিউন করে গিটারকে নিয়ে আবার পাশের ঘরে ঢুকতেই সবাই নড়েচড়ে বসল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। স্টেজ যেন সেজে উঠেছে আলোআঁধারিতে। টেবিলের ওপর গরম গরম তন্দুরি চিকেন এসে গেছে। এই দেখে একটু মন খারাপ হল। আমি এখন গাইব, আর শ্রোতারা ঠ্যাঙ চিবোবে - এ কেমন অন্যায়। কিন্তু কর্তব্যপালনের কথা ভেবে আর কিছু বললাম না। শ্রোতা আর দর্শক যা খুশি চিবোতে পারে, বিনোদনের তাই নিয়ম। আমি এক কোনায় একটা টুল মতো টেনে বসে পড়লাম গিটার নিয়ে। কী গাব আজ কী শোনাব ভাবছি, এমন সময় আনন্দধামের অপর কোনা থেকে আগের সেই দাদা বলে উঠলেন, "ধরো দেখি একখান কিশোর রফি! জমে যাবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিশোর না রফি?" দাদা আর উত্তর দিতে পারলেন না। ততক্ষণে একপিস ঠ্যাঙ তার মুখে ঝুলছে। আমি দোনামনা করে হেঁড়ে গলায় ধরলাম, "ইন্তেহা হো গ্যায়ি, ইন্তেজার কী।" শরাবী সিনেমার গান হচ্ছে দেখে গিটারের তালে তালে আরো গ্লাস ভরে উঠল। দাদা উঠে কোমর দোলাতে শুরু করলেন। বাকিরাও গলা মেলালেন। তবে ওই যে বললাম, ফিউশন সর্বত্র। সবাই নিজের নিজের স্কেলে চেঁচিয়ে গাইছেন। সঙ্গে বেতালে হাততালি। আমার মিহি গলা তাতে আরামসে হারিয়ে গেছে। গিটারের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না। গান শেষে সবাই তালি দিয়ে তারিফ করতে লাগলেন। "বড়িয়া গান ধরলে তো, শুরুতেই আসর মাতিয়ে দিলে পুরো, জিও পাগলা!"

আমি ভাবলাম তারিফ ওদের পাওয়ার কথা, কারণ মুখরার পর থেকে আমি আর গাওয়ার সুযোগ পাইনি। বিনা কৃতিত্বে বাহবা পেলে ভালো লাগে না। এবার ভাবছি অঞ্জন নচি ধরব, বা সোনু উদিত এমন কিছু, যথারীতি আবার আবদার এসে গেল। তবে এবার অপেক্ষাকৃত জোয়ান সমিতির দিক থেকে। "তুম হি হো" গাও, নয়ত "অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল" হোক।

মুশকিলে পড়লাম। গানগুলো পছন্দের হলেও এসব শক্ত গান গাওয়ার অভ্যেস নেই। তাও চেষ্টা করে দুকলি গেয়ে দিলাম। একজন বৌদি এসে মুখের সামনে চিকেনের ঠ্যাং ধরলেন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাকাতে বললেন, "শুকনো মুখে গান গাইছ তখন থেকে, কামড় দাও একটা।" আমি ধরতে গেলাম ঠ্যাংটা নিজের হাতে, কিন্তু তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "আরে হাত এঁটো হয়ে যাবে তো, বাজাবে কী করে। গান থামালে হবে না। আমরা সার্ভিস দিয়ে যাব। তুমি কামড়াও।"

ভাবলাম কে সার্ভিস দিতে এসেছিল, আর কে দিচ্ছে। যাই হোক, কোনোরকমে দাঁত দিয়ে চেপে টেনেটুনে চিকেনের একটা অংশ ছিঁড়ে চিবোতে লাগলাম। গ্লাসটাও কেউ মুখের সামনে ধরলে মন্দ হত না, কিন্তু কেউ দয়া দেখাল না। কাকুস্থানীয় একজন অনেকক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন আমার গান। একহাতে গ্লাস আর অন্য হাতে সিগারেট নিয়ে তিনি বললেন, "ভায়া, একটু গজল টাইপের কিছু গাও তো। বৈঠকী আমেজ আসুক। গুলাম আলি জানো?"

জিজ্ঞেস করলাম, "বড় না ছোট?"

উনি সিগারেটে একটা লম্বা সুখটান নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলেন, "ছোট করেই গাও, বড় দরকার নেই।"

আমি ছড়ানোর জন্য তৈরি হতে লাগলাম। "চুপকে চুপকে রাত দিন" গানটা আমার প্রথম গিটারের শিক্ষক শিখিয়েছিলেন। সুরার আসর বসলেই এই গানের অনুরোধ আসে দেখেছি। আজ আবার সিলেবাসে পড়ে গেল। এইসব আসরে এমন গান মাঝখানে বা শেষের দিকে গাওয়া ভালো। নেশার ঘোরে শ্রোতারা শুধু মাথা দোলায়। নয়ত গানের অ আ ক খ জানলে হাতের বড় আর ছোট গ্লাসগুলো আমার দিকেই ধেয়ে আসত।

বৌদি আবার দাঁড়ালেন পাশে এসে। তবে এবার শুধু চিকেনের ঠ্যাং নয়, সঙ্গে একটা আবদারও এনেছেন। "এই আমি একটা গান গাইব তোমার সঙ্গে, ডুয়েট।"

ব্যাস, গোটা ঘর জুড়ে একটা রব উঠল। সবাই আগ্রহ ভরে তাকালো আমাদের দিকে। একজন বললেন, "দুজনে পাশাপাশি বসো, তবে যুগলবন্দী জমবে, কী বলো?" সবাই সায় দিতেই বৌদি আর একটা টুল এনে পাশে বসলেন। আমি গিটার নিয়ে সামান্য একটু তফাতে যেতে উনি আবার কাছে চলে এলেন। বললেন, "কী গাই বলো তো? তুমিই সাজেস্ট করো কিছু। আমার মাথায় আসছে না।"

মাথায় গান নেই, অথচ গাইতে চান। বিপদে পড়লাম। কী গান বলি এখন। জনতা এগিয়ে এল সাহায্য করতে। "চোখে চোখে কথা বলো হোক, মানাবে ভালো।" বৌদিও উচ্ছসিত হয়ে সহমত জানালেন। আমাকে বাজাতে বললেন। স্কেল বুঝে নেওয়ার জন্য আমি ওঁকেই অনুরোধ করলাম শুরু করতে। উনি শুরু করলেন। আমি চেষ্টা করে কোনোরকমে স্কেল ধরে বাজাতে লাগলাম। বৌদি পরের লাইনে অন্য স্কেলে চলে গেলেন। বেসুরো বলা যাবে না। সব দোষ উঠোনের, মানে গিটারের। আমি আবার স্কেল বদলে ফেললাম। অন্তরায় গিয়ে উনি আবার স্কেল বদলে ফেললেন। আমি গিটারের স্ট্রিং ছেড়ে আঙুল দিয়ে কাঠের বডিতেই তাল দিতে লাগলাম। এতে মুশকিল আসান হল। গান শেষ হতে তালিতে ফেটে পড়ল ঘর। বুঝলাম শ্রোতারা এতক্ষণে আসল আনন্দ পেয়েছেন। বৌদি লজ্জা পেয়ে উঠে চলে গেলেন এবার। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গ্লাস হাতে তুলে নিলাম।

গৃহকর্তা এবার অনুরোধ রাখলেন। তাঁর নিমন্ত্রণেই এসেছি আজ, তাই শুনতেই হবে। রাশভারি গলায় তিনি বললেন, "অরিজিৎ, আমার শুধু দুটো গানের আবদার আছে। দারুণ পছন্দের, দিনরাত শুনি, প্লিজ গাও। একটা হচ্ছে বিনতে দিল, আর একটা আয়াত। পদ্মাবত আর বাজিরাও মস্তানি থেকে।"

বরফের কুচি গলায় আটকে জোর বিষম খেলাম একখানা। গ্লাসের পানীয় ছিটকে পড়ল গিটারের ওপর। সেই বৌদি এসে মাথায় ফুঁ দিতে শুরু করলেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে গৃহকর্তাকে বললাম, "দাদা, আমার পদবী গাঙ্গুলি, সিং নয়। ডেয়ার দিতে চাইলে জামা খুলে ঘোরাতে বলো, ঘুরিয়ে দিচ্ছি তোমার ব্যালকনিতে গিয়ে, কিন্তু বিনতে

দিল, আয়াত! তোমরা বললে ঠুমরি থেকে ঠুমকা সব গেয়ে দেব। শুধু নিজেকে সামলে রেখো। গান শুনে তোমরা ভ্যাবাচ্যাকা থির হয়ে থেমে গেলে কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই।"

যেভাবে গানের অনুরোধ আসতে শুরু করেছিল, এই সতর্কবাণী না শোনালে আজকে অনুষ্ঠান যে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, তা আমার কল্পনার বাইরে। রাত হয়ে এসেছে অনেকটা। এবার ডিনার সেরে বাড়ি ফিরব ভাবছি। বাকিরাও রান্নাঘরের দিকে উঁকি মারতে শুরু করেছে। তবে যাঁর অনুরোধে এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল, সেই ভুঁড়িওয়ালা দাদা এবার উঠে দাঁড়ালেন কোনোরকমে। হাতের তালুতে চানাচুরের দুটো বাদাম স্যাট করে মুখে পুরে টলতে টলতে বললেন, "অরিজিৎ, তুমি সিং নও মানলাম, কিন্তু সিং-এর এই গানটা আজ তোমাকে গাইতেই হবে। আজকের সন্ধ্যা শেষ হবে এই গান দিয়ে। লতাজীর গান বলে কথা। না বলতে পারবে না কিন্তু!"

বুঝলাম কী গান আসতে চলেছে। অরিজিৎ সিং লতাজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বেশ কিছু গান গেয়েছেন, যা এখন খুবই জনপ্রিয়। আমিও বারবার শুনি। অপূর্ব উপস্থাপনা। ওই গান গাওয়া মানে লতাজী আর অরিজিৎ সিং দুজনকেই অপমান করা। কিন্তু খিদেও পেয়েছে। আর গান না গাইলে এরাও কেউ খেতে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম, "বলুন কোনটা গাইব।"

দাদার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি দেখা গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তিনি বললেন,

"অনেকগুলো আছে। কিন্তু আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা আছে, ওটাই গাও। ওই যে, কী যেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে! দোল দোল দুলুনি..."

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - সায়ন কুঁতি

ছোট মামু যখন পাগল হয়ে গেলো তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। একদিন কাঠি আইসস্ক্রিম খেতে খেতে টিউশনি থেকে ফিরছি, পাড়ার মোড়ে দাঁড় করিয়ে নেপাল মেসো বলল মামু নাকি পাগল হয়ে গেছে হঠাতই।

নেপাল মেসো মিনু মাসীর বর। মিনু মাসী মায়ের পাড়াতুতো বোন। আমাদেরই পাড়ায় বিয়ে হয়ে এসেছিলো এই বছর পাঁচেক। বিশাল বড় বাড়ির নিচে ছোট্ট একটা দোকানে মেসো সারাদিন বসে থাকত। দোকানটা মনে হয় বসে থাকার জন্যেই খুলত। যেমন আমার ছোট কাকা খুলত। কাগজ পড়ত, তিন পাত্তি খেলত, ক্যারাম খেলত আর চা খেতে খেতে রাজা উজির মারত। পাড়ায় শচীনের দোকান থেকে ছটা খোপে কাচের বেঁটে গ্লাস সাজিয়ে চা আসত। কালে কালে সেই শচীন চপ কাটলেটের দোকান করে বসলো অথচ কাকা বা নেপাল মেসোর দোকানে ভুল করেও একটা খদ্দের উঠতে দেখলাম না। সেই নিয়ে মেসোর বা কাকার দুঃখও ছিলো বলে মনে হয় না। অবরে সবরে মাসীর বাড়ির ভেতরে গেলে দেখতাম মিনু মাসী বিশাল বড় সংসারের ঊনকোটি কাজে সারাদিন ব্যস্ত। মাসীর জায়েরাও তাই। আর বাইরের দোকানগুলোয় তাদের কত্তারা বসে বসে হয় ঢুলছে নয় খবরের কাগজ পড়ছে। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম বাইরের দোকানগুলোতেও মাসীরা এসে বসলে মনে হয় তবু বিক্রিবাটা হত কিছু। এরা তো খদ্দের এলেও গম্ভীর হয়ে বসেই থাকে কেবল। দোকান না চললেও, অভাব কিছু মনে হয় না ছিলো মাসীর। বিয়ে বাড়ি কি অনুষ্ঠান কিছু থাকলে মাসী যেত গয়নার শো-কেস সেজে। দামী ঝলমলে কাতান জড়িয়ে নিত গায়ে। জড়ানোই বটে। তেমন সৌখিন ভাবে শাড়ি পরতে মা বা মাসীকে আমি দেখিনি কখনো।

সেদিনও মেসো বলল ভেতরে যেতে। মাসী আমাকে দিয়ে মা'কে কিছু খবর পাঠাবে নাকি! আমাদের বাড়িতে ফোন তখন ছিলো কেবল জ্যেঠুর দোকানে। মা বা মাসী কারোরই সংসার ফেলে একে অন্যের বাড়ী যাবার বিশেষ উপায় ছিলো না। কিছু বলার থাকলে আমি বা অফিস ফেরত বাবা'ই ভরসা। মামাবাড়ি থেকে কেউ শহরে এলে গাঁয়ের লেটেস্ট আপডেট দিয়ে যেত আমাদের বা মাসীদের বাড়ি। তখন সেই ফরোয়ার্ডেড মেসেজ ডেলিভার করার দায়িত্ব বর্তাত আমাদের উপর। ভেতরে যাবার অন্তত পনেরো মিনিট পর মাসী একটা বাড়িতে দুটো সাদা নারকোলের নাড়ু আর দুটো মেরি বিস্কুট নিয়ে হাজির হত। দুটোই আমার চরম অপছন্দের জিনিস, কিন্তু তবু ওর বেশি কিছু তখন কারোর বাড়িতেই গেলে পাবার যো ছিলো না। অগত্যা ব্যাজার মুখ করে টপাত করে গিলে নিয়েই জল খেতে হত। ততক্ষণে অবশ্য মা'কে কী

বলতে হবে বার দু তিনেক কানের গোড়ায় বলা হয়ে যেতো মাসীর। প্রত্যেকটার ক্রোনোলজি মনে রেখে এসে মা'কে বলতে হবে। ওইটুকু রাস্তা তাই বেশি সময় নিয়ে আসা যেত না। ছুটতে ছুটতে আসতে হত। সিক্সে ওঠার পর চলাফেরায় একটু নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ছোটার বদলে হেঁটে আসতাম। ততদিনে অবশ্য স্মৃতিশক্তিও বেশ বেড়েছে। পর পর অনেকগুলো ঘটনা মনে রাখতে পারছি। কার পরে কী বলতে হবে সেটাও আর গুলিয়ে ফেলছি না। কোনটা ঠিক কতটা এক্সপ্রেশন দিয়ে মাকে বলব সেটাও নিজেই ডিসাইড করে নিচ্ছি।

সেবারও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন নারকেলের ছিবড়ে গুলো মুখের মধ্যে পাগলে পাগলে জমা করছি থু থু করে ফেলব বলে, তখনই ভেবে নিলাম মাকে ঠিক কীরকম মুখ করে এই দুঃসংবাদটা দেওয়া যেতে পারে। কারোর সামনে যে এটা মা'কে বলা যাবে না বেশ বুঝতে পারছিলাম। এমনিই আমার মামাবাড়ির কাউকেই ঠাম্মা বা বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ সুনজরে দেখে না। তাতে অবশ্য তাদের ভারি বয়েই গেছে। যত কুঞ্চিত ভ্রু-যুগলের উপেক্ষাই পাক না কেন আমার মামারবাড়ির লোকের অসময়ে দন্ত বিকশিত করে "এই এয়ে পড়লুম রে অপু, দে দুটি ভাত দে দিকি।" বলার বিরাম ঘটে না। মা"ও সেরকমই। গেঁয়ো বাপ ভাইদের জন্য যত অপমানিতই হতে হোক না কেন, গায়ে মাখে না কিছুই। ঘুরে উত্তরও দেয় না, রাগও করে না। এই এসে পড়া অতিথিদের সবাই যে মায়ের নিজের লোক তা নয়। বেশিরভাগই গ্রামতুতো সম্পর্কের লোক। এরকম সম্পর্কে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ার চল শহরে নেই। কিন্তু গাঁ-গঞ্জে তখন বেশ ছিলো। এখন গ্রামের দিকে কতটা ভালো মিষ্টি পাওয়া যায় জানি না কিন্তু তখন তেমন পাওয়া যেত না। শক্ত শক্ত চালের গুঁড়ো মেশানো হলদেটে রসগোল্লা খান দশেক নিয়ে মাঝেমধ্যেই যেমন হাজির হতেন মায়ের গ্রামতুতো ভূষণ'কা। সিনেমা দেখা, কলেজে ভর্তি কি রোগনাড়া হলে জনা পাঁচেক লোক একসাথে এসে হাজির হত। সত্যি কথা বলতে বাবাও বেশ বিরক্তই হত তখন। যৌথ পরিবারে ভাগের দেড়খানা ঘরে এতগুলো লোকের স্থান সঙ্কুলান হয় না। আমার পড়াশোনাও ডকে ওঠে। তাতে আমার যদিও আনন্দের সীমা রইত না।

সেদিন মিনু মাসীর বাড়ি থেকে ফিরে নিচে নেই দেখে মাকে খুঁজতে ছাদে গেলাম। মা ছাদে কাপড় মেলছিলো। আমাকে এক পলক দেখেই চানে যাবার তাড়া দিলো। আমি গুটি গুটি পায়ে কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "ও মা ছোট্মামু নাকি পাগল হয়েছে জানো।" মায়ের মুখটা মুহূর্ত কয়েক হতবাক লাগলো। তারপরেই আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে চোখটা পাকিয়ে বলল, "এসব বাজে কথা ঘরময় বলে

বেড়িয়েছ কি দেব পিঠে কিল।“ তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাকি কাপড় মেলায় মন দিলো। আমি মনের দুঃখে চলে আসছি মা আবার ডাকলো। এইবার স্বর খানিক নরম। বলল, “বাবাকেও জানাতে যাস না যেন সোনা। চিন্তা করবে।“

হুঁহ বাবার ভারী বয়েই গেছে তোমার পেয়ারের ভাইয়ের জন্যে চিন্তা করতে। আহ্লাদ করে আবার সোনা বলে ডাকছে। মা ভালোই বুঝেছে কিল মারার কথায় রাগ হয়েছে আমার। অন্য সময় নীলু বললেও আদর করার সময় মা আমাকে সোনা বলে ডাকে। মজার কথা হল, মা ছোটমামুকেও সোনা বলে আদর করে। কাকীকেও “লক্ষ্মীসোনা বোন আমার” বলে। বিবিকেও ‘সোনামা’ বলে। তাই মায়ের এই পাইকারি রেটের সোনার মূল্য আমার কাছে কানাকড়িতে নেমে এসেছে আজকাল

আমি ভেবেছিলাম মা খুব ঘাবড়ে গিয়ে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে ঠাম্মাকে বলে মামাবাড়ির জন্যে বেরোবে। দিদার হার্ট অ্যাটাক হতে যেভাবে গেছিলো। সেসবের লক্ষণ তো দেখছি না তেমন। বেশ কটাদিন আমারও ইস্কুল বন্ধ হত-

মা মনে হচ্ছে আমার ইচ্ছেয় জলই ঢেলে দিলো খুব করে। চান করে স্কুলে চলে গেলাম অগত্যা।

পরদিন বিকেলে হঠাতই মা বলল আমাকে ইংরেজি স্যারের কাছে ছাড়তে যাবে। অবাক হয়ে গেলাম। মা ইংরেজির কিছুই বোঝে না। যাও বা জানত অনভ্যাসে সবই গোল্লায় গেছে। ইংরেজিতে কিছু দেখলেই মা সেখান থেকে ছুটে পালায় আজও। আমাদের বাড়িতে সবার আবার দারুন ইংরেজি সিনেমা টিনেমা দেখার নেশা। বাবা তো দেশি সাহিত্যও পড়ে না কিছুই। বিলিতি রহস্য রোমাঞ্চের ভক্ত। ছুটির দিনে সিগারেট হাতে স্টিফেন কিং কি কোবেন খুলে বসলে মা সেই সময় সমীহের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপচাপ চা রেখে চলে যেত। আমার ঘোর সন্দেহ মা বোঝে না বলেই এই বাড়াবাড়িটা করা হত। বাড়িতে ইংরেজি কাগজ আসবে বাবার আর জ্যেঠুর জন্যে। অথচ তাদের কাগজ পড়ারই সময় নেই। সন্ধেবেলার খাস খবর শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকত মা, অথচ জ্যেঠী তখন সিরিয়াল দেখবে। কোথাও কিছু নেই রাস্তায় “জবাব চাই জবাব দাও” বলে সামনে সাদাধুতির ফিটবাবু আর পেছনে চটি পায়ে দুগগার মা, শান্তিমাসী, বলাইকাকাদের হাতে পতাকা ধরিয়ে “মেহনতি জনতার জীবনের স্বার্থে লড়ছি, লড়ব” মিছিল গেলেও মা দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে শুনত কী বলছে। কীসের এত খবর শুনতে চাইত মা আমার আজও মাথায় ঢোকে না।

সেই মা হঠাৎ ইংরেজি স্যারের সাথে দেখা কেন করতে যাবে

বুঝলাম না। যাইহোক বিকেল বেলা মা ছাড়তে গেলো শুধু তাই না, ঘন্টা দুই পরে আবার আনতেও গেলো। বাড়ি ফেরার পর দেখলাম ততক্ষণে বাবা ফিরে গেছে, চা দেওয়া হয়নি বলে ঠাম্মা দারুন চেঁচামেচি করছে। বুঝলাম মা এর মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেনি, অন্য কোথাও গেছিলো। কোথায় গেছিলো মা আমাকে টিউশনে দিয়ে?

মা ঠাম্মার বকবক মাথা নিচু করে শুনতে শুনতেই চট করে তাঁতের শাড়িটা ছেড়ে ঘরের ন্যাতা মত'টা জড়িয়ে রান্নাঘরে সেঁধিয়ে গেলো। আমি খুব গম্ভীর হয়ে বাবাকে বললাম ক্লাস টেস্টে ফেল করেছি বলে স্যার গার্জেন কল করেছিলেন। তাতে বাবা খুব সন্দেহজনক ভাবে তাকিয়ে রইলেও ঠাম্মা ঝপাং করে কথা ঘুরিয়ে "কী যে করে সারাদিন, মেয়েটাকে দেখে না" শুরু করে দিলো। খানিকক্ষণ বাদে চুপও করে গেলো যদিও। আমি তাড়াহুড়োয় খুব ধেড়িয়ে ফেলেছি। বাবা জলখাবার খেয়ে এসে খাতা দেখতে চাইলো আমার। মা ঠিকই বলে। একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে দশটা মিথ্যে বলতে হয়।

রাতে খাবার সময় দেখলাম ডিমের ঝোলে নুন বেশ কম। আগে আমরা বসি। আমি, বিবি, বড়দাদা, ছোটদাদা। তারপর বাবা কাকাই আর জ্যেঠুমনি আর ঠাম্মা বসে। মায়েরা শেষে খায় রান্নাঘরে বসে। অনেকক্ষণ ধরে খায় মেঝেতে বসে। টেবিলে বসে না। মায়েরা মানে মা আর কাকী। জ্যেঠী তার খাবার তে-তলায় নিয়ে গিয়ে খায়। এসব জ্যেঠীর জন্যে অ্যালাউড। জ্যেঠী ভয়ানক রাগী। ঠাম্মার চেয়েও বেশি। মায়েদের এই অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে করে বাসী চুনো মাছের ঝাল কি তরকারী ফুরোলে পাকা পটল পোড়া মেখে লঙ্কা রগড়ে ছোটলোকের মত হুশহাশ খাওয়া দেখে জ্যেঠীর বমি পায় খুব।

আমি ভাতের গরাস আগে তুলেছি। বিবি সবে ভাতে ডিমের ঝোল ঢেলেছে আর ছোটদাদা বড়দাদাকে জ্যেঠী এই নিয়ে চারবার ক্রমশ সুর চড়িয়ে ডেকে ফেলেছে। পাছে অন্য কেউ টের পায় তাই আমি আগেভাগে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে ঝোলে নুন নেই বলে দিলাম। মা ঝটপট বাটি তুলে এনে নুন চেখে ঠিক করে আবার ভরে দিলো। রাতের রান্না আর সকালের অফিস স্কুলের ভাত মায়ের ডিপার্টমেন্ট। কাকী জলখাবার আর জ্যেঠী বেলার রান্না দেখে। প্রায় দিনই জ্যেঠীর শরীর খারাপ থাকে বলে সেটাও মা কাকী মিলেই করে। কাকীর রান্না কোনোদিন ভালো হয় না। কেউ খেতে পারে না। খুব চেষ্টা করে কাকী। আজকাল আমার বেশ রাগ হয় এসবে। মা'কে বললেই বকবে। কিন্তু আমার চোখের সামনে প্রত্যেকদিনই বিবিধ রকম অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। খাবার পরে বাবা বেশ কিছুক্ষণ টিভি দেখে আমি গল্পের বই পড়ি। মা আর কাকীর কাজ সেরে শুতে আসতে আসতে অনেক দেরী

হয়। সকালে সবার আগে মা'ই ওঠে। উঠে উনুন ধরিয়ে রেখে চানে যায়। উনুন ধরায় কারণ গ্যাসে পর পর সকালের চা, দুধ গরম এসব হয় এর ওর জন্যে। রান্নায় দেরী হলে আবার মুখ ঝামটা জুটবে। না খেয়েই হয়ত রাগ করে বেরিয়ে গেলো কেউ।

আমি গল্পের বই রেখে রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখি মা কাকী তখনও খাচ্ছে। খাচ্ছে মানে ভাতের থালা সামনে নিয়ে এঁটো হাতেই বসে আছে। চাপা স্বরে কাকী মা'কে কিছু বলছে আর মা বাঁ হাতের চেটোয় চোখের জল মুছছে। সে অবশ্য প্রায় দিনই হয় এ নয় ও এরকম ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে। আজকাল আমার আবার একটা বদভ্যাস হয়েছে সন্দেহজনক কিছু দেখলেই চুপচাপ উদাস মুখে কান খাড়া করে কথা টথা শুনে নেওয়া। পিসীরা এলে ঠাম্মার ঘরে আশেপাশে ঘুরে আমি এরকম কত খবরের খাজানা জমিয়েছি। বলার কাউকে পাই না নেহাত। বিবি বড্ড ছোট আর বড়দাদা ছোটদাদা আমাকে মোটেই পাত্তা ফাত্তা দেয় না একটুও। মা'কে একদিন বলতে গেছিলাম যে ঠাম্মা মাকে হাভাতে ঘরের মেয়ে বলেছে। মা উলটে আমাকেই "কেন তুমি আড়ি পেতে এসব শুনেছ" বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেলো। ঘুম ভেঙে পিসেকে চা দিলো। পিসীকে আলামারি খুলে পুজোর নতুন শাড়িটা বের করে দিলো সন্ধেয় বন্ধুর বিয়েতে যাবার জন্যে। তারপর থেকে মাকে কিছুই বলি না। কিন্তু আজকের ফ্যাঁচফ্যাঁচটার কারণ মনে হচ্ছে ছোট্মামুর পাগল হয়ে যাওয়ার সাথে কানেক্টেড। কাকী খুব চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমি তো কখনও সমুকে দেখে কিছু বুঝিনি গো সেজদি। একটু ছেলেমানুষ মত এই যা। মিনু কী বলল একটু পরিস্কার করে বল আমাকে। নিজেই বরং যাও না কেন একবার দেখে আসতে-"

ও তাহলে মিনু মাসীর বাড়ি যাওয়া হয়েছিলো বিকেলে-

মা থালায় ভাত নিয়ে নাড়ছে দেখলাম। নাক টেনে বলল, "কী বলে যাব রে?"

কাকীর সাহস মায়ের চেয়ে বেশি। কাকী রেগে বলল, "কেন? সমু অসুস্থ সেই বলে যাবে। অত জমাখরচ কেন দিতে হবে তোমাকে?"

কাকী রাগী মানুষ বলে কেউ তেমন ঘাঁটায় না। জ্যেঠী যে জ্যেঠী সে ওব্দি খানিকটা সমীহ করেই চলে। সবাই বলে চারটে ছেলের কাজ কাকী একা করতে পারে। আমাদের বাড়ির ছোটখাটো প্লাম্বিং কি ইলেক্ট্রিক্যাল কাজকম্ম কাকীই করে। শাড়ি পরে তরতরিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিস বেয়ে চারতলার তলার ছাদে উঠে অ্যান্টেনা ওব্দি সারিয়ে দেয়। এদিকে বাবা দাদাদের মই চাই, এই চাই, ওই চাই-

কাকী হাঁটে দুদ্দাড়িয়ে, মাথায় কি গায়ে বড়দের দেখলে কাপড় দেবার বালাই নেই। আড়ালে ঠাম্মা মুখ বাঁকিয়ে বলে 'মদ্দাপানা'। সামনে বলার

সাহস নেই কারোর। আমার দারুন ভালো লাগে কাকীকে। কাকীর বাপের বাড়ি বলে কিছু নেই। তিনকূলেই কেউ নেই। নাকি আছে মনে হয়, দেখিনি কখনো কাউকে। কানাঘুঁষোয় শুনেছি কাকীর সৎ মা আছে। সৎ মা থাকা আর না থাকা যে একই ব্যাপার সে তো জানা কথাই। আজ ওব্দি কোনো বই টইতে ভালো কিছু তো পড়িনি। আমরা যখন মামারবাড়ি যাই কাকী করুণ চোখে তাকায়। একবার বললেই যেন পোঁটলা বাঁধবে। এদিকে বলার উপায় নেই। দুই বউ চলে গেলে সংসারের কী হবে!

এত বাহাদুরী করলে হবে কী! কাকীও মায়ের কাছে ভেউ ভেউ কাঁদে মাঝেমধ্যেই। আমার তো মনে হয় সারাদিন ধরে দুজনে বসেই থাকে খাবার পাতে কাঁদবে বলে। হয় এ নয় ও, কেউ না কেউ কাঁদছে। তবে কাকীর কান্নার কারণ মনে হয় অন্যকিছু। কাকা নাকি কাকীকে একটুও ভালোবাসে না, অন্য কাকে বাসে। এইরকম সামান্য একটা কারনে কাকীর মত বীর কাঁদবে এটা আমার একটুও ভালো লাগে না। এটা নিয়ে ডিটেলে যে কিছু জানব তারও তো উপায় নেই। মা খালি খালি বলবে “যে সয় সে রয় ছোট।“

কী সয় সেটা ঠিক জিজ্ঞাসা করার মত নয় মনেহয়। আরো অনেকদিন রান্নাঘরে আড়ী পাততে হবে মনে হচ্ছে। কাকীর মায়ের পরামর্শ পছন্দ হয় না একেবারেই। কাঁদতে কাঁদতেই হেসে বলে “আমি কি তুমি নাকি! দেখো কী করি এইবার-“

মা ভয় পায়। আমি খুশি হই। কাকী আমার আইডল। আমি মা আর কাকী বাদে কেউ জানে না কাকী একটা চাকরী পাবে। আমি জানি কারণ আমি ইনকুইজিটিভ, মানে অনুসন্ধিৎসু। এই শব্দটা নতুন শিখেছি। এইবাড়িতে আমাকে কি আর যেচে কেউ বলবে এসব!

২

ছোটমামুকে আমাদের আর দেখতে যাওয়া হয়নি। বহুদিন বাদে, প্রায় তিনচার মাস পরে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি এলো দাদুর। মামাবাড়ি থেকে সবাই পোস্টকার্ডেই চিঠি লিখত। কেন কে জানে ইনল্যান্ড লেটারে চিঠি কখনোই পাঠাত না। তাই মায়ের নামে আসা চিঠি নিচের ভাড়ার দোকানের কর্মচারী থেকে, মালিক থেকে, কাকুর দোকানে কাকুর হাত হয়ে বাড়ির সব লোক থেকে কেউই পড়তে বাকি থাকত না। মা যতক্ষণে চিঠি হাতে পেত, সব খবর বাসী হয়ে গেছে। এবারেও তাই হল। দাদুর লেখা “বড় খুকি বেয়ান আর জামাইয়ের অনুমতি হলে একবার এসো। এদিকে পরিস্থিতি প্রতিকূল। সমু পাগল হয়েছে। সমস্ত

দিন বেঁধে রেখে আর পারা যায় না। তোমার কথা হয়তো বা শোনে-“

সমস্ত পাড়া রাষ্ট্র হল সুকল্যাণের শালা পাগল হয়েছে। চৌধুরীদের বউয়ের ভাইকে বেঁধে রাখতে হচ্ছে। ঠাম্মা জ্যেঠী মায়ের মুখ দেখাই বন্ধ করেদিলো রাগে। বাবাও তাই প্রায়। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না কেউই। এত বড় অপমান আগে হয়নি এবাড়ির। এর প্রায় সপ্তাহখানেক পরে একদিন বাবা অফিসে বেরোনোর পরে মা দেখলাম আয়নার সামনে শাড়ি পরছে। আমি স্কুলে যাব, এমন সময় মা কোথায় চলল! কাকী এসে বলল, “তুমি বেরোও, নীলুকে আমি দেখে নেব সেজদি।“ কিছুই বুঝছি না কী হচ্ছে। মা মাথায় কাপড় টেনে ঠাম্মাকে প্রণাম করতে গেলে পা সরিয়ে নিলো ঠাম্মা। মা ঠোঁট কামড়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি ছেড়ে। কাকী ভাত বেড়ে দিলে আমিও খেয়ে স্কুলে চলে গেলাম মুখ গোমড়া করে। মায়ের উপর রাগ হল। মা কোনোদিন আমাকে না নিয়ে কোথাও যায় না। কোথায় চলে গেলো মা! আমাকে একবার বলেও গেলো না। রাগে অভিমানে চোখ ফেটে জল এলো আমার। বাড়ি আসার পর দেখি পিসী এসে হাজির। বাড়িতে গোলমাল হলেই ছোট পিসী চলে আসে সবসময়। তাতে গোলমাল কমে না কিছুই, বাড়ে উলটে। বাবা এসে গুম হয়ে বসে রইলো চেয়ারে। কাকী চা দিতে এলে বাবা মুখ তুলে তাকালো। আমি আর বিবি টেবিলে বসে ঝোল ঝোল ম্যাগী খাচ্ছিলাম শব্দ করে করে। বিবি সবে ক্লাস টু। জগতসংসারের কোনো দিকেই তার বিশেষ আগ্রহ নেই। দাদাদেরও তাই। এই বাড়িতে সব চেয়ে মিসফিট মনে হয় আমিই। ছোটদাদা বলে আমার মধ্যে ভবিষ্যতে প্রাইভেট ডিটেক্টিভের খোচর হবার সমস্ত গুণ মজুদ। আমি আর সাহস করে জিজ্ঞাসা করিনি কাকে রিপোর্ট করব আমি।

কাকী সবার মত বাবার সাথেও নর্মাল টোনেই কথা বলে। চায়ের কাপ রেখে দিয়ে বলল “সেজদি যেতে কত দেরী করল বলুন তো দাদা!” বলে আর দাঁড়ালো না। টুক করে বেরিয়ে গেলো। বাবা হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলো কাকীর যাবার দিকে। আমি আর বাবাকে বলছি না যে কাকীই ঠেলেঠুলে মা’কে পাঠিয়েছে। গোটা ঘরে একটা দুঃখ দুঃখ মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেশ লাগছে। জ্যেঠী পিসী ঠাম্মা যারা আগে কখোনো খিদে পেলে খোঁজ নেয়নি, সবাই বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চোদ্দবার আমার খাওয়ার, পরীক্ষার, টিউশনির খোঁজ নিচ্ছে। খেতে দিচ্ছে না কিছুই যদিও। দিচ্ছে সেই কাকীই। বাবা রাতে খাবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমিও মামাবাড়িতে যেতে চাই কী না। রেখে আসবে তাহলে। আমি না বললাম। বাবা আবার বইতে মুখ ডোবাচ্ছিলো, আমি একটু গলা ঝেড়ে বললাম, মা হয়ত তিন চার দিনে ফিরে যাবে, আমার অসুবিধে হবে না। তোমার হবে?”

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলো খুব। বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা সিলেবাসের বাইরে করে ফেলেছি। কেটে পড়লাম। আজকাল প্রায়শই আমি এরকম ভুল করে ফেলছি। কে বলছে আমি খুব পেকেছি, কেউ বলছে কিছুই শিখছি না, ছোটই রয়ে গেছি। মা'কে এরকম একা মামারবাড়ি যেতে দিদার অসুখ বাদে আর কেউ আগে কখনো দেখেনি তো। সকালের অভিমান্ কেটে গিয়ে আমার আসলে এখন বেশ ভালই লাগছিলো। মা কী করছে এখন! মামা কতটা পাগল হয়েছে আমি জানি না। কী রকম পাগল হয়েছে মামা? কোর্ট পাড়ার শ্যামলি পাগলির মত! ইংরেজিতে কবিতা বলতে বলতে যায় যে! ধুসস মামাও তো মায়ের মত ইংরেজিতে গোল্লা। মামা খোল বাজিয়ে গান গায় ভালো হরিমন্দিরে বসে। বেশ সুর আছে মামার গলায়। শ্রীখোল বাজিয়ে অনেক গান গায়। একটা মনে পড়লো-

"তুমি ব্রজে রাখাল রাজা, যশোদার কানাই
বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকেরই ধন নদেরও নিমাই।"

তাহলে কি নামগান গেয়ে বেড়াবে এখন রাস্তায় রাস্তায়! তাতে খারাপ কী আর, ভালোই তো। আমি খঞ্জনী নিয়ে পাশেপাশে যাব বেশ।

মা কি সাইকায়াট্রিস্ট! মা'কে কেন ডেকে পাঠালো দাদু কে জানে। আমি কি রাতে একা শোবো নাকি! আমার মনে হয় আবার রাগ হচ্ছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে বাবা বা অন্য কেউ মায়ের উপর রাগ করবে আরো। বই খুলে বসতেই কাকী এসে বলে গেলো আজ আমি বিবি আর কাকী একসাথে শোবো।

পরের দিনটাও যেমন তেমন গেলো। বাবার মেজাজ অফিস থেকে ফিরে তুঙ্গে। আমাকে দশটা ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচ করতে দিয়েছিলো। চারটে ভুল হতে, "যেমন গাধা মা তেমন মেয়ে। মাথায় গোবর।" বলে চলে গেলো। গাধার মাথায় গরুর পায়খানা থাকবে কেন কে জানে। বারান্দায় বসে বসে কত কত সিগারেট খেয়েই চলেছে। আমি একফাঁকে উঠে গিয়ে কাকীকে বলে এলাম সে কথা। দরকার ছিলো না বলার। কাকীর কত কাজ এখন। তবু আমার নৈতিক দায়িত্ব বলেও একটা বিষয় আছে। এর আগেও আমি বড় দাদার ছাদে সিগারেট খাওয়াও জ্যেঠুমনিকে বলে দিয়ে নৈতিক কর্তব্য পালন করেছি। তখন আমি বিবির বয়েসী হব। এখন আর এসব করি না।

আর বিবিটাকে দেখো! কোনোদিকে তার নজর নেই। পড়ছে, আঁকছে, গাইছে, কিছুই না করার থাকলে হাতের লেখা প্র্যাক্টিস করছে। কেউ বলে না ওকে এসব করতে। ঠাম্মা বলে কাকুর মত হয়েছে। আমাকে বলা হয় বিবির মত হতে। দিদিদের দেখিয়ে বোনেদের বলা হয় অমন হতে। আমাদের বাড়িতে উলটো। তাতে আমার মানে লাগে

না। বাবা বলে আমার এই মানে না লাগাটাও মায়ের থেকে পাওয়া। আমাদের আত্মসম্মানবোধ বলেই নাকি কিছু নেই। এদিকে ঠাম্মা শিশু কিশোর উৎসবে আঁকায় জেলায় ফার্স্ট হতে বলেছিলো বাবার মত আঁকার হাত পেয়েছি। বোঝো! বাবা আঁকলো কবে? লক্ষ্মীপুজোয় ঘরজোড়া আলপনা তো মা দেয়। শীত পড়লে সারাদুপুর না ঘুমিয়ে মা নক্সিকাঁথা বুনে চলে কত কত। মামাবাড়িতে গেলে মায়ের হাতে আঁকা ঠাকুরের পটও দেখেছি। একবার এখানে একটা এনেছিলো মা। তখন আমি বেশ ছোট। পিসী হেসে হেসে বলেছিলো, "আরে বৌদির কাণ্ড দেখো। ক্যাঁতা, পটের চিত্তির, এসব তো হাভাতে মোল্লারা আঁকে। এইবার কি সলমা জরির ফুলতোলাও শুরু করবে নাকি এই বাড়িতে?"

৩

মা ফিরলো তিনদিন বাদে। পান্তুমামা এসেছে মায়ের সাথে। দিদা বড় বাজারের ব্যাগে প্রতিবারের মত এই সেই পাঠিয়েছে। প্রতিবার সেসব জোনাকির মায়ের কাছে চলে যায় কদিন বাদে। সবই গাছের জিনিস। টোকো আম, জংলি জিলিপি, জলসা পেয়ারা, খসলা শাক, ডাঁটা এসব। পান্তুমামা মায়ের কেউ একটা ভাই। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। মায়ের সাথে কেউ কোনো কথা বলছে না বাড়ীতে। মনে হয় বাবা এলে বলবে। পান্তুমামা ব্যাগ হাতে করে বসার ঘরের চেয়ারে বসে আছে। কাকী সরবত নিয়ে এসে ব্যাগটা নিয়ে গেলো। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ফিস ফিস করে, "এই পান্তুমামা, ছোট মামু কি খুব পাগল হয়ে গেছে?" পান্তুমামাও আমার মত অনুসন্ধানী। এইটা খুবই পছন্দের প্রশ্ন করে ফেলেছি মনে হল। কিন্তু বসার ঘরে বসে এসব গূঢ় খবর দেবার ইচ্ছে পান্তুমামার ছিলো না। আমিও ভেবে দেখলাম জায়গাটা সুবিধের না ঠিক। সরবতের গ্লাসটা রেখে সবে বারান্দায় যাচ্ছি কাকী চলে এলো। পান্তুমামার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তোমাকে তো বাড়ি ফিরতে হবে। এখনই বরং বেরিয়ে পড়। সন্ধে নামলে আবার বাস থেকে নেমে ভ্যান পাবে না আর। এই বছর তো মাধ্যমিক। সময় নষ্ট কোরো না পান্তু।"

কী মুশকিল! পান্তুমামা করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বেচারা মনে হয় একটা দিন থাকবে ভেবে এসেছিলো। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তা দেখতে খুব ভালোবাসে মামা। সারাদিন ধরে গাড়ি, রিক্সা, ভ্যান এইসব দেখতে পারে ঠায়ে দাঁড়িয়ে। কাকী তো জানে সে-কথা, তবে পান্তুমামাকে চলে যেতে বলছে কেন! কাকী কি বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো নাকি! আমার তো খুবই সাস্পিশিয়াস লাগছে এইবার।

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম মা বকা খাবে এটা কাকী মামারবাড়ির কাউকে দেখাতে চায় না বলেই পান্তুমামাকে সাত তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিয়েছে। কাকী মামার হাতে খালি ব্যাগটা মুড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো। মা শাড়ি ছেড়ে এসে দশটা টাকা হাতে দিয়ে পান্তুমামাকে বলল, "বাস ভাড়া বাঁচলে বোমা কিনে খাস।"

এই এক বোমা। মামাবাড়ির সবাই যে কি ভালোবাসে এটা খেতে কী বলব! ভেতরে না থাকে আলু না ডিম না মাছের পুর। পুরোটাই ব্যাসন না ডাল কী যেন একটা। কি বিচ্ছিরি খেতে রে বাবা! মায়ের সামনে বলি না। দুঃখ পাবে বলে। সেবার পুজোয় বম্বে গিয়ে ওর জুড়িদার পেয়েছিলাম একটা। সেটা অবশ্য পাঁউরুটির মধ্যে ঢুকিয়ে খায়। মা নিজের দেশের জিনিস খেতে পেয়ে গদগদ হয়ে গেছিলো একেবারে। ভাবটা এমন, দেখেছ আমাদের বোমার দৌড়! বম্বে ওব্দি চলে এসেছে। বাবা অফিস থেকে টিকিট পায় বছরে একবার দশদিনের ঘুরতে যাবার জন্যে। সেই সময়টা মায়ের প্রজাপতি দশা চলে। তাঁতের শাড়ির বদলে সুটকেসে ভরা থাকে সিন্থেটিকের ফুরফুরে শাড়ি। ঘুরতে গেলে বাবা প্রতিবার একটা করে দারুন ভালো শাড়ি কিনে দেয় মা'কে। যেখানে যায় সেখানকার শাড়ি। দিয়ে চুপিচুপি বলে আলমারিতে তুলে রাখতে। কাউকে না যেন দেখায়। কাউকে না দেখাবার বাতিক মায়ের তত নেই যত বাবার আছে।

অবশ্য ঘুরতে গেলে বাবাও অন্যরকম হয়ে যায়। ঘুরতে যাবার ছবিতে বাবা মায়ের কাঁধে হাত রাখে। এখানে তো রাস্তায় বেরোলে বাবা আগে আগে হাঁটে আর মা তাল মেলাতে হিমশিম খেয়ে পেছনে পেছনে দৌড়োয়। কই ঘুরতে গেলে এমনটা হয় না। না মা পিছিয়ে পড়ে না বাবা এগিয়ে যায়। তাহলে এখানে এমন কেন হয়? প্রতিবার ঘুরতে যাবার সময় কাকী মামাবাড়ি যাবার মত মুখটা করে। কাকী কখোনো কোথাও ঘুরতে যায় না। কোত্থাও না। কাকী বাজারে যায়, ইলেক্ট্রিক বিল দিতে যায়, মাসকাবারি করতে যায়, বড়জোর মায়ের সাথে মেলায় কি মন্দিরে যায়। ঘুরতে কখোনো যায় না। আমি বড় হলে ঠিক কাকীকে নিয়ে ঘুরতে যাব। বিবির উপর আমার এক ফোঁটা ভরসা নেই। মায়ের ঘুরতে গিয়েও কাকীর জন্যে মনখারাপ করে খুব। আমরা তিনজনে ঘুরতে গেলে সবাই খুবই ব্যাঁকাচোরা কথা বলে আগে পরে ক'দিন। বাবার অফিসের কলিগরা থাকে বলে বাবা বাড়ির অন্য কাউকে অফার করে না যাবার জন্যে। মা মিনমিন করে বলে বাবাকে সে'কথা, অন্তত ঠাম্মাকেও যদি নিয়ে যাওয়া যায়। বাবা উত্তর দেয় না। ঠাম্মা গেলে তো ঘোরার জায়গা গুলোও বাড়ির মত হয়ে থাকবে। মা এরকম উৎকট আবদার করে কেন কে জানে! বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই একেবারে। নিয়ে

যেতে হলে কাকীকে নিয়ে চলুক। ঠাম্মা তো বছরে তিনবার করে ক্লাব থেকে গোটা ভারতের এইদিক ওইদিক ঘুরে আসে। কই, তোমায় নিয়ে যায় তখন! উত্তর ভারতই গেলো মনে হয় বার চারেক।

পান্তুমামা যাবার বেশ অনেকক্ষণ বাদে বাবা জ্যেঠু কাকু একে একে ফিরলো। চা খাবার পরেই দেখি ছোট পিসী এসে গেছে। পিসেও এসেছে। কেবল টিভিতে শুক্রবারে বাংলা সিনেমা দেখায় প্রসেনজিত রঞ্জিত মল্লিক এদের। আমাদের বাড়ির সাথে কী মিল কী মিল বাবাগো! তবু অঞ্জন চৌধুরি রঞ্জিত মল্লিকের মত একটা নাইট ইন আর্মার রাখেন, আমাদের সে বালাইও নেই।

কাকী জলখাবারে চাউমিন করবে বলে আলু আর বাদাম ভাজছিলো। আমি রান্নাঘরে গিয়ে খুটুর খুটুর করছি একটু। বিশাল ভয় লাগছে কেন কে জানে। কাকীকে বললাম, তুমি কেন বসার ঘরে যাচ্ছো না কাকী? আমার বদ্ধমূল ধারণা মায়ের কপালে আজ দুঃখ আছে। এক কাকী ছাড়া মা'কে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বাবার মত অকেশনালি এম্প্যাথেটিক লোকের উপর আমার ভরসা নেই একদম। কাকী ঘসঘস করে বঁটিতে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বলল, "আমার তো ভাই না, ভাই তো সেজদির। আমার ভাই হলে আমি জবাব দিতুম বৈকি।"

খুব দুঃখ পেলাম। আহা রে আমার মা'টা!

চাউমিন খেতে খেতে সবাই মিলে মাকে কী কী বলবে বুঝতে পারছি না। আমার কী হল কে জানে? আমি গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসার ঘরে বসে রইলাম। পিসী গম্ভীর হয়ে বলল, "পড়তে যাও।" আমি তাও ঢ্যাঁটার মত বসে রইলাম। বাবা বলল, "বড়রা কথা বলবে, তুমি যাও এখন।" আমি তাও "আমার মায়ের সাথে খুব দরকার আছে। আমি গেলে মাও আমার সাথে যাবে" বলে বসে রইলাম। শেষে মা'ই বলল কাকীর কাছে যেতে। আমার আবার খুব কান্না পেয়ে গেলো। কাকী দেখি মুচকি মুচকি হাসছে আমাকে রান্নাঘরে ফিরতে দেখে। বলল, "বীরপুরুষ হয়েছ তুমি!"

এহ পুরুষ নাকি আমি?

"বীরপুরুষ বিশেষন তো রে! মা'য়ের ঢাল হতে চাইবার ইচ্ছেটাই বীরপুরুষোচিত কী না। লক্ষীছেলে বললে কি মা লক্ষীর মত ছেলে হয়ে যায়?"

কথাটা ভুল না কাকীর। যুক্তি খণ্ডানো গেলো না।

৪

সেদিন মা সালিশিসভায় কী জবাব দিয়েছিলো আমি শুনিনি কিন্তু

তারপর থেকে মায়ের মধ্যে যাকে বলে বেশ একটা কনফিডেন্স দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। মিনমিন করে না। কারোর সাথেই পারতপক্ষে কথা বলে না। রাতে রান্নাঘরে কাঁদেও না কাকীর কাছে। চুপচাপ দুজনে মিলে ভাত খায়। বাবার সাথেও তেমন কথা বলে না। ছুটির দিনগুলোয় বাবা বই পড়তে পড়তে উশখুশ করলে এসে চা দিয়ে চলে যায়। অফিসের জামা, পার্স, রুমাল গুছিয়ে রাখে। রুমালে কোলন দিতেও ভোলে না। বাবাই যেন কেমন বেচারা মত মুখ করে তাকিয়ে থাকে এখন মায়ের দিকে। আগে বাবার আওয়াজ পেলেই মা সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে ছুটে আসত দরজার কাছে। হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে নিত। এখন আর আসছে না। আমাদের এই বাড়িতে আলাদা ঘর কেবল বড়দাদা আর ছোটদাদার জন্যে আছে। আমি যদিও বেশ বড় হয়ে গেছি, তবুও বাবা মায়ের সাথেই ঘুমোই। ঠাম্মার কাছে আমার আর বিবির শোবার ব্যবস্থা হয়েছে বটে। ঠাম্মার খাটটাও বেশ বড়ই। কিন্তু একদিন শুতে গিয়েই আমি আর বিবি দুজনে বেঁকে বসেছি। এক তো ঠাম্মা ইয়াব্বড় ‘ডুম’ জ্বালিয়ে শোয়, তার উপর বীভৎস নাক ডাকে। এখন আমার আর বিবির আলাদা একটা ঘর না হওয়া ওব্দি আমরা যে যার বাবা মায়ের কাছেই শুচ্ছি।

সেদিন রাতে আমি ঘুমিয়েই গেছিলাম প্রায়। প্রায় বলছি কারণ আমি সারারাত জেগেই ঘুমোই। আধোঘুমে থাকা যাকে বলে। মা পাশে শুয়ে একটু নড়লেই আমি সজাগ হয়ে যাই আর দ্বিগুণ জোরে মা’কে জড়িয়ে ধরি। সেদিনও তাই প্রায় জেগেই ছিলাম বলে মায়ের ফোঁপানি শুনতে আমার অসুবিধে হয়নি। যাক বাবা! কতদিন পরে মা’কে বেশ চেনা চেনা লাগছে। আমি কান খাড়া করে মটকা মেরে রইলাম। বাবা মায়ের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে বলছে ,”তুমি চিন্তা কোরো না, অসুখ এতখানি বেড়েছে যখন এইবার পুজোয় কায়দা করে ঘুরতে যাবার ছুতোয় আমরা বরং সমুকে সাউথে একবার দেখিয়ে আনি গিয়ে। ম্যাড্রাসে যাই চল। দেখবে কেউ জানতে পারবে না। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলব। কেঁদো না আর লক্ষ্মীটি-“

বাবাকে বেশ বীরপুরুষ লাগলো।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। আমাদের জানালা থেকে সোজা একটা ঝাঁকড়া দেবদারু গাছ দেখা যায়। দ্বাদশীর রাতে বাতাসে দুলতে থাকা দেবদারু গাছটাকে দৈত্যের মত লাগছে। ক’দিন আগেও বাবা ওই গাছে একানড়ে থাকে বলে আমাকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। হাওয়ায় জানালার পর্দা উড়ছে। মায়ের কান্না থেমে গেলেও বাবার নিশ্বাসের শব্দ একটু বেশিই জোরেই শোনা যাচ্ছে। এতক্ষণ জেগে থেকে আমার ঘুম পাচ্ছিলো এইবার। বাবা মায়ের ফিসফিসে কথা

মাঝেমধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো। এত আস্তে কথা বলছে ভালো করে শুনতেও পাচ্ছি না। এর চেয়ে ঠাম্মার নাক ডাকার মধ্যে ঘুমোনো ভালো। এদের তো কথাই শেষ হয় না। আমি রেগে মেগে খাটের উপর উঠে বসলাম। বাবা মা দুজনেই চমকে গেলো। আমি দুদ্দাড়িয়ে বালিশ বগলে নামতে নামতে বললাম, "এত গল্প থাকে যখন আগে কর না কেন? রাত্রীবেলা গল্প করার সময়! আমার তো ঘুম পায় নাকি!"

অন্ধকারের মধ্যে ঘুমচোখে আমি আর বাবা মায়ের মুখটা দেখতে পাইনি। সকালে ঠাম্মা তুলে দিলো ঘুম থেকে। তারপর থেকে বাবা মা আমাকে দেখলে পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য!

এর পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। বাড়িতে সেদিন জন্মাষ্টমীর পুজো। আমার স্কুল ছুটি, বাবা কাকার অফিসও ছুটি। মোটের উপর সবাই বাড়িতেই আছে। মা জ্যেঠীমা ঠাকুর ঘরে। কাকী রান্নাঘরে। কাকীকে ঠাম্মা ঠাকুরের কাজ করতে দেয় না। কাকীরও তেমন ইন্টারেস্ট নেই বলে গা'ও করে না। কাকীর ইচ্ছে থাকলে কেউ না বললেও থামত না এ আমি খুব জানি। আমারও তেমন ইন্টারেস্ট নেই পুজো আচ্চায়। ঠাকুরঘরের কাছাকাছি যাওয়া মানেই হ্যাপা। চান করেছ নাকি, এঁটো জামা নাকি, বাসী জামা নাকি, এই নাকি, সেই নাকি। বাবা রে বাবা! মামাবাড়ির ঠাকুরঘর বরং ভালো বেশ। আমি আলুপোস্ত ভাত খেয়েও কতদিন দিব্যি অঞ্জলী দিয়ে দিয়েছি। সবাই দেখেও কিছু বলেনি। মামারবাড়ি ভারী মজা কথাটা তো আর এমনি এমনি আসেনি!

মা আর জ্যেঠী এমন ঘীয়ের লুচির গন্ধ ছড়িয়েছে, আমার পড়াশোনা মাথায় উঠেছে। এদিকে পুজো হতে হতে বিকেল হবে। আমি দুবার সিঁড়ি থেকে ঠাকুর দালানে গিয়ে দেখে এলাম। মা এত এত নারকেল কুরিয়েই চলেছে। ঠাম্মা খালি গায়ে গরদ জড়িয়ে বসে তদারকি করছে সব। ঠাম্মার চেহারা বেশ ভারির দিকে। গরম পরলে ঠাম্মা বুক টুক খুলেই বসে থাকে। এত্ত হাসি পায় রে বাবা দেখলে! ইয়াব্বড় বড় আদুর বুক নিয়ে ঠাম্মা তক্তাপোষে বসে থাকে। এদিকে আমি পুজোয় একটা জিন্সের প্যান্ট পরতে সেকি ঝামেলা গোটা বাড়িময়! ঠাম্মা তো ঠাম্মা, বড়দাদা আমায় যা গাট্টা দুখানা মারলো! মনে পড়লে ব্রহ্মতালু জ্বালা করে এখনো। কোমরে ইলাস্টিক লাগানো জিন্সের প্যান্টটা মা বেগতিক দেখে তুলে রেখে দিয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া একটার বেশি দুটো কথা বলা বড়দাদা মোটে পছন্দ করে না। আর আমি যেহেতু একটাও প্রয়োজনীয় কথা বলি না তাই আমার একটা শব্দ মুখ থেকে বেরোলেই বড়দাদা চোখ পাকায়। আমি বোবা হয়ে জন্মালেই মনে হয় খুশি হত। আমি এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। এই যে গোটা বাড়ি চরকি কাটি এটাও কেউ পছন্দ করে না। স্কুলে যেতে সবার লাগে দশ

মিনিট। আমি এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে বিশ মিনিটে পৌঁছাই। কিছুতেই এগুলাও আমি কন্ট্রোল করতে পারি না। বেপাড়ায় দেখে চেনা লোক কি দাদাদের বন্ধুরা বলে দিলেই হল। বাড়ি এসেই শুরু হয়ে যায় জেরা। আরে বাবা কেন ঘুরে ঘুরে যাই তার আবার কারণ কী! ঘুরতে ভালো লাগে তাই ঘুরে ঘুরে যাই। রোজ রোজ একই রাস্তা দিয়ে কেন স্কুলে যাব! সবাই আমাকে বকলে মা'ও তিতিবিরক্ত হয়ে দু-ঘা দিয়ে দেয়। অথচ মামাবাড়িতে গেলে মা নিজেই খালি পাড়া বেড়ায়, এর ওর বাড়ি খেয়ে আসে। আমার এসব ফাঁস করে দেবার ইচ্ছে হলেও বলি না।

কাকী বলেছে একদিন আমিই নাকি এত বড় হয়ে যাব এদেরকেই বোবায় ধরবে। এখন ছেড়ে দিতে। ছেড়ে না দিয়েই বা কী করব! কে বাবা গাঁট্টা খাবে আবার।

মায়েদের উপোস। খাবে না কিছু। কাকী আমাকে খেতে ডাকছে। আজ ভাতের পাতে নিরামিষ তরকারী শুধু। কালও তাই গেছে। পুজো থাকলে আগের দিনও নিরামিষ আমাদের বাড়িতে। ঠাম্মার কড়া হুকুম পেটেও আমিষ রাখা চলবে না। আমি একদম নিরামিষ খেতে পারি না। দাদারা বাইরে খেয়ে আসে। আমাকে কাকী গেলোবার আগের দিন ডিমসেদ্ধ করে দিতে ঠাম্মা খুব রাগ করেছিলো। কাকী দাদাদের কথা বলায় বলেছিলো, "ব্যাটাছেলেরা বাইরে খাক, ওকে তো শিখতে হবে এসব।" কাকী আর কিছু বলেনি। কাল খেতে বসে দেখি আমার আর বিবির পাতে হাঁসের ডিমের ডালনা। ঠাম্মা খুব চেঁচিয়েছে। তারপর চুপ করে গেছে। মা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার একদিন ডিম না খেলেই বা কি যাবে আসবে সেটাই মা বোঝে না। কাকীকে বকে। কাকী উল্টে বলে খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে সেটা বোঝালে কাকী না খেলেও চলে কি না ভেবে দেখবে। ব্যাস মা কুপোকাত। "তোর সাথে পারি না আমি" বলে চলে যায়। আমাদের এই এঁদো বাড়িটায় কাকী একটা যাকে বলে রেভোল্যুশন।

ঠাম্মার বয়স হয়েছে বলে আর নিজ্জলা উপোস করে না। সাধন ডাক্তার বারণ করে গেছে। কাকী ঠাম্মার জন্যে জলে মিছরি ভিজিয়ে রেখেছে মাটির ছোট কুঁজোয়। মায়েরাও উপোস ভেঙে ওই খাবে। কেউ আশেপাশে না থাকলে আমিও দু এক গেলাস খেয়ে নিই। কী যে ভালো লাগে! জলে মৌরির গন্ধ ছাড়ে বেশ। ঠাম্মা দেখতে পেলে হয়ে গেলো আর কি! এক তো সকড়ি জামায় কুঁজো ধরা তার উপর সোমত্ত মেয়ে'র মৌরি নাকি খেতে নেই। কেন নেই তার উওর পাওয়া যাবে না জিজ্ঞাসা করলে। তবে আমার ধারণা সেটা ওই ছাদের কোনে মা কাকী জ্যেঠীর নোংরা বিচ্ছিরি কাপড় মেলা রিলেটেড কিছুই হবে। ইস্কুলে সেঁজুতি, পৃথা এদের সব হয়ে টয়ে গেছে। খুবই চুপি চুপি আলোচনা হয় এসব

নিয়ে। বাড়িতে সবার ধারণা আমি এসবের কিছুই জানি না। কিন্তু আমি টিভিতে অ্যাড দেখে আর পিসী, মা এদের কথা শুনে শুনে বিবির মত বয়স থেকেই অনেক কিছু আঁচ করে নিয়েছি। আগে আমার ধারণা ছিলো বড়রা কেউ কেউ হয়ত বাচ্চাদের মত হিসি চাপতে না পেরে করে ফেলে। তাই কাঁথা পরে থাকে। বিবি যখন ছোট ছিলো বিবিকে কাঁথায় শুইয়ে রাখা হত। মিনিটে মিনিটে ভিজিয়ে ফেলত। ছাদের কোনে সারা বছরই দেখতাম কাঁথার মত কাপড় মেলা। আমি ভাবতাম মায়েরাও ওরকমই হয়ত-

সেঁজুতি মানে সাজু'কে ওর মা একটা পাতলা বই দিয়েছিলো পড়তে। জনসন অ্যান্ড জনসনের বই। ওই পাউডার আর সাবানের কোম্পানি, তারা আবার বই কেন বের করেছে বুঝতে পারিনি। সাজু বলল ন্যাপকিনের সাথে নাকি ফ্রি দিয়েছে। ওটাতে খুব ভালো করে লেখা ছিলো। স্কুলে অবশ্য লুকিয়ে পড়তে হয়েছে। সাজু বলল শরীর খারাপ নয়, এটাকে পিরিয়ড বলে নাকি। বইটা ইংরেজি আর বাংলা দুটোতেই লেখা ছিলো। আমি ইংরেজিটা পড়েছি। বেশ জ্ঞান হয়েছে। বিবিকে আগেই আমি সব বুঝিয়ে বলে দিতে পারব ভালো করে। মায়েরা তো শরীর খারাপ খারাপ বলে খালি। জ্যেঠীর কথা নিয়ে বলছিলো কাকীকে যে আর শরীর খারাপ হবে না। আলবাত শরীর খারাপ হয় জ্যেঠীর। সবসময়ই বলে শরীর খারাপ। কোনটা কী শরীর খারাপ না বললে লোকে বুঝবে কী করে। বলছি বটে, কিন্তু জ্যেঠীর কি একটা অপারেশন হয়েছে বলে ঠাম্মা খুব কাঁদছিলো মনুয়ার কী হবে বলে বলে। মনুয়া জ্যেঠুর ডাক নাম। জ্যেঠীর অপারেশন তো জ্যেঠুর জন্যে কেন কাঁদছিলো ঠাম্মা কে জানে! কাকী খেতে বসে চুপি চুপি মা'কে ফিক ফিক করে হেসে হেসে বলছিলো, "আমার হলে বরং কাজ দিত। আরেকবার সানাই বাজত এই বাড়িতে ছেলের বিয়ের। অসভ্যতার যেন লিমিট নেই এদের সেজদি। মা হয়ে এমন মড়াকান্না জুড়েছেন" মা রাগ রাগ মুখ করে বলেছিলো, "বালাই ষাট!"

এসব কথা একেবারেই আমার কিছু মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু তাই বলে এসব আমি ভুলেও যাইনি। আমি ভেবে দেখেছি, কোনো কথা যদি সেই সময়ে নাও বুঝতে পারি, একটু বড় হবার পর ঠিক বোঝা যায়। এই যেমন তিন চার বছর আগে যখন মাঠে খেলতে গেলে ভুতোর দাদা বিচ্ছিরি করে জড়িয়ে ধরত, জিতু কাকা আঙুল গলিয়ে দিত খারাপ জায়গায়, জ্বালা জ্বালা করত হিসি করতে গেলে, তখন না বুঝলেও কিছুটা পরে বুঝেছি তো যে পালাতে হয়! তাতে করে যদিও এখনও মনে পড়লে কান্না পাওয়া থামেনি। থামবে কী করে! কাউকেই তো বলতে পারি না। আমার কি মায়ের মত কাকী আছে নাকি। বন্ধুদের

কাউকেও বলতে পারি না লজ্জায়। আমিই খুব খারাপ মনে হয়। তাই এসব হয় টয় আমার সাথে। ওইজন্যেই কি বড়দাদা বকে খালি? 'রিজার্ভ' হতে বলে! হয়ত ভালোর জন্যেই বলে। কী জানি-

৫

ঠাকুরমশাই আরতী করলে কাঁসর বাজানো আমার কাজ। বিবি ঘন্টা বাজায়। পুজোর সময় ছেলেরা কেউ থাকে না আমাদের বাড়ির। আসলে বাবা কাকারা মার্ক্সিস্ট কি না। লাল পতাকার সাপোর্টার। পুজো টুজো এসব করে না। ঠাম্মাও ঘাঁটায় না। ছেলেদের নাস্তিক হওয়া অ্যালাওড। দাদারাও ঘেঁসে না এইদিকে। পুজোটুজো মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট। ঠাম্মা একদিন বলেছিলো আমার 'শরীর খারাপ' শুরু হলে আমাকে জয় মঙ্গল বার করতে হবে। ভাবলেই আমার মাথা খারাপ হয়। ওই পানের ইয়াব্বড় খিলি গিলতে গিয়ে কাকী একদিন মরেই যাচ্ছিলো প্রায়। তারপর থেকে আর খায় না। কাকীর খুবই কুলক্ষণ সবেতে। খিলি গিলতে গিয়ে গলায় আটকেছে এমনটা কেউ কখনো শোনেনি আগে। আমিও নাস্তিক হতে চাই, কিন্তু ভয় লাগে বাবা। সারা বছর তাও যেমন্ তেমন হয়ে যায়, কিন্তু পরীক্ষার আগে থেকে রেজাল্ট বেরোনোর আগে ওব্দি এক মাস কিছুতেই ভগবানকে না ডেকে থাকা যায় না। এদিকে রাগও খুব হয়। কোনো সিচুয়েশনেই পড়লে ভগবানকে ডাকলে লাভ হয় না বিশেষ। সেই অঙ্কে গাড্ডা তো গাড্ডাই, সেই বাসী কাপড়ে আচার চুরি করলে ঠাম্মার কাছে বকা খাবই, সেই মেজো পিসী এলে ভোম্বল দাদা অঙ্ক শেখাতে গিয়ে খারাপ ছবির বই বের করে দেখাবেই। বুকে ব্যথা দেবেই। আগে এত ব্যথা লাগত না। এখন কেন কে জানে এমনিই ব্যথায় টনটনে হয়ে থাকে সবসময়। মোট কথা কোনো কিছুতেই যদি ভগবান আমাকে না বাঁচায় আমি খামোকা সময় নষ্ট কেন করব! তাও ডাকি। আর কাকে ডাকব? মা সারাদিন কাজে ব্যস্ত, বাবা অফিসে ব্যস্ত। এই বাড়িতে আর এই শহরেই যে আমাকে এত ভগবানকে ডাকতে হয়, কই মামাবাড়ি গেলে তো হয় না! কেউ তো সেখানে এমন আজব ব্যবহার করে না কারোর সাথে!

এই যে ছোট্টামা এখন পাগল হল, সেও তো ভোম্বল দাদার বয়েসীই হবে। ছোটমামার মত মজার মানুষ কি দুটো পাবে কেউ! ছোট্টামা থাকে দিদার ঘরেই। মাধ্যমিকে তিনবার ইংরেজিতে ব্যাক পেয়ে আর পড়াশোনা করেনি। আমাদের বাড়িতে কেউ যেসব কল্পনাও করতে পারবে না, মামাদের আমি সেইসব করতে দেখি ওখানে। আমরা গেলে মামারা আমাদের জন্যে বাজার থেকে কাচের চুড়ি টিপের পাতা কিনে

আনে হাট থেকে। সবচেয়ে বেশি আনে ছোট্মামাই। কীসের সাথে কী মানানসই সেসব মামাই বলে দেয়। মায়ের শাড়ি কেটে হাত মেশিনে সেবার আমার জন্যে কেমন সুন্দর ঘাঘরা বানিয়ে দিলো সমস্ত রাত জেগে। ওইটাই মামার রোজগার। মেশিনটা মা অনেক কষ্টে অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে জমিয়ে মামাকে কিনে দিয়েছে। পেয়ে সে কি খুশি মামা!

মামাবাড়িতে আনন্দে হোক দুঃখে হোক সবাই সবার মাথায় চুমু খায়। বড় হোক, ছোট হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক সবাই সবাইকে হামি দিয়ে বেড়ায়। ওরে বাবা আমাদের বাড়ি এসে মায়ের পাড়াতুতো কে দাদা যাবার সময় মা'কে "আসি রে খুকু" বলে চুমু খেতে সে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড! জ্যেঠী আর ঠাম্মা বার বার বাবাকে বলছে "ম্যাগো ঘেন্নায় বাঁচি না।" বাবাও একটু বিরক্তই হয়েছিলো। মা'কে বলছিলো বারণ করলে পারো তো এসব করতে। এখানে এসব কেউ করে না। আর এত বড় খুকুকে জড়াজড়ি করাই বা কেন? ছোট্মামাকে মা দারুণ ভালোবাসে। এখানে এলে বা ওখানে গেলে মা থালায় মেখে ভাত খাইয়ে দেয়। আমারও ইচ্ছে করে মা আমাকেও খাইয়ে দিক, ঠাম্মা বকবে বলে বলতে পারি না। ছোটমামা কিছুতেই এখানে এলে টেবিলে বসে খাবে না। বসে থাকবে মায়ের খাবার সময় ওব্দি। রান্নাঘরের কোনে বসে মায়ের পাতে, মায়ের হাতে খাবে। কাকী হাসে দেখে। বাবা বলে "তোমাদের বাড়ির সবার এত আদিখ্যেতা কেন খুকু? অত বড় ছেলে, তাকে বাড়িতে বৌদিরা খাইয়ে দেবে, এখানে তুমি খাইয়ে দেবে, এসব কী বলোত?"

বাবাকে মনে হয় জীবনে কেউ খাইয়ে দেয়নি, দরজা থেকে মাথায় হামি দেয়নি বলে হিংসে করে। ঠাম্মার নজর এড়িয়ে স্কুল যাবার সময় দেরী হয়ে গেলে মা খাইয়ে দেয় আমাকে। মায়ের হাতে খেলে যে টেস্ট বেড়ে যায় সেটা বাবা কোনোদিন জানতে পারেনি। খুব অপছন্দের খাবারও মা খাইয়ে দিলে ততটা খারাপ লাগে না।

কেন যে ঠাকুরমশাই আজ এত দেরী করছেন কে জানে! দুই হাঁড়ি ভর্তি তালের বড়া ভাজা হয়েছে। আমার আর ভালো লাগছে না। ঠাম্মা তক্তি করেছে সন্দেশের ছাপ তুলে। আমি অনেকবার কৌটো খুলে খুলে বিস্কুট খেয়ে এসেছি। আজ আর সন্ধের জলখাবারের পাট নেই। সবাই প্রসাদই খাবে। কোথায় প্রসাদ! পুজো হলে তবে না খাব। কাজ না থাকলে হাই ওঠে। দু তিনবার মুখের কাছে তুড়ি মেরে মায়ের সানন্দাটা বের করলাম। এইটাই সূবর্ণ সুযোগ পড়ার। এখন তো মা বাবা কেউ আসবে না ঘরে। একটা কানে-কানে বলে কলাম আছে খুব ইন্টারেস্টিং। দাদারা বাইরে গেলে আমি দাদাদের ঘরে ঢুকে একদিন তোষোকের

নিচে একটা আরো ইন্টারেস্টিং ম্যাগাজিন আবিস্কার করেছিলাম। সেটার নামটা খুব আজব ছিলো। দারুন সব ইন্টারেস্টিং কেসের খবর তাতে। বেশিক্ষণ টাইম পাইনি দেখার। খবরের কাগজ টাইপের নিউজ কিন্তু আসলে ম্যাগাজিনই। পুঁচকে চাচা চৌধুরির সাইজের। চাচা চৌধুরি আর চাঁদমামার ভেতরেই লোকানো ছিলো। আমি তো চাঁদমামা পড়ব বলে টানতেই ওটা বেরোলো। জানতে পারলে দাদারা আমার চামড়া গুটিয়ে দেবে। এমনিই একটা ভালো কথা নেই মুখে। কাকী একদিন কী যেন বলেছিলো রেগে বেশ- ও হ্যাঁ, “ভাত দেবার নাম নেই চড় মারার গোঁসাই।“

পৃথার দাদাটা কী ভালো। কত ভালো করে কথা বলে ওর সাথে। বকে ঠিকই একটু আধটু কিন্তু কত হেল্প করে দেয় ওকে, পড়া বুঝিয়ে দেয়। পৃথার কাছে সারাক্ষণ দাদার কথা শুনে শুনে দুঃখ হয় খুব। পৃথারা হেব্বি গরীব। মামাবাড়িতে থাকে। বাবা মা কীসে একটা মারা গেছে দুজনেই। আমার কেউ কেন নেই কে জানে! কেউ মানে কেউই যেন নেই। আমারই কেন এরকম লাগে, কই বিবির তো লাগে না কাউকে। একা একাই কত ভালো থাকে। আমার কেন মনে হয় ছোড়দাদা বড়দাদা কেবল না বকাবকি করে একটু কথা বলুক, পড়িয়ে দিক, স্কুলে টিউশনে ছেড়ে আসুক মাঝেমধ্যে। ইয়ার্কি মারুক, গল্প করুক, গল্প বলুক। নাহ সে তো হবার নয়। হিংসে হয় পৃথাকে খুব। রাখী গেলো ক’দিন আগে। পৃথাকে কি ভালো একটা পেন দিয়েছে ওর দাদা। ওরকম পেন বাবা চাইলেই আমায় কিনে দেবে। এটা বিশেষ ভালো কারন পৃথা এসে বলল, “দাদাভাই জানিস কত দিন ধরে টাকা জমিয়ে জমিয়ে এই দুটো কালির পেনটা আমাকে কিনে দিলো।“ আমিই উল্টে দেমাক করে বলে এলাম বড়দাদা ছোটদাদা ওরকম পেন কত ফেলে দেয় এদিক ওদিক। সত্যিই তো তাই। জ্যেঠুর অনেক টাকা। দাদাদের পেনদানী থেকে চারটে পেন আমি সরিয়ে নিলে বুঝতেই পারবে না, আরো দশটা কিনে আনবে। পৃথা কিছু বলেনি আমাকে। মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছিলো। আমি সরে গেলাম চটপট। পৃথা যেন বুঝতে না পারে আমার জন্যে ওর মত দাদারা টাকা জমিয়ে কিছু আনে না হাতে করে।

আমাদের বাড়িতে দাদাদের জন্যে ফুলের রাখি পুজো দিয়ে আনা হয়। সেটা পরানো ওব্দি না খেয়ে বসে থাকতে হয় আমাকে আর বিবিকে। ঠাম্মা তারপর লুচি মিষ্টি সাজিয়ে দিলে দাদারা রাখি পরে খেয়ে উঠে গেলে আমাদের খেতে দেয় মা। ভোম্বল দাদাও আসে। আমার একটুও ইচ্ছে করে না ভোম্বল দাদাকে রাখি পরাতে। রাখি পরালে এরা কেউ কিছু দেয়ও না।

বসে বসে এইসব এতোল বেতোল ভাবছি হঠাত নিচ থেকে গোলমাল কানে এলো খুব। সবাই তো ঠাকুরঘরে। শুনতে কেউই পাবে না। আমাদের বাড়িটা রাস্তার উপরে বলে সারাদিন গোলমাল চলতেই থাকে। একতলায় দোকান আর গুদাম ভাড়া দেওয়া আমাদের। জ্যেঠুর গলা পেলাম সিঁড়িতে। দুমদাম করে উঠে এসে দোতলার পলকা দরজাটার উপর ভারী দরজাটা ফেলে দিলো। প্রচণ্ড চিৎকার করছে জ্যেঠু। কী বলছে আমি বুঝতে পারছি না তবে খুবই খারাপ কথা। জ্যেঠু রেগে গেলেই প্রচণ্ড খারাপ খারাপ কথা বলে। আমি শোবার ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে রাস্তায় তাকাতে দেখি ছোট্মামু। এটা কী করেছে মামু! শাড়ি পরেছে কেন? হাতে চুড়ি, মাথায় টিপ- মামাবাড়িতে যাত্রায় ছেলেরা এরকম মেয়ে সাজে। কি কাণ্ড! তার উপর মামু যা তালঢ্যাঙা, শাড়িটা বেশ অনেকটা উপরে উঠে গেছে। খুবই খারাপ দেখাচ্ছে মামুকে।

এরকম পাগল হয়ে গেছে ছোট্মামু! মা'কে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বাড়িই চলে এসেছে মনে হয়। জ্যেঠু তো দরজা দিলো আটকে, উপরে আসবে কী করে? আমি দৌড়ে গিয়ে মা'কে ডাকতে যাব দেখি বাবা জ্যেঠু নিচে চলে গেছে। বাবা গিয়ে শাড়ি টেনে ধরলো মামুর। মামু চিৎকার করছে। খুকুদি, খুকুদি বলে ডাকছে বার বার। বাবা ছেড়ে দিলেও জ্যেঠু ততক্ষণে একটানে শাড়িটা খুলে দিয়েছে। মামা কীরকম লুকিয়ে যাচ্ছে ইলেক্ট্রিক পোস্টের পেছনে। মামার পরনে নতুন লাল সায়া আর ব্লাউজ। শাড়িটা রাস্তায় জমা জলে ভিজে গুটিয়ে পড়ে আছে। মায়ের গলা যেন শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরে। মা কি কাঁদছে? আমি কান পাতলাম। মা ভীষণ জোরে চিৎকার করছে। মা কখনো জোরে কথা বলে না। কী বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার ক্ষমতা নেই উঠে গিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে বাইরে থেকে কাউকে খুলে দিতে বলার।

এদিকে আবার মামুকে বাবা ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলো পোস্টের পেছন থেকে। তারপর পা থেকে জুতোটা খুলে মারতে শুরু করলো। জুতো খুলে মারছে বাবা মামুকে! জুতো দিয়ে কেউ কাউকে মারে! বাবা মামুকে কি মামাবাড়ির কাউকেই ভালো বাসে না জানি, তাই বলে জুতো দিয়ে মারবে? হাত দিয়ে আড়াল করছে মামু। হাতে অনেক রঙিন কাচের চুড়ি ছিলো। সব ভেঙে খান খান। হাতেও ফুটেছে কিছু। মামু হাত ধরে আছে। এরই মধ্যে নাকি সুরে মা'কে ডাকার বিরাম নেই। যত মা'কে ডাকছে ততই বাবা মারছে। আশেপাশের সবার বাড়ির জানালা খুলে গেছে, বারান্দায় ঝুঁকে পড়েছে সবাই। মামু এত মার খাচ্ছে আর সবাই এরকম হাসছে কেন? আমি চিৎকার করতে গেলাম দেখলাম গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। মা'কে যে দেখব

সেটাও পারছি না। কাকী কই? আমি কাকীকে ডাকতে গেলাম গলা বুজে এলো। ভীষন কাঁদছে মা। দরজার চাবি চাইছে ঠাম্মার কাছে। আমাদের ঘরের দরজাও লাগানো। মনে হয় মা যাতে বারান্দায় না আসতে পারে সেই জন্যে। আমি বাইরে যেতে পারছি না। কেউ জানে না আমি এই ঘরে আছি। আমি গ্রীলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বড়দাদাও মারছে মামুকে। এত মার খেয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়েছে মামু। হাত দিয়ে বুকের কাছে ব্লাউজটা মুঠো করে ধরে আছে। আর আওয়াজ পাচ্ছি না। পাশে সবুজ সাইকেলটাও দুমড়ে পড়ে আছে। অতদূর থেকে সাইকেল চালিয়ে এসেছে মামু!

কেন? কীসের জন্যে! মা'কে সাজ দেখাতে মনে হয়। এই শাড়িটা মায়েরই তো! বাবা গুজরাট বেড়াতে গিয়ে কিনে দিয়েছিলো। মা দিয়েছে মামুকে! বাবা কি সেইজন্যেই মারছে মামুকে এত? কই পিসী পরলে তো কিছু বলে না! না হয় অসুখই করেছে একটু। সেরে যাওয়া ওব্দিও অপেক্ষা করা যায় না! বাবা তো নিজেই বলেছিলো ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে। তাহলে হঠাত কী হল? মিথ্যে বলেছিলো মা'কে বাবা?

কেন তুমি এত পাগল হয়ে গেলে মামু?

হলেই যদি এখানে এলে কেন?

ভীষণ রাগ হচ্ছে আমার। মায়ের কী হবে এখন? সবাই মিলে কি মা'কে তাড়িয়েই দেবে? আমার গলার কাছটায় ব্যথা করছে খুব, ঢোক গিলতে পারছি না, চোখ জ্বালা করছে।

বারান্দায় লুকিয়ে রইলাম। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে। আমি কেন লুকোতে চাইছিলাম জানি না। এত ভীতু আমি! মা যেখানে যাবে আমিও মায়ের সাথেই যাব। বাবার কথা ভাবতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। আমার ফ্রকের সামনের ফ্রিলটা ভিজে গেছে চোখের জল মুছে মুছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এলাম। কোথায় গেলে কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে আর। মায়ের কী মনে আছে আমার কথা একটুও এখন? মা কি তবে শুধু মামুকে নিয়ে চলে যাবে? আমি কি কেউ নই কারোর তবে?

কেন তুমি পাগল হয়ে গেলে ছোট্টমামু? হলেই যদি আমার মায়ের কাছে এলে কেন?

সূচিপত্র

উল্কামুখী
পার্থ ঘোষ
অলঙ্করণ - অনির্বাণ ঘোষ
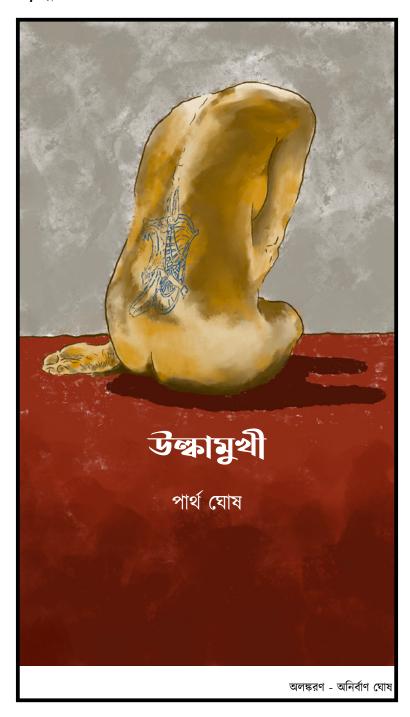
প্রথম পর্ব

শেষ সেপ্টেম্বরে অঝোরে বৃষ্টি গোটা কলকাতা জুড়ে। যথারীতি জল থইথই অবস্থা চারপাশে। ইডেন হসপিটাল রোড ধরে কলেজের পাঁচ নম্বর গেটে বাস থেকে নামতে না নামতেই চুপচুপে ভিজে গেলো অর্যমা। ছাতাটা খোলার একমুহূর্ত অবকাশটুকুও মিললোনা। পিঠে ভারী ব্যাগ নিয়ে, হাতের ট্র্যাভেলার্স ট্রলি টানতে টানতে সেই স্বর্ণময়ী হোস্টেল বেশ অনেকটা রাস্তা। নিজের মনেই গজগজ করতে করতে স্কুল অফ নার্সিং, ডেভিড হেয়ার ব্লকের সামনের রাস্তাটা পেরোলো সে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে চরাচর জুড়ে। ইতিউতি ছাতা মাথায় পেশেন্ট পার্টি, ডিউটিরত পুলিশকর্মীদের জটলা। ব্যস্ত ইন্টার্ণ-পিজিটিদের পথচলা। কেউ পাশে নেই যে একটু সাহায্য করতে পারে। রাগের মাথায় ঈশানকে ফোনও করা হয়নি সকাল থেকে। যাদবপুর থেকে হাওড়া এমন কিছু বেশি দুরত্ব নয় যে একবারটির জন্যও স্টেশনে আসা যায় না। থাক, বসে থাক নিজের ইগো নিয়ে। বেশি পড়ার চাপ দেখাচ্ছে। এখানেও তো সেটা কিছু কম নয় বাপু, বরং মেক্যানিকালের থেকে কিছুটা বেশিই বলা যেতে পারে।

দোতলায় নিজের রুমটা চাবি দিয়ে খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এলো। তার মানে রুমমেট নৈঋতা এখনো ফেরেননি। ঘরে দড়িতে মেলা টাওয়েল, দুটো টপ আর লেগিংস, কয়েকখানা আন্ডারগার্মেন্টস। টেবিল, বেডময় বইখাতা ছড়ানো যথারীতি। ফাঁকা ভিসেরা'র বোতল দুটো, আর কয়েকপিস বোন-সহ একখানা বড় ফিমার গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। খুব তাড়াতাড়ি রুম চেঞ্জ করতেই হবে; এত নোংরার মধ্যে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার তো মিনিমাম এতটুকু সেন্স থাকা দরকার একজনের! একটু গুছিয়ে তো রাখতে পারা যায় ঘরটাকে, নাকি একেবারে নরককুন্ড বানিয়ে রাখতে হবে সবসময়? কই, এতদিন অদৃজাদি'র সাথে থাকতে একফোঁটা অসুবিধা হয়নি তো? সেই যে চার মাস আগে সবসময় খুব টিপটপ, গোছানো দিদিটা আর.জি.কর চলে গেলো পোস্টগ্র্যাজুয়েশন পড়তে, তারপর এই নতুন ফার্স্ট ইয়ারের আপদটির আগমন ঘটল। আজ ফিরলে বেশ কড়া করে কথা শোনাতে হবে— মনে মনে ঠিক করলো সে।

টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে ফিরে এসে, কোনোরকমে ঘরটাকে অল্প একটু সভ্যভদ্র করা গেলো। কোণের একটা ধুপ জ্বালিয়ে রুমের জানালাটা খুলে দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ কেমন বুকটা একটু ছ্যাঁৎ করে উঠলো অর্যমার। রাস্তার উল্টোদিকে, মরচ্যুয়ারি আর লন্ড্রির মাঝের ঘুপচি মত একটু ঝোপের অন্ধকারে দুটো সবুজ

রঙের বিন্দু জ্বলজ্বল করছে। যেন ওপরে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কুকুর বেড়াল হবে হয়তো, এই ভেবে তখনকার মতো মনকে কিছুটা শান্ত করা গেলো। জানা ছিলো না, সেই রাতেই কী ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে তাকে।

সেকেন্ড প্রফেশনাল এগিয়ে আসছে দোড়গোড়ায়। প্যাথো-ফার্মা-মাইক্রোবায়ো-এফএসএমের চাপে পিষ্ট হচ্ছে ক্লাসশুদ্ধ সবাই। প্রথমটাতে কোনোরকমে উতরে গিয়েছিলো অর্যমা, অনেক কষ্টে বায়োকেমিস্ট্রিতে সাপ্লিটা বাঁচিয়ে। ফিজিওলজি খারাপ লাগতো না, আর অ্যানাটমি চলনসই। এবার বোঝা যাচ্ছে মেডিক্যালের শিলনোড়ায় মশলা বাটা কাকে বলে।

রাতের দিকে ক্ষিদের চোটে অনন্তনারায়ন-পাণিকরের মাইক্রোবায়োলজি বইটা বন্ধ করে যখন ডাইনিং এ পৌঁছানো গেলো, তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় দশটা ছুঁইছুঁই। দুই একজন মাত্র সিনিয়র বোর্ডার সেখানে খাচ্ছে। তার নিজের ইয়ারের কেউ নেই। মনে হচ্ছে কাল সকালের আগে কেউ বাড়ি থেকে আসবে না। ঠান্ডা ডাল ভাত, একটা ঘ্যাঁট মতো সব্জী আর ডিমের ঝোল কোনক্রমে মুখে ঠুসে হাত মুখ ধুয়ে একতলা থেকে ওপরে উঠছে যখন, অর্যমা দেখলো, কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে দোতলায়, ঠিক সিঁড়ির মুখটায়। আলোর দিকে পিছন করে আছে বলে মুখটা চেনা যাচ্ছে না। চুল খোলা, পরনে একটা ঢোলা জোব্বা মত নাইটি। কিচেনের পিছনের দিক থেকে একটা কেমন যেন বমি বা খাবার পচা গন্ধ ভেসে আসছে খুব। গা-টা তার গুলিয়ে উঠলো বড্ড। সিঁড়িটা যেন হঠাৎ মনে হচ্ছে খুব বেশী উঁচু। খ্যানখ্যানে একটা গলা – “দি, তুমি ঘুমিয়ে গেলে ভিতর থেকে দরজাটা লক কোরোনা প্লিজ। আমার রুমে ফিরতে একটু রাত হবে, ওই উইং-এ গ্রুপ স্টাডি করতে যাবো ডিনারের পর।” নৈঋতা! কখন ফিরলো কে জানে?

অনেক রাতে একটা বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো অর্যমার। ডক্টর বি.সি. রয় অ্যানেক্স বিল্ডিং, অ্যানাটমি লেকচার থিয়েটরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে সে, ঠিক যেন প্রথমদিনের ক্লাসের মতো। কিচ্ছু মনে পড়ছেনা সামনে টেবিলে শোয়ানো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ফিমেল ক্যাডাভারটার দিকে তাকিয়ে। ঠিক মাথার ওপরে একটা ঝাপসা হলুদ আলো ছাড়া বাকি জায়গাটায় অন্ধকার যেন জমাট বেধে আছে। দম আটকানো ফরম্যালিনের গন্ধ চারদিকে। কেউ কোত্থাও নেই। কেমন যেন একটা প্রচণ্ড তেষ্টায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে বলে মনে যাচ্ছে। গা হাত পা হঠাৎ করে বড্ড ভারি, হাজার চেষ্টা করেও টেবিলের পাশ থেকে নড়াচড়া করতে পারছেনা সে। উল্টোদিকে হুডে ঢাকা মাথা নিচু করে,

অদ্ভূত একটা কালো জোব্বা মত পোষাক গায়ে, হাতে একটা স্ক্যালপেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। পরিচিত প্রফেসর বা ডেমোনস্ট্রেটর কেউ নয় তো? ভয়ে গলা দিয়ে একটা অস্ফূট আওয়াজ বেরোলো শুধু। পরক্ষণেই মুখ তুললো সেই মূর্তি। আরেহ, এ তো সেই ফরেনসিক মেডিসিনের আশিসদা, মরচ্যুয়ারী অ্যাসিস্টেন্ট! স্যারদের সাথে সাথে থাকে ডেমনস্ট্রেশনের সময়। তবে স্মল পক্সের দাগওয়ালা গালগুলো কেমন যেন তোবড়ানো, আর অদ্ভুত রকমের লম্বাটে লাগছে যেন মুখটা। হলদে দাঁত বের করে হাসছে। সন্ধ্যাবেলায় দেখা সেই সবুজ চোখদুটো যেন আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে এলো সামনের দিকে।

একটা আর্তচিৎকার করে বেডের ওপর উঠে বসলো অর্যমা। গোটা শরীর জবজবে হয়ে ভিজে গেছে ঘামে। এর মধ্যে আবার পিরিয়ডস শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, চেঞ্জ করার খুব প্রয়োজন। সবেধন নীলমণি জানালাটা খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভেতর একটা ভ্যাপসা গরম। আলোটা জ্বলছে। অস্বস্তি হতে পারে ভেবে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েই শুয়েছিলো সে। বাইরে থেকে কেউ কি নক করছে? নৈঋতার গলা, ডাকছে তার নাম ধরে। উঠতে গিয়েই থমকে গেলো সে। উল্টোদিকের টেবিলে ফর্ম্যালিন ভরা শিশিটা তো আগে চোখে পড়েনি? তার মধ্যে লালচে রঙের কিছু একটা ডোবানো। চোখ রগড়ে ভালো করে দেখে গাটা কেমন যেন শিউরে উঠলো। একটা হার্ট। উঁচু হয়ে আছে সুপিরিয়র ভেনাকাভা। এতটাই তাজা, যেন মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই ধুকপুক করছিলো কারুর বুকের মধ্যে। সাধারণত ভিসেরা তো এমনটা হয়না! রঙটা দেখে মনে হচ্ছে যেন জ্যান্ত মানুষের বুকে ছুরি চালিয়ে উপড়ে এনেছে কেউ, খানিক আগেই!

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথমবার নীট পরীক্ষায় মেডিক্যাল হয়নি, ডেন্টাল পাচ্ছিলো অর্যমা। টুয়েল্ভ-এর পর তাই একটা বছর ড্রপ দিয়ে পরেরবার ভালো র‍্যাঙ্ক করার পর, একদম সোজা মেডিক্যাল কলেজে, তার স্বপ্নের জায়গায়। অনেকদিন ঘোরের মধ্যে দেখেছে সেই চওড়া সিঁড়ি ওঠানো উঁচু এমসিএইচ বিল্ডিংটার সামনে দিয়ে অ্যাপ্রন পরে হেঁটে যাচ্ছে নিজে। এখানে, ক্যাম্পাসে থেকে পড়াশুনো করার পরিবেশটাই খুব সুন্দর। অতি কম ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যেও সবাই যে যার মত প্রাণপনে কাজ করে যাচ্ছেন, স্যার-ম্যামদের তো তুলনা হয়না। জিএলটি বা জেনারেল লেকচার থিয়েটরের ক্লাসগুলো করতে প্রথম থেকেই খুব ভালো লাগে। পুরো আড়াইশো জনের ব্যাচের সকলের সাথে এই তিন বছরেও তেমন

আলাপ হয়নি, ওই হাই হ্যালো করার মতো মুখচেনা এই যা। বরং সিনিয়ররা বেশি ইন্টারেস্টিং। মেডিসিনের অর্কদার অসামান্য ফিজিক্স প্রীতি, সার্জারির অরিত্রদা কি ভীষণ হ্যান্ডসাম, পিডিয়্যাক সৌম্যকান্তিদা দুর্দান্ত লিখতে পারে, সাইকিয়াট্রির অনিকেতদা সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে গলা ফাটায়, হেপাটোলজি'র সপ্তর্ষিদা ভীষণ কেয়ারিং... আর পাব্লিক হেলথের রুমেলিকাদি'র তো তুলনা হয়না। সারাজীবন ঘাড় নীচু করে পড়াশোনা করে যাওয়া অর্যমা যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করছে ডাক্তারি পড়তে এসে। এক্সট্রা-কারিক্যুলার কাজকর্মে যে এত মজা, এখানে না এলে তো বোঝাই যেতো না। বিশেষ করে র‍্যাপসডি বা স্যাপিয়েন্ট মেডিক্যুইজের সময় হইহই করে কিভাবে দিনগুলো কেটে যায়, বোঝাই যায়না।

তড়িঘড়ি ব্রেকফাস্টের ডিম-টোস্ট গিলছিলো সে ক্যান্টিনে বসে, ক্লাসমেট পৃথ্বীশের ফোন এলো।

- "এ ভাই কোথায় রে?"

- "এই তো খাচ্ছি এখন, তুই কোথায়?"

- "তাড়াতাড়ি আয় ক্যাজুয়ালটি ব্লকের সামনে, একটা যা-তা কান্ড ঘটেছে।"

আসানসোল সেন্ট প্যাট্রিক্সের ছেলে পৃথ্বীশ। ফর্সা রোগা পাতলা চেহারা, চোখে চশমা... দুর্দান্ত ব্লগ লেখে ইংরেজিতে। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে খুব প্রিয় বন্ধু অর্যমা'র। ঈশান যখন প্রথমদিকে ওকে নিয়ে চাপ খেতো, তখন মজা করার জন্য বেশি বেশি করে পৃথ্বীশের সাথে ছবি তুলে সে আপ্লোড করতো ইন্সট্যাতে। ব্যাপারটা সিরিয়াস দিকে যাচ্ছে দেখে একদিন দুজনকে নিয়েই বিকেলে ফুড স্টেশনের দোতলায় বসতে হলো। প্রথম আলাপেই ভাগ্যক্রমে ঈশানের ভুলটা ভেঙে গিয়েছিলো। এখন তো যাদবপুরে মাঝে মাঝেই পৃথ্বীশ স্টে-ওভার করতে চলে যায়, মেক্যানিকালের পার্টি নাকি ওর জোকস ছাড়া জমেনা। দুজনের এমন জমাটি বন্ধুত্ব হয়েছে যে অর্যমার ফোন কোনো কারণে বন্ধ থাকলে ঈশান পৃথ্বীশকে কল করে নেয়। আর দুজনের ঝগড়া হলে পৃথ্বীশকেই শেষ অব্দি মধ্যস্থতা করতে হয়।

এমসিএইচ আর ইমার্জেন্সি বিল্ডিং এর সামনে প্রায় তুলকালাম অবস্থা। পুলিশের গাড়ি, মিডিয়া'র ওবি ভ্যান, জনারণ্য। ছুটে এসেছেন প্রিন্সিপাল ম্যডাম, সুপার রা। গতকাল রাতে পুলিশ একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস নিয়ে এসেছিলো, সার্ভাইভ করেনি পেশেন্ট। বডি ক্যাজুয়াল্টি ব্লকের করিডোরের শেষপ্রান্তে ট্রলি-তে রাখা ছিলো, অত রাতে কাউকে পাওয়া যায়নি বলে মর্গে মুভ করানো যায়নি। বাড়ির লোক সকালে আইডেন্টিফাই করতে যখন আসে, দেখা যায় চেস্ট-অ্যাবডোমেন ওপেন

করা, কেউ যেন নিপুণ হাতে সবকিছু কেটে বের করে নিয়ে আবার বেসবল স্টিচ করে রেখেছে। অথচ কোথাও কোনো ব্লাড স্টেইন ইত্যাদির চিহ্ন নেই। অন ডিউটি ইন্টার্ণ পিজিটিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ, আটক করেছে সিকিউরিটি-কে।

"তাহলে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত? রাজধানীর টার্শিয়ারি হাসপাতালেই কি মানব-শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ কেনাবেচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে? জানতে গেলে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে..." – গলাটা শুনেই মাথাটা ঝপ করে গরম হয়ে গিয়েছিলো পৃথ্বীশের। লম্বা মাইক্রোফোন হাতে স্বনামধন্য চ্যানেলের সাংবাদিকের দিকে তেড়ে যাচ্ছিলো প্রায় সে, অর্যমা হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে ভিড়ের বাইরে বের করে আনলো।

-"হোয়াট দ্য ফাক? হাউ ডেয়ার শি ম্যালাইন মাই কলেজ?"

-"লেট ইট বি, ইউ নো দে ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট, ইভন লেট দ্য এন্টায়ার মিডিয়া অ্যাটেনশন আপঅন ইউ; এই দ্যাখ আবার ঈশান কল করছে...।"

মেডিকো লিগ্যাল কেস যেহেতু, পুলিসের নির্দেশে বডি তৎক্ষণাৎ অটোপ্সির জন্য পাঠানো হলো ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি বিল্ডিং-এ। হেড অফ ডিপার্টমেন্ট নিজের হাতে আবার ওপেন করবেন বলে ওদের ব্যাচটাকে ডেকে নিলেন। যথারীতি আঁতেলস্য আঁতেল বৈদুর্য্য চ্যাটার্জি ওরফে বাটা সবাইকে ঠেলেঠুলে স্যারের পাশে জায়গা করে নিলো, যাতে সবার আগে ওই সবচেয়ে ভালো করে প্রসিডিওরটা দেখতে পায়। দাঁত কিড়মিড় করে পৃথ্বীশ কয়েকটা বাছাবাছা খিস্তি প্রয়োগ করছিলো, অর্যমা কনুইয়ের গুঁতো মেরে চুপ করালো।

-"তোমরা ভালো করে দেখে নাও। এই স্কাল ওপেন করলাম। কনকুশন, কনট্যুশন, ইন্ট্রা-ক্রেনিয়াল হেমাটোমা তিনটেই আছে দেখছো, কিন্তু স্কাল ফ্র্যাকচার নেই...অর্থাৎ..."

স্যারের কথা শুনতে শুনতে একটা অদ্ভূত অনুভূতি হলো অর্যমার। ওই যে বলে মেয়েদের একটা সিক্সথ সেন্স থাকে, যা দিয়ে বোঝা যায় কেউ না কেউ একজন তার দিকে লক্ষ করছে। মুখ তুলতেই গাটা ঘিনঘিন করে উঠলো। ওই হোঁতকা গাম্বাট বাটা হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখটা অল্প খোলা। চোখ দিয়ে গোটা শরীরটাকে চাটছে যেন।

"শিট...এক্সকিউজ মি স্যার, নিড টু গো টু ওয়াশরুম ওয়ান্স", অনুমতি নিয়ে টয়লেটের দিকে এগোলো সে। হেভি ফ্লো হচ্ছে। প্যাড বের করে চেঞ্জ করার পর ইউজড খানা চটপট র‍্যাপ করে ব্যাগে চালান করে নিলো। দরজা খুলে বেরিয়ে লবি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা লাগছিলো একজনের সাথে। আরেকবার চমকে

ওঠা বাকি ছিলো মনেহয়। সাদা অ্যাপ্রনে আশিসদা, হাতের জার-এ ফরম্যালিনে ডোবানো কিছু স্পেসিমেন। অপ্রস্তুত একটা কান এঁটো করা দেঁতো হাসি দিয়ে উল্টোদিকে চলে গেলো সে। আবার সেই বমি পচা গন্ধটা যেন কোত্থেকে ভেসে নাকে এসে লাগলো।

লাঞ্চের সময় পৃথ্বীশকে গত রাতের স্বপ্নের গল্পটা করতে গিয়েও চেপে গেলো অর্যমা, লেগ পুলড হয়ে ফালতু ইয়ার্কির পাত্রী হওয়ার ভয়ে। শুধু ওই হঠাৎ করে তার রুমে উদয় হওয়া হৃৎপিন্ডের কথা শুনেই ছেলেটা খানিক চুপ করে রইলো।

-"সামথিং ইজ ফিশি, ইট সিমস, তবে তোর রুমমেট মেয়েটা কিন্তু বেশ বন্য মামণি টাইপ দেখতে..."

-"তবে আর কি, তুইও মামন হয়ে ওর গলায় ঝুলে পড়। সর্বসময় খোলা চুল এলিয়ে ধেয়ে ধেয়ে তোর দিকে এগিয়ে আসে, দেখিনি ভাবছিস? কী শ্যাবি দেখতে লাগে মাঝেমাঝে।"

হাসাহাসি করতে করতেই হঠাৎ চুপ করে গেলো দুজনে। তাদের সামনে দিয়ে একটাই ছাতা মাথায় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় এজরা বিল্ডিং এর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বৈদুর্য্য আর নৈঋতা।

তৃতীয় পর্ব

-"তুমি কি এই উইকএন্ড হোস্টেলে থাকবে দি? নাকি বাড়ি যাবে?"

-"কেন রে? কি দরকার?" বই থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দিলো অর্যমা।

কোনো সাড়া নেই ওপাশ থেকে। বেডে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কালচে নীল হাতকাটা নাইটি পরা শ্যামলা দোহারা চেহারার মেয়েটা। সিগারেট ফুঁকে এসেছে মনেহয় বাইরে থেকে, ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে গন্ধটা।

-"তোমাদের ইয়ারের বাটাদা কেমন ছেলে গো?"

-"এমনি নর্ম্যাল, ঠিকই আছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলতো?" নড়ে চড়ে উঠে বসলো অর্যমা।

-"ডেট করতে চাইছে যে, বলছে মন্দারমণি যাবে", খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো নৈঋতা।

-"আগে ওয়ো-তে গিয়ে দ্যাখ, তারপর অত দূর যাবি'খন। তোর পড়াশুনো নেই? সামনে ফার্স্ট প্রফেশনাল পরীক্ষা না?"

-"আরে ও-ই বললো তো অ্যানাটমি পড়িয়ে দেবে ভালো করে।"

"সাথে ফিজিওলজিটাও, সেটাই বা বাদ রাখছে কেন?" বিরক্তি ঝরে পড়লো অর্যমার গলায়। হিহি করে হাসছে নৈঋতা, গড়িয়ে পড়ছে খাটে, আর যেন থামতেই পারছেনা। মাথাটা ঝট করে গরম হয়ে যাচ্ছিলো অর্যমার, সেটা সামলে নিলো আগে। একটা কৌতূহল নিবৃত্তির প্রয়োজন

খুব।

-"অ্যাই শোন না, হাসি থামা আগে। হার্ট-টা কার থেকে কিনলি রে? খুব ভালো কোয়ালিটির দেখলাম তো। অ্যাতো ভালো ভিসেরা-র স্পেসিমেন তো আমরা কোনোদিনই পেলামনা পড়ার সময়...। কে দিলো রে? নিরাপদ দা?"

-"না নিরাপদ নয়, বাটাদা প্রেজেন্ট করেছে। ওর কাছেই ছিলো। বললো আমার হার্ট আজ থেকে তোর...হি হি... কার থেকে কিনেছে জানিনা ...।"

জিজ্ঞাসাটা যেন আরো বেশি জিজ্ঞাস্য হয়ে ফিরে এলো। পৃথ্বীশকে বলতেই হবে খবর নিতে। দুজনেই তো মেন বয়েজ হোস্টেলের।

মইদুল নামে ঈশানের একটা বন্ধু আছে, যাদবপুরের কম্প্যারেটিভ লিটারেচারের। প্রথম আলাপে কেমন যেন ক্যালানে-কার্তিক মার্কা লেগেছিলো, কিন্তু ছেলেটার পড়াশুনোর বহরটা, যা শুনেছে অর্যমা... তা ঈর্ষণীয়। কলেজ স্ট্রিটে দুই-একবার দেখা হয়েছে। ছেলেটা একা একা পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ায়, উল্টে-পাল্টে দ্যাখে, কিছু কেনে, আর সবার সাথে প্রচুর কথা বলে। ইদানিং ফিল্ম স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের ক্লাসগুলোতেও নাকি মাঝে মাঝে তাকে বসে থাকতে দেখা যায়, প্রফেসরদের সস্নেহ প্রশ্রয়ে। সেদিন হঠাৎ করে কফি হাউসে আবার দেখা। খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুরদম বিশেষণটা যেন ওর জন্যই বানানো হয়েছে। খানিক ভ্যাবলার মত ওর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকার পর ইশারায় একটু আলাদা করে সাইডের দিকে ডাকতে, অর্যমা বেশ অবাক ও খানিক বিরক্তই হয়েছিলো।

-"বল। ডাকলি কেন? ঈশানের নামে চুকলি করবি নাকি?"

-"আরে দূর। তোকে অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মাইন্ড করবি না আশা করি।" লাইটার দিয়ে বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বললো মইদুল।

-"বলে ফ্যালো বস, তাড়া আছে। হস্টেল ফিরতে হবে, পড়া জমে আছে।" হাত নেড়ে নাকের সামনে থেকে বিড়ির ধোঁয়া সরানোর চেষ্টা করলো সে।

-"ইদানিং তুই মাঝেমাঝে কিছু পচা গন্ধ পাস? বা আন-ন্যাচারাল কিছু ঘটতে দেখিস আশপাশে?" একটু সিরিয়াস কণ্ঠস্বর ওদিক থেকে।

-"আপাতত তোর বিড়ির গন্ধে মাথা ধরে যাচ্ছে। কী পাস বলতো ভাই এসব ফুঁকে?"

-"একটু সাবধানে থাকিস রে। আমার কেমন যেন একটু আনক্যানি ফিল হচ্ছে তোকে দেখার পর থেকে..., কেমন একটা লম্বা ছায়া মত

পিছনে...”

-“দিনে ক’টা করে জয়েন্ট ফুঁকছিস বল তো? এরপর যদি স্মোকার্স লাং নিয়ে কলেজে দেখাতে আসিস শালা, ঝেড়ে একটা লাথ দেবো তোকে, সোজা রিহ্যাবে গিয়ে ল্যান্ড করে যাবি।”

-“আমার কথা ছাড়, তুই আনুবিস-এর নাম আগে কখনো শুনেছিস?”

খানিক থমকে গেলো অর্যমা। তারপর পৃথ্বীশের গলা শুনতে পেয়ে ঝটপট ফিরে গেলো নিজেদের টেবলে, মইদুলকে একপ্রকার অভদ্রভাবে অবজ্ঞা করেই। নামটা কিন্তু গেঁথে রয়ে গিয়েছিলো মাথায়। খুব ছোটবেলায়, বইমেলা থেকে কেনা একটা বইতে প্রথমবার সেটা শুনেছিলো। কী কো-ইন্সিডেন্স! আর এই তো দুইদিন আগে হঠাৎ করেই আহ্লাদিত হয়ে রুমে ফিরে নৈঋতা কুর্তি খুলে দেখিয়েছিলো তার নতুন আঁকানো ট্যাটু। বাটা স্পন্সর করেছে নাকি। পিঠ জুড়ে, নীল আর কালো রঙে সিমেট্রিক প্যাটার্নে আঁকা, একদম শেষ লাম্বার ভার্টিব্রা অব্দি। ছুঁচলো দাঁত, লম্বা কান, তীক্ষ্ণ লাল চোখের শেয়াল-দেবতা। মিশরীয় সভ্যতায় মৃত্যু পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম ম্যমি বানানো যাঁর হাতে।

কিছুতেই আর পড়ায় মন বসেনা। অগত্যা ট্যাবটা খুলে গুগলের শরণাপন্ন হতেই হলো ফার্মাকোলজি ছেড়ে।

নিরাপদর সাথে ঈশান আর অর্যমা বসেছিলো অ্যানাটমি বিল্ডিং-এর কোণের দিকে একটা ঘরে। চারদিকে ছাড়ানো স্পেসিমেনের বোতল, বোন-সেট। টেবিলের ওধারে অসংখ্য বলিরেখায় ভরা একটা মুখ, খাকি প্যান্ট আর ময়লা সাদা শার্টেই তাকে দেখা যায় সবসময়। রিটায়ারমেন্টের বয়স মনে হয় পেরিয়ে গেছে অনেকদিন, খাতায় কলমে যদিও ষাট ছুঁতে আরো বছর তিনেক। প্রায় বংশানুক্রমে ডোমের চাকরি এই মেডিক্যাল কলেজে। প্রফেসররা খুব নির্ভর করেন এই মানুষটির ওপর। এমবামিং এর হাত অসাধারণ। অ্যানাটমি ভাইভা’র আগের রাতে ক্যাডাভার স্টাডির সময়ে ছেলেমেয়েদের সাথে অচিরেই রাত জাগতে দেখা যায় মানুষটিকে। সেকেন্ড প্রফেশনালের একজোড়া ছেলেমেয়ে আলাদা করে কথা বলতে চেয়েছে, তাতেই বেশ আপ্লুত মনে হলো।

- “সেই কুন ছুটো বয়সে এয়ানে কাজে এয়েচি বাপটোর হাত ধরে, মনেও নেইকো। প্যাটের দায়ে চাকরি। বউ ছেলে বলে গা দিয়ে মড়ার গন্দ ছাড়ে, দেশে গেলে আমার হাতে জলটুকুও খায়না কেউ। ট্যাহাটা অবশ্যি নেয় হাত পেতে, উতে কুনো দোষ নাই গ দাদাদিদিরা। এই ডাকদর সাররা, আপনেরা, সম্মান দ্যে আপনি করে ডাকেন যওন, মন ভরি যায়। ঠিক করে রেখেচি, মরলে একানেই মরবো।”

-"কী যে বলেন নিরাপদদা। এখন আপনাকে মরতে দিচ্ছে কে? পরের ব্যাচের বাচ্চাগুলো অ্যানাটমিতে সাপ্লি খাবে তো..." বলে উঠলো ঈশান।

"উফ তুই চুপ কর না। আপনি বলুন না নিরাপদদা, শুনতে খুব ভালো লাগছে আপনার কথা। প্রথম যেইদিন এখানে এসে বডি দেখলেন, আমাদের মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?" রিনরিনে কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো অর্যমা।

অনেক দূর থেকে ঘড়ঘড়ে গলাটা ভেসে এলো যেন ... "ভয় পেলে চলবেক কী কর‍্যা দিদি? বাপটা কয়েছিলো, নজ্জা ঘেন্না ভয় সব বারপানে রেকে আসবি। তকনকার বড় ডাগদরবাবু ভগমান ছিলেন, মেশিন চালানোর আগে বলতেন – নিরু, তুই শুদু হাত-পা গুলো ভালো করে ডলে দে দিকি, বডির মুকের পানে চাইবিনা কো একদম। পেত্থম পেত্থম বমি করে ফেলতাম, একন আর কিচ্ছু হয়না। মড়া কাটা হাগা-মোতার মতো হয়ে গেচেক বটে।"

"আমরা আজ তাহলে আসি নিরাপদদা, আপনার তো এখন আবার থিয়েটারে যেতে হবে, নতুন ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস শুরু তো আজ? আরেকদিন সময় নিয়ে আসবো, অনেক কিছু গল্প শুনবো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আসবেন কেনে, একশোবার আসবেন। আর নতুনরা জানতি চাইলে আমার থেকেই সেট নিতে বলবেন, ওই হারামজাদা আশিসের কাচে যেনো না চলে যায়..." খৈনীর দাগ ধরা দাঁত বের করে হেসে বলে উঠলো বৃদ্ধ।

থিয়েটরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখা গেলো জমায়েতটা। একগুচ্ছ ছেলেমেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাটমি ডক্টর উপায়ন সরকার। "উই নিড ট্যু ইঞ্জেক্ট দ্য ফ্লুইড ইন্টু দ্য সার্ক্যুলেশন সিস্টেম থ্রু দ্য রাইট ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড ড্রেণ আউট ব্লাড ফ্রম দ্য জ্যুগুলার ভেইন। দ্য বডি অফ দ্য ক্যাডাভার নিডস ট্যু বি ম্যাসাজড ফর প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রিজার্ভেটিভ কেমিক্যালস। প্রপার এমবামিং ইজ নেসেসারি ইন অর্ডার ট্যু প্রিসার্ভ দ্য করপ্স ফর লংগার ড্যিউরেশন..." – বলতে বলতেই স্যার স্ক্যালপেল ধরলেন ক্যাডাভারের কভার সরিয়ে। "ফিমেইল, এস্টিমেটেড এজ সেভেনটি, ন্যাচারাল ডেথ, ডোনেটেড বাই ফ্যামিলি মেম্বার্স..." আঁ আঁ শব্দে যথারীতি অজ্ঞান হয়ে গেলো ক্লাসের দুইজন।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।

চতুর্থ পর্ব

ক্লাসের পর, ট্রেতে সাজানো ভিসেরা আবার প্রিজার্ভেটিভ ভর্তি জারে তুলে রাখছিলো নিরাপদ। লাংগস, ডায়াফ্রাম, ফুল স্টম্যাক, ইন্টেস্টাইন ইত্যাদি ফাঁপা অর্গ্যান আলাদা, আবার লিভার কিডনির মতো সলিড অর্গ্যান আলাদা। স্যাচুরেটেড সোডিয়াম ক্লোরাইড আর রেক্টিফায়েড স্পিরিট দ্রবণে দিনের পর দিন কাজ করতে করতে তার শিরা ওঠা হাতদুটোর অবস্থা বেশ খারাপ। জায়গার জায়গায় ছাল উঠে গেছে। উপায়ন স্যার কাজ করার সময় গ্লাভস পরার কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

স্টোরে সব জার গুছিয়ে তুলতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলো সে। কয়েকটার নম্বর মিলছেনা কেন? নেই নাকি? স্টক থেকে সটান মাল চুরি করে বিক্রি করেচে তাহলে আশিস ব্যাটা। হাতের কাজগুলো সেরে এখুনি গিয়ে স্যারকে বলতে হবে।

অ্যানাটমি আর ফরেন্সিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে রোটেশনাল বেসিসে ডিউটি রোস্টার হয় মরচ্যুয়ারি অ্যাসিস্টেন্টদের। ট্রমা কেসগুলোর বীভৎসতা তো থাকেই, টক্সিকোলজিও কম যায়না। এতদিন ধরে কাজ করার পরও নিরাপদ তাই অ্যানাটমিতে বেশী স্বচ্ছন্দ। দুই মাস আগে পয়জনিং কেস এসেছিলো একটা; অল্পবয়সী মেয়েটির ইউট্রাস ওপেন করার পর সেকেন্ড ট্রিমেস্টার ফিটাস পাওয়া গিয়েছিলো। সেই রাতে ঘুমোতে পারেনি সে। নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকতো দিনের পর দিন। কাকে অভিশাপ দিত কে জানে?

যেইদিন থেকে আশিস নামে ছোকরাটি কনট্র্যাকচুয়াল বেসিসে জয়েন করেছে, তবে থেকে সে নিরাপদ'র চক্ষুশূল। দুই একদিন বিড়ি খৈনী দিয়ে ভাব জমাতে এসেছিলো, পাত্তা দেয়নি একদম। কেমন যেন একটা হাঁ হাঁ করে গিলতে আসা ব্যাপার আছে ছোকরার কটা চোখ দুটোর মধ্যে। চাপে রাখার জন্যই বোধহয় নিজে অ্যানাটমিতে থেকে নিরাপদ বারবার ফরেন্সিকের ডিউটিতে ঠেলে পাঠায় ওকে।

সপ্তাহের পাঁচদিন, সোম থেকে শুক্র, আলাদা আলাদা ল্যাব। মাসক্যুলো-স্কেলেটাল, কার্ডিও-ভাস্কুলার, গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টিনাল, রিপ্রোডাক্টিভ-এন্ডোক্রাইন আর নার্ভাস সিস্টেম। ব্যাচের পর ব্যাচ ছেলেমেয়ে আসে সকাল থেকে। অবিশ্রাম ডেমনস্ট্রেট করে যেতে হয় টিউটরদের। নিরাপদ'র নাওয়া খাওয়ার সময় থাকেনা খুব একটা। ক্লাসের পর অন্য কাজও থাকে। নতুন বডিগুলোর এমবামিং, পুরোনো শুকনো আমসি হয়ে যাওয়া গুলোর থেকে বোনস আলাদা করে রাখা... সেইগুলো ধরে ধরে গুছোনো, বিশ্রামের অবকাশ নেই

সারাদিন। পরীক্ষার সময়ও স্পেসিমেন স্যাম্পল রেডি করার থাকে, ভাইভার সময়ে স্যারদের প্রশ্ন অনুযায়ী ডিসপ্লে করতে হয়। যন্ত্রের মতো কাজ করে চলে সে। স্যাররা বলাবলি করেন, হুজ নেক্সট? নিরাপদ'র রিট্যায়ারমেন্টের পর কে সবকিছু সামলাবে? দিনের পর দিন চিঠি-চাপাটি করেও তো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছেনা। নীলরতনে মাস্টার্স ডিগ্রি হোল্ডাররা ডোমের চাকরিতে এপ্লাই করার পর কিছুদিন হইচই হয়েছিলো, তারপর তো সেসব থিতিয়ে গেছে একেবারে। একজনও কেউ পার্মানেন্টলি জয়েন করলে কাজকর্ম শিখে নিতে পারতো। আশিস তবুও ফরেন্সিক সামলাচ্ছে, অ্যানাটমির কি হবে?

নানারকম ভাবনাচিন্তায় মশগুল হয়ে নিজের চেম্বারে বসেছিলেন উপায়ন। ল্যাপটপে খোলা কয়েকটা সাইট। কি দুর্ধর্ষ বানিয়েছে বিদেশি ইউনিভার্সিটিগুলো। এবার থেকে তো বাড়িতে বসে, ট্যাবেই স্টুডেন্টরা শিখে ফেলতে পারবে সব। এর ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে হুড়োহুড়ি করে ডিসেকশন টেবলে অ্যানাটমিকাল প্রসিডিওর দেখতে আসবেনা, অনলাইনেই হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে কি ঠিকভাবে শেখা সম্ভব? নিজের হাতে না ঘাঁটতে পারলে নার্ভাস সিস্টেমের কমপ্লেক্সিটি তো বোধগম্যই হবেনা। চিন্তার জাল ছিন্ন হলো দরজার কাছ থেকে ডাকে। আশিস উঁকি–ঝুঁকি মারছে।

-"স্যার?"

-"হ্যাঁ বলো।"

-"কতগুলো স্পেসিমেন আনার জন্য রিক্যুইজিশন লিখে দিন না; ফরেন্সিক থেকে নিয়ে আসি।"

-"কী কী লাগবে বলো? আর ভালো জিনিস আনবে, নইলে ক্লাসে অসুবিধা হয়।" কি-বোর্ডে খটাখট করতে করতে বললেন হেড।

এগিয়ে দেওয়া কাগজের স্লিপটা নিতে গিয়ে অবাক হয়ে যেতে হলো। লম্বাটে আঙুলের নখগুলোতে অদ্ভুত কয়েকটা সবজেটে রঙের স্ট্রিক, যা ওর কমপ্লেশনের সাথে খাপ খায় না একেবারেই। খেয়াল করা হয়নি আগে।

-"আশিস, আমি লিখে দিচ্ছি, একবার ডার্মা তে গিয়ে দেখিয়ে নাও তো মৃদুল স্যারকে। নখের এই অবস্থা কবে থেকে হলো?"

-"ও আমার জন্ম থেকেই আছে স্যার, চিন্তা করবেন না একদম।" মাড়ি বের করে আকর্ণবিস্তৃত হাসলো সে। উপায়ন লক্ষ করলেন, গাঁট্টাগোট্টা শ্যামলা চেহারার ছেলেটির কানের উপরিভাগ বেশ ছুঁচলো। ছোটবেলায় স্টারট্রেক সিরিয়ালের সেই ক্যাপ্টেন স্পকের মত অনেকটা।

বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল। মধ্য পঞ্চাশে এসে নিত্যদিনের এই মোনোটনি আর সহ্য হচ্ছেনা। নিজের ভালো লাগতো বলে একসময়

জেদ ধরে স্পেশালাইজেশন করেছিলেন অ্যানাটমিতে, কিন্তু পেশেন্ট হ্যান্ডল করতে না পারলে কিসের আর ডাক্তারি পড়া? কেউ তেমন গাইডও করেনি সেইসময়, নইলে আরেকবছর চেষ্টা করলে হয়তো মেডিসিন-সার্জারি-গাইনি যে কোনো একটা পেয়েই যেতেন। ফার্স্ট প্রফেসনালের পর হবু ডাক্তাররা আর এই পথ মাড়ায়না। হাসপাতালের মধ্যে কোথাও দেখা হলে হালকা একটু উইশ, তার বাইরে কোনো রেগগ্নিশন নেই। অন্য কলেজ থেকে যে কলিগরা আসেন ভাইভা নিতে, তাঁদের ফ্রাস্ট্রেশনের চূড়ান্ত লেভেলটা বোঝা যায় পরীক্ষার সময়। যেন যাবতীয় ক্ষোভ বারংবার উগরে দিতে থাকেন বাচ্চাগুলোর ওপর। তাঁর স্টুডেন্টরা অবশ্য প্রথম দিন থেকেই বকুনির চোটে সিজনড হওয়া শুরু করে দিতে থাকে। ঝটাপট তাই উত্তরগুলো দিতে পারে অনেকেই।

উপায়ন আনমনে জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন, দেখলেন বি.সি রয় অ্যানেক্স থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে যাচ্ছে আশিস। পিছনে কাটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ওর পোষা কুকুরটা। পরক্ষণেই আবার দরজার ক্যাঁচ করে আওয়াজ। পার্মিশন না নিয়ে একজনই আছে যে তাঁর ঘরে ঢুকতে পারে অবলীলায়।

-"স্যার গ, আমায় জবাব দ্যাও এবার। আর পারছিনি কো। সব স্টক ফাঁকা করে দিলো হারামির বাচ্চাটা।"

-"আঃ, কী হচ্ছেটা কী নিরাপদদা? মুখ খারাপ করছো কেন? তোমায় যে বলেছিলাম ওকে দায়িত্ব ছাড়ো খানিকটা, তুমি সব আগলে বসে থাকলে চলবে কি করে?"

-"তমায় হাতে ধরে কাজ শিকিয়েচি, তমায় বলবুনি তো আর কারে বলব? অই বেজন্মার ব্যাটাই লিচ্চয় এমার্জেন্সির বডি থেকে হার্ট তুলে এনেছিলো। আমি পার্মেন্ট স্টাপ, আমায় ধরে পুলিশ হুজ্জুতি করবে আর ছেড়ে কতা কইতে হবে? কেন বলো দিকি? কী দাসকত লিকি দিইচি তমাদের কাচে?"

-"ছাড়ো তো, ওটা সামলে নেওয়া গেছে। আমি তো আছি, না কি? অত চিন্তা তুমি কোরো না। যাই হোক, কী কী স্পেসিমেন সরলো বলো দেখি?"

উল্টোদিকের একটা টুলে বসে কিছুক্ষণ বকরবকর করতে থাকলো মানুষটা। আর পড়াশুনো করা মাথায় উঠলো ডক্টর উপায়ন সরকারের। টেবলের ওপর পড়ে থাকা মোবাইলটা তুলে নিলেন, এক্ষুণি একটা কল করা দরকার যে ফরেন্সিকের হেডকে।

জানুয়ারির শুরুতে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে কলকাতায়। বিকেলে মিঠে রোদ্দুর কমে এলেই ঠান্ডা মালুম হয়। কলেজ স্ট্রিটে চায়ের

দোকানগুলোতে দাঁড়িয়ে আগুনের তাপে নিজেদের সেঁকে নেয় মানুষজন। বইপাগল যেমন আছে, তেমন আছে স্টুডেন্টদের ভিড়। প্রেসিডেন্সি, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে এলে দেখা মেলে পেশেন্ট পার্টির। শয়ে শয়ে। ওষুধের আর সার্জিকাল ইনস্ট্রুমেন্টস এর দোকান, খানিক এগিয়ে সারি সারি প্লাম্বিং শোরুম।

মেট্রো থেকে নেমে শিবমন্দিরের রাস্তাটা ধরলো মইদুল। কমপ্যারাটিভলি একটু ফাঁকা থাকে এটা, ধাক্কাধাক্কি কম হয়। হোস্টেলে বন্ধুরা টোন টিটকিরি কাটছিলো বেরোনোর আগে, 'ব্যাম্বির বইয়ের ধ্বক উঠেছে" বলে। লম্বা বাঁশের মতো চেহারা বলে যাদবপুরের সবাই ওকে ওই নামেই চেনে। সপ্তাহের মিনিমাম চারদিন এই 'ধ্বক'টা ওঠেই। বইয়ের গন্ধ না পেলে রাতে ঘুমই আসেনা, সেটা পাগলরা বুঝলে হয়। আজ বই দেখা ছাড়াও আরেকটা কাজ আছে। কয়েকদিন ধরেই মনের ভেতরটা বড্ড কু ডাকছে যেন। ঈশানের থেকে চেয়ে নিয়ে আসা নম্বরটায় কল লাগাতে হবে। পৃথ্বীশ। অর্যমার ব্যাচমেট। কয়েকটা কথা ওর সাথে আলোচনা করার বড্ড দরকার। ঈশানকে যদিও কিচ্ছু বলা যায়নি, যা মাল... হয়তো হাঁউ মাঁউ করে স্বর্ণময়ীতে এসে বডি ফেলে দেবে।

নানারকম চিন্তা করতে করতে বিড়িটা ধরিয়ে একমনে হাঁটছিল সে, রাস্তার বাঁপাশ ধরে। মাসখানেক আগে কেনা পুরোনো বইটাতে যা লেখা আছে, সেটা যদি এক শতাংশও সত্যি হয়, তাহলেও সমূহ বিপদ। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের উলটো মুখটায় পৌঁছে খানিক থমকে দাঁড়ালো সে। না, আগে হোস্টেলে খোঁজ করা দরকার, বই পরে কেনা যাবে। বিবি রোজিও লেন ধরে বাঁদিকে ঘুরতেই মেন বয়েজ হোস্টেল। নীল রঙের ইউ প্যাটার্নের চারতলা বিল্ডিং। নীচে দাঁড়িয়েই ফোনটা বের করলো পকেট থেকে।

তিনবার অনেকক্ষন ধরে বাজার পরেও যখন ওপার থেকে কোনো রেস্পন্স পাওয়া গেলো না, মইদুল বুঝতে পারলো, নির্ঘাৎ পৃথ্বীশ ফোন সাইলেন্ট করে ঘুমোচ্ছে। একটা মোটাসোটা ছেলে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছিলো, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে রুম নম্বরটা জেনে নিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠতে লাগলো সে।

হোস্টেল সবজায়গায় যেমন হয়, তেমনি। পিলারের সাথে দড়ি বাঁধা, সারি সারি জামাকাপড় শোকাচ্ছে। মশার ধুপের গন্ধ ভেসে আসছে দরজা আধভেজানো ঘরগুলোর ভিতর থেকে। কোণে ডাঁই করে রাখা ভাঙা আসবাবপত্র, পুরোনো বই। টয়লেট থেকে ঝাঁঝালো বাতাস বেরিয়ে এসে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

তিনশো বাইশ নম্বর ঘরটা একটেরে, করিডোরের একদম শেষ

প্রান্তে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, পিছনে কেউ আসছে। ঘুরে তাকালো মইদুল। একটা ছায়া মতো কেউ যেন ঝট করে সরে গেলো ডানদিকে সিঁড়ির ধারে।

অসময়ে পৃথ্বীশের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে সে খানিকক্ষণ ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইলো মইদুলের দিকে। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে ক্যান্টিনে ফোন করলো দুই কাপ চা আর ভেজিটেবল চপ আনার জন্য। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে গুছিয়ে বসলো দুজনে।

পঞ্চম পর্ব

ঘড়ির কাঁটা প্রায় রাত দেড়টা ছুঁয়েছে। যথারীতি ঘরে নেই নৈঋতা, কোথায় আড্ডা দিচ্ছে কে জানে? কী করে যে ফার্স্ট প্রফেসনাল পাস করবে মেয়েটা, চিন্তা হয় মাঝে মাঝে। বেডে আধশোয়া হয়ে রবিন্স আর কট্র্যানের মেডিকাল প্যাথলজির পাতা ওল্টাচ্ছিলো অর্যমা, গায়ে পাতলা কম্বলটা জড়িয়ে। মাঝে মাঝে ব্ল্যাক কফিতে চুমুক। জেনারেলি পড়ার সময়ে সে ফোনের ডেটা সুইচ অফ করে রাখে, নইলে কনসেন্ট্রেট করতে অসুবিধা হয় বড়। আজ ভুলে গিয়েছিলো বলেই টুং করে নোটিফিকেশনের আওয়াজে চমকে উঠলো। কয়েকটা অনলাইন জার্নালের সাবস্ক্রিপশন করা ছিলো, তার একটাতেই খবরটা ভেসে এলো। হেডলাইন বলছে, সার্স কোভিড ইনফেকশন স্প্রেডিং র‍্যাপিডলি অল ওভার চায়না। সাস্পেক্টেড ওরিজিন ফ্রম আ ওপেন মার্কেটপ্লেস ইন উহান ডিস্ট্রিক্ট। ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো ঈশানকে।

-"পড়ছিস নাকি রে?"

-"হ্যাঁ, এই বসলাম খানিক আগে। ব্যাম্বি এসেছিলো, ভাট বকে গেলো দুঘন্টা ধরে। আজ দেখা হয়েছে নাকি তোর সাথে? কলেজ স্ট্রিট গিয়েছিলো বলছে।"

-"কই না তো। অবশ্য আমি ল্যাবের পর রুমে এসে ল্যাদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আচ্ছা শোন না, বিষাণদা কোন ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক রে? চেং কুং ন্যাশনাল বোধহয়, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাইনানে। কেন রে?"

"ফোন করেছিলো কি কয়েকদিনের মধ্যে? তুই চায়নার খবরটা শুনেছিস?"

মেন বয়েজ হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে চুপচাপ একটা সিগারেট ধরিয়েছে পৃথ্বীশ। আজ সে একা, রুমমেট বাড়ি গেছে। ব্যাম্বির কথাগুলো একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। গুগল করে দেখে নিয়েছে,

সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রোম ভাইরাসটার জুওনটিক কন্ট্যামিনেশনের ফলে ২০০৩ আর ২০১২ তে আউটব্রেক হয়েছিলো বটে, তবে সেটা খুব ম্যাসিভ আকারে নয়। ব্যাম্বির মতে, ও যে পুরোনো বইটা খুঁজে পেয়েছে, সেটার টাইমলাইন অনুযায়ী, এর পর ২০২০-২১ নাকি অত্যন্ত বাজে সময়। ভাইরাস অ্যাটাকটা নাকি পৃথিবীর জনসংখ্যা বহুল পরিমানে কমিয়ে দেবে, স্পষ্ট লেখা আছে। ও শিওর, কারণ ওর মতে বইটা সেই প্রাচীন ইজিপশিয়ান বুক অফ দ্য ডেড-এর ওপর একটা ক্রিটিকাল রিভিউ। শুরুতেই হিব্রুতে যে ভার্সটা আছে, তা নিঃসন্দেহে আনুবিসের বন্দনা। আর লেখা আছে, স্বয়ং মৃত্যুর দেবতা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন প্রসাদ গ্রহণ করতে।

দরজায় নক করলো কেউ। এত রাতে কে রে বাবা? বিছানা থেকে নেমে স্লিপারটা পায়ে গলাতে গিয়ে আলপটকা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সে, মাথাটা দম করে ঠুকে গেলো বেডের পায়াতে। প্রচন্ড আঘাতের ফলে চুলের ভিতর দিয়ে ব্লাড ড্রিপ করতে শুরু হয়েছে, শুধু এইটুকে টের পেলো সে। চোখে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে যখন, দেখলো ফোনটা বাজছে। স্ক্রিনে অর্যমার নাম। আর খুট করে কিভাবে যেন খুলে গেছে রুমের দরজাটা। ঠেলে ঢুকছে বাটা, পিছনে আরো একজন কেউ। কালো একটা আলখাল্লার মতো ড্রেস পরণে। মাথা হুড দিয়ে ঢাকা, মুখ দেখা যাচ্ছেনা।

নীলরতনের মণিদা সেইদিন যে খবরটা দিয়ে গেলো, তার পর থেকে অদম্য কৌতূহলে কেটেছে মাঝের কটা দিন। হঠাৎ করে উপায়ন স্যারের কাছে ছুটি চাইতে গেলে যদি সন্দেহ করে, তাই দিন তিনেক আগে থেকেই নিরাপদ বলে রেখেছিলো, ফাঁক পেলে দেশের থেকে আসা ভাইপোর সাথে দেখা করতে বেহালা যাবে। আজ তাই শিয়ালদহ থেকে বজবজ লোকালে মাঝেরহাট, তারপর রিমাউন্ট রোডের মোড়ে বাস থেকে নেমে সে অটো ধরলো একটা। কাঁটাপুকুর স্টাফ কোয়ার্টারের কাছে নামিয়ে দিতে বলে, চুপচাপ চেয়ে রইলো বাইরের দিকে। এ যেন কলকাতার ভিতরে এক অন্য কলকাতা। যে একবারও না এসেছে, সে কল্পনাতেও আনতে পারবেনা কি অদ্ভূত বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে গোটা চরাচর জুড়ে। ট্রাকের সাইডিং, অনন্ত লাইন লেগে আছে যানবাহনের। শীত শেষের রুক্ষ মাটির থেকে ধুলো উড়ছে, পেট্রোল ডিজেলের ধোঁয়ায় চোখে জ্বালা ধরে যাওয়ার জোগাড়।

খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না ভিখুজীর ঘর। শতচ্ছিন্ন একটা চাদর গায়ে, দরজায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন তিনি। সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই ঘোলাটে চোখগুলো জ্বলে উঠলো।

-"মণি পাঠালো তো?"

-"হঁ গো দাদা। শোনা ইস্তক ছটপট করে মরতিচি। খপরটা ভালো করে জেনে শুনে নিয়ে বড় ডাগদারকে না বলা অব্দি স্বস্তি পাচ্চিনাকো।"

হড়হড় করে সবটুকু উগরে দিলেন বৃদ্ধ। বেহালার এক নামকরা ডাক্তার বাড়ির কেচ্ছা। ড্রাইভারের সাথে মালকিনের অবৈধ সম্পর্কের জেরে জন্ম নেওয়া এক শিশুপুত্রের গল্প। তারপর তাকে অবলীলায় নিঃসন্তান মেড সার্ভেন্টের কোলে ফেলে দিয়ে সতীসাধ্বী সেজে ভদ্রমহিলার আবার প্রবাসী স্বামীর ঘর করতে বম্বে চলে যান। সেই ড্রাইভারও হাতে কিছু কাঁচা টাকা পেয়ে একটা ট্রাক কিনে কলকাতার বাইরে সটকে পড়ে রাতারাতি। আর যে বুকে করে তাকে বড় করে তুললো, শিশুটির সেই পালক পিতা একসময় অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলো ভিখুর। দুজনেই কাঁটাপুকুর মর্গের কর্মী। নেশার চোটে একদিন সব সত্যিটাই বেরিয়ে এসেছিলো বমির মত করে। যেদিন, বাবার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ডিউটিতে গিয়ে, একখান অ্যাক্সিডেন্ট কেস পোস্টমর্টেম করতে হয়েছিলো ছেলেটিকে নিজের হাতে। ডাক্তার চেয়ারে বসে অর্ডার করছিলেন শুধু। পার্টির থেকে ছেলে মালকড়ি ঠিকমতো চাইতে পারবে কিনা বডি ছাড়ার আগে, সেই সন্দেহে মর্গে পৌঁছে গিয়েছিলো বাবা। বডির মুখের ঢাকা সরাতেই ছিটকে সরে আসে তিনহাত। "কী করলি রে বাপ? এ কাকে কাটলি নিজের হাতে?"

নিজের জন্মদাতার শরীর পোস্টমর্টেমে কাটাছেঁড়া করেছে শুনে নাকি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো আশিস। জন্ম থেকে তাকে লালন-পালন করা মা-বাবার কোনো কথা না শুনে বাড়ি থেকে একেবারে ছিটকে পালিয়ে গিয়েছিলো বছর দুয়েকের জন্য। বুড়ো বুড়ি কেঁদে কেটে হয়রান। তারপর হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হয় আবার, চেহারা আর আচার ব্যাবহারের মধ্যে অদ্ভূতরকমের সব পরিবর্তন নিয়ে। নানারকম চাপ দিয়ে বেহালার সেই ডাক্তার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করে আবার। সেখানে গিয়ে কী করেছিলো কেউ জানেনা, তবে কনট্র্যাকচুয়াল বেসিসে মেডিক্যাল কলেজে একটা কাজ পেয়েই রাতারাতি হাওড়ার ভিতরদিকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় মা বাবাকে। নিজে কোথায় ডেরা বেঁধে আছে এখন কাউকে কখনো বলেনি। মাঝে মাঝে কাঁটাপুকুরে দেখা যায় তাকে, মর্গের আশপাশে একা ঘুরঘুর করতে। একটা লেজকাটা কুকুর সাথে থাকে সবসময়, বিড়বিড় করে তার সাথে কি কথা বলে ভগবান জানেন। আর পরিচিত মুখ দেখলেই না চেনার ভান করে পালায় সবসময়।

পৃথ্বীশের যখন জ্ঞান ফিরলো, প্রথমে বুঝতে পারেনি কোথায় আছে সে। মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা। ধোঁয়ায় ভরা একটা উষ্ণ অঞ্চলের মধ্যে

শুয়ে আছে সে, হাত পা বাঁধা অবস্থায়। অদ্ভূত লালচে আলোয় ভরা চারদিকটা, উৎসটা যে কি তা বোঝা দায়। পচা মাংসের গন্ধে গুলিয়ে উঠছে গা। ঘাড়টাকে কাত করেই চমকে উঠলো সে। পাশেই পাহারা দেওয়ার ভঙ্গিতে থাবা বিছিয়ে বসে আছে একটা বিশাল কুকুর। জিভ বের করা, তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত দেখা যাচ্ছে। আধো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ চোখগুলো জ্বলছে। চিৎকার করতে গিয়েও পারলোনা সে, মুখটা লিওকোপ্লাস্ট দিয়ে আটকানো। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কেউ এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লো মুখের ওপর। বাটা, বৈদুর্য্য চ্যাটার্জি। শ্লেষের হাসি হাসছে দাঁত বের করে। কাউকে উদ্দেশ্য করে বললো, "বোড়ে আমাদের কব্জায় ব্রো, রাণীও দ্যাখো ঠিক চলে আসবে শিগগির। শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা।"

গোঁগোঁ করে ভয়ার্ত একটা বোবা আওয়াজ বেরোলো পৃথ্বীশের গলা দিয়ে। মাথার ওপর যেন অন্ধকার থেকে নেমে আসছে চকচকে বিশাল এক দাঁড়িপাল্লা। এতক্ষণ বোঝা যায়নি, দূরে হাঁটু গেড়ে বসে কালো আলখাল্লা পরনে একসারি লোক অদ্ভূত উচ্চারণে শুরু করলো কিছু মন্ত্রোচ্চারণ। আর বাটার পাশে এসে দাঁড়ালো লম্বা চওড়া অদ্ভূতদর্শন মূর্তি, মুখে একটা মুখোশ। শেয়ালমুখ এমন নিখুঁত মুখোশ কেউ আগে কোথাও কখনো দেখেনি।

ষষ্ঠ পর্ব

পরপর দুইদিন পৃথ্বীশকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে অর্যমা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। ফোন বন্ধ, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ লাস্ট সিন দেখাচ্ছে পরশু রাত একটায়। হোস্টেলের কেউ কিছু বলতে পারছেনা। আসানসোলের বাড়িতে কিছু ইমার্জেন্সি ঘটলো নাকি? সেখানের কারুর নম্বর তো জানা নেই। মিনিমাম একটা খবর তো দেবে রে বাবা। ঈশানকে জানাতে, সেও বেশ থমকে গেলো কিছুক্ষণ। বললো, ক্লাসগুলো সেরে নিয়ে, সন্ধ্যার দিকে চলে আসবে কলেজ স্ট্রিট।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকে গিয়ে গার্জেনের ফোননম্বর যোগাড় করে ফোন করে দেখবে কিনা, এইসব নানারকম ভাবতে ভাবতে স্বর্ণময়ীতে ফিরছিলো যখন, হঠাৎ করেই কেউ যেন পিছন থেকে ডাক দিলো তাকে।

-"কি গো দিদিমুনি, তোমরা তো আর এলেনি আমার কাছে? গপ্প শুনবা না?" ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা ধরা গলায়, নিরাপদদা। আর থাকতে না পেরে নিজের দুর্ভাবনার পুরোটা বলে ফেললো অর্যমা। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে নিজের মনে কিসব কথা বলতে বলতে চলে গেলো পিছন ফিরে।

মানুষের জীবনে এমন এক-একটা দিন আসে, পুরোটা যেন আগাগোড়া বিষণ্ণতায় মোড়া মনে হয়। কোত্থেকে যেন বুকফাটা একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু এতটাই নর্মাল একটা জিনিস যে কোনোদিন আলাদা করে সেটা নিয়ে ভাবার অবকাশ পায়না কেউ। স্ট্যাটিস্টিক্স-এর পোঁয়াসো ডিস্ট্রিবিউশন। সাইরেন বাজাতে বাজাতে একটা অ্যামবুলেন্স ঢুকলো গেট দিয়ে। অর্যমার ইচ্ছে করছে দুহাতে নিজের কানগুলো চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে যায় হাসপাতালের এই চৌহদ্দি থেকে।

হাতঘড়িতে দুপুর সাড়ে তিনটে। স্কোয়্যারে গিয়ে বসলে কেমন হয়? একটু গরম লেবু চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছা করছে খুব। জলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ খানিক বসলে হয়তো একটু ভালো লাগতে পারে। কিন্তু জায়গা পাওয়া যাবে কি আদৌ? একটা বেঞ্চে তিনজোড়া করে কাপল বসে থাকে সবসময়। ট্রাই নিয়ে দেখা যাক, এইসব ভেবে কলেজ স্ট্রিটে বেরিয়ে এলো সে।

কেউ যেন নাম ধরে ডাকছে পিছন থেকে। খানিক অবাকই লাগলো তাকিয়ে। চেকচেক একখানা সোয়েটার আর উঁচু করে পরা ঢোলা জিন্সে, ক্লাসমেট বাটা। চশমার ফাঁক দিয়ে সেই অত্যন্ত ইরিটেটিং, ইডিয়টিক দৃষ্টিতে তাকানো। বেশ বিরক্তি লাগলো অর্যমার। নিশ্চয়ই নৈঋতার ব্যাপারে কথা বলবে।

-"কি ব্যাপার? ডাকছিস কেন?"

-"কোথাও যাচ্ছিস?"

-"কেন বল তো? কি দরকার?" বেশ রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করলো অর্যমা।

-"তোকে একটা জিনিস দেখানোর ছিলো। ফার্মা ক্লাসে মেন হোস্টেলের কয়েকজনকে পৃথ্বীশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলি যেন শুনলাম।"

-"হ্যাঁ? তো? তুই কিছু জানিস? তাহলে সেটা ক্লাসেই দেখালিনা কেন সবার সামনে?"

-"না না, একটু কনফিডেনশিয়াল বলে তোকে আলাদা করে ডাকলাম"... বলতে বলতে জিন্সের পকেট থেকে ফোন বের করলো বাটা।

-"এই দ্যাখ।"

হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করা একটা গুগল ম্যাপ লোকেশন। পৃথ্বীশের নম্বর থেকে পাঠানো। তার আগে বা পরে আর কোনো মেসেজ নেই। আর কাউকে না পাঠিয়ে শেষ অব্দি বাটা কে?

-"আমি জানি তুই কি ভাবছিস। লোকেশনটা ভালো করে দ্যাখ। হোস্টেল পাওয়ার জন্য বম্বের অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম, আমার বাড়ি কিন্তু

ওর খুব কাছে, বেহালায়। পৃথ্বীশ জানে। তাছাড়া ওই চত্বরে মম ড্যাড-কে চেনে না এমন বিশেষ কেউ নেই। দুজনেই নাম করা। ইউরোলজিস্ট আর গাইন্যাক, বুঝলি তো?" যথারীতি নিজের পেডিগ্রির ঝাঁপি খুলে ফেললো বৈদূর্য্য।

মাথা গরম করবেনা ঠিক করলো অর্যমা। পৃথ্বীশকে খুঁজে পেতে হলে এই মালটার সাহায্য নিতেই হবে। তাই মিনিট পনেরোর মধ্যেই রেডি হয়ে বেরোবে বলে বাটাকে একটু ওয়েট করতে বললো সে। বেশ ঠান্ডা লাগছে, ইমিডিয়েটলি হোস্টেল ফিরে একটা সোয়েটার চাপানো দরকার গায়ে। ঈশানকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলো দরজায় চাবি লাগানোর সময়। তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছে যখন, ইডেন হস্পিটালের সাইডের দিকে নৈঋতার সাথে দেখা। চিরকালীন নার্ভাস টাইপ গাইনির মধুরিমাদিকে কিছু বলছে হাত পা নেড়ে, আর কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট নিয়ে শুনছে দিদিটা। তাকে দেখে একবার হাতটা নাড়লো শুধু। হোঁৎকার সাথে ওর গাড়িতে চেপে কোথাও যাচ্ছে দেখলে কি ভাবতো কে জানে?

হন্ডা সিটি-টা সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরলো। বড্ড জ্যাম অফিস ফেরৎ রাস্তায়। টুপি-উর্দিধারী ড্রাইভার চালাচ্ছে ধীর গতিতে। ধুলো ধোঁয়ার জন্য কাঁচ তোলা। পিছনের সিটে বাইরের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল হলো, একদম কম ভলিউমে যেটা বেজে চলেছে গাড়ির মধ্যে, সেটা কোনো পরিচিত গান নয়। একঘেয়ে একটা সুর, খেয়াল করে শুনলে ইংরেজিতে লিরিকস গুলো অনেকটা এইরকম -

To thou whose work is the care for the dead, I offer my praise.
O god of the graveyard, great god of the tomb, preserver of Osiris, protector of Horus the child,
Bearer of the scale, counter of hearts, balancer against the feather of Ma'at, you lead us into the Duat,
The life after life in which we may dwell in peace and plenty, in which we may be reborn among those we have loved,
Our dearest ones in whose steps we hope to follow, to whose arms we hope to return. O guardian and guide of souls,
O foremost of the Western gods, who lead us into the necropolis, who carries us from world into world,
Anubis who opens that sacred way, Anubis who is ancient of

name and ancient of might,
Speaker of spells and granter of breath, O friend of the departed; I thank you for your many gifts.

-"গাড়িটা থামা বৈদূর্য্য। এক্ষুণি সাইড করতে বল"... খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো অর্যমা। তার দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে গা জ্বালানো একটা হাসি হাসছে বাটা। ড্রাইভারটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হলো আরেকবার। কটা চোখগুলোতে শেয়ালের ধূর্ততা। আশিসদা, ফরেন্সিক মেডিসিনের মরচ্যুয়ারি অ্যাসিস্টেন্ট। ওঠার সময় নানা চিন্তায় মুখটাও দেখা হয়নি ভালো করে। বাটার সাথে এখানে কী করছে?

ব্যাম্বি, অর্থাৎ মইদুল, ঈশানের কাছে খবরটা শুনে এক মুহূর্ত আর দেরি না করে একটা উবার বুক করে নিলো ফোন থেকে। ওকে অতটা টেন্সড হতে কখনো দেখা যায়নি। নার্ভাস ভঙ্গীতে শুধু মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছে ফোনে। ঈশান যতবারই কারণ জিজ্ঞেস করে, ব্যাটা পাঁকাল মাছের মত পিছলে এড়িয়ে যায়। ক্যাব যখন টালিগঞ্জ ক্রস করছে, একটা ফোন এলো হঠাৎ। এপারের কথোপকথনটাই শুধু কানে এলো ঈশানের।

-"হ্যাঁ স্যার, বেরোচ্ছেন তো?"

-"নিরাপদদাকে বলুন, ও চেনে বললো রাস্তাটা।"

-"বুঝতে পারছিনা; আমি কিন্তু বারংবার পৃথ্বীশকে বলে এসেছিলাম সাবধান হতে। ঠিক আছে, রাখছি। আমরা হয়তো আগে পৌঁছে যাবো, হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন করে নেবো, আপনারা আসুন।"

আর থাকতে পারলো না ঈশান। তার চাপের কাছে বাধ্য হয়ে নতিস্বীকার করতেই হলো ব্যাম্বিকে। সবটা বলতে হলো, পুরোনো বইটার কথা, সেইদিন কফি হাউসে অর্যমাকে দেখে সেই আনক্যানি ফিলিং, ডক্টর উপায়ন সরকার এবং নিরাপদ মাহাতোর সাথে আলাদা করে দেখা করে কথা বলা... পৃথ্বীশকে সাবধান করা, কিচ্ছু বাকি রাখলো না।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা অনুসারে, আনুবিস হলেন সমাধিসৌধ, মৃত্যুপরবর্তী জীবন এবং মমির দেবতা। সহজে চেনার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন বিদ্যমান তাঁর মধ্যে। অধিকাংশ দেবতাদের মতো তাঁর দেহ মানুষের, কিন্তু ঘাড়ে বসানো শিয়ালের মাথা। পেশিবহুল শরীরের রঙ মিশকালো। তাঁকে প্রায়শই একটি আসনে বসা অবস্থায় কল্পনা

করা হয়। তিনিও নিজের চেহারা বা আকৃতি মুহূর্তেই পরিবর্তন করতে পারেন। মৃত ব্যক্তিকে মর্ত্যলোক থেকে মৃতদের দেশে নিয়ে যাওয়ার পথে নিরাপত্তা দেন তিনি। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো, মালিক বা প্রভুর মৃত্যুর পর তার হয়ে আনুবিসের কাছে সুপারিশ করে কুকুর। সে কারণে মৃতদেহের সাথে কুকুরেরও সমাধি দিত তারা, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে পিরামিডের ভিতরে খননকার্য থেকে। আনুবিসের কাজ হলো মৃত মানুষের আত্মা সংরক্ষণ করা। পুরোহিতদের মাধ্যমে প্রথমত তিনি দেহ সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ করেন। তার প্রথম পর্বে, মৃত্যুর পর প্রথম চল্লিশটি দিন একটা পাথরের স্ল্যাব-এর ওপর শুইয়ে লবণ দিয়ে মৃতদেহকে ভিজিয়ে রাখা হতো। তারপর পঁয়তাল্লিশ রকম রাসায়নিক দ্রবণের সাহায্যে সেই দেহ সংরক্ষণ করা শুরু হত। দেহ থেকে লিভার, কিডনী, ফুসফুস ইত্যাদি সব ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে নেওয়ার পর, কেবল হৃৎপিণ্ড রাখা থাকত তার নিজের জায়গায়। তারপর দেহ নিয়ে যাওয়া হত সমাধিস্থলে।

মিশরীয় ধর্ম অনুসারে মানবদেহ মৃত্যুর পরে জেগে উঠতো। আনুবিস সমাধিতে গিয়ে মৃতের চোখ খুলে দিতেন। মৃতব্যাক্তি জেগে প্রথমেই দেখতো সামনে আনুবিস দাঁড়িয়ে আছেন। তখনে সে কোনো কথা বলতে পারতো না। আনুবিস তারপর ধীরে ধীরে তার কান ও মুখ খুলে দিতেন। এতে করে ব্যাক্তিটি পুনরায় কথা বলতে ও শুনতে পারার ক্ষমতা ফিরে পেত। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হতো দেবতা ওসিরিসের কাছে, যিনি ছিলেন আনুবিসের জন্মদাতা। কথিত আছে, ওসিরিসের টুকরো হয়ে যাওয়া মৃতদেহকে জোড়া লাগিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং পুত্র আনুবিস; এমন সেটিই মিশরের প্রথম মমিফিকেশন। ওসিরিস মৃত মানুষটির সারা জীবনকালে কৃতকর্মের বিচার করতেন। একটি দাড়িপাল্লার একদিকে মৃতের আত্মা (মিশরীয়রা আত্মা বলতে হৃদয়কেই বোঝাতো) রাখা হতো এবং অন্যদিকে রাখা হতো একটি পালক। যদি আত্মার ওজন পালকের ওজনের সমান না হতো, সেই ব্যাক্তিকে তক্ষুণি আত্মাসমেত ধ্বংস করে ফেলা হতো। আর যদি পালক আর আত্মার ওজন সমান সমান থাকে তাহলে তাকে দেওয়া হতো অনন্ত জীবন কিংবা আকাশের নক্ষত্র হয়ে যাওয়ার মতো সম্মান। সেইখান থেকে ব্যাক্তি দেখতে পেতো পৃথিবীবাসীকে। আত্মাসমেত ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত ছিলো আমিত নামের এক ভয়ানক প্রাণী। কুমিরের মতো মুখ, সিংহের মতো শরীরের মাঝের অংশ আর জলহস্তীর মতো পিছন ভাগ, এই সংমিশ্রণে তৈরি হিংস্র প্রাণীটি আনুবিসের বা ওসিরিস এর আদেশে পাপী দেহ ও আত্মাকে ছিঁড়ে খেয়ে ধ্বংস করতো।

কিছু জনশ্রুতি অনুসারে, আনুবিস ছিলেন ওসিরিস এবং নেপথিসের জারজ সন্তান। নেপথিস তার স্বামী সেথের ভয়ে আনুবিসকে গোপনে পরিত্যাগ করেন। অনাথ আনুবিসকে তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পান দেবতা আইসিস এবং দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে, বেশ কিছু প্রাচীন মিশরীয় কিংবদন্তি অনুসারে, আনুবিস সত্যিকার অর্থেই সেথের ঔরসজাত সন্তান ছিল। সেইসকল কিংবদন্তি অনুযায়ী, সেথের দ্বারা গর্ভবতী হবার পর নেপথিস সেথের কাছ থেকে সেই খবর লুকিয়ে রাখেন। কারণ, সন্তানসম্ভবা নেপথিস ভাবতেন, সেথের সংস্পর্শে এলে তার সন্তানও সেথের মতো রূঢ় ও বেপরোয়া স্বভাবের হয়ে উঠবে। তখন তিনি গোপনে আনুবিসকে আইসিসের কাছে দত্তক দেন। আনুবিসকে নিয়ে 'দুই ভাইয়ের গল্প' নামে আরও একটি গল্প চালু আছে। সেই গল্পে আনুবিসের বাটা নামে এক অনুজ ছিল। বাটা ছিলেন প্রাচীন মিশরের একজন পুরোহিত বা প্রকারান্তরে আঞ্চলিক দেবতা, যিনি আনুবিসের সহচরের কাজ করতেন। সম্ভবত আনুবিসের প্রার্থনার জন্য প্রাচীন মিশরে আলাদাভাবে কোনো মন্দির নির্মাণ করা হয়নি। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তেমন কিছু খুঁজে পাননি এখনো অব্দি। কবরস্থান ও সমাধিগুলোকেই তাঁর মন্দির বা বিচরণ স্থান হিসেবে ধরা হয়। মিশরবাসী মৃত্যু পরবর্তী শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আনুবিসের প্রার্থনা করতেন। সময়ের সাথে সাথে, ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের কারণে কালের গর্ভে আনুবিস ক্রমে হারিয়ে গেছেন বলে মনে করা হলেও, এখনো কিছু কিছু গোপন সংগঠন পূজা করে আসছে আনুবিসের। সেই মতানুসারে, যুগে যুগে আনুবিস ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে আবার নেমে আসেন পৃথিবীতে, কোনো এক মানুষের শরীরে। এমন কেউ, যার সাথে তাঁর জীবনের কিছু না কিছু মিলে যায়। সেই সময় থেকে শুরু হয় ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে হঠাৎ অগ্নুৎপাত, খরা বন্যা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি, এবং মৃত্যু হয় হাজার হাজার মানুষের। এর ফলে, জগতে ইকোলজিকাল ব্যালান্স বা প্রানের ভারসাম্য বজায় থাকে বলে মনে করা হয়। জেনেটিক মিউটেশন হয় তড়িৎগতিতে, আর কাইন্ড অফ সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট ইত্যাদি সম্বলিত ডারউইনের তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হয়। আর সর্বপ্রথমে, আনুবিসের আগমন সূচীত হয় সর্বগুণসম্পন্না একটি নারী শরীরের বলিদানে। তাকে, পত্নী আনপুট হিসাবে গ্রহণ করেন তিনি। 'বুক অফ দ্য ডেড' এর রিভিউ কপিটা হাতবদল হতে হতে কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানে না এলে এবং ব্যাম্বির নজরে না পড়লে হয়তো এসবের কিচ্ছুটি জানা যেতোনা।

সপ্তম পর্ব

চলন্ত গাড়িটায় নিশ্চুপ বসে আছে অর্যমা। আশিসের চোখের দিকে তাকানো মাত্র কেমন একটা অবশ হয়ে গেছে সে। নিজের শরীর বা মনের ওপর যেন বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। তারাতলা থেকে ডানদিকে বাঁক নিলো গাড়ি। বামহাতে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডকে রেখে, নেচার পার্ক পেরিয়ে এগিয়ে চললো পাহাড়পুরের দিকে। শীতের সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারের ওপর ইতস্তত গাড়ি। জায়গাটায় মানুষের বসতি খুব কম, শুধু ওয়্যারহাউস, কারখানা আর সারি দিয়ে কন্টেনার রাখা। খালাসি ড্রাইভার মিস্ত্রী মজুরের জটলা চায়ের দোকানে। মাঝে মাঝে রেললাইনের আঁকিবুঁকি। যখন গাড়ি থামলো, সামনে দেখা গেলো বিশাল একটা জলাশয়। শ্যাওলায় সবুজ, অত্যন্ত নোংরা পরিবেশ চারপাশে। পোর্ট ট্রাস্টের ধোবি তালাও।

পরিত্যক্ত কিছু রেল ওয়াগনের পিছনদিকে, ঝোপঝাড়ের ভিতরে একটা রাস্তা নেমে গেছে নীচে। আশিস আর বৈদূর্য্য দুইদিক থেকে ধরে যখন অর্য্যমাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে, অন্ধকার নেমে এলো আচমকা। কোথার থেকে যেন এসে মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করলো একঝাঁক বাদুড়। তাদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ছাড়া সারা চরাচর নিস্তব্ধ।

একটা প্রায় অন্ধকার ঘর। দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হদিশ পাওয়া যাচ্ছেনা। একদিকে কোণের ওপর দিকটায় হ্যারিকেন টাইপের কিছু একটা ঝুলছে। কিভাবে যেন তাপমাত্রা বাইরের থেকে অনেকটাই বেশী। উঁচু একটা বেদীর ওপর হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে পৃথ্বীশ। পরণে শুধু জিন্স... ছিপছিপে ফরসা শরীরটা জবজব করছে ঘামে। বুক, পেটের জায়গায় জায়গায় গোল লাল দাগগুলো কিসের কে জানে? অর্যমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ওঠার চেষ্টা করেও অসফল হলো। বাটা এগিয়ে গিয়ে চুলের মুঠিটা ধরে মাথাটা ঠুকে দিয়েছে বেদীর সাথে। আঁক করে একটা শব্দ, তারপর আর কোনো সাড় নেই।

একটা তীক্ষ্ণ শিসের মত আওয়াজ করে আশিস ডেকে উঠলো, “মিৎ? মিৎ?”

অর্য্যমার লেগিংসের ওপর দিয়ে পায়ে একটা সরসরে অনুভূতি। এক বিঘত লম্বা জিভ দিয়ে কেউ চাটছে গোড়ালি, তারপর পায়ের গোছ, উরু... ক্রমে আরো ওপর দিকে। অন্ধকারে জ্বলছে দুটো সবুজ চোখ।

গা ঘিনঘিন করে উঠলো তার। চিৎকার করার সব ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছো। মুচকি দেসে আশিস এগিয়ে এলো আর খরখরে একটা

আঙুল বুলিয়ে দিলো ঠোঁটে। এরপরে যা ঘটলো, তা অকল্পনীয়। কেউ যেন অচেনা একটা ভাষায় কথা বলে উঠলো তার মধ্যে, এবং পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করলো। অর্য্যমা বুঝতে পারলো, বারবার একই কথা বলতে বলতে সে নিজে হাঁটু গেড়ে বসছে, আর সামনে আশিসের শরীরটা লম্বা হতে হতে প্রায় ঘরের ছাদটা ছুঁয়ে ফেলেছে। মাটিতে কিলবিল করছে লক্ষ লক্ষ ম্যাগট। কটু দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়।

গুগল ম্যাপ লোকেশন প্রায় কুড়ি মিটার অ্যাকিউরেসি দেখায়। একটু আড়াল করে পার্ক করা ছিলো হন্ডা সিটি গাড়িটা। ডক্টর সরকারের পাশে ঈশান আর মইদুল, সামনে টর্চ হাতে নিবারণ। শহরের পশ্চিমপ্রান্তের আকাশ ঢেকে আসছে কালো মেঘে। অনেক দূরে, বন্দর এলাকার জোরালো আলোয় লালচে হয়ে আছে দিগন্তরেখা। একটা জাহাজের ভোঁ শোনা গেলো খিদিরপুর ডক থেকে।

-“আমারে বোদা পেয়েচে? ভেবেচে কিচু জানিনা, বুজিনা...তাই না? এতদিন ধরে মড়া ঘাঁটতেচি, হারামজাদা আমার চোককে ফাঁকি দিবি তুই?” গজগজ করছিলো নিবারণ। ঈশান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, ইশারায় তাকে চুপ করতে বললেন উপায়ন। ব্যাম্বি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে এক জায়গায়। জোরালো টর্চের আলোটা সেদিকে ফেলতেই আতঙ্কে হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে এলো সবার।

ধোবি তালাও এর জলে আলোড়ন শুরু হয়েছে। অনেকগুলো মাথা বিজবিজ করছে যেন, উঠে আসার চেষ্টা করছে পাড় বেয়ে। তাদের শরীরগুলো ফ্যাকাশে সাদা। নাক মুখ চোখ কিচ্ছু আলাদা করে বোঝা যাচ্ছেনা, শুধু সবার বুকের কাছটায় একটা করে গভীর গর্ত।

টর্চ নিভিয়ে তক্ষুণি খানিকটা পিছিয়ে আসতে হলো সবাইকে। উপায়ন সেই মুহূর্তে দেখলেন, ডানদিকের ঝুপসি জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা। ঈশান চেপে ধরলো ব্যাম্বির হাতটা। নিবারণদা সেইদিকে মাথা উঁচু করে, জোরে নিঃশ্বাস টেনে কিছু একটা শোঁকার চেষ্টা করলো, আর তারপর সবাইকে হাত নেড়ে বললো ওদিকপানে এগুতে।

সেই শেয়াল মুখোশটা গলানো আশিসের মাথায়। হাতে লম্বা একটা লাঠি, যার আগায় ধারালো একটা ধাতব ফলা। টানটান করে পৃথ্বীশের শরীরের ওপরেই শোয়ানো হয়েছে অর্ধচেতন অর্য্যমাকে। একলাফ দিয়ে যখন সেই বেদীর ওপর উঠে পড়লো আশিস, তক্ষুণি ভেসে এলো হাজারে হাজারে অশরীরী দীর্ঘনিঃস্বাসের শব্দ। বুকফাটা হাহাকার নিয়ে টলতে টলতে চারদিক থেকে আসছে ওই ফ্যাকাশে সাদা মুর্তিগুলো।

পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা... যাদের মুক্তি হয়নি আজও। প্রেতযোনিতে আটকে আছে যারা, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। বৈদুর্য্য হাঁটু গেড়ে বসে প্রণিপাত জানাচ্ছে তার ইষ্টদেবতাকে। পাশে একটা বিশাল অদ্ভুতদর্শন প্রাণী, যার জিভ মাটি ছুঁয়েছে, টপটপ করে নাল পড়ছে সেখান থেকে।

হঠাৎ বাইরে বজ্রপাতের মতো একটা অট্টহাসির শব্দ। বিদ্যুৎ চমকে উঠলো যেন ঘরের মধ্যে। সেই নীলচে সাদা আলোয় দেখা গেলো, দরজায় দাঁড়ানো এক নারী। এলোচুল, নিরাবরণ। হতভম্ব হয়ে সেইদিকে ছুটে গেলো বৈদুর্য্য।

-"তুই এখানে কেন এসেছিস? আর এভাবে? ছিঃ !"

-"কেন গো বাটাদা? ভালো লাগছে না আমায়? বলো?"

-"চলে যা। এক্ষুণি তুই চলে যা প্লিজ। পরে কথা বলে নেবো তোর সাথে।"

-"মন্দারমণি যাবে বললে যে গো। চলো না, আজই যাই..., তোমার গাড়িও তো আছে।"

হাতটা ধরে টানতে যেতেই যেন একটা কারেন্টের ঝটকা খেলো বৈদুর্য্য। ছিটকে পড়লো মাটিতে। হতভম্ব হয়ে বসে রইলো ওর দিকে চেয়ে। এক-পা এক-পা করে বেদীর দিকে এগোচ্ছে সে। ক্রমশ বাড়ছে উচ্চতায়। শ্যামলা ত্বকে পিছলে যাচ্ছে অবশিষ্ট আলো। পায়ের নীচে কাঁপছে পৃথিবী। মহাকাশ। মহাকাল।

-"আমার ইচ্ছা ছাড়া এ চত্বরে একটা পাতাও নড়ে না, পালন করি আমি। দক্ষিণ-পশ্চিমটা তাই শুধু আমার, জানো তো আশিসদা? আমার নাম নৈঋতা। অ্যানাটমির ক্লাসে খেয়াল করোনি মনে হয়। ছেড়ে দাও ওদের, আমি এসে গেছি।"

পরিশিষ্ট

তারপর দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেছে একটা বছর। অতিমারী থাবা বসিয়েছে সব মহাদেশে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু দৈনন্দিন আক্রান্ত ও মৃত্যুর হিসাব। সবারই হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে একটা ছোট্ট খবর। 'মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধান।' গাইনি ওয়ার্ড থেকে যেইদিন প্রথম আক্রান্ত হয়েছিলেন কয়েকজন চিকিৎসক এবং নার্সিং স্টাফ, তার ঠিক আগের দিন, চার নম্বর পাতায়, ছোট্ট করে বাঁদিকের কলামে।

শহরের টার্শিয়ারি হাসপাতালে বাকি চিকিৎসা, একদম ইমার্জেন্সি বাদ দিয়ে, প্রায় বন্ধ। সমস্তটাই কোভিড আক্রান্ত রোগীর জন্য বরাদ্দ

করে দিয়েছিলেন রাজ্য সরকার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবার ডিউটি পড়তো, উপায়নও বাদ যান নি। প্রথম ধাক্কাটা পার করে যখন দ্বিতীয় ঢেউ এলো, হাজার সাবধানতা অবলম্বন করেও হাসপাতাল থেকে ইনফেক্টেড হলেন তিনি। প্রথমে বোঝা যায়নি, একদিন বাড়ি ফিরে, স্যানিটাইজার দিয়ে দুইপ্রস্থ স্নান সেরে, খাওয়া দাওয়ার পর যখন শুতে গেলেন, শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগতে শুরু করলো। সেই রাতেই, হুহু করে বেড়ে গেলো টেম্পারেচার। গলায় ব্যাথা, স্বাদ-গন্ধের বোধমাত্র নেই। টেস্টের রেজাল্ট এলো দুইদিন পর। বাড়িশুদ্ধ সবাই পজিটিভ। স্ত্রী, কন্যা আর বৃদ্ধা মা।

মে মাসের ছয় তারিখ। চারদিকে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার, রাস্তায় শুধু অ্যামবুলেন্সের হুটারের আওয়াজ। শেষ রক্ষাটা করতে পারলেন না উপায়ন। মায়ের কো-মর্বিডিটি ছিলো, হুহু করে নামতে শুরু করলো স্যাচুরেশন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, নিজের ডাক্তার বন্ধুবান্ধব ধরে, একটা বেড যোগাড় করতে পেরেছিলেন বাইপাসের ধারের নামকরা হাসপাতালে। তিনদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি। তারপর মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর, আর শেষে একটা ম্যাসিভ কার্ডিয়্যাক অ্যারেস্ট। সব শেষ।

ততদিনে শুধু উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু পেয়েছিলেন বলে দুর্বল শরীর নিয়েও গাড়ি চালিয়ে কর্পোরেশনের গাড়ির পিছনে সিরিটি মহাশ্মশানে পৌঁছালেন তিনি। যে দৃশ্য দেখলেন সেখানে, আজীবন দুঃস্বপ্নের মতো রয়ে যাবে মনের মধ্যে। মৃত্যুর মিছিল। সারি সারি প্লাস্টিক কভারে মোড়া শরীর শোয়ানো মেঝেতে, পা ফেলার জায়গা নেই। মাছি ভিনভিন করছে চুঁইয়ে পড়া বডি ফ্লুইডের ওপর। কোন বডিটা সরকারি আর কোনটা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এসেছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। একটা চুল্লীতে একসাথে ঠেলে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে দুই তিনখানা করে। গনগনে দুপুরের রোদ্দুর আর চুল্লীর তাপে আগুন ঝরছে যেন চারপাশে। পকেট থেকে হাজার চারেক টাকা খরচ করে সার্টিফিকেট নিয়ে সবকিছু মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। আর শরীর চলছেনা যেন।

আদিগঙ্গার জল কমে গেছে অনেক। বৃষ্টি হয়নি অনেকদিন। গুমোট ভাবটা ধীরে ধীরে কাটছে এসি'র হাওয়াতে। এপার ওপারের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে কয়েকটা। ফাঁকা রাস্তাঘাট। করুণাময়ী কালীবাড়িতে ওঠার ঠিক আগেই কয়েকটা কুকুর গাড়ির সামনে এসে পড়লো হঠাৎ। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন উপায়ন। কেঁউকেঁউ করে

তারস্বরে কান্না জুড়লো তারা একযোগে। ইশ্, নিশ্চয়ই চাকায় থেঁতলে গেছে একটা। গাড়ির থেকে নেমে বাঁপাশে তাকাতেই শরীরে একটা হিমস্রোত বয়ে গেলো তাঁর। অন্ধকার ঝোপের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে কেউ একজন। তার লম্বা হাতদুটো মাটিতে ঠেকে আছে, ঠিক যেন লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্ত। চারদিকে গোল করে কুকুরের ভিড়। কটা চোখদুটোতে তীব্র ক্ষিদে নিয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শ্মশানের দিকে।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - সৌমিক পাল

টলিউডের একটি জনপ্রিয় সিনেমা 'মৌচাক' এর একটি গানে মজার ছলেই দুটি বিপরীতধর্মী কথা বলেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এক জায়গায় তিনি বলেছেন "নারীর গড়ন নারীর ধরণ বদলে কি আর যাবে?

শাস্ত্রমতে তাই তো নারীর ঘোমটা খোলাও মানা।"

আবার আর এক জায়গায় বলেছেন "নারী পুরুষ সমান সমান আছে যে তার অনেক প্রমাণ। "

এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের বাক্য আমাদের সামাজিক চিন্তা-ভাবনারই প্রতিচ্ছবি। আমরা মুখে যতই বলি না কেন আমরা নারী-পুরুষ সমানাধিকারের পক্ষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবে দেখা যায় না। খুব শিক্ষিত পরিবারে এখনও কন্যাসন্তানের আগমনে সকলে বেশ ভালোমতো দুঃখিত হয়। মেয়েদের যেনতেন প্রকারেণ পুরুষদের অধীনস্থ করে রাখার এক প্রক্রিয়া সারাক্ষণ চলতে থাকে। সে মেয়েদের মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করেই হোক বা শারীরিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে হেয় প্রতিপন্ন করেই হোক। মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করাই মূল উপপাদ্য বিষয় হয়।এই প্রসঙ্গেই হাইমেন বা সতীচ্ছদের অবতারণা। তথাকথিত গোঁড়া সমাজ 'হাইমেন' নামক এমন একটি নারীঅঙ্গ বা বলা ভালো অঙ্গাণুকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে যা অনেকের ক্ষেত্রে থাকেই না (যা তথাকথিত ভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ) আবার অনেকের ক্ষেত্রে থাকলেও লুপ্তপ্রায়। তবুও এই সতীপর্দা'কে নিয়ে সমাজ,সাহিত্য,চলচ্চিত্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সেই মধ্যযুগীয় আমল থেকে ব্যক্তিমনে নানা কৌতূহল ও নারীশরীরের মাপকাঠি হিসেবে তা ব্যবহার হয়ে আসছে। এই স্বল্প পরিসরে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রগুলিতেই আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সতীচ্ছদ বা সতীপর্দা কী ও কেন?

সতীচ্ছদ বা সতীপর্দা বা হাইমেন নারী শরীরের একটি ছোট এবং খুব পাতলা কলা বা টিসু যা ভ্যাজাইনাল ওপেনিং এর সামনে থাকে। এটি ভ্রূণ গঠনের পর যে সব টিসু বাড়তি পরে থাকে তাই দিয়ে তৈরি হয়। প্রত্যেকের সতীপর্দা বা হাইমেন অস্তিত্বগত এবং গঠনগতভাবে আলাদা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে অস্তিত্বগতভাবে হাইমেন আলাদা করে অনুভূত হয় না। কম বয়সেই বিলুপ্ত হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে বয়সের সাথে পাতলা হয়ে আসে এবং পরে তা ছিঁড়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে ব্যথা বা রক্তপাত হয় ছিঁড়ে যাওয়ার সময়ে, অনেকের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মনে করে যে, এই হাইমেনের থাকা বা না থাকার ওপর একজন মেয়ের সহবাসের অভ্যাস সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়।

অথচ সহবাসকালের আগেই অস্তিত্বগত ত্রুটির কারণে কারও হাইমেন না থাকতে পারে আবার সহবাসের আগে তা এমনি কোনও দৈহিক পরিশ্রমবশতঃ ছিঁড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাই হাইমেন বা সতীচ্ছদ না থাকা মানেই কোনও মেয়ে পলিগ্যামাস বা সে অসতী তা কিন্তু বোঝা যায় না। তবে সমাজের ধ্বজাধারীরা এই ধারণা পোষণ করেই থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অস্ত্রপোচারের মাধ্যমে কম বয়সেই হাইমেন সরিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু সহবাস ব্যতিরেকেই হাইমেন লুপ্ত হল।

হাইমেন ও সতীত্বের সহাবস্থান বা সমনাম

প্রাচীনকাল থেকে বার বার নারীশরীরের কোনও অংশ বা তার দেহের কোনও চিহ্নকে সতীত্বের নিশানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি অবশ্যই মধ্যযুগীয় এক মানসিকতা। কিন্তু এই ধারণা যুগ যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পোষণ করে আসছে। বিবাহিত শুধুমাত্র মেয়েদেরই যেমন নানা চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে যেমন মঙ্গলসূত্র, শাঁখা-সিঁদুর আবার অনেক আদিবাসীদের মধ্যে পায়ে মল ও নাকে নাকছাবি পরার মাধ্যমে সে যে কোনও পুরুষের সম্পদ এবং 'সতী' তার যেন নিশান দেগে দেওয়া হয়।

এই সতীত্ব প্রকাশের এক শরীরী মাপকাঠি হল হাইমেন। অনেকক্ষেত্রে সরাসরি হাইমেনের কথা বলা না হলেও প্রকারান্তরে সেইদিকেই ইঙ্গিত থাকে। এই ধারা বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ, সাহিত্য এবং সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি/সোশাল ট্যাবু

মধ্যযুগীয় সময় থেকেই সতীত্বও হাইমেনের এক সুগভীর সম্পর্ক দেখা যায়। বর্তমানে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় পরিচিতির মূলে এই সতীত্ব নির্ণয় এবং তার পরবর্তী প্রয়োগ। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনায় বোঝা যায় এই সতীত্ব নির্ণয়ের রীতি মূলত ভালোবাসার আড়ালে নারীর প্রতি পুরুষের অধিকার কায়েম করার এক নিমিত্ত মাত্র। মধ্যযুগীয় বর্বরোচিত মানসিকতা প্রদর্শনে নারীমনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে অধীনতা বিস্তার। নারীর সতীত্ব যতদিন পর্যন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার মূলে থাকবে ততদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরর 'সতীচ্ছদের' গুরুত্ব থাকবে। ড্যানিয়েল পোলক 'ভার্জিনিটি টেস্ট' বা সতীত্বের পরীক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'an old custom designed to check if a young girls' hymen is intact" বা 'এক প্রাচীন

প্রথা যা একটি অল্পবয়সী মেয়ের হাইমেন বা সতীচ্ছদ অক্ষত আছে কিনা সেটা দেখায়। এই সংজ্ঞা সতীত্ব পরীক্ষার লিঙ্গভিত্তিক ধারণাকে বা মানসিকতাকেই স্থাপন করে।

সমাজে ঠিক কি কি দেখে বা কিসের মাধ্যমে এই সতীত্ব নির্ধারণ চলে সেটি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় একজন মেয়ে প্রকৃতপক্ষে সতী কিনা তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সতীত্বর লক্ষণগুলো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিনা! অনেক মেয়ের হাইমেন অন্যান্য নানান দৈহিক পরিশ্রমের কারণে প্রথম সহবাসের আগেই ছিঁড়ে যেতে পারে বা থাকতে নাও পারে। কিন্তু বিবাহ-পরবর্তী সময়ে স্বামীর সাথে সঙ্গমকালে পারিবারিক রীতি অনুযায়ী সুপ্রাচীনকাল থেকে সাদা চাদরে রক্তের দাগ আছে কিনা দেখা হয়। মধ্যযুগীয় এই পন্থার প্রয়োগ আজও কিছু মুসলিম প্রধান রক্ষণশীল দেশে দেখা যায়। এই বর্বরোচিত প্রথার কোনও যৌক্তিকতা নেই। তাও এভাবে মেয়েটির সতীত্ব প্রমাণিত হলে পরিবার গৌরবান্বিত হয়। সাদা চাদরে রক্তের দাগ পাওয়ার অর্থ মনে করা হয় স্বামীর সাথে সঙ্গমের আগে তার অন্য কারও সাথে সঙ্গম বা সহবাস হয় নি, স্পষ্টতই তার সতীত্ব অক্ষুন্ন আছে। জর্ডন, প্যালেস্টাইন,টার্কি এই সমস্ত দেশে ১৯৯০ এর মাঝামাঝি পর্যন্তও হাইমেনের অস্তিত্ব পরীক্ষা বা সতীত্ব নির্ণয়ের প্রথার গুরুত্ব ছিল। সাউথ আফ্রিকায় এই মানসিকতাকে এইডস মহামারীর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সতীত্ব নির্ণয়কে তকমা দেওয়া হয় ' culturally appropriate solution to the problems caused by the epidemic.'

কথায় আছে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' ।যে জায়গায় যত কড়াকড়ি তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকেই নানা পন্থা ব্যবহার করে থাকেন। এবং তার মধ্যে বেশ অভিনবত্ব আছে। অনেক মেয়েরা নকল রক্তপাত দেখানোর জন্য যোনিপথে ঘুঘু পাখির রক্তপূর্ণ পাকস্থলী বা জোঁকপূর্ণ কোনও থলির মতো জিনিস রেখে দিত। এর ফলে যার হাইমেন আগে থেকেই নেই বা যে বিয়ের আগেই অন্য পুরুষের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে কিছু বোঝার উপায় থাকত না। এইরকম অভিনব সব পন্থা আবিষ্কারে বৃহত্তর স্বার্থে এটাই প্রমাণিত হত যে “ the simple fact is that short of catching someone in the act of sex, virginity can be neither proven nor disproven.”

সার্বিকভাবে এই সতীত্ব নির্ণয় বা ভার্জিনিটি টেস্ট বিষয়টি নারীকেন্দ্রিক হয়েই থাকে। বহুকাল ধরেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রজনন এবং প্রসবকালীন অগ্রাধিকার সূত্রে মেয়েদেরই এই পরীক্ষার সামনে ফেলা হয় , পুরুষরা কখনও এর আওতায় আসেন না। সেই কারণে পুরুষাঙ্গ বা ছেলেদের শরীরের কোনও প্রজননক্ষম অঙ্গ কিন্তু কোনও পরীক্ষা-

নিরীক্ষার মুখে পড়ে না। যত অত্যাচার চলে মেয়েদের হাইমেনের উপর যার অস্তিত্বই সেভাবে প্রমাণিত নয়। হাইমেনের থাকা বা না-থাকার প্রসঙ্গকে আমরা যদি উপেক্ষাও করি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে মেয়েদের যে পরিমাণ মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক প্রতিকূলতা ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা বস্তুতই গ্রহণযোগ্য নয়।

সাহিত্যে সতীত্ব বা হাইমেন

সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের প্রতিফলন যুগ যুগ ধরে সাহিত্যিকদের লেখনীতে ছাপ ফেলে। সাহিত্য সমাজের আয়না। তাই হাইমেন বা ভার্জিনিটি টেস্ট ও বহু যুগ আগে থেকে সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে প্রকাশ পায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিকিৎসা গ্রন্থ “De secretis mulierum” বা ‘সিক্রেটস অফ ওম্যান’ এ বলা হচ্ছে যে একজন মহিলা যদি অসতী হন বা তাঁর হাইমেন অক্ষত না থাকে তবে তাকে গ্রাউন্ড লিলি খেতে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব করবেন। ভাষাটি ঠিক এইভাবে বলা হয় ‘if she is corrupt, she will urinate immediately’. বই এর এই লাইনটি থেকেই সেইসময়কার নারীদের প্রতি সমাজের কদর্য ও অপমানকর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়।

লিন গ্রাহাম রচিত ‘The Arabian Mistress’ বইটিতে শেখ নায়ক তাঁর নায়িকাকে বলে ‘ তুমি বুঝতে পারছ না আমার সংস্কৃতিতে মেয়েদের পুণ্যতা কি পরিমাণ উচ্চতা রাখে।‘ পাঠকের কাছে সহজেই অনুমেয় যে ‘পুণ্যতা’ ‘সতীত্ব’র নামান্তর মাত্র ; প্রকারান্তরে হাইমেন অটুট আছে কিনা তা দেখে নেওয়া। ‘কুমারী’ মেয়েরা অর্থাৎ যে সব মেয়েদের হাইমেন অক্ষুন্ন তারা রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সব সময়ে মৌলিকত্ব ও অগ্রাধিকার পায়।

প্রাচীনকাল থেকে প্রায় ২০০৮ পর্যন্ত বেশ কিছু রোম্যান্টিক নভেল পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই সর্বত্রই মেয়েদের সতীত্ব নির্ণয়ের কথা বলা আছে, কোথাও কিন্তু কোনও ভার্জিন শেখ-এর উল্লেখ নেই। বার বার এই সময়ের সাহিত্যে আবারও নারীকেন্দ্রিক ‘চ্যাস্টিটিসিটি’ র প্রাধান্য দেখা যায়।

ছ’টি খুব জনপ্রিয় শেখ রোমান্সের বই বিভিন্ন নাম করা পাবলিশার থেকে প্রকাশিত। এইসব নামী উপন্যাসগুলিও সদর্পে ‘ভার্জিন হিরোইন’দের গৌরবান্বিত করে থাকে।

Harlequin Mills and Boon’s, Lynne Graham-এর The Arabian Mistress (2001), Lucy Monroe’র The Sheikh’s Bartered Bride (2004), Penny Jordon-এর Possessed by the Sheikh (2005), Sara Morgan-এর ‘The Desert Sheikh’s

Captive Wife (2007) এবং Chantelle Shaw-এর ‘ At the Sheikh’s Bidding’(2008) – এর সাথে দুটি মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাব্য ‘Bevis of Hampton’ (c.1300) এবং Blancheflur (c.1250) – এগুলিতে খুব সুচারুভাবে কুমারীত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুমারীত্ব সংক্রান্ত বর্ণনা এবং তাঁর গুরুত্ব পর্যালোচনা বইগুলিতে আছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু নথিপত্র জুড়ে যেমন বাইবেল, চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা, রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস, উপকথা, আদালতের নথি – সর্বত্র বিভিন্ন উপায়ে একজন নারীর কুমারীত্ব পরীক্ষা করার কথা উল্লেখ করা আছে।

Kathleen Coyne Kelly তাঁর লেখায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই ধরণের পরীক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করেন- ১) পৌরাণিক উপায় (উপকথা ও সাহিত্যে) ২) ঐতিহাসিক বা ইতিহাস লব্ধ উপায়(নথিপত্র ও কোর্টের দলিলপত্র)। Laurie Magluire সতীত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষাকে তাঁর এক গবেষণায় চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন ,

‘textile proof of bleeding’ বা ‘কাপড়ে রক্তপাতের প্রমাণ’, ‘gynaecological examination by a jury of women’ বা ‘এক বিশেষজ্ঞ নারী পর্যবেক্ষক দল দ্বারা স্ত্রী-রোগ বিষয়ক পরীক্ষা’, ‘proof of the magical ability on the part of the virgin’ বা ‘কুমারীদের কিছু অলৌকিক ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ’ এবং ‘ somatic responses to injested fluid or inhaled fumes’ বা ‘গৃহীত তরল বা ধোঁয়ার প্রতি সোমাটিক প্রতিক্রিয়া।‘ এই শ্রেণীবিভাগের দিকে তাকালেই এটি সহজেই অনুমেয় যে প্রথম দুটি বিভাগ যার প্রথমটিতে কাপড়ে রক্তপাতের দাগ দেখা হয় সেখানে মূলত হাইমেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি মূল উপপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয় ভাগ যেখানে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু হাইমেনের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সতীত্ব নির্ণয় বিষয়ক এই ধরণের গবেষণায় স্পষ্ট যে এই বিষয়টিকে সাহিত্য এবং পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হত।

সমসাময়িক রোমান্টিক নভেলেও ভার্জিন নায়িকা একান্ত কাম্য। এই উপন্যাসগুলিতে virgin, innocent এবং innocence এই শব্দগুলি কুমারীত্বরই সমনাম প্রায়। সরাসরি হাইমেনের কথা বলা না থাকলেও যেহেতু কুমারীত্ব পরীক্ষার অঙ্গরূপে হাইমেনই মূল আলোচ্য বিষয় তাই সমকালীন সাহিত্যে এই শব্দগুলির প্রয়োগ প্রকারান্তরে হাইমেনের উপস্থিতিকেই স্বীকৃতি দেয়। মধ্যযুগীয় এই পন্থার বিপক্ষে আবার কিছু নায়িকাকে মনের দুঃখে বিলাপ করতেও দেখা যায়। তখন সে বলে ‘ had she not been a virgin, she had the awful feeling even a pity date would not have occurred. It

was medieval and felt like worst kind of betrayal.' একটি মেয়ের কুমারীত্ব পরীক্ষায় বা নির্ণয়ে সামাজিক পুরুষকার যতটাই মধ্যযুগীয় এবং বর্বরোচিত এক উল্লাস অনুভব করে, মেয়েটি ঠিক ততটাই মানসিক ও শারীরিক হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে, নিজেকে সমাজ, বিনোদন, সাহিত্য সব কিছু থেকেই গুটিয়ে নেয়। আমরা যদি এক লিঙ্গ-নিরপেক্ষ মনন নিয়ে এই বইগুলি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে সব ক'টিতেই আশ্চর্যভাবে মেয়েদের সতীত্ব পরীক্ষা বা ভিন দেশীয় পুরুষদের সাথে প্রেম বা বিবাহকালীন সময়ে নানা উপায়ে সতীচ্ছদের উপস্থিতি পরখ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর উপর পুরুষের যে চরম এক আধিপত্য কায়েমের মানসিকতা থাকে সেটিই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

রূপালী পর্দায় সতী-মনস্কতা

ভার্জিনিটি বা কুমারীত্বকে সমগ্র বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় মননে একজন মেয়ে বিয়ের আগে পর্যন্ত কুমারী থাকলে অর্থাৎ তার যোনিপথ অসূর্যম্পশ্যা থাকলে বা তাঁর সতীচ্ছদ অটুট থাকলে পরিবারের গর্ব বাড়ে এবং স্বামীগৃহেও তার মর্যাদা বজায় থাকে, যদিও তা পরিবারের সদস্য হিসেবে নয়, একজন আত্মত্যাগী মা বা পরিপূর্ণ বধূ হিসেবে যে মুখ বুজে সংসার ও পরিবারের স্বার্থে নিজেকে বলি দেয়। হিন্দি সিনেমায় কখনওই সরাসরি হাইমেন বা সতীচ্ছদ নিয়ে কোনও আলোচনা শোনা যায় নি। তবে যে কোনও শয্যাদৃশ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিকী দৃশ্য বা ছায়ামিলনের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মিলন বা নায়িকার প্রথম সতীত্ব খোয়ানোর দৃশ্যকে দেখানো হয়। অনেক হিন্দি সিনেমার গানের ক্ষেত্রে গানের কথার মধ্যেই একজন নায়িকাকে ফুটন্ত ফুল, কুঁড়ি ও লাল গোলাপ ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা হয় এবং এই বর্ণনার মাধ্যমে তার যৌবন ও সতীত্ব সম্পর্কে এক স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়। বলিউডের সিনেমার ক্ষেত্রে আরও একটি মতাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। তা হল যে সব মেয়েরা স্বাধীনচেতা বা উপার্জনকারী হয় তাদের যেন অবিসংবাদিতভাবেই অসতী আখ্যা দেওয়া হয়। মনে করা হয় এই স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য তারা কোনও না কোনও পুরুষের সাথে মিলিত হয়েছে। তাই প্রকারান্তরে তারা 'প্রকৃত' বউ হওয়ার উপযুক্ত নয়। ১৯৭০ সালে বড় পর্দায় আসা "Purab aur Paschim' সিনেমাটিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হিন্দু সঙস্কৃতিতে কুমারীত্ব রক্ষার দিকে খুব বেশি মাত্রায় জোর দেওয়া হয়। এই চলচ্চিত্রের নায়িকা একজন মুক্তকামী নারী হিসেবে পশ্চিম থেকে ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

আশ্চর্যভাবে সে খুব অনায়াসেই উত্তর-ঔপনিবেশিক, জাতীয়তাবাদী এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিজেকে মানিয়ে নেয়। যা থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্কারকে আলোকায়িত করার জন্যই স্বাধীনতা-উত্তর দশকের পশ্চিমের 'বিপথগামী' নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখে।

ফিল্ম সমালোচক নীপা মজুমদার মনে করিয়ে দেন "পশ্চিমী নারী হিসেবে খারাপ নারীর নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য এই সিনেমায় স্বাধীনতা পরবর্তী একটি প্যান-ভারতীয় পরিচয় হিসেবে তুলে ধরা হয়।"

নারীত্ব সম্পর্কিত এই তত্ত্বই বারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে স্বাধীনচেতা অর্থেই সে নষ্ট অথবা তার সতীত্ব বিপন্ন অথবা তার হাইমেন অক্ষত নেই। ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে এই সত্য বা এর কাছাকাছি তথ্যের ইঙ্গিতে প্রতিফলন আমরা বার বার দেখি।

এবার এক ঝলক একটু দেখে নিই ইংরেজি একটি টিভি শো এর বিষয়ে। একবিংশ শতাব্দীর মার্কিন মুলুকে ভার্জিনিটি নিয়ে উন্মাদনার মাঝে একাধিক এই বিষয়ক টিভি শো বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে একটির নাম 'True Blood'। এটিতে একইভাবে নারীচরিত্রকে পুরুষতান্ত্রিক আবহে বসিয়ে তাদের চির-শিশু বা 'ফরেভার চিল্ড্রেন' প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে যৌন সংসর্গের পর ভ্যাম্পায়ারিক জেসিকার হাইমেন কালো হয়ে যায়। এটি তার প্রথম সহবাস ছিল না। তাই এই ঘটনাটিকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন 'ভার্জিন' না হওয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অদ্ভূতভাবে ছুৎমার্গের কারণে "It grows black"বলা হয়। যে 'প্রায় লুপ্ত' অঙ্গটি নিয়ে এতটাই রাখঢাক সেটিকে প্রকারান্তরে গ্লোরিফাই করার প্রবণতা দর্শককে বিভ্রান্ত করে। একবার যৌন সংস্রবের পরেই জেসিকা আবার 'সতী' পর্যায়েই ফিরে যায়। তাই এক্ষেত্রেও দর্শক দেখে যে সতীত্বকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং নায়িকাকে বেশ কষ্ট করেই 'চিরকুমারী' করে রাখার চেষ্টা চলছে। একটি আলোচনায় পাওয়া যায় "Jessica's illusive and regenerating hymen reinforces the myth that all women have this membrane, thereby allowing for physical proof of 'first blood' so prized within patriarchial cultures". সাথে এটাও বলা হয় "Yet history has also upheld in certain cultures the belief of the 'power of virgin' in that sex with a virgin -and by extension the first blood— could cure a venereal disease." জেসিকা তার ভ্যাম্পায়ার অবস্থায় তার রক্ত দিয়ে সারিয়ে তুলতে পারে, যদিও সে অতিপ্রাকৃত তাও যেহেতু সে তার ভার্জিনিটিকে বা 'রিজেনারিটিভ'

হাইমেনকে অক্ষত রেখেছে, তাই সে পবিত্র।

এইভাবে আমরা দেখি হিন্দি এবং ইংরেজি রুপোলি পর্দায় সতীত্ব এবং হাইমেনকে সমার্থক ধরেই সব সময়ে নারীকে এক অত্যন্ত কঠিন পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এবং তথাকথিত দর্শক তা অত্যন্ত ভালোভাবেই গ্রহণ করেন।

হাইমেনঃ অ্যান ইভিল মিথ

হাইমেন একটি মিথ তো বটেই। তবে তা 'গুড','ব্যাড' নাকি 'ইভিল' তা বোঝা বেশ দুস্কর। তবে 'গুড' যে নয় তার প্রমাণ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ সর্বত্র মিলেছে। "The Hymen, a Useless symbol নামক একটি নিবন্ধে Sharon. Olds এর 'Ode to the Hymen' এর একটি উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। তা হল

"I don't know who
invented you— to keep a girl's
inwards
clean and well-cupboarded."

এর থেকেই বোঝা যায় যে হাইমেন-এর বিষয়টি একটি 'মিথ' ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে পুরো নিবন্ধটি পর্যালোচনায় আমরা এটি সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে এই মিথটি খুব কম ক্ষেত্রেই নারীজীবনে ভালো কিছু নিয়ে এসেছে বরং নিয়ে এসেছে মানসিক এবং শারীরিক বিপর্যস্ততা। এখনকার দিন হলে এই বিষয়ে ট্রোলিং ও মনে হয় করা হত। অথচ সবার ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় না, কিন্তু হেনস্থাটির কমতি হয় না। সেই কারণেই এটিকে 'ইভিল মিথ'এর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

খুব সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বই এর সমালোচনা চোখে পড়ে। বইটির নাম 'পান্তীর মাঠ'। লেখিকা শ্রীমতি কৃষ্ণকামিনী দাসী। লেখাটির নামটি আমাকে আকর্ষণ করে সব থেকে বেশি —" শুধু নারীই কেন প্রেমে কলঙ্কভোগী?" খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নিবন্ধটির সাথে আমার বুক রিভিউটির খুব সাদৃশ্য মনে হয়। বিবাহিতা বালিকা বধূ, এক সন্তানের কিশোরী মা পরিণত বয়সে লিখে গিয়েছেন তার পরপুরুষের প্রতি প্রেমানন্দ ও কলঙ্কভাগিতা দুয়েরই বয়ান, অকপটে। অত্যন্ত সাহসী আখ্যান নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্যদিকে সমালোচিত বা কটু বাক্যেরও সম্মুখীন হতে হল বার বার। এই লেখকের ভাষায় নারীবাদের অন্তঃসার সুস্পষ্ট। আসন্নপ্রসবা বধূকে সাহেব হাসপাতাল, না কি আঁতুড়ঘর, কোথায় নেওয়া হবে, তা ঠিক করেন বাড়ির অভিভাবকেরা: "কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না পর্য্যন্ত... তোর কী মত বল দেখি?"

স্ত্রীর অন্য প্রণয় জানতে পেরে স্তম্ভিত স্বামী যখন বলে "তুমি আমাকে বঞ্চনা করিলে?", এই মেয়ে চোখে চোখ রেখে বলে, "আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক বর্ত্তমান? তাহা কী প্রণয়ের না অভ্যাসের?" সে পরে লেখে: "কলঙ্কের ভাগী কেবল মহিলাগণই হয় কেন?"

তাই সেই প্রশ্ন কিন্তু সেই আদিম কাল থেকে শুরু করে এই বিংশ শতাব্দীর এক সাহসী গৃহবধূর গল্পেও রয়ে যায় যে 'কলঙ্কের ভাগী কেবল নারীরাই কেন!' পুরুষের বহুগামীতায় সমস্যা নেই, কিন্তু নারী একজনের বেশি পুরুষের সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই বলা হবে 'তার হাইমেন অক্ষত নেই, সে অসতী'। হাইমেন তো নিমিত্ত মাত্র, আসল অপুষ্টি বা প্রতিবন্ধকতা প্রাচীন থেকে আধুনিক মননে, মেনে নেওয়ায়... সেই বিষয়ে পরিবর্তন বা সহনশীলতা না আসলে শুধু হাইমেন নয় আরও অনেক ছুৎমার্গ বিষয়ক এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় 'ইভিল মিথ' হয়ে মানবসভ্যতাকে জর্জরিত করবে, কারণ নারীর বা মায়ের অপমান অর্থে মানবজাতির অবমাননাই বটেই।

তথ্যসূত্রঃ

Virgin Envy:The Cultural Insignificance of the Hymen
The Hymen, a Useless Symbol
A Rare Presentation of Imperforate Hymen

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ইদানীং একটা বাড়ির কথাই শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে মনে পড়ে। বাড়িটা ছিল আমার পিসিমার শ্বশুরবাড়ি। বয়স দেড়শোবছর। একতলায় দোকানঘর-টর ছিল। দোতলার একদিকে থাকত আমার পিসিমার ফ্যামিলি আর অন্য অর্ধে থাকত পিসিমার বিধবা ননদ, যাকে আমরা বেবি পিসি বলে ডাকতাম।

পলেস্তারা-খসা, পুরনো সেই বাড়িটার রঙ ছিল ফসিল হয়ে-যাওয়া এক ডায়নোসরের উরুর হাড়ের মতন। সেরকমই সরু, লম্বা আকার। বাদামি রঙের পাথুরে টেক্সচার। তবে একবার ফসিল হয়ে গেলে হাড়ের যেমন আর বদল ঘটে না, চৌষট্টির দুই পানিট্যাঙ্কি-লেনের বাড়িটাকেও তেমনি আর অধিকতর জীর্ণ হতে দেখিনি কখনো।

দোতলার বারান্দার মাঝখানে যে পার্টিশন-ওয়ালটা ছিল, তার গায়ের দরজাটা খুললে পিসিমার অংশ থেকে বেবি পিসির অংশে যাওয়া যেত। যদিও একই ছাদের তলায়, তবু বাড়ির ওই অংশটাকে চিরকাল বেবি পিসিমার বাড়ি বলেই জানি।

পিসিমার বাড়ির পেছনদিকের সেই বারান্দাটা অনেকদিক থেকেই বেশ অস্বাভাবিক ছিল। বারান্দাটার নীচে একটা খুব সরু গলি ছিল। গলিটার মধ্যে দিয়ে কোনোদিন কোনো মানুষকে যাতায়াত করতে দেখিনি। তবে নির্জন দুপুরে বেজিদের খেলা করতে দেখেছি ওখানে। পাঁচিলের পুরনো ইটের খাঁজে উত্তুরে হাওয়ায় জাত-সাপের খোলস দোল খেতো। গলির একপাশে পিসিমার বাড়ির মতনই পুরনো কয়েকটা বাড়ি। অন্য পাশে সেন্ট জোসেফের মলিন গির্জা আর তৎসংলগ্ন ভবঘুরে-আশ্রমের উচু পাঁচিল।

বারান্দায় গেলে দেখতে পেতাম, ভবঘুরে আশ্রমের পাঁচিলঘেরা মাঠে দাঁড়িয়ে কিছু লোক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের রোগা শরীর, ন্যাড়া মাথা, ফ্যাকাশে গায়ের রঙ। পরণে তাদের সাদার ওপরে ছাইরঙের স্ট্রাইপড ঢোলা জামা আর পায়জামা। ছোটবেলায় আমি ওদের দেখে ভয় পেতাম।

পার্টিশন-ওয়ালটার গায়ে যে কাঠের পাল্লা-দুটো ছিল, তাদের গায়ে কোনো এককালে সবুজ রঙ করা ছিল হয়তো। তবে আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখছি, সেই রঙের আভাসটুকুই মাত্র রয়েছে। ছোটবেলায় ওই পাল্লার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে আমি বেবি পিসির ঘরসংসার দেখবার চেষ্টা করতাম। কখনো-কখনো বেবি পিসিও আমার চোখের নড়াচড়া দেখতে পেয়ে যেত। হঠাৎ করেই খিল খুলে আমার হাত ধরে পার্টিশনের ওপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলত, লুকিয়ে দেখিস কেন? দরজায় নক করলে কি আমি দরজা খুলব না? দেখ! ঘুরে ঘুরে দেখ তোর পিসেমশাইয়ের পাপের সম্পত্তি।

আমি বালকের দ্বিধাজড়ানো পায়ে দুটো ঘরের লাল-মেঝে মাড়িয়ে হাঁটতাম আর দেখতাম বেবি পিসির দেয়াল-আলমারিতে কত পোর্সেলিনের পুতুল। পরী, মৎস্যকন্যা, স্প্যানিয়েল কুকুর, হাতে দুধের বালতি নিয়ে গাউন পরা মেম গোয়ালিনি।

একটা ঘরের মাঝখানে পালিশকরা মেহগনি কাঠের বিশাল পালঙ্ক পাতা ছিল। তার গোটা জমিন স্কটল্যান্ডের কারিগরদের হাতে তৈরি আঙুরলতা আর গোলা্পের তোড়ায় ভরা। পালঙ্কের মাথার দিকে কাঠের জাফরির মাঝখানে ডিমের মতন একটা আয়নাও ছিল। দুধ-সাদা বালিশের ওয়ারে ছিল রঙিন সুতোর আইভিলতা।

আরো কত কি-ই যে ছিল ওই বিশাল দূটো ঘরে। চোঙাওলা গ্রামাফোন ছিল। ব্রোঞ্জ আর মার্বেলের স্ট্যাচু ছিল। দেয়ালঘড়ি আর টেবিলঘড়ি ছিল সব মিলিয়ে আট থেকে দশটা। আর দেয়ালে ছিল গিলটি করা ফ্রেমে বাঁধানো অনেকগুলো অয়েল-পেন্টিং।

কিন্তু বেবি পিসি ছাড়া আর কোনো মানুষ ছিল না।

আমি বেবি পিসির বাড়ি থেকে আবার যখন মাঝখানের দরজা পেরিয়ে আমার নিজের পিসিমার কাছে চলে আসতাম, তখন পিসিমা জিজ্ঞেস করত, কোথায় গিয়েছিলিস?

আমি বলতাম, বেবি পিসির বাড়ি।

পিসিমা গম্ভীরমুখে বলত, কিছু খেতে দিলে খাস না। অত যাবার দরকারই বা কী?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, কেন?

মেয়েটা ভালো নয়। এইটুকু বলেই পিসিমা আমাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে, অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

আমি অবশ্য বেশি যেতামও না ওদিকে। মনেই থাকত না যাওয়ার কথা। সারাদিন আমি পানিট্যাঙ্কি লেনে আমার সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতাম। কখনো কখনো বগলে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে চলে যেতাম একটু দূরে, লেবুতলা পার্কে। ইটের উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলতাম। কিংবা হাওয়াই চটির গোলপোস্ট বানিয়ে রবারের বলে ফুটবল। ছুটির সেই দিনগুলোতে খেলা নিয়েই মেতে থাকতাম বেশি। মা, বাবা, বেবি পিসি, মাস্টারমশাই, কারুর কথাই তখন মনে পড়ত না।

তবু কখনো-কখনো সন্ধের মুখে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় হঠাৎ করেই চোখ চলে যেত পিসিমার বাড়ির দোতলার দিকে। অবাক হয়ে দেখতাম, দোতলায় মাত্র দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে— পিসিমার অংশের ঘরদুটো। বেবি পিসির দুটো ঘর আমি বাইরে থেকে অনেকবার দেখবার চেষ্টা করেও দেখতে পাইনি।

হয়তো পেছনের ওই গলিটায় গিয়ে মুখ তুলে তাকালে, বেবি পিসির

ঘরদুটো দেখতে পেতাম। সেই চেষ্টা করিনি যে তাও নয়। কিন্তু কখনোই গলিটায় পৌঁছনোর পথ খুঁজে পাইনি। পানিট্যাঙ্কি-লেনের ঠিক কোনখান থেকে যে গলিটা শুরু হয়েছিল কে জানে।

***

একেকটা শীতের ছুটি ফুরিয়ে যায়, আমি নিজের বাড়িতে ফিরে যাই। পরের বছর শীতকালে আবার যখন পিসিমার বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসি, তার মধ্যে আমার একবছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে। স্কুলের উঁচু ক্লাসে একধাপ উঠে গেছি। পায়ে কড়া লোম গজাচ্ছে। ঠোঁটের নীচেও হালকা রোম। গলা ভাঙছে।

তবে এইসবই তো বাইরের বদল। ভেতরের বদলটা হঠাৎই এলো সেইবার, বেবি পিসির হাত ধরে।

নিস্তব্ধ দুপুরে আমি বরাবরের মতন বারান্দার দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি বেবি পিসি এদিকেই তাকিয়ে আছে। আমার চোখের মণিটা নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল, তাই দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিল।

বলল, কত বড় হয়ে গেছিস। কত লম্বা হয়ে গেছিস। যা, ওখানে বসে বইটই পড়। আমি চান করে আসছি।

সত্যিই, আগের বছরের তুলনায় প্রায় এক ফুট বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই সেদিন আমার চোখের নাগালে এসে গিয়েছিল বেবি পিসির দেয়াল আলমারির সবচেয়ে ওপরের তাকটা। দেখেছিলাম সেই তাকটায় শুধুই পোর্সেলিনের তৈরি নানারকমের ল্যাঙটো পুতুল সাজানো রয়েছে। বিলিতি সব মিথুনমূর্তি— কমিক্সের ছবির মতন। স্থূলাকার লোকগুলোর গায়ে শুধু কোট; প্যান্ট নেই। তাদের মুখে শয়তানি হাসি আর দু-উরুর ফাঁক থেকে মাটির সঙ্গে সমকোণে বেরিয়ে আছে তাদের অস্বাভাবিক দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ। মেয়ে পুতুলগুলোর গায়ে কোনো পোষাকই নেই, তাদের উরুসন্ধিতে সাদা চিনেমাটির ওপরে গাঢ় খয়েরি রঙের তিনকোনা প্রলেপ।

শৈশব পেরিয়ে গিয়েছিলাম বলেই সেদিন প্রথম খেয়াল করলাম, দেয়ালের অয়েল-পেন্টিংগুলো জুড়েও উলঙ্গ পুরুষ আর উলঙ্গিনী নারীদের ভিড়।

আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। গলার ভেতরে কে যেন এক শিশি আঠা উপুড় করে দিয়েছিল, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। তারমধ্যেই হঠাৎ শোয়ার ঘরের লাগোয়া স্নানঘরের দরজা খুলে বেবি পিসি বেরিয়ে এল। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই, হাতে কিছু ভিজে পোশাক নিয়ে

চলে গেল বারান্দার দিকে।

বেবি পিসির আদুল গায়ে তখন শুধুমাত্র একটা ভিজে শাড়ি জড়ানো ছিল। আমি দেখলাম, ওইসব পুতুল-মেমসাহেব আর দেয়ালের ছবির মতনই বেবি পিসির শরীর। হয়তো তার চেয়েও সুন্দর।

তাই দেখে পোর্সেলিনের তৈরি অসভ্য-সাহেবদের মতই আমার লিঙ্গোত্থান ঘটল এবং বারান্দায় কাপড় মেলে ঘরে ঢুকবার জন্যে দরজায় পা রাখতেই বেবি পিসির সেটা চোখেও পড়ল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, বেবি পিসি আমার কোমরের নীচের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর চোখদুটো একবার বিস্ময়ে একটু বড় হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল; তার বদলে পাতলা ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল মজা-পাওয়া হাসিতে। শাড়িটা গা থেকে খুলতে-খুলতে বেবি পিসি আমাকে ডাকল, আয়।

বেবি পিসির বাড়ি থেকে সেদিন ফেরার পরে, আমার চোখমুখ দেখে আমার নিজের পিসিমা কিছু বুঝে থাকবে। পরেরদিনই দেখলাম একটা ছুতোর এসে পার্টিশনের দরজার ওপরে আরো একটা তক্তা ঠুকে ওটাকে পার্মানেন্টলি সিল করে দিয়ে গেল। অবশ্য না করলেও কিছু যেত আসত না। আমি নিজেই আর যেতাম না ওদিকে। চোদ্দ-বছর বয়সে সেই সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আমার তীব্রভাবে খারাপই লেগেছিল, শরীরে এবং মনে।

পরের বছর, মানে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই শীতের ছুটিতে পিসিমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, তখন না ছিল আর রাস্তায় খেলার বয়স, না ছিল পড়াশোনার ঢিলেমি দেওয়ার সুযোগ। গেলেও একবেলার জন্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে যেতাম। দোতলায় না উঠেই ফিরে আসতাম বেশিরভাগ দিন। ক্রমশ ভুলেই গেলাম যে পিসিমার বাড়িটায় একটা বারান্দা আছে, সেখান থেকে ভবঘুরে আশ্রম দেখা যায়। পার্টিশন-ওয়ালের ওদিকে পিসিমার বিধবা ননদ থাকে, যাকে বেবি পিসি বলে ডাকতাম।

***

তারপরে আরো কত বছর যে কেটে গেল। বেবি পিসির বাড়ি ছাড়া আর কিছুই প্রায় মনে করতে পারি না ইদানিং। বেবি পিসি ছাড়া আর যাদের মনে পড়ে তাদের মধ্যে আছে নন্দিতা বলে খুব ফরসা আর রোগা একটা মেয়ে। মনে হয় মেয়েটা আমাকে খুব ভালোবাসতো কিন্তু একলা ঘরে ওর মুখোমুখি পড়লেই আমি ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম, কাঁদতাম, লুকোতে চাইতাম। রাত্রি হলে ও আমার পোশাক খুলে নিতে চাইত, কিন্তু আমি খুলতে দিতাম না।

নন্দিতা আমাকে একজন দাড়িওলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবুর জেরার চোটে আমি বেবি পিসির বাড়িতে সেই দুপুরে যা-যা ঘটেছিল, সবই বলে ফেলেছিলাম। ডাক্তারবাবু সব শুনে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ইয়েস, দ্যাট সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ মাইট হ্যাভ ট্রিগারড হিজ গাইনোফোবিয়া। গাইনোফোবিয়া মানে জানেন তো? মানে মহিলায় আতঙ্ক; যেটা এনার ক্ষেত্রে ঘটছে।

তারপর সেই দাড়িওলা আমাকে অনেকগুলো ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। সপ্তাহে একদিন করে ওঁর চেম্বারে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন যাবো? কেনই বা ওষুধ খাবো? আমি কি অসুস্থ না পাগল? কাজেই সেই বাড়িটা যেখানে নন্দিতা আর আমি ছিলাম, সেটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর এখানে কেমন করে এসে পৌঁছলাম কে জানে। তবে এসে দেখছি ভালোই হয়েছে। কতবছর বাদে আবার পিসিমার সেই বাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছি। ডাইনোসরের উরুর হাড়ের মতন লম্বা বাদামি একটা বাড়ি। তার দোতলায় কাঠের রেলিং দেওয়া সরু বারান্দা। আমার পেছনে সেন্ট জোসেফের মলিন গির্জাঘর। পায়ের কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দুটো বেজি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে পিছনদিক থেকে আগে কখনো পিসিমার বাড়িটাকে দেখিনি। সামনে যে উঁচু পাচিলটা রয়েছে, তার ওদিকে নিশ্চয় সেই

সরু গলি, যেটাকে আমি এর আগে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি।

দোতলার বারান্দায় রেলিং-এ দুই কনুই রেখে, হাতের তালুর মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখটাকে রেখে বেবি পিসি দাঁড়িয়েছিল। বেবি পিসি এত বছরেও একটুও বদলায়নি। ফসিলেরা বদলায় না। এখনো বেবি পিসির গায়ের ভিজে শাড়ি থেকে টুপটাপ জল ঝরে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। বেবি পিসির চিনেমাটির উরুর মাঝখানে বল্লমের ফলার মতন ধারালো ত্রিভূজ।

এই পৃথিবীর আর কেউ বেবি পিসিকে দেখতে পাচ্ছে না।

শুধু ভবঘুরে আশ্রমের বাগানে দাঁড়িয়ে আমি, আমার পরণে সাদার ওপরে ছাইরঙের স্ট্রাইপড ঢোলা জামা আর পাজামা, চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম বেবি পিসির নিষ্ঠুর শান্ত মুখ। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - সৌমিক পাল
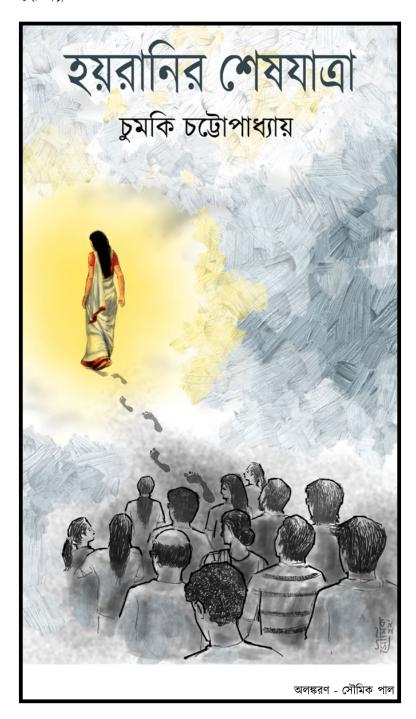
হয়রানি হল ভারতীর মেয়ে। কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে ভারতীর মাথায় ঠেসে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে হাবু বলেছিল, ' আজ থিকে তুই আমার বউ, বুইলি। '

একটু অবাক হয়েছিল ভারতী। পুরুত নেই, মন্ত্র নেই, এমন কি মাকালীর সামনে দাঁড়িয়েও সিঁদুর পরানোর পাট নেই, সার সার দোকানের একটা থেকে এক পাতা সিঁদুর আর দুখানা পাতলা শাঁখা কিনে ভারতীকে টেনে খানিক আড়ালে গিয়ে কাজ সারল হাবু। এ কেমনতরো বিয়ে রে বাপু!

ভারতীর একটা আস্তানা দরকার ছিল। সৎ মায়ের জ্বালায় কাটোয়ায় থাকতে না পেরে কলকাতার বাসে উঠে বসেছিল এক ভোরে। অচেনা অজানা শহরের ফুটপাত আশ্রয় দিয়েছিল ভারতীকে।

ফুটপাতের অনেকদিনের বাসিন্দা তরলামাসি সব শুনে বলেছিল, 'আমার গা ঘেঁষে থাক রে মেয়ে, যদি এরা বোঝে তুই একা, তালে ছিঁড়ে খাবে। বলবি আমি তোর মাসি হই। বাকি আমি সামলে নেব।'

আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে— এই প্রবাদবাক্যটা জানে না ভারতী। কিন্তু না জানলে কি আর খাটতে নেই! কে বলেছে নেই, ভারতীর সঙ্গেই তো ঘটে গেল ঘটনাটা।

মাস খানেক বাদে একটা ঠিকে কাজ জোগাড় করে দিল তরলামাসি। তারপর আরো একটা জুটলো। এতদিন তরলার দয়াতেই খাবার জুটছিল ভারতীর। কাটোয়া থেকে আসার সময় কেবল মায়ের দেওয়া কানের ফুলজোড়া আনতে পেরেছিল সে। সে দুটো বেচে ভারতীর হাতে কিছু টাকা দিয়েছিল।

মাইনে পেয়ে ভারতী বলল, 'মাসি, এতদিন তো তুমি আমার দেখভাল করলে, এখন থেকে আমি তোমার দেখাশোনা করব।'
তরলার চোখে জল। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে সে বলল, 'তুই বড় নক্ষী মেয়ে রে মা, তবে আমার শরীর গতিক ভালো নয় রে। কবে আছি কবে নেই, নিজের এবার যাহোক একটা ব্যবস্থা কর মা।'

মাসি যতই ভালো হোক, ফুতপাতে থাকতে আর ভালো লাগছিল না ভারতীর। দু নম্বর কাজের বাড়ির তলাতেই রিক্সাস্ট্যান্ড। চার পাঁচখানা

রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়। তার মধ্যে একজন হাবু। মাঝেমাঝে বৌদি যখন বাজারে যায়, হাবুর রিক্সাতেই যায় বেশির ভাগ।

বাজার করে ফিরলে ভারতীর ডাক পড়ে। ভারতীর হাতে বাজারের থলে দিতে গিয়ে ইচ্ছে করে যেন হাত ছোঁয়ায় হাবু। গা ছমছমিয়ে ওঠে ভারতীর। এরপর ভারতী কাজ সেরে ফেরার সময়ে পিছু পিছু রিক্সা নিয়ে আসা শুরু হয় হাবুর।

'এই যো, রিস্কায় ওঠো না, পৌঁচে দোবো।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে পেছন পেছন আসত হাবু। দিনের পর দিন ঘুরঘুর করতে থাকায় সাড়া না দিয়ে পারে না ভারতী।

যেদিন প্রথম কানাগলিতে হাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল ভারতী, সেদিনই জেনে নিয়েছিল ওর থাকার ঘর আছে কিনা। আছে শুনে আর দুবার ভাবেনি ভারতী, বিয়েতে ও রাজি জানিয়ে দিয়েছিল।

বিয়ের পর এক মাস কাটতে না কাটতেই ভারতী বোঝে তার পেটে বাচ্চা এসেছে। হাবুকে সে কথা বলতেই তার মেজাজ গরম হয়ে যায়। 'এই সেরেচে, বাচ্চাকাচ্চা আমার ভালো লাগেনা বাপু, আপদ যত। তুমি খসিয়ে দাও বরন, আমি গঙ্গা ডাক্তারের সঙ্গে কতা বলে আসব'খন।'

ভারতী বুঝে গেছিল হাবুর ধরন। এমনিতেই রোজগারের আদ্ধেক টাকা মদে ওড়ায়। নেহাত ভারতীর কিছু রোজগার আছে তাই ভাতে ভাত জোটে। কিন্তু বাচ্চা হলে তো খরচ বাড়বে, তার জোগান কে দেবে।

যেদিন গলা অবধি মদ গিলে এসে ভারতীকে টেনে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে চাইছিল হাবু, সেই রাতেই হাবু ঘুমিয়ে পড়লে ঘর ছেড়েছিল ভারতী।

এ পথ সে পথ ঘুরে শীতলকুচি পৌঁছয় সে। শীতলকুচিতে তার মামাবাড়ি ছিল । মা মরে যাবার আগে বেশ কয়েকবার এসেছে সেই বাড়িতে। এখন আর ওর বাড়িটার হদিস মনে নেই। কেবল বড়মামার নামটুকু মনে আছে, বলাই দাস।

রাতটুকু মন্দিরের দাওয়ায় কাটিয়ে সকালে খোঁজ করতে বেরয়

ভারতী। বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে খোঁজ করতে থাকে কিন্তু কেউ বলতে পারে না। সারাদিন ঘুরে রাতে সেই মন্দিরে গিয়েই শোয়ে ভারতী।

এভাবে থাকতে থাকতেই একদিন ভারতী পুরুতমশাই শান্তিনাথ ভট্টাচার্যের চোখে পড়ে যায়। শান্তিনাথাবাবু সব জেনে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান ভারতীকে। বাড়িতে যথেষ্ট আপত্তি ওঠে। শান্তিবাবুর স্ত্রী, ছেলে, বৌমা কেউই এই অপরিচিত সন্তানসম্ভবা মহিলাকে রাখতে রাজি হয় না। সেই রাতটুকু কাটিয়ে ভোর হতেই বেরিয়ে আসে ভারতী।

এক সকালে দেখা যায় শীতলকুচি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে পড়ে আছে এক হতদরিদ্র মহিলা আর তার পাশে কেঁদেই চলেছে এক শিশু কন্যা। হইচই পড়ে যায়। মহিলার দেহে প্রাণ নেই। বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষা দেওয়া হলেও কেউ আর তার দায়িত্ব নিতে চাইল না। আজকাল নানান ঝামেলায় পড়তে হয় এসব ব্যাপারে। কিন্তু এই দুধের শিশুকে কোথায় রাখা যায়!

তাইরে নাইরে করতে করতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই থেকে গেল মেয়েটি। সারাদিনই সে চিৎকার করে কাঁদে। হাত খালি থাকলে কোনও সিস্টার এসে খাইয়ে দিয়ে যায়, ব্যস্ত থাকলে কেউই আসে না। বাচ্চাটাকে নিয়ে হয়রান হয়ে যায় সকলে। ওর নাম হয়ে যায় হয়রানি।

খেয়ে না খেয়ে, ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে দিন পার হতে থাকে, বড় হতে থাকে হয়রানি। পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পড়েছে সে। খুব কথা বলে মেয়েটা। এখন সে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়া বুড়ি গায়ত্রীর কাছেই এককামরা কোয়ার্টারের বারান্দায় থাকে। প্রাথমিক স্কুলে যায়, দুপুরের খাওয়াটা সেখানেই জুটে যায়। আর ঘুরে বেড়ায় কাছাকাছির দোকানপাট গুলোতে। কেউ হাতে একটা বিস্কুট দেয়, কেউ বা একটা লজেন্স। কোনো কোনো দিন সন্তান না হবার শোক উথলে ওঠে পঞ্চাননের মনে। সেদিন হয়রানির হাতে একটা টিফিন কেক ধরিয়ে দেয় সে।

অনেকেই পঞ্চাননকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'তোমাদের তো ছেলেপেলে নেই, হয়রানিকে মানুষ করো না।'

বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে কথাটা বলেছিল পঞ্চানন।শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল সন্ধ্যা, 'দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভালো কতাটা জানো না নাকি? কোথাকার কোন বাচ্চা, বাপের ঠিক নেই, তাকে ঘরে তুলতে যাব কেন

শুনি?'

পঞ্চানন আর কথা বাড়ায়নি, সরে গেছিল সেখান থেকে।

গায়ত্রী মাসি নিজের ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে হয়রানির চুল আঁচড়ে টাইট করে বেঁধে দিতে দিতে বলে, 'তোর মায়ের কিন্তু বুদ্ধি ছিল। মরবি তো মর, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে এসে মরেছে। আদাড়ে বাদাড়ে মরলে তোর কী হত বল দেখি?'

'আমি যখন মরব, তখন অনেক লোক থাকবে।' হয়রানির পাকাপোক্ত কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে মরত গায়ত্রী। বলত, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারানি তো তুই! সব প্রজারা এসে জড়ো হবে তুই মরলে। যা পালা, কাজ আছে আমার।'

তারপর... চল্লিশ বছর পর।

প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো কাচে ঢাকা গাড়ি ধীর লয়ে এগিয়ে চলেছে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ মিলেমিশে অদ্ভুত এক ভারী গন্ধ তৈরি করেছে। ভেতরে শায়িত মধ্যবয়েসী মহিলা। গাড়ি ঘিরে প্রচুর মানুষ। মৃদু লয়ে কথা বলতে বলতে তারাও পা মিলিয়েছে সেই মন্থর গাড়ির গতির সঙ্গে।

রাস্তায় চলাচল করা অনেক মানুষই জানতে চাইছে, 'কে চলে গেল, এত লোক?' ভীড়ের ভেতর থেকেই কেউ একজন জবাব দিল, 'হাসিরাশিদেবী। যাত্রা জগতের সম্রাজ্ঞী।'

'কী অভিনয় করতেন, মনে হত জীবনের থেকেও বেশি সত্যি। ওই "মায়ের কান্না" পালাটায় মৃত সন্তানকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কান্না — উফ, আসরে হেন দর্শক পাওয়া যেত না, যে কাঁদেনি।'

'আর ওইটা বলো, কী যেন নাম, হ্যাঁ, "সীমানা ছাড়িয়ে" পালায় ওই পাকিস্তানি মহিলার চরিত্র। কে বলবে উনি পাকিস্তানি নন! যেমন উর্দু উচ্চারণ তেমন অঙ্গভঙ্গি। যাত্রা জগতের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেল!'

এরা কেউ জানে না আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রগতিশীল যাত্রা সংস্থা এসেছিল শীতলকুচিতে। হয়রানি গেছিল দেখতে। যাত্রা শেষ হবার পর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে।

'হেই, হেই মেয়ে, এখানে ঘুমুচ্ছিস কেন? পালা তো শেষ হয়ে গেছে, যা, বাড়ি যা।'

চোখ কচলে উঠে বসল হয়রানি। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। চারিদিক তাকিয়ে একটাও চেনা মুখ দেখতে পেল না। ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুনে এসে হাজির হয়েছেন পালার মূল চরিত্রের অভিনেতা রবিশংকর জানা। সব শুনে তিনি বললেন, 'এত রাতে এই অল্পবয়সী মেয়েটাকে একা ছাড়া ঠিক হবে না। রাতটুকু থাক, সকালে চলে যাবে। কিছু খেতে দিয়ে দিও।'

সেই থেকে আর ফেরা হয়নি হয়রানির। পাকাপাকি থেকে গেছিল ওদের দলে। চা জলখাবার জনে জনে দেওয়া, কাপড়চোপড় মেলা তোলা, এরকম ফাইফরমাশ কাজের বদলে চার বেলা খাওয়া দিত মালিক। ভালোই লাগত হয়রানির। মাঝে একবার শুধু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে গায়ত্রীমাসিকে বলে গেছিল, এখন আর ফিরবে না।

পালাগুলো দেখে দেখে সকলের পার্ট মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল হয়রানির। মাঝে মাঝে কাগজ না দেখেও দিব্বি প্রম্পটারের কাজ করে দিত। অবসর সময়ে এর ওর চরিত্র অভিনয় করে দেখাত সে। অবাক হয়ে যেত সবাই। আসল অভিনেতা অভিনেত্রীর থেকে ওর অভিনয় জোরালো যে, সেটা সকলেরই চোখে পড়ত।

এরপর যেটা হবার সেটাই হল, হয়রানি অভিনয়ে ঢুকে পড়ল। প্রগতিশীল যাত্রা সংস্থা তরতর করে উন্নতি করতে লাগল। হয়রানি বদলে গেল হাশিরাশিতে। সিনেমায় অভিনয়ের ডাক আসতে লাগল। কিন্তু তাতে রাজি হল না হাসিরাশি। 'যে মঞ্চ আমাকে থাকার জায়গা দিয়েছে, ভালোবাসা দিয়েছে, সেখান ছেড়ে আমি কোত্থাও যাব না।'

একেকটা পালা সুপারহিট হচ্ছে। হাসিরাশিদেবীর নাম জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁচ্ছে। টেলিভিশনের ন্যাশনাল বাংলা চ্যানেল থেকে সাক্ষাৎকারের ডাক এল। এক কথায় প্রগতিশীল যাত্রা সংস্থা একটা বিশেষ উচ্চতায় উঠে গেল হাসিরাশিদেবীর জন্যে। মালিক খুশি, সহশিল্পীরাও খুশি।

অবসর সময়ে একদিন সবাই মিলে বসে গল্প গুজব করছে। আলুর চপ, বেগুনি দিয়ে মুড়ি আর চা খাওয়া চলছে। দলের একটি জুনিয়র ছেলে আশিস, হাসিরাশিদেবীকে জিগ্যেস করে বসল, 'দিদি, আপনি তো

কত কিছু পেলেন জীবনে। টাকা পয়সা, নাম, যশ। আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছে আছে কি?'

সবাই একটু থমকে গেল। এধরণের প্রশ্ন আদৌ করা উচিত কি! আগে উনি যা ছিলেন, ছিলেন। এখন তো যথেষ্ট নামী মানুষ। আশিস নিজেও বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছিল প্রশ্নটা করে।

হাসিরাশি একটু হেসে বলে উঠল, 'আছে বৈকি চাওয়ার জিনিস। আমি চাই মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহের সঙ্গে এত মানুষ যাবে যে রাস্তার লোক অবাক হয়ে ভাববে, "কে মারা গেল যে মানুষের মিছিল যাচ্ছে সঙ্গে!" জানি না, সে ইচ্ছে পূরণ হবে কি না। নিঃসঙ্গ মৃত্যু আমি চাই না।'

'কী যে বলেন দিদি, কতই বা বয়েস আপনার, এখনই মরার কথা কেন? শুভ চিন্তা করুন।' অসীম বলে।

'বয়েস দিয়ে কি আর মরা বাঁচা হিসেব হয়। আমি বেশিদিন বাঁচতে চাই না,মোটে চাই না। বেশিদিন বাঁচলে সম্মান থাকে না। জানি না, কপালে কী আছে!'

হয়রানিকে আর হয়রান না করে ওর ইচ্ছেতে 'তথাস্তু' বললেন ঈশ্বর। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসেই হৃদয় কাঁপিয়ে চলে গেল অতীতের হয়রানি, এখনকার হাসিরাশিদেবী। ওর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অন্যান্য যাত্রা দলের শিল্পীরাও দলে দলে এসে হাজির হল। সকলের মুখে একই কথা, এমন উচ্চমানের শিল্পী আর পাওয়া যাবে না। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল যাত্রা মহলের।

এক ঠোঁট হাসি নিয়ে অন্য দুনিয়ায় বসত গড়তে চলল হয়রানি। পূরণ হয়েছে তার অন্তরের সাধ।

সূচিপত্র

আপনারা হয়ত নাও চিনতে পারেন
দেবপ্রিয় মুখার্জী
অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
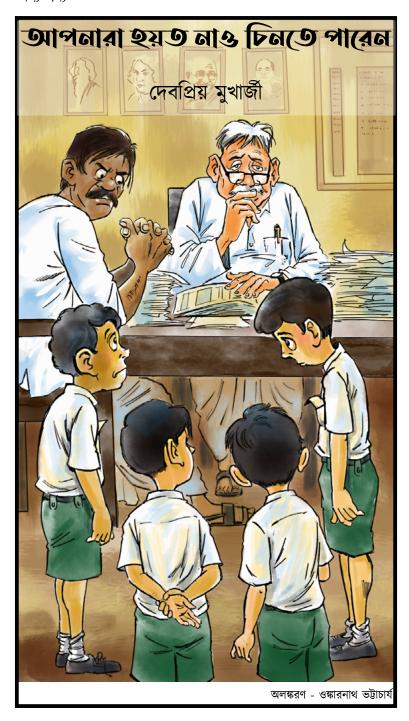
সে তখন ক্লাস সেভেন বা এইট হবে। মাথা কার্টুন গিলে গিলে শুকোচ্ছে, চামড়া দিনদিন মোটা হচ্ছে। মায়ের গুলে দেওয়া কমপ্ল্যান আর মাষ্টারদের গালে দেওয়া চড়থাপ্পড়-ময় সোনার সময় তখন। তবে কমপ্ল্যান যে মানুষকে লম্বা করে না তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আমি। ক্লাস ওয়ানে আমি লাইনের সবচেয়ে পেছন দিকে দাঁড়াতাম। তারপর যত ক্লাস বাড়ছিল , আমি লাইনের পেছন দিক থেকে সামনের দিকে এগোচ্ছিলাম। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানিনা কিন্তু ইস্কুলের প্রার্থনার লাইনকে উচ্চতা অনুসারে সাজানো এক প্রকারের বডিশেমিং। আমি প্রতিদিন এর শিকার হতাম। কিন্তু বডিশেমিং ব্যাপারটা সেকালে সেরকম হিট করেনি বলে আমিও প্রতিবাদ করতাম না। সন্দেহ হত হয়ত মুদিখানা থেকে ভেজাল কমপ্ল্যান দেয় , কারণ আমি চওড়ায় বাড়লেও , লম্বায় বাড়ছিলাম না। বাড়ির লোকজনকে সে কথা বলতে গেলে বলত "ঐ খেয়েই তোর বাকি বন্ধুরা লম্বা হচ্ছে, কিন্তু তুই হচ্ছিস না। কখনই কমপ্ল্যানের দোষ হতে পারে না।"। মনে হয় সেই ক্লাস এইটেই শেষ বেড়েছি। নাইনে হয়ত কিছুটা বেড়েছিলাম , কিন্তু আমাদের ইস্কুলের হেডস্যার ভয়ানক কড়া সমরেন্দ্রবাবু আমার ব্রহ্মতালুতে যে গাঁট্টাটা বসিয়েছিলেন সেটাই আমার উচ্চতা ধ্রুবক করে দিয়েছিলো। সাফারি স্যুট বা প্যান্টশার্ট পরে টিপটপ হয়ে আসতেন। দুই হাত ভাঁজ করে জড়ো করে নিয়ে পোডিয়ামে এসে দাঁড়াতেন, তারপর ইস্কুল রাউন্ড দিতে বেরোতেন।

ধরুন আপনি মাছের বাজারে গেছেন, খুব হল্লা হচ্ছে, এমন সময় ‘গদাম’ করে কোনও একটা লরির টায়ার বার্স্ট করল। মুহূর্তের জন্য যেমন আকস্মিক নীরবতা নেমে আসবে, ঠিক সেরকমই হত হেডস্যার নিজের রুম থেকে বেরিয়ে ইস্কুলের পোডিয়ামে এসে দাঁড়ালে।

ধরুন শামিম ৪৯ এ ব্যাট করছে, বা অমিত বল হাতে নিয়েছে, কেউ হাইবেঞ্চিতে উঠে ঝাঁপ মেরেছে— সব যে যেমন ছিল সেই মুহূর্তে স্টিলফটো হয়ে যেতো। হেডস্যার আসলেন মানে ঘণ্টা পড়ুক ছাই না পড়ুক টিফিন টাইম খতম, চুপচাপ ক্লাসে ঢোক সবাই। তালসারি বিচের লাল কাঁকড়াগুলোর মতন ক্লাসে ঢুকে যেতুম আমরা। এছারাও উনি মাঝে মাঝে রাউন্ড দিতে আসতেন। এক্সমেন সিনেমার কুইক সিলভারের সিনটা দেখে আমি অবাক হইনি। ঐ সিনে সবাই স্থির হয়ে আছে শুধু কুইক সিলভার দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ও সিন আমি ডেলি দেখতুম। হেডস্যার রাউন্ডে বেরোলে, গোটা ইস্কুলের নড়া থেমে যেতো। ভূগোল স্যার অর্ধেক বৃত্ত এঁকে অপেক্ষা করতেন যে হেডস্যার যেন তার ক্লাসে না ঢোকেন।অন্য ক্লাসে অঙ্কের স্যার সিঁড়িভাঙ্গা করতে পারতেন না, ইংরিজির স্যার বাংলা পড়াতে শুরু করতেন, বাংলার স্যার নজরুল

আবৃত্তি করতে গিয়ে জীবনানন্দ শুরু করে দিতেন।

আমার মনে হয় এই যে নেতা মন্ত্রীদের যারা একেবারেই ঠিক করে কাজটাজ করে না আর কি , তাদের প্রত্যেককেই মাস খানেকের জন্যে হেডস্যারের ট্রেনিংয়ে রাখলে ব্যাপারটা মন্দ হত না।

এদের দেখে মনে হয় এদের জীবনে হয়ত হেডস্যারেরা বা হেডমিসরা আসেইনি।

আজকাল ম্যাক্সিমাম পোলাপানই দেখি ইংরাজি মিডিয়ামে পড়াশুনো করে। অন্তত আমার পরিচিতদের মধ্যে কারো প্রজন্মই বাংলা মিডিয়ামের ধারকাছে ঘেঁষে না সেভাবে।যে এলাকায় বাংলা মিডিয়াম নেই , সেই সব এলাকায় কেবল বাপ-মা-রা ছেলেমেয়েকে ইংরেজি মিডিয়ামে ভর্তি করে। আর যাদের ট্যাঁকের জোর কম তাদের ছেলেপুলেকেই দেখেছি বাংলা মিডিয়ামে পড়তে। আজকাল বাচ্চা জনসমক্ষে বাংলা বললে বহু বাবা মা পারলে ব্যাগ থেকে হোলিওয়াটার বের করে গোটা এলাকায় ছিটায়, যাতে বাংলার ভূত ঘাড় থেকে নামানো যায়।অনেকে বাড়িতেও বাচ্চার সাথে ইংরাজিতে কথা বলে। সেদিন আমাদের আবাসনে দেখছিলাম দুই তেলুগু বাচ্চা নিজেদের মধ্যে ইংরাজিতে কথা বলছে, বুঝলাম এই ভাইরাস কেবল বাংলায় ছড়িয়েছে তা নয়।

যাই হোক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বাবার সাথে স্কুটারে করে বাজারে যেতাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবার সাথে বেরিয়েছি, বাজার ঢুকবো ঢুকবো অমনি বাবা ফটাত করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাবার হেলমেটে আমার মাথা ঠুকে গেলো। বাবা স্কুটার দাঁড় করিয়ে আমায় বলল নেমে আয়। দেখলাম সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা একটা বুড়ো আর আমার দিদার মতন ঘিয়ে রঙের ছাপার শাড়ি পরা এক বুড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দোকানদারকে ইশারা করে বললেন যেন জিনিসের দাম না নেয়। তারপর পেছন থেকে বুড়োবুড়ির সামনে এগিয়ে গিয়ে সোজা দুজনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমাকে বললেন "এখুনি প্রণাম কর"। আমি ভাবছি এই দাদু দিদাকে তো কখনও বাড়িতে আসতে দেখিনি। এঁরা তবে কারা?

“স্যার, চিনতে পারছেন? আমি অমরেশ।আটাত্তরের ব্যাচ।”

ভদ্রলোক বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তারপর আমায় আশীর্বাদ করলেন। এবার বুঝলাম বয়স্ক ভদ্রলোক বাবার মাষ্টারমশাই।

আমার প্রসঙ্গে খানিক বাক্য বিনিময়ের পরে তারপর বাবা স্যারের থেকে ব্যাগ নিয়ে নিলো। নিজে বয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের রিকশায় চাপিয়ে দিয়ে এলো। তারপর আমায় বলল “আমাদের হেডস্যার রে। ইস্কুলের স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালে আমরা ভয়ে দৌড়ে ক্লাসে পালাতাম।কী

দাপট ছিল।এখন চেহারাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ”

বাবাকে বাজারের তাড়া দিলাম কারণ আমরা ফিরলে মা রান্না বসাবে। এদিকে আমার বাড়িতে গৌতমবাবুর সায়েন্স গ্রুপের ব্যাচ বসবে। আমার মা আবার গৌতমবাবুর ভক্ত। সপ্তাহে তিনদিন আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে তুলোধোনা করেন, আর তার বিনিময়ে মা তাকে চপ, কাটলেট, অমলেট, গরমকালে চা, শীতকালে কফি ফুলকপির সিঙ্গারা এসব খাওয়ান।

বাবার সাথে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম বাবার এই হেডস্যারের চেহারা মোটেই আমাদের হেডস্যারের মতন দশাসই নয়। ইনি ওরকম ছয়ফুট লম্বাও নন। আমার অবাক লাগলো এই ভেবে যে এঁকে দেখে আমার ছয়ফুট লম্বা বাবা ভয় পেত।

ইস্কুলের আসল মজা ছিল শুক্রবার। শুক্রবারে কিছু কিছু মুসলিম ছেলেরা দোহরের নমাজ পড়তে যেতো; তাই আমাদের টিফিন হত ডবল পিরিয়ডের। যাদের বাড়ি ইস্কুলের থেকে কাছে আর সাইকেল ছিল তারা বাড়ি যেতো ভাত খেতে, আর আমরা যারা ইস্কুলে টিফিন নিয়ে আসতাম , বা ইস্কুলের বাইরেই কখনো একটাকার চটপটি, কখনো দুটাকার ফুচকা, আটআনার বিস্কুট আইসক্রিম, দুটাকার ঘুগনি, পিয়ারা মাখা, কয়েৎবেল মাখা, লুচি বা মুড়ি দিয়ে টিফিন সেরে ফেলতাম, তারা খেলতাম পাঁচের বদলে দশ ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ। দেওয়ালে দাগ কেটে হত উইকেট, সস্তার রবার্ট ডিউস বল থাকতো ব্যাগে, ইস্কুলের হাই বেঞ্চির পায়া ভাঙ্গা হত ব্যাট। হাওয়াইচটি জড়ো করে হত বোলারস এন্ড। আম্পায়ার থাকত না, কারণ "বিশ্বাসে মেলায় আউট-নটাউট, তর্কে মারামারি”।

আর ছিল দুই শকুন যারা ঐ দুই পিরিয়ডের ফাঁকা সময় আগে আগে সব পড়া করে নিত। তাদের খালি স্যার ম্যাডামদের কাছে নাম কামানোর তাল। তাদের মধ্যে আবার একটা ছিল মনিটর। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ক্লাসে গোল বাধালেই সে নরাধম গিয়ে মাষ্টারমশাইদের কাগজের টুকরোয় নাম লিখে জমা দিত। তাই কারো কারো ক্লাস শুরুই হত বেঞ্চে কান ধরে দাঁড়িয়ে নয়ত ক্লাসের কোণে নিলডাউন হয়ে, নয়ত একটা রুলের ঘা হজম করে। নিজের ক্লাসের বন্ধুদের সাথে এভাবে বেইমানি করত কী করে কে জানে।

তবে সবচেয়ে ঝুঁকির সময় আসতো শীতকালের খড়ি ওঠা জানুয়ারি মাসে। মাঘমাসে একটা মেলা হত গোটা মাস জুড়ে। প্রথম সাত দিন হত আদিবাসীদের, তারপর তিন দিন মুসলমানদের, তারপর সবার

জন্যে। আমরা অবশ্য মানতাম না ওসব, প্রতিদিনই ঢুঁ দিতাম মেলায়। হাঁ করে দেখতাম পেল্লায় নাগরদোলাটাকে। সিনেমা আর খেলোয়াড়দের পোস্টারের দোকান ছিল আমার প্রিয়। তারপর ছিল খেলনা আর হরেক মাল দু-টাকার দোকান। এছাড়া ঢাকাই পরোটা, পেটাই পরোটা, গজা, জিলিপি, ঝুড়িভাজা, অমৃতির দোকান। আমরা খোলাসুদ্ধু বাদাম কিনে বিটনুন দিয়ে খেতে খেতে গোটা মেলা চষে বেড়াতাম। কৃষ্ণনগর থেকে আসতো মাটির পুতুলের স্টল। অবাক হয়ে ভাবতাম কী করে মানুষ মাটি দিয়ে অবিকল রবিঠাকুরের মূর্তি বানাচ্ছে, এমনকি গান্ধীবুড়ো আর নেতাজির চশমাটাও বানিয়েছে লোহার তার রং করে। আর ছিল একটা বুড়োর বইয়ের দোকান। সেখান থেকে বই কেনা হত। সব সরু সরু বই। গোপাল ভাঁড়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন, ধাঁধার বই আর ছিল বিচিত্র সব ভূতের বই। বাঁশবাগানের ভূত, গরুরগাড়ির ভূত, রেলগাড়িতে ভূত। ছিল নানা রূপকথার গল্প। আরও কত যে বই ছিল তার ইয়ত্তা নেই। তবে সবচেয়ে ভিড় হত ম্যাজিকের দোকানে। রোগাসুটকো ম্যাজিশিয়ান বিড়ি মুখে তাজ্জব করে দেওয়া সব ম্যাজিক দেখাত। আর তার দোকান থেকে আমি কিনতাম নানা রকম ম্যাজিকের জিনিস। বাড়িতে পিসি আসলে, তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বাহবা কুড়নো আর তার বদলে পাঁচ টাকা, দশ টাকা জোগাড় করা ছিল তার প্রধান মজা।

আদিবাসীরা আসতো লরি বা ট্রাক্টরে চেপে। ঐ সাতদিন হত রোজগার। আমাদের ইস্কুলের অনেক ছেলেই ইস্কুল কামাই করে গাড়ি দেখাশোনা করে, চপ-পাঁপড়ের দোকান দিয়ে টাকা জোগাড় করত। আর মেলা চলাকালীন আমরা কয়েকজন ইস্কুল থেকে যেতুম মেলায়, হাতঘড়ি ছিল না; অতএব ভরসা ছিল ট্রেনের হুইসল, নয় মেলার দোকানদারেরা। ইস্কুলে থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা দিলেই আমরা পাঁচিল টপকাতাম, তারপর সোজা মেলায়, তারপর ছয় পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়বার আগেই ঢুকে পড়তাম ইস্কুলে। যেহেতু ইস্কুলের গেট খোলা আর বন্ধ করায় সময় অপচয় হত তাই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও পাঁচিল টপকাতুম আমরা কয়েকজন। ঝুঁকিপূর্ণ এই কারণেই কারণ আমাদের এইটের ক্লাসে এ সেকশনের সিক্সথ পিরিয়ড ছিল হেডস্যারের। কেন শুক্রবারে এইটের ক্লাসের এ সেকশনের সিক্সথ পিরিয়ডই হেডস্যারকে নিতে হবে এই বিধান বিধাতা পুরুষ লিখেছিলেন সে কথা তিনিই জানেন।

এরকমই এক শুক্রবারের দিন। থার্ড পিরিয়ড শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা জনা চারেক চলে গেলাম পশ্চিমদিকের দেওয়ালে । হাইট কম। সেখান দিয়ে টপকানো ছিল সহজ। ঐ করতে গিয়ে হাত পা ছড়ত , নুনছাল উঠত , চটি ছিঁড়ত, কিন্তু তার থেকে মেলার গুরুত্ব জীবনে

ছিল অনেক বেশি। অতএব ছয়ফুট পাঁচিল থেকে এক লাফে নিচে নেমে দে ছুট। আর ফেরার সময় ইঁটের গাদায় চেপে তারপর আবার পাঁচিলে উঠে নীচে লাফ। এরকমই একদিন ইস্কুল থেকে আগে আগে পালিয়ে মেলায় পৌঁছেছি।বাদাম খেয়ে, হরেক রকম দোকান ঘুরে, নানা রকম খাবার খেয়ে চরম ফুর্তি হয়েছে। আর ব্যাগে রয়েছে গোপাল ভাঁড় ও গরুর গাড়ির ভূত। দোকানদারকে সময় জিগ্যেস করে মাথায় বাজ পড়ল। ইস্কুলের ঘণ্টা পড়তে আর বাকি মোটে পনেরো মিনিট বাকি। আমরা ছুট লাগালাম। ইস্কুলে যখন পৌছালাম ততক্ষণে গেট বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচিল টপকাতে হবে বলে চারজন পশ্চিমদিকের পাঁচিলে উঠেছি। এবার এক লাফ মেরে শেডের নীচে দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দৌড়ে , হেডস্যার ঢোকবার আগে ক্লাসে ঢুকে যাওয়ার অপেক্ষা। বুক দুরদুর করছে কিন্তু অসম্ভব নয় মোটেই। দিলাম লাফ। শেডের তলা দিয়ে চুপি চুপি ক্লাসের কাছে পৌঁছে দেখলাম হেডস্যার তখনও ঢোকেননি। কিন্তু দেখলাম সব বন্ধুরা বিস্ফারিত চোখে আমাদের দেখছে। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। আমি একজনকে জিগ্যেস করলাম "কী হয়েছে রে? এভাবে দেখছিস যে?” সে চোখের ইশারায় পূর্বের দোতলায় দেখাল।

ভয় আমি আগেও পেয়েছি, নানা রকম ভয়। ভূত আমি দেখেছি, সাপ আমায় কামড়েছে, কুকুর আমায় তাড়া করেছে কিন্তু এবার যেটা পেলাম সেটা ভয় কখনই নয়। এই স্বাদটা আতঙ্কের। বুঝলাম আতঙ্কে বুকের ধুকপুক শোনা যায়, মাথা ভোঁভোঁ করে, কানে আর কিচ্ছুটি শোনা যায় না, পেট প্রবল গোঁত্তা মারে। পুবের ব্যাল্কনিতে দেখলাম যমদূতকে। হ্যাঁ যমদূত তারেক স্যারের মতনই দেখতে। কারণ তারেক স্যারের মার একবার যে খেয়েছে সে চিতায় ওঠবার বা কবরে যাওয়ার আগের মুহূর্ত অব্ধি সেকথা ভুলতে পারবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুর্ঘটনায় অনেক স্মৃতি হারালেও তারেক স্যারের মারের স্মৃতি হারাবে না। সম্ভবত উনি হাত দিয়েই নিজের জামা ইস্তিরি করতে পারতেন। রদ্দা মেরে কাঁঠাল ভাঙ্গা বা চেষ্টা করলে নারকেল ফাটাতেও পারবেন। সেই তারেক স্যার আমাদের ইস্কুলের গেট টপকে ক্লাসে ঢোকবার পদ্ধতিটা পুরোটা দেখেছেন।

আমরা জমে গেছি। হাত-পা অসাড়। এবার তারেক স্যার একটা কাণ্ড করলেন। তিনি কিচ্ছু করলেন না। স্টাফরুমের দিকে হেঁটে চলে গেলেন।আমরা তখনও দাঁড়িয়ে আছি। হেডস্যারের দেখা নেই। তারেক স্যারের ও দেখা নেই। দেখলাম ইস্কুলের ঘণ্টাবাদক ও হেডস্যারের ফরমায়েশি খাটে সনাতনদা আমাদের ক্লাসের দিকে আসছে। এসে বললেন “তোমাদের চারজনকে হেডস্যার ডেকেছেন, চল।”

ক্লাসরুম থেকে হেডস্যারের রুম পর্যন্ত জার্নিটা হলও তলপেটে বল লাগবার পরে ফুটবলারের স্ট্রেচারযাত্রার মতন। সনাতনদা আমাদের পথ দেখিয়ে যমালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের হেডস্যারের রুমের সামনে নিয়ে গিয়ে সনাতনদা চলে গেলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম হেডস্যার , তারেক স্যার আলোচনা করছেন। হেডস্যার ডাকলেন "ভেতরে আয়”।

হেডস্যারের রুমে থরে থরে বই আর কাগজপত্র সাজানো। একটা দেওয়ালে বিশাল কাঠের নেমপ্লেটে কৃতী ছাত্রদের নাম লেখা। স্যারের মাথার পেছনে দেওয়ালে লাগানো মনিষীদের ছবি। আরেকটা কাঠেরবোর্ডে লেখা সব হেডস্যারদের নাম। কিন্তু আমার চোখ খুঁজছে নিদেনপক্ষে একটা লোকনাথ বাবার ছবি বা একটা মা কালির ছবি যারা আমাদেরকে এই সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, কিন্তু পেলাম না। কিন্তু সবার আগে ডাক পড়ল আমার। কারণ বিপদের মুখে ভুলেই গেছি আমার বুকপকেট থেকে চেয়ে রয়েছে অজয় জাদেজা আর আমিশা প্যাটেলের পোস্টকার্ড।

স্যার হাত দিয়ে পকেট থেকে সেদুটিকে তুলে নিলেন। তারপর আমাদের জিগ্যেস করলেন “কোথায় গেছিলি?”

আহসান বলল “স্যার নামাজ পড়তে।”

মণি বলল “বাড়ি।”

কেবল আমি আর ইসমাইল বললাম “স্যার মেলায় গেছিলাম।”

স্যার মণি আর আহসানকে নিয়ে তারেক স্যারকে বললেন চলে যেতে।

আমাকে আর ইসমাইলকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

মিনিট দশেক পরে আমরা যখন ক্লাসে ঢুকলাম তখন দেখলাম আহসান আর মণির চুল উশকোখুশকো আর গাল লাল। পায়ে হাত বুলচ্ছে। ইসমাইল গিয়ে কোনও কথা না বলে বেঞ্চে বসে পড়ল, আমিও বসে পড়লাম। সেদিন ব্যাগে মাথা রেখে আমি আর ইসমাইল গোটা পিরিয়ড কেঁদেছিলাম। শপথ করেছিলাম আর কখনও ঐ কাজ করব না।

হেডস্যার বলেছিলেন “তোরা ভালো ছেলে। নিজেরাই সত্যিটা স্বীকার করলি। এখন তোরাই ঠিক কর মানুষ হবি না জানোয়ার। তোরা না বুঝে অপরাধ করেছিস, কিন্তু এখন বুঝছিস । তাই তোদের মারার মতন তুচ্ছ শাস্তি দেবো না, তোদের বাড়িতেও জানাবো না। কিন্তু এটা

ভুলে যাস না, তোরা আমার নিজের সন্তানের মতন। এবার ভেবে দেখ তোরা যে কাজ করেছিস সেটা ঠিক না ভুল? “

কৃতী ছাত্রের বোর্ডের দিকে ইসমাইলকে দেখিয়ে বললেন “সাতাশ নম্বর নামটা কার?”
ইসমাইল মাথা নিচু করে বলল “আব্বা"।

অন্য কাঠের বোর্ডটা যেটায় পুরনো হেডস্যারদের নাম লেখা সেটার দিকে দেখিয়ে বললেন “তুই চাইলে কিন্তু এই বোর্ডটায় তোর নাম ও লেখা হতে পারে, এবার ঠিক কর নাম হবি না হবি না। যা চলে যা। বন্ধুরা জানতে চাইলে বলবি স্যার খুব মেরেছেন, কিন্তু তোদের মারব না। যা ক্লাসে যা। আজ আমার ক্লাস হবে না। বাকিদের বলে দিস।”

কাঠের বোর্ডে আমার বা ইসমাইলের নাম ওঠেনি । কিন্তু বহুতলে বসে আজ যখন হেডস্যারের কথা মনে করি, তখন বুঝতে পারি কেন আমার ছয়ফুটের লম্বা বাবা রোগা সিড়িঙ্গে মাস্টারমশাইকে দেখে ভয় পেতো। ভয় নয়, ওটা শ্রদ্ধা। নিখাদ, অটুট, ভালোবাসা থেকে জন্মানো শ্রদ্ধা।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - রণদীপ নস্কর

বিলাস, বৈভব আর প্রযুক্তির পিছনে ছুটতে ছুটতে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাচ্ছে আজকের 'সভ্য' মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলো। এই ক্ষয়রোগেরই প্রতিষেধক 'বাটারফ্লাই প্রজেক্ট'। পৃথিবীর এক কোণায় একটি প্রজাপতির পাখার কম্পন, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে দিক পাল্টে দিতে পারে একটা টর্নেডোর। সঠিক জায়গায় একটা ছোট সদর্থক কাজের নুড়িপাথরের বাঁধ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া অবক্ষয়ের তীব্র স্রোতস্বিনী ধারাকে, মানবসভ্যতাকে একটা দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া 'মানুষ' হয়ে ওঠার – বাটারফ্লাই প্রজেক্ট-এর এটিই মূলমন্ত্র।

এর পেছনে যিনি আছেন, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাঁর সৃষ্টি এক 'অ্যাক্সিলারেটেড ইভোলিউশন'-এর গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে। বিবর্তনের পথে মানুষের পরের আরও অনেক ধাপ, বহু লক্ষ বছরের পথ এগিয়ে থাকা এই না-মানুষটি এমন অনেক কিছুই পারেন, আজকের বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলে না, আমাদের সাধারণ বোধ যাকে বলে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা।

প্রবাসের এক অলস সপ্তাহান্তের সন্ধ্যায় আন্তর্জালের সীমানা ছাড়িয়ে লক্ষ বছরের বিবর্তনের ওপার থেকে আমার জগতে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল তাঁর ধাতব কণ্ঠস্বর। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমা-হেন না-চিজকে তিনি জুড়ে নিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বব্যাপী কীর্তিকলাপের শরিক হিসেবে। এ কাহিনী, তাঁর তেমনই এক কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত।

তাঁর নাম, নোটুকেশ্বর।

প্রাককথন

ঘটনা ১
চৌঠা মার্চ, ২০২১
ডুরানকুলাক, রুমানিয়া-বুলগারিয়া সীমান্ত
স্থানীয় সময় ১৮:২০

তিন দফার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেরিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাব থেকে বেরোতেই বাইরের ঠান্ডাটা একটা ঝাপটা মারল আর্নো-র মুখে। অন্য দিনগুলোয় ওভারকোটের কলার তুলে দেয় আর্নো, কান-গলা ঢেকে নেয় মাফলারের পরতে। কিন্তু আজ ওর কোষে কোষে দৌড়ে বেড়াচ্ছে উত্তেজনার উষ্ণ স্রোত, বাতাসের শৈত্যটুকু যেন মরুভূমিতে বৃষ্টির মতো শুষে নিল ওর শরীর। মন বলল, এই তো শেষ। এর পরেই তো নতুন জীবন, সি ইউং-এর সঙ্গে। নতুন মহাদেশ, নতুন শুরু, নতুন একটা সাদা পাতা।

পার্কিং লটের একেবারে কোণায় পৌঁছে নিজের মোটরসাইকেল চালু করার আগে সাইড-ভিউ মিররটা এক নজর দেখে নিল আর্নো। যেমন থাকে ওর নিজস্ব ড্রাইভিং পজিশনে, তার চেয়ে সামান্য নিচের দিকে নামানো। ওটুকুই ইঙ্গিত। অর্থাৎ সি ইউং এসেছিল, নিজের কাজটুকু সেরে ফিরে গেছে। পার্কিং লটের এই বিশেষ কোণটাও সি ইউং-এরই আবিষ্কার। সিকিউরিটি অফিসে কাজ করার সুবাদে এই কমপ্লেক্সের কোন কোন জায়গা সিসিটিভির আওতার বাইরে, তা ওর নখদর্পণে। এমন কি স্যাম্পলটা ঠিক কোথায় লুকিয়ে পাচার করা হবে ল্যাবের বাইরে, সে প্ল্যানিং-ও ওর। আর্নোর দায়িত্ব শুধু সে প্ল্যানটাকে ফলপ্রসূ করা, অর্থাৎ আজ রাতের মধ্যে সে স্যাম্পল পৌঁছে দেওয়া ভার্না এয়ারপোর্টের লাগোয়া কফিশপে। তা মেয়ে হিসেবে সি ইউং যদি এতটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারে, পুরুষ হিসেবে বাকিটুকু পূর্ণ করার দায় আর্নো মাথা পেতে নেবে। বিশেষ করে যদি সে দায়িত্বের ওপারে পুরস্কারস্বরূপ অপেক্ষা করে থাকে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা স্বপ্নের দেশে, সি ইউং-এর সঙ্গে একটা নতুন জীবনের হাতছানি।

রিয়ার-ভিউ মিররটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আর্নো চালু করল নিজের বহুদিনের সঙ্গী ট্রায়ামফ মোটরসাইকেলটার ইঞ্জিন। অভ্যেসবশে নজর গেল ফুয়েল-গেজের ওপর। ছটা বারের দুটোতে এসে ঠেকেছে – অবাক ব্যাপার তো! সকালেও তো অর্ধেক ভর্তি ছিল! যাই হোক, তেমন

বুঝলে রাস্তায় ট্যাঙ্ক ভরে নেওয়া যাবে, আপাতত ল্যাবরেটরি থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। ভার্না এয়ারপোর্ট একশ কিলোমিটারের রাস্তা। কিন্তু সি ইউং পইপই করে বলে দিয়েছে –

শহরের ভেতরের রাস্তা নয় আর্নো, কোস্ট-বরাবর রুট নাইন-ও-ওয়ানটাই নিও। খানিকটা ঘোরা পড়বে, কিন্তু ট্রাফিক বা পুলিশের কোনও ঝুঁকি থাকবে না। এয়ারপোর্টে স্যাম্পলটা দেওয়ার আগে তোমার ভিসা-র কাগজপত্র আর টিকিট বুঝে নিও কিন্তু। তারপর ফ্ল্যাটে গিয়ে অপেক্ষা কোরো, আমি শিফট শেষ করে লাগেজ নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছাব রাত দশটার মধ্যেই। ওয়াইন-ও নিয়ে আসব। ভার্নায় আমাদের শেষ রাত, একটা নতুন জীবনের শুরু – সেলিব্রেশন তো করতেই হয়!

***

কন্ট্রোল রুমের মাস্টার ডিসপ্লেটা এখন ভাগ হয়ে গেছে চারটে স্ক্রিনে। ওপরের বাঁ দিকের স্ক্রিনটার ফিড আসছে সরাসরি একটা স্পাই স্যাটেলাইট থেকে। ডুরানকুলাকের পরের শহর শাবলা, সেখান থেকে শুরু হয়ে থেকে ডান দিকে মোড় নিয়েছে রুট নাইন-ও-ওয়ান, ব্ল্যাক সী'র উপকূল-বরাবর বিছিয়ে আছে একটা নীল রেখার মতো। আর তার ওপর দিয়ে একটা লাল বিন্দু ক্রমশ পিছলে সরে যাচ্ছে শাবলা থেকে দূরে, ভার্না'র দিকে।

পাশের স্ক্রিনটার ফিডও আসছে ওপর থেকেই, তবে স্যাটেলাইট নয়। এর উৎস একটি ড্রোন, মিলিটারি পরিভাষায় যার নাম ইউএভি – আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল। লাল বিন্দুটির সামান্য পেছনে শ'খানেক ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে সে, তার থার্মাল ক্যামেরায় স্পষ্ট ফুটে উঠছে একটা ধাবমান মোটরসাইকেলের অবয়ব।

নিচের বাঁ দিকের স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে বাইকের ড্যাশবোর্ডের প্রতিরূপ – স্পিড, ফুয়েল-গেজ, ইঞ্জিনের তাপমাত্রা – সব। কিন্তু এই তিনটে নয়, কন্ট্রোল রুমের মানুষগুলোর সকলের একনিষ্ঠ মনোযোগ এই মুহূর্তে ন্যস্ত হয়ে রয়েছে মাস্টার ডিসপ্লের নিচে ডান দিকে, চতুর্থ স্ক্রিনটার ওপর। পর্দার মাঝামাঝি একটা নিষ্প্রভ আলোর আভাস বাদ দিলে, প্রায়ান্ধকার সেই স্ক্রিনের ডান দিকে শুধু স্থির হয়ে জ্বলজ্বল করছে লাল হরফে লেখা একটি সংখ্যা –

2.99l

– দ্য স্যাম্পল ওয়জ কেপ্ট ইনসাইড এ প্লাস্টিক মেমব্রেন, জেন্টলমেন, অ্যান্ড দ্য মেমব্রেন, ইনসাইড দ্য ফুয়েল-ট্যাঙ্ক– স্পিকারফোনে ভেসে এল একটি ধাতব কণ্ঠস্বর – হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় সে মেমব্রেন গলে গেছে, ফলে স্যাম্পল এখন সরাসরি ফুয়েল-ট্যাঙ্কে মিশে গেছে। দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ন্যানো-রিসিভারস আর ওয়র্কিং ফাইন। ডিরেক্টর, স্টার্ট ট্রান্সমিশন।

নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রজেক্ট ফেনরিরের প্রধানের গলা শোনা যায় না এই ল্যাবরেটরিতে। যখন শোনা যায়, তখনও সারা পৃথিবী ঘুরে, বহু সার্ভারে ধাক্কা খেতে খেতে এসে পৌঁছয় এই ধাতব স্বর, যাতে কোনও ভাবেই চিহ্নিত করা না যায়, কোথায় এর উৎপত্তিস্থল; যাতে কোনও ভয়েস-প্রিন্ট দিয়ে চিহ্নিত করা না যায় এর পেছনের অস্তিত্বটিকে। কিন্তু মানুষটি আদতে যেই হোন না কেন, সে কণ্ঠস্বরের শীতল ইস্পাতের থেকে ভীত দূরত্ব রেখে চলতে চান প্রজেক্টের সকলেই। এর আগের যে কটি প্রজেক্ট রিভিউ মিটিং-এ এ গলা শোনা গিয়েছিল, প্রতিটির পরেই তদানীন্তন প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে অব্যাহতি নিতে হয়েছিল দায়িত্ব থেকে।

মরণোত্তর অব্যাহতি।

বিনা-বাক্যব্যয়ে নিজের মাইক্রোফোন চালু করলেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ল্যাপটপের কীবোর্ডে খুটখাট শব্দ, প্রথমে কম্যান্ড, তারপর কনফার্ম। কয়েক সেকেন্ডের প্রতীক্ষার পর লাল হরফে লেখা সংখ্যাটির রং বদলে গেল, হল সবুজ। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ, অচঞ্চল।

তার পরে সংখ্যাটা বদলাতে শুরু করল ধীরে ধীরে। 3.00l, 3.05l, 3.10l...

সামান্য গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন ডিরেক্টর,

– সাবজেক্টের বাইকের ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি উনিশ লিটার। আজ সকালে অর্ধেক ভর্তি ছিল, সে অবস্থায় ট্যাঙ্কে স্যাম্পল ইনসার্ট করা হয়, তারপর তাকে অ্যাকটিভেট করা হয়, মিনিটে পয়েন্ট ও ফাইভ লিটার, এই রেটে। অর্থাৎ কুড়ি মিনিটে এক লিটার। এক ঘন্টা পরে ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়, ততক্ষণে প্রায় তিন লিটার পেট্রল কনজ্যুম করেছে আমাদের

স্যাম্পল। সেটাই দেখাচ্ছিল স্ক্রিনে। ট্যাঙ্কে অবশিষ্ট ছিল সাড়ে পাঁচ লিটার। ল্যাব থেকে ইতিমধ্যেই পঁচিশ কিলোমিটার ট্র্যাভেল করেছে সাবজেক্ট, এক লিটার গেছে ওতে। এই মুহূর্তে সে স্যাম্পলকে আবার ট্রিগার করা হয়েছে, এবং এখন তার রেটও বাড়ানো হয়েছে, মিনিটে ও পয়েন্ট টু্য ফাইভ লিটার। অর্থাৎ চার মিনিটে এক লিটার।

যে রেটে আর যে স্পিডে চলছে, তাতে আগামী ছ থেকে আট মিনিটের মধ্যে আপনারা দেখবেন, ড্যাশবোর্ড স্ক্রিনে ফুয়েল বারের রং লাল হয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ আওয়ার ডেমনস্ট্রেশন।

উপস্থিত বাকি দুজনের মধ্যে একজন, যিনি বয়স্ক, একবার উপর-নিচে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। অন্যজন, সম্ভবত ক্রেতাসুলভ ছিদ্রান্বেষণ বজায় রাখতেই মন্তব্য করলেন,

– ব্যস, এর মধ্যেই? আমরা আর একটু দীর্ঘ ডেমনস্ট্রেশন আশা করছিলাম, সামথিং আ লিটল মোর স্পেক্টাকুলার।

– আপনারা কোনও ল্যাবরেটরি-ডেমনস্ট্রেশন দেখছেন না জেন্টলমেন –হালকা ইস্পাতের ছোঁয়া বুঝি ডিরেক্টরের গলাতেও – ও সব সিনেমায় হয়। আপনারা যেটা দেখছেন, সেটা একটা রিয়েল-লাইফ কেস-স্টাডি। কথা না বলে লক্ষ্য করুন, কী ভাবে আগামী আট মিনিটে স্ক্রিনের সংখ্যাটা 5.00l-এ পৌঁছে যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যায় ফুয়েল বারের রং। তার পর দেখছি, স্পেক্টাকুলার কিছু দেখানো যায় কি না আপনাদের।

রুট নাইন-ও-ওয়ান ধরে উপকূলের রাস্তায় পড়েই গতি বাড়াল আরোহী, কিন্তু তার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শ্লথ হয়ে এল তার বেগ। ঠিক যেমনটি হওয়ার ছিল, ড্যাশবোর্ডে ফুয়েল-বারের রং ততক্ষণে লাল। অর্থাৎ এক-দেড় লিটার পেট্রোলই মাত্র মজুত আছে ট্যাঙ্কে, তার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে পেট্রল পাম্পে। সামনেই ছোট্ট শহর ত্যুলেনোভো, সেখানেই পাওয়া যাবে। কোথাও একটা লীকেজ আছে, দেখিয়ে নিতে হবে সেটাও। খানিকটা সময় নষ্ট হবে বটে, কিন্তু আর তো কোনও উপায়ও নেই।

কন্ট্রোল রুমের দুজন পর্যবেক্ষক খেয়ালও করেননি, ওপরের ডানদিকের স্ক্রিনের ফিডের ছবি কখন যেন পালটে গেছে। যখন তারা

নজর করলেন, তখন ড্রোনটি আর বাইককে অনুসরণ করছে না। বাইকটিকে অনেকটা অতিক্রম করে গিয়ে সে তখন ইউ-টার্ন করেছে, নেমে এসেছে নিচে। তার অভিমুখ এখন সোজা বাইকের দিকে, যেন মুখোমুখি গিয়ে ধাক্কা মারবে আরোহীর সঙ্গে। থার্মাল ক্যামেরায় বাইকের অবয়ব যখন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, দুজনের দূরত্ব যখন আন্দাজ পঞ্চাশ ফিটের কাছাকাছি, তখনই হঠাৎ...

ডিরেক্টরের কীবোর্ডের দূর-নিয়ন্ত্রণে অন্ধকার থার্মাল স্ক্রিনের পর্দা ধুয়ে গেল হলুদ আলোয়। ড্রোনের ক্যামেরার নিচে বসানো তীব্র আলোর রশ্মি জ্বলে উঠল সহসা, ধাঁধিয়ে দিল আরোহীর চোখ। মুহূর্তে বেসামাল হল বাইকের হ্যান্ডল, তার মধ্যেই ড্রোন তার গতিপথ পালটে উড়ে গেল ওপরে। কয়েক সেকেন্ড লাগল বাইক-আরোহীর নিয়ন্ত্রণে ফিরে পেতে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। পিছন থেকে ছুটে আসা দ্রুতগামী আট-চাকার ট্রাকটার গতিপথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পল-মাত্র সময় পেল না সে। বাইক-সমেত তাকে পিষে দিয়ে ট্রাকটা ত্যুলেনোভো-র দিকে বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ড্রোনের ফিডের পর্দায় ভেসে উঠল বিস্ফোরণের উজ্জ্বল আলো।

– স্পেক্টাকুলার এনাফ, জেন্টলমেন? – কঠিন গলায় প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিলেন ডিরেক্টর, উত্তরের তোয়াক্কা না করেই।

– ওকে, বাট নট ফোর– এতক্ষণে প্রথমবার মুখ খুললেন তৃতীয়জন – চেঞ্জ ইন টাইমলাইন। উই নীড ডেলিভারি ইন থ্রি উইকস। ডেলিভার্ড ইনসাইড সাউথ অব দ্য টিউব।

– ডান। মার্চ টুয়েন্টি-ফিফ্‌থ – চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ডেমনস্ট্রেশনের সমাপ্তি ইঙ্গিত করে – এক্স্যাক্ট সময় আর ডেলিভারির ডিটেলস আমাদের তরফ থেকে চব্বিশ ঘন্টা আগে জানিয়ে দেওয়া হবে।

***

ঘটনা ২
৫ই মার্চ, ২০২১
সিয়াটল, ওয়াশিংটন
স্থানীয় সময় ১০:২০

‘নোটেশন অফ এ স্টর্ম’।

ইমেলের সাবজেক্ট লাইনটা দেখে প্রথমে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল আইরিনের।

ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি, অর্থাৎ আন্তঃবিষয়ক গবেষণাই তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাজের জায়গা, তাই হেড-অফ-ডিপার্টমেন্ট আইরিনের ইমেল-ইনবক্সে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ভেসে ওঠে আপাত-যোগসূত্রহীন দুটি বা তদধিক বিষয়ের যৌথ গবেষণায় আগ্রহী ছাত্রদের কাজের সংক্ষিপ্তসার। অ্যামিবার কোষ থেকে কৃত্রিম গর্ভসঞ্চারের পদ্ধতি, বা আরশোলার শুঁড়ের দৈর্ঘ্যের বিবর্তন থেকে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স নিরূপণ, কোনোকিছুই বাদ যায় না। এবং আইরিন তার কোনোটিকেই না পড়ে উড়িয়ে দেন না, তা বিষয়বস্তুর শিরোনাম যতই অসংলগ্ন মনে হোক না কেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট আসার পরে সরকারি ব্যয়-সংকোচনের ফলে যখন তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে, তখন নিতান্ত দৈবী হস্তক্ষেপের মতোই বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশন নামের একটি সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আইরিনের দিকে। তাদের শর্ত ছিল একটাই। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন, কোনও আইডিয়াকেই পুরোপুরি বিচার না করে বাতিল করা যাবে না, আর এই ঝাড়াইবাছাইয়ের কাজটি করতে হবে স্বয়ং আইরিনকেই। সব দিক ভেবে সম্মতি দিতে দ্বিধা করেননি আইরিন।

সেদিন ডিনারে আইরিন বানিয়েছিলেন বাবার প্রিয় পদ, উগালি আর সুকুমা। দিনের শেষে ডিনারের টেবলে মেয়ের সঙ্গে এই সময়টুকুর অপেক্ষায় বসে থাকেন যোসেফ।

– একটা ভালো খবর আছে বাবা। আমার ডিপার্টমেন্ট একটা প্রাইভেট ফাউন্ডেশন থেকে গ্রান্ট পেয়েছে, আপাতত পাঁচ বছরের জন্য। নামটা বেশ অদ্ভুত – বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশন। – বাবাকে উগালির বাটি

এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন আইরিন।

– পৃথিবীর এক কোণায় প্রজাপতির পাখার কম্পন? যা পাল্টে দিতে পারে অন্য গোলার্ধে এক ভয়ানক টর্নেডোর গতিপথ? – বলতে বলতে চকচক করে উঠেছিল বৃদ্ধ প্রাণীবিজ্ঞানীর চোখদুটি। চেয়ার ঠেলে ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের স্টাডিতে ঢুকে গিয়েছিলেন যোসেফ, খানিক পরে ফিরে এসেছিলেন একটা পুরোনো ফটোগ্রাফ হাতে। জঙ্গলের পটভূমিতে তোলা ছবি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারটি মানুষ । বিশের মাঝকোঠার এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ, সঙ্গে তিন বৃদ্ধ।

তার পরের এক ঘন্টা সময় জুড়ে আইরিন ছিলেন শুধুই শ্রোতা। কঙ্গোর এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক তরুণ শিকারি-কাম-গাইডের কালেদিনে এক বিশ্বখ্যাত প্রাইমেটোলজিস্ট হয়ে ওঠার গল্পটা যদিও আইরিনের জানা, কিন্তু তার পেছনের ঘটনাটির সাক্ষী যে তিনজন মানুষ, তাঁদের পরিচয় নিজের মেয়ের কাছ থেকে অদ্যাবধি আড়াল করে রেখেছিলেন যোসেফ। আজ, এতদিনে উঠল সে রহস্যের পর্দা।

– এতদিন বলিনি, কারণ প্রফেসরের বারণ ছিল – যোসেফের আঙুল এক বৃদ্ধের ছবির ওপর – উনি বলেছিলেন, একদিন ঠিক ডাক আসবে। তার আগে এই যোগাযোগের কথা যেন কাউকে না বলা হয়।

‘নোটেশন অফ এ স্টর্ম’। স্ক্রিনে খোলা ইমেলের সাবজেক্ট লাইনটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, আজ বুঝি সেই ডাক আসার ক্ষণ। কারণ বিষয়বস্তু যতই অবাস্তব শোনাক না কেন, প্রেরকের ঠিকানায় জ্বলজ্বল করছে বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশনের নামটি। কোনও ছাত্র বা রিসার্চ স্কলার নয়, এই গবেষণার অনুরোধ এসেছে সরাসরি সেই ফাউন্ডেশন থেকে, যাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এতদিন এই ডিপার্টমেন্টের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই দুষ্কর হত।

অন্য কাজ সরিয়ে রেখে আইরিন ডুবে গেলেন মেলের সঙ্গে পাঠানো সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে।

***

বিষয়ের নামটা শুনতে যতই অবিশ্বাস্য লাগুক না কেন, প্রস্তাবনাটুকু পড়তে গিয়ে কিন্তু অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা মনে হচ্ছিল না মোটেই।

স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনের একটা আর্টিকল থেকে অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করেছেন লেখক, বলছেন –

সমুদ্র-ঝড়ের মরশুমে হিউস্টন, ফ্লোরিডা সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগ, মধ্য-আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিস্তীর্ণ অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উত্তর আটলান্টিক থেকে উঠে আসা বিধ্বংসী হারিকেনের দাপটে। এক দিকে যেমন বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে চলেছেন এই ঝড়ের পূর্বাভাসকে আরও নিখুঁত করে তুলতে, তেমনই সে ঝড়ের ক্ষতির প্রাবল্য কত ব্যাপ্ত, কত গভীর হতে পারে, সেটাও সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা বার বার উঠে আসছিল বিজ্ঞানীদের সামনে।

কারণ, পরিবেশবিজ্ঞানীদের সাবধানবাণী কানে নিচ্ছিল না ব্যস্ত মানুষ। বা কানে নিলেও, মগজে নিচ্ছিল না। বরং প্রাকৃতিক সম্পদের লাগাম-ছাড়া অপব্যবহার আর পরিবেশের অনিয়ন্ত্রিত দূষণ আরও বেশি করে বাড়িয়ে তুলছিল প্রকৃতির রোষকে। ফলে প্রতিটি ঝড়ের সঙ্গে বেড়ে চলেছিল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ। তাই ক্রমাগত আলোচনা চলছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। প্রয়োজন পড়ছিল, এই বুঝিয়ে-বলার জন্য নতুন মাধ্যম খুঁজে বের করার। কী হতে পারে এই মাধ্যম? গত শতাব্দীর অডিও-ভিস্যুয়াল পোস্টার-ক্যাম্পেনের দিন গেছে আজ। ব্যস্ত মানুষ এমন কি বই পড়ারও সময় বের করে উঠতে পারে না, তার জায়গা নিয়েছে পডকাস্ট। সেই ব্যস্ততার বর্ম ভেদ করে কেমন করে তার মগজে ঢোকানো যাবে, আগাম ঝড়ের পূর্বাভাস?

যা কিছু স্থির, যেমন কোনও কিছুর আকার বা রং, তাকে চিনে নিতে মানুষের যেমন দৃষ্টিশক্তিই ভরসা, যা পরিবর্তনশীল তার জন্য তেমনই ভরসা শ্রবণেন্দ্রিয়ে। ছবির তুলনায় শব্দের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি আদিম, অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ। সুর বা তালের খুব সামান্য তারতম্যও মানুষের কানে ধরা পড়ে, তার জন্য সঙ্গীত-বোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। রেখাচিত্র বা রঙিন চার্টের বদলে শব্দচিত্রে প্রকাশ – যাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন সোনিফিকেশন – তা সাধারণ মানুষকে অনেক সহজে বুঝতে সাহায্য করবে যে কোনও ঝড়ের তীব্রতা, তার ধ্বংস-ক্ষমতাকে। গত বারো বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঝড়ের শব্দরূপ, আর তাদের ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক পরিমাপকে পাশাপাশি রেখে এই কাজটিই করে চলেছেন ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি গবেষকরা।

গত পাঁচ বছর এ প্রজেক্ট ধরে চলছে অন্য য়ুনিভার্সিটিতে। তার একাধিক উদাহরণ দেওয়া রয়েছে পেপারটিতে। একটি লিংকে ক্লিক করে তার খানিকটা অংশ শুনেওছেন আইরিন। চমক লাগানোর মতো কাজ, নিঃসন্দেহে। নতুন করে আইরিনের ল্যাবের কী ভূমিকা থাকতে পারে এখানে?

ভাবতে ভাবতেই আইরিন লক্ষ্য করলেন, কার্সরটা যেন নিজের মর্জিতেই এসে দাঁড়িয়েছে ডকুমেন্টটির নিচে একটা টেলিফোন-আইকনের ওপর। এর নাম, এমবেডেড কল বাটন। মাউসে আঙুল ছোঁয়ালেন তিনি, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা রিনরিনে ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পিকার থেকে। যেন আইরিনের ভাবনারই উত্তর।

– সাইক্লোন বা টর্নেডোকে এই যে শব্দচিত্র দিয়ে প্রকাশ করা, আমাদের ফাউন্ডেশন চাইছে এর একটা বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে। একটা মিউজিক্যাল নোটেশন, একটা স্বরলিপি – যাকে ঠিক যন্ত্রে ঠিকমতো বাজাতে পারলে একটা ঝড়ের জন্ম দেওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা আপাত-অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঝড় থেকে যদি সুরের নোটেশন তৈরি করা যায়, তাহলে তার বিপরীত প্রকৌশল করিয়ে নোটেশন থেকে ঝড় নয় কেন?

এ বিষয়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষে যতটা সাহায্য দরকার, আপনি পাবেন। এই মুহূর্তে এই রিসার্চের বিভিন্ন দিকের টুকরো টুকরো কাজ চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবে, ফাউন্ডেশনের একাধিক গবেষক নিযুক্ত আছেন এই কাজে। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের ফিল্ডে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু আপনার ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতা এই প্রজেক্টের সাফল্যের জন্য খুব জরুরি। আর সেই জন্যই আমরা চাই, ডিরেক্টর হিসেবে এই পুরো প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনি নিন। একমাত্র আপনিই জানবেন এই গবেষণার সব কটি দিক, টুয়েন্টিফোর বাই সেভেন আপনারই তত্ত্বাবধানে তৈরি হবে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম ঝড়ের প্রোটোটাইপ নোটেশন। আমাদের হাতে সময় সীমিত। আজ পাঁচই মার্চ, আজ থেকে ঠিক পনের দিনের মধ্যে এই নোটেশন আমাদের দরকার, না পেলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে পৃথিবীর। য়ু আর ইয়োর বেস্ট হোপ, ডক্টর আইরিন কাবালা।

– আর যদি আমি রাজি না হই? আমি তো জানি না, কী উদ্দেশ্যে আপনাদের এই রিসার্চ? মানুষের কোনও অকল্যাণ হতে পারে, এমন

কোনও রিসার্চ আমার ল্যাবে আমি হতে দিই না মিস্টার হুএভার-ইউ-আর! – নিষ্কম্প, পাথুরে গলা আইরিনের।

– বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশনের যে কোনও প্রজেক্টই চূড়ান্ত কনফিডেনশিয়াল, কিন্তু আপনার উদ্বেগও অযৌক্তিক নয়। আপনি এক কাজ করুন। কথা বলুন ডক্টর যোসেফ কাবালার সঙ্গে। আশা করি ওঁর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি আপনাকে ভরসা দিতে পারবে। আর তার পরেও যদি আপনার মনে কোনোরকম দ্বিধা থাকে, এই ফাইলটা ওপেন করে টেলিফোন আইকনে ক্লিক করবেন, আমি অপেক্ষায় থাকব আপনার উত্তরের।

– হ্যাঁ, বাবা আপনাদের ফাউন্ডেশনের কথা জানেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে চেনেন কি? বাবার কাছে যে ছবি দেখেছি, সেখানে তো আপনার থাকার কথা নয়। সে ছবি তো অন্তত পঞ্চাশ বছর আগের তোলা, আর বাবা বাদে বাবা সে ছবির বাকি সকলেরই বয়স তখনই অন্তত পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ...

- ঠিকই বলেছেন আপনি। ও ছবিতে আমি নেই। আমি কোনও ছবিতেই নেই। কিন্তু উনি আমার পরিচয় জানেন... – উত্তর এল ধাতব কণ্ঠে – আমার নাম বলবেন ওঁকে। নোটুকেশ্বর।

***

।। এক ।।

বাইশে মার্চ

এমিরেটস ইনভেস্টমেন্টের নিজস্ব বিমান যখন আল-আরিশ বিমানবন্দরের মাটি ছুঁল, স্থানীয় সময় তখন দুপুর সাড়ে বারোটা, বাইরের তাপমাত্রা আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সরকারি লৌকিকতা সারতে যে একেবারেই সময় লাগল না, তার পুরো কৃতিত্বটাই সম্ভবত আমার আমন্ত্রণকর্তা এমিরেটস ইনভেস্টমেন্ট এবং তাদের প্রতিনিধি, আমার ভ্রমণসঙ্গী মোহাম্মদ আল-বাকসা-র। অত্যন্ত বিনয়ী, মৃদুভাষী, অন্তত সত্তরোর্ধ প্রৌঢ় মানুষটি প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই ছায়ার মতো লেগে রয়েছেন আমার সঙ্গে। আল-আরিশ বিমানবন্দরে বিদেশি পর্যটকদের ভিড় তেমন থাকে না, ফলে ইমিগ্রেশন-কাস্টমসের বেশিরভাগ কর্মচারীই

ইংরেজি বলতে তেমন স্বচ্ছন্দ নন। তাদের সঙ্গে কথা চালাতে গেলে ভাষা একটা বড়ো সমস্যা হতে পারত। বিশেষ করে এ-ফোর মাপের যে খামটি রয়েছে হ্যান্ডব্যাগে, সেটির ব্যাপারে খানিকটা অস্বস্তি কাজ করছিল আমার। ওঁর কল্যাণে সে অস্বস্তি দূর হয়েছে, কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি আমাকে।

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই চড়া রোদের তাত বুঝিয়ে দিয়ে গেল, সাহারা মরুভূমির পুব দিকের ভৌগোলিক সীমা লোহিত সাগরের পশ্চিম কিনারে এসে থেমে গেলেও মরুভূমির আবহাওয়া সীমানার এদিকে মাঝে মাঝে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতেই থাকে। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে আল-বাকসা মৃদু হেসে বললেন,

– মার্চ মাসে এতটা গরম সাধারণত পড়ে না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সীমান্তে উত্তাপ কিছু বেশিই।

– সীমান্তে উত্তাপ? – অবাক হলাম আমি।

– যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেটি হচ্ছে সিনাই পেনিনসুলার অংশ। ইজিপ্টের একমাত্র অঞ্চল, যেটি এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর আল-আরিশ হচ্ছে নর্থ সিনাই প্রশাসনিক বিভাগের রাজধানী, এরা বলে গভর্নরেট। এর পুব সীমা নির্ধারণ করছে ইজিপ্ট-ইজরায়েলের সীমান্ত, আর তার ওপারেই গাজা স্ট্রিপ। খুব শান্ত জায়গা যে নয়, সে তো আপনারা নিউজ মিডিয়ার কল্যাণে জানেনই। তবে সেটা সীমান্ত বরাবর, দৈনন্দিন রাজনৈতিক উত্তাপ বিশেষ ছোঁয় না এই গভর্নরেটকে।

বলতে বলতে গাড়ি এসে গেল। স্টিল গ্রে রঙের টয়োটা এক্সপ্লোরার, তবে শহুরে ঝাঁ-চকচকানির বদলে তার সর্বাঙ্গে মরুভূমির রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ছাপটাই প্রবল। ড্রাইভার নেমে মাথা নুইয়ে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে না ঢুকে আল-বাকসা এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে কথা বললেন তার সঙ্গে। কথা শেষ হতে সে আরও মাথা নুইয়ে মৃদু স্বরে কিছু বলল, তার পর আমাদের দুটি হ্যান্ড লাগেজ গাড়ির সিটে তুলে দিয়ে পিছিয়ে গেল। আমাকে ইশারা করলেন আল-বাকসা,

– বসুন আদিত্য। লেট মি হ্যাভ দ্য প্লেজার অফ ড্রাইভিং ইউ টু দ্য মিটিং।

– কী ব্যাপার বলুন তো? ড্রাইভারকে কি মানা করে দিলেন? আপনি নিজে ড্রাইভ করছেন?

– আমরা যাদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, তারা সচরাচর আমাদের মতো সভ্য মানুষদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, যতটা সম্ভব – গাড়ি স্টার্ট করলেন আল-বাকসা, আর তখনই লক্ষ্য করলাম, অটোমেটিক নয়, এ গাড়ির গিয়ার-শিফট পুরোনো আমলের, ম্যানুয়াল – আর সেই চেষ্টাটার সম্মান করি আমি। সুমেড পাইপলাইনের কাজে আমি যখন প্রথম আসি এই অঞ্চলে, তখন আমার বয়স পঁচিশ। সদ্য বিদেশ থেকে মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স ডিগ্রি করে এসেছি। নিজেকে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড দ্য লেসেপ্সের চেয়ে কম কিছু ভাবতাম না, আর সেই দম্ভ ফুটে বেরোত আমার চলনে-বলনে, কথায়-কাজে। সেই দম্ভকে ভেঙে-চুরে আমাকে মানুষ করে তোলার পেছনে যতটা অবদান সুয়েজের, ততটাই সুয়েজের আশেপাশে বাস করা এই প্রান্তিক যাযাবর মানুষগুলোরও। ওদের কাছে পৌঁছতে গেলে সভ্যতার ধড়াচুড়ো খুলে রেখে যেতে হয় আদিত্য, না হলে সভ্যতার গন্ধে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, এই স্থিতধী মিতভাষী মানুষটির আপাত নৈঃশব্দ্যের পেছনে লুকিয়ে আছে অভিজ্ঞতার এক বিপুল ভাণ্ডার। এমিরেটস ইনভেস্টমেন্টের মতো কোম্পানি অকারণেই তাঁদের ভরসা ন্যস্ত করেননি এই মানুষটির ওপরে। আর শুধু তারাই নন; এমন কি নোটুকেশ্বর নিজেও।

চোখ বন্ধ করে ঘাড় এলিয়ে দিলাম সিটের হেডরেস্টে। মাথার ভেতরে ফ্ল্যাশব্যাকে দৌড়তে থাকল গত আটচল্লিশ ঘন্টার ঘটনাবলী।

***

প্রথম চব্বিশ ঘন্টা – বিশে মার্চ

কোভিডের প্রথম ধাক্কার পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছি, দিল্লিতে। পরিবারের সঙ্গে কটা দিন শান্তিতে ছুটি কাটানোর ইচ্ছেয় জল ঢেলে দিল সিঙ্গাপুর অফিস থেকে ঊর্ধ্বতন কর্ত্রীর ফোন। এমিরেটস ইনভেস্টমেন্ট, গোটা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অন্যতম প্রধান লগ্নিকারী সংস্থা, তাঁর কাছে ইমেলে ফরমান পাঠিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে কিছু সৌরবিদ্যুৎ প্রজেক্টের লগ্নির ব্যাপারে আলোচনা করতে

চেয়ে। আলোচনা হবে আবু ধাবিতে ওদের হেড-অফিসে, আর আমি যেহেতু অর্ধেকের বেশি রাস্তা পেরিয়েই ফেলেছি, সুতরাং একটু কষ্ট করে যদি... ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সঙ্গে সান্ত্বনা পুরস্কার স্বরূপ এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল, আমি চাইলে এর বদলে আমার ছুটি কদিন বাড়িয়ে নিতে পারি।

ভদ্রমহিলা যদি জানতেন, এই সব ফোন আর ইমেলের অন্য প্রান্তে কী নিপুণ দক্ষতায় অদৃশ্য সুতোর নিয়ন্ত্রণ সামলাচ্ছেন এক না-মানুষ। কিন্তু উনি না জানলেও আমি তো জানি! সেই লাদাখের শীতল মরুভূমিতে উতঙ্কের মেঘের পিছনে ধাওয়া করা দিয়ে শুরু তার।

কর্ত্রীর ফোনের পিছু পিছুই এল তাঁর ফোন।

– আবু ধাবি হয়ে ইজিপ্ট যেতে হবে, আদিত্য। আজ কুড়ি তারিখ, ইজিপ্ট পৌঁছতে হবে বাইশ তারিখ দুপুরের মধ্যেই । সচরাচর তোমাকে আগে মিশনের বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে জেনে নিই, তুমি রাজি কি না। এবারে আর সে সুযোগ দিতে পারছি না। সময়ের সত্যিই বড়ো অকুলান, প্রত্যেকটি ঘন্টা মেপে এগোতে হচ্ছে। ফ্লাইটের টিকিট, এমিরেটস আর ইজিপ্টের ই-ভিসা, হোটেলের বুকিং আর টেস্ট রিপোর্ট তোমার মেলবক্সে পৌঁছে গেছে। রাত এগারোটায় ফ্লাইট, তার আগে আমি তোমাকে ব্রিফ করে দেব।

ফোন নয়, ফ্লাইট ছাড়ার ঠিক আগে ব্রিফিং নোট এসে পৌঁছাল মেলবক্সে; সঙ্গে এল নোটুকেশ্বরের সাবধানবাণী;

***

– এই নোটটি সেলফ-ডিলিটিং, আদিত্য। পড়া হয়ে গেলে ফাইলটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মুছে ফেলবে এ ফাইল, যাতে এর বিষয়বস্তু অন্য কারোর নজরে পড়ার ন্যূনতম সম্ভাবনা না থাকে।

এমনিতে তোমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি-অর্থনীতি আমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়, কিন্তু তোমাদের জগতের স্থিতিশীলতার জন্য রাজনীতির 'ব্যালান্স অব পাওয়ার'-টা খুব জরুরি। সর্বক্ষণের প্রয়োজন একটা গতিশীল স্থিতাবস্থা, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম'। এই ইকুইলিব্রিয়াম, অর্থাৎ ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লা একদিকে

হেলে গেলেই যুদ্ধ, আর তেমন অসমান হয়ে পড়লে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গড়িয়ে যেতেও সময় লাগবে না। এই স্থিতাবস্থাটাকে একেবারে আমূল নাড়িয়ে দেওয়ার একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে গত কয়েক বছর ধরে, এবং এখন সেটা একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, বলতে পারো ফাইনাল কাউন্টডাউন। এ চক্রান্ত যদি সফল হয়, তার পরিণতি কী হবে, সেটা ভাবতে বসাও বিলাসিতা, কারণ জেঙ্গিস খান আর হিটলারের সমন্বয় ঠিক কী চেহারা নিতে পারে তা ভেবে ওঠা সভ্য মানুষের কল্পনায় কুলোবে না।

তোমাদের পৃথিবীতে এই স্থিতিশীলতার অন্যতম সূচক হচ্ছে তেল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে পেট্রোলিয়াম, অর্থাৎ ক্রুড অয়েল। তেল যার, ক্ষমতা তার। তাই তেলের কুয়োর দখল নিয়ে মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ। তাই ঠাণ্ডা লড়াই তেলের বাণিজ্যপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। পেট্রো-বিপণনের পরিভাষায় যার নাম 'অয়েল চোক-পয়েন্ট'।

পৃথিবী-জোড়া তেলের পরিবহণের বেশিরভাগটাই চলে সমুদ্রপথে, আর যদিও পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই সমুদ্র, সে পথের সবটাই আদিগন্ত-প্রসারিত সুপারহাইওয়ে নয়। এর মধ্যে এমন কিছু কিছু জায়গা আছে, যা তুলনায় নেহাতই গলিঘুঁজি, কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই তেল-বণিকদের হাতে। কোনও কারণে তা বন্ধ হয়ে গেলে তেলের যোগান বন্ধ হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে পড়বে যাবে একটি রাষ্ট্র বা একটি সমগ্র অঞ্চলের এনার্জি-নিরাপত্তার বলয়, এতটাই গুরুত্ব সেই রাস্তার। এই জন্যই এদের নাম চোক-পয়েন্ট। আর এই চোক-পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে তোমাদের সব রাষ্ট্রশক্তিরাই তৎপর। যতটা নিজেদের এনার্জির সরবরাহকে সুরক্ষিত রাখতে, ততটাই বিপক্ষকে অসুবিধায় ফেলতে।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো চোক-পয়েন্টটি রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি আর ইরানের মাঝে, হরমুজ প্রণালীতে। তার মাত্র তিনশ নটিক্যাল মাইল দূরে 'গদর' বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছে চিন। সে বন্দর যদিও পাকিস্তানের জমিতে, কিন্তু তার আসল মালিকানা চিনের হাতে। দাঁড়িপাল্লার উল্টোদিকে, তালিকার দু'নম্বরে রয়েছে মালাক্কা প্রণালী। চিনের বেশিরভাগ পেট্রোপণ্যই যায় মালাক্কা দিয়ে, আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকার মিত্রশক্তি, ফলে পাল্লার ভার দুদিকেই প্রায় সমান সমান হয়ে আছে।

এই তালিকার তিন এবং চার নম্বরে যথাক্রমে আছে সুয়েজ ক্যানাল, এবং বাব-এল-মান্দেব প্রণালী। বলছি বটে দুটো, আসলে কিন্তু দুয়ে মিলে এক। সুয়েজ ক্যানাল যদি হয় আফ্রিকাকে ভেদ করে এশিয়া থেকে সরাসরি ভূমধ্যসাগর হয়ে য়ুরোপের বাজারে পৌঁছনোর শর্টকাট রাস্তা, তা হলে তার পেছনের সাপ্লাই লাইন আসছে আরব সাগর থেকে, গালফ অব আদেন আর রেড সী হয়ে, এক এবং একমাত্র বাব-এল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে। পাশের ম্যাপটা দেখলে একটা আন্দাজ পাবে এই জোড়া চোক-পয়েন্টের। এশিয়ার ইয়েমেন আর আফ্রিকার জিবুতি, এই দুয়ের মধ্যেকার সরু প্যাসেজটা, ওটিই হচ্ছে বাব-এল-মান্দেব প্রণালী। বিপরীত দিক দিয়েও সত্যি ব্যাপারটা – একবার সুয়েজ দিয়ে ঢুকলে বাব-এল-মান্দেব দিয়ে বেরোনো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই পণ্যবাহী জাহাজের। যদি কোনও ভাবে এই দুটি চোক-পয়েন্টকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়, তাহলে এদের সাহায্যে সারা পৃথিবীর তেলের সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

‘অপারেশন ফেনরির’ সেই দিকেই এগোচ্ছে। যদি সফল হয়, বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে গোটা মানবজাতি। পৃথিবীর যে কোনও কোণায় যথেচ্ছ গৃহযুদ্ধ, রায়ট, এমন কি বিশ্বযুদ্ধ শুরু করারও ক্ষমতা থাকবে একটা শক্তির হাতে। সেটাকে আটকানোর জন্যই আরও বড়ো একটা বিশৃঙ্খলার আয়োজন, আর সে বিশৃঙ্খলা হবে আমার মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রজাপতির পাখার কম্পন থেকে টর্নেডো সৃষ্টির গল্প তো অনেকেই শুনেছ বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশনের মিশনের সঙ্গী হতে গিয়ে, এবারে তার একটা হাতে-কলমে উদাহরণ দেখে নিতে পারবে। যদি আমরা সফল হই। যদি তুমি সফল হও, আদিত্য।

***

একবার পড়লাম, দুবার পড়লাম। চোক-পয়েন্টের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে পড়লাম তৃতীয়বার। তারপর ভাবতে ভাবতে, খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই বন্ধ করেছিলাম ফাইলটা। হঠাৎ কী মনে হতে আবার ক্লিক করলাম। ওয়র্ড ডকুমেন্টটা খুলে গিয়ে সাদা স্ক্রিনের ওপরে ভেসে উঠল কালো অক্ষর –

কন্টেন্ট সেলফ-ডিলিটেড

অপারেশনটার কী যেন নাম নাম লিখেছিলেন নোটুকেশ্বর?

ফেনরির। নর্স পুরাণে লোকির নেকড়ে-সন্তান, দেবরাজ ওডিনের শমন। যার দুই সন্তান স্কল আর হাটি আকাশ জুড়ে ধাওয়া করে বেড়াত সূর্য আর চাঁদকে।

যে বা যারা আছে এর পেছনে, রাগনারক-ই কি তাদের উদ্দেশ্য?

মহাপ্রলয়?

***

পরের চব্বিশ ঘন্টা – একুশে মার্চ

দিনের শেষে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে গেল নোটুকেশ্বরের পরের ব্রিফিংটা ।

ভোররাতে আবু ধাবি পৌঁছানো থেকে শুরু করে দুপুরে এমিরেটস ইনভেস্টমেন্টের টিমের সঙ্গে মিটিং, প্রেজেন্টেশন সবটাই হল খুব নির্ঝঞ্ঝাট। আলোচনার সূত্রপাত করলেন সুমেড প্রজেক্টের ডিরেক্টর মিস্টার আবদাল্লা। ইজিপ্টে ওদের আগামী প্রজেক্টের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে একটা প্রাথমিক খতিয়ান চান ওরা। আমি যদি যেতে রাজি থাকি, ওদের প্রাইভেট বিমানে আগামীকালই রওনা হয়ে যেতে পারি। সঙ্গে ওদের তরফে একজন অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট থাকবেন, যাতে ভাষা ইত্যাদির জন্য কোনও সমস্যায় না পড়তে হয়।

– সুয়েজ ক্যানালের ঠিক পাশ দিয়ে এক জোড়া পাইপলাইন অপারেট করে সুয়েজ-মেডিটারেনিয়ান পাইপলাইন কর্তৃপক্ষ, সংক্ষেপে সুমেড। আমাদের কোম্পানি সেই পাইপলাইনের অন্যতম অংশীদার। পরের দফার এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট খুব শিগগিরই শুরু করতে চলেছি আমরা । এই প্রজেক্টগুলো তৈরির সময় আমরা নজর রাখি, যাতে আমাদের প্রজেক্টের আশেপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দারাও সেই উন্নয়নের খানিকটা অংশভাগী হতে পারে। এই প্রজেক্টের আশেপাশে যে সব গ্রাম রয়েছে, সেগুলো মূলত যাযাবর বেদুইন জনগোষ্ঠীর। তাদের জন্যই এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে। আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলুন, ওদের প্রয়োজনটা বুঝুন, তার পরে আপনার প্রাথমিক ফিজিবিলিটি রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা পরের স্টেপ নেব। এ বিষয়ে আপনাকে যাবতীয় সহায়তা দেবেন আমাদের কনসালটেন্ট মোহাম্মদ-আল-

বাকসা। হি ইজ আ ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড রিসোর্স ফ্রম দিস প্রজেক্ট, নোজ সুমেড ইনসাইড আউট।

বাকি দিনটা কেটে গেল প্রজেক্টের হালহকিকত বুঝে নিতে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাইপলাইনের ব্যাপারেও অনেকটা কৌতূহল নিরসন করিয়ে দিলেন আল-বাকসা।

– তেলের পরিবহণ আজকাল প্রায় পুরোপুরিই নির্ভর সুপারট্যাঙ্কারের ওপর। কিন্তু সুয়েজ ক্যানালের গভীরতা মাত্র চব্বিশ মিটার, তাতে পুরোপুরি ভর্তি অবস্থায় এই সুপারট্যাঙ্কারদের পক্ষে ক্যানাল পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় না। সে জন্যই সুমেড পাইপলাইনের পরিকল্পনা। সুমেডের দু মাথায় দুটো তেলের টার্মিনাল রয়েছে, দক্ষিণ প্রান্তে আইন সোখনা আর উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে সিদি কেরির। ঠিক কত বড়ো এই টার্মিনাল, তার একটা আন্দাজ দিই আপনাকে। হাজার তিনেক প্রমাণ মাপের ফুটবল মাঠ এঁটে যাবে আইন সোখনা পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের ভেতরে। ক্যানালে ঢোকার আগে উত্তরমুখী সুপারট্যাঙ্কারকে খালি করা হয় আইন সোখনায়, প্রয়োজনে হোল্ডিং ট্যাঙ্কে সে তেল স্টোরও করা হয় কিছু সময়ের জন্য। তারপর পাম্প করে সুমেড পাইপলাইনের মাধ্যমে সে তেলকে পাঠানো হয় সিদি কেরির টার্মিনালে। খালি হয়ে যেতেই হালকা হয়ে ভেসে ওঠে সুপারট্যাঙ্কার, সহজেই পার হয়ে যায় সুয়েজ ক্যানাল। তারপর সিদি কেরিরে আবার সে তেল পাম্প করে ভরে দেওয়া হয় সুপারট্যাঙ্কারের গর্ভে। আর অন্য পাইপলাইনটি ব্যবহার করা হয় দক্ষিণমুখী সুপারট্যাঙ্কারের জন্য।

– কিন্তু বিভিন্ন রিফাইনারির এত রকম তেলের কোয়ালিটি, এত রকম প্রোডাক্ট, কোনও ভাবে মিশে গেলেই তো বিপদ? – প্রথম প্রশ্ন এল মাথায়।

– গুড কোয়েশ্চন – হাসলেন আল-বাকসা– প্রতিটি সাপ্লাইয়ের পরে তেলের একটা পাতলা আস্তরণ লেগে থাকে পাইপলাইনের ভেতরের গায়ে। পরের সাপ্লাইটি পাঠাবার আগে একটা স্বয়ংক্রিয় হাই-প্রেশার জলের জেট দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় পাইপলাইন। ধরে নিন, যেন জলের একটা সিলিন্ডার পাইপের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল, এবং সেটা এতটাই প্রচণ্ড চাপে যাতে তার ধাক্কায় পাইপলাইনের ভেতরে লেগে থাকা তেলের পর্দা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়।

– এই জোড়া পাইপলাইন কি যথেষ্ট নয় তেল-সরবরাহের জন্য? তার জন্যই কি এই এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট, যেটার কথা মিস্টার আবদাল্লা বলছিলেন?

– না না, এটা নতুন পাইপলাইন – আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন আল-বাকসা – আইন সোখনা থেকে সিদি কেরির টার্মিনাল বরাবর আমাদের পাইপলাইন তিনশ কুড়ি কিলোমিটার লম্বা। আর এই নতুন লাইনটি দৈর্ঘ্যে হবে তার দেড় গুণেরও বেশি, আইন সোখনা থেকে দক্ষিণে লোহিত সাগরের তীর বরাবর একেবারে সিনাই পেনিনসুলার শেষ মাথায় শার্ম-এল-শেইখ অবধি; সেখান থেকে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে সৌদি আরবের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনের সঙ্গে।

– এর উদ্দেশ্য কি কোনও ভাবে বাব-এল-মান্দেবের চোক-পয়েন্টকে এড়ানো? – জ্ঞান জাহির করার লোভ সামলানো গেল না।

– বাহ্ – চোক-পয়েন্টের ওপরেও পড়াশোনা আছে না কি আপনার? – এমনই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আল-বাকসা, উল্টে লজ্জায় পড়ে গেলাম।

– না না, এমনিই একটু ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখছিলাম। হরমুজ আর মালাক্কা নিয়ে দুই শক্তির ব্যালান্স-এর খেলা – খুব ইন্টারেস্টিং, না?

– ও ব্যালান্স আর বেশি দিন থাকবে না, মিস্টার আদিত্য – চিন্তাক্লিষ্ট শোনালো আল-বাকসা'র গলা – হরমুজ প্রণালীর কথা যখন পড়েছেন, তখন গদর বন্দরের কথাও জানেন নিশ্চয়ই? ওদের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগের অংশ হিসেবে গদর বন্দর থেকে চিন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোর বরাবর তেলের সরবরাহ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছে চিন। পাশাপাশি চলছে 'পোলার সিল্ক রুট' তৈরির কাজ, অর্থাৎ স্থলপথের বদলে সোজা মেরুপ্রদেশ, আর্কটিক সমুদ্র দিয়ে বাণিজ্যের রাস্তা। তেলের সরবরাহের জন্য আর মালাক্কা প্রণালীর ওপর ভরসা করতে হবে না চিনকে। আর মালাক্কা চোক-পয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে কী হবে বুঝতেই পারছেন, পুরো নিয়ন্ত্রণটাই হয়ে যাবে ভীষণরকম একপেশে।

এর পরে কথা বিশেষ এগোল না। ডিনারের পরে আমাকে ঘরে পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর, এদিকওদিক দেখে, হাতের ব্রিফকেসটি খুলে তা থেকে বের করে আনলেন একটি এ-ফোর মাপের

খাম।

– আমাকে বলা হয়েছে এটি আপনার হাতে পৌঁছে দিতে, মিস্টার আদিত্য। উইশ ইউ গুড নাইট। আমি কাল সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট লাউঞ্জে অপেক্ষা করব আপনার জন্য।

ন্যানো-মেটিরিয়ালে তৈরি এ খাম আমার চেনা। শুধু খাম নয়, সেফ-ডিপোজিট লকার-ও বটে। বিমানবন্দরের এক্স-রে মেশিনে এ খামের ভেতরকার ছবি ধরা পড়ে না। আর খামের একটি বিশেষ জায়গায় হাতের তালুর স্পর্শ না পড়লে এ খাম খোলাও যায় না। কিন্তু এ খাম, আল-বাকসার কাছে এল কেমন করে? তবে কি...

আল-বাকসা? বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশন?

ছয় বাই আট ইঞ্চি মাপের একটা ধূসর-বাদামি রঙের চৌকোনা চামড়ার মতো টুকরো বেরোল খাম থেকে। তার ওপরে সারি দিয়ে আঁকা কিছু অদ্ভুত চিহ্ন। সে আঁকার ধরণ অনেকটা, যেমন গৃহপালিত পশুদের গায়ে উত্তপ্ত ধাতুর ছাঁচ দিয়ে মালিকানার চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, তেমন।

– উটের চামড়া থেকে তৈরি পার্চমেন্টের কৃত্রিম সংস্করণ – কানের কাছে নোটুকেশ্বরের মৃদু কণ্ঠস্বর জানান দিল, আমার অজান্তেই তিনি এসে হাজির হয়েছেন ফোনের ওপারে – কাল যাদের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা, কাগজ-কালির লেখা দেখিয়ে তাদের ভরসা জিতে নেওয়া যাবে না, আদিত্য। তারা মনে-প্রাণে এখনও মধ্যযুগের বাসিন্দা। আধুনিক প্রযুক্তিতে তাদের না আছে ভরসা, না বিশ্বাস।

– কারা তারা? আর তাদের ভরসা অর্জন করাটা কেন এত জরুরি আমাদের কাছে?

– একটা ঝড় চাই, আদিত্য। রাগনারক-কে আটকাতে হলে একটা ঝড় চাই, আর সেটা তৈরির ব্লুপ্রিন্ট এই মুহূর্তে ধরা রয়েছে তোমার হাতে। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম ঝড়ের স্বরলিপি - নোটেশন অব আ স্টর্ম। কিন্তু শুধু স্বরলিপি হলেই তো হবে না, তার সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রেরও যোগ হওয়া চাই। না হলে ঠিক ঝড়টি উঠবে না, যেমনটি আমাদের প্রয়োজন।

– আর এই মধ্যযুগের বাসিন্দারা আপনার সেই পাত্র?

– পাত্র নয় আদিত্য, পাত্রের আধার। আর বাসিন্দা-‘রা’ নন, কেবল একজন। পাত্রটি হচ্ছে আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের একটি বাদ্যযন্ত্র, এখনকার অ্যারাবিক স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট ‘উদ’-এর পূর্বজ। আর পুরুষানুক্রমে ওই একজনই পারেন ওটি বাজাতে। অথবা বলা ভালো, স্ত্রী-অনুক্রমে।

– আপনি কি বলছেন কিছু ধরতে পারছি না স্যর –বাধ্য হলাম নিজের অসহায়তা স্বীকার করে নিতে – রাগনারক, ঝড়, স্বরলিপি, পাত্র, আধার, এখন আবার স্ত্রী? জট পাকানোরও তো একটা সীমা থাকে?

– ঠান্ডা হয়ে বোসো আদিত্য। ছাড়াচ্ছি জট। তার আগে বলো তো, অয়েল-ইটিং ব্যাকটেরিয়ার ব্যাপারে কী জানো?

– একজন বাঙালি বিজ্ঞানীর কথা পড়েছিলাম যেন, ডক্টর আনন্দমোহন চক্রবর্তী – স্মৃতির গভীর থেকে উঠে এল নামটা – যে কোনও অয়েল-স্পিল, মানে তেলের ট্যাঙ্কার থেকে সমুদ্রের জলে ব্যাপকভাবে তেল মিশে গিয়ে যে দূষণ, তাকে রোধ করার জন্য ল্যাবরেটরিতে বানানো হয়েছিল এমন এক ব্যাকটেরিয়া; তার কথাই বলছেন কি?

– মোটামুটি ঠিক। ডক্টর চক্রবর্তীর কাজটাই মূলত পথ দেখিয়েছিল, যদিও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বড়ো তেল-কোম্পানিই এ ব্যাপারে আরও অনেক গবেষণা স্পনসর করে চলেছে নিয়ত। ওদের ভাষায় এর নাম ‘বায়ো-রেমেডিয়েশন’, অর্থাৎ পেট্রল-দূষণের জৈব-প্রতিবিধান, প্রাকৃতিক উপায়ে দূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনা। একশো শতাংশ না হলেও খানিকটা সাফল্য পাওয়াও গেছে এতে। কিন্তু প্রিমাল্যাব যা করে ফেলেছে, তা আর বায়ো-রেমেডিয়েশনের পর্যায়ে নেই, বায়ো-টেরোরিজমে পৌঁছে গেছে।

– প্রিমাল্যাব, মানে সেই যারা বুয়া নোইকে পাচার করছিল, বেআইনি প্রাইমেট-রিসার্চের জন্য?

– নামটা মনে আছে তোমার! হ্যাঁ, ওদের বুলগারিয়ার ল্যাবরেটরিতে প্রাণী-গবেষণা বন্ধ হলেও ব্যাকটেরিয়া নিয়ে জেনেটিক রিসার্চ অব্যাহত

রয়েছে, আর এর বেশির ভাগটাই কন্ট্রাক্ট রিসার্চ। এরকমই একটি কন্ট্রাক্ট রিসার্চ হচ্ছে প্রজেক্ট ফেনরির। কাদের কন্ট্রাক্ট, কে আছে এর পেছনে সে সব জানতে চেও না, ওটুকু 'নিড-টু-নো'-ই থাক। কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে অয়েল-ইটিং ব্যাকটেরিয়াকে এমন একটা রূপ দিয়েছে প্রিমাল্যাব, যাতে যে কোনও কোম্পানির ক্রুড অয়েলের ওপর সমান ভাবে কার্যকরী হবে এই ব্যাকটেরিয়া। অক্টেন, অর্থাৎ যে হাইড্রোকার্বন তেলের অন্যতম মূল উপাদান, তাকে সহজেই ভেঙে ফেলবে জল আর হাইড্রোজেনে। কিন্তু এতেই শেষ নয়।

এদের জেনেটিক গঠনে বুনে দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্ম ন্যানো-রিসিভার , যার মাধ্যমে রেডিও-সিগন্যালের সাহায্যে বাইরে থেকে এদের ট্রিগার করা যায়, প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়, আবার দরকার পড়লে এদের বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত-ও করা যায়। প্রিমাল্যাবের তরফে ওদের ক্রেতাকে এর সফল ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে এ মাসের চার তারিখে, আর তার ডেলিভারির তারিখ এ মাসের পঁচিশ। এই রেকর্ডিং-টা শোনো আদিত্য –

ইয়ারফোনে ভেসে এল একটি প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর। প্রৌঢ়, কিন্তু দৃঢ়।

ওকে, বাট চেঞ্জ ইন টাইমলাইন। নট ফোর, উই নীড ডেলিভারি ইন থ্রি উইকস। ডেলিভার্ড ইনসাইড সাউথ অব দ্য টিউব।

– শুনলে? 'ইনসাইড সাউথ অব দ্য টিউব' – তাৎপর্য বুঝলে কথাটার?

– না স্যর, ধরতে পারছি না।

– দ্য টিউব, অর্থাৎ সুমেড পাইপলাইন। আর ইনসাইড সাউথ মানে, পাইপলাইনের দক্ষিণ দিক, মানে আইন সোখনার দিক। পঁচিশে মার্চের কোনও এক সময়ে, একটা ক্রুড অয়েল ভর্তি ট্যাঙ্কার এসে নোঙর করবে আইন সোখনা টার্মিনালে। পাম্প করে সে ট্যাঙ্কারের ক্রুড পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুমেড পাইপলাইনের ভেতরে, তার সঙ্গে পৌঁছে যাবে ফেনরির ব্যাকটেরিয়াও। পাইপলাইনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ঘাঁটি গেড়ে বসবে তারা, তারপর রেডিও সিগন্যালের অপেক্ষা। চোক-পয়েন্ট শব্দটার অর্থই পালটে যাবে এক ধাক্কায়। ক্রুড পেট্রোলিয়ামের মধ্যেকার অক্টেন যৌগটিকে আক্রমণ করে ভেঙে দেওয়ার অর্থ বুঝতেই পারছ,

ফেনরিরকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করে পুরো পাইপলাইনটাকেই নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা যাবে। শুধু তেলের সরবরাহ নয়, হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যাবে গোটা দুনিয়ার অর্থনীতি থেকে বাণিজ্য, শেয়ার-মার্কেট থেকে মুদ্রার বিনিময়মূল্য, রাষ্ট্রবিপ্লব থেকে গৃহযুদ্ধ, সব কিছু। ছোট ছোট দেশগুলো হয়তো বিক্রিই হয়ে যাবে তাদের সমস্ত নাগরিক-সমেত, মুছে যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। ব্যালান্স অব পাওয়ার বলে আর কিছু থাকবে না, আদিত্য।

– কিন্তু সেটা আটকানোর সবচেয়ে সহজ পথ তো সেই বিশেষ ট্যাঙ্কারটাকে নোঙর করতে না দেওয়া, তাই না? আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই, কোন ট্যাঙ্কারে আসছে এই ফেনরির ব্যাকটেরিয়া? তাকে আটকে দিন। এইসব ঝড়টড় কোন কাজে আসবে?

– আমি সর্বজ্ঞ নই, আদিত্য – শান্ত গলায় উত্তর দিলেন নোটুকেশ্বর – আমার পদ্ধতি, বা তার পেছনের বিজ্ঞান আজকের বিজ্ঞানের থেকে এতটাই এগিয়ে, যাতে হয়তো তাকে মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃত বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু অন্তে সেও বিজ্ঞান। তারও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যে সীমাবদ্ধতার কারণে লি পিয়াং-এর মগজের ভেতর আমি উঁকি মারতে পারিনি। বুয়া নোই-এর মাঝসমুদ্রে গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনাটার পর প্রিমাল্যাব তাদের রিসার্চকে, তাদের ল্যাবরেটরির সুরক্ষাকে আরও শক্তপোক্ত করে ফেলেছে। আরও কঠিন ফায়ারওয়াল, এবং সর্বোপরি, ওরা রিসার্চের কাজটা এমন ভাগে ভাগ করে ফেলেছে যাতে একটা অংশের খবর যদি কোনও ভাবে বাইরে ফাঁস হয়েও যায়, তাতে বাকি গবেষণার গোপনীয়তায় কোনও আঁচ পড়বে না। এই পুরো গবেষণাটার যাবতীয় তথ্য আছে কেবল দুজনের কাছে। আর তারা প্রিমাল্যাবের দুর্গের বাইরে পা রাখেন না।

– তাহলে আপনি এত কিছু কীভাবে জানতে পারলেন, ফেনরিরের ব্যাপারে? – প্রশ্ন করলাম আমি।

– ওদের ক্লায়েন্টের জন্য ওরা একটা ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছিল আদিত্য। যে রেকর্ডিংটা শোনালাম তোমাকে, ওটা সেই ডেমনস্ট্রেশনেরই সময়কার। তার অঙ্গ হিসেবে ওরা একটি ড্রোন, এবং একটি স্পাই স্যাটেলাইটের ফীড ব্যবহার করেছিল। আধ ঘন্টারও কম সময় নিয়েছিল ওরা, কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট ছিল আমার এ-আই মস্তিষ্ক 'মানিক'-এর পক্ষে, ওই ফিডের সূত্র ধরে ওদের সিস্টেমের মধ্যে উঁকি

মারার জন্য। সেই আমাদের প্রথম আভাস পাওয়া, প্রজেক্ট ফেনরিরের। কিন্তু যে ট্যাঙ্কার ফেনরিরকে বয়ে নিয়ে আসবে, সেটিকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। ইন ফ্যাক্ট, ওরা শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবে কোন ট্যাঙ্কারে পাঠাবে, এবং আমি যদি খুব ভুল না করি, ওরা একাধিক ডিকয় ব্যবহার করবে এই কাজে। সুতরাং সে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

– তাহলে উপায়?

– যেমন বললাম, ঝড়। ক্যাওস, আরও বড়ো একটা ক্যাওসকে থামানোর জন্য।

– আচ্ছা, এবার বোঝান এর সঙ্গে এই স্বরলিপির কী সম্পর্ক? না কি, সেও কাল বলবেন, শেষ মুহূর্তের আগে?

– না আদিত্য, বলব আজকেই। কাল অনেক কাজ তোমাদের।

কাল আল-বাকসা তোমাকে নিয়ে যাবেন উত্তর ও দক্ষিণ সিনাই গভর্নরেটের সীমান্তে, বেদুইনদের একটি গোষ্ঠীর বসতিতে। ছোট্ট গোষ্ঠী, মাত্র পঞ্চাশের কাছাকাছি পরিবারের বাস। কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই এদের, মাঝে মাঝেই ক্যারাভান তুলে নর্থ সিনাই থেকে সাউথ সিনাই, বা সেখান থেকে সুয়েজ গভর্নরেটের আওতায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এদের বিশ্বাস, এদের শিকড় প্রাক্-ইসলামিক আরবে। এদের ধর্মগুরু বলো, নেতা বলো, তিনি একজন মহিলা, বংশানুক্রমে তাঁকে ওরা সম্বোধন করে আল-য়ামামা বলে। ইসলামিক সংস্কৃতিকে স্বীকার করে না, তাই সরকারের তরফ থেকেও তেমন সুযোগসুবিধা পায় না এরা, আর সভ্যতার সঙ্গে যে কোনও রকম সংস্পর্শও এড়িয়ে চলে। যে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রটির কথা বলছিলাম, সেটি রয়েছে ওই আল-য়ামামার কাছেই, একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে ও যন্ত্র ছুঁয়ে দেখার, তাতে সুর তোলার। আল-বাকসা এদের খানিকটা বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাই ওর সঙ্গে গেলে তোমার পক্ষে ওদের ডেরা অবধি পৌঁছানো সম্ভব হবে। ওর মাধ্যমেই কথোপকথন চালাতে হবে তোমায়, আল-য়ামামার হাতে তুলে দিতে হবে এই স্বরলিপি, অনুরোধ করতে হবে, সূর্যোদয়ের আগে ব্রাহ্মমুহূর্তে যেন উনি তুলে নেন ওঁর যন্ত্র, বাজান এই সুর। বাকিটা, বাটারফ্লাই এফেক্ট।

– আর যদি উনি বাজাতে রাজি না হন? যদি না শোনেন আমাদের

কথা?

– সে সম্ভাবনাই বেশি হে আদিত্য, সেটাই চিন্তার কথা – বললেন বটে, কিন্তু চিন্তার লেশমাত্র আভাস পাওয়া গেল না নোটুকেশ্বরের গলায় – তবে তারও একটা পথ আছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে আল-য়ামামার উপকথাটা শোনানো দরকার। বলছি শোনো –

এই উপকথা আরব দুনিয়ায় প্রচলিত রয়েছে ইসলামের জন্মেরও আগে থেকে। আক্ষরিক অর্থেই দূরদর্শী ছিলেন জারকা-আল-য়ামামা, এতটাই দূরদর্শী, লোকে বলত এক সপ্তাহের দূরত্বের ক্যারাভানও তাঁর নজর এড়াত না। যত বেশি অন্ধকার, ততই নাকি প্রখর হত তাঁর দৃষ্টি। তাঁদের প্রতিবেশী রাজ্যের সম্রাট হাসানের সৈন্যরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর গোষ্ঠীকে আক্রমণ করতে আসে, উনি আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাদের, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি ওঁর কথা। ওদেরও পুরোপুরি দোষ ছিল না অবশ্য। সম্রাট হাসান জানতেন জারকা'র এই বিশেষ ক্ষমতার কথা, তাই সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি করে গাছের ডাল কেটে নিজেদের শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিতে। জারকা দেখেছিলেন, একটা জঙ্গলকে এগিয়ে আসতে। যেমন দেখেছিলেন তেমনটাই বলেছিলেন, ফলে কেউ বিশ্বাস করেনি ওঁর ভবিষ্যদ্বাণী। শেষে যখন ভুল ভাঙল, ততক্ষণে রাতের অন্ধকারে মরুভুমি পেরিয়ে এসেছে হাসানের সৈন্যদল, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

জাদুকরী সন্দেহে জারকা-আল-য়ামামাকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল। তার আগে ওরা উপড়ে নিয়েছিল আল-য়ামামার চোখদুটি, কিন্তু রক্তপাত হয়নি এক ফোঁটাও। সেখানে নাকি ছিল শুধু অতল অন্ধকার।

বেদুইনদের এই গোষ্ঠীটির ধারণা, জারকা-আল-য়ামামা এদেরই কন্যা ছিলেন। এরকম ধারণা অবশ্য যাযাবরদের মধ্যে বিরল নয়। রুক্ষ কঠিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি ভরসা একটা অন্যতম অবলম্বন তো বটেই, কিন্তু এরা সেই বিশ্বাসটিকে একটা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। এরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রতি প্রজন্মে তিনি ফিরে ফিরে আসেন, আজকের আল-য়ামামা বেছে নেন তাঁর উত্তরসূরীকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা জ্ঞানের ভাণ্ডারের চাবি তুলে দেন তার হাতে। অনূঢ়া আল-য়ামামা তাঁর পিতৃকুলের রক্ষণাবেক্ষণেই জীবন কাটিয়ে দেন। তারপর জীবনের

শেষপ্রান্তে এসে বেছে নেন তাঁর উত্তরসূরীকে। এমনটাই চলে আসছে।

– আর সে মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবন? সে নিজে আল-য়ামামা হয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায় কি না সেটা কেউ জানতে চায় না? – প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিরক্তির রেশ নিজের কানেই ধরা পড়ল।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন নোটুকেশ্বর।

– এদের সময় থেমে আছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। আজ তুমি তোমার একবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধ দিয়ে এদের বিচার করতে চাইলে তা তো ন্যায়বিচার হবে না আদিত্য। ঠিক যেমন ন্যায় হবে না, যদি আমি তোমার বিচার করতে বসি আমার সময়ের মূল্যবোধ দিয়ে। আমার মূল্যবোধে তো এই চোক-পয়েন্ট, এই ব্যালান্স অব পাওয়ার, এই যুদ্ধের কোনও দামই নেই। ঠিক যে কারণে আমি বুঝে উঠতে পারি না, কেন তোমাদের পৃথিবীতে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, সেই একই যুক্তিতে আল-য়ামামার ট্র্যাডিশনকে তোমার একুশ শতকের চোখে বিচার করতে বসলে ভুল করবে। এ কথা ভুলে যেও না, বাটারফ্লাই এফেক্টের সুতোর এক প্রান্তে আল-য়ামামা সেই প্রজাপতির পাখার কম্পন, যার অন্য প্রান্তে অপেক্ষা করে আছে ঝড়। ক্যাওস। রাগনারক থেকে মুক্তি।

– বেশ। এবার বলুন, এই আল-য়ামামার বিশ্বাস অর্জনের জন্য কী করতে হবে আমায়?

– আল-য়ামামা যে তোমাদের প্রস্তাবে সায় দেবেন না, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তাই এই প্ল্যান বি। কিন্তু খুব সাবধান আদিত্য, প্ল্যানের এই অংশটা আল-বাকসাও জানেন না। ওঁকে শুধু জানানো হয়েছে, বেদুইনদের ক্যাম্পে যাওয়ার সময় সঙ্গে ওঁর সেলফোনটা গাড়িতে রেখে যেতে। তোমাদের দুজনের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম থাকবে তোমার ফোনটিই। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো ...

***

।। দুই ।।

বাইশে মার্চ

এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হওয়ার পরে প্রথম যেখানে গাড়ি থামিয়েছিলেন আল-বাকসা, সে জায়গাটা উত্তর এবং দক্ষিণ সিনাইয়ের সীমান্ত বরাবর, আল-আরিশ থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দক্ষিণে। একশ কিলোমিটারের আগেই দু পাশে রুক্ষ পাথুরে পাহাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল, আল-বাকসা জানালেন এটিই নাকি বিখ্যাত 'এল তিহ্'-র পাহাড়ি – তার মাঝখান দিয়ে স্কেল-টানা দাগের মতো হাইওয়ে ফিফটিফাইভ পৌঁছে দিল উত্তর সিনাই গভর্নরেটের নাখল শহরে।

হোটেল ঠিক করাই ছিল, চেক-ইনের পরে আমাকে বিশ্রাম করতে বলে আল-বাকসা নিজে আবার বেরোলেন গাড়ি নিয়ে। বললেন – আমি ততক্ষণে আমাদের পরের বাহনের ব্যবস্থা করে আসি, আর এই ট্রাইবটা এখন ঠিক কোথায় আছে সে ব্যাপারেও একটু খবর নিয়ে আসি। সূর্য ডোবার পরে আবার রওনা হব আমরা, সওয়া ছটা নাগাদ।

সওয়া নয়, বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছটা বাজল। নাখল অবধি আমরা এসেছিলাম হাইওয়ে ফিফটিফাইভ ধরে, এবার শহর ছেড়ে গাড়ি ডানদিকে ঘুরল পঞ্চাশ নম্বর হাইওয়ে বরাবর । এ রাস্তা গিয়ে পড়ছে একেবারে সুয়েজের কিনারে। হাইওয়ের দুপাশে এল তিহ্-র নিষ্প্রাণ পাথুরে পাহাড়, অস্তগামী সূর্যের আভা তার খয়েরি রঙে বুলিয়েছে বিষন্নতার প্রলেপ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সে মন-খারাপ ছোঁয়াচে রোগের মতোই চারিয়ে যায় দর্শকের মনে।

আমাকে অবশ্য বেশিক্ষণ তাকাতে হল না সে দিকে। মিনিট কুড়ির মধ্যেই মূল রাস্তার পাশে একটা স্লিপ-রোডে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড় করালেন আল-বাকসা। হাইওয়ের ওপরে আলো থাকলেও স্লিপ-রোডের দিকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে এর মধ্যেই। পার্ক-করা গাড়িটা রাতের বেলায় হাইওয়ে থেকে নজরে আসবে না চট করে।

– এই যে, এই দিক দিয়ে নেমে আসুন নিচের কাঁচা রাস্তায় – গাড়ির উল্টো দিক থেকে আল-বাকসার গলার আওয়াজ ভেসে এল।

স্লিপ-রোড থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, তার মুখে

দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক। ওর পিছু পিছু নেমে গিয়ে পড়লাম নিচের রাস্তায়। সম্ভবত যাযাবর বেদুইনদেরই পায়ে পায়ে একটা আবছা পথের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে পাথরের গায়ে। সে পথ ধরে কয়েক পা যেতে না যেতেই বাঁ পাশের অন্ধকারটা হঠাৎ নড়ে উঠল শব্দ করে।

– আমাদের পরের বাহন। আসুন মিস্টার আদিত্য।

খচ্চর। প্রাক-বাইবেল যুগ থেকে এই দেশের, এই সভ্যতার ভার বহন করে আসছে এদের জাতভাইরা, আমার ভার কি আর বইতে পারবে না? নোটুকেশ্বরের নাম নিয়ে চেপে বসলাম একজনের পিঠে।

অন্ধকারে অচেনা রাস্তায় অন্য কারোর ভরসায় চলার একটা সুবিধা আছে, অনর্থক পথের দুশ্চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে বসে না। আমার সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক খচ্চরারোহী গাইড, পেছনে আল-বাকসা, তার পেছনে আরও একজন। বেশ সুরক্ষিতই বোধ করছিলাম, কিন্তু মাথায় ঘুরছিল নোটুকেশ্বরের সাবধানবাণী।

কী ভাবে রাজি করাব আল-য়ামামাকে? সভ্যতা থেকে বিযুক্ত এক যাযাবর বেদুইন গোষ্ঠীনেত্রীকে কী ভাবে বোঝাব, কী অসহায় ভাবে একবিংশ শতকের আধুনিক সভ্যতা ভিখারির মতো হাত পাতছে সুদূর অতীতে থেমে-থাকা এক আপাত-অসভ্য জনজাতির কাছে? আর যদি রাজি না হন উনি? নোটুকেশ্বরের প্ল্যান বি-ই বা কীভাবে ফলপ্রসূ হবে?

ভাবতে ভাবতেই পথ ফুরোলো। এক সময় বুঝতে পারলাম, রাস্তাটা নামছে নিচের দিকে। একটা বাঁক ঘুরল আমাদের খচ্চর-কনভয়, দেখলাম দূরে কয়েকটা মশাল জ্বলছে, তার আলোয় ঠাহর হল পাথুরে রাস্তা গিয়ে মিশেছে সমতল বালিতে, তার ওপরে দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ছাউনির আদল। বুঝতে পারলাম, আমাদের উদ্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছেছি। পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন আল-বাকসা, যাওয়ার আগে ফিসফিস করে বলে গেলেন,

– আমি গিয়ে কথা শুরু করছি। আপনি নেমে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ডাকলে আসবেন।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। যতটা উৎসাহ নিয়ে এগিয়েছিলেন, ঠিক ততটাই হতোদ্যম, ক্লান্ত পায়ে মিনিট দশেকের

মধ্যেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক। মাথা নাড়লেন আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে, অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিতে সময় নেননি আল-য়ামামা। ।

– কী বললেন উনি? – কথাটা আমার মুখ থেকে বেরোনোর আগেই ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়লাম বালির ওপরে। তার সঙ্গে শিরদাঁড়ার ওপর একটা প্রবল চাপ, মনে হল কেউ হাঁটু দিয়ে চেপে বসেছে পিঠের ওপর। মাথার ওপর একটা কাপড়ের ঢাকা পরিয়ে ফাঁস টেনে দিল ক্ষিপ্র একজোড়া হাত, ঘাড়ের ওপর অনুভব করলাম একটা ঠাণ্ডা ধাতব নলের স্পর্শ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে আসতেও স্বস্তির আভাস পেলাম মনে।

নোটুকেশ্বরের প্ল্যান বি-র চিত্রনাট্য তা হলে নির্ধারিত পথেই এগোচ্ছে। যেমনটি উনি বলেছিলেন, কাল রাতে।

– আল-য়ামামা যে তোমাদের প্রস্তাবে সায় দেবেন না, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তাই এই প্ল্যান বি। কিন্তু খুব সাবধান আদিত্য, প্ল্যানের এই অংশটা আল-বাকসাও জানেন না। ওঁকে শুধু জানানো হয়েছে, বেদুইনদের ক্যাম্পে যাওয়ার সময় সঙ্গে ওঁর সেলফোনটা গাড়িতে রেখে যেতে। তোমাদের দুজনের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম থাকবে তোমার ফোনটিই। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো ...

আল-য়ামামা এবং ওঁর বেদুইন-গোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে ওঁর সহায়তা তুমি পাবে না। আর ওঁর বিশ্বাস অর্জন করার একটিই রাস্তা খোলা আছে আমাদের সামনে। আল-দাওলা-আল-ইসলামিয়াহ্, সিনাইতে আইএস-এর অনুগামী জঙ্গি সংগঠন। তাদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য সিনাই পেনিনসুলা অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। বেদুইনরা সিনাই অঞ্চলকে চেনে নিজেদের হাতের তালুর রেখার মতো করে, তাই অনেক দিন ধরে আল-দাওলা চেষ্টা চালাচ্ছে, বেদুইনদের মধ্যে নিজেদের জঙ্গি আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার, নিজেদের অপকর্মের শরিক করে নেওয়ার। আর তার জন্য এদের প্রয়োজন আল-য়ামামার স্বীকৃতি পাওয়া । সিনাইয়ের বাকি বেদুইন গোষ্ঠীগুলোও আল-য়ামামাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাই যদি কোনও ভাবে ওঁর সমর্থন আদায় করা যায়, তাহলে এদের কাজটা সহজ হয়ে যায়। তার জন্য দরকারে রক্তপাত ঘটাতেও পিছপা নয় এরা। কিন্তু আল-দাওলা-র সমস্যা হচ্ছে, এখানে এদের কোনও নেটওয়ার্ক নেই, ফলে আল-য়ামামার ক্যারাভান যে কখন

কোথায় থাকে সে ব্যাপারে এরা পুরোমাত্রায় অজ্ঞ।

– বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাদের আল-য়ামামার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার খবরটা গোপন সূত্রে পৌঁছে দেবেন আল-দাওলা-র কাছে। ওরা আমাদের অনুসরণ করে আসবে, চেষ্টা করবে আল-য়ামামাকে কিডন্যাপ করার, আর আমরা সে চেষ্টা বিফল করব। মানে, করবেন আপনিই, বকলমে আমরা। কিন্তু স্যর – একটা টেররিস্ট সংগঠনকে এর মধ্যে ঢোকানো কি ঠিক হবে? যদি হাতের বাইরে চলে যায় ব্যাপারটা? ওদের গুলিগোলা চালানোর ওপরে তো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না আপনার!

– ওরাও চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কাজটা শেষ করে বেরিয়ে আসার, কারণ এখানে ওদের কোনও নিরাপদ আস্তানা নেই। বেদুইনদের ক্যাম্পটার অবস্থান এই মুহূর্তে উত্তর সিনাই, দক্ষিণ সিনাই আর সুয়েজ – তিন তিনটে গভর্নরেটের সীমার খুব কাছে। পুলিশের কড়া পাহারা থাকে ওই অঞ্চলে। আর বেদুইনদের সাহায্য দরকার ওদের, অযথা রক্তপাত করে ওদের চটানোর ঝুঁকি নেবে না আল-দাওলা-র জঙ্গিরা।

সেই প্ল্যান বি।

যেমনই এক ধাক্কায় পেড়ে ফেলা হয়েছিল মাটিতে, তেমনই কলার ধরে প্রচণ্ড এক ঝটকায় তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল আমাকে। ধাতব নলটা কানের পাশ থেকে সরে গেল, তার পরেই কোমরে খোঁচা লাগতে বুঝলাম, লক্ষ্য আমিই আছি, শুধু স্থান বদল হয়েছে নলের। কর্কশ কর্তৃত্বময় গলায় কেউ একজন আরবিতে হুকুম দিল কাউকে।

আল-বাকসার গলার আওয়াজ। কাউকে কিছু বলছেন, উত্তর-প্রত্যুত্তর চলল মিনিট দুয়েক ধরে, তারপর কোমরে আবার নলের চাপ। বুঝলাম, সামনে চলার ইশারা।

বালির ওপর দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল বেশ খানিকটা রাস্তা। বেদুইনদের ক্যাম্প তখন সরগরম হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে বহু মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে , আর তাদের ছাপিয়ে উঠছে সেই কর্কশ গলার আদেশ। সম্ভবত এই-ই আল-দাওলা-র নেতা।

আবার ধাক্কা দিয়ে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হল আমাকে, খুলে দেওয়া হল মাথার ঢাকনা। তাকিয়ে দেখলাম, আল-বাকসারও ঠাঁই হয়েছে আমার ডান পাশে। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন মানুষটি। আর আমাদের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে ইজিপশিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরা এক সৈন্য তার বন্দুকের নল তাক্ করে রেখেছে আমাদের দিকে।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,

– এরা কে, আল-বাকসা? আর্মির ইউনিফর্ম দেখছি, কিন্তু ইজিপশিয়ান আর্মি হঠাৎ আমাদের ...

– এরা আর্মির সৈন্য নয় মিস্টার আদিত্য। এরা আল-দাওলা-আল-ইসলামিয়াহ্-র জঙ্গি, আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছে। এরা ইজিপ্টে আইএসের শাসন স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এখানে কী উদ্দেশ্যে, কিছুই বুঝতে পারছি না – বিড়বিড় করে জবাব দিলেন আল-বাকসা।

উনি বুঝতে না পারলেও আমি তো জানি! সামান্য পড়াশোনা করেছিলাম কাল, এবং যতটুকু জেনেছিলাম, হাড় হিম হয়ে গিয়েছিল তাতেই। সারা দুনিয়ার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকার এক নম্বরে রয়েছে যে ইসলামিক স্টেট, দুহাজার চোদ্দ থেকে সিনাই পেনিনসুলা অঞ্চলে তাদেরই প্রতিভূ হিসেবে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আল-দাওলা-আল-ইসলামিয়াহ্। এদের লক্ষ্য সমগ্র সিনাই অঞ্চলটাকে ইসলামিক স্টেটের শাসনে নিয়ে আসা। ইজরায়েলের নাকের ডগায় নিজেদের ঘাঁটি জমাতে পারলে সিনাই পেনিনসুলা ওদের ক্ষমতার নতুন ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবে, তার সঙ্গে হাতে আসবে তেল আর সুয়েজের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যে কোনও ধর্মীয় দাবার লড়াইতে এক দল বোড়ে থাকা খুব জরুরি। ওদের কাছে এই যাযাবর বেদুইনরা সেই অনিচ্ছুক বোড়ে।

এ ভাবেই এক ধর্মের সাম্রাজ্যবিস্তারের নিচে চাপা পড়ে যায় আরও প্রাচীন এক বিশ্বাস।

চারদিকে নজর ঘুরিয়ে দেখলাম, আমাদের ঘাড়ের ওপর দাঁড়ানো জঙ্গিটিকে বাদ দিলেও আরও অন্তত চারজন জঙ্গি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে ক্যাম্পের চৌহদ্দি। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্তত শ'খানেক বেদুইনকে জড়ো করা হয়েছে ক্যাম্পের মাঝামাঝি, গোল করে বসানো

হয়েছে বালিতে। সবাই চুপ, শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে শিশুকণ্ঠের কান্না।

নোটুকেশ্বর কী তবে কাজটা ভুলই করলেন?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই সমস্বরে একটা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। কোণের একটা ক্যারাভানের পর্দা সরিয়ে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল এক দৈত্যাকৃতি জঙ্গি, গায়ের ইউনিফর্মটা যেন ফেটে পড়ছে। আর তার উদ্যত পিস্তলের নলের সামনে দৃঢ় পায়ে হেঁটে এলেন এক প্রৌঢ়া। মাথা থেকে পা অবধি ঢাকা কালো রঙের মাদ্রাগা-য়, কিন্তু মুখে আবরণ নেই কোনও। মশালের আলো কোণাকুণি এসে পড়ছে তাঁর মুখে, সেই আলো-আঁধারিতে আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর ঝকঝকে উজ্জ্বল শান্ত একজোড়া চোখ। সে চোখে কোনও ভয়, কোনও চিন্তার লেশ মাত্র নেই। তিনি যেন জানেন, কী লেখা আছে এই চিত্রনাট্যের পরের পাতাগুলোতে।

সমবেত ক্যাম্পবাসী, ইউনিফর্ম-পরা জঙ্গিদের ছুঁয়ে সে চোখ ফিরল আমাদের দুজনের দিকে, তারপর আবার ন্যস্ত হল বৃত্তাকারে বসে থাকা মানুষগুলোর ওপর, বন্দুকের নলের নিচে বসেও যারা পরম ভরসায় নিজেদের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তাদের আল-য়ামামার ওপর। পেছন থেকে সেই কর্কশ গলা খেঁকিয়ে উঠে আদেশ দিল। বুঝলাম, এই সেই নেতা।

মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন আল-য়ামামা।

আমি তাকালাম আল-বাকসার দিকে – উৎকর্ণ হয়ে সে কথা শুনছেন ভদ্রলোক। আমার দিকে চোখ পড়তে ইশারায় আমাকে কাছে সরে আসতে বললেন। আড়চোখে দেখলাম, আমাদের রক্ষীরও নজর আল-য়ামামার দিকে। খুব আস্তে আস্তে শরীর ঘষটে সরে গেলাম ওঁর দিকে।

– এরা আল-য়ামামাকে দিয়ে এদের জঙ্গি আদর্শের প্রচার করাতে চায় মিস্টার আদিত্য। অন্যথায় গুলি চালাতেও পিছপা হবে না। আল-য়ামামা বলছেন, ওদের বাধা না দিতে, বাধা দিলে গুলি চলবে, প্রাণ যাবে শিশুদের, বৃদ্ধদের।

– কীরকম প্রচার? এখান থেকেই সরাসরি ব্রডকাস্ট করবে না কি?

– সে রকমই তো মনে হচ্ছে।

– আর আমাদের নিয়ে কী করবে মনে হয়, আল-বাকসা?

– জানি না, বুঝতে পারছি না আদিত্য। আমরাই বোধ হয় ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম এখানে, কিন্তু কী করে ওরা খবর পেল, আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

– যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে তো লাভ নেই আল-বাকসা – ফিসফিস করে বললাম –কিন্তু আমাদের জন্যই যখন এই বিপদ এসে পড়েছে আল-য়ামামার ওপর, তার রাস্তাও আমাদেরই বার করতে হবে। আপনি এক কাজ করুন। ওদের নেতাটির সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন। বলুন যে আমি একটা য়ুরোপীয় কোম্পানির কর্তাব্যক্তি, আমাকে পণবন্দি রেখে আমার কোম্পানির কাছ থেকে ওরা মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করে নিতে পারবে, তার বদলে আপনাকে যেন ছেড়ে দেয় ওরা। এক্ষুনি কথা বলুন, যান। বেশি দেরি হয়ে যাওয়া আগেই!

– এ কী অসম্ভব কথা বলছেন আপনি মিস্টার আদিত্য – ফুঁসে উঠলেন আল-বাকসা – এই ধারণা হল আমার সম্বন্ধে আপনার? দ্যাট আই'ল সেল য়ু আউট, তাও নিজেকে বাঁচাতে?

সবটুকু আকুতি গলায় এনে অনুরোধ করলাম –

– এটা আর্গুমেন্টের সময় নয় আল-বাকসা। যেটা বলছি, প্লিজ করুন। আমাদের সকলেরই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা।

কী বুঝলেন কে জানে, ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের রক্ষীটিকে কিছু বললেন আল-বাকসা। তার নজর তখনও আল-য়ামামার দিকে, প্রথমে সে আমল দিল না। কিন্তু আল-বাকসার কথায় এমন একটা কিছু থেকে থাকবে, শেষে সে মাথা নেড়ে আমাদের দুজনকে ইশারা করল উঠে দাঁড়াতে। তারপর বন্দুকের নিশানায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেল আল-য়ামামার পাশে দাঁড়ানো ওদের নেতার কাছে। বিরক্ত হয়ে আবারও খেঁকিয়ে উঠল সেই দৈত্য, তারপর আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে আল-বাকসার দিকে তাকিয়ে গর্জন ছাড়ল একটা।

কাঁপা-কাঁপা গলায় নিজের কথা শেষ করলেন ভদ্রলোক। দৈত্য এবার তাকাল আমার দিকে। অন্তত পৌনে সাত ফিট লম্বা, তেমনই চওড়া, দশ লিটারের জলের ক্যানের আকারের এক একটা বাইসেপ। এক মুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গল আর মোটা ভুরুর আড়ালে ক্রূর একজোড়া চোখ বোধ হয় মেপে নিতে চাইল, সে যা দেখছে, আল-বাকসার কথার সঙ্গে তার সত্যিই সাযুজ্য আছে কি না।

– ইওর নেম?

বললাম নাম।

– হোয়াই ইউ হিয়ার?

যতটা সম্ভব কম কথায় বললাম, বেদুইন ক্যাম্পে সৌরবিদ্যুতের প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

– ইওর কোম্পানি হোয়্যার?

অর্থাৎ বাজিয়ে নিতে চায়, মুক্তিপণ ডলারে পাওয়া যাবে, না ইউরোতে। আমেরিকান পণবন্দি হলে অবশ্য আনুষঙ্গিক ঝামেলাও আছে, জার্মানি শুনে মনে হল খানিক সন্তুষ্ট হল। আমার দিকে এগিয়ে এসে মুখের কাছে মুখ এনে বলল,

– ইউ কল ইওর কোম্পানি, ইওর বস। ইউ কল, দেন আই টক। নো ট্রিক – বলতে বলতে লোকটার নজর ঘুরল ভিড়ের দিকে। সামনের সারিতে এক বেদুইন মা বসেছিলেন তার বাচ্চাকে দু হাতে আগলে, ওর চোখের ইশারায় একটা জঙ্গি গিয়ে বাচ্চাটির চুলের মুঠি ধরে ছিনিয়ে নিতে গেল মায়ের কোল থেকে। দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরলেন মা, সঙ্গে সঙ্গে অত বড়ো শরীরটা নিয়েও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দৈত্যটা নিচু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, হাতে ধরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল মহিলার মাথায়। একটা আর্ত চিৎকার করে দু হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মহিলা।

এতটা আকস্মিক আর অপ্রয়োজনীয় নৃশংসতার অভিঘাত চুপ করিয়ে দিয়েছিল গোটা ভিড়টাকেই। দৈত্যটাও বুঝি তাই-ই চেয়েছিল। পায়ের ঠোকরে মহিলার শরীরটাকে সরিয়ে দিল অবহেলায়, তারপর

বাচ্চাটির জামা ধরে এক হাতে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক যেন সিংহের কবলে হরিণশিশু। ডুকরে ডুকরে হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছিল বাচ্চাটি, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে ছুঁড়ে দিল নিজের এক সাকরেদের পায়ের কাছে। বালির ওপর আছড়ে পড়ে আবার কেঁদে উঠল বাচ্চাটি, তারপর ধীরে ধীরে থেমে এল তার কান্নার দমক, বোধ হয় ভয়ের ধাক্কাতেই।

– ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইউ ট্রিক, শী ডাই!

মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিলাম মা ও শিশু, দুজনের কাছেই। তারপর ফোন বের করে কনট্যাক্ট-লিস্ট খোলার ভান করলাম। ভানই, কারণ ওঁকে ডায়াল করার মতো কোনও নম্বর তো নেই আমার তালিকায়।

কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্লিজ নোটুকেশ্বর, ফোনটা করুন। বাচ্চাটার জন্য! প্লিজ!

কেঁপে উঠল হ্যান্ডসেট। শান্ত, ধাতব কণ্ঠস্বর ফোনের ওপরে। একটু যেন বেশি শীতলও।

– ইংরেজিতেই কথাবার্তা চালিয়ে যাও আদিত্য। মিনিটখানেক, তার পরে হ্যান্ডসেটটা তুলে দাও ওদের লিডারের হাতে। আর প্রথম সুযোগেই মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যেও। ক্লিয়ার?

এক মিনিটের আগেই একতরফা কথোপকথন শেষ করে কাঁপা হাতে ফোনটা বাড়িয়ে দিলাম, ছিনিয়ে নিয়ে কানে লাগাল দৈত্যটা। কর্কশ গলা আছড়ে পড়ল মাউথপিসে – হাল্লো।

টেলিডিসচার্জ!

একটা সাদা বিদ্যুতের ফলা ঝলসে উঠল ফোনের ভেতর থেকে লোকটার কান পর্যন্ত। পৌনে সাত ফিটের দানবটা এই দাঁড়িয়ে ছিল নিজের পায়ে, এই শূন্যে ছিটকে উঠে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ততক্ষণে আমিও ঝাঁপ দিয়েছি সাকরেদটির পায়ের ওপরে, দুহাতের বেষ্টনে বাচ্চাটাকে আগলে ধরে তাকে নিয়েই দু পাক গড়িয়ে গেছি বালির ওপরে। চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম সাকরেদ জঙ্গিটি বন্দুক তুলছে আমার দিকে, তার পরেই আল-বাকসা দু হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়লেন

আমাকে আড়াল করে।

একটা গুলির শব্দ ডুবে গেল সমবেত বেদুইনদের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে। মরুঝড়ের মুখে কুটোর মতোই ভেসে গেল পাঁচ জঙ্গি।

***

টেলিকমিউনিকেশনকে কাজে লাগিয়ে ফোনের ভেতর দিয়ে নিজের অসীম ক্ষমতাশালী মস্তিষ্কের তীব্র ইলেকট্রিক পালসকে কেন্দ্রীভূত করে ফোনের ওপারের মগজে আঘাত হানার এই যে পদ্ধতি, টেলিডিসচার্জ, নোটুকেশ্বরের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনেই এটার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল আমার। তবে সেটার পরিমাপ ছিল খুবই সামান্য, এক পার্সেন্টেরও কম। মনে আছে, প্রথম দিনেই উনি বলেছিলেন,

'... মগজ ভাজা করার জন্য দশ পার্সেন্ট-ই যথেষ্ট।'

অনর্থক হিংসা, বিশেষ করে একটি মা ও তাঁর শিশুর প্রতি অকারণ বর্বরতা বুঝি এই না-মানুষটিকেও বিচলিত করে থাকবে। আজ রাতে সম্ভবত হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাওয়ার চার্জ করেছিলেন নোটুকেশ্বর। সত্যিই ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছিল জঙ্গি নেতাটির মগজ, তার সঙ্গে কোল্যাটারাল ড্যামেজ হিসেবে আমার ফোনটাও। বাকি জঙ্গিরাও বাঁচেনি বেদুইনদের হাত থেকে। সিনাই মরুভূমির কোনও কোণে রাত পেরোনোর আগেই দাফন হয়ে যাবে দেহগুলো।

আল-য়ামামার ক্যারাভানেই শুশ্রূষা চলছিল আমার সঙ্গীর। আমি অপেক্ষা করছিলাম বাইরে। এক সময় আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। নিচে শোয়ানো রয়েছে আল-বাকসার দেহ। ওঁর পার্স, গাড়ির চাবি, পাসপোর্ট সবই পকেট থেকে বের করে রাখা পাশে, সঙ্গে পার্চমেন্টটাও। ইশারায় আমাকে বসতে বললেন আল-য়ামামা, তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন,

– আপনার সঙ্গীর আপাতত আর কোনও বিপদ নেই। কপাল ভালো, বুলেটটা ভেতরে ঢোকেনি, কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। আপাতত ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লেপে দেওয়া হয়েছে, রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়েছে তাতে। ওষুধের ঘোরে এখন ঘুমোচ্ছেন। আপনিও একটু বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আমরা আপনাদের গাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়া হবে।

শুধু এটুকুই? এমন একটা বিপদ কেটে যাওয়ার পরেও কোনও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ নেই, নেই কোনও সাহায্যের আশ্বাস – এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না?

খানিকক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা আর সঙ্কোচের বেড়াজাল কাটিয়ে মুখ খুললাম,

– আপনার অজানা নয়, কী আর্জি নিয়ে আমরা এসেছি আপনার কাছে। সে আর্জি আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, আল-বাকসা বলেছেন আমাকে। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আর একটি বার ভেবে দেখুন। সিনাই মরুভূমির এক প্রান্তে বসে আপনি হয়তো বা ধারণা করতে পারছেন না, কী বিপুল বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমস্ত মানবজাতি। এই যে পৃথিবীজোড়া সভ্যতার চাকা ঘুরছে দিবারাত্র, তার পেছনের একটা বড়োসড়ো শক্তি যোগাচ্ছে পেট্রোলিয়াম। তার নিয়ন্ত্রণ যদি একটা অশুভ শক্তির হাতে চলে যায়, তার পরিণতি যে কী ভয়াবহ হতে পারে, তার পুরোপুরি আন্দাজ আমাদের কাছেও নেই। শুধু জানি, আরও অনাহার, আরও যুদ্ধ, আরও মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকবে পৃথিবীর একটা বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য।

– বিপর্যয়টা ঠিক কী ভাবে আসবে, সেটা কিন্তু আপনার সঙ্গী বা আপনি, কেউই বলেননি।

নোটুকেশ্বরকে দেওয়া মন্ত্রগুপ্তির শপথ ভাঙা ছাড়া উপায় নেই কোনও। সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ফেনরিরের কথা। ঝড়ের স্বরলিপির কথা।

– আর এ সবের থেকে নিষ্কৃতি সম্ভব হবে এই সুরের প্রভাবে? ঠিক কেমন করে? আপনার সঙ্গী বললেন বটে, এই সুর থেকে ঝড় উঠবে। কিন্তু সে ঝড়ের সঙ্গে আপনাদের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কী সম্পর্ক? কী ভাবে ঘটবে সেটা, বোঝাবেন আমাকে, যাতে একটু বিশ্বাসযোগ্য হয় গল্পটা? – দু-আঙুলে পার্চমেন্টটা তুলে ধরে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আল-য়ামামা।

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর আমার কাছেও নেই।

– পৃথিবীর এক কোণায় একটি প্রজাপতির পাখা ঝাপটানো, অন্য এক কোণায় বদলে দিতে পারে একটা ঝড়ের অভিমুখ। এই নিয়েই আমাদের কাজ। আমি শুধু এটুকু জানি, আপনার বাজনাই সেই প্রজাপতির পাখার কাঁপন। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথের নিশানা আপনিই দিতে পারেন।

– আর সে জন্যই একখানি দু-ধারি তলোয়ার নিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে, কেমন? – সহসা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আল-য়ামামার কণ্ঠ – এক ধারে লোভ, আর অন্য ধারে কৃতজ্ঞতা। এক হাতে আমাদের বসতিতে বিদ্যুৎ এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, অন্য হাতে জঙ্গিদের গোপনে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দেওয়া আমাদের ক্যাম্পে? যাতে আমাদেরই সামনে তাদের নিকেশ করে দিয়ে আমাদের আনুগত্য হাসিল করা যায়? আল-ইসলামিয়াহ্-র চেয়ে আলাদা কীসে, আপনারা? ওরা অন্তত সোজাসাপ্টা ভয় দেখিয়ে আমাদের সমর্থন দাবি করেছিল, আপনাদের মতো লুকিয়েচুরিয়ে ছল করে নয়! কিন্তু এত বুঝেও একটা সহজ কথা বুঝতে পারলেন না আপনারা। অশিক্ষিত মানুষ মাত্রেই বোকা হয় না। এসব গল্প শোনার সময় নেই আমার। – বলতে বলতে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আল-য়ামামা।

উঠে দাঁড়ালাম আমিও। এর পরে আর ওঁর আশ্রয়ে থাকা চলে না। নোটুকেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমটিও নষ্ট হয়েছে। এখন একমাত্র রাস্তা, এই রাতের অন্ধকারেই ফিরে যাওয়া হাইওয়েতে। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করা, যদি উঁনি স্বয়ং যোগাযোগ করেন আল-বাকসার ফোনে।

– আমি কি গাড়ির চাবিটা পেতে পারি? তাহলে হেঁটে হাইওয়ে অবধি পৌঁছে যেতাম, ওখানেই অপেক্ষা করতাম কাল সকাল অবধি।

– আপনাকে একা চলে যেতে দেব ক্যাম্প থেকে? আপনার কি মনে হয়, সে বিশ্বাসযোগ্যতা আপনাদের আছে? আমার আদেশ, আপনি কোথাও যাবেন না এ ক্যাম্প ছেড়ে। কাল সকালে এখানকার বাসা গোটাব আমরাও, কিন্তু আপনাদের নাখলের পথে রওনা করে দিয়ে।

আজকের আগে বাটারফ্লাই ফাউন্ডেশনের কোনও কাজে বিফল হয়ে ফিরতে হয়নি। একটা তেতো স্বাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে মুখের ভেতরে। মাথার ভেতরে পিন-কাটা রেকর্ডের মতো ঘুরে ঘুরে বেজে চলেছে নোটুকেশ্বরের সাবধানবাণী – অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ... রাষ্ট্রবিপ্লব ... গৃহযুদ্ধ

... ছোট ছোট দেশগুলো হয়তো বিক্রিই হয়ে যাবে, মুছে যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে।

দরজার চৌকাঠে পা রেখে ফিরে তাকালাম একবার, শেষবারের মতো। আল-য়ামামার দৃষ্টি অনুসরণ করছিল আমাকে। ফিরে তাকাতে দেখে সে দৃষ্টি বদলে গেল প্রশ্নে, ভ্রু কুঁচকে যেন জিজ্ঞাসা করল – আবার কী চাই?

– আপনার অভিযোগ যথার্থ, আল-য়ামামা। আমরা বোধহয় সত্যিই বুঝে ওঠার চেষ্টা করিনি আপনাদের। কিন্তু আপনি? আপনি বুঝে উঠতে পেরেছেন তো, জারকা-আল-য়ামামাকে? কালকের পরে আপনার মনে হবে না তো, যার নামের উত্তরাধিকার আপনি বা আপনারা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, তাঁর নিজের জীবনের শিক্ষাটাকেই অগ্রাহ্য করলেন আপনি, যখন পরীক্ষার মুহূর্ত সামনে এল?

– ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি? – কঠিন হয়ে এল আল-য়ামামার কণ্ঠস্বর।

– এ উপকথা আমার চেয়ে শতগুণে ভালো জানেন আপনি। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশি করে ছুঁতে পারছি সেই নারীটির জীবনের শেষ দিনগুলোকে। নিজের সবটুকু ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে তিনি তাঁর গোষ্ঠীর মানুষদের সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন আসন্ন বিপদের হাত থেকে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা। কেন বিশ্বাস করেনি? কারণ তিনি বলেছিলেন, একটা অরণ্য এগিয়ে আসছে আমাদের গ্রাস করতে। উনি তা-ই বলেছিলেন, যা উনি দেখেছিলেন। কিন্তু ওঁর সাবধানবাণী, চারপাশের মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। যখন বিশ্বাস করার মতো পরিস্থিতি এল, ততক্ষণে সব শেষ।

আপনি যতই বলুন না কেন, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে আপনাদের কোনও সম্পর্ক নেই, তা যে পুরোপুরি সত্যি নয় তা আপনি নিজেও জানেন। না হলে এ সভ্যতার ভাষা আয়ত্ত করতে হত না আপনাকে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই রূঢ় সত্যিটা এসে কড়া নাড়বে আপনার দরজায়, ঠিক যেমন হাসানের সৈন্যরা এসে তলোয়ার ধরেছিল আপনার পূর্বপুরুষের গলায়। আর এ ভাষা জানেন বলেই, সেদিন ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তির দায় আপনাকে নিতেই হবে। জারকা-আল-য়ামামার

স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন অন্তত বলবেন না, আপনার সুযোগ ছিল না ইতিহাসের মোড় ঘোরানোর।

ওঁর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করেই পা বাড়ালাম বাইরে, অন্ধকার অনিশ্চিতের দিকে।

***

।। তিন ।।

তেইশে মার্চ

কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ছিলাম জানি না। মৌমাছির ঝাঁকের শব্দের মতো একটা মৃদু গুঞ্জনে ঘুম ভাঙতে চোখ খুলে দেখলাম, একটা পাহাড়ির ঢালে শুয়ে রয়েছি, পাল্টে গেছে চারদিকের দৃশ্যপট। সিনাইয়ের বালিয়াড়ি আর মরুভূমির জায়গা নিয়েছে আদিগন্তবিস্তৃত রুক্ষ পাথুরে খাদান, আর তার গায়ে দেখছি হাজার হাজার শীর্ণ মানুষ। সাদা, কালো, হলদে, বাদামি – গায়ের রং নির্বিশেষে তাদের কারোর হাতে বেলচা, কারোর কোদাল, গাঁইতি, কারোর ভাগ্যে বা জুটেছে টব খোঁচানোর খুরপি, কেউ কেউ শুধু দুহাতের আঙুলগুলোকেই সম্বল করে নিরন্তর খুবলে চলেছে খাদানের গায়ে। কখনও কখনও একটা ক্লান্ত হাত কিছু খুঁজে পাচ্ছে, চকিতে লুকিয়ে ফেলছে কোমরের সঙ্গে বাঁধা পাউচে। ক্লান্ত দু চোখে মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠছে আশার বিদ্যুৎ, পরক্ষণেই তারা ফিরে যাচ্ছে নিজের কাজে।

কী খুঁড়ছে ওরা?

উত্তরটা পাওয়া গেল ডানদিকে ঘাড় ঘোরাতেই। জং-ধরা লোহার ফ্রেমের ওপর একটা সাইনবোর্ড এখনও টিঁকে আছে, তার সর্বাঙ্গে সময়ের ছাপ। বোর্ডের বাঁ দিকে একটা খুলির ছবি, নিচে আড়াআড়ি একজোড়া হাড়, আর তার পাশে গোটা গোটা অক্ষরে স্টেনসিল করে লেখা

ABANDONED COAL MINE - KEEP OUT

মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। এরা কয়লা খুঁজছে। বন্ধ্যা,

পরিত্যক্ত ওপেন-কাস্ট খনির বুক থেকে এরা আহরণ করছে বিন্দু-বিন্দু জ্বালানি। তার মানে সভ্যতার প্রাথমিক শক্তির উৎস, পেট্রোলিয়াম এখন ফেনরিরের গ্রাসে। পৃথিবী-জোড়া সেই আকালের মোকাবিলা করতে এদেরকেই বেছে নিয়েছে সভ্যতা। প্রান্তিক মানুষের পেটে সবার আগে টান পড়ে, তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা ভিড় করে এসেছে এই পরিত্যক্ত কয়লার খাদানে। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে একমুঠো কয়লা যে জোগাড় করতে পারবে, তার হয়তো বিনিময়ে একমুঠো খাবার জুটবে।

বাকিরা, রাগনারকের মারণযজ্ঞে ফেনরিরের আহুতি হয়ে পুড়ে যাবে খিদের আগুনে।

গুনগুন শব্দটা প্রথমে ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে, মনে হচ্ছিল শ্রমিক-মানুষগুলোই বুঝি কাজের ফাঁকে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তার পরে বুঝলাম, শব্দটা আসছে মাটির গভীর থেকে। চাপা কান্নার মতো শব্দ।

অসহায় মাটির কান্না। পৃথিবীর কান্না।

ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকল তার আর্তি, যেন খনির গভীর থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে কান্না উঠে এল মাটির উপরে। আর সেই হাজার-হাজার মাটি-খোঁড়া মানুষ তাদের হাতের কোদাল-বেলচা-গাঁইতি-খুরপি ফেলে হাঁটু গেড়ে বসল প্রার্থনার ভঙ্গিতে, দু হাত আকাশের দিকে তুলে কেঁদে উঠল তাদের মাটির সঙ্গে।

আর সেই সমবেত হাহাকারের অভিঘাতে আরও একবার ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম আমি। দৃশ্যপট মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু রয়ে গেল শব্দটা।

সত্যিই বুঝি কান্নার শব্দ। বা এমন কোনও সুর, যাতে এসে মিশেছে চরাচরের সমস্ত জমাট বেদনার আকুলতা। সুরটা আসছে টিলার পেছন থেকে, যে টিলার একটা গুহায় আমি নজরবন্দি রয়েছি কাল রাত থেকে।

ক্যাম্পের একপাশে এই টিলা, তারই একটা গুহাতে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল কাল রাতে, আল-য়ামামার ক্যারাভান থেকে বাইরে বেরোনোর পর। সামনে আগুন জ্বলছিল, সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল একটা কুটকুটে কম্বল। আগুনের সামনে পাহারায় ছিল দুজন বেদুইন।

খানিকক্ষণ বসে থাকার পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ জড়িয়ে এসেছিল ঘুমে।

মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকার অন্যতম কু-অভ্যাস হল, নতুন দেশে গিয়ে পুরোনো আমলের হাতঘড়ির সময় অ্যাডজাস্ট করা হয়ে ওঠে না। এই মুহূর্তে ফোনটা আর কাজ করার মতো অবস্থায় নেই, ফলে হাতঘড়িই ভরসা। তাতে সময় দেখলাম, বাইশে মার্চ রাত সাড়ে এগারোটা, অর্থাৎ এখানকার হিসেবে তেইশে মার্চ। রাত তিনটে।

এখন আগুন নিবে গেছে। আমার প্রহরীদেরও আর দেখা যাচ্ছে না তাদের জায়গায়। টিলার পেছন থেকে আসছে শব্দটা। তাকে অনুসরণ করে টিলাটাকে প্রদক্ষিণ করে গিয়ে ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

দূরে মরুভূমির কিনারায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট ব্যসের একটা অর্ধবৃত্তের পরিধি বরাবর ছড়িয়ে বসে রয়েছেন জনা-চল্লিশেক মানুষ। বৃত্তের কেন্দ্রের মানুষটি বসেছেন হাঁটু গেড়ে, বাঁ হাতে লম্বালম্বিভাবে কোলের ওপর ধরে রাখা একটি বাদ্যযন্ত্র। 'উদ'-এর পূর্বজ হলেও দূর থেকে দেখতে লাগছে আমাদের সারেঙ্গির মতো। ডান হাতে তিনি ছড় তুলে নিয়েছেন, ধরেছেন সুর। আন্দাজ করতে পারছি, তাঁর সামনে খোলা রয়েছে পার্চমেন্টে উৎকীর্ণ ঝড়ের স্বরলিপি। তাঁর পেছনে মাথা তুলেছে বালিয়াড়ির ঢেউ-খেলানো চূড়া। কদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, আজ সম্ভবত পঞ্চমী বা ষষ্ঠী, চাঁদের ঠাণ্ডা আলো ধুইয়ে দিচ্ছে মেঘহীন আকাশ, মুছিয়ে দিচ্ছে মরুভূমির তাপ। বাতাসও স্তব্ধ, সেও বুঝি অপেক্ষায় রয়েছে কোনও এক অপার্থিব জাদুর।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জ্ঞান আমার নেই। গল্পে শুনেছি, গান গেয়ে আগুন জ্বালানোর বা বৃষ্টি নামানোর কথা। আল-য়ামামার বাজনা আজ এই মেঘহীন রাত্রে ঝড় তুলবে কি না সে কথা নোটুকেশ্বরই বলতে পারবেন, কিন্তু শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, চারদিকের পাহাড় যেন এক দুর্ভেদ্য কারাগার, আর সমস্ত চরাচর যেন আজ রাতে এসে জড়ো হয়েছে তার দরজায়, হাজার হাতে দরজার শেকল ধরে নাড়া দিচ্ছে তারা, তাদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠছে – মুক্তি দাও, মুক্তি দাও ... ধীরে ধীরে সে আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে এল তিহ্-র পাহাড়ি সুঁড়িপথে, মুক্তির পথের সন্ধানে – তারপর আবার সুরের হাত ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে তাদের মুক্তির ঐকতান, এক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির মতো। প্রতিবার আরও একটু তীব্র সে আকুতি।

যেমন সহসা শুরু হয়েছিল, তেমন সহসাই শেষ হল আল-য়ামামার বাজনা। কোনও ঝড় উঠল না, কোনও বজ্রপাত হল না, শুধু সমবেত বেদুইনদের বিস্মিত হর্ষোল্লাসের আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলাম, পেছনের বালিয়াড়িটির চূড়া ধ্বসে পড়ছে।

যেমন ভাবে ভেঙে পড়ে মেরুপ্রদেশের আইস-শেলফ।

***

।। চার ।।

চব্বিশে মার্চ

কাল বিকেলেই ফিরেছি আবু ধাবি, আজ রাতে ফিরব নিজের আস্তানায়। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে গত ছিয়ানব্বই ঘন্টার দিনলিপি।

তেইশে মার্চ সকালে নাখল পেরোনোর আগে আল-বাকসার ফোন থেকে কল করেছিলাম এমিরেটস ইনভেস্টমেন্টের অফিসে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আল-বাকসার, এটুকুই জানাই ওদের। চার্টার্ড ফ্লাইট তৈরিই ছিল, ওরা জানালেন, আমি যদি আল-আরিশ এয়ারপোর্ট অবধি পৌঁছতে পারি, তার পর ওরাই সব দায়িত্ব নেবেন।

পেছনের সিটে আল-বাকসা তখনও ওষুধের ঘোরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমারও ঘুম হয়নি প্রায় সারা রাত, তার ওপরে এতটা ড্রাইভ, যাতে কোনও ভাবে চোখ লেগে না যায়, তাই ফোনটা করার পরেই গাড়ির এফএম রেডিও চালু করে আমার ব্লুটুথ ইয়ারপিসের সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়েছিলাম। অ্যারাবিক গানের সুর ভেসে আসছিল কোনও একটা প্রভাতী চ্যানেল থেকে।

– সুপ্রভাত, এবং অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটানোয় দুঃখিত, আদিত্য! – সুরের মূর্ছনা বন্ধ হয়ে ইয়ারপিসে ভেসে এল নোটুকেশ্বরের সহাস্য ধাতব স্বর – একটা অন্যরকম কিছু শোনাই তোমাকে। ঝড়ের স্বরলিপির পরিণতি। তোমাদের ভাষায় যাকে বলে, লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ, সরাসরি সুয়েজ থেকে।

– গুড মর্নিং স্যর। আমি ভাবছিলামই, ফোনটা তো গেল, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কেমন করে। তারপর মনে হল, আপনি একটা

ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবেন। আমি নিজেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি এটার পরিণতি জানার জন্য। কী শোনাবেন স্যর?

– বলছি। তার আগে বলো তো, সুয়েজ ক্যানাল পার করা নিয়ে আল-বাকসা কি কিছু বলেছেন তোমাকে?

– না তো! চোক-পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, কিন্তু এ প্রসঙ্গটা বাদ রয়ে গেছে।

– বেশ, তাহলে একটু বলে দিই, বুঝতে সুবিধা হবে। নির্ঝঞ্ঝাটে সুয়েজ পার করা কিন্তু যে কোনও অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের পক্ষেও রীতিমতো কঠিন পরীক্ষা। আঠারশ ঊনসত্তর থেকে আজ অবধি একাধিক বার সংস্কার হয়েছে সুয়েজ ক্যানালের, প্রস্থে বা গভীরতায় যা প্রথমে ছিল তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ। কিন্তু এই সংস্কার কখনওই সুপারট্যাঙ্কার বা সুপার কন্টেইনার-জাহাজের ডিজাইনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি, বেশ কয়েক কদম পিছনে রয়ে গেছে। সুয়েজের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে তাই ক্যানালটুকু পার করার জন্য এক বা একাধিক ইজিপশিয়ান পাইলটকে নিয়োগ করেন সুয়েজ ক্যানাল কর্তৃপক্ষ। পাইলটরা যে সব সময় নিজেরা হাত লাগান তা নয়, কিন্তু ওই সময়টুকু জাহাজ থাকে তাদের তত্ত্বাবধানে।

এই মুহূর্তে আইন সোখনার দিক থেকে সুয়েজ পার করছে, বিশ্বের বৃহত্তম সুপার কন্টেইনার-জাহাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি, নাম ‘নেভার টেকন’। ঠিক কত বড়ো ‘নেভার টেকন’, তার একটা আন্দাজ দিই তোমাকে। আইফেল টাওয়ার সওয়া তিনশ মিটার উঁচু। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতা তিনশো একাশি মিটার। ‘নেভার টেকন’ দৈর্ঘ্যে এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি প্রায় চারশ মিটার, প্রস্থে ষাট মিটার। আর এগারো মিটারের গভীরতায় সুয়েজের সর্বাধিক প্রস্থ হচ্ছে দুশ পঁচিশ মিটার। চারশ আর দুশ পঁচিশ – বুঝতেই পারছ, প্রায় পা টিপে টিপে, সন্তর্পণে একেবারে সোজা পথে এ রাস্তা পেরোতে হবে জাহাজটিকে, যাতে কোনও ভাবেই সে বেঁকে না যায়। না হলেই সর্বনাশ।

– এক মিনিট স্যর – গাড়ি চালাতে চালাতে ক্যানালের ছবিটা মাথায় এঁকে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম – আপনি বললেন এগারো মিটারের গভীরতায়। কেন? এগারোই কেন? দশ বা বারো নয় কেন?

– ওটাকে একটা রেফারেন্স হিসেবে নিতে পারো আদিত্য। উনিশশ ছাপ্পান্ন সাল থেকে সুয়েজের সংস্কার চলেছে, এবং ওই এগারো মিটার গভীরতার নিরিখে সুয়েজ প্রস্থে বেড়েছে ষাট মিটার থেকে দুশ পঁচিশ মিটার, অর্থাৎ প্রায় পৌনে চার গুণ। এগারোর জায়গায় বারো হতেই পারে, তাতে প্রস্থ কমে যাবে। জলতল থেকে জাহাজের সবচেয়ে নিচের ডুবে থাকা অংশটির দৈর্ঘ্যকে নাবিকের পরিভাষায় বলা হয় ড্রাফট। ‘নেভার টেকন’-এর ড্রাফট প্রায় পনের মিটার। সুয়েজের সর্বাধিক গভীরতা হচ্ছে চব্বিশ মিটার। সেজন্যই বললাম, সোজা বেরিয়ে গেলে সমস্যা নেই। কিন্তু কোনও কারণে বেঁকে গেলে...

নোটুকেশ্বর কথা শেষ করলেন না। তার বদলে হেডসেটে ভেসে এল একাধিক মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ, যেন একটা তীব্র মতান্তর চলছে কোনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে।

রাস্তার দিকে নজর আমার, তবুও বোঝার চেষ্টা করলাম। আন্দাজে মনে হল, তিনটে আলাদা আলাদা গলা। স্থানীয় ভাষায় রীতিমত ঝগড়া করছে দুজন, তৃতীয় একজন তার মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তার উচ্চারণের ধরণ খানিকটা দক্ষিণ এশীয়, আর গলার স্বরে ত্রাস আর উদ্বেগ ঝরে পড়ছে। কিন্তু বাকি দুজন তার কথায় উচ্চবাচ্য করছে না, বরং তিনি কথা বললেই তাকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে অশুদ্ধ ইজিপশিয়ান ইংরেজিতে একজনের চিৎকার। এক সময় বোধহয় ক্ষান্ত দিলেন তিনি, তার গলা থেমে গেল। রয়ে গেল শুধু দুজনের ক্রমান্বয়ে বাড়তে-থাকা চিৎকার।

তারও মিনিটখানেক পরে, দুজনের ঝগড়া তখনও অব্যাহত, যেন অনেকটা দূর থেকে আবার ভেসে এল সেই তৃতীয় মানুষটির গলা। ঠিক কথা নয়,কানে এল দীর্ঘশ্বাস-মেশানো একটা ইংরিজি অপশব্দ, কোনও পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে যেমনটি বলি আমরা।

আর তার ঠিক পরেই সব আওয়াজ ছাপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন –

ইস্তাদামত্ বিল’আর্দ

– অর্থাৎ, ‘হিট দ্য গ্রাউন্ড’ – ফিরে এল নোটুকেশ্বরের গলা – আমাদের মিশন অ্যাকমপ্লিশড, আদিত্য। ‘নেভার টেকন’-এর মাথার

দিকটা আটকে গেছে ক্যানালের পূর্ব-প্রান্তে, এবং পেছন দিকটা আড়াআড়ি ভাবে, পশ্চিম প্রান্তে। এই মুহূর্ত থেকে সুয়েজ ক্যানাল অফিশিয়ালি ব্লক্ড। যতক্ষণ ব্লকেড না উঠবে, বন্ধ থাকবে আইন সোখনা বা সিদি কেরির টার্মিনালে সুপার-ট্যাঙ্কারের নোঙর ফেলাও। ইন্টারপোল অনেকটা সময় পেয়ে যাবে, ফেনরির-বাহী ট্যাঙ্কারটিকে খুঁজে বের করার।

– কিন্তু এই ব্লকেড কী ভাবে সম্ভব হল স্যার? – উত্তেজনা সামলে স্টিয়ারিং আয়ত্তে রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলাম।

– ব্যাপারটা ফিজিক্স আদিত্য। চেষ্টা করছি সহজ করে বলার – খাদে নেমে এল নোটুকেশ্বরের গলা, যেন য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর বোঝাচ্ছেন ছাত্রকে – সাধারণ সময়ে একটা নির্ধারিত গতিতে সোজা পথে সুয়েজ পেরিয়ে যাওয়ার কথা সব জাহাজের। বস্তুত, একটা সর্বোচ্চ নির্ধারিত গতির বেশি রাখার নিয়মই নেই। কারণ কোনও সরু ক্যানালের মধ্যে দিয়ে যদি জাহাজ খুব বেশি গতিতে চলে, তাহলে সেই গতির কারণে অপসারিত জল জাহাজের পেছন দিকে একটা বিপরীতমুখী টান প্রয়োগ করে। জাহাজ যত বেশি কোনও একটা কূলের কাছে থাকবে, তত বেশি তার টান। এটাকে বলে ‘ব্যাঙ্ক এফেক্ট’। নির্বিঘ্নে সুয়েজ পেরোনোর জন্য যে কোনও জাহাজের সর্বোচ্চ নির্ধারিত গতিবেগ ন’নটের কম, আর ‘নেভার টেকন’ চলছিল তার প্রায় দেড় গুণ, তের নটেরও বেশি গতিতে। অত বড়ো জাহাজের নিজস্ব ইনার্শিয়া যথেষ্ট বেশি, তার ওপর অত বেশি গতিতে স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিম দিকের কূলের খুব কাছে চলে গিয়েছিল ‘নেভার টেকন’। বাকি কাজটা ফিজিক্স করে দিয়েছে।

– কিন্তু কেন? এত স্পিড বাড়ানোর কারণ কি ছিল ওদের?

– কারণ তোমরা, আদিত্য। কারণ, যিনি বা যারা এই ঝড়ের স্বরলিপি তৈরি করেছেন। কারণ আল-বাকসা আর তুমি, যারা এই স্বরলিপি পৌঁছে দিয়েছ যোগ্য মানুষের কাছে। কারণ আল-য়ামামা, যিনি সেই স্বরলিপিকে সুরে পরিণত করে জন্ম দিয়েছেন একটি মরু-ঝড়, ‘খামসিন’-এর। যে মুহূর্তে ‘নেভার টেকন’ সুয়েজ ক্যানালে প্রবেশ করে, তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সত্তর কিলোমিটার প্রতি ঘন্টারও বেশি বেগে সে ঝড় আছড়ে পড়ে সুয়েজের দক্ষিণ দিক থেকে। তার ধাক্কা সামলানোর জন্যই গতিবেগ বাড়াতে হয়েছিল ‘নেভার টেকন’-কে,

নতুবা সেই ঝড়ের মুখে তার ডেকের ওপরকার স্তূপীকৃত কন্টেইনারের পাহাড় একটা কৃত্রিম পালের কাজ করত, তাতেও তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত হত জাহাজটি। ফলাফল একই দাঁড়াত।

কী বলব? বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। ব্যাপারটা যতটাই অসম্ভাব্য, তার পরিণতি ততটাই বাস্তব। রেডিওর নব ঘুরিয়ে একটা ইংরেজি ভাষার নিউজ স্টেশন খুঁজে পেলাম, তাতেও অন্য কোনও খবর নেই সুয়েজের ব্লকেড ছাড়া। কেউ বলছেন দুদিন, কেউ বলছেন তিন -চার দিনের কম নয় এ জট ছাড়তে। সারা পৃথিবীর বাণিজ্যমহলে আশঙ্কার ছায়া।

কোল্যাটারাল ড্যামেজ। না হলে এই আশঙ্কা শুধু ছায়া নয়, ফেনরিরের সন্তান হয়ে গ্রাস করে নিতে পারত সভ্যতার সূর্য-চন্দ্রকে।

মানবমনের গতিপথ কী বিচিত্র – কোল্যাটারাল ড্যামেজ শব্দবন্ধটা মাথায় আসতেই মনে পড়ল সেই আহত বেদুইন মায়ের কথা। ভীত শিশুটির কথা।

আল-য়ামামার কথা।

আজ ভোরে ক্যাম্পে ফেরার পর আল-য়ামামাকে বলেছিলাম শেষবারের মতো,

– এমিরেটস ইনভেস্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ কিন্তু আপনাদের ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চান নিজেদের তাগিদেই। এর পেছনে আমাদের কোনও দুরভিসন্ধি নেই। এ বিষয়ে আপনার সম্মতি পেলে আমি পরের কাজগুলো শুরু করতে পারি।

এতটুকু টলেনি তাঁর অবস্থান।

– কী হবে বিদ্যুৎ দিয়ে, বলতে পারেন? বিদ্যুতের হাত ধরে কেবল টিভি আসবে, মোবাইল ফোন আসবে, অন্য এক পৃথিবীর ডাক আসবে, যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেড় হাজার বছরের ফারাক। সে পৃথিবীর জন্য আমরা তৈরি নই। তৈরি হতেও চাই না। এই মরুভূমি, এই ক্যারাভানের জীবন, এতেই বেশ আছি আমরা। আপনি বলে দেবেন ওদের, আমাদের কোনও কাজ নেই বিদ্যুতে।

যতক্ষণে আল-বাকসাকে নিয়ে রওনা হয়েছিলাম, ততক্ষণে নোঙর তুলে ফেলেছে ওদের ক্যারাভান। গন্তব্য অন্য গভর্নরেট, অন্য এক বালির বন্দর।

***

উত্তরকথন

চব্বিশে মার্চ, ২০২১
সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম, প্রজেক্ট ফেনরির,
প্রিমাল্যাব, ডুরানকুলাক
স্থানীয় সময় ০০:১০

প্রথম রিং-এই রিসিভার তুললেন প্রজেক্ট ফেনরিরের ডিরেক্টর।

– অ্যাব্যান্ডন ফেনরির – সারা পৃথিবী ঘুরে, বহু সার্ভারে ধাক্কা খেতে খেতে ফোনের ওপার থেকে এসে পৌঁছাল ধাতব ইস্পাত-শীতল কণ্ঠের আদেশনামা।

– কিন্তু স্যর, আমাদের হাতে এখনও ছত্রিশ ঘন্টার ওপর সময় আছে। আয়ম শিওর, এই ব্লকেড আগামী বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মিটে যাবে। উই ক্যান স্টিল মিট আওয়ার ডেডলাইন।

– নো ইউ ক্যান নট! ইটস আ মেস্ – ইস্পাত ক্রমশ ধারালো – ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাও লং দিস উইল টেক! বাই দেন দিস হোল ক্যানাল উইল লুক ওয়র্স দ্যান রাশ-আওয়ার নিউ ইয়র্ক! আর তা ছাড়া, দিস প্রজেক্ট ইজ অলরেডি কম্প্রোমাইজড। ইন্টারপোল বুলগারিয়ান পুলিসকে ইনফর্ম করেছে, টুগেদার দে আর অন দেয়ার ওয়ে টু আওয়ার ল্যাব। ওদিকে দুটো রাশিয়ান ওয়রশিপ ধরা পড়েছে আমাদের স্যাটেলাইটে, রেড সী আর সুয়েজ গালফের মধ্যে। আমরা জানি না ওরা ওখানে কেন, কী উদ্দেশ্যে, কারণ আমার ইনফর্মেশন অনুযায়ী ওদের ওখানে থাকার কথাই নয়। সো, ডেস্ট্রয় অ্যান্ড ডিলিট! মনে রেখো, ইন্টারপোল বা ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি, কারোর কাছেই যেন ফেনরির সম্বন্ধে কোনও তথ্য লীক না হয়! প্লিজ সী টু ইট!

– আর আমি? আমার কী হবে? ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট মি টু ফেস ইন্টারপোল, রাইট?

– নো ওয়ে। ওদের পৌঁছতে আরও আধ ঘন্টা লাগবে। তার মধ্যে তুমি ফেনরির ব্যাকটেরিয়ার সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট ট্রিগার করাও, আর সমস্ত প্রজেক্ট ফাইল ডিলিট করো। হয়ে গেলে এমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে, গো টু শাবলা হেলিপ্যাড। আমার হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, তোমাকে বর্ডারের ওপারে পৌঁছে দেবে, বুখারেস্টের সাবার্বে। ফ্রম দেয়ার, টেক আ ফ্লাইট, যেখানে তোমার ইচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, মে বি?

ফেনরিরের কম্যান্ড-কনসোল থেকে সেলফ-ডেস্ট্রাকশন কম্যান্ড দিতে সময় লাগল দু মিনিট। আর প্রজেক্টের মাস্টার ফোল্ডার ডিলিট করতে আরও পনের মিনিট। কী মনে করে হার্ড ডিস্ক রিফরম্যাট করারও কম্যান্ড দিলেন ডিরেক্টর, তারপর শেষবারের মতো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গত প্রায় এক মাস ধরে এই কন্ট্রোল রুমটিই কার্যত তার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল ...

এবং ল্যাচ টানতেও দরজা খুলল না। তার বদলে দরজার আই-হোলের পাশের একটি গোপন রন্ধ্রপথে বেরিয়ে এল খানিকটা বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। সরাসরি এসে লাগল ডিরেক্টরের নাকে-মুখে।

***

– সীমস লাইক আ কেস অব গ্যাস পয়জনিং – ইন্টারপোলের ইনভেস্টিগেটর মন্তব্য করলেন তাঁর সঙ্গের বুলগারিয়ান অফিসারটির উদ্দেশ্যে – আপনি কিছু উদ্ধার করতে পারলেন?

অপর জন তখন ল্যাপটপ এবং সার্ভার থেকে ফরেনসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ আহরণে ব্যস্ত।

– নাহ্ – অল ডিলিটেড। শুধু তাই নয়, কোনও স্পেশাল রিফরম্যাটিং টুল ব্যবহার করা হয়েছে। ফোল্ডার্স আর ডিলিটেড ইররিভার্সেবলি। আমাদের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে আরেকবার চেষ্টা করব। বাই দ্য ওয়ে – মৃতের পরিচয় জানা গেল?

– ডক্টর মিজ সি ইউং, ডিরেক্টর, প্রজেক্ট ফেনরির।

সূচিপত্র

হাস্যকর
উল্লাস মল্লিক
অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ভবেনবাবু হাসেন না। বলা ভাল, হাসতে পারেন না। মাঝে মাঝেই পেট থেকে হাসি বুড়বুড়িয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে হাসির কোনও ছাপ পড়ে না। আসলে হাসতে গেলে মুখের যে মাংসপেশিগুলোর চাঙ্গা হবার দরকার পড়ে দীর্ঘদিনের অব্যবহারে সেগুলো একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। ফলে পেটের হাসি পেটেই থেকে যাচ্ছে। অথচ ওয়ানস্ আপন এ টাইম ভবেনবাবু হাসতেন। বেশ প্রাণ খোলা হাসিই হাসতেন। মজার দৃশ্য দেখে, মজার কথা শুনে হাসতেন। কিন্তু একটা সময় লক্ষ্য করলেন হাসলে সমস্যা হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষই হাসি পছন্দ করে না। দেখলেন স্কুলে স্যারেরা হাসি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছেন না; হাসলেই বকুনি দিচ্ছেন। বলছেন, জীবনে হাসি তামাসার অনেক সময় পাবি। এখন পড়াশুনার সময়। বাড়িতে বাপ জ্যাঠারা বলতেন, খামোখা হাসছিস কেন, হাসলে জীবনে উন্নতি করতে পারবি না। যৌবনে প্রেমিকা বলেছিল, অ্যাই, তুমি অত হাস কেন বল তো! তুমি একদম সিরিয়াস নও। সিরিয়াস না হলে আমার দায়িত্ব নেবে কী করে! সিরিয়াস নয় বলেই সেই প্রেমিকা একদিন কলা দেখাল। একবার একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে মিছিলে হেঁটেছিলেন ভবেনবাবু। হাঁটতে হাঁটতে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই হাসি ফুটে উঠেছিল মুখে। মাঝারি গোছের এক নেতা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হাসছেন কেন! থতমত খেয়ে ভবেনবাবু বললেন, না, মানে ওই আর কী। নেতা রাগত গলায় বললেন, এটা কীসের মিছিল জানেন! এটা দাবিদাওয়া আদায়ের মিছিল। দাঁত কেলিয়ে দাবি আদায় হয় না। দাবি আদায় করতে গেলে হনুমানের মতো দাঁত খিঁচোতে হয়। আপনি তেড়েমেরে স্লোগান মারুন।

তারপর থেকে ভবেনবাবু দেখে আসছেন, হাসি জিনিসটাকে খুব একটা সুবিধের দৃষ্টিতে দেখে না মানুষজন। ব্যাঙ্ক অফিস দোকান বাজার মিটিং মিছিল – যে কোনও জায়গাতে হাসলেই সমস্যা। বাড়িতে গিন্নিও বলেন, আমার মতো বউ পেয়েছ তাই; অন্য মেয়ে হলে দেখিয়ে দিত। হাসি ঠাট্টা করেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলে। তারপর থেকে ভবেনবাবু হাসিকে কনট্রোল করার চেষ্টা করে আসছেন। আর করতে গিয়েই এই অবস্থা – হাসিতে ফেট ফাটছে; কিন্তু মুখে ফুটছে না।

অর্থাৎ কিনা সমাজ হাসিটাকে এভাবেই দেখে। ওই লোকটা একটুতেই হাসে; মানে লোকটা সিরিয়াস নয়, লোকটার ব্যক্তিত্ব নেই; গভীরতার অভাব। আর ওই লোকটা হাসির কথা শুনলে ভুরু কোঁচকায়, হাসির দৃশ্য দেখলে বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নেয়; হ্যাঁ, লোকটার পার্সোনালিটি আছে। আমাদের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবল ব্যক্তিত্ববান ছিলেন। কথিত আছে তিনি হাসতেন না। চ্যাপলিনের ছবি আর জ্যান্ত

সন্ন্যাসী পুড়িয়ে মারার দৃশ্য নাকি একই দৃষ্টিতে দেখতেন। এমন মানুষ আরও আছেন। এরা মনে হয় কালমেঘ আর রাবড়ির তফাৎও বুঝতে পারেন না।

শিল্প সাহিত্যে ওই একই ব্যাপার। হাসির গল্প উপন্যাস রম্যরচনা তেমন পাত্তা পায় না। ওগুলো ঠিক জীবনমুখী নয়। ওগুলো থেকে কোনও শিক্ষালাভ হয় না। ওগুলো চ্যাংড়ামি। শিল্প সাহিত্য হবে এমনই, যা কিছু বার্তা দেবে সমাজকে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে বাঁচার লড়াইয়ে, শেষে একটা আলোর পথও দেখাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে পাঠক যদি চোর-ছ্যাঁচড় ছিনতাইকারী বা বেশ্যা হয় তাহলে সমস্যা। কারণ ওরা আলোর চেয়ে অন্ধকার পথ বেশি পছন্দ করে। যাই হোক, জীবনমুখী সাহিত্যের গম্ভীরমুখো পাঠক সাধারণত আলোচনা করেন এই ভাষায় – গল্পটা একেবারে হৃদয় ছুঁয়ে গেল; কিংবা দাঁড়াবার জায়গাটাকে নাড়িয়ে দিল কিংবা পড়ার পর থেকে ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে (কুরানি দিয়ে নাকি কে জানে), কিংবা মাংসের গন্ধ উঠে আসছে (কাঁচা না রান্না উল্লেখ থাকে না)। সমালোচনার আর একটা ভাষা ইদানীং খুব চলছে। সেটা হচ্ছে – কবিতার মতো। গল্প তো নয়, যেন কবিতা; সিনেমা তো নয় যেন কবিতা। ব্যস; হয়ে গেল, সাত খুন মাফ। বোদ্ধার বোধবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই আর। মুশকিল হল, নির্মল হাসির গল্প উপন্যাস কাউকে কুরে কুরে খায় না, উত্তরণ বা আলোর পথ দেখায় না ধাক্কাধুক্কি দিয়ে নাড়িয়ে দেয় না, তাই এসব জীবনবিমুখ।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, হাসির গল্প বা জোকস্ শুনে শ্রোতা না হাসলে। অবস্থা প্যাথেটিক হয় সে ব্যাখ্যা করে দিতে বললে; এবং প্যাথেটিকোতর হয় ব্যাখ্যার পরও না হাসলে। সেই সময় নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। মনে হয় বেচারার মূল্যবান সময়টা শুধু শুধু নষ্ট করলাম। এই সময়ে হয়তো উনি দেশ ও দশের কল্যানের কথা ভাবতে পারতেন।

বাংলার এক রসসাহিত্যিক গল্প বলছিলেন এক মজারু দেশের। সে দেশের সবাই রসিক। সেখানে জোকস্‌ের নাম্বারিং থাকে। কোনও আড্ডায় কেউ হয়তো বলল, ৯০৪। লোকজন হো হো করে হেসে উঠল। তখন একজন পালটা দিল, ২৩২২। আবার হাসি। তার পালটা দিয়ে আর একজন বলল, ৯২। আমাদের সমাজে ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বাসে উঠে আপনি যদি ইংরিজি কাগজ পড়েন পাশের লোক সম্ভ্রমে তিন ইঞ্চি সরে বসবে; কিন্তু যদি চটি জোকসের বই পড়েন, পাশের লোক খিঁচিয়ে উঠে বলবে, এই যে দাদা ভদ্রভাবে বসতে পারেন না। ভাবটা এমন ঠিকঠাক ভদ্রলোক কখনও জোকসের বই পড়তে পারেন না।

অনেকে আছেন কালার ব্লাইন্ড। যাঁরা রঙের পার্থক্য ধরতে পারেন না। মনে হয় তেমনই এরা হিউমার ডেফ। হাসির কথা আর শ্রাদ্ধের মন্ত্র যাদের কাছে প্রায় একই। শিব্রাম চক্রবর্তী একবার বলেছিলেন, অচিন্ত্য আর প্রবোধের মধ্যে প্রেমেনই ভাল লেখে। এখন এই কথা শুনে কিছু মানুষ কুলকুলিয়ে হেসে উঠবেন, আর কিছু মানুষ ভাববেন প্রিনটিং মিসটেক। এরা অবশ্য মানুষ হিসেবে মন্দ নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে খুবই ভাল। দয়ালু সাহসী পরোপকারী। কিন্তু হিউমার ডেফ। বাঘ যেমন, প্রবল শক্তিশালী, অসম্ভব সৌন্দর্য, রাজকীয় চালচলন; কিন্তু কিছুতেই কোকিলের মতো গান গাইতে পারে না। কী আর করা যাবে! যেখানে বাঘও অমন তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয়।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

(১)

আজকাল অল্পেই বড় বুক ধড়ফড় করে প্রবীরবাবুর। ছোটগড় থানার ওসি প্রবীর সাহা। এসিতে বসেও দরদরিয়ে ঘামছেন তিনি। খাকি শার্ট ভিজে কালো। ঘনঘন জল খাচ্ছেন। মাঝেমধ্যেই হিসি করতে যাচ্ছেন। আর উঠতে বসতে যাকে তাকে যাচ্ছেতাই করছেন। সামনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এস.আই. মন্ডলকে চারটে খিস্তি পেড়ে সবে জলের গেলাসে চুমুক দিয়েছেন, ওমনি টেবিলে রাখা মোবাইলে "ওম জয় জগদীশ হরে" বেজে উঠল। 'খঁৎ' করে একটা বিষম খেলেন তিনি। খানিকটা জল চলকে পড়ল টেবিলের কাচে। এস.আই. মন্ডল পকেট থেকে রুমাল বের করে চট্ করে জলটুকু মুছে নিল। চশমার ওপর দিয়ে স্ক্রিনে চোখ রাখতেই সাহার খাঁচা ভেদ করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গলাটা দু-চার বার খাঁকড়ে নিয়ে রোমশ হাতে ফোনটা তুলে কানে লাগালেন তিনি।

"হ্যাঁ স্যার, সাহা বলছি।"

তারপর মিনিটখানেক তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। তাঁর ফরসা মুখ লাল হতে হতে একটা অতিকায় টোম্যাটোতে পরিণত হল। আমতা আমতা করে বারকয়েক, "হ্যাঁ স্যার, একদম স্যার। আজকের মধ্যে স্যার। না স্যার। দু'ঘন্টার মধ্যে স্যার। ডেফিনিটলি স্যার। স-স-সরি স্যার। এক্ষুনি স্যার। এক্ষুনি..." বলে ফোনটা কান থেকে নামিয়ে খানিক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন তিনি। মিনিটকয়েক বাদে মন্ডল উসখুস করতে করতে জিজ্ঞেস করেই বসল, "স্যার? ডিএসপিবাবু ফোন করেছিলেন, না? কিছু বললেন?"

চোখ মেললেন প্রবীর সাহা। মন্ডলের দিকে স্থির চোখে চেয়ে বললেন, "আমার মা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন জানো মন্ডল? ত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হন। পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। সাতটা ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন। জীবনে একটিবারের জন্যও আমিষ মুখে তোলেননি, থান ছাড়া পরেননি, কটূ কথা বলেননি।"

মন্ডল ভারী গদগদ হয়ে বলল, "সে তো আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় স্যার। এমন পুত্র তো আর অমন জননী ছাড়া অন্য কোথা দিয়ে বেরুবে না।"

হাসিহাসি মুখ করে ওসি বললেন, "তাহলে আমার মায়ের কী দোষ মন্ডল? কী পাপ তার?"

মন্ডল অবাক হয়ে বলল, "মানে স্যার?"

ওসি দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন, "মানে শুয়োরের বাচ্চা তোমরা ক্যালানের মত কাজ কারবার করবে আর এমএলএ, ডিএসপি, বিল্টু

দাস সবাই ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন করে আমার মা চু..."

মন্ডল তড়িঘড়ি বলল, "স্যার আশেপাশের সব এলাকা আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হয়ে গ্যাছে। নদীতে, পুকুরে সব জায়গায় আজ জাল পড়েছে। দক্ষিণের জঙ্গলে সার্চ পার্টিও বেরুবে।"

"বেরুবে মানে? কবে বেরুবে? বিল্টু দাস এসে আমার গলায় পা তুলে মুখে মুতলে তারপর?"

"বাকি দু'টো সার্চপার্টি এই সবে ফিরেছে স্যার। পাখার তলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। একটু চা-টা খেয়ে নিয়েই..."

"চোপ," গর্জন করে উঠলেন প্রবীর সাহা, "ডাকো শালাদের। এক্ষুনি ডাকো।"

মন্ডল তড়িঘড়ি বেরিয়ে যেতেই কেবিনে এসে ঢুকলেন অতনু। অতনু ব্যানার্জি। রোগা, লম্বা, শুকনো মুখে সংসারি গোঁফ, চোখে মোটা কাচের চশমা। এই থানাতেই বিশ বছর কনস্টেবলের চাকরি করছেন পঁয়তাল্লিশ ছুঁতে চলা অতনু। চায়ের ট্রে'টা টেবিলে রেখে মেঝে থেকে পাকানো কাগজ, সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের কোণে রাখা বাস্কেটে ফেলে হাত দু'টো পেটের কাছে জড়ো করে ভারী সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলেন প্রবীর। অতনুর দিকে চোখ পড়তেই গা জ্বলে গেল তাঁর। খেঁকিয়ে উঠলেন, "কী ব্যাপার? অমন ন্যাকার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী চাই?"

অতনু মিনমিন করে বলল, "আজ্ঞে স্যার, বলছিলুম কী..."

"কী?"

"বলছিলুম যে দক্ষিণের জঙ্গলে সার্চ পার্টিতে আমিও যদি থাকতে পারতুম তবে বেশ একটু এক্সপিরিয়েন্স হত। আসলে ফোর্সে তো অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু তেমন পদোন্নতি তো..."

প্রবীর সাহা গম্ভীর হয়ে বললেন, "দ্যাখো অতনু, চাবি-টাবি খুলছ, চা-জলখাবার আনছ, মাঝেমধ্যে লকআপে চোরটোর কোঁৎকানোর সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না। তুমি হাবিলদার ক্যাটাগরির মাল, ওই ক্যাটাগরিতেই থাকবে। বিশ বছর উঠোন ঝাঁট দিয়ে আর শেষ বয়সে এসে সালমান খান হতে যেও না। পদোন্নতি ফদোন্নতির ভূত মাথা থেকে নামাও নইলে কিন্তু বসিয়ে দোব। এমনিই মটকা গরম... আরে আসুন আসুন... জাঁহাপনারা আসুন..."

চার এস.আই. কাঁচুমাচু মুখ করে কেবিনে ঢুকেছেন। ওসি হাসিহাসি মুখ করে চেয়ে বললেন, "আপনারা নাকি জিরিয়ে টিরিয়ে নিচ্ছেন শুনলাম। সব ঠিকঠাক আছে তো? গদি, বালিশ, তোষক, এসি কিছুর

যদি ব্যবস্থা করতে পারি জানাবেন সাহেবরা।"

এস.আই চক্রবর্তী আমতা আমতা করে বলে উঠলেন, "আসলে স্যার, এই ফিরিচি। সেই ভোর থেকে সবক'টা পুকুর ঘুরে ঘুরে জাল ফেলিইচি।"

"পেয়েছ?"

"হ্যাঁ স্যার?"

"ছেলেটাকে পেয়েছ? বিল্টু দাসের ব্যাটাকে?"

"না স্যার..."

রাগে ফেটে পড়লেন ওসি, "ইয়ার্কি হচ্ছে হ্যাঁ? ইয়ার্কি? এক্ষুনি বেরো। এক্ষুনি সার্চ পার্টি নামা। দক্ষিণের জঙ্গল ছেঁচে ফেল। কাল সকালের মধ্যে ছেলেটাকে না পেলে হুড়কো দেওয়া কাকে বলে দেখবি। এ মন্ডল, কোথায় কাটছ? দাঁড়াও, কথা আছে।"

মন্ডলের বয়স বেশী না। তবে অল্প বয়সেই সাহেবকে তেল টেল মারার সবরকম দক্ষতাই সে অর্জন করেছে। সিলিং ফ্যানের দিকে চেয়ে সে বলল, "পাখাটা ফুল স্পিডে নেই? স্যার যা ঘামছেন। একটা বিপদ আপদ হয়ে গেলে কে দেখবে? কাজের যা প্রেসার স্যার নিচ্ছেন..."

অতনু বললেন, "ফুল স্পিডেই আছে তো......"

তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে মন্ডল বলল, "এটা ফুল স্পিড? যান, গিয়ে এক্ষুনি ইলেকট্রিকের দোকানে খবর দিন। ছেলে পাঠাতে বলুন। হাঁ করে দেখছেন কী? যান।"

অতনু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওসির দিকে চেয়ে মন্ডল বলল, "এটা স্যার মহা ফাঁকিবাজ। সিনিয়র লোক কিন্তু বড্ড ম্যাদামারা।"

ওসি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওসব বাদ দাও। বোসো মন্ডল। বলো কী আপডেট?"

মন্ডল চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "সবক'টা চেকপোস্টের আপডেট আছে স্যার। কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি। এমনিতে গতকাল রাত থেকেই তো নাকা চেকিং চলছে। বেরুতে পারবে না এখান থেকে। ছেলেটাকে যারাই তুলুক, তারা ছোটগড়েই আছে।"

"হুম। বিল্টু দাস?"

"সে তো স্যার গাড়ি নিয়ে চারদিক চেলে ফেলছে। বিল্টুর ছেলেগুলো সব ক্ষ্যাপা কুত্তার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে..." গলাটা খাঁকড়ে নিয়ে মন্ডল বলল, "আর্মস নিয়ে স্যার। সোর্ড, মেশিন। কিছু বলাও যাচ্ছে না এখন। সেন্সিটিভ ইস্যু।"

"কিছু বলতেও হবে না। যেচে বাঁশ নিয়ে লাভ নেই। ফোন টোন কিছু আসেনি তো? টাকা পয়সা চেয়ে?"

"এখনও না। তবে আমার মনে হয় না আসবে বলে। কিডন্যাপিং বলে মনে হচ্ছে না স্যার। ছোটগড়ে বসে বিল্টু দাসকে ব্ল্যাকমেইল করবে, তাও আবার তার ব্যাটা রায়ান দাসকে তুলে... না স্যার, অত দম কারও নেই।"

"আমারও তাইই মনে হচ্ছে। কিডন্যাপিং হলে পয়সা নিতে যেইই আসুক না কেন বিল্টু ধরবেই। ছোটগড়ের কেউ হলে বিল্টুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আর ছেলেকে জ্যান্ত ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই নেই। ছেলে ফেরত পেলে ঠিক শুঁকে শুঁকে কালপ্রিটকে বিল্টু বের করবেই। আমার মনে হয় গন কেস। মার্ডার্ড বা ইয়েট টু বি মার্ডার্ড।"

"তাহলে কী হবে স্যার? লাশ ফাশ উদ্ধার হলে বিল্টু থানা না জ্বালিয়ে দেয়।"

"ওই জন্যই তো বলছি হাঁ করে বসে না থেকে ছেলেটা লাশ হয়ে যাওয়ার আগেই খুঁজে বের করো," খেঁকিয়ে উঠলেন সাহা, "আমার মুখ না দেখে যাও দিকিনি পঞ্চানন হালদারের খোঁজ নাও। বিল্টুর ছেলেকে কারও যদি ছোঁয়ার দম থাকে তবে তা পঞ্চাননেরই আছে। ওর ভাইয়ের মার্ডারটা অত সহজে ভুলে যাবে ভেবেছ?"

"স্যার?"

"কী?"

"একটু আগেই বিল্টুর লোকজন পঞ্চাননের কারখানায় হামলা করেছিল। দু'দলে বিশাল মারামারি হয়েছে। আমি তো গিয়েছিলাম থামাতে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করেছি। প্রেসও এসে হাজির। এই যো পঞ্চাননের ম্যানেজার 'ভোরের সূর্য' চ্যানেলে কী বলছে দেখুন।"

মোবাইলে একটা ভিডিও চালিয়ে ওসির দিকে ফোনটা ঘুরিয়ে দিল মন্ডল। একটা মাঝবয়সী টেকো লোক। মোটা গোঁফ। মারামারিতে বোধহয় মাথা ফেটেছে। কপালে রুমাল চেপে ধরে সে বলছে, "... আরে ভাই, পঞ্চানন বাবু ক'দিন ধরেই ছোটগড়ে নেই। ব্যবসার কাজে বাইরে গ্যাছেন। আমরা ব্যবসায়ী লোক। ফালতু গুন্ডা বদমাইস এসে আমাদের কারখানায় চড়াও হচ্ছে। বিল্টু দাসের ছেলে হারিয়েছে তো আমরা কী করব? সে যা গুণধর ছেলে দেখুন ডাকাতি ফাকাতি করে কোথাও নিজেই কেটে পড়েছে। ক'দিন আগে একটা রেপও তো করেছে শুনলাম। সেই ভয়েই দেখুন..."

ওসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মন্ডল বলল, "কিন্তু স্যার, পঞ্চাননকে গতকাল সন্ধেবেলাতেই হরিদেবপুরের বাজারের ওধারে দেখা গেছিল। কালো স্কর্পিওটা থামিয়ে ফল কিনছিল। আজ সকাল থেকে সে গায়েব।"

ওসি গুম হয়ে গেলেন। মন্ডল উৎসুকভাবে চেয়ে রইল।

খানিক বাদে প্রবীর সাহা ক্লান্ত গলায় বললেন, "পুজোর আগে ভাবলুম একদিন ছুটি নিয়ে বউ-ছেলেমেয়ের সাথে শপিংটা সেরে আসি। এখন তো দেখছি ফাটা বাঁশে বিচি আটকাল। একদিকে বিল্টুর ব্যাটা গায়েব। অন্যদিকে পঞ্চানন প্রাইম সাসপেক্ট। শহরে দাঙ্গা না লেগে যায়। আমি আর বাঁচব না মন্ডল। আমার বড্ড শরীর খারাপ করছে।"

(২)

থানার পেছনের পুকুরঘাটের বেদীতে বসে খৈনি ডলছিল কেষ্ট আর বাবু। কেষ্ট হেড কনস্টেবল। বাবু সিভিক পুলিশ। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। কাঁচা সবুজ পানা-জল তিরতিরিয়ে কাঁপছে।

কেষ্ট বলল, "সেই যে নিউটন না কে বলেছিল না?"

"কী?"

"ওই যো, আমি জ্ঞান সাগরের তীরে দু-চারটে নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র..."

"হ্যাঁ, ওরমই কী একটা বলেছিল বটে।"

"হ্যাঁ, আমিও কুড়িয়েছি..."

"তাই ভাবছি বিড়ি বের করতে গিয়ে আমার যে দশ টাকার নোটটা পড়ে গেল, কোন শুয়োরের বাচ্চা কুড়িয়ে নিল?"

"ধুর বাঁড়াটা। আমি বলছি আমার মানুষ চেনার হেব্বি ক্ষমতা। তাও কি আর সব জানি? খেজুরতলায় স্রেফ ক'খানা আম কুড়িয়েছি মাত্র..."

"খেজুরগাছে আম? ফুল নেশা তো..."

"ওরে চুদির ভাই। খেজুরতলা জায়গাটার নাম। ওখেনে আম বাগান আছে..."

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল দু'জন। কনস্টেবল অতনু এসে দাঁড়িয়েছেন। ভারী বাধোবাধো মুখে তিনি কেষ্টর দিকে চাইলেন।

হেড কনস্টেবল কেষ্ট ভুরু কুঁচকে বলল, "কী ব্যাপার?"

"এস.আই.বাবু ডাকছেন। চক্কোত্তিবাবু। দক্ষিণের জঙ্গলে সার্চ পার্টি বেরুবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেষ্ট সিভিক পুলিশ বাবুর দিকে চেয়ে বলল, "দেখছিস বাবু? কুত্তার লাইফ। সকাল থেকে এধার ওধার চষে এলাম। শালা এখনও ডিউটি। একে দ্যাখ। ওসব পারে না। বেঁচে গ্যাছে। বেশী কাজ পারলেই বাঁশ। এর মত হলে বেঁচে যেতুম। চা করে

সাহেবকে দাও তারপর বসে বসে টিভি দ্যাখো। মাঝেমধ্যে লকআপের চোরটোরগুলোর সাথে বসে তাস পেটো। ঠিকই আছে। তোরই জীবন রে অতনু..."

বাবু হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আরে বাদ দিন তো কেষ্টদা। আপনি ওর থেকে জুনিয়র হয়েও হেড কনস্টেবল। ও শালা পুলিশ? ও তো একটা চাকরব্যাটা। চলুন চলুন, আমি একটা জলের বোতলে বাংলা পাঞ্চ করে নিচ্ছি। দক্ষিণের জঙ্গলে সার্চ করতে করতেই দু'ভাইয়ে মিলে টাক্ করে মেরে দোব। এই অতনুদা সরুন তো। হ্যাট..."
খৈনিটা দু'আঙুলে টিপে নিয়ে ঠোঁটের তলায় গুঁজে অতনুর দিকে তাকিয়ে কেষ্ট বলল, "দেখলি? দ্যাখ। একে বলে করিৎকর্মা ছেলে।"
অতনু অপরাধীর মত জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছ'টা নাগাদ থানা মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে। সব এস.আই.রা সার্চ পার্টি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। দু-চারজন পুলিশ আর ক্লার্ক এদিক ওদিক বসে হাই তুলছে। বিল্টু দাসের ছেলে নিখোঁজ। বাকি সব এখন চুলোয় যাক। খানিক দূরেই শনিমন্দির থেকে ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজ ভেসে আসছে। উঠোনে দু'টো কুকুরবাচ্ছা একটা ন্যাকড়া নিয়ে বেদম টানাটানি খেলছে। ওসির ড্রাইভার অনন্ত গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে খেতে অতনুর সাথে গল্পগাছা করছিল। অতনুর কোন নেশা নেই। ছ'টা বাজতে না বাজতেই ওসি প্রবীরবাবু হন্তদন্ত হয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। কানে মোবাইল।
"হ্যাঁ স্যার, আসছি স্যার। এক্ষুনি আসছি স্যার।"
অনন্ত সাহেবকে দেখে বিড়িটা টুক করে নর্দমায় ফেলে দিয়ে অতনুকে ফিসফিস করে বলল, "এস.পি. অফিস। সিওর।"
প্রবীরবাবু সিঁড়ি দিয়ে থপথপিয়ে নেমে এলেন। তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা তালে তালে নেচে উঠল। অনন্ত গাড়ির দরজা খুলে দিল। ওসি বললেন, "এস.পি. অফিস। কুইক।"

অনন্ত দরজা বন্ধ করে অতনুর দিকে চেয়ে "কী বলেছিলুম?" ভঙ্গীতে ভুরু নাচিয়ে মুচকি হেসে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল। অতনু হাঁ করে চেয়ে রইলেন। গাড়িটা একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতে অতনু খক্- খক্ করে কেশে ফেললেন। কাশতেও কাশতেও তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন অনন্তর অনুমান ক্ষমতার কথা। ঠিক বলে তো দিল যে সাহেব এস.পি. অফিস যাবেন! কী বুদ্ধি এদের! অনন্তর মত চ্যাংড়া ছেলেও দু'দিন বাদে তাঁকে টপকে প্রোমোশন পেয়ে যাবে।

তিনি আজীবন চাকরব্যাটাই রয়ে যাবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থানার পেছনের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। উর্দি ছেড়ে একটা ঢলঢলে হাফশার্ট আর পাশবালিশের খোলের মত ছিটের প্যান্ট গলিয়ে, কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এলেন। কেউ তাঁকে খেয়ালও করল না। সাহেবরা আজ আর কেউ ফিরছেন বলে মনে হয় না। দাবড়ানোর কেউ নেই। সামনে মেয়ের মাধ্যমিকের প্রি-টেস্ট। বাড়ি গিয়ে মেয়ের ইংরিজিটা নিয়ে বসলে বরং কাজ দেবে।

বাড়ি ফেরার পথে বাজারে স্কুটি থামিয়ে অতনু ডাঁটা দর করছিলেন। কানে গেল পাশের চায়ের দোকানে কে একজন বলছে, "পঞ্চানন হালদারই বিল্টুর ছেলেকে গুম করেছে। পুলিশ পঞ্চাননকে তুলে নিলে বেঁচে গেল। বিল্টুর হাতে পড়লে কেটে রাস্তায় ছড়িয়ে দেবে।" ভারী অবাক হলেন তিনি। পাবলিক সত্যিই সব জানে। স্রেফ তিনিই জীবনে কিচ্ছু জেনে উঠতে পারলেন না। ঘটে একটু মালকড়ি যদি দিত ভগবান। ভারী ঘেন্না লাগে মাঝেমধ্যে।

বড়পুকুর ধারটা অন্ধকার মত। স্রেফ একটা ল্যাম্পপোস্টে টিমটিম করে হলদে বাল্ব জ্বলছে। ঢালু পাড় বেয়ে ঝোপের মধ্যে খানিকটা নেমে ব্যাগ থেকে কালো প্লাস্টিকের প্যাকেটটা বের করে ঝেড়ে ঝেড়ে আবর্জনাগুলো পুকুরে খালি করছিলেন অতনু। পেছন থেকে "আরে অতনু যে" ডাকটা আসতে চমকে উঠলেন তিনি। আর একটু হলে পড়েই যেতেন। খুব জোর সামলে নিলেন।

"ভালোই হ্যাঁ? বাড়ির সব জঞ্জাল প্যাকেটে করে এনে পুকুরে ফেলা হচ্ছে। তুমি না পুলিশ?"

অতীনকাকা। অতনুর বাবার বন্ধু। বাবা অনেক আগে মারা গেলেও কাকা এখনও মাঝেমধ্যে খোঁজটোঁজ নিতে আসেন। কাকাকে দেখে সলজ্জ হেসে অতনু বললেন, "পেলাস্টিক ফেলিনি কাকা। ওই সব রান্নাঘরের আনাজের খোসা, মাছের কাটাকুটি আঁশটাঁশ। গিন্নি অফিস আসার আগে ধরিয়ে দিয়েছিল। সারাদিন ব্যাগেই ছিল। এখন মনে পড়তে খালি করলুম। আমি ডাস্টবিনেও পেলাস্টিক ফেলি না কাকা। খালি করে বাড়ি নিয়ে চলে যাই। পরে ওটাতে ময়লা এনে ফেলি। পুকুরে ফেললুম যাতে মাছটাছ খেয়ে নেয়।"

অতীনকাকা হেসে বললেন, "বেশ বেশ। তা আছ কেমন?"

"এই চলছে কাকা। আপনি?"

"এই বয়সে মানুষ যেমন থাকে তেমনই আছি। তোমার প্রোমোশন

টোমোশন কিছু হল?"

অতনু মাথা নিচু করে বললেন, "না কাকা।"

"কিছু মনে কোরো না অতনু। তোমার মত ছেলের এই লাইনে উন্নতি করা মুশকিল আছে। তুমি যদি পড়াশুনোটা আরও চালাতে। মেধাবী ছেলে ছিলে... যাকগে, মেয়েটা পড়াশুনো করছে?"

অতনুর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হ্যাঁ কাকা, এই তো এবারে মাধ্যমিক দেবে।"

"বেশ বেশ। চলি এখন। ভালো থেকো। আমি পরে একদিন তোমাদের বাড়ি যাব'খন।"

বাড়ি ঢুকে জামাটামা ছাড়তে না ছাড়তেই শিউলির মা এসে দাঁড়াল। চায়ের কাপটা সানমাইকার টেবিলের ওপর রেখে বলল, "কিগো? কিছু খোঁজ পাওয়া গেল?"

অতনু অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের?"

শিউলির মা থমথমে মুখে বলল, "ওই যো। বিল্টু দাসের ছেলেটার। ওর নামটাও নিতে ঘেন্না করে..."

অতনু বললেন, "আমারই কী আর তোমারই বা কী? আমি অফিস যাই, চাকরব্যাটার কাজ করি, ফিরে আসি। ওসব আমাকে কেউ বলেও না। আমি মাথাও ঘামাই না। পুলিশের চেয়ে দেখছি তোমাদের চিন্তা বেশী।"

"যদি ছেলেটা পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো মেয়েটা বিচার পাবে না। আর যদি কেউ মেরে দিয়ে থাকে তাহলে যে করেছে বেশ করেছে।" শিউলির মায়ের চোয়াল শক্ত।

লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে অতনু বৌয়ের কাছে তাড়াতাড়ি ঘেঁষে এসে চাপা গলায় ধমক দিলেন, "আহ্! আস্তে। বিল্টু দাসের ছেলে। সামলে কথা বলো। বাড়ি বয়ে এসে কুপিয়ে দিয়ে যাবে।"

"তুমি না পুলিশ?"

"না, আমি কোন পুলিশ টুলিশ না। আমাদের ওসিই বিল্টুর ভয়ে কাপড়ে চোপড়ে করে ফেলে... শিউলি কই? পড়ছে?"

"হ্যাঁ। ওঘরে। সবে বসেছে। সারা দুপুর লাটাই নিয়ে ছাদে ছিল। লাই দিয়ে দিয়ে তো মাথায় তুলেই ফেলেছ।"

"সে কী! এই রোদ্দুরে?"

"বলে সামনে বিশ্বকর্মা পুজো। উনি নাকি প্যাকটিস করছেন। তুমিই তো জিনিসপত্র সব কিনে এনে দিয়েছ। এখন সে আর বললে শুনবে?"

"যাই দেখি।"

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে অতনু পাশের ঘরে চলে গেলেন। রান্নাঘরে

খুন্তি নাড়তে নাড়তে শিউলির মায়ের কানে আসতে লাগল সন্ধের খবর।

"চব্বিশ ঘন্টা হতে চলল এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও শাসকদলের নেতা বিল্টু দাসের ছেলে রায়ান দাস এখনও নিখোঁজ। গতকাল রাতে রায়ানের বাইকটি উদ্ধার হয় হরিদেবপুর খালপোলের কাছে। ঘটনাস্থলে ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন ও রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে অপহরণ করা হয়েছে..."

(৩)

চোরকাঁটার ঝোপ থেকে হেগে বেরিয়ে এসে কাশী দেখল পায়ের সামনেই একটা পাঁচশোর নোট পড়ে রয়েছে। চোখ চকচক করে উঠল তার। জামবনের পেছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। আলো আছে আরও খানিক্ষণ। পাখিরা ওড়াউড়ি করছে। চ্যাঁচামেচি করছে। কাশী নীচু হয়ে স্যাট্ করে নোটটা কুড়িয়ে নিল। আহা! এমন কপাল তো আর রোজ হয় না। নোটটা পকেটে চালান করতেই বুকটা ধক্ করে উঠল তার। জলের বোতলটা মাটিতে নামিয়ে প্যান্টের দু'পকেট ভালো করে হাতড়ে একটা বিড়ির প্যাকেট আর একটা দেশলাই বাক্স ছাড়া কিচ্ছুটি পেল না সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশী। এই কুড়িয়ে পাওয়া নোটটা তবে তারই। ঝোপে হাগতে ঢোকার আগে পকেট থেকে বিড়ি বের করতে গিয়ে কখন টুক্ করে পড়ে গিয়েছিল।

"ধুর বাঁ..."

জলের বোতলটা তুলে নিয়ে সে পা চালাল। যাকগে, ফোকটে পাঁচশো না আসুক, নিজেরটা তো মিলেছে। আজ বৌদিকে বলেছে রাত্তিরে খাসির মাংস নিয়ে ঘরে ঢুকবে। বৌদি যা খাসি রাঁধে না, উফ্! পুরনো কারখানার শেডটার সামনে টিমটিম করে একটা বাল্ব জ্বলছে। সামনে গোটাকয়েক বাইক দাঁড় করানো। একটু দূরে কৃষ্ণচূড়ার নীচে একটা টাটা সুমো। বৌদির জন্য ক'টা কৃষ্ণচূড়া কুড়িয়েছে কাশী। একটা প্যাকেটে জল টল মেরে রাখা আছে। খাসির মাংস আর কৃষ্ণচূড়া। বৌদির কথা ভাবতেই মনটা আবার ফুরফুরে হয়ে উঠল। গুনগুনিয়ে উঠল কাশী, "কাটে নেহি কাটতে ইয়ে দিন ইয়ে রাত, কেহনি থি তুমসে যো দিলকি বাত..."

মরচে পড়া টিনের দরজাটা ঠেলে শেডের ভেতর ঢুকল কাশী। নীচু হয়ে বাঁশের খেঁটেটা তুলে নিল সে।

"কাটে নেহি কাটতে ইয়ে দিন ইয়ে রাত, কেহনি থি তুমসে যো দিলকি বাত..."

দু'পা এগিয়ে গেল সে।

"লো আজ ম্যাঁয় কেহতা হুঁ..."

ওপর থেকে দু'হাত বেঁধে ঝোলানো ল্যাংটো ছেলেটার দাবনা বরাবর দাঁতে দাঁত চিপে সজোরে খেঁটেটা চালাল কাশী... "আই লাভ ইয়ু..."

"ও মা গো... ও মা গো..." ককিয়ে উঠল ছেলেটা।

সিলিং থেকে পরপর চারটে ছেলে ঝুলছে। ল্যাংটো। হাতদু'টো দড়ি দিয়ে ওপরে বাঁধা। চারজনেরই মুখ লটকে থুতনি বুকে এসে ঠেকেছে। সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া কালসিটে। হাত-পা-গা ফেটে রক্ত গড়িয়ে কালচে হয়ে আছে। খেঁটেটা বাঁদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিল্টুর দিকে ফিরল কাশী।

"মালগুলো কিছু বলল দাদা?"

একটা টিনের ফোল্ডিং চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে বিল্টু দাস। চকড়া-বকড়া জামার চারটে বোতাম খোলা। হলদে আলোয় ঘেমো কালো বুক চকচক করছে। গলায় ক'গাছি মোটা মোটা সোনার চেন। দু'হাতে অনেকগুলো স্টোনচিপ সাইজের আঙটি, সোনার মোটা ব্রেসলেট। চুল উস্কোখুস্কো। মিশকালো বদনে লাল টকটকে দু'টো চোখ - উদভ্রান্ত দৃষ্টি । পাশে একটা কাঠের টুলের ওপর রাখা টেবিল ফ্যানটা ঘটর ঘটর শব্দে ঘুরছে। সাত-আটজন ছেলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছে।

বিল্টু দাস কোন কথা বলল না। গুম মেরে বসে রইল। বিল্টুর ডানহাত শ্যামা বলল, "হাগতে কতক্ষণ লাগে তোর? শালা কুঁড়ের ডিম। চ্যাংড়া ছেলেগুলো কেলিয়ে কেলিয়ে হাঁপিয়ে গেল।"

কাশী তাড়াতাড়ি করে আবার খেঁটেটা তুলে নিয়ে বলল, "এখনও বলেনি? দাঁড়াও..."

বিল্টু এবার ধমক দিল।

"এ কাশী। থাম। এদের যা ফাটিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছিস, কিছু জানলে এতক্ষণে বলে দিত। মালগুলোকে নামা। ওসির বাচ্চা নিতে আসছে।"

কাশী ঘ্যানঘেনিয়ে বলে উঠল, "আবার পুলিশ কেন দাদা? ও শালারা কিছু করতে পারবে বলে তোমার মনে হয়?"

"আহ্! যা বলছি কর।"

ছেলেগুলোকে ধরাধরি করে নামিয়ে মাটিতে শোয়াতে না শোয়াতে বাইরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

খানিক বাদেই টিনের দরজা সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে এলেন প্রবীর সাহা। পেছনে মন্ডল। মাটিতে পড়ে থাকা একটা ছেলের হাত বুট দিয়ে সরিয়ে, তাড়াতাড়ি করে বিল্টুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রবীর সাহা খুব দুঃখ দুঃখ মুখ করে বললেন, "আমার যে কী খারাপ লাগছে

বিল্টুবাবু তা বলে বোঝাতে পারব না। সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। রায়ান আমারও পুত্রসম..."

বিল্টু দাস রক্তচোখে ওসির দিকে চেয়ে বললেন, "আর ন্যাকামি না মারিয়ে এই মালগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

"এরা কারা বিল্টুবাবু? কোত্থেকে তুললেন?"

"রায়ানের বন্ধু। শালা বালের বন্ধু। আড্ডা মারত, গাঁড় মেরে খেত, মাগিবাজি করত। সবসময়ই রায়ানের পোঁদে আঠার মত লেগে থাকত। আর দরকারের সময়ে... আর দরকারের সময়ে... যখন ছেলেটাকে কোন শালারা তুলে নিয়ে গেল..."

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ছেলেটার পাঁজরায় টেনে এক লাথি কষাল বিল্টু দাস। ছেলেটা কাটা ছাগলের মত ধড়ফড়িয়ে উঠে হাতের কাছে মন্ডলের পা পেয়ে জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল, "আর মেরুনি গো... আর মেরুনি..."

মন্ডল গোবর মোছার মত করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বিগলিতভাবে বলল, "তাহলে বিল্টুবাবু এদের কি লকাপে নোব? ইন্টারোগেশন..."

"লাভ নেই। মালগুলো কিচ্ছু জানে না। খালধারে ফেলে দিয়ে যাও। বেঁচে গেলে উঠে বাড়ি চলে যাবে। আর সাহা..."

প্রবীর সাহা তটস্থ হয়ে বললেন, "হ্যাঁ বিল্টুবাবু?"

"পঞ্চাকে পেলে সোজা আমার হাতে তুলে দেবেন। ওই শুয়োরের বাচ্চাই আমার ছেলেটাকে তুলেছে। ওর ভাইটাকে কিরম করে মেরেছিলুম মনে আছে তো?"

মন্ডল চট করে বলে উঠল, "সত্তরটা কোপ।"

"হ্যাঁ, পঞ্চার মা'ও চিনতে পারেনি..."

ওসি তাড়াতাড়ি করে বললেন, "তবে বিল্টুবাবু খবর ভালো। পঞ্চানন হালদারও ছোটগড় থেকে বেরোয়নি। রায়ানও। এ একদম পাকা খবর। যে লেভেলে নাকা-চেকিং চলছে, একটা মাছিও গলতে পারবে না। আমার ধারণা পঞ্চাননকে পেলেই রায়ানকেও পেয়ে যাব। আপনি স্রেফ আপনার ছেলেপুলেগুলোকে একটু শান্ত রাখুন। পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে..."

বিল্টু দাস রক্তাভ চোখে তাকাল।

"বেশী পাকামি না মারিয়ে কাজের কাজ করুন। আমার ছেলেদের তাদের মত করে দেখতে দিন। যান এবার। ভাগুন।"

সবার সাথে ধরাধরি করে নির্জীব ছেলেগুলোকে পুলিশের জিপে তুলে দিয়ে কাশী হাঁপ ছাড়ল। বেশী বাজেনি। খাসিটা চট করে তুলতে

হবে। লাইনধারের বাজারে আব্বাসের দোকান থেকে সিনা আর রাণ মিলিয়ে শ'পাঁচেক তুলতুলে মাংস কিনল সে। রামের একটা সাড়ে-সাতশো তুলল। বুড়ির মাঠের পাশ দিয়ে আসার সময়ে বাইক থামাল সে। বুড়ির মাঠে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেউ কোত্থাও নেই। কাশী ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বেলে দেখল বটগাছের গোড়ায় একটা বেশ বড় টিফিন ক্যারিয়ার বসান। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেটা তুলে নিল সে। ব্রজনাথ মিত্তির বাই লেনের সরু গলিটায় যখন সে ঢুকল তখন আটটা বেজে গিয়েছে। লোকজন চোখে পড়ল না। ল্যাম্পপোস্টের ফিকে আলোয় গলিটা ভালো করে মেপে নিল সে। না, লোকজন কেউ নেই। কোনও একটা বাড়ি থেকে টিভিতে খবর পড়ার আওয়াজ আসছে। বাইক থেকে নেমে বাঁদিকের থমথমে বিশাল বাড়িটার প্রকান্ড সদর দরজার পাশের বেদীতে টিফিন কৌটোটা নামিয়ে রেখেই কাশী কাঁটা হয়ে গেল। চট্ করে অন্ধকারে সরে এল সে। উল্টোদিক থেকে একটা লোক আসছে। চোখ সরু করল কাশী। একটু দূরে একটা বাড়ির সামনে থেমে লোকটা কড়া নাড়ল। খানিক বাদেই একটা বৌ দরজা খুলল। লোকটা কিসব বকবক করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল। তাকে দেখতে পায়নি। হাঁপ ছাড়ল কাশী। অবশ্য দেখতে পেলেই বা কী। লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে। অতনু ব্যানার্জি। ছোটগড় থানার হাবিলদার। এক্কেবারে ম্যাদামারা মাল। তাও, পঞ্চাননবাবুকে এত্তেলা করে দিতে হবে।

খাসির মাংসর প্যাকেটটা দালানে নামিয়ে রেখে উঠোনের টিউবওয়েল চেপে চেপে হাত-পা ধুচ্ছিল কাশী। নুপুরের শব্দে মাথা তুলল। বৌদি বেরিয়ে এসেছে। হাতকাটা নাইটি। সুডৌল হাতদু'টোয় উঠোনের হলুদ আলো পড়ে চকচক করছে। কাঁধের পাশ দিয়ে এলো চুল নেমে এসেছে। ভেতরের ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। বৌদি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল ভেতরে শায়া নেই। নাইটির পেছনে টিউবের আলোয় সুগঠিত থাইজোড়ার ছায়া স্পষ্ট। সেদিকে তাকিয়ে কাশী ক্যাবলার মত হাসতেই বৌদি মুখ বেঁকাল।

"ঢঙ..."

নীচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে নিতেই কাশীর চোখে চোখ পড়ল তার। ফর্সা গাল লাল করে পর্দা সরিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল সে। মেয়েটা বড্ড ভালো। কাশী হাসল। কতই বা বয়স। খুব জোর তিরিশ। পোড়া কপাল।

জামা প্যান্ট ছেড়ে বার্মুডা পরে খালি গায়ে সানমাইকার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল কাশী। দু-চারবার বাইসেপ ট্রাইসেপ ফুলিয়ে

নিজেকে দেখে বেশ খুশি হল সে। আয়নায় বৌদির টিপ সাঁটা। সিঁদুর কৌটোয় ধুলো জমেছে। পাশের টিনের শোকেসের ওপর প্লাস্টিকের সস্তা ফ্রেমে দাদা-বৌদির বিয়ের ছবি। সিঁথিতে মোটা করে ধ্যাবড়ানো সিঁদুর, কপালে চন্দনের নকশা, চোখে একরাশ স্বপ্ন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছবিটা উল্টে রাখল সে। দাদা তার আগে বিল্টু দাসের কাছে কাজ করত। একটা এনকাউন্টারে...

"ওই... একবার এদিকে এসো..."

রিনরিনে কন্ঠের ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ল কাশীর। খাসি কষানোর দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল কাশী। বৌদির ভরাট পিঠে ঘামের ফোঁটা। পটু হাতে খুন্তি নাড়ছে সে। গ্যাসের টেবিলে একটা ছোট বাটি নামানো। বৌদি কাশীর দিকে না ফিরেই বলল, "চেখে বলো। নুন-মিষ্টি-ঝাল..."

ফুটন্ত মাংসের টুকরোটা মুখে ফেলে পাকলাতে পাকলাতেই কাশী বলল, "ঠিক আছে। হেব্বি হয়েছে।" তার মুখ দিয়ে ভকভক করে গরম বাষ্প বেরিয়ে এল। বৌদি অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এত গরম কীভাবে তুমি খাও কী জানি বাবা!"

কাশী মাংস চিবুতে চিবুতেই দুষ্টুমি করে বলল, "গরম গরমই তো খেতে মজা..."

বৌদি আবার মুখ বেঁকিয়ে পেছন ফিরল।

"ঢওওওওং..."

ঘটি উপুড় করে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বৌদির খোলা পিঠ, ঘাড়, হাতের দিকে চেয়ে রইল সে। নরম, মসৃণ। মাখনের মত। হলুদ সুতির নাইটিটা পেছনের খাঁজে কিছুটা ঢুকে গিয়েছে।

কাশী দু'পা এগিয়ে বৌদির দু'বাহু স্পর্শ করল। বৌদি বিরক্ত হল।

"কী হলটা কী? রাঁধছি তো..."

তার পিঠে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ নিল কাশী। আহ্!

ঘাড়ে একটা আলতো চুমু খেতেই কেঁপে উঠল বৌদি।

"ইশশশশশ! না..."

পেছন দিক থেকে বৌদিকে জড়িয়ে ধরল সে। কী নরম শরীর! কাশীর রক্তে আগুন। বৌদি মোচড় দিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

"উম্মম্ম! না, ছাড়ো... ছাড়ো বলছি..."

"ছেড়ে দেব? সত্যি?"

"জানি না, যাও তো। ঢং..."

তার নরম বুক এখন কাশীর হাতের মুঠোয়। নাইটির পেছনে বার্মুডার দৃঢ় উপস্থিতি। বৌদির একটা হাত টেনে নিয়ে এসে নিজের বার্মুডার ওপর ছাড়ল কাশী।

সুতির নাইটিটা গুটিয়ে ওপরে তুলতেই গ্যাসের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল বৌদি। কাশীর বার্মুডা তখন পা বেয়ে নেমে এসেছে।

"উফ্! সোনা আস্তে..."

"ভাল্লাগছে? হ্যাঁ? কিগো? ভাল্লাগছে?"

কাশীর বুক উঠছে নামছে। সে হাঁপাচ্ছে। বৌদি বলল, "উম্মম্মম্ম! রান্নাঘরে... ভাল্লাগে... খুব..."

কাশী গতি না কমিয়েই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "কেন? রান্নাঘরে কী?"

"উঁহ্! বৌ বৌ লাগে... তোমার... বৌ... আহ্ সোনা... লাগবে..."

নিজেকে বের করে আনল কাশী। বৌদিকে এক হ্যাঁচকায় তার দিকে ফিরিয়ে আঁকড়ে ধরল সে। নরম ঠোঁট। জিভের স্পর্শে স্নায়ুতে বিদ্যুৎ খেলল তার। বৌদির দু'বগল ধরে চাগিয়ে নিয়ে গ্যাসের টেবিলে বসাল। বৌদি দু'হাত ছড়িয়ে বাসনপত্র ছিটকে দিয়ে জায়গা দিল কাশীকে। ঝনঝন করে গড়িয়ে গেল হাঁড়ি, কড়া, থালা, গেলাস। আবার প্রবেশ করল কাশী।

"কার বৌ, হ্যাঁ? কার বৌ?"

নির্লোম, মসৃণ পাজোড়া কাশীর কোমরে ফাঁসের মত চেপে বসল।

"তোমার বৌ... তোমার সোনা, তোমার বৌ..."

কাশী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আ-আই লাভ ইয়ু বৃষ্টি... আই লাভ ইয়ু..."

ততক্ষনে লোহার কড়ায় খাসির মাংসর তলাটা ধরতে শুরু করেছে।

(৪)

"একত্রিশের দুই ব্রজনাথ মিত্তির বাই লেন। হ্যাঁ... মিত্তির মিত্তির... ব্রজনাথ মিত্তির... ওই ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের উল্টোদিকের রাস্তাটা দিয়ে ঢুকে এলেই... নীল দরজা, বাঁ দিকে... দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, বেলটা বাজান... ব্যাস ব্যাস ব্যাস ব্যাস... ঠিইইইইক আছে... ঠিক আছে... রাখলাম ভাই।"

ফোনটা কেটে পকেটে পুরে মুখ তুলতেই অতনু দেখলেন মন্ডল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অতনু একগাল হেসে বললেন,

"আমাজোন। গিন্নি কিসব জিনিস কিনেছে। সেগুলোই দিতে এসেছে। আমার বাড়িটা গলির ভেতরে তো। ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হয়।"

জিপের দুলুনির তালে তালে মন্ডল কেটে কেটে বলল, "আপনার বয়সটা কত হল? ডিউটিতে আছেন তো? ফোনে সেই থেকে হ্যালহ্যাল হ্যালহ্যাল করে যাচ্ছেন।"

অতনু কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "আসলে..."

"না, কোন আসলে ফাসলে না। ডিউটির সময় ওসব পার্সোনাল হ্যাজানি চলবে না। মাথায় কি কিচ্ছুটি নেই? আর কত দিন..."

পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠতেই মন্ডল তাড়াতাড়ি বের করল। আড়চোখে একবার অতনুর দিকে দেখে নিয়ে মোবাইলটা কানে ধরে, হাতের তালু দিয়ে মুখটা আড়াল করে চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ শিল্পা, তোমার কথাই ভাবছিলুম। না না, কোনও অসুবিধে নেই। না না, একদমই ব্যস্ত না। তোমার মিষ্টি গলাটা না শুনলে..."

ভাঙাচোরা রাস্তার দু'পাশে কচুবন, জলা। জিপটা ঝড়াং ঝড়াং করতে করতে চলেছে। পাশে বুড়ো কনস্টেবল বদ্রীনাথ একটা আদ্যিকালের থ্রি-নট-থ্রি বন্দুক জড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ পায়ে কী একটা ভিজেভিজে ঠেকতে নড়েচড়ে উঠে বসে বুড়ো বদ্রীনাথ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "ও অতনু? চোখের কি মাতা খেইচিস নাকি? কী একটা পায়ে রেখিচিস আমার। প্যান্টের গোছটা ভিজে গেল। লাল লাল কী যেন। উঁহ্! মাছটাছ নাকি?"

অতনু তাড়াতাড়ি করে প্যাকেটটা সরিয়ে নিয়ে সলজ্জ হেসে বলল, "এহেহেহে! একদম খেয়াল করিনি গো। না, মাছ না। আজকে বউ একটু মুরগি নিয়ে আসতে বলেছিল। আমি খাসিই তুলে নিয়েছি। আজ খাসির ঝোল আর ভাত খেয়ে দুপুরে টেনে ঘুমিয়ে গতকালের নাইট ডিউটি উসুল করে নোব।"

বদ্রীনাথ শিউরে উঠে বলল, "করিচিস কী রে ব্যাটা? শনিবার দিন আমার গায়ে আঁশ ঠেকালি?"

"ধুর, আজ রবিবার তো। তুমি না..."

বদ্রীনাথ আশ্বস্ত হয়ে ফোকলা হেসে বলল, "ওহ্ তাই বল। তা বলি কি অতনু বৌমাকে বলে আমাকে যদি দু-এক পিস... একটু ঝোল, আলু... একা মানুষ তো... বেশী তো না..."

বাইরের দিকে চেয়ে অতনু গুনগুনিয়ে উঠলেন, "শ্যামা মা কি আমার..."

টালির বাড়ি। পেছনে উলুবন। বাড়ির সামনে নীচু জমিতে জল দাঁড়িয়ে আছে। জলকাদার ওপর দিয়ে ইঁট পেতে পেতে বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করে হয়েছে। উঠোনে পাতকুয়ো। একটা ক্ষয়াটে পেয়ারাগাছে

লোহার সরু শেকল দিয়ে দু'টো সাইকেল বাঁধা। একটা বড় কালো বাবা-সাইকেল, একটা স্কুল থেকে দেওয়া সামনে ঝুড়িওয়ালা ছাত্রী-সাইকেল। পাশেই একটা কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছে একটা ছেলে। বছর বারো-তেরো হবে। পা দু'টো সরু লিকলিকে, মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে, কোমরটা শক্ত করে কাপড় দিয়ে চেয়ারে বাঁধা। মন্ডল, অতনু আর বদ্রীনাথকে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলেটা "গিঁগিঁ" করে বিকট আওয়াজ তুলল। তা শুনে কোত্থেকে একটা রোগা, লেজ গোটানো, দুদু ঝোলা মাদি কুকুর ছুটে এসে পেয়ারা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খাঁইখাঁই করে চেঁচিয়ে একটা যাচ্ছেতাই কান্ড বাঁধিয়ে বসল।

অতনু ঢিল কুড়িয়ে ছোঁড়ার ভান করে "হেই হেই" করছিলেন এমন সময়ে টালির ঘর থেকে এক মধ্যবয়স্কা মহিলা গায়ে আঁচল জড়াতে জড়াতে ইঁটে-ইঁটে অভ্যস্ত পা ফেলে বেরিয়ে এলেন। চোখেমুখে ভয় ও দুশ্চিন্তা।

পুলিশ দেখেই হাত জোড় করে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

"মরে যাব আমরা। মেরে দেবে আমাদের। মেয়েটার সব্বোনাশ তো করেই দিয়েছে..."

"বেশী বকছেন হ্যাঁ? বড্ড বেশী বকছেন। প্রমাণ ছাড়া ভুলভাল কথা বললে সোজা চালান করে দোব," মন্ডল খ্যাঁক করে উঠল।

ভদ্রমহিলা থতমত খেয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। গালে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ।

অতনু গলাটা খাঁকড়ে নিয়ে বলল, "চিন্তা করবেন না দিদিভাই। এই যো গার্ড।"

বদ্রীনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল, "একটা চেয়ার বের করে দিন দিকিনি।"

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেলেন। মন্ডল গজগজ করতে লাগল, "শালা কোর্টের মাথা-ফাথা খারাপ নাকি কে জানে! এসব ফালতু লোকজনকে প্রোটেকশন দেওয়ার কী আছে কে জানে মাইরি।"

অতনু মিনমিন করে বলল, "বিল্টুবাবুর ছেলেছোকরাগুলো যদি চড়াও হয়..."

"হ্যাঁ, খেয়েদেয়ে কাজ নেই আর। বিল্টু দাস ভালো করে জানে এদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আনাজওয়ালার বউ, মেয়ে আর একটা পঙ্গু ছেলে। এরা বিল্টুর ছেলেকে তুলবে? কোন মানে হয়? আর কি প্রমাণ আছে যে রায়ান দাসই এদের মেয়েকে..."

মহিলা একটা লাল প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। পেতে দিলেন পাতকুয়োর পাশে। বদ্রীনাথ থ্রি-নট-থ্রি'টা পাতকুয়োতে ঠেকনা দিয়ে রেখে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসল। অতনু জানে

খানিক বাদেই সে নাক ডাকবে। প্রোটেকশনের নামে প্রহসন। বদ্রী নাকি বিল্টু দাসের গুন্ডাদের হাত থেকে এদের বাঁচাবে। তাকেই বরং প্রোটেকশন দিলে ভালো হয়।

মহিলা ছলছলে চোখে হাত জোড় করে তাদের দিকে তাকালেন। মন্ডল কী একটা বলবে বলে হাঁ করেছিল, পকেটে ফোনটা আবার বেজে উঠতে সেটা কানে দিয়ে "হ্যাঁ শিল্পা, তখন কেটে গেল। প্লিজ রাগ কোরো না বাবু..." বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে পাশের কচুবনের দিকে সরে গেল।

অতনু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "পারমিতা কেমন আছে?"

মহিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। অতনু হাত নেড়ে বললেন, "আস্তে আস্তে। কাঁদবেন না দিদিভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অতনু ডানদিকে চেয়ে দেখলেন মন্ডল ফোনে মশগুল। একটা কঞ্চি দিয়ে কচুগাছ ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে ঘ্যানঘ্যানিয়ে কিসব বলছে। বদ্রী এর মধ্যেই ঢুলে পড়েছে। অতনু বললেন, "একবার দেখে যাই?"

মহিলা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ দাদা, আসুন না।"

মহিলার পেছন-পেছন ইঁটে পা ফেলে ফেলে ব্যালেন্সের খেলা দেখাতে দেখাতে সাবধানে এগোলেন অতনু। দরজা খাটো। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়।

সামনের বারান্দার একটা দিক নীল তেরপল দিয়ে ঘেরা - ওটা রান্নাঘর। শোবার ঘরের ভেতরটা স্যাঁৎস্যাঁতে, অন্ধকার, পেচ্ছাপের গন্ধ। ছেলেটা করে টরে ফেলে বোধহয়। ঘরের ভেতর গাদাগাদি করে একটা খাট, একটা টেবিল, একটা আলমারি, একটা ছোট টিভি আর একটা ব্যাঁকামত ড্রেসিংটেবিল। সবকিছুর ওপরেই গুচ্ছের মালপত্র ডাঁই করে রাখা। মহিলা তাড়াতাড়ি করে সুইচ মারলেন। খানিকটা দপদপিয়ে একটা টিউবলাইট জ্বলে উঠল। পায়াগুলোর নীচে গোটাতিনেক করে ইঁট দিয়ে খাটটা উঁচু করা। খাটের তলায় একটা বিছানা পাতা। মহিলা নীচু হয়ে হয়ে ডাকলেন, "বুল্টি? এই দ্যাখ। শিউলির বাবা এসেছে। কিরে..."

অতনু উবু হয়ে বসলেন। চোখ সয়ে আসতে দেখলেন খাটের তলায়, দেওয়ালের কোণের দিকে জড়োসড়ো হয়ে, দু'হাতে দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরে মেয়েটা বসে রয়েছে। খাটের তলায় পাতা বিছানায় বইখাতা, পেন্সিলবক্স ছড়ানো ছেটানো। একটা জলের বোতল আর একটা ব্যাটারির আলো কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

অতনু নরম গলায় ডাকলেন, "পারমিতা? কেমন আছ মা?"

মেয়েটি নিরুত্তর। অতনু পকেট থেকে একটা বেগুনি রঙের প্যাকেট

বের করে এগিয়ে দিলেন।

"ক্যাডবেরি। শিউলি পাঠিয়েছে। সে এখন তোমার জন্য ত্রিকোণমিতি কষছে। খাতা পাঠিয়ে দেবে। আমি দিয়ে যাব..."

মহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "কিরে? মুখে কতা নেই কেন? জেঠু কী দিচ্ছে নে..."

অন্ধকারে মেয়েটির চোখজোড়া উজ্জ্বল ও অভিব্যক্তিহীন।

অতনু হাত তুলে বললেন, "থাক দিদিভাই। আমি পরে আবার আসব'খন।"

ক্যাডবেরির প্যাকেটটা পাশেই একটা পিঁড়ের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি।

"শোনো মা, টেস্টপেপারটা করতে থাকো। দেখতে দেখতে পরীক্ষা চলে আসবে। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে আর শিউলিকে হলে বসিয়ে দিয়ে আসব। কোন চিন্তা নেই।"

অতনু উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা একটা স্টিলের গেলাসে জল এগিয়ে দিলেন।

"ঘরে তো মিষ্টি নেই। শুধু জলই..."

অতনু গেলাসটা মুখে তুললেই আঁশটে গন্ধ পেলেন। মহিলা বোধহয় মাছ কুটছিলেন। নিশ্বাস বন্ধ করে কোনমতে একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা ফেরত দিতেই বাইরে বুটের শব্দ পাওয়া গেল। অতনু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা গেলাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাইরে মন্ডলের গলা, "কী ব্যাপার? আবার ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?"

শোনা গেল অতনু গ্যালগেলিয়ে বলছে, "একবার দেখে নিলুম সব বিলিব্যবস্থা ঠিকঠাক কি না..."

"ওহ্! একদম আইপিএস অফিসার এসেছে রে... শাল্লা..."

ছেলেটা বোধহয় 'গিঁগিঁ' করে ডেকে উঠল। মহিলা গেলাস হাতেই তাড়াতাড়ি করে দেখতে ছুটলেন। সাথেসাথে আবার ফিরে এসে সুইচ মেরে টিউবলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে গেলেন।

খাটের তলা থেকে একটা রোগাটে হাত বেরিয়ে এসে ক্যাডবেরির প্যাকেটটা অন্ধকারে টেনে নিল।

(৫)

"সেবার রান্নাপুজোর দিন ঝেঁপে বিস্টি হলুনি? খোকন কেলাবে বসে মদ খাচ্ছিল। তখন ক'টা হবে? বিকেল পাঁচটা। সেদিন বেলা থেকে পোগ্রাম চলছে। খোকনদের বাড়ি খুব বড় করে রান্নাপুজো হয়। তার পরেরদিন আবার ওদের কারখানায় বিশ্বকর্মাপুজো। ওদের বাড়ি

তো কেলাবের পেছনেই। থেকে থেকে ইলিশমাছ ভাজা দিয়ে যাচ্চে আর আমরা খাচ্চি। নইলে আমরা কি আর ইলিশমাছ কখনও চোখে দেকিচি? আমি তো এমনিতে প্যাকেট খাই স্যার। ক'দিন আগেও তো রাত্তিরে লাইনধারে প্যাকেট খেয়ে ক্যালাকেলি কচ্চিলুম। মন্ডলবাবু সেই তুলে আনল। খুব কেলিয়েছিল। মেরে এক্কেবারে গাঁ..."

মন্ডল চড়াৎ করে সুখেনের মাথার পেছনে একটা চাঁটি কষাল।

ওসি দাবড়ালেন, "কাজের কথা বল।"

সুখেন মাথার পেছনে হাত বোলাতে বোলাতে গ্যালগ্যাল করে বলে উঠল, "হ্যাঁ স্যার, সেদিন ইংলিশ হচ্ছিল। খোকনই খাওয়াল। আমাদের আর নইলে পয়সা কোথায়? তখন পাঁচটা বোধহয় বাজে। চারটে সাড়ে সাতশো খালি। সবাই আউট। স্রেফ আমরা তিনজন তখনও বসে। খোকন বলল নাকি নেশা হয়নি। আমাকে বলল গাড়ির পেছনে বসতে। মাল আনতে যাবে।"

"কেন? খোকন তো তোকে পাঠাল না কেন?"

"স্যার, মদ খেলেই খোকনের বাইক চালানোর ভূত চাপত। মদ খেয়ে শালা হেবি জোরে বাইক ফাটাত। মাল খোকন নিজে গিয়েই আনবে। তবে পোঁদে কাউকে বসতে হবে। ওই বিস্টির ওয়েদারে আর আমার ভাল্লাগছিল না। আমি একটু গাঁইগুঁই করে নেশার ধুনকি দেখিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। ওই ম্যাড়াটা স্যার গেল খোকনের সাথে। খোকন আমাকে খিস্তি পাড়তে পাড়তে বেরুল। তারপর তো মালটা জল কাদা মেখে অনেক রাত্তিরে ফিরে এল। বলল, কারা নাকি বড়পুকুরের ধারের আমবাগানের গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। খোকনকে তুলে নিয়ে গেল। ও কোনরকমে পালিয়েছিল।"

একটু দম নিয়ে সুখেন চাপা গলায় বলল, "তার পরেও নাকি বিল্টুবাবুর ছেলেরা সব ওর পোঁদে পোঁদে ধাওয়া করেছিল। ও সেই পুরনো রেললাইনের টানেলে অনেক্ষণ লুকিয়েছিল। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের খবর দিল। পঞ্চাননবাবু তো তখনই গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। আমরাও সব খুঁজতে বেরুলাম। খোকনের বডিটা তো জানেনই স্যার বিশ্বকর্মাপুজোর দিন বিকেলে পাওয়া গেল। বুড়ির মাঠের পাশের টোকো আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে গিয়েছিল। কুপিয়ে কুপিয়ে আর কিছু রাখেনি। খোকনের লাশটার গায়ে আবার সুতো দিয়ে অনেকগুলো ঘুড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বিল্টুবাবু। আসলে ক্যাচড়াটা তো লোহার বাবরি তোলা নিয়ে। আড়াইশোটা কারখানার বাবরি - কম আয় ওখেন থেকে? এলাকাটা বিল্টুবাবুর ছিল; উনিই তোলাতেন। পঞ্চাননবাবু খামোকা তার ভাইকে দিয়ে ওগুলো দখল করাতে গেলেন কেন কে জানে। মাঝখান থেকে ভাইটা অকালে চলে

গেল। বড্ড ভালো ছেলে ছিল খোকনটা। রোজ মদ খাওয়াত। স্যার, সেবারই তো সব বলিচি। আবার কেন স্যার?"

মন্ডল ধমক দিল, "যতবার জিজ্ঞেস করব ততবার বলবি।"

সাহা বললেন, "আচ্ছা। বুঝলাম।"

সুখেন চাপা গলায় বলল, "স্যার, ওই কাশীটাই সবচেয়ে বড় হারামি। মালটার দাদা তো বিল্টুবাবুর কাছে কাজ করত। ওই যে সেবার আপনারা দক্ষিণের জঙ্গলে এনকাউন্টারে..."

ওসির ঠান্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে সুখেন মিইয়ে গিয়ে কাঁচাপাকা খোঁচাখোঁচা দাড়ি চুলকুতে চুলকুতে বলল, "বলচি যে কাশীর দাদা বিল্টুবাবুর কাছে কাজ করলে কী হবে? খোকনের সাথে এক ইস্কুলে পড়েছে আগে কাশী। বন্ধু তো ওর। তাই খোকন কাশীকে সবসময় ডাকত। বিশ্বাস করত। দেখুন স্যার বিশ্বাসের দাম। কাশীর বৌদি আছে না? মেয়েটার কী যেন নাম - হ্যাঁ, বিস্টি বিস্টি। আমাদের খোকনার সাথে মাগিটার একটু লটরপটর ছিল। এবার কাশী যে তার জন্য ভেতরে ভেতরে খোকনের ওপর খচে আছে কে জানত? খোকনের সাথে বাইকে চড়ে বেরুনোর আগে শালা কাশীই ফোন করে দিয়েছিল ওর দাদাকে। ওর দাদাই খোকনাকে তুলল, মারল। লাভ কী হল?"

সুখেন ফ্যাকফ্যাক করে হাসল। মুখ দিয়ে ভকভক করে কাঁচা চুল্লুর গন্ধ বেরিয়ে এল। ওসি নাকে রুমাল চাপা দিলেন।

"বিল্টুবাবু যা ঘুঘু জিনিস। মার্ডার কেসটা খেল কাশীর দাদাই। বিল্টুবাবু আর ওকে তখন চিনতে পারবে? তারপর তো স্যার আপনারা ওকে দক্ষিণের জঙ্গলে..."

সুখেনের চুলের মুঠিটা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে মন্ডল হিসহিসিয়ে বলল, "সুখেন, খুব চুলকুনি হয়েছে না তোর? লাইনে কাটা পড়ার খুব শখ না?"

সুখেন একটা কেন্নোর মত গুটিয়ে গেল।

"ছেড়ে দিন স্যার, পাগল ছাগল মানুষ। পেটে মদ পড়লে কখন যে কী বলি তার ঠিক নেই..."

"চুপচাপ বাড়ি পালা নইলে লকআপে ঢুকিয়ে ফাটিয়ে দোব।"

সুখেন মন্ডলের পাশ কাটিয়ে সাঁৎ করে ওসির কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

ওসি মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মন্ডল? কাশী কবে থেকে বিল্টুর কাছে কাজ করে?"

মন্ডল গলা নামিয়ে বলল, "দু'বছর স্যার। ওর দাদাটাকে যেবার আমরা..."

"হুম। তখন পঞ্চাননের ভাই খোকন মরল। এখন বিল্টুর ছেলে

গায়েব। কাশী সেবার খোকনকে বিট্রে করল কারণ খোকন কাশীর দাদার বৌয়ের সাথে অ্যাফেয়ারে জড়িয়েছিল বা জড়াতে চলেছিল। এবারে তো মোটিভ আরও স্ট্রং। দাদার খুনের রিভেঞ্জ। বিল্টুর ছেলে রায়ানও তো কাশীকে খুব প্রেফার করত তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার। খালপোলের ধারে দু'জনকে একসাথে বসে অনেকবার মদ খেতে দেখেছি।"

"হুম। কাশী একা পারবে না। পঞ্চাননের হাত আছে। আগের বারেও কাশীই সেট আপটা করেছিল। এবারেও তাইই করেছে। পঞ্চানন কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে আমার মনে হয় সেটাও কাশাই জানে। মন্ডল, কাশীকে তোলো। আজই। ওই জানে রায়ান দাস কোথায় আছে... বা আদৌ আছে কি না..."

"কিন্তু স্যার, বিল্টু দাসের দলের ছেলেকে তুললে খচে যাবে না?"

"বিল্টু দাসকে যখন আমরা জানাব যে কাশীই কালপ্রিট আর আমরাই তা বের করেছি - কী হবে? খচে যাবে না খুশি হবে?"

মন্ডল দাঁত বের করে বলল, "খুশি হবে স্যার।"

"তবে আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে মালটা তুলে নিয়ে এসো গিয়ে। যত্তসব!"

(৬)

ড্রেসিংটেবিলের সামনে একটা প্লাস্টিকের লাল টুলে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল বৃষ্টি। ঘন কালো লম্বা চুলের গোছা কাঁধের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। বৃষ্টির ডান হাতে একটা সরু চুড়ি - সোনার। তার ঠোঁটজোড়া বড় আকর্ষণীয়। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে আয়নার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সে। অস্ফুটে বলল, "কী সুন্দর রে তুই! গায়ের কী রঙ! ঠোঁটটা কী সুন্দর! চোখগুলোও..."

নিজের ডান বাহুর দিকে চোখ পড়তে বৃষ্টি দেখল লাল দাগ। কামড়ের। কাশীটা খুব দুষ্টু। বড্ড কামড়ায়। যেন খেয়েই নেবে। ফিক করে হেসে ফেলল সে। তার গা কী মসৃণ! চকচকে। কী ভালো লাগে। পুরুষ মানুষ যে তাকে চোখ দিয়ে গিলে খায় তা বৃষ্টি ঢের কমবয়স থেকেই জানে, বোঝে এবং সেটা নিয়ে খানিকটা অহঙ্কারও করে থাকে। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। আয়নায় নিজের শরীর দেখতে তার বড় ভাল্লাগে। নিখুঁত শরীর। মুগ্ধ হয় সে নিজেই। নাইটিটা তুলে সবে মাথা দিয়ে গলিয়ে খুলতে যাবে এমন সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল সে।

কাশী এল? উঁহু, তার তো আসার কথা না।

"কে?"

"পুলিশ। দরজা খুলুন।"

নাইটির ওপর একটা ওড়না চাপাতে গিয়েও কী ভেবে বৃষ্টি থেমে গেল। শান্তভাবে গিয়ে দরজা খুলল সে। বারান্দায় এস.আই. মন্ডল দাঁড়িয়ে। তার পেছনে আরও তিনজন পুলিশ। একজন লেডি কনস্টেবলও আছে। বাড়িতে পুলিশ আসা তার কাছে নতুন না। আগেও অনেকবার এসেছে। কখনও তাদের ঘরে বসে খানাপিনা করেছে, কখনও সব তোলপাড় করেছে। এই মন্ডলও বৃষ্টির বরের সাথে তাদের ঘরে বসে মদ খেয়ে গেছে। পঞ্চানন হালদারের ভাই খোকন মার্ডার হওয়ার পর তাকে তোলার সময়ে মন্ডলই এসেছিল। হাসিমুখেই বেরিয়েছিল ছেলেটা। মন্ডলের সাথে ইয়ার্কি মারতে মারতেই গাড়িতে উঠেছিল। তারপর আর ফিরল না।

বৃষ্টি ভুরু কুঁচকে বলল, "কী চাই?"

"কাশী কই?"

"আমি কী করে জানব? সে দু'দিন ঘরে আসেনি। শুক্কুরবার সন্ধেবেলা শেষ এসেছিল। তারপর আবার মাঝরাত্তিরে একটা ফোন এল। বেরিয়ে গেল।"

"কোথায় গেল?"

"আমি কী জানি? বলল ক'দিন ফিরবে না।"

"ঘরটা দেখব।"

বৃষ্টি দু'হাত ছড়িয়ে দু'দিকের কপাট আটকে বলল, "একা মেয়েমানুষ আছি। এখন ঢোকা যাবে না।"

মন্ডল দেখল বৃষ্টির নাইটির তলায় ব্রা নেই। একমূহুর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে লেডি কনস্টেবলকে ইশারা করল সে। বৃষ্টিকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে খাটে বসিয়ে দিল সেই মহিলা। মন্ডল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিকে দেখতে লাগল। কেসের ঝামেলাটা মিটলে মেয়েটার নাম্বারটা নিতে হবে। এখন চাইলে খ্যাঁক করে উঠবে; তাছাড়া সবাই আছে।

বাকিরা দু'টো ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, পেছনের উঠোন সব দেখে টেখে এসে মন্ডলকে বলল, "নেই স্যার। বাইকটাও নেই।"

বৃষ্টির মুখ রাগে লাল টকটকে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ছোটলোক শালা সব।"

মন্ডল বেরিয়ে যেতে যেতেও ফিরে এসে বলল, "কাশী এলেই থানায় ফোন করে দিও। আর্জেন্ট। আচ্ছা থাক, তুমি আমাকেই ফোন কোরো। থানায় ফোন করলে যদি তোমার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করে, আমার খারাপ লাগবে বৃষ্টি। কষ্ট হবে। তুমি আমার পার্সোনাল

নাম্বারটা রেখে দাও। বুঝলে? কিগো?"

বৃষ্টি একবার কটমট করে তাকিয়েও হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে ফোনটা টেনে নিল।

লকটা খুলে বলল, "বলো..."

মন্ডল খুব খুশি হয়ে বলতে শুরু করল, "নাইন-এইটি-থ্রি-ফোর..."

বৃষ্টি জানে কাশী আর ফিরবে না। তার মত শরীর নিয়ে ছোটগড়ের ছিঁচকে হায়নাদের দাঁত-নখ এড়িয়ে বেঁচে থাকতে গেলে একজন ক্ষমতাওয়ালা পুরুষমানুষের ছায়ায় থাকার প্রয়োজনীয়তাও বৃষ্টি জানে। মন্ডলের নম্বরটা সেভ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

(৭)

আজ বাবা ডিউটি থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে। মা ফোন করেছিল। শিউলির গা ঘষঘষ করছে - জ্বরজ্বর। গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা। তাও সে পাকামি মেরে অঙ্ক কষতে বসেছিল। বাবা এসে দাবড়ানি দিতে তবে চাদরচাপা দিয়ে শুয়েছে। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। শীত-শীত করছে। খানিক আগে মা আদা-তেজপাতা-লবঙ্গ দিয়ে চা করে দিয়ে গিয়েছিল। শিউলি খেয়েছে। খাটের ওপর তার পাশে বাবু হয়ে বসে মাসকাবারির হিসেব করছে বাবা। শিউলি ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, "বাবা, মাধ্যমিকের পর কী নোব?"

অতনু মুদিখানার লিস্ট করতে করতেই বললেন, "তোর যা ইচ্ছে তাইই নিবি।"

"আর্টস? বাংলা, ইংরিজি, ইতিহাস আমার ভাল্লাগে।"

"তাই নিস।"

"আর সায়েন্স?"

"তাও নিতে পারিস।"

"সায়েন্স থেকেই তো ডাক্তার হওয়া যায়, তাই না?"

"হ্যাঁ, তা হওয়া যায় বটে।"

শিউলি বাবার দিকে পাশ ফিরে শুল।

"বাবা? দাদু ডাক্তার ছিল না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেন হলে না? তোমারও তো ইচ্ছে ছিল..."

অতনু হিসেব করতে করতে থমকালেন। কাষ্ঠ হেসে শিউলির দিকে ফিরে বললেন, "সবার কি আর সব হয় রে? বাবা চলে যেতে আমরা একটু অভাবে পড়লুম। বাবা বিনা পয়সাতেই বেশীরভাগ রোগী

দেখত। কোনদিনও কারও থেকে জোর করে একটা পয়সাও চায়নি যে বৌ-ছেলে-মেয়ের জন্য জমিয়ে যেতে পারবে। তবে স্রেফ টাকাকড়ির টানাটানিকেও দোষ দোব না। আমার নিজেরও গাফিলতি ছিল। কুসঙ্গে পড়েছিলুম। ফাঁকিও মেরেছিলুম।"

"তুমি তো ডাক্তারির অনেককিছু জানো তাই না? দাদু তো সব শিখিয়েছিল... রোগনির্ণয়, ওষুধ, ছোটখাটো অপারেশন, সেলাই... তুমিই তো বলেছ।"

"হ্যাঁ, তা জানি বটে। বাবা হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখিয়েছিল, তবে শুধু তা দিয়ে তো আর হয় না; ডিগ্রিটা খুবই দরকারি জিনিস।"

শিউলি চুপ করল। অতনু আবার হিসেবে মন দিলেন। এই মাসটা মনে হচ্ছে একটু টানাটানিতে যাবে। ইলেকট্রিক বিলটাও বড় বেশী এসেছে।

একটু পর শিউলি আবার ডাকল।

"বাবা?"

"আবার কী হল রে? তুই ঘুমুবি না?"

"তুমি পারমিতার বাড়ি গিয়েছিলে? মা বলল।"

একটু চুপ করে থেকে অতনু বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমার ত্রিকোণমিতি সব কষা হয়ে গেছে। আবার গেলে খাতাটা নিয়ে যেও।"

"ঠিক আছে। দিয়ে দিস, আমি কালই দিয়ে আসব।"

"ও জানো তো খাটের তলায় থাকে। ওটাই ওর পড়ার ঘর। বৃষ্টিতে জল উঠে গতবছর বইখাতা সব ভিজে গিয়েছিল। ও ইস্কুল থেকে ফিরে দেখে ওর বিছানা, বই-খাতা সব জলের নীচে।"

"হুঁ। দেখলাম।"

"কী কষ্ট না ওদের?"

"ওদের জন্য কিছু করতে পারবি বাবু? মানে শুধু পারমিতার জন্য না। ওদের মত কষ্ট যাদের তাদের সবার জন্যই। পারবি?"

"কীভাবে?"

"তার জন্য ভালো করে পড়াশোনা শিখতে হবে বাবু। দেখবি সব রাস্তা চোখের সামনে স্পষ্ট। তখন আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। তুই নিজেই বুঝে যাবি কীভাবে কী করতে হবে।"

শিউলি উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসে বলল, "পড়তে বসব। ইংলিশের ক'টা লেখা বাকি আছে।"

অতনু ধমক দিয়ে বললেন, "এখন শো, শুয়ে থাক চুপচাপ। শরীরটা বড্ড খারাপ আজ। শো।"

শিউলি ব্যাজার মুখে আবার ধপ করে শুয়ে পড়তেই টিভির পাশে

রাখা অতনুর মোবাইলটা বেজে উঠল। অতনু তাড়াতাড়ি গিয়ে কানে দিলেন।

"হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা স্যার। এক্ষুনি স্যার। না না, দেরি করব না। এখনই আসছি।"

"কোথায় যাবে বাবা?"

"একটু কাজ পড়েছে মা। তুই ঘুমো।"

অতনুর মুখ থমথমে।

পুরনো রেললাইনটা যেখানে গুপী পালের ইঁটভাটার দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে এত রাত্তিরেও মেলা লোক জড়ো হয়েছে। জনবসতি কাছাকাছি খুব একটা নেই। তবে খবর চাউর হতে ছেলেবুড়ো সব এদিক ওদিক থেকে এসে জুটেছে। জায়গাটা পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। ফরেন্সিক বিভাগ থেকে লোক এসেছে। একজন ঝোপের ধারে উবু হয়ে বসে কী যেন খুঁটছে। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। মন্ডল আর চক্রবর্তী ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে।

ওসি প্রবীর সাহা দরদর করে ঘামছেন আর হাত-পা নেড়ে ফোনে কাকে কী একটা প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। 'ভোরের সূর্য'র এক তরুণ সাংবাদিক ব্যারিকেড ভেঙে ফাঁকতালে ঢুকে এসেছিল বটে; তবে তাকে রদ্দা মারতে মারতে বের করে দেওয়া হয়েছে। তার ফোনটাও মন্ডল কেড়ে নিয়েছে।

খানিকটা দূরে একটা ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে খৈনি ডলছিল হেড কনস্টেবল কেষ্ট আর সিভিক পুলিশ বাবু।

বাবু জিজ্ঞেস করল, "কখন সব মিটবে বলো দিকিনি? বাড়ি যেতুম। মা আজ খিচুড়ি করেছিল। ঠান্ডা হয়ে গেলেই সব মাটি।"

কেষ্ট হাই তুলতে তুলতে বলল, "কী জানি মারা। কুত্তার লাইফ। তাও যদি বুঝতুম লাশটাশ পাওয়া গেছে। শালা মোটে একটা আঙুল।"

"আঙটিটাই তো আসল। আঙটিতে তো আবার 'আর' লেখা - রায়ান। হয়ে গেল। খেলা এখনও বাকি আছে বুজলে? এ কেস এন্তার ভোগাবে মনে হচ্ছে।"

"একবার একটা বই দেখেছিলুম বুজলি? মোহিনী হলে। কী যেন নামটা। মুম্বইয়ের গ্যাং ওয়ার নিয়ে। এরা একটা লাশ ফেলে তো ওরা একটা... উফ! সে কী খুনোখুনি! কী যেন নাম! ধুত্তোর!"

"এস্কোর তাহলে এখন এক-এক, তাই তো? পঞ্চাননের ভাই, বিল্টুর ছেলে।"

"দাঁড়া আগে লাশটা পাওয়া যাক।"

"আর লাশ... আঙুল তো পেয়েছে। ওতেই হবে। কাটকে টুকরে টুকরে করকে ছড়া দিয়া। একটা টুকরো পাওয়া গেছে, বাকিগুলো পেতেও আর দেরি নেই।"

"একে বলে রিভেঞ্জ কিলিং বুঝলি?" কেষ্ট ঠোঁটের তলায় খৈনি গুঁজে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "পঞ্চাননের ভাইকে মেরে গায়ে ঘুড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল মনে আছে? এদিকে বিল্টুর ব্যাটার আঙুলে ঘুড়ি বেঁধে দিয়েছে।"

বাবু গদগদ হয়ে বলল, "ওহ্! পুরু সিনিমা। হ্যাঁগো কেষ্টদা, রায়ান মানে কী গো?"

"ভগবান জানে কী।"

ওদিকে হঠাৎ একটা গোলমাল বাঁধল। গোটাচারেক চারচাকা আর অনেকগুলো বাইক এসে থেমেছে।

"গাঁড় মেরেছে। বিল্টু দাস রে।"

"ও কেষ্টদা, আমার বড্ড ভয় করচে। আটকালে বিল্টুর ছেলেরা ক্যালাবে..."

"আর না আটকালে ওসি চাকরি খাবে। ঘাবড়াসনি, চল চল..."

বিল্টুর ছেলেরা ব্যারিকেড ভেঙে গার্ডদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিতে বিল্টু এসে দাঁড়াল ওসির সামনে। দু'চোখ টকটকে লাল। ওসি ভয়েতে বেঁকে গেছেন। বিল্টু হাতের চেটো চিত করে বাড়িয়ে দিল।

"আঙুলটা।"

"ও-ওটা দেওয়া যাবে না বিল্টুবাবু। অফিসিয়াল রেকর্ড।"

দাঁতে দাঁত ঘষে ওসির কলার চেপে ধরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকার গাড়ির গায়ে তাকে সেঁটে ধরে বিল্টু দাস বলল, "শালা শুয়োরের বাচ্চা! আমার ছেলের আঙুল কেটে তাতে সুতো দিয়ে ঘুড়ি বেঁধে দিচ্ছে আর তুই আমাকে অফিসিয়াল দেখাচ্ছিস? সবক'টাকে কুপিয়ে রেখে যাব এখানেই..."

মন্ডল আর চক্রবর্তী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিল্টুদাসের ছেলেদের হাতে সোর্ড, রড, মেশিন। বিল্টুর পেছনেই তার ডান হাত শ্যামা।

ওসি প্রবীর সাহার সারা শরীর কাঁপছে। তাও হাত স্থির রেখে বিল্টু দাসের দু'পায়ের ফাঁকে রিভলভারটা ঠেকিয়ে যথাসম্ভব ঠান্ডা গলায় বললেন, "কলারটা ছেড়ে দিন বিল্টুবাবু। অন ডিউটি অফিসারকে অ্যাসল্ট করাটা মনে হয় ঠিক হবে না।"

অস্থানে রিভলভারের অপ্রত্যাশিত খোঁচায় হকচকিয়ে বিল্টু দাস কলার ছেড়ে পিছু হটল। ওসি রিভলভারটা বাগিয়ে রেখেই ঠোঁটে অতিকষ্টে একটা শুকনো হাসি ঝুলিয়ে চাপা গলায় বললেন, "চেষ্টা তো

করছি বলুন। আপনি যান, বিশ্রাম নিন গিয়ে বরং। আমি কথা দিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়িই পঞ্চানন হালদারকে আমরা তুলব।"

রক্ত জল করা দৃষ্টিতে ওসিকে একবার আপাদমস্তক মেপে নিয়ে বিল্টু দাস বলল, "শ্যামা, চল।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে আর একবার ঘুরে তাকিয়ে বিল্টু দাস বলল, "চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম। চব্বিশ ঘন্টা।"

গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে যেতে মন্ডল দৌড়ে এল ওসির কাছে।

"স্যার? ঠিক আছেন তো স্যার?"

ওসি ক্লান্তভাবে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হোলস্টারে রিভলভারটা পুরতে গিয়ে একবার ফসকালেন। দু'বারের বার পুরে বললেন, "বুকটা বড় ধড়ফড় করছে মন্ডল। একটু চিনচিনে ব্যথাও বোধহয় টের পাচ্ছি।"

অতনু তার সর্বক্ষণের সঙ্গী কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে চেইনটা খুলতে খুলতে বললেন, "একটা সর্বিট্রেট দিচ্ছি স্যার। জিভের তলায় রাখুন।"

(৮)

বৌয়ের এই উঠতে বসতে ঝ্যাঁটা-জুতো মারা আজকাল আর মোটে সহ্য হয় না কালীর। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখনও তেজ কমেনি মাগীর। উঠতে বসতে মুখ ঝামটা। কমবয়সে বাপ-মা তুলে খিস্তি পাড়লে খুব খচে যেত কালী। লাঠালাঠি বাঁধাত। এখন মোটে রাগ হয় না তার। চোখের সাথে সাথে স্মৃতিতেও ছানি পড়েছে বোধহয়। বাপের ভারী গলাটা ছেঁড়া ছেঁড়া মনে পড়ে এখনও। মায়ের মুখ আবছা। হবে না? সে নিজেই এখন দাদু। বড়কার ঘরে একটা। ছোটকার ঘরে দু'টো। সারাদিন ভ্যান টেনে ঘরে ফিরে উঠোনে বসে যে দু'দন্ড জিরুবে, নাতি-নাতনিদের নিয়ে যে একটু আহ্লাদ করবে তার জো নেই। ভ্যানটা পেঁপেগাছের গোড়ায় রেখে পাতকোতলা পেরুলেই বৌয়ের খিস্তি ফোয়ারা চালু। বয়স যখন কম ছিল তখন কালী তার রাগের কারণ বোঝার চেষ্টা করত। বহুবছর সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই এখন ভ্যানটা রেখেই বগলে পুরনো রেডিওটা, একটা ঠোঙায় খানিকটা মুড়ি আর একটা জলের বোতল নিয়ে কালী চলে আসে পশ্চিমপাড়ার পুকুরধারে। এই পুকুরে কোন ঘাট নেই। চাদ্দিকে কচুবন। তার মাঝেই সাফসুতরো দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সে। সেখেনে বসে বসে বিড়ি খেতে খেতে ছিপ ফেলে মাছ ধরে কালী। মাছ ধরাটা অবশ্য উপলক্ষমাত্র; এখেনে এলে বড় শান্তি পায় সে। কাঁচা বয়সে কালী ছিল

হল্লাবাজ। মদ, মেয়েমানুষ, ইয়ারদোস্ত, ফূর্তি এসব নিয়েই দিন কাটত। বাসস্ট্যান্ডের বিশ্বকর্মাপুজোয় মাল খেয়ে বচ্চনের গানে সে যা নাচত তা দেখার জন্য আশেপাশে ভিড় জমে যেত। বয়স হতে এসব আর ভাল্লাগে না তার। নারকেল গাছের মাথায় চাঁদ ওঠে। খানিকদূরে বাঁশের পোলের ওপর দিয়ে মাঝেসাঝে কেউ সাইকেল চাগিয়ে সার্কাস দেখাতে দেখাতে পার হয়। বড় বড় মাছ ঘাই মারে পুকুরের জলে। ঝিঁঝিঁর ডাকে ঝিমুনি আসে তার। মাঝেমধ্যে লায়লন্টিকা, তেলাপিয়া দু-একটা যে ওঠে না তা নয়; তবে সে বঁড়শি থেকে আলগা করে নিয়ে তাদের আবার পুকুরে ছেড়ে দেয়। এত রাত্তিরে ঘরে মাছ নিয়ে গেলে বড়কার মা চেল্লে পাড়া মাথায় করবে।

আজকে বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। মুষলধারে না হলেও সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হয়েছে। একটা চ্যাটালো পাথরে বসেছে কালী। ছিপ জলে। চোখ ফাতনায়। কান রেডিওতে। ফাতনার সাদা কাঠিটা তিরতিরিয়ে কাঁপছে।

"ইয়েএএএএএ লাল রঙ... কব মুঝে ছোড়েগা..."

কালী মাথা নেড়ে বলল, "আহা!"

পুকুরের পশ্চিমপাড় বরাবর খানিকটা এগিয়ে গেলে উলুবনের আড়ালে, পিপুলগাছের নীচে একটা ভাঙা বাড়ি আছে। কবেকার কে জানে। ক'দিন হল কালী ওখানে আলো দেখেছে। ব্যাটারির সাদাটে আলো। বেশীক্ষণের জন্য জ্বলে না। খুব অল্প সময়ের জন্যই জ্বলে উঠে ফের নিভে যায়। আলোর মালিক যেন কিপটে। টিপেটুপে খরচ করে। আলোর দরকারটুকু মিটে গেলেই অন্ধকার। কালী অত মাথা মারে না। বাঁশঝাড়, ক্ষেতখামার, ভাঙা বাড়িতে মেলা লোকের আনাগোনা। কেউ চুরির মাল মেলায়, কেউ মদ খায়, কেউ গ্যাঁজায় দম দেয়, কেউ আবার মেয়েছেলে এনে মাদুর পাতে। অমনই কেউ হবে হয়তো। আজও খানিক আগে আলোটা জ্বলেছিল। আবার নিভেও গেছে। কুকুরগুলো বড্ড ঝাউঝাউ করছে - কী জ্বালা।

"না তো ইঁয়াহা অমৃত মিলে... পিনে কো না জহের..."

কালী আমেজে চোখ বুজে সবে বলতে যাবে "কিশোর কুমার তুমি ভগবান", এমন সময় পাশের কচুবন ভেঙে কে একটা হুড়মুড়িয়ে তার ঘাড়ে এসে পড়ল। ছিপ গেল জলে, কালী কাদায়, চাদ্দিকে মুড়িফুড়ি ছড়িয়ে ছিটিমে একদম একাক্কার। রেডিওটা কাদায় কাত হয়ে পড়েও বেজে চলেছে, "এবার আপনারা শুনবেন..."

"ধর শুয়ারের বাচ্চাকে ধর..."

"থাম খান..."

চারিদিকে বুটের আওয়াজ। টর্চের জোরালো আলোর বিম এদিক-ওদিক হচ্ছে। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে অনেকে। কে একটা দড়াম করে আছাড় খেল।

কালীর ওপর যে ছেলেটা এসে পড়েছিল সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আর একবার আছাড় খেল। তার গোড়ালিতে লেগে রেডিওটা আরও খানিকটা জলের দিকে হড়কে নেমে গেল। বুড়ো কালী জন্টি রোডসের মত ঝাঁপ মেরে বুকে জড়িয়ে ধরল রেডিওটাকে। কনুইটা কিসে যেন খুব জোর ঠুকে গেল।

রেডিওটার জান খুব কড়া। সে এখনও বেজে চলেছে।

"আ যা রে মেরে সাথ। ইয়েহ জাগে জাগে রাত..."

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ছোটার চেষ্টা করতেই সামনের ঝোপ থেকে কে একটা বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দু'জনেই জড়ামড়ি করতে করতে কচুবনে ঢুকে গেল। কে একটা চ্যাঁচাল, "ধর শালাকে। ছাড়বি না।"

"পুকারে তুঝে সুন..."

"এই শুয়োরের বাচ্চা... এই গুম্মারা..."

কচুবন থেকে হাঁচোড়পাঁচোড় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা। সে উঠে দাঁড়ানোর উপক্রম করতেই এসে হাজির আরও একজন। সামনে পড়ে থাকা একটা আধলা নিয়ে ছেলেটা নীচ থেকে সামনের লোকটার থুতনি বরাবর চালাল।

ফ্যাটাক্ করে একটা আওয়াজ হতেই "ওরেব্বাপরে!" বলে মাটি নিল লোকটা।

কালী বুকে রেডিও আঁকড়ে কাদায় চিত হয়ে শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ঝাড়পিট দেখছে।

"আ যা রে মেরে সাথ। ইয়েহ জাগে জাগে রাত।"

কচুবন থেকে বেরিয়ে আসা একটা হোঁৎকাকে ধাক্কা মেরে চালকুমড়োর মত পুকুরে গড়িয়ে দিল ছেলেটা। অন্য একজনের ভুঁড়িতে লাথি মেরে ছিটকে দিল সে।

"পুকারে তুঝে সুন। সুনাদে উয়োহি ধুন।"

শেষরক্ষা হল না। ঝোপঝাড় ভেঙে আরও তিন-চারজন ঝুপঝুপ করে বেরিয়ে এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ধস্তাধস্তি চলছে প্রবল। যত বাঘা জোয়ানই হোক, জনা চারেকের সাথে পেরে ওঠা তো আর সহজ না।

ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। মুখে টর্চের জোরালো আলো পড়তে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। মন্ডলের গলা শোনা গেল, "বেকার অত দৌড়ঝাঁপ করাতে

গেলি কাশী। ভালো ছেলের মত চলে এলেই ঝামেলা মিটে যেত। এই ভোগান্তির জন্য কী ক্যালানি যে তোর কপালে নাচছে তা তুই জানিস না রে।"

কাশীর ঠোঁটে রক্ত। মুখময় কাদা। জ্বলজ্বলে চোখে সে চেয়ে আছে টর্চের আলোর দিকে। আলোর আড়ালে মন্ডল। কাশীর চোখে ঘেন্না।

মন্ডল বলল, "ভালোই ছিলি। মরা দাদার বৌয়ের দুধ দুইছিলি বেশ। ফালতু ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে কী লাভ হল বল? এবার বৃষ্টির কী হবে? তবে চিন্তা করিসনি। আমার নাম্বারটা ওকে দিয়ে এসেছি। দুধও দুইব, আবার গু..."

কাশী দাঁতে দাঁত চিপে বলল, "শালা মাদার..."

মন্ডল ঘিপ্ করে কাশীর তলপেটে একটা ঘুঁষি মারল। যন্ত্রণায় গুটিয়ে গেল সে। বাকিরা টানতে টানতে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

কাদার ওপর মাথা নীচু করে থুতনিতে হাত চেপে বসেছিলেন অতনু। মন্ডল সেদিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "কী হল আবার? এটা আবার কী নতুন ভঙ ধরলেন?"

অতনু বিড়বিড় করে বললেন, "ফেটেছে।"

মন্ডল বলল, "কী? গাঁড় তো? হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। অপারেশনে আসার জন্য একেবারে বাচ্ছা ছেলের মত ঝুলোঝুলি করলেন। এসেই স্ট্রেট ক্যালানি খেয়ে গেলেন। সত্যি মাইরি! এখন কি উঠবেন নাকি লাল ওষুধ, বোরোলিন, চুষিকাঠি এসব এনে দোব?"

অতনু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বের করতে করতে বললেন, "না না, ঠিক আছে। আমি সেলাই করে নোব। সেল্ফ-সার্জারিও তো মোটামুটি পারি। চশমাটা ভাঙেনি, খুব জোর বেঁচে গেছি।"

মন্ডল গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে গজগজ করে বলল, "হ্যাঁ, আপনি তো আবার বিধান রায়ের বাবা। শালা বোকা..."

অতনু থুতনিতে রুমাল চেপে মন্ডলের পিছু নিল।

তখনও হাঁ করে জলকাদায় শুয়ে আছে বুড়ো কালী।

বুকে জড়ানো রেডিওটার জান হেবি কড়া; সে তখনও গেয়ে চলেছে -

"জিমি জিমি জিমি। আ যা, আ যা, আ যা... জিমি জিমি জিমি। আ যা, আ যা, আ যা..."

(৯)

কারখানা ঘর থেকে বেরিয়ে ঘড়ঘড় করে শাটারটা টেনে নামালেন অতনু। নীচু হয়ে দু'টো তালা মারলেন। মহালয়া আসছে। তাদের

মফস্বলে এখন থেকেই ভোরের দিকটায় বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগে। অতনু একটু শীতকাতুরে মানুষ। গায়ে উলিকটের ফুলহাতা গেঞ্জি চড়িয়েছেন তিনি। থুতনিতে ব্যান্ডেজ। সেলাই পড়েছে - নিজেই করেছেন। উঠোন ভিজে। ভোররাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। এক হাতে লুঙ্গি সামলে, অন্য হাতে চাবির গোছাটা ঝুলিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে উঠোন পেরুলেন তিনি। উঠোনটা হড়কা হয়েছে। সামনের সপ্তাহে একদিন ছুটি নিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা তুলতে হবে। শিউলির মা'কে বললে এইটুকু কাজের জন্য সে আবার খানকদুয়েক ঝি ডেকে আনবে। ফালতু খরচ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে অতনু দেখলেন দোতলার বারান্দার গ্রিল ধরে শিউলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে কী যেন দেখছে। অতনু বললেন, "কিরে? এত ভোরে উঠে পড়লি যে!"

শিউলি বাবার দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল, "হিসি করতে উঠেছিলাম।"

অতনু পাশের ঘরে ঢুকে চাবির গোছাটা তার ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে সেটা নিজের পিঠের ব্যাগে একটা চশমার খাপে পুরে রাখলেন। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন শিউলি তখনও দাঁড়িয়ে।

"এই! সবে পৌনে পাঁচটা বাজে। শুগে যা। আমি সাতটা নাগাদ ডাকছি। পড়তে বসবি। দাঁড়াসনি মা এখানে। সবে জ্বর থেকে উঠেছিস। আবার ঠান্ডা লেগে যাবে।"

শিউলি গ্রিলে কপালটা ঠেকিয়ে রেখেই বলল, "ওরা কারা বাবা?"

থুতনির ব্যথায় দাঁতে ব্রাশ দিতে পারছেন না অতনু। ডানহাতের তর্জনীতে মাজন লাগাতে লাগাতেই বললেন, "ওরা কারা?"

"ওই যো। পাপাইদের পাঁচিলের আড়ালে।"

অতনু গ্রিলের কাছে সরে এলেন। খানিকটা দূরেই ঘোষদের একটা পুরনো বড় বাড়ি রয়েছে। ঘোষরা এখন আর থাকে না। ভাড়া দিয়ে তারা কলকাতা চলে গেছে আজ প্রায় বছর দশেক হল। ঘোষদের মেজছেলে শুভ্র অতনুর ছেলেবেলার বন্ধুন সেও এখন কলকাতায় থাকে। বাড়িটায় শেষ বছরখানেক কোন ভাড়াটেও ছিল না। ইদানীং অবশ্য মাঝেমধ্যে দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যায়। ছাদে গামছা টামছাও মেলা থাকে প্রায়ই। ওই বাড়ির গায়েই পাপাইদের পাঁচিল। সেই পাঁচিলের আড়ালে ঘাপটি মেরে এদিকে পেছন ফিরে বসে রয়েছে দু'জন। চক্রবর্তীর চেক শার্ট চিনতে অতনুর ভুল হল না। অতনু খানিকটা মাথা হেলিয়ে দেখলেন রক্ষাকালীর বেদীর আড়ালেও কার একটা সবুজ জামা দেখা যাচ্ছে। অতনু বুঝলেন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও অনেকেই আছে।

কাশী তবে কোঁৎকানি খেয়ে মুখ খুলেছে। পঞ্চানন হালদারের খোঁজ মিলেছে। অতনু ফোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁরই পাড়ায় পঞ্চানন হালদার লুকিয়ে। তাঁরই দু'টো বাড়ি পরে অপারেশন। অথচ তাঁকেই ব্যাটারা জানায়নি। তিনি লুঙ্গি পরে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছেন। যাকগে, এমনিতেও থুতনিতে বিষ ব্যথা। শিউলিকে বললেন, "এই, শুগে যা।"

শিউলি অনড়। অতনু শিউলিকে ঠেলতে ঠেলতে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে হুড়কোটা টেনে দিলেন। কী দরকার বাবা? একটু বাদেই হুড়ো খেয়ে যখন পঞ্চানন বেরুবে তখন গুলি টুলি ছুঁড়লেও ছুঁড়তে পারে। তিনি আর একবার উঁকি মেরে দেখলেন ঘোষদের পাঁচিল টপকাল থানার দুই ইয়ং অফিসার। অতনু আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়খানায় ঢুকলেন।

একটু কষে গিয়েছিল। কোঁৎ পেড়ে কায়দা করে নামাতে বেশ খানিক্ষণ সময় লাগল। হেগে টেগে বেরিয়ে অতনু দেখলেন শিউলির মা আর শিউলি বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ একটা গোলমালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতনু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এত সকালেও প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। পুলিশে পুলিশে তাদের গলি ছয়লাপ। ওসিকে দেখতে পেলেন অতনু। হাত-পা নেড়ে খুব ওস্তাদি করে 'ভোরের সূর্য'র ক্যামেরার সামনে কীসব লেকচার দিচ্ছেন। ঘোষদের বাড়ি থেকে মুখ ঢাকা তিনটে লোককে ঘাড় ধরে পরপর বের করে নিয়ে আসা হল। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা লম্বা সিড়িঙ্গে, খালি গায়ে একটা মুষকো আর একটার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, বড় ভুঁড়ি। মাথায় গামছা মুড়ি দেওয়া ভুঁড়িওয়ালাটা পঞ্চানন; অতনুর বুঝতে ভুল হল না। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়েই পুলিশ ভিড় ঠেলে ঠেলে তিনজনকে বের করে নিয়ে গেল। বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অতনুদের গলি সরু। গাড়ি ঢোকে না। লোকজন হইহই করতে করতে তাদের পেছনে পেছনে ছুটল।

কড়কড় করে আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ল একটা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অতনু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে ছুটলেন। সদর দরজাটা খুলেই দেখলেন ওসি মাথায় একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন। কোথায় দাঁড়াবেন ঠাহর করতে পারছেন না। অতনু হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, "স্যার? ও স্যার?"

অতনুকে দেখে ওসি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। বৃষ্টি ততক্ষণে ভালোই বেগ নিয়েছে।

"আসুন স্যার, আসুন।"

"আরে, অতনু যে! তোমার বাড়ি নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার। ভেতরে আসুন স্যার। জুতো খুলতে হবে না।"

ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি করে ওসিকে একটা শুকনো গামছা এগিয়ে দিয়েই অতনু হাঁক পাড়লেন, "ওগো, এদিকে এসো শিগগিরি। কে এসেছেন দেখো।"

শিউলির মা বেরিয়ে এসে ওসিকে দেখে তাড়াতাড়ি করে গায়ে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে বলল, "তুমি ওঁকে বসাও। আমি চা করে আনছি।"

ওসি মাথা মুছতে মুছতে বললেন, "লিকার, হ্যাঁ দিদিভাই? দুধ ছাড়া, চিনি কম।"

ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। অতনুদের বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে গরম চায়ে চুমুক দিলেন ওসি।

"আহ্!"

"স্যার? পঞ্চানন হালদার আমার ঠিক দু'টো বাড়ি পরেই লুকিয়ে ছিল বলুন? আমি টেরও পাইনি।"

"টের পাওয়ার জন্য চোখকান খোলা রাখতে হয় অতনু।"

অতনু আমতা আমতা করে বললেন, "আমি তো আসলে জানতুম না। আর বাড়িতে থাকিই বা কতক্ষণ? ডিউটিতেই তো বেশী..."

কড়মড় করে একটা খাস্তা বিস্কুটে কামড় বসিয়ে ওসি বললেন, "তোমার মধ্যে ওই জিনিসটা নেই অতনু। মেনে নাও। এতে লজ্জার কিছু নেই। সবার তো আর সব হয় না।"

পাশের ঘরের খোলা দরজার পর্দার পেছনে শিউলি দাঁড়িয়ে। শুনছে। পরপর দু'দিন দু'টো ভাইটাল অপারেশন সাকসেসফুলি সেরে ওসির মেজাজ আজ বেশ প্রফুল্ল।

বিস্কুটটা গিলে নিয়ে চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "তবে তুমি লোক ভাল। দেখো, ফোর্স তো আর শুধু মারামারি, দৌড়োদৌড়ি, তদন্ত করার লোক নিয়ে চলে না; তোমাদের মত আরও পাঁচটা ছোটখাটো কাজের লোকও লাগে। সব নিয়েই তো তবে আমরা ইয়ে... কি তাই তো?"

অতনু সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

"তোমার থুতনি কেমন আছে?"

"ব্যথা আছে।"

"সে তো থাকবেই। দু'দিনও পুরোপুরি কাটেনি। যাকগে, বৃষ্টি ধরছে। এবার উঠব।"

"স্যার? বিল্টুবাবুর ছেলেকে পাওয়া গেল?"

"যায়নি তবে যাবে। মাথাগুলোকে তো তুলে ফেলেছি। গতকাল

সারারাত থার্ড ডিগ্রি দিতে তবে কাশী আজ ভোররাতে পঞ্চাননের খোঁজ দিল। সাথে সাথে আমরা ঘিরে ফেললুম। তবে রায়ানের ব্যাপারটা নিয়ে যা বলল তা আমার বিশ্বাস হয়নি। দেখি পঞ্চাননকে জেরা করে। খুব বেশীক্ষণ পঞ্চাকে রাখতে পারব কি না জানি না। এদের পলিটিকাল রিচ তো লম্বা। দেখা যাক।"

"কেন স্যার? রায়ান দাসের ব্যাপারটা নিয়ে কাশী কী বলল?"

"সেদিন খালপোলে ধারে রায়ানকে মাল খাওয়াবে বলে কাশীই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাননের হাতে কাশীই রায়ানকে তুলে দেয়। তাকে নিয়ে সোজা এসে ওঠে এই বাড়িতে। পঞ্চাননের প্ল্যান ছিল এখানে রায়ানকে টর্চার করে মার্ডার করবে আর তার ভিডিও বিল্টু দাসকে পাঠাবে। ভাইয়ের খুনের রিভেঞ্জ, বুঝলে তো?"

অতনু চোখ গোলগোল করে বলল, "তাহলে স্যার? বডি কি এখানে পেলেন? না জ্যান্ত পেলেন?"

ওসি হতাশ কণ্ঠে বললেন, "না না, ধুর। এখানেই তো গেঁড়িটা গুলিয়েছে। কাশী বলেছে যে রায়ানকে তারা এই বাড়িতে তুলে নিয়ে আসার দিন রাতেই রায়ান আবার মিসিং হয়। কাশী ছিল না। রায়ানকে এদের হাতে তুলে দিয়ে কেটে পড়েছিল। সে পরে জানতে পারে। পঞ্চানন আর তার দু'টো লোক ছিল। তারা রায়ানকে হাত-পা-মুখ বেঁধে একতলার একটা ঘরে ফেলে রেখেছিল। ভোররাতে চেক করতে গিয়ে দেখে সে হাওয়া।"

"অ্যাঁ? কীভাবে?"

"ঘরটায় ওরা তালা মেরে রেখেছিল। রাত্তির বারোটাতেও শেষ এসে দেখে গিয়েছিল। সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ আবার এসে দেখে দরজা হাট করে খোলা। রায়ান নেই।"

অতনু হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

"বন্ধ করো। মুখে মাছি ঢুকে যাবে।"

প্যান্ট থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে ওসি উঠে দাঁড়ালেন। অতনু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

"এইযো স্যার। এদিকে বেসিনটা।"

প্রবীর সাহা হাত ধুতে ধুতে বললেন, "কাশী আর পঞ্চাননের বক্তব্য কাটা আঙুল বা তাতে বাঁধা ঘুড়ির ব্যাপারে তারা কিচ্ছুটি জানে না। রায়ানকে তারা শেষ যখন দেখেছে তখন সে অক্ষতই ছিল।"

শিউলির মা দরজার পাশ থেকে বলল, "স্যারকে একবার বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালে না?"

ওসি রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, "পরে হবে'খন দিদিভাই।

এখন থানায় ফিরে অনেক কাজ। মিডিয়া আসবে, বিল্টু দাস আসবে। ওপরতলা থেকে হাজার খানেক ফোন আসবে। আজ চলি।"

"পর্দার আড়ালে শিউলিকে দেখে বললেন, "কী মা? লেখাপড়া করো?"

শিউলি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওসি বললেন, "বেশ বড় বাড়ি। কড়ি-বরগা। অনেক পুরনো না?"

"হ্যাঁ স্যার, একশো বছরের ওপর। দাদুর তৈরি। আগে জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। এখন তো আর..."

বিশাল বিবর্ণ উঠোনের ওপারে জংধরা শাটার নামানো একটা একানে ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ওসি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি গ্যারাজ নাকি? অতনু আবার গাড়ি ফাড়ি কিনলে নাকি?"

অতনু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, "কী যে বলেন স্যার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আমার আবার গাড়ি! ওটা পুরনো কারখানাঘর। আমার ছোটকাকার লোহার ব্যবসা ছিল। কাকা মারা যেতে বন্ধই পড়ে থাকে। যত রাজ্যের জঞ্জাল ডাঁই করা আছে। গাড়ি... হাহাহাহা! স্যার বড্ড মজা করেন..."

ওসি দরজা পেরিয়ে গলিতে পা রেখে খোশমেজাজে বললেন, "মজা ছাড়া আর জীবনে আছেটা কী বলো? আমি এগোলাম। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে এসো। আজ খুব চাপ যাবে।"

অতনু দরজাটা পেছনে টেনে দিয়ে বললেন, "চলুন স্যার, বড়রাস্তা অবধি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

(১০)

সবে পাঁচটা বেজেছে। রেডিওতে তেড়ে মহিষাসুরমর্দিনী চালিয়েছে কালী। একটা তর্পণপার্টির বুকিং ছিল। অনেক ভোরেই ভ্যান নিয়ে বেরিয়েছে সে। কিছুক্ষণ আগেই মনসাতলা স্টেশনে তাদের নামিয়ে দিয়ে এসে বড় রাস্তার ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের পাশের চায়ের গুমটিটার সামনে দাঁড়িয়েছে সে। সবে কাক-টাক ডাকছে। একটা বিহারী বৌ একহাত ঘোমটা টেনে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে গুটিকয় লোকজন। চায়ের দোকানেও রেডিও চলছে। সরু গোঁফওয়ালা একটা চিমড়েমত ছেলে খ্যাঁক করে উঠে কালীকে বলল, "ওহ্! একটা তো চলছে। আপনারটা বন্ধ করুন না। ক'টা শুনব?"

দোকানদারও চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, "ও কালীদা, তোমারটা বন্ধ করো। দু'টোর সাউন্ড একসাথে জইড়ে যাচ্ছে।"

কালী ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বলল, "তোরটা চায়না মালটা বন্ধ কর। আমারটা চল্লিশ বছরের রেডিও। এখনও যা স্যাউন্ড..."

গার্ডার দিয়ে মোড়া একটা খবরের কাগজ চায়ের দোকানের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে হুশ করে একটা সাইকেল বেরিয়ে গেল।

চিমড়ে ছেলেটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে গার্ডারটা খুলল। 'ভোরের সূর্য'তে চোখ রাখল সে। খানিক্ষণ সেটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ছেলেটা বলল, "ধুস! কেসটা পুরু ধামাচাপা পড়ে গেল। স্রেফ পাঁচের পাতার তলার কোণে ছ'লাইনের একটা খবর। বাকি সব আলবাল জিনিসে ভর্তি।"

"কী লিকেচে?" দোকানীর উৎসুক জিজ্ঞাসা।

"জামিন পেলেন রায়ান দাস অপহরণ কান্ডের মূল অভিযুক্ত পঞ্চানন হালদার। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে আটক করার জন্য আদালতে পুলিশকে কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। গতকাল পঞ্চানন হালদার জামিন পাওয়ার পরেই 'এআইডিপি'র জেলা সভাপতি ঘোষণা করেন এবারের নির্বাচনে ছোটগড় থেকে বিল্টু দাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পঞ্চানন হালদার। ভোরের সূর্যকে পঞ্চানন জানান যে তিনি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছেন, তবে তাঁর বিশ্বাস মানুষ তাঁর পাশে আছে। রায়ান দাস এখনও নিখোঁজ। ছোটগড় থানার ওসি প্রবীর দাস ভোরের সূর্যকে জানিয়েছেন রায়ানের খোঁজ চলছে।"

"ও আর পাওয়া যাবেনে। বিল্টু পঞ্চার ভাইকে মেরেছিল। হল কিছু? পুলিশ কিছু করতে পারল? পঞ্চাই শালা বিল্টুর ছেলেকে মার্ডার করে কোথায় গাপ করে দিয়েছে। একেও কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। কী অতনুদা? ভুল বললাম?"

অতনু বসে বসে শুনছিলেন। খুবই দুঃখের সাথে ঘাড় নেড়ে বললেন, "ঠিকই বলেছ ভাই। ভুল কই? তবে আমাকে অফিসে এসব নিয়ে কেউ কিছু বলে না। আমি ছোটখাটো কাজটাজ করি।"

দোকানদারকে টাকা দিয়ে একহাতে প্লাস্টিকের গ্লাসে খানিকটা চা আর অন্য হাতে ঠোঙায় ক'টা লেড়ো বিস্কুট নিয়ে এবার গলির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই ছিটকিনি তুললেন। খিল দিলেন।

শিউলি চারটেয় উঠেছিল। মহালয়ার দিন বরাবরই ওঠে। খানিক্ষণ শুনেই আবার ঘুমের দেশে। চায়ের দোকানে যাওয়ার আগে রেডিওটা বন্ধ করে গায়ে চাদরটা টেনে দিয়ে এসেছেন অতনু। মা'কে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে।

প্লাস্টিকের গ্লাস আর ঠোঙাটা পাশে নামিয়ে রেখে বুকপকেট থেকে চাবি বের করে নীচু হয়ে তালাদু'টো খুললেন অতনু। শাটারটা তুললেন।

ক'দিন আগেই কলকব্জাগুলোয় ভালো করে তেল দিয়েছেন তিনি। শাটারটা নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল। কারখানা ঘর অন্ধকার। রেডিও স্ট্যাটিকের শব্দ আসছে। চা-বিস্কুট নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন অতনু। শাটারটা আবার টেনে নামালেন। বাঁদিকের দেওয়ালে হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপতেই একটা জোরালো হলদে আলো জ্বলে উঠল। অতনু নীচু হয়ে এবার ভেতর থেকে তালা মারলেন।

নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পেছন ফিরলেন অতনু। ঘরের এদিকে ওদিকে গুচ্ছের ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ডাঁই করা আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে সিলিং থেকে একটা হলুদ বাল্ব ঝুলছে। তার তলায় একটা লোহার ভারী চেয়ার। পাশেই একটা কাঠের টেবিল। ঘরে পেচ্ছাপ-পায়খানার সাথে আরও কী একটা আঁশটে নোনতা গন্ধ।

চায়ের গ্লাস আর বিস্কুটের ঠোঙাটা টেবিলে রেখে অতনু মিষ্টি হাসলেন। রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে স্ট্যাটিকের শব্দটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তারপর রায়ানবাবু? মহিষাসুরমর্দিনী শোনা হল?"

লোহার চেয়ারে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে একটা ছেলে। ঠোঁটের ওপর দিয়েও আড়াআড়ি একটা কাপড়ের পট্টি শক্ত করে বাঁধা। ছেলেটার দু'চোখের তলায় পুরু করে কালি পড়েছে। চোখে বিভীষিকা। তার বাঁ হাতটা কনুই থেকে নেই, দু'টো পাও হাঁটুর পর থেকে গায়েব। ক্ষতস্থানগুলো সুন্দর করে ব্যান্ডেজ করা।

অতনু রায়ানের পেছনে দাঁড়িয়ে তার মাথার পেছনে বাঁধা কাপড়ের পট্টির ফাঁসটা খুললেন। রায়ানের গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল। অতনু জিভ কেটে বললেন, "এহেহে! রায়ানবাবু বোধহয় ভুলেই গেছেন জিভ ছাড়া কথা বলাটা একটু মুশকিলের। বহুদিনের অভ্যেস তো। দোষ নেই। ভুল তো মানুষমাত্রই হয়ে থাকে। কষ্ট করবেন না রায়ানবাবু। কথা বেরুবে না।"

ঘরের কোণের দিকে হুকে ঝোলানো অ্যাপ্রনটা নামিয়ে মাথা দিয়ে গলিয়ে পরলেন অতনু। রায়ানের দু'চোখ বিস্ফারিত।

"আজকে রায়ানবাবু ভাবছি ডান হাতটা শুরু করব। দাঁড়ান, যেগুলো হয়েছে লিস্টিতে টিক মেরে দিই।"

টেবিল থেকে একটা কার্ডবোর্ডে আটকানো কাগজ কলম তুলে নিয়ে টিক মারতে মারতে অতনু পড়তে লাগলেন, "একটা কান, জিভ, বাঁ হাত, ডান-পা, বাঁ-পা... বাহ্! ঠিক আছে।"

মুখে সার্জিকাল মাস্কটা পরলেন তিনি। চশমার মোটা কাচে হলুদ আলো ঝকঝক করছে। হাতে রাবারের গ্লাভসজোড়া গলাতে গলাতে অতনু বললেন, "খুব খাটনি যাচ্ছে ক'দিন রায়ানবাবু। ডিউটিতে গিয়ে

আপনাকে খুঁজতে বেরুতে হচ্ছে আবার বাড়ি এসে মেয়েকে পড়ানো, বাজার দোকান। রাত্তিরেও ঘুম হচ্ছে কই? সবাই ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়লে আপনার দেখভাল করতে হচ্ছে। বড্ড খাটনি যাচ্ছে রায়ানবাবু।"

মাথায় সার্জিকাল ক্যাপ, মুখে মাস্ক। মোটা কাচের চশমা। সবুজ অ্যাপ্রনে রক্তের ছাপ। টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন অতনু। টেবিলে পরপর সাজানো রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ছুরি-কাঁচি-চপার। অতনু অন্যমনস্কভাবে তাদের ওপর আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "তার ওপর পেলাস্টিকের প্যাকেটে করে আপনার কিমাগুলো জায়গায় জায়গায় ফেলে আসতে হচ্ছে। ওইটে সবচেয়ে চাপের। কেউ দেখে টেখে ফেললে মাছ, মাংস, আবর্জনা বলে চালাতে হচ্ছে। অবশ্য বেশীরভাগই ফেলছি দক্ষিণের জঙ্গলের ওদিকে ভাগাড়ধারে - শিয়ার, কুকুর, শকুনে সে জিনিস বেশীক্ষণ পড়ে থাকতে দিচ্ছে না। আহা, খাকগে। কেষ্টর জীব..."

রায়ানের চোখে বিভীষিকা। রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করলেন অতনু। ভোরের খবর শুরু হয়েছে। লোকাল স্টেশন। এক মহিলা খ্যানখ্যানে গলায় খবর পড়ছেন।

"...গতকাল জামিন পেলেন পঞ্চানন হালদার।"

আবার যন্ত্রপাতিতে মন দিলেন অতনু। বাছতে বাছতে বললেন, "ব্যান্ডেজগুলো কেমন করছি বলুন রায়ানবাবু? পুরো ডাক্তার। ডিগ্রি নাই থাকতে পারে। তবে প্রতিভা ও দক্ষতায়..."

টেবিল একটা চপার তুলে নিয়েও থমকালেন তিনি।

"না না, আগে চা'টা খেয়ে নিন বুঝলেন। ঠান্ডা হয়ে যাবে নইলে।"

ডানহাতে প্লাস্টিকের গ্লাসে ধোঁয়াওঠা চা আর বাঁহাতে চপারটা নিয়ে রায়ানের দিকে এগিয়ে গেলেন অতনু।

রেডিওতে খ্যানখ্যানে কন্ঠস্বর বেজেই চলেছে।

"...রায়ান দাসের খোঁজ এখনও চলছে।"

সূচিপত্র

অনুসন্ধান
ঋজু গাঙ্গুলী
অলঙ্করণ - সায়ন কুঁতি
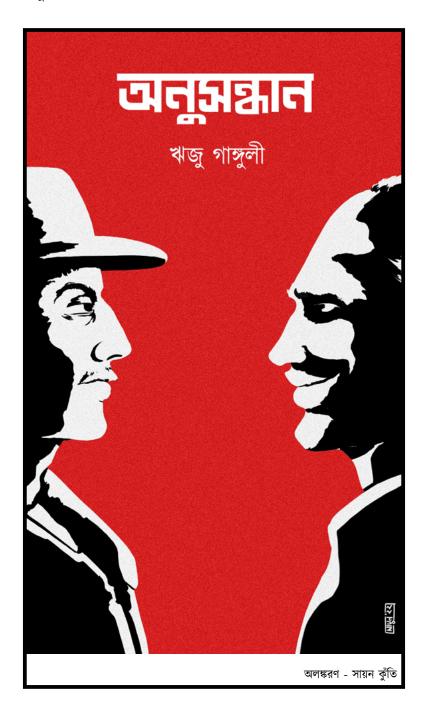
"একজন ট্যাক্সপেয়ার হিসেবে আমার কিছু অধিকার আছে।" কড়া গলায় বললাম, "আমার বাড়ি আর বাগান বরবাদ করাটা একবার শেষ হোক। তারপর সবকিছু আগের মতো না হওয়া অবধি আমি আপনাদের ছাড়ব না।"

"ওই নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না, মিস্টার ওয়ারেন।" ডিটেকটিভ-সার্জেন্ট লিটলার মুচকি হেসে বললেন, "সরকারের তরফে এখানকার সবকিছু একদম আগের মতো করে দেওয়া হবে— সে আমরা কিছু পাই বা না-পাই।"

ভদ্রলোক আমার স্ত্রী'র শরীর... বা সঠিকভাবে বললে লাশের কথা বলছিলেন। এখনও অবধি অবশ্য ওঁরা কিছুই পাননি।

"কাজটা কিন্তু সহজ হবে না, ডিটেকটিভ। আপনার লোকেরা গোটা বাগানটাকেই কার্যত খুঁড়ে ফেলেছে। সামনের লনটা দেখে তো চষা জমি বলেই মনে হচ্ছে। আমার বাড়িটাকেই একটু-একটু করে ভেঙে ফেলছেন আপনারা। ওই তো! আপনার এক কনস্টেবল একটা মস্ত হাতুড়ি নিয়ে বেসমেন্টের দিকে এগোচ্ছে। এভাবে..."

রান্নাঘরে বসে কফির কাপে চুমুক দিলেন লিটলার। তারপর একগাল হেসে বললেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তন ৩০,২৬,৭৮৯ বর্গমাইল— যার মধ্যে হ্রদ, নদী, নালা— এ-সবও আছে।"

এইসব তথ্য কি উনি আমাকে বলার জন্যই মুখস্থ করেছেন? ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আলাস্কা আর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বলছেন, নাকি বাদ দিয়ে?"

"কাজের সুবিধার্থে আমরা ওগুলো বাদ দিতে পারি।" ভ্রুক্ষেপ করলেন না লিটলার, "যা বলছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তন ৩০,২৬,৭৮৯ বর্গমাইল হলেও, এমনকি তার মধ্যে পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি— এ-সব থাকলেও, স্ত্রীকে খুন করার পর স্বামীরা লাশটা তাদের সম্পত্তির মধ্যেই লুকোয়।"

মনে-মনে ভাবলাম, নিঃসন্দেহে সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। বনে-জঙ্গলে পুঁতলে কোনো কৌতূহলী ছোকরা গুপ্তধন বা ফসিল খুঁজতে চেয়ে লাশটা বের করে ফেলতে পারে।

লিটলার আবার হাসলেন, "আপনার জমিটা যেন কত বড়ো?"

"ষাট ফুট বাই দেড়শো ফুট। আপনার কোনো ধারণা আছে, এই জায়গায় মাটিটা বাগানের মতো করার জন্য আমাকে কতটা খাটতে হয়েছে? আপনার লোকেরা তো মাটির নীচের স্তর অবধি খুঁড়ে ফেলেছে। আমি তো হলদে মাটিও দেখতে পাচ্ছি এখনই!"

দু'ঘণ্টা কেটে গেলেও লিটলারের আত্মবিশ্বাসের বহরটা বোঝা গেল তাঁর কথায়, "বাগান বা ফলনের তুলনায় অনেক সিরিয়াস বিষয় নিয়ে

এখন আপনার ভাবনা-চিন্তা করা উচিত, মিস্টার ওয়ারেন।”

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম। লিটলারের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগা জনাদশেক মজদুর জায়গাটাকে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চের মতো করে ফেলছিল।

“আমরা এ-সব ব্যাপারে কোনো ফাঁক রাখি না।” লিটলার মিষ্টি মুখে বললেন, “আপনার বাড়ির চিমনিতে জমা ঝুলটাও আমরা পরীক্ষা করে দেখব। তারপর ধরুন... চুল্লির ছাইগুলোও নেড়েচেরে দেখব। বুঝলেন তো?”

“ঘর গরম করার জন্য আমি ওইসব জিনিস ব্যবহার করি না।” কাপে কফি ঢেলে বললাম, “আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি, ডিটেকটিভ। সত্যি বলতে কি, সে যে এখন কোথায়— আমি সেটাই জানি না।”

নিজের কাপে চিনি ঢেলে চামচ নাড়তে-নাড়তে লিটলার বললেন, “তাঁর এই ‘অদৃশ্য’ অবস্থার কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?”

“ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো কিছু তো ঘটেনি। এমিলি এক রাতে নিজের কিছু জামাকাপড় একটা সুটকেসে ভরে আমাকে ছেড়ে চলে গেছিল। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, ওর কিছু জামাকাপড় পাওয়া যাচ্ছে না।”

“আপনার স্ত্রী’র মোট কতগুলো আর কী-কী পোশাক ছিল— তা আমরা কীভাবে জানব?” আমার স্ত্রী’র ফটোটার দিকে তাকালেন লিটলার, “আচ্ছা, আপনি ওঁকে বিয়ে করেছিলেন কেন?”

“ভালোবেসে।”

ব্যাখ্যাটা যে লিটলারের কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হল, সেটা ওঁর মুখ দেখেই বুঝলাম।

“ওঁর তো দশ হাজার ডলারের জীবন-বিমা করা ছিল, তাই না?”

সেটা ছিল। এমিলিকে ‘অদৃশ্য’ করে দেওয়ার সেটাও অন্যতম কারণ; তবে সেটাই প্রধান কারণ নয়। আমি আসলে ওকে আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

অতৃপ্ত কামনার কামড় সহ্য করতে না পেরে এমিলিকে বিয়ে করেছিলাম— এইরকম কিছু আমি দাবি করব না। সত্যি বলতে কি, আমার স্বভাবটা ওইরকম নয়। বরং ব্যাচেলর হিসেবে অনেকদিন কাটালে একটা অনুতাপের বোধ জন্মায়। তারই পাল্লায় পড়ে ওই কুকর্মটি করেছিলাম।

এমিলি আর আমি— দু’জনেই মার্শাল পেপার প্রোডাক্টস্-এ চাকরি করতাম— আমি অ্যাকাউনটেন্ট, এমিলি টাইপিস্ট। শান্ত, চুপচাপ, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে রীতিমতো উদাসীন এমিলির একমাত্র পাঠ্য বস্তু ছিল খবরের কাগজ— সে-ও একদিন পর-পর। স্বাভাবিকভাবেই ওর আলোচনার স্তরও সেদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল বা থাকবে—

ওই পর্যায়েই আটকে থাকত। সংক্ষেপে বললে, প্রেমের বদলে একটা সুব্যবস্থা হিসেবে যাঁরা বিয়ে করার কথা ভাবেন, তাঁদের পক্ষে এমিলি ছিল একেবারে আদর্শ স্ত্রী। অথচ...

অথচ এই সাদামাটা ও মুখচোরা স্বভাবের মেয়েটি বিয়ের পর ধারে ও ভারে যে কী মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, ভাবতেও পারবেন না! কী বলব আপনাদের, অবিবাহিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছি বলে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাও দেখাত না এমিলি।

"আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?"

যাচ্ছেতাই। কিন্তু সে তো আর বলা যায় না। তাই উত্তর দিলাম, "আমাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মতান্তর হত— যেমন সব দম্পতির মধ্যেই হয়।"

"তাই নাকি? আপনার পড়শিরা তো বলেছেন, আপনি আর আপনার স্ত্রী রোজই ঝগড়া করতেন।" সার্জেন্ট যে বেশ খোঁজখবর নিয়েই এসেছেন, সেটা বোঝা গেল। আর পড়শি বলতে উনি কাদের কথা বলছেন, সেটাও বুঝতে পারলাম। ফ্রেড আর উইলমা ট্রিবার! আমার বাড়িটা যেহেতু এক কোণে, তাই একমাত্র ওদেরই আমার পড়শি বলা চলে। এমিলি'র গলা অতদূর অবধি যেত কি? কী জানি! ওজনের সঙ্গে ওর গলার জোরও যে ক্রমশ বাড়ছিল, তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানবে?

"ট্রিবার দম্পতি বলেছেন, তাঁরা প্রায় রোজই আপনাদের ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ পেতেন।"

"ওঁদের নিজেদের ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ থামলে তবেই শুনতে পেতেন— এটা বলেননি? আর হ্যাঁ, আমার গলা ওঁদের কোনোমতেই শোনার কথা নয়। আমি উঁচু গলায় কথা বলি না।"

"গত শুক্রবার সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় আপনার স্ত্রীকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছিল। তারপর থেকে ওঁকে কেউ দেখেনি।"

প্রায় সঠিক তথ্য। গরম করে নিলেই খাওয়া যাবে এমন কিছু জিনিস, আর আইসক্রিম— এই নিয়েই সেদিন সন্ধেবেলা সুপারমার্কেট থেকে ফিরেছিল এমিলি। রান্নাবান্না বলতে ও ওগুলোই বুঝত। আমি নিজের ব্রেকফাস্ট নিজেই বানাতাম; লাঞ্চও করতাম অফিসের ক্যান্টিনেই। রাতেও যা-হোক কিছু গরম করে কাজ চালিয়ে নিতাম।

"তারপর থেকে অন্য কেউ এমিলিকে দেখেনি।" পার্থক্যটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম, "আমি ওকে তারপরেও দেখেছি। ডিনারের পর ও শুতে গেল— এটাও দেখেছি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তো আবিষ্কার করলাম যে একটা ব্যাগে কিছু জিনিস নিয়ে ও আগের রাতেই চলে গেছে।"

বেসমেন্টের কংক্রিটের মেঝেটা কেউ ভাঙতে শুরু করেছিল। আওয়াজের ঠেলায় সেদিকে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে আসতে বাধ্য হলাম। লিটলারকে জিজ্ঞেস করলাম, "সেদিন সন্ধেবেলায়, ওই তথাকথিত 'শেষবারের' মতো, কে এমিলিকে দেখেছিলেন?"

"মিস্টার আর মিসেস ট্রিবার।"

উইলমা ট্রিবার আর এমিলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। এরা দু'জনেই বিয়ের পর চেহারা ও মেজাজের দিক দিয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছিল, অথচ দু'জনেরই চিন্তাভাবনা ছিল একেবারে বনসাই-মাপের। উইলমা'র সঙ্গে বিবাহোত্তর সহাবস্থানের ঠেলাতেই বোধহয় ফ্রেড ট্রিবার এমন মুখচোরা টাইপের হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, ফ্রেড একজন চমৎকার দাবাড়ু। এমিলি'র কথা বা কাজের প্রতিবাদ করতাম বলে ফ্রেড আমাকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তিও করে।

"সেদিন মাঝরাতে ফ্রেড ট্রিবার এই বাড়ির দিক থেকে একটা অপার্থিব আর্তনাদ শুনেছিলেন।"

"অপার্থিব!"

"ঠিক এই বিশেষণটাই উনি ব্যবহার করেছেন।"

"তাহলে বলতে হয় যে ফ্রেড ট্রিবার একটি মিথ্যুক। ওঁর স্ত্রী-ও কি একই কথা বলেছেন?"

"না। তাঁর ঘুম নাকি বেশ গভীর। তবে ফ্রেডের ঘুম ভেঙে গেছিল ওই চিৎকারে।"

"মরিসনদের কী বক্তব্য? তাঁরাও কি সেই 'অপার্থিব' চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন?"

"মরিসনদের ঘুম ভাঙেনি। তাছাড়া ওঁদের বাড়িটা এখান থেকে অনেকটা দূরে। সেই তুলনায় ট্রিবারদের বাড়ির দূরত্ব মাত্র পনেরো ফুট।" পাইপে ধীরেসুস্থে তামাক ভরতে-ভরতে লিটলার বললেন, "ফ্রেড ট্রিবার ওই চিৎকার শুনে একবার ভেবেছিলেন যে স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলবেন। শেষ অবধি তিনি... সাহস পাননি। যা শুনলাম, মহিলার মেজাজ নাকি সপ্তমে চড়েই থাকে। যাইহোক, এরপরেও ফ্রেডের ঘুম আসছিল না। তারপর, রাত দুটো নাগাদ তিনি আপনার বাড়ির পেছনের দিক থেকে মাটি খোঁড়ার শব্দ পান। এরপর তিনি আর থাকতে না পেরে নিজের স্ত্রীকে ঘুম থেকে তোলেন। ওঁরা দু'জনেই এরপর দেখেন যে আপনি ওখানে মাটি খুঁড়ছেন।"

"ব্যাটারা গুপ্তচরেরও অধম!" রাগে দাঁতে দাঁত ঘষলাম, "তাহলে ওভাবেই আপনারা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি অত বড়ো একটা বাক্স কেন ব্যবহার করেছিলেন?"

"হাতের কাছে ওটাই ছিল। তাতেও জিনিসটা কফিনের তুলনায় অনেকটাই ছোটো ছিল।"

"মিসেস ট্রিবার গোটা শনিবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন যে আপনার স্ত্রী 'বেড়াতে গেছেন এবং আগামী বেশ কিছুদিনের মধ্যে ফিরবেন না।' এরপরেই তাঁর মনে হয় যে আপনি স্ত্রী'র দেহটিকে, বেশ ঠাসবুনোট একটা প্যাকেজের মতো করে, পুঁতে ফেলেছেন!"

কাপে আরও কফি ঢেলে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা শেষ অবধি কী পেলেন?"

একটু অস্বস্তিভরেই লিটলার বললেন, "একটি বেড়ালের মৃতদেহ।"

মাথা নেড়ে বললাম, "শেষ অবধি একটি বেড়ালকে কবর দেওয়ার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করছেন?"

"আপনি সবকিছু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, মিস্টার ওয়ারেন।" লিটলারের মুখে হাসিটা ফিরে এল, "প্রথমে তো আপনি এ-কথা মানতেই চাননি যে ওখানে কিছু একটা পোঁতা হয়েছে।"

"তার কারণ, সব ব্যাপারে আপনারা নাক গলান— এ আমার একেবারেই পোষায় না।"

"তারপর আপনি বলেছিলেন, বেড়ালটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।"

"আমার তো তেমনই মনে হয়েছিল।"

"অথচ আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, ডান্ডা দিয়ে বেড়ালটার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেড়ালটাও আবার ছিল আপনার স্ত্রীর বিশেষ পছন্দের!"

"মৃত বিড়ালদের দেহ পরীক্ষা করার মানসিকতা আমার নেই, ডিটেকটিভ।"

"আমার ধারণা," পাইপে সুখটান দিয়ে লিটলার বললেন, "স্ত্রীকে খুন করার পর আপনি বেড়ালটাকেও মেরে ফেলেন। হয়তো ওটা বেঁচে থাকলে আপনার ক্রমাগত স্ত্রীর কথা মনে পড়ত। অথবা বেড়ালটা হয়তো আমাদের দেখিয়ে দিত, কোথায় আপনি স্ত্রীর দেহটা পুঁতেছেন।"

"এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?"

"এমন যে হয়, এটা তো অস্বীকার করা যায় না!" লিটলারের মুখটা কিঞ্চিৎ লাল হয়ে উঠছিল, "কুকুরেরা গোরস্থানে গিয়ে কবরের ওপর বসে থাকে। নাম-টাম ছাড়া পুঁতে ফেলা হয়ে থাকলে সেখানে মাটি খোঁড়াখুঁড়িও করে। তাহলে বেড়াল কেন করতে পারবে না?"

সত্যিই তো। কিন্তু বেড়ালের কি অতটা প্রভুভক্তি আছে?

লিটলার নীচ থেকে হাতুড়ি আর ড্রিলের শব্দ শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "সচরাচর কেউ হারিয়ে গেছে— এ-কথা জানলে

আমরা 'নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত বিভাগ'-এর মাধ্যমে হ্যান্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করি। তারপর সপ্তাহদুয়েক অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণত স্বেচ্ছায় কেউ কোথাও চলে গিয়ে থাকলে ওই সময়টুকুর মধ্যে তাদের টাকাপয়সা ফুরিয়ে যায়। তারা সুড়সুড় করে ফিরেও আসে।"

"তাহলে এমিলি'র বেলায় সে-সব না করে আমার বাড়ির চোদ্দোটা বাজাচ্ছেন কেন? যতদূর জানি, ও নিজের সঙ্গে শ'খানেক ডলার নিয়ে গেছে। ওই দিয়ে আর কদ্দিন চলবে?"

"যখন আমরা একজন স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা শুনি," হেসে-হেসেই বলতে লাগলেন লিটলার, "তার সঙ্গে শুনি যে সেই বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পাওয়া গেছে, তারপর এও শুনি যে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সেই নিরুদ্দেশ মহিলার স্বামীকে দেখেছেন মাটি খুঁড়ে কিছু পুঁততে— তখন আমরা বুঝি যে একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেই অবস্থায় আমরা দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারি না, মিস্টার ওয়ারেন।"

সে তো আমিও পারি না! সেজন্যই তো বেড়ালটাকে মেরে শুধু কবরই দিইনি, এই ব্যবস্থাও করেছিলাম যাতে পুরো ঘটনাটার দু'জন সাক্ষী থাকে। তবু, গলায় যথাসম্ভব বিষ ঢেলে বললাম, "তাই আপনারা হাতের কাছে যত শাবল, বেলচা, হাতুড়ি, গাইতি ছিল, সব নিয়ে আমার বাড়িতে হামলা করলেন! আবারও বলে রাখছি সার্জেন্ট, যদি প্রতিটি ইট, কাঠ, এমনকি মাটির চাবড়াও আগের অবস্থায় ফিরে না আসে, তাহলে মামলার ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল ছাড়া কিচ্ছু দেখবেন না।"

"আপনার বসার ঘরের কার্পেটে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।" নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন লিটলার।

"আরে সে তো আমারই রক্ত!" ব্যান্ডেজ করা অংশটা দেখালাম, "একটা গ্লাস ভেঙে গেছিল। তার কাচের টুকরো তুলতে গিয়েই হাতটা বিশ্রীভাবে কাটল।"

"আসল দাগ লুকোনোর চেষ্টা!" লিটলার বললেন, "ওই ক্ষতস্থানটা আপনি ইচ্ছে করে তৈরি করেছেন।"

ঠিক। ওইভাবে কার্পেটে রক্তের দাগটা আমাকে তৈরি করতে হয়েছিল একটাই কারণে। যদি অন্য কোনো কারণ নাও থাকে, ওটার জোরেই পুলিশ আমার বাড়িতে খানাতল্লাশি চালাতে বাধ্য হবে।

দেখলাম, পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে ফ্রেড ট্রিবার আমার বাড়ির হাল দেখছে। উঠে দাঁড়িয়ে লিটলারকে বললাম, "ওই লোকটার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হচ্ছে।"

লিটলার আমার পিছু-পিছু চললেন। স্তূপীকৃত মাটি আর গর্ত এড়িয়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে বললাম, "একে কি প্রতিবেশীসুলভ আচরণ বলা

চলে, ফ্রেড?”

“দেখো অ্যালবার্ট,” ঢোঁক গিলে বলল ফ্রেড, “আমি কারও অনিষ্ট করতে চাই না। তুমি এমিলিকে খু... কিছু করেছ, এমন আমি ভাবিওনি। তবে উইলমা আর ওর কল্পনাশক্তির ব্যাপারটা তো জানই। ওরই চাপে...!”

“পরেরবার ‘এক হাত হয়ে যাক’ বলে দাবার বোর্ড বের করার কথা ভেবোও না!” বলে আমি লিটলারের দিকে ফিরে বললাম, “আমি যে এখানেই এমিলির দেহটা লুকিয়েছি— এ-বিষয়ে আপনারা কীভাবে নিঃসন্দেহ হলেন?”

“আপনার গাড়ির গতিবিধি থেকে।” লিটলার মুখ থেকে পাইপ বের করে বললেন, “শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আপনি গাড়িটাকে ইগল ফিলিং স্টেশনে নিয়ে গেছিলেন। সেখানে গিয়ে আপনি ইঞ্জিনের তেল বদলেছিলেন। মেকানিক কাজ-টাজ সেরে, দিন, সময় আর তখনকার মাইলেজ নোট করে গাড়ির দরজায় একটা স্টিকার মেরে দিয়েছিল দরজায়। তারপর আপনার গাড়ি ঠিক ততটুকুই চলেছে যতটুকু ওই ফিলিং স্টেশন থেকে আপনার বাড়ির দূরত্ব। শনিবার আপনার অফিস বন্ধ থাকে। আজ রবিবার। মানে শুক্রবার বিকেলের পর থেকে আপনার গাড়ি আর কোথাও যায়নি।”

আশা করেছিলাম যে ওই স্টিকারটা পুলিশের চোখে পড়বে। না পড়লে কোনোভাবে ওটার প্রতি আমাকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণই করতে হত। আপাতত আমি দেঁতো হাসির সঙ্গে শুধোলাম, “গাড়িই বা লাগবে কেন? আমি ওকে পাঁজাকোলা করে, কোনো ফাঁকা জমি অবধি হেঁটে গিয়েও তো কবর-টবর দিতে পারতাম।”

“এখান থেকে সবচেয়ে কাছে খালি জমি অবধি পৌঁছোতে গেলেও চারটে ব্লক পেরোতে হয়। রাত্তির হলেও অতটা দূরত্ব, কারও চোখে না পড়ে পায়ে হেঁটে পেরোনো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আপনার স্ত্রী... কিছু মনে করবেন না মিস্টার ওয়ারেন, আপনি তাঁকে দু’হাতে নিয়ে অতটা রাস্তা পেরোতে পারতেন না।”

ফ্রেড আমার বাগানের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বলল, “অ্যালবার্ট, তোমার বাগানটা তো ওরা খুঁড়েই ফেলেছে। ক’টা গর্ডন পিংক আমাকে দেবে? তার বদলে তোমাকে কয়েকটা অ্যাম্বার গলিয়াথ দেব।”

পেছন ফিরে গটগট করে বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকেল ফুরিয়ে গেল। আকাশ থেকে আলোর মতো করে, বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে লিটলারের মুখ থেকে নিশ্চিন্ত ভাবটাও একটু-একটু করে মুছে গেল।

সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় হাতুড়ি চালানো বন্ধ হল।

সার্জেন্ট চিল্টন রান্নাঘরে লিটলারের সামনে হাজিরা দিলেন। মানুষটিকে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্রুদ্ধ— মানে 'বিধ্বস্ত' হওয়ার জন্য যা-যা বিশেষণ ব্যবহার করা যায়, তার সবক'টাই দেখাচ্ছিল। সর্বাঙ্গে কাদা আর মাটি মেখে চিল্টন বললেন, "নেই। কিস্যু নেই!"

"তুমি ঠিকমতো দেখেছ?" পাইপটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে লিটলার জানতে চাইলেন, "কোনো জায়গা বাদ-টাদ পড়েনি তো?"

"সব দেখেছি। এই বাড়িতে, বা বাগানে কোথাও কোনো মৃতদেহ পোঁতা হয়ে থাকলে আমরা এতক্ষণে সেটা পেয়ে যেতাম। এতক্ষণ যারা কাজ করেছে, তারা কেউই আনাড়ি নয়।"

"আমি জানি আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন, মিস্টার ওয়ারেন।" আমার দিকে কটমট করে তাকালেন লিটলার, "আমার মন এ-কথা বলছে!"

একজন বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ মানুষ যখন সব ছেড়ে এইসব বলেন, তখন তাঁর ওপর কিছুটা দয়াই হয়। আমারও তাই হল; বিশেষত এক্ষেত্রে যেহেতু আমি জানি যে ভদ্রলোকের মন ভুল বলছে না।

"আজ রাতে মটন দোপেঁয়াজা বানাব ভাবছি।" খুশিয়াল ভঙ্গিতে বললাম, "অনেকদিন বানাইনি।"

একজন পুলিশ তখনই রান্নাঘরে ঢুকল। সে লিটলারকে বলল, "আমি ওই ট্রিবার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

"তো? কিছু জানতে পারলে?"

"উনি বলছিলেন, বাইরন কাউন্টিতে লেকের ধারে মিস্টার ওয়ারেনের একটা ছোট্ট কটেজ আছে।"

ফ্রিজ থেকে মাংসটা বের করতে গিয়ে হাত থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল আর একটু হলে। ফ্রেড হতচ্ছাড়ার জন্য যে কী বিপদে পড়তে হল!

লিটলারের চোখ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে বিস্ফারিত হল। হতাশা ঝেড়ে ভদ্রলোক সোৎসাহে বলে উঠলেন, "জানতাম! এরা সবসময়, সবসময় নিজেদের জমিতেই লাশ পুঁতে রাখে।"

আমার মুখটা নির্ঘাত একেবারে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তাও আমি যথাসম্ভব জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, "খবরদার বলছি! ওই বাড়ির ত্রিসীমানায় পাও রাখবেন না। ওটা কেনার পর ঠিকঠাক করতে অন্তত দু'হাজার ডলার খরচা হয়েছে। এখন আপনার দলবল কালাপাহাড়ি করে সেটার বারোটা বাজালে আমি কিন্তু...!"

"চিল্টন, তুমি কিছু ফ্লাডলাইট জোগাড় করে লোকজনকে নিয়ে ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।" আমার দিকে ঘুরে লিটলার বললেন,

"আপনার এই নিরালা কুটির-টি ঠিক কোথায়?"

"আমি কিছুতেই বলব না।" ঘাড় গোঁজ করে বললাম, "তাছাড়া আপনারাই তো বললেন, আমার গাড়ি নাকি শুক্রবার সন্ধের পর থেকে নড়েইনি।"

"সে আপনি মিটারে কারচুপি করেই থাকতে পারেন। এবার বলুন দেখি, কোথায় আপনার কটেজ?"

"বলব না।" একেবারে রণংদেহি পোজ নিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

"আমাদের দেরি করাতে চাইছেন বুঝি?" দয়ার্দ্র ভঙ্গিতে হাসলেন লিটলার, "নাকি আজ রাতে ওখানে গিয়ে, দেহটা বের করে, সেটাকে অন্য কোথাও লুকোনোর কথা ভাবছেন?"

"আমি ওইরকম কিচ্ছু ভাবছি না। তবে সাংবিধানিক অধিকার বলেও একটা বস্তু আছে। সেজন্যই আমি আপনাদের কাছে আমার কটেজের ঠিকানা দেব না।"

তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু লাভ হল না। লিটলার আমারই বাড়ির ফোন থেকে বাইরন কাউন্টিতে ফোন করে, পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে কটেজের ঠিকানা জোগাড় করে ফেলল।

"আপনাদের আবারও বলছি," গর্জন করলাম আমি, "এই বাড়ির যা অবস্থা করেছেন, ওটারও যদি তেমন অবস্থা করেন, তাহলে আমি মেয়রের কাছে নালিশ করব। চাকরি চলে যাবে আপনার!"

লিটলার অবশ্য খুবই ভালো মুডে ছিলেন। উৎসাহে দু'হাতের তেলো ঘষতে-ঘষতে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চিল্টন, কাল লোকলশকর লাগিয়ে এখানে সব ঠিকঠাক করে দিও, কেমন?"

"প্রতিটি ফুল, প্রতিটি ঘাস অবধি যেন আগের অবস্থায় ফিরে আসে।" লিটলারের পেছন-পেছন গেট অবধি আসার সময় বললাম, "নইলে উকিলের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো রাস্তা থাকবে না।"

সেই রাতে দোপেঁয়াজাটা নিতান্তই বিস্বাদ লাগল। অবশেষে, রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ দরজায় অত্যন্ত মৃদু স্বরে টোকার আওয়াজ পেলাম। ফ্রেড ট্রিবার ঘরে ঢুকে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"কোন আক্কেলে তুমি কটেজের কথাটা উল্লেখ করলে?" রাগে প্রায় কাঁপছিলাম আমি, "অত সুন্দর জায়গাটাকে একেবারে তছনছ করে দেবে লিটলারের লোকজন।"

"কথা বলার সময় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল।"

হতচ্ছাড়াকে আরও অনেক কথা শোনানোর ইচ্ছে ছিল। তাও

নিজেকে সামলে নিলাম। লিটলার পরে ওটার কথা জানতে পারলে নির্ঘাত আরও বেশি করে খোঁজাখুঁজি করত। তার বদলে এখনই যা হওয়ার হয়ে যাক।

"তোমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁহ্!" একগাল হেসে ফ্রেড বলল, "ওর তো এক ঘুমেই রাত কাবাড় হয়। তাই কোনো ভয় নেই।"

ফ্রেডের বেসমেন্টে গেলাম। সেখানে ত্রিপলের নীচে, একটা ঠান্ডা জায়গায় এমিলির লাশটা শোয়ানো ছিল। লুকোনোর পক্ষে ওটা একেবারে আদর্শ জায়গা। উইলমা সপ্তাহে একদিন কাচাকুচির জন্য শুধু বেসমেন্টে যায়, নইলে ওখানে কেউই যায় না।

আমি আর ফ্রেড ধরাধরি করে এমিলিকে নিয়ে আমার বাড়ির বেসমেন্টে নামলাম। জায়গাটা একেবারে তছনছ হয়ে ছিল। তার সবচেয়ে গভীর গর্তটাতে মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে তার ওপর প্রায় ফুটদেড়েক পরিমাণ ধুলো আর মাটি ঢেলে দিলাম। দেখে বুঝলাম, কাজ হয়ে গেছে।

"এতে হবে তো?" ফ্রেড চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, "ওরা যদি খুঁজে পায়?"

"মাত্তা খারাপ! যে জায়গায় ওরা ইতিমধ্যেই তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, সেখানে ওরা আবার খোঁজার কথা ভাববেই না। কালই ওরা এসে গর্ত ভরাট করে সব সমান করে দেবে।"

আমরা রান্নাঘরে এসে বসলাম।

"আমাকে কি এক বছর অপেক্ষা করতে হবে?" ফ্রেড কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই।" কড়া গলায় উত্তর দিলাম, "এমন কিচ্ছু করা যাবে না, যাতে পুলিশের কোনোরকম সন্দেহ হয়। এক বছর বা তার কিছু বেশি পরে তুমি উইলমাকে মেরে আমার বেসমেন্টে রাখবে, যতক্ষণ না পুলিশের তরফে তোমার বাড়ির খোঁজাখুঁজি শেষ হয়।"

"উইলমার সঙ্গে আরও এক বছর!" বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফ্রেডের মুখ থেকে, "অপেক্ষাটা বড়ে দীর্ঘ হবে। তবে আমার তরফে কিছু বলার নেই। টসে তুমি জিতেছিলে, তাই আগে তুমিই মুক্তি পেলে। ইয়ে, বলছিলাম কি, তুমি ওই কথাটা কি সিরিয়াসলি বলেছিলে?"

"কোন কথাটা?"

"ওই যে... আর আমার সঙ্গে দাবা না খেলার ব্যাপারটা...?"

লিটলার অ্যান্ড কোং আমার সাধের কটেজের কী অবস্থা করতে পারে— সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছিল বলে দিই, আমি সিরিয়াসলিই ওর সঙ্গে আর দাবা খেলব না। তারপর লোকটার

মুখচোখ দেখে মায়া হল। বললাম, “না-না।”

“তাহলে এক হাত হয়ে যাক!” একগাল হেসে ফ্রেড বলল, “আমি বোর্ডটা নিয়ে আসি।”

[মূল কাহিনি: রিমেইন্স টু বি সিন, লেখক: স্টিভ ও'কনেল (জ্যাক রিচি), প্রথম প্রকাশ: আলফ্রেড হিচকক'স মিস্ট্রি ম্যাগাজিন, জুন ১৯৬১]

সূচিপত্র

মাতৃরূপেণঃ মিডিয়ার মায়েরা এত কেন ভালো?

এলজা রায়

আচ্ছা, আপনি আজ অবধি যতগুলো দেশী-বিদেশী সিনেমা, টিভি সিরিজ, ওয়েব সিরিজ দেখেছেন; সেখানে কতগুলোতে মায়ের চরিত্র দেখেছেন বলুন তো? প্রায় সবগুলোতেই কখনও না কখনও টুকটাক মায়ের চরিত্র দেখেই থাকেন, তাই না? অনেক ক্ষেত্রেই মুখ দেখানো পার্শ্ব চরিত্র, হল থেকে বেরলে বা টিভির চ্যানেল পাল্টে দেওয়ার পরে মনেই থাকে না। কখনও বা বেশ ভালো লেগে যাওয়ার মত মজার চরিত্র, বা কষ্ট দেখে কেঁদে ফেলার মত চরিত্র, আবার কখনও মায়েরাই গল্পের মুখ্য চরিত্র।

আমারদের হিন্দি বাণিজ্যিক সিনেমার কথাই যদি বলি; করন জোহর, ইয়াস রাজ ফিল্মস এর মায়েরা ৫০০ মিটার দুর থেকে ছেলের আসার কথা বুঝতে পারেন। কভি খুশি কভি গম সিনেমাতে জয়া ভাদুরি যেমন শাহরুখ খানের আসার আগেই গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। আরেকটু বাস্তব এর কাছাকাছি দেখতে গেলে, জয়া ভাদুরিরই কল হো না হো এর চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য আমরা সমব্যাথি হই। এঁরা পার্শ্ব চরিত্র হলেও সিনেমা শেষ হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে আমরা এদের কথা ভুলে যাই না।

এবারে যদি আরেকটু সমসাময়িক সিনেমার কথা বলি, যেগুলো স্মল টাউন সিনেমা, বা বর্তমান বলিউডের ভাষায় হাই কনসেপ্ট সিনেমা (ধরে নিন আয়ুষ্মান খুরানার বেশির ভাগ সিনেমা গুলোই, অথবা রাজ কুমার রাও এর সিনেমা গুলো) সেখানেও বেশ ভালোবেসে ফেলার মত কিছু মায়েদের আমরা দেখেছি, কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা কমিক রিলিফের জন্যই পর্দায় আসেন, কিছু ক্ষেত্রে কমিক রিলিফ পেরিয়েও আমাদের মনে দাগ কেটে যান। যেমন বরেলি কি বরফি অথবা শুভ মঙ্গল সাবধান-এ সীমা পাওভার চরিত্র দুটি। এমনকি দঙ্গল মূলত বাবা আর তার দুই মেয়ের সিনেমা হলেও সিনেমাতে সাক্ষী তনওয়ার এর চরিত্রটা কমিক রিলিফের সাথে সাথে গল্পের অনুঘটক হয়ে যায়।

কমেডির বাইরে, ভারতীয় সিনেমার আদি থেকেই দুঃখিনী, দরিদ্র, সিঙ্গেল মাদার আমরা দেখেছি, মাদার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে ৭০ এর দশকের এংরী ইয়াং ম্যান দের রাগের কারণই থাকত মায়েদের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া, অথবা মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারা। সেই ঐতিহ্য আজও অক্ষুন্ন। এদের মধ্যে আনেকেই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কেউ কেউ পার্শ্ব চরিত্রে। ২০০০ সালের পরে বাণিজ্যিক ভাবে তুমুল সফল সিনেমা গুলোর মধ্যে বাগবান আর বাধাই হো সিনেমার

কথা মাথায় আসে, যেখানে মায়ের চরিত্ররা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কোই মিল গায়া, তারে জমিন পর বা বাহুবলীর মত সিনেমাতেও আমরা মায়েদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখি।

কিছু কিছু অনসাম্বল কাস্টের সিনেমার গল্পেও মায়েদের চরিত্র আমাদের আনেকদিন ধরে মনে রেখে দিই , যেমন রাম প্রসাদ কি তেরভি সিনেমাতে সুপ্রিয়া পাঠক, অথবা দিল ধরকনে দো সিনেমাতে শেফালী শাহ এর চরিত্র। যদিও রাম প্রসাদ কি তেরভি-তে সুপ্রিয়া মুখ্য চরিত্রেই অভিনয় করেছেন, কিন্তু অনসাম্বল কাস্টের কারণে, গোটা দৃশ্য জুড়ে খুব বেশিবার আমরা সুপ্রিয়াকে একা বেশিক্ষণের জন্য দেখতে পাইনা। এছাড়া সিক্রেট সুপারস্টার, গালি বয় মুখ্যত সন্তানের সাফল্যের কাহিনী হলেও রনভির সিংহের মায়ের চরিত্রে অমৃতা সুভাস, কিংবা জায়রা ওয়াসিমের মায়ের চরিত্রে মেহের ভিজ আমাদের চোখে জল এনে দেয়।

ভারতবর্ষে ওটিটি আসার পর থেকে গল্পের অভিনবত্ব এসেছে নিঃসন্দেহে। প্যান্ডেমিকের পরে প্রথম সারির হিন্দি সিনেমার তারকরাও স্ট্রেইট টু ওটিটির জন্য সিনেমাতে অভিনয় করছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই, বেশ কিছু নতুন ধরনের গল্পও দর্শক খুঁজে পেয়েছে, মিমি, ডার্লিংস, জলসা, হেলিকপ্টার ইলা, ত্রিভঙ্গ জাতীয় সিনেমা আমরা দেখতে পেয়েছি। যেখানে মিমি সারগেসি আর মাতৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে, সেখানে জলসা দুই মায়ের জুজুধান, ত্রিভঙ্গ সেখানে তিন প্রজন্মের জমে থাকা ক্ষোভের, আর অভিমানের গল্প।

সম্প্রতি জি ফাইভের সাস বহু আচার প্রাইভেট লিমিটেড এর কথা মাথায় আসছে। অত্যন্ত ঘরোয়া এই গল্পে আমরা দেখতে পাই তিন মাকে। ভারতীয় টেলিভিশনের কুচুটে শাশুড়ি পেরিয়ে, এক মাকে দেখি যিনি ছেলের প্রাক্তন বউয়ের ব্যাবসা দাঁড় করানর জন্য উদয় অস্ত পরিশ্রম করেন। নেটফ্লিক্সের ডার্লিংস এও আমরা শেফালি শাহ কে এক সম্পূর্ণ অন্যরকম মায়ের চরিত্রে দেখি, যিনি মেয়েকে জোর করে সংসার করার পরামর্শ দেন না, বরং অত্যাচারী স্বামীকে মেরে ফেলার পরামর্শ দেন।

বাংলা সিনেমা, তথা ভারতীয় সিনেমার সাবালকত্ব প্রাপ্তি যে পথের পাঁচালী-র হাত ধরে, সেখানে সর্বজয়াই গল্পের কাণ্ডারী। পরবর্তী সময়ে উনিশে এপ্রিল, তিতলি, পারমিতার একদিন সিনেমাগুলো তৈরি হয়েছে

মা আর তার মেয়ে/ছেলের বউ এর সম্পর্কে কেন্দ্র করে। বাংলা টেলিভিশন যদিও এখনও ফর্মুলার বাইরে বেরতে পারেনি। বাংলা ওটিটিও এই বিষয়ে এখনও সাবালকত্ব পায়নি। মহামায়া জাতীয় কিছু প্রচেষ্টা হয়ে থাকলেও, তার গুনমান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এতখানি গৌর চন্দ্রিকার পরে আসি মুল বক্তব্যে। এই যে এতগুলো সিনেমার, চরিত্রের নাম বললাম, এর মধ্যে কখনও কি আমরা খারাপ মায়েদের দেখতে পাই? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, আলোচনা করতে হবে, খারাপ মা কে? আমাদের সমাজ খারাপ মা বলতে কি শিখিয়েছে? এমন মা, যিনি নিজের সমস্ত সখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে নিজের সন্তান প্রতিপালন করেন না। এমন একজন মা, যিনি নিজের জীবনের প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত শুধু সন্তানের কথা ভেবেই নেন না, এমন একজন মা, যিনি নিজেকে ভালোবাসেন, নিজের পেশাকে ভালবাসেন, নিজের পেশাকে শুধুই অর্থ উপার্জনের মাধ্যম মনে করেন না। উপরে আমি যে লম্বা সিনেমা গুলোর লিস্ট দিলাম, এদের মধ্যে কতজন মায়ের পেশা আছে? কতজন মা শুধুই ফুল টাইম মা নন? কিছু পুরনো সিনেমার ক্ষেত্রে মায়েদের চাকরি বা পেশা থাকাটা স্বাভাবিক না হলেও সমসাময়িক সিনেমাও এই বিষয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে। বরং আমরা এমন অনেক চাকুরীরতা ভিলেইন মা দেখেছি যারা স্বার্থপর, যারা দায়িত্বজ্ঞানহীন, যারা শুধুই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু মা হয়ে উঠতে পারেননি।

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক, অর্থাৎ এমন এক সমাজ ব্যাবস্থা যেখানে পুরুষরাই ক্ষমতার অধিকারে থাকেন এবং মহিলারা সেখানে স্থান পান না। এটা এটা সমাজ ব্যাবস্থা, যেটা যুগের পর যুগ ধরে লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাইকে সমান ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাই আজ মা-ঠাকুমারাই ছেলেদের রান্না ধরে ঢুকতে দেননা। এই পুরুতান্ত্রিক সমাজ আমাদের কিছু সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়েছে। যেমন নারী মানেই গৃহকর্মে নিপুণ, পুরুষ মাত্রেই উপার্জনের মাধ্যম, পুরুষের চোখে জল এলে সে মেয়েলী। কারণ? মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা। গবেষকদের ঠিক তেমনই মাতৃত্বেরও কিছু মাপ কাঠি আমাদের পুরুষতন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে। যেমন, ১) শিশুর সঠিক লালন পালন শুধু মাত্র তাঁর মা-ই করতে পারে, ২) মাকে ২৪ ঘণ্টা একাগ্র ভাবে শুধু মাত্র মায়ের ভূমিকাই পালন করতে হবে, ৩) নিজের কথা না ভেবে মায়েদের সর্বক্ষণ সন্তানের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিতে হবে, ৪) মাতৃত্বেই এক নারীর সর্বোচ্চ প্রাপ্তি, এবং পরিপূর্ণতা, এর বাইরে তাঁর কোন কিছু পাওয়ার থাকেনা,

৫) মায়েদের সব সময় নিজের সন্তানের জন্য অপর্যাপ্ত সময়, এবং কর্মশক্তি থাকতেই হবে।

এর অন্যথা হলে কী হবে? এর অন্যথা হলে সেই মহিলা মা হিসাবে অসফল, এবং অস্বাভাবিক। কারণ মায়েদের সাথে আমরা তুলনা করি প্রকৃতির, মায়েদের সাথে আমরা তুলনা করি দেশের। প্রকৃতি আমাদের মা, ভারতবর্ষ আমাদের মা। তাই প্রকৃতি বা দেশ আছে শুধু আমাদের দেওয়ার জন্য। তাঁদের চাওয়ার তো কিছু থাকতেই পারেনা। এরা আমাদের চিরজীবন শুধুই দিয়ে যাবে, বদলে বিশেষ কিছু আশা করবেন না, এটাই তো আমাদের প্রত্যাশা।

১৯৬০ এর দশকে সমস্ত ব্রিটিশ, এবং আমেরিকান টিভি সিরিজের মা হত গৃহবধূ। তাঁরা সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণ, স্বামী-সন্তানের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের কখনওই ক্লান্ত লাগেনা, রাগ-বিরক্তি হয়না, তাঁদের অবসাদ নেই, তাঁরা বাড়িতেও সুন্দর সেজে গুজে বসে থাকেন। চেনা লাগছে কি? আমাদের বর্তমান হিন্দি বাংলা সিরিয়ালের গল্পের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার প্রায় সমস্ত বাড়িতে টিভি এসে গিয়ে ছিল, তখন পুরুষতন্ত্রের জোরে সমস্ত মহিলা চরিত্রই ছিল ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণ, যারা বাড়িতে থেকে সন্তান প্রতিপালন করার মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পান। ভারতবর্ষে টিভি এসেছে অনেক পরে। তাই ৮০ এবং ৯০ এর দশকে টিভি ছিল শহুরে মধ্যম। সেখানে ইধার উধার-এর মত সিরিয়াল হত। যেখানে গৃহকর্মে আনাড়ি দুই চাকুরিরতা মেয়ে থাকত একসাথে। কিন্তু ৯০ এঁর দশকের মাঝামাঝি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আসে, টেলিভিশন পৌঁছয় গ্রামে গঞ্জে। একতা কাপুর নিয়ে আসেন কিউকি কি সাস ভি কভি বহু থি, এবং কাহানী ঘর ঘর কি। এই দুই সিরিয়ালের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা উড়িয়ে নিয়ে যায় টেলিভিশনের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনাকে, এবং টিভি ভরে যায় সুন্দরী, অশিক্ষিত/স্বল্প শিক্ষিত/ শিক্ষিত, গৃহবধূতে। যারা বছরের পর বছর যৌথ পরিবারে থেকে, শ্বশুরবাড়ির অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে সকলের মঙ্গলের জন্য হাসি মুখে বলিদান দিয়েই চলেন। টেলিভিশনের গল্প প্রগতিশীল, নিদেনপক্ষে সমসাময়িক হওয়ার বদলে পিছন দিকে এগোতে থাকে।

৮০-র দশক এবং ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে টেলিভিশনের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার জায়গায় এখন এসেছে ডিজিটাল মাধ্যম। ভারতের প্রথম ওয়েব সিরিজ ছিল টিভিএফ নির্মিত ইউটিউব সিরিজ

পার্মানেন্ট রুমমেটস, সেখান থেকেই ভারতে ডিজিটাল মাধ্যমে গল্প বলার সূচনা। সেখানে মহিলাদের নিয়ে, মায়েদের নিয়ে অনেক জটিল গল্প উঠে আসছে যেগুলোর গভীরতা, এবং সূক্ষ্মতা সমসাময়িক সিনেমা বা টিভি সিরিয়ালের থেকে অনেকটাই বেশি। কারণ টিভিএফ এর নির্মাতাদের মতেই ওটিটি এর দর্শক এক প্রজন্ম, যারা বিগত ১৫-২০ বছর ভারতীয় টেলিভিশন দেখা ছেড়ে দিয়েছিল। বেনারসি আর হিরের গয়নায় সুসজ্জিত গৃহবধূর গল্পে তাঁরা উৎসাহ হারিয়েছিলেন। তাঁরা টরেন্ট থেকে ডাউনলোড করে আমেরিকান টিভি সিরিজ দেখতেন।

সিনেমা, টিভি সিরিজ, ডেলি সোপ, টিভির বিজ্ঞাপন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নতুন অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা আরেকটু পুরনো সময়ে যাই, তাহলে আমাদের সাহিত্যও কিন্তু এই কথাই বলে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের উদাহরণেও কিন্তু মায়েদের এই উপরোক্ত রূপই আমরা দেখি, সে চর্যাপদই হোক, বা মনসা মঙ্গল কাব্য, বা লক্ষ্মীর পাঁচালী। রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকেই মায়েদের বলিদানের প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখিয়েছেন। আমাদের রামায়ণ মহাভারতও এর ঊর্ধ্বে নয়। ঐতিহাসিক ভাবে ইংরেজি সাহিত্যও খুব ব্যাতিক্রমী নয়। তাই অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম হিসাবে নতুন হলেও মতাদর্শ বা চিন্তা ধারার দিক দিয়ে নতুন অবশ্যই নয়।

কিছু আমেরিকান এবং ব্রিটিশ গবেষণা অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়া এসে সমস্যাটা আরই গভীর করে দিয়েছে। চিরকাল আমরা বইতে পড়েছি, টিভি সিরিয়ালে, সিনেমাতে, ওটিটির সিরিজে, বিজ্ঞাপনে দেখেছি মা কি রকম হওয়ার কথা। এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে সারাদিন সফল মায়েদের ভিডিও ব্লগ দেখি, তাঁদের লেখা পড়ি, হাসি খুশি বাচ্চা সমেত তাঁদের ছবি দেখি, তাঁদের মাতৃত্বের সাফল্যের গল্প শুনি। যেমন আমরা সারাদিন ফিলটার দেওয়া সেলফি তুলে নিজেদের খুঁত ঢেকে আত্মস্তুতি করি, তেমনই নিখুঁত মাতৃত্বও এখন কাম্য। আমাদের গালের দাগ যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখানো যায়না, ঠিক তেমনই আমাদের মাতৃত্বের খামতিও সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখতে হয়। আর মাতৃত্বের খামতি কি? কে ঠিক করে দেবে? পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কারণ যে মা মাতৃত্ব নিয়েও ১০০ শতাংশ সন্তুষ্ট নন, তিনি অস্বাভাবিক। যে মা নিজের সন্তানের জন্য নিজের চাওয়া পাওয়া বিসর্জন দিতে রাজি নন, তিনি অস্বাভাবিক। যে মা নিজের সব কাজ সামলে সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না, তিনি অসফল। আর এই দেখনদারির যুগে যখন নিজের সমস্ত খুঁত ঢেকে নিজের প্রাচুর্য, সৌন্দর্য, আর সাফল্য

দেখানোই রীতি; সেখানে কোন মা-ই বা সাহস করে বলবেন, যে তিনি শুধু মাত্র সন্তানের লালন পালন করেই সন্তুষ্ট নন, খুশি থাকার জন্য তিনি আরও কিছু চান।

আচ্ছা আমরা কি এটা ভেবে দেখি, যে মায়েরাও মানুষ? ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক মিডিয়া, আমাদের আশে পাশের মানুষ, আমাদের সমাজ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সব্বাই মিলে আমরা মায়েদের ভগবান বানিয়ে ফেলি। আর মায়েরা ভগবানের দায়িত্ব পালন করতে করতে সারাজীবন কাটিয়ে দেন। নিজেরদের সমস্ত শখ আহ্লাদ বিসর্জন দেওয়াটাই দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেন। প্রত্যেক চাকুরীরতা মা সীমাহীন অপরাধবোধে ভোগেন, আর না ভুগলে তাঁদের আশে পাশের লোকজন মনে করিয়ে দেন যে তাঁদের অপরাধবোধ থাকা উচিৎ।

তাহলে? মায়েরা কবে ঠাকুরের সিংহাসন থেকে নেমে মানুষ হবেন? আমরা কবে তাঁদের রক্ত মাংসের মানুষ ভাবব? যাঁদের ভুল হতে পারে? যারা ক্লান্ত হতে পারেন? এক মা হয়ত ৩-৪ ঘণ্টা অফিসে যাতায়াত করে ৮ ঘণ্টা শিফট করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে চুপ চাপ শুয়ে টিভি দেখতে চায়, কিন্তু তিনি মা, সন্তানকে বাসি/বাইরের খাওয়ার দিতে পারেন না। তাই ওনাকে রাতেও রান্না করতে হয়। মায়েদেরও ইচ্ছে করে সিনেমা দেখতে যেতে, বাইরে খেতে যেতে, ঘুরতে যেতে কিন্তু সন্তানকে রেখে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই বাচ্চাদের অনেকটা বড় হয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হয় নিমিত্তমাত্র স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য।

বাচ্চার জন্ম মানে এক মায়ের উপর দিয়ে শারীরিক, এবং মানসিক ঝড় বয়ে যাওয়া। জন্মের আগে এবং পরে মাসের পর মাস বিনিদ্র রজনী কাটানো, জন্মের পরে একটা মানুষের সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া, বছরের পর বছর ছুটি বিহীন, বিরতিহীন এক চাকরি করে যাওয়া। তাঁদেরও কি বিরতির প্রয়োজন হয়না? সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে পালাতে ইচ্ছে করেনা? কিন্তু আমাদের আশে পাশের কতজন মাকে আমরা বলতে শুনেছি যে তাঁরা বিরক্ত, ক্লান্ত, এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে অনিচ্ছুক? রাগের মাথায় সব মা-ই বলেন সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু কতজন কথাটা গুরুত্ব নিয়ে বলেন? আর বললেই বা আমরা কতজন তাঁদের কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনি? উত্তরটা সহজ, কারণ আমরা জানি মায়েরা যাবে না। মায়েরা যেতে পারবে না। তাই তাঁদের বছরের পর বছর ধরে করা অভিযোগ আমরা অবহেলায় এড়িয়ে যাই।

সিনেমার কথায় যদি ফিরি, আমরা যতগুলো হিন্দি – বাংলা – ইংরেজি সিনেমা, টিভি সিরিজ দেখে অভ্যস্ত সেখানের সব মা-ই এই একই ছাঁচে তৈরি। তাঁরা নির্দ্বিধায় নিজের চাওয়া পাওয়া ভুলে ভগবানের সিংহাসনে বিরাজ করেন। সন্তানের জন্মের পরে ১০ থেকে ২০ শতাংশ মা-ই ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ভোগেন, কিন্তু টিভিতে, সিনেমাতে, বিজ্ঞাপনে আমরা কতবার সে কথা শুনি? কতজন রক্ত মাংসের মা দেখি আমরা? এমন একজন মা, জিনি নিশ্চিন্তে সমাজের ভয় না পেয়ে বলেন যে তাঁরা ক্লান্ত, তাঁদের বিরতি চাই, নিজেদের সন্তানদের থেকে বিরতি চাই? ইংরেজি সিনেমা বা টিভি সিরিজে কিছু উদাহরণ থাকলেও, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সব মা-ই ভগবান।

এক সর্বজয়া অপুকে বলার চেষ্টা করেছিল নিজের শখের কথা, অপুর টাকায় নিজের চিকিৎসা করানোর কথা, কিন্তু বাবা হরিহরের মতই অপুও শোনার আগেই ঘুমিয়ে পরে। বন্ধু যখন অপুকে জিজ্ঞেস করে ছুটিতে বাড়ি না গেলে মা রাগ করবে কিনা, অপু বলে “ম্যানেজ করে নিয়েছি... ২টো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।” মন্দির থেকে বাস্তবের মাটিতে নামে মা ছেলের সম্পর্ক। উনিশে এপ্রিলের সরোজিনী বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন অন্তঃসার শূন্য, তিনি ভালো মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারেননি বলে। ডার্লিংস এর সামসুনিসা আমাদের চেনা ছকের আটপৌরে সংরক্ষণশীল মায়েরদের থেকে অনেকটা আলাদা হলেও মায়ের ভূমিকা পালনে তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে। মিমি সিনেমাতে মিমির চরিত্রে কৃতি স্যানন এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিতীয়বার না ভেবে নিজের হিরোইন হওয়ার সব স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে সন্তানের লালন পালনের সমস্ত দায় নিয়ে নেয়। এমন এক সন্তান, যে তাঁর নিজের নয়, যে অনাকাঙ্ক্ষিত; তাঁর মা হতে গিয়েও নিজের চাওয়া পাওয়া ভুলতে এক সুন্দরী সম্ভবনাময় যুবতীর মধ্যে কোনই দ্বিধা দ্বন্দ্বই তৈরি হয়না। দিল্লী ক্রাইম-এ শেফালী শাহ অভিনীত ভর্তিকা চতুর্বেদী চূড়ান্ত সফল দুঁদে পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও নিবেদিত মা। সিজেন ২ তে, অপরপ্রান্তে যখন সোলাঙ্কির চরিত্রে অভিনয় করা তিলোত্তমা সোম ধরা পরে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ছেলেকে ছেড়ে চলে গেল কেন? সোলাঙ্কি জানায় তাকে কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসাই করেনি সে মা হতে চেয়েছিল কিনা। তাই আমাদের মেনে নিতে একটুও অসুবিধা হয়না যে, যে মা তাঁর সন্তানকে ছেড়ে চলে যায়, সে সাইকোপ্যাথ, খুনি, দাগি আসামি।

ইংরাজি ফ্যান্টাসি সিরিজ গেম অফ থ্রোন্স, যেখানে সবাই ধূসর,

চতুর, ক্ষমতা লোভী, সেখানেও সারসেই ল্যানাস্টারের মত স্বার্থপর ভিলেইনও মা হিসাবে ১০০ তে ১০০ পায়। তাহলে কি এমন মা নেই যিনি নিজের খুশিকে প্রাধান্য দেন? বা যদি দিতে নাই পারেন, অন্তত প্রাধান্য দিতে চান? তাঁদের ইচ্ছে করে নিজের জন্য একটু সময় দিতে, নিজেদের চাকরি, নিজেদের পেশাকে আরেকটু প্রাধান্য দিতে? বিগত ১০-১৫ বছরে ছবিটা খুব আসতে আসতে একটু একটু করে পালটালেও, আমাদের সেকুলার হিন্দি সিনেমার কোন নায়িকাই মা হওয়ার পরে আর রুপোলী পর্দায় ফিরতেন না। তাঁদেরও কি কখনও ফিরতে ইচ্ছে করেনি? ঘটনাটা বোধহয় তাই নয়, ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। আমাদের সমাজ আমাদের যুগ যুগ ধরে বুঝিয়েছে মাতৃত্বই মেয়েদের সব থেকে বড় পাওয়া, সব থেকে বড় দায়িত্ব, সব থেকে মহান অবদান। তাই মাতৃত্ব থেকে বিরক্ত ক্লান্ত হয়ে, ছুটি নেওয়ার সাধ থাকলেও সাহস খুব কম মানুষেরই থাকে। সাহস বলছি কারণ একটা ছোট্ট ছুটি চাইলেও চোখ রাঙিয়ে ওঠে আমারদের চতুর্দিকের মানুষ গুলো। মায়েরা বলার সাহসই পায়না।

২০০০ সালের আগে পর্যন্ত হিন্দি সিনেমার কোন হিরোইনই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরে জন সমক্ষে আসতেন না। এবং মা হওয়ার পরে তাদের কেরিয়ার শেষ বলে ধরেই নেওয়া হত। অবশ্য সেটা অংশত এই কারণে যে আমাদের হিন্দি মুল ধারার সিনেমা হিরোইনরা শুধু মাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই থাকেন। সিনেমার গল্পে তদের ভূমিকা কমই থাকত, তাই মা হওয়ার জন্য ২-৩ বছর বিরতি নেওয়ার পরে যদি কোন হিরোইন কাজে ফিরতেও চাইতেন, ততদিনে তাঁর জায়গায় কোন নতুন তরুণী সুন্দরী চলে আসত। জয়া ভাদুরি, শ্রীদেবীর মত দাপুটে অভিনেত্রীরাও মা হওয়ার পরে রুপোলী পর্দা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সম্প্রতি আলিয়া ভট, করিনা কাপুর, বা বিগত দশকে ঐশ্বর্য রাইরা কিছুটা হলেও সেই বাঁধা ভেঙেছেন। এ তো গেল রুপোলী পর্দার কাহিনী, পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য মহিলা মা হওয়ার পরে আর নিজেদের পেশাতে ফেরেননি। রিসার্চরা কর্মরত মায়েদের মূলত দুই ভাগে ভাগ করেন। এক যারা নিজেদের পেশা নিয়ে সচেতন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আর অন্য দলের কাছে নিজেদের সন্তান, পরিবারই অগ্রাধিকার পায়। চাকরি তাদের কাছে গৌণ। কিন্তু এর বাইরেও এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত মা আছেন, যারা পেশাগত ভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও, সন্তানের জন্মের পরে আর কাজে ফেরেননি। এর বহুবিধ কারণ আছে। কিছু গবেষকদের মতে এক নারীর কর্মস্থলে না ফেরার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে, তাঁর পারিবারিক, এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের

উপরে নির্ভর করে সে কাজে ফিরবে কিনা। আমাদের উপমহাদেশে অবশ্যই মা-বাবা, স্বামী, শ্বশুর বাড়ির লোক জনের চাপে পরে অনেক মা-ই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কর্মস্থলে ফিরতে পারেন না। অনেকেই আবার ইচ্ছে করেই ফেরেননা। মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক গঠনও এর জন্য দায়ী। গবেষণা অনুযায়ী কিছু মেয়ে পেশাদারিত্বের জীবন পছন্দ করে, কিছু মেয়ে পারিবারিক জীবনে আনন্দ খুঁজে পায়, আবার অনেকেই দুটোর ভারসাম্য চান। হাফিংটন পোস্টের এক গবেষণা অনুযায়ী সমস্যা আরও গভীরেও আছে। মা হওয়ার সাথে সাথে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তাঁদের মনে হতে শুরু করে যে, তাঁদের আর কর্ম জগতে ফেরার যোগ্যতা নেই। এর সাথে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশান, সামাজিক এবং পারিবারিক সমর্থনের অভাব তাঁদের বাড়িতে থাকতে বাধ্য করে।

আমার এক বন্ধু ডাক্তার, সিঙ্গেল মাদার, অসম্ভব যত্নে নিজের ছেলেকে মানুষ করছেন। তিনি নিজের জন্য একটু দামী কিছু কিনলে তাঁর মা বাবা বলেন, “নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে রেখে যে চাকরি করছ, এভাবে সেই টাকা নষ্ট করবে? এই জন্যই ছেলেকে ডে কেয়ারে রেখে যেতে?” উল্টো দিকে আমার এক ইউক্রেনিয়ান প্রেফসর কলিগ, যিনি ১৬ বছর বয়েস থেকে আমেরিকাতে বড় হয়েছেন, আমার অফিসে এসে একদিন বললেন, “আমার বাবার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে...” আমি ওনার বাবার জন্য সমবেদনা জানানো শুরু করার আগেই উনি বললেন, “আমার প্রায় দু সপ্তাহ কোন চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট ছিল না...” (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওনার ৯ বছরের মেয়ে সপ্তাহের তিন দিন ওনার কাছে, আর ৪ দিন ওনার মা বাবার কাছে থাকে) আমি আবারও সমবেদনা জানানোর চেষ্টা করতেই উনি উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, “মেয়ে গত ১৫ দিন ধরে সারাদিন বাড়িতে ছিল...। আমি ক্লান্ত, আমি ওকে আদর করে, ওর সাথে কথা বলে, ওর আবদার শুনে শুনে ক্লান্ত... আজকে ও দাদু দিদার বাড়িতে যাবে... আমি খাওয়ার অর্ডার করে রাত্তিরে শুধু শুয়ে শুয়ে টিভি দেখতে চাই।” উনি স্বেতাঙ্গিনী মা হলেও, আমদের ভারতীয় মায়েদের কি কখনই এরকম মনে হতে পারে না? আর মনে হলে কি তাঁরা শান্তিতে নির্ভয়ে সেটা কাউকে বলতে পারে না? আর আমরা কি তাকে জাজমেন্টাল না হয়ে সমবেদনার চোখে দেখতে পারি না? আজকে এক স্বেতাঙ্গিনী মা যেটুকু গল্প করে মনে শান্তি পাচ্ছে, আমাদের উপমহাদেশের মায়েদের কি সেই অধিকার টুকুও নেই?

আসলে নেই, নেই কেন? কারণ পুরুষতন্ত্র আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে

মাতৃত্বের ঊর্ধ্বে নারীর কোন আশা আকাঙ্খা নেই, থাকতে পারে। নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে। আর মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার পরে আর নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার থাকতে পারেনা। তাই আমাদের মিডিয়া, সেই ভাবধারার ধারক ও বাহক হয়ে একই গল্প দেখিয়ে চলেছে। যে কোন সামাজিক পরিবর্তন, চিন্তা ধারার পরিবর্তন আনতে গেলে মিডিয়ার মধ্যস্ততা অপরিহার্য। কিন্তু সেই মিডিয়াই যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে সার্বিক পরিবর্তন আসা অসম্ভব।

'সিনেমা is too powerful to be only entertainment' শুধুই বিনোদন হওয়ার জন্য সিনেমা অতিরিক্ত ক্ষমতাশীল। সিনেমা একাধারে আমাদের সমাজের আয়না। সেই আয়নাতে আমরা যেমন আমাদের সৌন্দর্য উপভোগ করি, তেমনই আমাদের ব্রণ, পাকা চুল, পোড়া দাগও দেখা যায়। অন্যদিকে সিনেমা আমাদের মোমবাতি, সমাজের যে জিনিস গুলো নিয়ে খুব কম কথা হয়, যে মানুষ গুলোকে, যে সমস্যা গুলোকে, যে আলোচনা গুলোকে আমরা প্রতিদিনের ব্যাস্ত জীবনে ভুলে যাই, অথবা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি, সিনেমা সেগুলোকে আলোর সামনে ধরে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আজকে অক্ষয় কুমারের প্যাডম্যান, টয়লেট, সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলছে। সেরকমই মায়েদের মানুষ ভাবানোও সিনেমার তথা মিডিয়ার দায়িত্বের মধ্যে পরে বইকি।

এই প্রসঙ্গে কিছু সিনেমা আর টিভি সিরিজের কথা মাথায় আসছে। ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিদ্যা বালান অভিনত হিন্দি সিনেমা শাকুন্তলা দেবী, এক মহিলার কাহিনী যিনি নিজেকে ভালো বেসেছিলেন। এবং শুধুমাত্র সন্তানের মুখ চেয়ে এক জায়গায় আটকে থাকেননি। অন্য অনেক বিষয়ের মতই এই রকম একটা জটিল বিষয় নিজে বিদ্যা সাহস করে সিনেমাটিতে অভিনয় করেছিলেন। সিনেমাটির অতিরিক্ত বাণিজ্যিকিকরনের জন্য সিনেমার মূল বক্তব্য একটু তরল হয়ে গেলেও সিনেমাতে আমরা অন্তত পক্ষে এক দেবী রুপী মাকে দেখিনা।

২০০০ সালে মুক্তি পায় জুলিয়া রবার্টস অভিনীত বায়োপিক এরিন ব্রকভিচ। বিউটি কুইন, দুইবার ডিভোর্সি, তিন সন্তানের মা, এরিন কাজ খোঁজে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার পরে, জীবনে প্রথম এরিনকে কেউ সম্মানের চোখে দেখে। নিজের কাজকে ভালবাসে এরিন। বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হলে এরিন বলে, "জীবনে প্রথম আমি ঘরে ঢুকলে মানুষ আমার শরীরের দিকে না তাকিয়ে আমার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছে। এই

প্রথম আমার নিজেকে মূল্যহীন মনে হচ্ছে না..."

২০১৭ থেকে ১৯ অবধি এইচবিও তে রিলিজ হয় বিগ লিটিল লাইজ - এর দুটি সিজেন। নিকোল কিডম্যান, রিজ উইদারস্পুন, সেইলীন উডলি, এবং লরা ডার্ন অভিনীত এই সিরিজ মায়েদের গল্প। এঁদের কেউ টেক কোম্পানির সিইও, কেউ দুঁদে উকিল ছিলেন কিছু সন্তানসম্ভবা হওয়ার পরে অবসর নিয়েছেন, কেউ আবার পার্ট টাইম ভলেন্টিয়ার আর কেউ সিঙ্গেল মাদার, কোন রকমে সংসার চালিয়ে নিজের সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সিইও মা, লরা ডার্ন, নিজের স্বামীকে বলে, "আমায় প্রত্যেকে ঘৃণা করে, কারণ কোন মা চাকরি করে? শুধু মাত্র দায়িত্ব জ্ঞানহীন মায়েরাই..." অপরপক্ষে অবসরপ্রাপ্ত উকিল নিকোল কিডম্যান বন্ধুর প্রয়োজনে দীর্ঘ বিরতির পরে, একটি আইনি লড়াইতে জিতে, সবার অলক্ষ্যে নিজের প্রিয়তম বন্ধুকে বলে, "গত ৬ বছর ধরে আমি বাচ্চার সর্দি মুছেছি... আমি শুধু মা হয়েই থেকে যেতে পারব না... আমি এতে সন্তুষ্ট নই। আমি জীবনে আরও কিছু চাই।" অর্থাৎ এক মায়ের সফল কর্মজীবন থাকলেও তিনি অপরাধবোধে ভুগতে বাধ্য, আবার অবসর নিয়ে নিলেও তিনি কাউকে সাহস করে বলতে পারবেননা না যে শুধুই মাতৃত্বে তিনি সন্তুষ্ট নন।

২০২১ সালে এইচবিও - মিনি সিরিজ সিন্স ফ্রম এ ম্যারেজ মুক্তি পায়। জেসিকা চ্যাস্টেইন এবং অস্কার আইজ্যাক অভিনীত সিরিজ প্রশ্ন করে মাতৃত্বকে, প্রশ্ন করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে। এখানে জেসিকা স্বামীর থেকে বেশি উপার্জন করে, জেসিকার নিজের পেশায় অত্যন্ত সফল। কিন্তু স্বামী সন্তানে তৃপ্ত না হয়ে জেসিকা প্রেমে পরে অন্য এক ছেলের। জেসিকার যৌন আকাঙ্খা ছাপিয়ে যায় তাঁর মাতৃত্বকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ এর সিন্স ফ্রম এ ম্যারেজ ১৯৭৩ সালের সুইডিশ সিরিজের রিমেক। ১৯৭৩ এর গল্পে যেখানে পুরুষ এক অন্য নারীর প্রেমে পরে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানকে ত্যাগ করেছিল, এখানে নারী সেই একই কাজ করে। এক মায়ের চরিত্রকে সমস্ত রকম শারীরিক, জৈবিক, এবং মানসিক চাহিদার ঊর্ধ্বে না রেখে সিন্স ফ্রম এ ম্যারেজ দেখায় যে এক মায়েরও স্বামী সন্তান নিয়ে দৈনন্দিন জীবন শুষ্ক লাগতেই পারে, তিনিও বিরক্ত, ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন।

একটু আগে উদাহরণ দিয়েছিলাম গেম অফ থ্রোন্স - এর যেখানে স্বার্থপর, কুটিল, ক্ষমতা লোলুপ, প্রতিহিংসা পরায়ণ চরিত্ররাও মা

হিসাবে মহান। জর্জ আর আর মারটিনের কাহিনী অবলম্বনে সিরিজটির প্রথম সিজেন মুক্তি পায় ২০১১ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম সিজেনের উপন্যাসটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৬ সালে। ২০২২ সালের ২১ শে আগস্ট মুক্তি পায় গেম অফ থ্রোন্স এর প্রিকুয়াল হাউজ অফ ড্রাগন এর প্রথম এপিসোড। ২০১৮ তে লেখা মারটিনেরই বই থেকে তৈরি এই সিরিজে অন্তঃসত্ত্বা রানি রাজাকে বলে, "সন্তানের জন্ম দেওয়া আমার পক্ষে একটা মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া। আমি ক্লান্ত, আমি জানি তোমায় পুরুষ সন্তান দেওয়া আমায় কর্তব্য, আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু এবারেও যদি ছেলে না জন্মায়, তাহলে এই শেষ। এর পরে আমি আর অন্তঃসত্ত্বা হতে পারব না।" যেখানে ২০১১ এর প্রথম সিজেনে কিশোরী ডেনেরিস সন্তানের জন্ম দেওয়াকেই নিজের সব থেকে বড় লক্ষ মনে করছেন, সেখানে ২০২২ সালের রানি বলছেন যে সন্তানের জন্ম দেওয়া, অন্তঃসত্ত্বা থাকা, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে যন্ত্রণাদায়ক। তিনি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান। যেখানে গেম অফ থ্রোন্স এর সমস্ত নারী চরিত্র মাতৃত্বকেই পরম প্রাপ্তি ভাবতেন, সেখানে ২০২২ এর সিরিজ, হাউজ অফ ড্রাগন-এ এক নারী তাঁর ভালবাসার পুরুষকে বলছে, আমি মা হতে চাইনা। আমি আমার বন্ধুদের জন্ম দেওয়ার সময় নরক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি, তাই আমি ঠিক করেছি আমি কোনদিন মা হব না।

২০২১ সালে মুক্তি পায় ম্যাগি জিলেনহল পরিচালিত, অলিভিয়া কোলম্যান অভিনীত ইংরেজি সিনেমা, দা লস্ট ডটার। সিনেমাতে অলিভিয়া কোলম্যানের চরিত্রের নাম লীডা। পিএইচডি এর থিসিস লেখার সময় লীডা দুই মেয়ের মা। স্বামীও তখন পিএইচডি শেষ করছেন। শেষের কয়েকটা বছর যে কোন ডক্টরাল ক্যান্ডিডেটের জন্যই ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ এবং মানসিক ভাবে পীড়াদায়ক। সেই সময় দুই ছোট্ট মেয়ের লালন পালন করতে গিয়ে লীডা বিধ্বস্ত হয়ে পরে। এবং দীর্ঘদিন অন্তরদ্বন্দের পরে নিজের মেয়েদের ছেড়ে চলে যায়। লীডা হয়ত এক চরম উদাহরন। কিন্তু এই ইচ্ছেটা কি কোনদিন কোন মায়ের হয়নি? আসলে হলেও তাঁরা বলার সাহসই পাননি, বেরিয়ে যাওয়া তো দুরস্থান। কারণ যে মা সন্তানকে ছেড়ে চলে যায়, তিনি তো সাইকপ্যাথ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেননা।

পশ্চিমের সমাজ ব্যাক্তিবাদী। তাই হয়ত ওঁদের পক্ষে এগুলো নিয়ে কথা বলা একটু হলেও সহজ। সিনেমা সিরিজের স্বেতাঙ্গিনী মায়েরা কেউ শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকেন না, বা তাঁদের মতামত অনুযায়ী
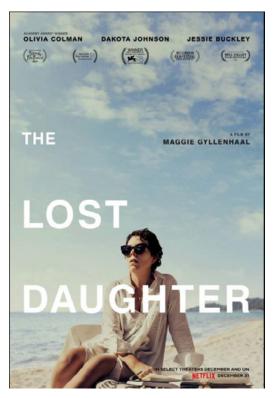
চলার দায় তাঁদের নেই। তবুও পর্দায় 'ব্যাতিক্রমী' মায়েদের সংখ্যা এখনও হাতে গোনাই।আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে চোখ রাঙানি অনেকটাই বেশী। হয়ত দেখা গেল মায়েদের নিয়ে একটু সাহসী চরিত্র লিখলে সে ছবিকে কেন্দ্র থেকে সার্টিফিকেটই দেওয়ার হবে না। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম গুলো এখনও কিছুটা হলেও স্বাধীন। যদিও ওটিটি প্রগতিশীল, কিন্তু ভারতীয় মায়েদের সংসার, স্বামী-সন্তান ব্যাতিত আশা-আকাঙ্খা দেখানোর ক্ষেত্রে এখনও লম্বা রাস্তা বাকি।

সমাজ পালটাচ্ছে। নারীদের অধিকার নিয়ে মানুষ সরব হচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে প্রথম বিশ্বের দেশ গুলোতে, এমনকি ভারতবর্ষেও জন্মের হার কমছে। পুরুষ তান্ত্রিক জাপানে, বিয়ের পরে মেয়েরা চাকরি ছাড়তে বাধ্য বলে মেয়েরা বিয়ে করছে না, পশ্চিমের দেশে মেয়ারা মা হতেই চাইছে না, কারণ মাতৃত্বের স্বাদ তাঁদের কাছে অপরিহার্য নয়। জাপানে বিয়ে এবং জন্মের হার বাড়ানর জন্য সরকার ডেটিং এর উপরে জোর দিচ্ছে। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় যদি ভেবে দেখি, সমাধানটা কি এভাবে সম্ভব? সমাজ নামক চাকা, পুরুষতন্ত্রের জোরে সন্তানের জন্মের পরে

তার প্রতিপালনের দায়িত্ব-কর্তব্য অসম ভাবে নারীর উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। মা হয়ে যাওয়ার পরে নারীর নিজের ছন্দে ফেরার কোনই উপায় রাখেনি। তাই হয়ত অনেকেই সন্তানের জন্মই দিতে চাইছেন না। আমাদের কি সামাজিক ভাবে, একটু সহিষ্ণুতার প্রয়োজন নেই? যে সমাজ একটু সমবেদনাশীল হবে। যুগের পর যুগ মায়েদের বলিদানকে পুজো করেই ক্ষান্ত না হয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, যাতে তাঁদের সারাজীবন শুধুই বলিদান না দিতে হয়। মিডিয়ার কাজ আলোচনা শুরু করা। এই আলোচনা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মিডিয়া শুরু করেছে, ভারতীয় মিডিয়া কবে আরেকটু তৎপর হয়ে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

রেফারেন্স:

১। হরিবল মাদার, ২০১৯, ইউনিভারসিটি অফ নেব্রাস্কা প্রেস
২। মম ইন দা মুভিজ, ২০১৪, সাইমন এন্ড শুষটার

চিত্রঋণ - ইন্টারনেট

সূচিপত্র

নিরুদ্দেশের পথে
তন্দ্রা ব্যানার্জী
অলঙ্করণ - জয়িতা সরকার
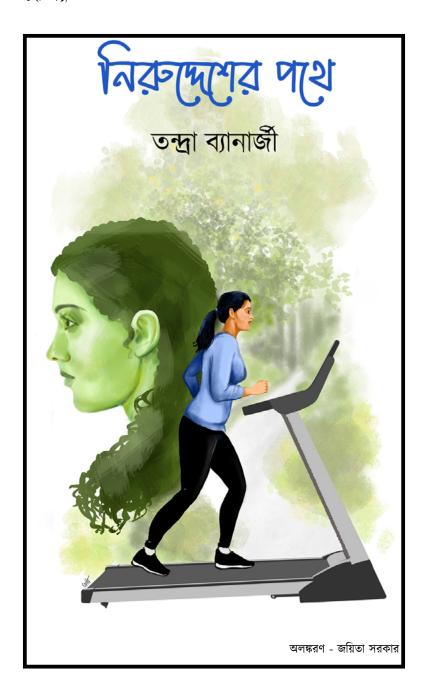
আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে ভালো করে দেখছিলাম। ওজনটা...সত্যিই বেড়েছে। একটা কিছু করা দরকার কিন্তু...কী করা যায় । সঙ্গীতা কৃপালনীর মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন পার্টিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। শখের সম্বলপুরী শাড়িটা ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে রেখেছি, অনেকদিন পরা হয় না । ব্লাউজটা পরতে গিয়ে দেখি - এমা, হাতাটা কিছুতেই ফিট করলো না। ছোট হয়ে গেছে। অসম্ভব বিরক্ত হয়ে কালো পাটোলা, ঘন নীল জারদৌসি এবং প্রিয় ক্রীম রঙের ঢাকাইটা পরতে গিয়েও একই অবস্থা হলো। ব্লাউজগুলোর হাত পেট সব যতটা পারা যায় টাঁক খুলে বাড়িয়ে নেওয়া কবে হয়ে গেছে । সুধন্য ঘরে ঢুকে "কী হলো রিতা, এখনো সাজ হয়নি? ক'টা বাজলো দেখেছো?" বলতে বলতে আমার রাগে ক্ষোভে কাঁদো-কাঁদো মুখটা দেখে বললো, "কী হলো আবার?"

সজল চোখে (আই-মেকআপের খেয়াল রেখে) বললাম, "দ্যাখো না, একটাও ব্লাউজ ফিট করছে না। কী যে করি।"

সুধন্য আমায় নিরীক্ষণ করে বললো, "ও হ্যাঁ...ইয়ে, একটা কিছু পরে নাও না...নিশ্চয়ই আছে কোনো একটা...মানে যেটা ফিট করবে।"

গোমড়া মুখে মভ রঙের কাঞ্জিভরমটা পরতে পরতে...ওটার ব্লাউজটা কিছুদিন আগেও বেশ আলগা হতো, এখন আঁট হলেও ফিট করে গেলো মোটামুটি...সুধন্যকে বললাম, "এতোটা মোটা হয়ে গেছি আগে কেন বলো নি, অ্যাঁ?" রাগটা কারো ওপর ঝাড়তে হবে তো। ও বিব্রত হয়ে বললো, "ইয়ে মানে আমি অতো লক্ষ করি না।" আয়নাটা আরেকবার দেখে নিয়ে গায়ে একটু পারফিউম স্প্রে করে ব্যাগটা তুলে নিয়ে গিফ্ট বগলে দুজনে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সুধন্য নিজেই ড্রাইভ করলো।

পার্টিতে গিয়ে যথারীতি হাসি গল্পগুজবে অংশ নিলাম কিন্তু মেজাজটা খারাপ হয়ে রইলো। বুফের প্রচুর লোভনীয় খাবার থেকে প্লেটে স্যালাড আর চিকেন তন্দুরি নিয়ে বসলাম। আমার বান্ধবী সুতনুকা আমার পাশে বসে একটু অবাক হয়ে বললো, "বিরিয়ানি আর কাবাব নিলি না আভরিতা ? ...পরে আবার তোর ফেভারিট বাদাম কুলফি আর ভ্যানিলা পাইনঅ্যাপেল ক্রীমও আছে, দেখেছিস। আর গুলাবজামুন।" আমি নিঃশ্বাস ফেলে সুতনুকার তন্বী দেহশ্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললাম, "নাঃ । হ্যাঁ রে ঠিক করে বল তো, আমার কি খুব ওজন বেড়ে গেছে?"

সুতনুকা এক টুকরো মোগলাই পরোটা মুখে দিয়ে আমায় একটু দেখলো। তারপর সন্তর্পণে বললো, "তা একটু...দ্যাখ আমাদের এই বয়সে এরকম হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে বুঝলি...তুই কোনো একটা ডায়েট

ফলো করলে পারিস। স্বাস্থ্যটাও জরুরি রে। আর ধর, কোনো একটা ব্যায়াম।" আমি ওর প্লেটের দিকে তাকালাম। ও হাসতে লাগলো।

"আভরিতা, তুই কি ভাবছিস আমি রোজ এতো ক্যালোরি খাই! সারা সপ্তাহ শাকপাতা মানে ওই স্যালাড স্যুপ ওইসব খেয়ে থাকি। শুধু এইসব পার্টিতে...। নিয়ম করে সাঁতার কাটি ক্লাবে। তোর এমন সুন্দর চেহারা, একটু লুজ করলেই দারুণ হয়ে যাবি আবার...।"

বাড়ি ফিরে এসে পোশাক বদলাতে বদলাতে ওই কথাগুলোই ভাবছিলাম। ছোটবেলায় টিঙটিঙে রোগা ছিলাম, মা জোর করে ডিম দুধ মাছ মাংস খাওয়াতেন। আর এখন! আমারই দোষ। আসলে খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম কিছুতেই মানতে পারি না। গরম ভাতে ঘি, ফিস ফ্রাই, ভালো মিষ্টি, কেক, আইসক্রীম, চকোলেট...ইসস। আর স্যালাড আমার দু-চক্ষের বিষ। এমনই কপাল যে সুধন্য আর সত্যব্রত দুজনেরই রোগার ধাত। দুবেলা রেজালা আর রাবড়ি খেলেও ওদের গায়ে লাগে না। সত্যব্রত আমাদের একটিই সন্তান। ও এবারে কলেজে পড়তে চলে গেছে ব্যাঙ্গালোর, সেজন্যও মন-টন ভালো থাকে না আজকাল। এই শৈল-শহরটি সুন্দর বটে কিন্তু ছোট, ভালো কলেজ কাছাকাছি নেই । এখানে এসেছি বছর পনেরো । সেরকম অন্তরঙ্গ দু-তিনজন ছাড়া বেশি কেউ নেই...আলাপ আছে অনেকের সঙ্গে যদিও। সুধন্যর পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপও বাড়ছে। আমার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হলেও সময় দিতে পারে না, আর বৌ-কোলে-নিয়ে বসে-থাকা স্বামী আমার পছন্দও নয়...। তাও বড়ো নিঃসঙ্গ লাগে আজকাল। ভালো লাগে না কিছু। ছেলেটাও কতো দূরে চলে গেছে। কতো পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় ছোটবেলাটাই ভালো ছিলো। মালদায় যৌথ পরিবারে বড়ো হয়েছি স্কুলে পড়ার সময়টা। মফস্বলের অন্য রকম জীবন । তুতো ভাইবোন, পাড়ার সঙ্গী সাথী, খেলাধূলো, কলাঝোপ আমবাগান, ধানক্ষেত ... । দুর্গাপূজো দোল দেওয়ালির উত্তেজনা । নিশ্চিন্ত দিনযাপন । কোথায় গেল সেসব সময় ! কতো বন্ধু ছিলো...মীরা, বনশ্রী, স্বাতী, ঝুমা...তাদের সঙ্গে আর যোগ নেই এখন। তারপর যৌথ পরিবার ভাঙলো। আর্থিক সমস্যা। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে হস্টেলে থেকেছি । বিয়ে হলো, দুর্গাপুরে বহুদিন ছিলাম। তিন ভাইবোনেরা দূরে দূরে। বাবা চলে গেলেন হঠাৎ হৃদরোগের আক্রমণে। মা এখন আছেন দাদার কাছে কলকাতায়। আজকাল কিছু মনে থাকে না মা'র। মনে পড়লো, এককালে মা মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করতেন চমৎকার।

রাতপোশাক পরে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। রাতের বেলা বাইরেটা ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। রাত্রিনীল আকাশে দূরে একটা আবছা

চাঁদ, মিটমিটে তারা... অসমতল উঁচু নিচু ঢেউয়ের মতো রাস্তা ঘাট টিলা পাহাড় জঙ্গল...কাছে দূরে টিপটিপ করে জোনাকির মতো আলোর সঙ্কেত।

মালদা থেকে চলে আসার সময় মন খারাপ হয়েছিলো খুব। উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার পরই চলে এসেছিলাম...কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম, তারপর যা হয়...। মীরার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। স্বাতী পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলো, দিল্লী চলে গিয়েছিলো কী যেন স্কলারশিপ পেয়ে। আর বনশ্রী...শুনেছিলাম বনশ্রী বাস দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলো, কলেজ যাওয়ার পথে। মনে আছে মনে খুব ধাক্কা লেগেছিলো জেনে। বনশ্রী ছোট থেকেই খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো আমার। পুতুল-খেলা আচার-চুরি লাইব্রেরির বই পাল্টা-পালটি করে পড়া...কতো কী...আশ্চর্য, কতো বছর হয়ে গেলো ওর কথা মনেই হয় নি। সময় ব্যাপারটাই অদ্ভুত। এতদিন পরে মনে পড়ছে...ওর পিঠ অবধি কোঁকড়া চুল একটা বেণী করে বাঁধা, জোড়াভুরুর নিচে বড়ো বড়ো চোখ, মিষ্টি শ্যামলা রঙ...

বিছানা থেকে সুধন্য বললো, “শুতে এসো, রিতা। আরে মন খারাপ করছো নাকি ? দূর ওসব তোমার ওই লুজ ফ্যাট, একটু ডায়েট এক্সারসাইজ করলেই ঝরে যাবে...।” এই বলে পাশ ফিরে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লো। দুত্তোর। সারারাত স্বপ্ন দেখলাম একটা বিশাল বুফের লাইনে আছি আর প্লেটে যতোই স্যালাড আর গাজর লেটুস তুলছি সেগুলো ঘি-চপচপে পোলাও আর চিংড়ির কাটলেট হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন ছুটি। ব্রেকফাস্টে বসে টোস্টে ভালো করে মাখন লাগাতে লাগাতে সুধন্য আমায় আড়চোখে দেখে বললো, “খানিক হেঁটে আসবে সকাল-বিকেল?”

নিজের প্লেটের ডিমসেদ্ধ এবং শুকনো টোস্টের দিকে চেয়ে শুকনো গলাতেই বললাম, “ওই চড়াই-উতরাই আমার দ্বারা হবে না বাপু। পা হাঁটু কনকন করে ।” আর রোজ ভোরবেলা ওঠা...উঃ। কোনো জিমও নেই এখানে। একটা ছিলো, কী সব আইনি ঝামেলায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা আছে সেটা অনেক দূরে। নিয়মিত আসা যাওয়া অসম্ভব।

সাঁতারের কথাটা আর তুললো না সুধন্য। জলে আমার দারুণ প্যানিক হয়, অল্প বয়সে একবার পুকুরে পড়ে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে যাই। ঐ ষষ্ঠীপুকুরে অনেকেই ডুবে মারা গিয়েছিল নাকি, এটা হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে মনে পড়ে। শ্বাসরোধকর ভয়ের স্মৃতি, এমনকি আমি বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রস্নানও করতে পারি না। এখন নিজের ওপরেই রাগ ধরছিলো। এখানে একটা যোগ ব্যায়ামের ক্লাস আছে বটে, মাঝে মাঝে গেলেও বিশেষ উপকার হচ্ছে না আমার। ক্লাসটা সকালের দিকে হয়, সন্ধ্যাবেলা দু-এক দিন মাত্র। আসলে অতো খদ্দের নেই তো।

দিনের বেলা কয়েক ঘন্টা আমি এখানকার ছোট্ট সংবাদপত্রের দপ্তরে গ্র্যাফিক ডিজাইনারের কাজ করি। ওই - লে-আউট, অ্যাড, এই সব। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ওখানে আমার সঙ্গে কাজ করে শীলা কুলকার্নি, ও একদিন আমায় বলছিলো মেদ কমানোর কী এক আয়ুর্বেদিক ওষুধ আছে নাকি। আমার তেমন বিশ্বাস নেই, আর...

ফোনটা বাজলো। সতু - সত্যব্রত। স্পিকারে খানিক এ কথা ও কথার পর হঠাৎ সুধন্য বলে বসলো, "তোর মা'র মন খারাপ বুঝলি সতু !"

আমি কটমট করে তাকালাম। সত্যব্রত একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, "কী হয়েছে মা ? এনি প্রবলেম ?"

"ওজন নিয়ে খুব চিন্তা করছে কাল থেকে।"

আমি ফোন কেড়ে নিয়ে বললাম, "না রে সেরকম কিছু নয়, আমি...।"

সতু বললো, "হুমমম। এটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে তোমায় মা। গতবার বাড়ি এসে আমি কিন্তু ভাবছিলাম...তুমি একটু রিডিউস করলে পারো। মানে স্বাস্থ্যের জন্যে...কোনো একটা ব্যায়াম করতে হবে। জানি সমস্যা আছে...তবু একটা কিছু ভাবো।"

"কী করবো বল তো। এই দ্যাখ না শুকনো টোস্ট, ডিমসেদ্ধ আর চিনি ছাড়া চা খাচ্ছি। কী ব্যায়াম করবো - ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ? ওতে ছাই হয়। সেবার স্কিপিং করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গোড়ালি মচকে গেলো...কী হবে আমার বল তো...।"

"আহাহা...মা, কুল ডাউন, ওরকম কোরো না। দাঁড়াও একটা সমাধান খুঁজে বের করা যাবেই।"

এর কদিন পরে ঠাণ্ডা লাগলো, গলা-ব্যথা, ক্লিনিকে দেখাতে গেছি। ডাক্তার মণিমালা সরকার আমায় দেখেশুনে ব্যবস্থাপত্র দিলেন, তারপর আমার চার্ট দেখে ভুরু কোঁচকালেন।

"মিসেস চৌধুরী, আপনার প্রেসার তো উঁচুর দিকে। পরিবারে হার্টের সমস্যা আছে বলেছিলেন না ? আমার মনে হয় রক্তে শর্করাও বর্ডার-লাইন। শুনুন, আপনাকে ওজন কমাতেই হবে, নইলে বিপদ হতে পারে।"

"আমি, মানে...।"

"খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল করুন। ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট - ভাত, আলু, চিনি, ভাজাভুজি তেল ঘি এসব একদম কমিয়ে দিন। পথ্য দিচ্ছি ।"

"চেষ্টা করছি...।"

"আর দৈহিক ব্যায়াম। খুব দরকার। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিন। একমাস পরে আবার আসুন।"

দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ঠিক করলাম ওই উঁচুনিচু রাস্তাতেই হাঁটবো এবার থেকে। দুপুরে ঘাসপাতা, রাত্তিরে দুটো রুটি সবজি আর একটু মাছের ঝোল বা মুরগির স্টু। ইস এভাবে বেঁচে থেকেই বা কী হবে। সুধন্য সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "ক'দিন পরে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখো। স্যালাড তো খারাপ জিনিষ না - বেশ লেবুর রস-টস দিয়ে...। আর অন্য জিনিস কম করে খেও নাহয়।"

"আর এক্সারসাইজ? ডাক্তার যা ভয় দেখালো...।"

বিকেলে সত্যব্রত ফোন করলো।

"মা, বাবা - প্রবলেম সলভড। বাড়িতেই মা এক্সারসাইজ করতে পারবে। তোমরা একটা ট্রেডমিল কিনে ফেলো। ওই যেমন জিমে থাকে। আজকাল বাড়িতে ব্যবহারের জন্যেও সিম্পল ট্রেডমিল পাওয়া যায় তো। ইচ্ছেমতো সময়ে করতে পারবে, যতোক্ষণ খুশি, যতোবার খুশি।"

"কিন্তু দাম-টাম কিরকম...।"

সুধন্য বললো, "সে সব নিয়ে ভেবো না। হয়ে যাবে। সতু, তুই সব খোঁজ নিয়ে ঠিক করে ফেল।"

"ওক্কে। আমি দেখছি ভালো কোয়ালিটির ইউজড পাওয়া যায় কিনা... তাহলে মা - নো চিন্তা!"

সেই রকমই হলো। এবং পরের সপ্তাহেই ট্রেডমিল এলো। আমাদের বাড়ির একেবারে পিছন দিকে একটা লম্বা ঘর আছে। একদিকের দেওয়ালে বিরাট বিরাট কাঁচের জানলা, ওপাশে গাছপালা, পাহাড়ের দৃশ্য। পর্দা সরিয়ে দিলে ভারি সুন্দর লাগে। ঘরের ভেতর বড়ো বাহারি টবে গাছপালা লতা বেড়ে উঠছে, প্রচুর আলো আসে। ওখানে বসে গল্পগাছা আড্ডা চা খাওয়া বই-পড়া গান শোনা এই সব করি আমরা। তা ট্রেডমিল সেখানেই অধিষ্ঠিত হলেন। জানলার দিকে ফেরানো সামনেটা। আমি তাতে হাঁটা শুরু করলাম। স্পিড, অ্যাঙ্গেল, রেসিস্টেন্স এইসব বদলানো যায়, ডিসপ্লেতে সময় দেখা যায়।

অল্প অল্প করে আরম্ভ করতে হয়। আমিও তাই করলাম, প্রথমে একটুতেই হাঁপিয়ে ঘেমে যেতাম। দুত্তোর বলে মেশিন অফ করে ডিভানে বসে পড়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে লেবু-জলে চুমুক দিতাম। তারপর আস্তে আস্তে দম বাড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে জেদও। সুধন্য আর সত্যব্রত উৎসাহ জোগাতে লাগলো। আর আমি কানে হেডফোন গুঁজে, মোবাইলে গান শুনতে শুনতে চোখ বুঁজে দ্রুত পা ফেলতাম... যেন এক অন্তহীন যাত্রা...

গোলমালটা আরম্ভ হলো তার পরে।

আমি কাজ থেকে ফিরি তিনটে আন্দাজ। সুধন্য অফিসে। কাজের

সহায়িকা গোপী আর মনিয়ার মা এসময় ঘুমোয় বা পান-মুখে পাশের বাড়ির আয়াটার সঙ্গে গল্পটল্প করে। আমি পোশাক বদলে, নিজের জন্য ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা লেবু-জল একটা বড় গ্লাসে ঢেলে নিয়ে পিছনের ঘরে গিয়ে ট্রেডমিলে পা দিই। হেডফোন কানে দিয়ে আমার প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি চালিয়ে পদক্ষেপ আরম্ভ করি।

সেদিনও তাই করছিলাম। অভ্যাসবশত চোখ বন্ধ, মন প্রায় শূন্য, কিচ্ছু ভাবছি না...নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে, বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে...বড় প্রিয় গান আমার...আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে...

...হঠাৎ গানটা থেমে গেলো। কানে কানে কে বললো, "আভরিতা। আভরিতা ?" চমকে চোখ খুলতেই দেখি আমার সামনে একটা পথ দূরে চলে গেছে, বাঁ দিকে গাছপালা আর ডান দিকে একটা ধু-ধু মাঠ... আমি পথটা ধরে হাঁটছি, আর কানে কানে কে বলে, "সামনে দেখ না আভরিতা...।" গলাটা কি চেনা? মাথাটা টলে গেলো, হেডফোনটা খুলে চোখটা ঘষে নিলাম আর সামনের ওসব মুছে গেলো, সবকিছু আবার স্বাভাবিক - ঘর, জানলার ওদিকে পরিচিত দৃশ্য...

...কীরকম হলো ব্যাপারটা? এরকম...ভুল দেখলাম চোখে? ভুল শুনলাম? একটু ইতস্তত করে হেডফোনটা কানে দিলাম, গানটা বাজছে আবার যেমন হওয়া উচিত... ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা, দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে...

মোবাইল বন্ধ করে হেডফোন খুলে ট্রেডমিল থেকে নেমে পড়লাম। বসে পড়ে খানিকটা লেবুজলে গলা ভিজিয়ে নিলাম। খুব কী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? হয়তো সেজন্যই...নাঃ নিশ্চয়ই তাই। আজ আর ট্রেডমিল করবো না।

তারপর দুতিনদিন সব ঠিকঠাক। তারপর - সেদিন শনিবার, আমাদের দুজনেরই ছুটি। ব্রেকফাস্টের পর মালী এলো, সুধন্য সামনের বাগানে ওর সঙ্গে গাছপালা লাগানো সম্বন্ধে কী সব নির্দেশ দিতে গেলো। বাগান করায় খুব ইন্টারেস্ট ওর। আমি ট্রেডমিলে উঠে যথারীতি হাঁটছি। গান চলছে, আমি ভাবছিলাম আজ দুপুরের দিকে একবার কিছু কেনাকাটা করতে বেরোবো। ড্রাইভারকে থাকতে বলতে হবে। কানে নিচু পর্দায় বাজছে, "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে...", নিজের অজান্তেই মন ফাঁকা হয়ে আসছে, আমি দ্রুত পা ফেলছি... হঠাৎ মনে হলো আমার পায়ের নিচে আর ট্রেডমিলের যান্ত্রিক গতি নেই, আমি হাঁটছি অন্য কিছুর উপর দিয়ে...মুখে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগলো, কানে গানটা থেমে গেলো, কে যেন বললো, "দেখ, আভরিতা..."

এবার চমকালাম না। চোখ মেলে দেখলাম আমি সেই পথটা দিয়ে হাঁটছি, অনেক দূর চলে গেছে, বাঁদিকের নিবিড় গাছপালার ঘন অচেনা গন্ধ, আকাশে অদ্ভুত একটা না-আলো না-অন্ধকার, আমি...আমি দ্রুত দুহাত দিয়ে মুখটা ঢেকে আবার ঘষে নিলাম। ... সবটা মিলিয়ে আবার আগের মতো । গানটা চলতে শুরু করলো আবার, ...আমার ঝুলন-দিনে দোলন লাগে, তোমার পরাণ হেলে না...

ডিভানে বসে পড়েছিলাম। সুধন্য মাটি-মাখা হাতে ঘরে ঢুকে বললো, "হয়ে গেছে ট্রেডমিল করা ? দেখবে এসো সেই গোলাপগাছটায় কী চমৎকার কুঁড়ি এসেছে, গোবিন্ বললো...।" তারপর থেমে গিয়ে বললো, "কি হলো রিতা, মুখটা এমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন?"

আমি বললাম, "ন্-না। কিছু না তো। ওই - একটু ক্লান্ত লাগছে আর কী ।"

সুধন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, "ওভার-ডু করে ফেলছো বোধহয়। সইয়ে সইয়ে করতে হয়।একবারে এতোটা করার দরকার নেই রিতা। ওজন তো কমছে, তাই না।"

"হ্যাঁ। চলো তোমার গোলাপ দেখি, তারপর একটু কিচেনে আজ লাঞ্চের কী ব্যবস্থা করছে গোপী সেটাও...।" আমি অভিজ্ঞতাটা মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু...মাঝে মাঝে ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটতে লাগলো। সুধন্যকে কিছু বললাম না - মানে, কী বলবো? দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে আমার? বাপ ছেলে দুজনেই হৈ-চৈ বাধাবে। আচ্ছা, আমার মাথায় কিছু গোলমাল হচ্ছে না তো? না না। আর তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না আমার। বেশ আছি, কাজে যাচ্ছি, গোপীকে রান্না বোঝাচ্ছি, ফোনে গল্প করছি এর-ওর সঙ্গে, শুধু...

আজকাল একটুক্ষণ ট্রেডমিলে উঠলেই যেন আমি কি-রকম হয়ে যাই। কানের হেডফোনের মধ্যে গানটা মিলিয়ে গিয়ে সেই কণ্ঠটা... কেমন চেনা চেনা লাগে কেন সেটাও বুঝতে পারি না। নারীকণ্ঠ, একটা অদ্ভুত ধাতব টান আছে। "আভরিতা...আভরিতা...।" আর আমি চোখ মেলে দেখি আমি সেই ... জগৎে। লালচে ধুলো আর পাথরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, চলেইছি। প্রতিবার আমি যেখান থেকে ফিরে আসি, পরের বার ঠিক সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করি। একটা লম্বা সরু গাছের কাছে পৌঁছেছিলাম আগের দিন। আজ আবার সেখান থেকে শুরু । বাঁ দিকের গাছপালাগুলো - যেন কেমন অন্যরকম । পাতা ফুল ফল - সবকিছু...চিনতে পারি না। বন্য লতা সব জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে...। কেউ কোথাও নেই, শুধু মাঝে মাঝে বনের মধ্যে ভাঙা ভাঙা পাথরের মূর্তি। কিসের, বুঝতে পারি না। নিস্তব্ধ সবকিছু, শুধু মাঝে মাঝে একটা

শীষের মতো আওয়াজ কোথা থেকে। আবছা একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে চলি। কোথায় যাচ্ছি আমি? তারপর কেমন যেন চটকা ভেঙে যায়, কানের মধ্যে গান ফিরে আসে...'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে'...আমি মুখ তুলে দেখি সব স্বাভাবিক। বাস্তব । প্রতিবারে আমি খেয়াল করি, আমার এই সময়টা বেড়ে যাচ্ছে। আমি প্রথমে আধঘন্টা, তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট, তারপর এক ঘন্টা সময় সেট করতাম মেশিনটায়। আজকাল বুঝতে পারি একঘন্টাও পেরিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ও জগৎে সময়ের হিসেব থাকে না। কিংবা...সময় নেই ওখানে?

আর আমি বুঝতে পারি ও জগৎটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে আমাকে। হ্যাঁ - ওজন কমছে। সুধন্য একদিন ভ্রূ কুঁচকে বললো, "তুমি বোধহয় এক্সারসাইজ আর ডায়েট একটু বেশিই করছো। এতো তাড়াতাড়ি এরকম এক্সট্রিমে যাওয়া ঠিক নয় রিতা। শরীর খারাপ হচ্ছে না তো?" আমি উড়িয়ে দিলাম। বললাম, "দূর, ডাক্তার সরকারের কাছে গেছিলাম তো গত পরশু, উনি তো খুশিই আমার প্রোগ্রেসে। সুগার কোলেস্টরল প্রেশার সব ভালো।"

সত্যব্রত ভিডিও কলে ছিলো, বললো, "তা বলে এতোটা, মা...।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "জানিস না, "টুউ রিচ্ অ্যাণ্ড টুউ থিন্" বলে কিছু হয় না। স্লিম হওয়ার চেষ্টা করছি রে।" রাত্রে সুধন্য আমায় কানে কানে বললো, "আমার এই রকম বৌ-ই ভালো, আর রোগা হতে হবে না সোনা।"

কিন্তু ওই জগৎটা আমায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। অবচেতন মনে আমি সর্বক্ষণ অপেক্ষা করি সেই ডাকের, তারপর আমি ফিরে যাই যেই অবাস্তবের রাজ্যে। অবাস্তব, না কি স্বপ্ন, না কি আমারই কোনো অলীক কল্পনা! কি জানি। আমি কোথায় যাচ্ছি তা-ও বুঝি না। পথটা কোথায় গেছে, কতদূরে। ডানদিকের ধু-ধু মাঠটায় একটা আবছা কুয়াশা ঘুরপাক খায়। অনেক দূরে একটা অদ্ভুত উঁচু কালো মূর্তি। সেটা কখনো সরে আসে আবার পিছিয়ে যায়। কিন্তু সেটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি না কিছুতেই। আমি চলি। সম্পূর্ণ ফাঁকা মনটা, কিছু ভাবি না, কারো কথা না। খানিকটা দূরে ডান পাশ থেকে একটা পাটকিলে রঙের কালো ডোরা-কাটা বেড়াল উঠে আসে। মুখ ফেরায় আমার দিকে। ওর দুটো চোখ দুরকম রঙের, নীল-সবুজ আর হলদে-সোনালী। চোখের পিছনে যেন ছোট ছোট আলোর কুচি। আমি ওর দিকে এগোই কিন্তু বেড়ালটা অসম্ভব ভাবে একই দূরত্বে থেকে যায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে সাবলীল মসৃণ গতিতে বাঁ-পাশের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা আধভাঙা পাথরের

ফোয়ারার ওপরে বসানো ফাটল-ধরা হেলে-পড়া মূর্তির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। মূর্তিটা তার ঝুঁকে-পড়া পাথুরে চোখে আমায় দেখতে থাকে। একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে আমি আমার নিজস্ব পৃথিবীতে ফিরে আসি। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে।

সুধন্য একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় বললো, "এবার তুমি তোমার ডায়েটের নিয়মের কড়াকড়ি কমাতে পারো তো রিতা। যথেষ্ট হয়েছে।"

"আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে গো। বেশ ঝরঝরে লাগে এই খেয়ে।"

"আজকাল বেশ অন্যমনস্ক থাকো।"

"ওই - মায়ের জন্য চিন্তা হয়। বৌদির সঙ্গে কথা হচ্ছিলো জানো। ডিমেনশিয়ার মতো লক্ষণ। এবার দেখে আসবো - তোমার ছুটি কবে নিতে পারবে মনে হয়?"

প্রসঙ্গটা ঘুরে গেলো। তার পরের দিন আমাদের বন্ধু সুরূপার জন্মদিন ছিলো। আমরা তিন বান্ধবী - আমি, সুতনুকা আর চন্দনা, এবং আমাদের স্বামীরা একসঙ্গে বাইরে খেতে গেলাম। সুতনুকা গিয়েছিলো দিল্লিতে, ওর বাবা অসুস্থ ছিলেন। চন্দনার স্বামী অরূপ অফিসের একটা কাজের ব্যাপারে পুনেতে গিয়েছিলো কিছুদিনের জন্য। চন্দনা আই-টি-তে কাজ করে, ছুটি নিয়ে গিয়েছিলো বরের সঙ্গে। সুতরাং বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি আমাদের। রেস্টুরেন্টে ওরা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো। আমার জন্যেই দেরি হলো। এবারে উল্টো বিপত্তি - ঢলঢলে ব্লাউজটা আবার ফোঁড় দিয়ে টাইট করতে হলো। আমার হাসি পাচ্ছিলো কিন্তু দেখলাম সুধন্য গম্ভীর হয়ে গেছে।

আমায় দেখে, বুঝলাম সবাই বেশ অবাক হয়েছে। সুতনুকা আর চন্দনা সমস্বরে বললো, "আভরিতা ! ... এ কী রে, এতোটা ওজন কমালি কী করে।"

সুতনুকার বর ডাক্তার, আমায় পেশাদারী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার জরীপ করে নিয়ে বললো, "আভরিতা, কিছু মনে কোরো না, তোমার শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?"

আমি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ শৈবালদা, ঠিক আছি, ওজনটা বড্ড বেড়ে গিয়েছিলো...আমার ডাক্তারই বলেছিলেন...ডায়েট, আর ট্রেডমিল।"

বাড়ি ফেরার পথে সুধন্য রাগ করে বললো, "এবার তোমার ওই ট্রেডমিলটা কমাও তো। আর খাওয়া নর্মাল করো।"

আমি কিছু বললাম না। কাজেও সবাই এটা বলছে। আর স্বয়ং ডাক্তার সরকার সেদিন আমায় ভালো করে পরীক্ষা করে ঠিক সুধন্যের মতোই ভ্রূ কুঁচকে বলেছেন, "এতোটা ওজন কমে গেছে...এবার

এক্সারসাইজটা কমান আর ডায়েটের নিয়ম একটু আলগা করুন। নইলে আবার...। আপনার টেস্টের রিপোর্ট সব নর্মাল।”

এক সময়ের লোভনীয় খাবারগুলো আর খেতেও ইচ্ছে করে না। চেষ্টা করি, নাড়াচাড়া করি প্লেটে বিরিয়ানি, মাংসের টুকরো, আলুভাজা। আইসক্রীম মুখে দিই একটু। সুধন্য চিন্তিত হয়ে দেখে আমায়। কিন্তু আমি...কিছুতেই ট্রেডমিলের সময় কমাতে পারি না। বুঝতে পারি দিন দিন আরো দীর্ঘ হচ্ছে সময়টা। ওই - অন্য মাত্রার জগৎটা আমার স্নায়ুশিরায় মিশে যাচ্ছে, যেন টেনে নিচ্ছে আমাকে। “আভরিতা, আভরিতা, আয়, এগিয়ে চল”...আর আমি সেই অলৌকিক অশেষ পথ ধরে চলতেই থাকি। বেড়ালটা আমার পথ কেটে যায় কখনো, আবার কখনো বাঁ দিকের ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাই, দুরঙা চোখ মেলে দেখছে আমায়। ডানদিকের দিগন্তের কাছে মূর্তিটা একটু একটু করে সরে আসে।

“রিতা - কতোক্ষণ ধরে ট্রেডমিল করো তুমি আজকাল?”

“ওই তো...ঘন্টাখানেক...।”

“বন্ধ করো এবার। এবার থেকে...।”

না, না...।

“প্লিজ, রিতা ।”

কী বলবো বুঝতে পারি না। তারপর বোঝাবার চেষ্টা করি। “ট্রেডমিল একেবারে ছাড়তে পারবো না। আবার ওজন বাড়বে সেটা কি ভালো হবে বলো?”

সুধন্যকে খুব উদ্বিগ্ন লাগছিলো। বললো, “তাহলে এবার থেকে আমি সময় বেঁধে দেবো, তার বেশি করবে না। আর আমি বাড়ি থাকবো যখন...অন্য সময় নয়। আর খাওয়া দাওয়াও ঠিকঠাক করতে হবে।”

“উঃ, আচ্ছা, আচ্ছা। আর তুমি সামনে বসে থাকবে না কিন্তু।”

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ট্রেডমিল আরম্ভ করলাম। আর ফিরে গেলাম আমার একান্ত সেই জগতে। না আলো না অন্ধকারের মধ্যে আমি পথ হাঁটতে থাকি। বাঁ-দিকের গাছপালা থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে চলতে শুরু করে। তার দিকে তাকিয়ে কেঁপে যাই আমি। বনশ্রী।

সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, “এতদিন আমার কথা ভুলে গিয়েছিলি তো?” আমি দেখি ওর মুখের একদিকে একটা লম্বা কালশিটের দাগ, আর একটা চোখ রক্ত জমে বন্ধ হয়ে আছে।

“বনশ্রী...না না, তুই তো, তুই তো সেই কবেই...।”

ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বনশ্রী। বলে, “আমি তো এখানেই আছি রে, এবার তুই-ও আয়।”

“না, আমি যাবো না, আমি...।”

"বনশ্রী, তুই কেন...।" অবশ চেতনার মধ্যে লক্ষ্য করি, ওর গোলাপি লেসের ফুল-বসানো সালোয়ার কামিজের এখানে কালচে রক্তে ছোপ, ছেঁড়া ওড়নাটা লুটোচ্ছে, কোঁকড়া চুলের বেণীটা অর্ধেক খুলে চুলগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে ঝুলছে...

'এই দেখ এই সালোয়ার-কামিজটা, সেবার পূজোর সময় হরেন দর্জিকে দিয়ে বানিয়েছিলাম, মনে আছে? তোর যে খুব পছন্দ হয়েছিলো, বলেছিলি, একবার পরতে দিবি? আর দেওয়া হয় নি...এখন নিবি, আভরিতা? নে না...।"

"না না, আমার চাই না...।" আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করি। আলো কেমন শেষ হয়ে আসছে, উঃ, ওর আঙুলগুলো কী শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরেছে...।

"ওই দেখ, ওখানে আমরা কতো খেলতাম মনে নেই তোর? ওই যে তোদের বাড়ির পেছনের বাগানটা। সেই যে একবার জামগাছের ওই বড়ো ডালটা থেকে পড়ে গিয়ে তোর হাঁটু কেটে গিয়েছিলো?"

আমি দেখি দাঁড়িয়ে আছি সেই বালিকা-বয়সের মালদার বাগানে, ঘন দুপুরের উত্তাপ, গাছপালার পরিচিত বনজ গন্ধ, জামগাছটা ফল পেকে কালো হয়ে আছে...সবটা কাঁপছে একটু একটু, মাঝে মাঝে আবছা হয়ে যাচ্ছে...অসম্ভব, অসম্ভব...

ঘোরটা হঠাৎ কেটে যায়। "রিতা, এই রিতা!" সুধন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

হেডফোন সরিয়ে চোখ খুলি। ট্রেডমিলটার গতি কমে আসছে। সুধন্য বোধহয় আধঘন্টার জন্যে টাইম সেট করে দিয়েছিলো। বললো, "যথেষ্ট হয়েছে একদিনের জন্যে।" আমি কিছু না বলে নেমে পড়লাম।

আমার ভয় করছিলো। সে রাত্রে অদ্ভুত সব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখলাম। বনশ্রী, আরো কারা সব আমার সঙ্গে ট্রেডমিলে হাঁটছে বিশাল একটা জিমে, আদি অন্ত দেখা যাচ্ছে না। লোকগুলোর চেহারা কেমন যেন, পোশাক এলোমেলো ছেঁড়াখোঁড়া, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। আমার পাশের রোয়িং মেশিনটায় লোকটার ডান হাতে গভীর লম্বা ক্ষত, সাদা হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। একটা বাচ্চা মেয়ে স্কিপিং করতে করতে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, তার হলদে-বুটি লাল ফ্রকটা ভিজে, অনেকটা ছিঁড়ে ঝুলছে, মুখে কাদা আর শ্যাওলা জড়ানো, চোখদুটো সাদা...। চমকে ঘুম ভেঙে যায়। জানলার বাইরে ঘন অন্ধকার।

পরের দিন ঠিক করেছিলাম ট্রেডমিলে উঠবো না। কিন্তু কী এক আকর্ষণ, যেন নেশার মতো! ওই অপার্থিব জগৎটা আমায় টানতে থাকে। হেডফোন লাগিয়ে হাঁটা শুরু করি, আস্তে আস্তে গান মিলিয়ে যায়...আর দেখি আমি দাঁড়িয়ে আছি মালদার বাগানটায়। আমার পাশ থেকে বনশ্রী বলে, "জাম খাবি না আভরিতা?"

"না...এই জায়গাটা...আমি এখানে কেন?"

"তুই আমার কথা ভাবছিলি তো, তাই নিয়ে এলাম। আয় এখানেই থাকি, অন্যদের সঙ্গে। এখানে সঅব আছে, তুই যা চাইবি, সব।"

"এটা কোন জায়গা...কোন সময়?"

"দূর, এখানে সময় আছে নাকি!" ওর কালশিটে-পড়া মুখে একটা অদ্ভুত চওড়া হাসি, দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে । ও আমার হাত ধরে আছে।

"আমায় ছেড়ে দে, বনশ্রী।"

"আয় আমরা জাম খাই। কী মিষ্টি জাম, একবার খেলে তোর আর ফিরে যেতেই ইচ্ছে করবে না!" ছেঁড়া ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বনশ্রী কেমন খসখসে গলায় হাসতে থাকে। সবটা আবছা হয়ে আসে, পথটা আবার দেখা যায়, তারপর আমি বাস্তবে ফিরে আসি। ট্রেডমিল থেমে গেছে।

অন্তর্জগৎের একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটতে থাকে। মনকে সংযত করার চেষ্টা করি, স্থির করি আর, আর যাবো না ওই অলীক বিভ্রমে, কিছুতেই যাবো না। কিন্তু পারি না না-গিয়ে। আমি যেন দুটো পৃথিবীতে একই সঙ্গে বাস করছি। একটাতে আমার স্বাভাবিক জীবন, আর অন্যটাতে...

ভাবার চেষ্টা করি, কেন আমি ফিরে যাই ওখানে? কীভাবে এটা সম্ভব? বিভ্রম? তবে কি আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি? বুঝতে পারি আজকাল খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকি। কোনো দিকে মন দিতে পারি না। কাজ থেকে ছুটি নিয়েছি। চিন্তাগুলো কেমন অসংলগ্ন লাগে। কোনটা বাস্তব? কোনটা অলীক?

"...আমার কথা শুনছো না রিতা? কী হয়েছে তোমার আজকাল?"

"না কিছু না, বলো শুনছি।" আমি টি-পট থেকে দু-জনের জন্য চা ঢালতে থাকি।

"বলছি, সতু বললো ও আসবে দু-একদিনের মধ্যেই।"

"হঠাৎ? আমায় কিছু বলে নি তো! ঠিক আছে তো?"

"ছুটি আছে না কি ক'দিনের।" সুধন্য চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে।

"আচ্ছা, খুব ভালো হবে।"

"রিতা, কী এতো ভাবো বলো তো?"

আমি ওর দিকে বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে বলি, "তেমন কিছু না...এই, পুরোনো কথা সব মনে পড়ে। জানো, আমার বনশ্রী বলে একজন বন্ধু ছিলো।"

"ও...হঠাৎ তার কথা? কি হয়েছিলো?"

"না, মনে হচ্ছে আর কি। শুনেছিলাম সে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলো। বাস দুর্ঘটনা। মুখে কালশিটে, একটা চোখে ওপর রক্ত

জমে...।” থেমে গেলাম। সুধন্য আমার দিকে কেমন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে আছে। কী একটা প্রশ্ন যেন করতে গিয়েও করলো না।

...বনশ্রী বলে, “আয় আভরিতা, আমার সঙ্গে আয়। দেখ এদিকে উঠোন, পুকুর, রাস্তা, রথতলা - সব তো তোর চেনা, বল? কতো মজা জানিস তো এখানে।” সব কিছুর ওপর কেমন একটা ছায়া নেমে আসছে। ষষ্ঠিপুকুরের ঘাটের ওপরে ভিজে লাল হলদে-বুটি ফ্রক-পরা একটা বাচ্চা মেয়ে বসে আছে, ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যাওলায় ঢাকা মুখে সে আমাদের দেখতে থাকে।

“চিনতে পারছিস না আভরিতা? ও তো চৌধুরী-বাড়ির মন্টি রে, সেই যে ছোটবেলায় পুকুরে একলা সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরে গিয়েছিলো?”

“আমি এখানে থাকতে চাই না, কেন নিয়ে এলি বনশ্রী?”

“হি হি হি। তোর তো নিজের জীবনে কেমন একা-একা হয়ে গিয়েছিলি তো। সকলে ব্যস্ত, আর তুই মোটা হয়ে যাচ্ছিলি, তারপরেই তো এই যন্তরটা পেয়ে গেলি...তাই তো পথ খুলে গেলো। আমাকে তোর মনে পড়ে গেলো, আর আমি তোকে নিয়ে এলাম! ভালো করিনি বল?” বনশ্রী আমায় জড়িয়ে ধরে। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে পথটা খুঁজতে থাকি, ফিরতেই হবে আমায়...বলি, “আমি আর আসবো না, কক্ষণো না...।”

“হি হি হি...তোকে যে আসতেই হবে আভরিতা।”

“না-আ...!” একটা ঝাঁকুনি লাগে। ট্রেডমিল থেমে গেছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকি, “সুধন্য!” ও প্রায় ছুটে আসে।

“রিতা! কী হয়েছে! এরকম হাঁপাচ্ছো...আমি পনেরো মিনিটের সেটিং রেখেছিলাম, দেখেছো তো শরীরের কী অবস্থা করেছো!”

“সুধন্য, আমি...।”

“এই নাও জল খাও। শোনো এবার থেকে আর এই ট্রেডমিল করতে হবে না।”

“না না করতে চাই না। সুধন্য, তুমি আমায় আর এটা করতে দিও না, কিছুতেই না।”

ও আমায় ধরে নিয়ে যায় লিভিং রুমে। বলে, “বসো। সতু ফোন করেছিলো। ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশন থেকে চলে আসবে এখুনি।...তোমার কি হয়েছে ঠিক, বলবে?” আমি শুধু মাথা নাড়লাম। কে বিশ্বাস করবে আমার কথা। আমি নিজেই কি...

সতু এলে খানিক হই-চই বলো, মনের আবছা অন্ধকার কাটলো অনেকটা। হঠাৎ এভাবে আসার কারণটা সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করতে হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরে বললো, “কেন এমনি আসতে পারি না

বুঝি!” রাত্রে খাওয়ার সময় খুব ক্যাজুয়ালি বললো, “তুমি তো এক্কেবারে ভীষণ স্লিম হয়ে গেছো। আর অতো ডায়েট করার দরকার নেই, এই নাও তোমায় ফ্রায়েড রাইস তুলে দিচ্ছি।”

সুধন্য ফিস-ফ্রাই খেতে খেতে বললো, “তোর মা বলছে আর ট্রেডমিল করবে না। বাঁচা গেছে।”

এবার সতু সিরিয়াস ভাবে বললো, “হ্যাঁ মা তোমায় বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।...একটা কথা...আচ্ছা কাল বলবো। আজ হেভি টায়ার্ড লাগছে।”

আর সেই রাত্রে...

ঘুমের মধ্যে ছেঁড়াখোঁড়া সব স্বপ্ন। চেতনার বুনোট খুলে আসছে, সুতোগুলো আমায় পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে। ফিরে গেছি সেই জগতে। চারধারে কুয়াশাটা ঘন হয়ে পাক খাচ্ছে। আজ এখানটা অন্ধকার, আকাশটা কেমন আবছা বেগুনি, দুটো চাঁদ । অবোধ্য কোনো যুক্তিতে এটা আমার স্বাভাবিক মনে হয় । বনশ্রীর সঙ্গে হাঁটছি, ছোটবেলার পরিচিত দৃশ্য সব অন্যরকম...বাড়িগুলো ভাঙাচোরা, পূবদিকের রাস্তার বটগাছটা বাজ পড়ে জ্বলে কালো গেছে, পায়ের কাছে মরা সব পাখি ছড়িয়ে আছে, শীষের মতো শব্দের প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া, আমার গায়ে কাঁটা দেয় শীতে আর আতঙ্কে। কানের কাছে বনশ্রী বলে, “থামলি কেন রে আভরিতা, এগিয়ে চল! হি হি হি, তুই ভেবেছিলি আর আসবি না, না?”

“না, না...আমার সংসার, স্বামী, ছেলে সব ছেড়ে কোথায় যাবো! আমায় ছেড়ে দে তুই।”

“তোকে যেতেই হবে...।”

আমি চিৎকার আর্তস্বরে বলি “নাআআআ! যাবো না!” প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে বাস্তবে ফিরে আসি । ট্রেডমিলে দাঁড়িয়ে আমি। সামনের জানলার বাইরে ঘন অন্ধকার। সুধন্য আমায় ধরে ফেলেছে। ওপাশ থেকে এসে সতু আমায় জড়িয়ে ধরে - ‘মা !”

“এতো রাত্রে...কখন উঠে এসেছো রিতা! কতক্ষণ ট্রেডমিলে ছিলে!”

“না না আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম তো...আমি এখানে, এখানে কি ভাবে এলাম জানি না...বনশ্রী, বনশ্রী আমায় ডাকে তো, ওখানে নিয়ে চায়..।” ভয়ার্ত কণ্ঠে বলি, “আমি আর যেতে চাই নি, তাই...।”

“রিতা, কী সব বলছো?”

“মা কাঁপছে বাবা, ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও তো। আমি আসছি।”

আধো চেতনার মধ্যে ঘরে শুয়ে ছিলাম, সুধন্য কাছে বসে। একটু পরে সতু ঢুকলো একটা লম্বা তার হাতে। পাশে বসলো।

ক্ষীণকণ্ঠে বলি, "আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? ট্রেডমিলে উঠলেই... কী সব দেখি, অন্যরকম জায়গা, আলো-অন্ধকার মতো, চেনা সবকিছু কেমন বিকৃত... আর বনশ্রী, ও তো কবেই মরে গিয়েছিলো...।"

সুধন্য বললো, "ও সব ক্লান্তির জন্য মানসিক বিভ্রম, রিতা।"

সতু তারটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, "...আর একটা ব্যাপার আছে...মানে, বিশ্বাস করাটা শক্ত, কিন্তু...ওই ট্রেডমিলটা...বোধহয় ভালো নয়।"

"মানে? সে আবার কী রে সতু?" সুধন্য বললো অবাক হয়ে। "ঠিকই চলে তো।"

"সে কথা নয় বাবা। তোমাদের বলি নি ওটা বেশ কম দামে পেয়েছিলাম? ব্যাপারটা হয়েছিলো কী, আমি খোঁজ নিচ্ছিলাম, তখন আমার বন্ধু বললো, ওর এক চেনা ফ্যামিলি ওদের প্রায় নতুন ট্রেডমিলটা বিক্রি করে দিতে চাইছে। ওবাড়ির এক মহিলা নাকি ওজন কমাবার জন্য কিনেছিলেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান, নানারকম রোগ-টোগ ছিলো নাকি। তারপরেও নাকি পরিবারে কী সব গোলমালের জন্য ওরা মুভ করতে যাওয়ার আগে অনেক আসবাব বেচে দিচ্ছে, ট্রেডমিলটাও... তাই কিনে নিলাম আমি তোমার জন্যে মা...।" সতু থামলো।

আমি বললাম, "তাতে কী হয়েছে?"

"আমি জানতাম না মা, বিশ্বাস করো। এই সেদিনই রাজেশ - আমার ওই বন্ধু - কথায় কথায় বললো, ওই মহিলার নাকি ট্রেডমিল করতে করতেই হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো। কী সব মানসিক গোলমাল হয়েছিলো না কি। চুপি চুপি অসময়ে গিয়ে ওটাতে হাঁটতেন। তারপর ওই পরিবারেরই একটি মেয়েও ওইভাবেই মারা যায়, ওর অ্যানোরেক্সিয়া ছিলো বোধহয়, খালি ওজন কমাতে চাইতো, ট্রেডমিল করতো। কেউ অতো খেয়াল করেনি কতক্ষণ করছে। তারপর একদিন কোল্যাপ্স করে গেলো। শেষে কী সব হ্যালুসিনেট করতো। ওদের প্রতিবেশী একজন ব্যবহার করতো, তারও...আমি এসব ডিটেল কিচ্ছু জানতাম না মা, রাজেশের সঙ্গে আমার প্রায় ঝগড়া হয়ে গেছে, ও বলছে ও সব নাকি ও-ও সম্প্রতি জেনেছে, ওই সব ঘটনার সময় ও বিদেশে ছিলো নাকি। আমি ঠিক করলাম এখানে এসে সব বলবো তোমাদের।"

আমরা চুপ করে রইলাম। সতু বললো, "তারটা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি এই দ্যাখো। মেশিনটা নিয়ে কী করবে জানি না...কাউকে বিক্রি করে বা ব্যবহার করতে দেওয়াও তো...।

আমি দৃঢ়ভাবে বলি, "না। ওটা থাক পড়ে।"

আজকাল ট্রেডমিলটা ঢাকাই পড়ে থাকে । সকাল বিকেল হাঁটি সুধন্যের সঙ্গে । সুষম খাওয়া-দাওয়া করি । সব স্বাভাবিক । শুধু

বহুদিন পর পর রাতের স্বপ্নে আমি সেই পথটা দিয়ে চলি । কুয়াশার মধ্যে আরো কী ছিলো, কে জানে...

সেদিন বিকেলে একলাই হাঁটছিলাম, সুধন্য একটা প্রজেক্ট নিয়ে খুব ব্যস্ত। সময়ের ব্যবধানের জন্য বিকেলে বিদেশের সঙ্গে টেলি-কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকতে হয় কখনো কখনো। এলোমেলো ভাবছিলাম... কাজে একটু দায়িত্ব বাড়ছে, বেশীক্ষণ থাকতে হয়...সামনের ছুটিতে সতু এলে সবাই একটু বেড়িয়ে আসবো, মা-কে দেখে আসবো এবার... রামস্বামীদের পার্টিতে চন্দনা একটা কী দামি তাঞ্চোই পরেছিলো, রঙটা কিন্তু একদম মানায় নি ওকে...বিকেল ফুরিয়ে আসছে, একেই কি রাক্ষসী বেলা বলে?....এই রাস্তাটায় বেশি লোকজন থাকে না... সামনে একটু দূরে তিন-চারজন স্থানীয় নারী-পুরুষ হাঁটছে, হাতে কিছু মোটঘাট, কথা বলতে বলতে পাশের একটা নিচু রাস্তা দিয়ে নেমে গেলো।

আর দেখি আরো সামনে কে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হয়। তার পরনে গোলাপি সালোয়ার-কামিজে কালচে ছোপ, ওড়নাটা লুটোচ্ছে, চুলের বেণী অর্ধেক খুলে আসছে, কেমন যেন এলোমেলো পা ফেলছে...আমার মাথার ভেতরে একটা ধাক্কা লাগে! বনশ্রী...না না হতে পারে না... এটা তো একটা পরিচিত সাধারণ রাস্তা, ওদিকের সরু রাস্তার মোড়ে একটা পানের দোকান, পাশের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেলো...। আমার ভুল হচ্ছে নিশ্চয়ই... মনে সাহস এনে আমি খুব দ্রুত পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে যেতে চাই, কিন্তু আশ্চর্যভাবে আমাদের দূরত্বটা একই থেকে যায়। আমি এবার গতি খুব কমিয়ে দিই, এগিয়ে যাক ও...কিন্তু...দূরত্বটা সেই একই। একটা পাটকিলে রঙের ডোরা-কাটা বেড়াল আমার পথ কেটে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। হঠাৎ ভয় করতে থাকে আমার। যদি...যদি ওই মেয়েটা... পিছন ফিরে আমার দিকে তাকায়, এগিয়ে আসে আমার দিকে, যদি ডাকে আমায়! মা গো! উলটোদিক ফিরে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটতে থাকি আমি, একটা কাঠ-ভর্তি ঠেলাগাড়ি আমায় পাশ কাটিয়ে চলে যায়, আমার দিকে হাঁটতে হাঁটতে আসা এক লাঠি-হাতে বয়স্ক ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হয়ে তাকান। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে পিছন দিকে তাকাই।

কেউ কোথাও নেই। ছিল কি? নাকি সবটাই আমার কল্পনা? যদি কল্পনা না হয়, আর যদি আবার ওকে দেখতে পাই, কোনো এক রাক্ষসী বেলায় যদি ও আমায় ডাকে , তবে? কী করবো তখন!

সূচিপত্র

আবহমান
রণদীপ নস্কর
অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

১

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে শাহরিক শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসছে ঝমঝমে বৃষ্টির আওয়াজ। নর্দমা দিয়ে জলস্রোতের শব্দ, জমে থাকা জলের ওপর দিয়ে রিকশা, সাইকেল চলে যাওয়ার ছপছপে ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনের কোলাহল। ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। এইবার কমে আসবে রাস্তায় মানুষের আনাগোনা। কমলা স্ট্রিট লাইটের আলোয় পিছলে যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটারা। উঁচু উঁচু বাড়িগুলো জেগে আছে জোনাকির মতো। এইসময় বিরহ জোরালো হয়; যুগে যুগে, শতকে শতকে এর অন্যথা হয়নি।

‘ট্রেন কটায়?’
‘কাল সকালে ঢুকছি। এই পৌনে সাতটা নাগাদ।’
‘নেমে সোজা এখানে আসবে কিন্তু!’
‘আচ্ছা। চেষ্টা করছি।’
‘চেষ্টা আবার কী! আমি অপেক্ষা করব।’

হা-ক্লান্ত আকাশ রণে ভঙ্গ দেয়। বৃষ্টি কমে আসছে। জমা জলে শিউরে শিউরে উঠছে রাস্তার আলো। গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে পাড়ার মোড়ের কালীমন্দির, রাস্তার ব্যস্ত গাড়িঘোড়ার দল, সমস্ত উঁচু উঁচু অফিসবাড়ি। জেগে আছে শুধু একটি চব্বিশ বছরের মেয়ে। তার দু’চোখ জুড়ে আসন্ন মিলনের স্বপ্ন, সম্ভাব্য দৃশ্যাবলীর মন্তাজ। তার অপেক্ষারা ধোঁয়াশার মতো জমে ঢেকে দিয়েছে গোটা গলিপথ। শহরে রাত নামছে।

২

ফিনফিনে ভোর। থেকে থেকেই গাছের পাতা ঝিরঝির করে কাঁপিয়ে উড়ে আসছে অষ্টাদশবর্ষীয়ার মতো চঞ্চলা হাওয়া। গোটা শহর রাজস্থানি ছবির যুবতীদের মতো স্বচ্ছ নীল ধোঁয়াশার ওড়না মুখে টেনে স্থির। গলিতে ঘুমোচ্ছে পথকুকুরের দল। কদাচিৎ বেরিয়ে যাচ্ছে দু-একটি সাইকেল। ইলেকট্রিকের তার বরাবর ছুটে যাচ্ছে জলের ফোঁটা, কাকেরা এসে বসলে ঝরে যাচ্ছে টুপটাপ। গাছের পাতা, ঝুলবারান্দার রেলিঙে দেবতার অশ্রুবিন্দুর মতো বৃষ্টির অবশেষ। কোথাও কোনও শব্দ নেই- শুধু বড়রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া দু-একটি এলে তার যেটুকু আওয়াজ কানে আসে। কোনও এক রূপোকাঠির ছোঁয়ায় গোটা পৃথিবী

যেন গভীর ঘুমে; কেবল জাগরণের ছাপ লেগে আছে রাজকন্যার ঘরে। আলো ফোটার ঢের আগেই জেগেছে মেয়েটি। আজ তার বড় আনন্দের দিন।

জানালা দিয়ে পাখির ছানার মতো নরম আলো এসে পড়েছে। মনে হয়, সে আলোকে হাত দিয়ে ছুঁলেই চমকে উড়ে যাবে। ভিজে যাওয়া লোহার শিকের দুর্বল পাহারা পেরিয়ে নরম আলোটি এসে আদর করে যাচ্ছে দুধসাদা বালিশটাকে। সেই আলোয় কেউ কাউকে দেখলে সারাজীবনের মতো ভালোবেসে ফেলে। মেয়েটি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। আকাশের মুখ ভার। মনে হয় না সারাদিনে আর রোদ উঠবে বলে। কতকগুলো পায়রা বকম বকম করে প্রাতঃকালীন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর আজ যেন কোনও তাড়া নেই। সমস্ত জরুরি কাজ, মিটিং মিছিল স্থগিত।

আজ যে তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত প্রথম মিলন! গোটা পৃথিবী আজ দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চা বিস্কুট খাবে, অলসভঙ্গিতে মুখস্থ করবে খবরের কাগজ। অসুখ উপেক্ষা করে খাবে কচুরি জিলিপি, দুপুরে খিচুড়ি ডিমভাজা। সন্ধেয় চাইলে ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচও দেখতে যেতে পারে অথবা একটা সিনেমা। আকাশকুসুম চিন্তা করে মেয়েটি আনমনেই হেসে ফেলল।

পরক্ষণেই তার সম্বিত ফিরল। নিজের কী হাল হয়ে আছে! আলুথালু শাড়ি, চুলের গোছ নেই, চোখেমুখে রাত্রিজাগরণের ছাপ প্রকট। ঘরেরও হাল যাচ্ছেতাই। বিছানার চাদর এলোমেলো, টেবিলে একগোছা খবরের কাগজ, ডাঁই করা জামাকাপড় আর বই, ঘরের কোণে রাজ্যের ঝুল! ছেলেটা প্রথমবারের জন্য আসছে, কী ভাববে! সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। এখুনি ঘরদোর পরিষ্কার করা দরকার।

মেয়েটি বিছানায় পাতল ধবধবে সাদা চাদর, দ্রুত গুছিয়ে ফেলল টেবিল। ঘরদোরে যা যেটুকু ঝুল পড়েছিল, পরিষ্কার করে নিতে লাগল না বেশিক্ষণ। স্নানের জলে ধুয়ে গেল সমস্ত রাত জাগার ক্লান্তি। পরল একটা পাটভাঙা সাদা-কালো শাড়ি। সাদা শাড়ির পাড়ের জায়গায় কালো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নকশা- সেই কালো সূক্ষ্ম নকশাগুলি যেন সাদার আভিজাত্যকেই আরও চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। মরমী লেখক যেমন অল্প শব্দেই সবচেয়ে বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন; তেমনই এই শাড়ির অল্প কালো চোখ ঠেলে দেয় অখণ্ড শ্বেত নীরবতার দিকে। মাথায় চূড়ো করে তোয়ালে বেঁধে মেয়েটি ভেজা শাড়ি মেলছে ছাদে, বাতাসে

সামান্য শিরশিরানির ছোঁয়া। ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙছে মহানগরীর, কানে ভেসে আসছে নাগরিক শব্দের কোলাজ।

দাগ লেগে থাকা অস্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে দেওয়ালের ছোপ ছোপ প্রাচীনত্ব। আয়নার গায়ে মিশে আছে কতকগুলো টিপ। মেরুন, গাঢ় সবুজ, কোনটা বা লাল। মেয়েটি চোখের তলায় সযত্নে লাগাল কাজল। একেকটি টিপ খুলে পরে আর দেখে কোনটায় বেশি ভালো মানাচ্ছে। সাজ শেষ হওয়ার পর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আয়নার দিকে। আয়নার কাছে লুকোনো যায় না কিছুই। চোখেমুখে যে চোরা চাপল্য খেলা করে যাচ্ছে, তা ধরা পড়ছে আয়নায়। মেয়েটির চোখে ডুবে আছে একটা সমুদ্র, তার ধূসর আকাশের তলায় বসে আছে বিষণ্ণ অহল্যা...

৩

...বাদামি বালুতট যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু ধূসর সমুদ্রের, যে সমুদ্র মিশে গেছে ফিকে নীল আকাশের গায়ে। বাতাসে কার্পাস তুলোর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিষণ্ণতা। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে সিগালের ডাক। পৃথিবীর আবর্তন যেমন এক শাশ্বত পুনরাবৃত্তি; তেমনই এই সমুদ্রতটে শ্বেত আসনের ওপরে যিনি বসে আছেন, তাঁর যাপন বাঁধা পড়ে গিয়েছে এক ঘটনাবিহীন ঘূর্ণাবর্তে।

অহল্যা। ঋষি গৌতমের স্ত্রী। গৌতমের অভিশাপে পাথর হয়ে বেঁচে আছেন। ঋষির অনুপস্থিতিতে ছদ্মবেশ ধরে আশ্রমে এসে অহল্যাকে সম্ভোগ করেছিল ইন্দ্র। গৌতম জানতে পেরে অভিশাপ দিয়ে অহল্যাকে প্রস্তর বানিয়ে দেন। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে তার কামাতুর লালসার চিহ্ন হিসেবে তৈরি হয় সহস্র যোনি। অহল্যার করুণার্তিতে অভিশাপের তীব্রতা কমান গৌতম; স্থির হয় বহুকাল পরে বিষ্ণুর কোনও অবতার এসে অহল্যাকে প্রস্তরজীবন থেকে মুক্তি দেবেন। ইন্দ্রের শরীরের যোনি বদলে যায় সহস্র চোখে। সেই থেকে অহল্যা পথ চেয়ে বসে আছেন মুক্তির আশায়।

প্রত্যেকদিন সমুদ্রের পাড়ে অনন্ত অপেক্ষায় জীবন কেটে যাচ্ছে তার। শিশিরের কণা গ্রহণ করে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়। দুধসাদা আঁচল ঘোলাটে বালিতে পড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়। উজ্জ্বল, স্বপ্নালু চোখে শুধু

প্রতিফলিত হয় সমুদ্রের বিষণ্ণ ধূসর। জনহীন পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে দেবত্ব থেকে সামান্যায় পর্যবসিত হওয়া নারীর দিনাতিপাত হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে সে প্রস্তর-অবয়বের চোখ থেকে কখনও সখনও গড়িয়ে পড়ে দু-এক ফোঁটা জল।

সেই অশ্রুই কি ঝরে পড়ে বৃষ্টি হয়ে?

অহল্যা বিষাদগ্রস্ত চোখে আকাশের দিকে তাকায়। তার আসনের পাশে পড়ে অজস্র ঝিনুক— তাদের প্রত্যেকের গায়ে ঘন কালো চোখ আঁকা আছে।

৪

বেলা বাড়ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষের আনাগোনা। কালো করে আসছে আকাশ। মেয়েটির চোখের কাজল-কালোর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস নিহিত আছে, আকাশের কালো মোটেই তেমন নয়। বরং যেন স্মৃতিমেদুর, খানিক চিন্তাগ্রস্তও। ঘন ধূসর আকাশের বুকে বোসেদের সাদা-মেটে পায়রাগুলো তৈরি করেছে অদ্ভুত বৈপরীত্য। আজ রবিবার বলে স্কুল নেই, অন্যথায় এই সময় কাচ্চাবাচ্চাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে গোটা গলিপথ মুখর হয়ে থাকে।

কিন্তু সাড়ে সাতটা বাজতে চলল, এখনও কোনও খবর নেই কেন? উৎসাহে যেন এক‌ফোঁটা বিরক্তির চোনা পড়েছে। সিগনালে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ট্রেন দেরি হতে পারে— সবই জানা। কিন্তু আজকের দিনটা তো এর ব্যতিক্রম হতে পারত? আজকে ট্রেনটা যদি প্রতিটা স্টেশনে সময়ে ঢুকত, সময়ে ছাড়ত; রাস্তায় একটিও মিনিট অপব্যয় না করে গন্তব্যে পৌঁছে যেত- কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হত?

'কদ্দূর?'
'আপাতত ট্রেন লেট করছে ঘন্টাতিনেক। বিরক্ত লাগছে বসে বসে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে কোথাও কিছু নেই ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে।'
'তিনঘন্টা!... ঠিক আছে। ধীরে ধীরে এসো।'

কেমন হত যদি একটি দিন চব্বিশ ঘন্টায় না হয়ে আটচল্লিশ, বাহাত্তর ঘন্টায় শেষ হত? এমন বিশেষ দিন থেকে এই যে বিধাতাপুরুষ খামোখাই তিনটে অমূল্য ঘন্টা কমিয়ে দিলেন; এর জন্য যদি মেয়েটি

একদিন তাঁর কাছে জবাবদিহি চায়- কাজটা কি খুব অন্যায় হবে?

গোটা বাড়িটা যেন এক বিশেষ উৎসবের প্রস্তুতিতে সেজে উঠেছে। ধাতব ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে টাটকা ফুলের গোছা, তাদের গন্ধে ম' ম' করছে গোটা ঘর। হরিণের নাভি থেকে জাত এইসব ফুল বুঝি স্বর্গের বাগানে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের ভবিতব্যে প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের সাক্ষী থাকার অনন্য সুযোগের কথাই লেখা আছে।

পর্দাগুলো মৃদু হাওয়ায় দুলছে এক বিশেষ ছন্দে। মেয়েটি ছাদে উঠল। ছাদের কাপড়জামাগুলো রোদের অভাবে এখনও কিছুটা সপসপে, তাদের শরীর থেকে জল চুঁয়ে চুঁয়ে মেঝেয় তৈরি হয়েছে নানান নকশা— কোথাও পালি অক্ষর, কোথাও ফুলের অসম্পূর্ণ পাপড়ি। একটি থেমে যাওয়া দিনে যে কতকিছুই চোখে পড়ে! মেয়েটি ছাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ঘন মেঘে ঢেকে গেছে গোটা আকাশ। কতকগুলো চিল বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছে। দূরে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে যান্ত্রিক কাকতাড়ুয়ার মতো, তাদের ধারেকাছে পাখিগুলো ঘেঁষে না। টবে বসানো গাছগুলো উদাসীন হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

একটা নীলজবার কুঁড়ি এসেছে। যে গোলাপগাছটা গতবারে শুকিয়ে গেল, মেয়েটি তাকে প্রাণে ধরেও সরিয়ে দিতে পারেনি। সেই গাছেও নতুন একটি কুঁড়ি দেখা যাচ্ছে যেন? নাকি এ মনের ভ্রম? গোটা দুনিয়াই কি এই বহুকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের আশায় নিজেকে সাজিয়ে তুলছে? রাধাকৃষ্ণের অভিসারের রাতেও নাকি এমন হত। রাধার ব্যাকুলতায় কেঁদে উঠত পৃথিবী। প্রবল ঝড়ে মাথা দোলাত বেবাক অরণ্যানী, কদম্ববৃক্ষের পাশে নদী হয়ে উঠত উত্তাল, মত্ত হস্তিনীর মতো চঞ্চলা।

এখানেও এখুনি বৃষ্টি আসবে। ভিজে যাবে গোটা পাড়া, গোটা শহর, গোটা পৃথিবী। গঙ্গার সমস্ত নৌকো পাড়ে এসে ফেলবে নোঙর। সমস্ত পশুপাখি, জনমানুষ খুঁজে নেবে নিজ নিজ আশ্রয়।

তীব্র জলের তোড়ের মধ্যে মিশে যাবে দুটো শরীর।

পায়ের তলাটা ভেজা ভেজা লাগতে দেখে, শাড়ির ভেজা জল কখন আনমনে মাড়িয়ে ফেলেছে সে। চিলেকোঠার সিঁড়ি থেকে রেলিঙের ধার অবধি তার পায়ের ছাপ- এ যেন 'অবাস্তব করুণ নয়ন'-এর মালকিনের

পায়ের ছাপ, পড়ে আছে নির্জন প্রাসাদের বারান্দায়, তেলেনাপোতায়...

৫

...সতেজ পদচিহ্ন যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তা একটি চৌকাঠ। নোনা ধরা দেওয়ালের বুক ভেদ করে উঠেছে একটি লজঝড়ে দরজা, তার মাথার ওপরে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা আঁকা। দরজার ওপাশে যে ঘরটি রয়েছে, তাকে ঘর বলার থেকে অন্ধকূপ বলাই ভালো। খানিক উঁচু থেকে জ্বলছে টিমটিমে হলুদ আলো। জানালা দিয়ে গাছপালার ভিড়ে সূর্যালোক ঢোকার সুযোগই পায়নি। দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা, নোনা তৈরি করেছে আনমনা মানচিত্র; জায়গাটি যেন বৈশ্বিক সমস্ত পথঘাট নস্যাৎ করে তৈরি করেছে নিজের নকশা, অবস্থান। সেখানে পৌঁছোতে গেলে জাগতিক সমস্ত চেনা-পথ ও পথ চেনার কৌশলকে ভুলে পৌঁছোতে হয়। মেঝেতে ধুলোর পুরু আস্তরণ। কোণের দিকে সংসার পেতেছে মাকড়সা, আরশোলার দল। কোনও এক পরাবাস্তব শিল্পীর কল্পনাসঞ্জাত এই কামরায় হাজার এক স্বপ্নের ভিড়। একটা পুরোনো তেপায়া টেবিলের ওপরে ঘোলা কাচের একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে খেলা করছে রঙিন মাছের দল। তাদের মাথার ওপরে বুদ্বুদগুলির মাধ্যমে তারা একে অপরের সঙ্গে কী কথা বলে তারাই জানে। একপাশে দেওয়ালের গায়ে একটা জং-ধরা খাঁচায় কতকগুলো সাদা বদ্রিপাখি নিজেদের মতো কিচিরমিচির করে চলেছে। আরেক কোণে রাখা ঠাকুর্দার আমলের একটি ড্রেসিং টেবিল। তার আয়নায় কোনোক্রমে দু হাত দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা সম্ভব। কুয়াশার ভোরে পাশের মানুষটিকে যতটা স্পষ্ট দেখা যায়, ঠিক ততটাই যেন ওই আয়নায় কারুর প্রতিবিম্ব পড়ে। ঠাকুরের ছবিওয়ালা মলিন একটা ক্যালেন্ডার দেওয়ালে নিজের মনে হাওয়ায় দুলছে; তার তলার দিকের বাঁধানো অংশটা দেওয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষে ঠক-ঠক করে এক একঘেয়ে, বিরক্তিকর আওয়াজ করে চলেছে। ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। সেকেন্ডের কাঁটার টিকটিক শব্দের বদলে কানে লেগে থাকে ক্যালেন্ডারের শব্দের অনুরণন। ঈশ্বরের এই বিস্মৃত গ্রামে সময়ের অতিবাহন বুঝি এই শব্দেই বোঝা যায়!

এই বদ্ধতাকে যেন খানিক আলতো করে সরিয়ে ঘরে ঢুকল যামিনী। যেভাবে স্থির হ্রদে পদ্মবনকে পেলব ছোঁয়ায় সরিয়ে এগোয় চঞ্চলা, নবীনা মাছ; তেমন এই বদ্ধতার পরতটি সরে ঘরে বুঝি প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। মাথার পেছনে চূড়ো করে গামছা বাঁধা, পরনে নেহাতই আটপৌরে শাড়ি। ঠোঁটের দুপাশে লেগে ক্লান্তি। গায়ে সামান্য মলিন অলঙ্কার।

মুখশ্রীতে সরল সৌন্দর্য। শরীরের ভরা যৌবন কোনও এক শাশ্বত প্রেমিকের জন্য বাঁধ ভাঙার অপেক্ষা করে আছে। একটি কাঠের টুল টেনে সে বসল আলমারির সামনে। পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ভেজা চুলের জল। গামছা দিয়ে সে চুল মুছতে শুরু করল ধীর হাতে। পাশের ঘর থেকে খুনখুনে একটা গলার স্বর ভেসে এল-

'অ মুখপুড়ি মাগী, এৎখনে তোর আসার সময় হল?'

হাতের চলন সামান্য ধাক্কা খেল। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘশ্বাস। তারপর আবার ধীর হাতে চুল মোছা...

কিরে, মরলি নাকি?

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মতো কর্কশ শব্দের বিপ্রতীপে, শান্ত ঝোরার মতো একটি কণ্ঠ ফুটে উঠল-

কী বলছো?
এত বেলা হয়ে গেল, খেতে দিবিনি?
দিচ্ছি। ভেজা চুলটা মুছি।

মশারির চাল চুঁয়ে আসা মেঘলা আলো অজস্র আঁকিবুঁকি কেটেছে শয়ান বৃদ্ধার মুখে। নদীর স্রোতের ধাক্কায় যেমন বালিতে অজস্র রেখা তৈরি হয়, তেমনই বয়স ছাপ ফেলেছে মহিলার মুখে। খাবারের থালাটা নিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে খেয়ে যাচ্ছেন। সেই বিড়বিড়ানিতে বারদুয়েক একটা নাম ভেসে এল— নিরঞ্জন।

মেয়েটি আবার নিজের মনে ভেজা চুল ঠিক করে চলেছে। বদ্রিপাখির কিচিরমিচির ছাপিয়ে, আজ তার মন বহুকালের প্রতীক্ষিত কারুর আসার পথে পড়ে আছে। হঠাৎ সেই টিমটিমে আলোয়, প্রাচীন ঘোলাটে অ্যাকোয়ারিয়ামের বুদ্বুদের চিরাচরিত জন্ম-মৃত্যু ছিঁড়ে, বদ্রিপাখিদের সহসা বাকরুদ্ধ করে আয়নায় পড়ল এক পরিচিত ছায়া! চমকে উঠল সে, তার যেন নিজের দু -চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। বাইরে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। হাওয়ায় দুলছে নারকেলগাছের সারি। এই অবয়ব তো তার ভীষণ চেনা! সেই চোখ, সেই মুখ, সেই কোঁকড়ানো চুল— বিদায়ের সময় নিরঞ্জন যেমন ছিল, অবিকল সেইভাবে এসে দাঁড়িয়েছে যামিনীর সম্মুখে।

আচমকা ঘরের বাতি গেল নিভে। প্রবল ঝড়ে জানালার পাল্লাগুলো সশব্দে আছড়ে পড়ছে দেওয়ালের বুকে। পিছনের পানাপুকুরের ছপছপে মিশে যাচ্ছে বেড়ালের কান্নার সুর। জগৎসংসার উথালপাথাল। নোনা ধরা ফিকেরঙের দেওয়ালে হ্যারিকেনের আলোয় ঘন হয়ে আসছে দু'জন নারী-পুরুষের ছায়া।

কতক্ষণ এভাবে কাটল জানা নেই। আচমকা ঘর অন্ধকার। হাওয়ায় কেঁপে উঠে নিভে গিয়েছে শিখা। ঝড় স্তিমিত হয়ে এসেছে। যামিনী আলো জ্বেলে দেখল ঘরখানি আগের মতোই পড়ে রয়েছে। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা যেন অলীক দৃশ্যকল্প মাত্র; ঘরে কেউ নেই! খানিকটা বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিয়েছে মেঝে। বদ্রিপাখিগুলোও ভিজে গিয়েছে খানিক। মাছেরা নির্বিকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাচীন জলাশয়ে। হা-ক্লান্ত, হতাশ এবং ভগ্নহৃদয় এক যুবতী, আলগা চুল বেঁধে নিতে নিতে শুনতে পেল পাশের ঘর থেকে খুনখুনে চিৎকার ভেসে আসছে-

'থালাটা নিয়ে যাবি তো রে। চিল্লিয়ে মুখে ফেনা উঠে গেল...'

যামিনী ধীরপায়ে পাশের ঘরে যায়। শূন্য ঘর। একখানি অস্বচ্ছ আয়না, একখানি পাখির খাঁচা, একখানি ঘোলাটে অ্যাকোয়ারিয়াম আর কতকগুলো ক্ষয়ে আসা আসবাবের সংসার। মা-মেয়ের কথোপকথন বর্ষণোত্তর জলবিন্দুর আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে-

'কার একটা গলা পেলুম যেন, নিরঞ্জন এল বুঝি?'
'কেউ না। তুমি শোও।'
'কবে যে সে ছেলে আসবে, আমি একটু শান্তিতে চোখ বুজব।'

গলা বুজে আসে মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ির। মেঝেতে কতকগুলো এলোমেলো পায়ের ছাপ।
দু'জোড়া।

৬

মেয়েটি আনমনা হয়ে কেটে চলেছে সবজির টুকরো। ডুমো ডুমো করে কাটা আলু; গোল গোল করে ছাড়ানো পেঁয়াজ। কলে জল এসে গিয়েছে। গতরাতের বাসনকোসন পড়ে আছে। সেগুলো চটজলদি ধুয়ে

ফেলা হল। ভাতের ফ্যান ফেলতে গিয়ে সজোরে চৌকাঠে ঠুকে গেল ডানপায়ের কড়ে আঙুল। ক্ষণিকের জন্য ফর্সা মুখটা গেল নীল হয়ে। যে যন্ত্রণা নীল হয়ে বিষিয়ে ওঠে, তা কি শুধুই শরীরের? যক্ষপ্রিয়ার বেদনাবিধুর প্রতীক্ষার রঙও বুঝি এমনি নীল। কালশিটে।

আকাশে গাঢ় ধূসর ত্রিপলের মতো ছেয়ে গিয়েছে বর্ষার মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকেই। প্রথম সঙ্গমের সময় যেমন শিউরে ওঠে নারীদেহ, তেমন প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকানোর সময় শিউরে উঠছে গোটা পৃথিবী। প্রায়ান্ধকার পৃথিবীতে আকাশে নীলচে-বেগুনি হয়ে শিরা উপশিরার মতো ছড়িয়ে পড়ছে 'বজ্রমানিক'। মেয়েটির ব্যথার নীল ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা আকাশের গায়ে; ছাদের ঘরে, প্রতিটি টিপটিপে বৃষ্টির ফোঁটায়।

প্রায় বারোটা বাজতে চলল। এখনও ছেলেটির কোনও হদিশ নেই। মেয়ের বিরক্তি প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। ভারতীয় রেলকোম্পানির প্রতি, নাকি নিজের ফুটো কপাল, নাকি সে বিরক্তি বর্ষার জলে কাগজের নৌকোর মতোই উদ্দেশ্যহীন? সাদা বেড়ালটা ভাত চেয়ে অনেকক্ষণ থেকে খাটের তলায় ম্যাও ম্যাও করছে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে অঝোর ধারায়। জানালার ঘষা কাচ ভিজে গেছে। বাইরের গাছের ছায়া কালচে ভূতের মতো তার গায়ে তৈরি করেছে হাজার এক অবয়ব। কোন এক বাড়িতে সরোদের রেওয়াজ করছে কেউ। ভেসে আসছে গম্ভীর বর্ষার রাগ।

৭

উথালপাথাল নদীর পাশে শান্ত কদমবন। সেখান থেকে ভেসে আসছে যে কোমল, মৃদু বংশীধ্বনি; তাতে যেন কোথাও খোদাই হয়ে আছে রাধার নাম। যে অন্তবিহীন অপেক্ষায় একটি, কেবলমাত্র একটি বাঁশির সুর শোনার জন্য তুচ্ছ হয়ে যায় গভীর রাতে জঙ্গলের অজানা ভয়; ফুৎকারে উড়ে যায় কন্টকাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার দুশ্চিন্তা; সেই অপেক্ষমাণ নারী যেন বসে আছে নিশ্চল। বিছানার চাদর এলোমেলো হয়ে গেছে। বাইরে গভীর শ্রাবণ।

এ সেই তাত কণ্বের আশ্রম। পুরাকালের মদির-রঙা আকাশের ছায়া পড়েছে কাকচক্ষু হ্রদে। দু-একটা জলফড়িঙের আকস্মিক আগমনে

কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছগাছালির প্রতিফলন। সেই হ্রদে কোন এক মাছের পেটে গিয়েছে শকুন্তলাকে দেওয়া দুস্মন্তের অভিজ্ঞান। দুস্মন্ত, বেমালুম ভুলে গিয়েছে শকুন্তলার কথা। তাত কণ্বের আশ্রমে যত্নের অভাবে হলুদ হয়ে আসে গাছেদের পাতা। ফিকে হয়ে আসে হরিণের পিঠ। বেঁচে থেকে বিস্মরণের বিষ কেমন হয়, টের পায় সে বনকন্যা প্রতি পলে।

এই ক্লিন্ন, দীন জীবনযাপনটিকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিতে আসছিল ট্রেনটা। এবং সেই ট্রেনে এক প্রেমিক। এখন সন্ধেবেলা। ছেলেটির খবরাখবর নেই বহুক্ষণ হল। তীব্র হাওয়ায় ঢেকে যাচ্ছে দুনিয়ার যাবতীয় কথা। গোটা পাড়ায় লোডশেডিং হয়ে নেমে এসেছে নিকষ অন্ধকার। আজকাল লোডশেডিং ব্যাপারটা এ পাড়া থেকে উঠেই গিয়েছে বলে নেই আর ইনভার্টারের চল। এমার্জেন্সি, মোমবাতির আলো ঠিকরে আসছে জানালাগুলো দিয়ে। এইসব নিভু-নিভু জোনাকির ভিড়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। একা। আহত। ছপছপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রিকশা। মন্দির থেকে শোনা যাচ্ছে সন্ধ্যারতি। যে জীবনযাপনে একমুঠো উজ্জ্বল আলো নিয়ে আসছিল ছেলেটি; সেই রোজনামচাটিই চোখের সামনে রোজকার মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেমন ছিল অহল্যার প্রস্তরকঠিন বিষাদ? কেমন কেটেছিল যামিনীর বিনিদ্র রাত? যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তার প্রিয়তম বিস্মৃত, সেই শকুন্তলার কাছে বনের কোলাহল কতখানি নীরব ও অনর্থক হয়ে উঠেছিল? কিভাবে মরেও বাঁচার আকুতি থেকে বেরোতে পারেনি ক্ষুধিত পাষাণের ইরানি প্রেতিনী? আদতে কতখানি নিঃশব্দ হলে মীরার মতো বাঙ্ময় হয়ে ওঠা যায়? হাজার-হাজার, লক্ষাধিক বছরেরও বেশি মৃত তারাদের আলো ঠিকরে আসছে যে পাড়ায়, এসে পড়ছে যার মুখে; সে-ই অহল্যা, সে-ই যামিনী। বৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য পরিশুদ্ধ হওয়া ধুলোয় ভরা এই শহরটা তার তাত-কণ্বের বন, তার 'বেদনার বালুচর'। যেখানে কোনদিন কাঙ্ক্ষিত ট্রেন আসেনি।

আকাশ কালো করে আবার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। এ-বৃষ্টি আজ রাতে থামার কোনও লক্ষণ নেই। এ-মেঘ কাঁদিয়েছে যক্ষপ্রিয়াকে তার প্রেমিকের থেকে বহুযোজন দূরের কোনও এক নির্জন প্রাসাদে; ভিজিয়ে দিয়েছে রাধার অভিসারের কদম্ববন। যে মেঘে কেবল পড়েছে বিষণ্ণ অপেক্ষার ছায়া- সে ঘনিয়ে আসছে মেয়েটির শরীরের দিকে।

সূচিপত্র

আ হিউগেনো: জন এভারেট মিলেয়

একটি ছবির গল্প - একটি গল্পের ছবি

সুব্রত কুমার আচার্য্য

২৪-এ আগস্ট, ১৫৭২ । প্যারিস ।

চারিদিক ঝাপসা। ভোরের আলো এখনও ফুটে ওঠেনি ঠিক করে। রক্তিম আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে সেন নদীর জলে। ফরাসি সভ্যতার প্রাণভোমরা, সতত বহমান এই নদী আজ যেন থম মেরে আছে। নাকি এই সবই ভলেন্তিনার মনের ভুল? ভিজে চোখ কান্নায় লাল হয়ে উঠেছে বলেই হয়তো এরকম দেখছে ও! নিজের হতাশ, ভাবলেশহীন নিষ্পন্দতাকেই বুঝি ও দেখছে সেনের জলে! নাকি, সত্যিই কোনো এক আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতিফলন এই সব? সেন নদীর জল কি এর মধ্যেই লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে মানুষের রক্তে? ভেবেই ভিতরে ভিতরে কেঁপে ওঠে ভলেন্তিনা।

নদীর ধারে উইলো গাছটার উপর ভর দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে ভলেন্তিনা। দিনের এই সময়ে, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের এইভাবে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না, বিশেষত আজকের দিনে। তবু, পা যেন আর চলছে না ভলেন্তিনার। বাড়ি ফিরতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু বাড়ি ফেরার কথা ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ওর। যে হত্যালীলার পরিকল্পনা ও আজ হতে দেখেছে ওর নিজের বাড়িতে, তারপর আর ওই বাড়িকে ওর নিজের বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ও এখন নিরুপায়। যে উদ্দেশ্যে ও রাতের বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল, সেই কাজে ও ব্যর্থ। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারে ও। যার আশ্রয়ের আশায় ও বেরিয়েছিল, সে ওর ভালোবাসাকে হেলায় ছেড়ে দিয়ে নিজের কর্তব্যের পিছনে চলে গেছে। যেন, ওর ভালোবাসা যথেষ্ট নয় রাওলের জন্য!

কিন্তু ও তো ভালোবাসে রাওলকে। শুধুমাত্র রাওলকে বাঁচানোর জন্য নিজের সব কিছু ছেড়ে, আজকের মতো এক ভয়াবহ দিনেও নিজের সব রকম বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে ও এসেছিল। কিন্তু রাওল? রাওল শুনল না ওর কথা!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে ভলেন্তিনাকে। চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ির দিকে এগোয়। মনে শুধু একটাই প্রশ্ন চলতে থাকে ওর।

ভালোবাসাই কি যথেষ্ট নয়?

***

২৪-এ আগস্ট, ১৮৫১। ইয়ুল, কিংস্টন টাউন, সারি কাউন্টি, ইংল্যান্ড।

‘ডিউক অ্যান্ড সন্স’-এর নতুন বলটা ব্যাটের উপর নাচাতে নাচাতে বাড়ির দিকে চলছে ষোল বছরের আর্থার লেম্প্রিয়ের। বলটা পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছে ও। ওর বাবার এক বন্ধু লন্ডনের ‘গ্রেট এক্সিবিশন’ থেকে এনে দিয়েছে। যদিও ভাই পার্সির জন্যই বলটা এসেছিল, কিন্তু আপাতত এই মহার্ঘ বস্তুটা ওর জিম্মায়। ডিউক কম্পানি ওদের সিমটা আরও মজবুত করেছে এ বছর। রাউন্ডআর্ম(*) বোলিংয়ের জন্য সিমটা পারফেক্ট। আর সেটা আজকেই যাচাই করা হয়ে গেছে আর্থারের। ওর বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কেউ। ব্যাটিংও খুব খারাপ করেনি আজ। এই রকম চললে খুব শীঘ্রই সারি ক্রিকেট ক্লাবে জায়গা হয়ে যাবে ওর। আর কেনসিংটন ওভালে সবাই ওর খেলাই দেখতে আসবে। হাততালিতে ফেটে পড়বে জনতা।

ভবিষ্যতের হাততালির শব্দে বিভোর হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির প্রায় কাছাকাছিই এসে পড়েছিল আর্থার। হঠাৎ খেয়াল হল যে ভুল হয়ে গেছে। মা বেরোনোর সময় বলেছিল ফেরার পথে ‘জনি’কে নিয়ে আসতে। আবার উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলো সে।

জনি তথা জন এভারেট মিলেয়-এর সঙ্গে আর্থারের বাবার পরিচয় যখন আর্থারের বাবা-কাকারা জার্সি দ্বীপে থাকত তখন থেকে। বাবা বলেছিল, জন আর ওর কিছু বন্ধু নাকি জুলাই মাসেই এসেছে কিংস্টন টাউনে, থাকছে সার্বিটন চত্বরে/এলাকায়। ওদের পড়শী স্যার রিডের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছে, ইয়ুল নদীর(*) ধারে আস্তানা গেড়েছে জন আর ওর বন্ধুরা। সকাল থেকে সন্ধে অবধি ওদিকেই দেখা যায় ওদের। গ্রাম্য লোকজন নাকি জড় হয়ে ওদের আঁকা দেখে। এছাড়াও আরেকটা বড় খবর পেয়েছে আর্থার। মিস্টার হাওলারের থেকে।

---

* ক্রিকেটে তখন আন্ডারআর্ম বোলিংই বেশি চলতো, রাউন্ডআর্ম বোলিং খুব বেশি বছর হয়নি আইনসম্মত হয়েছে, আর ওভারআর্ম বোলিং তো সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার বিচারে আন্ডারআর্ম বোলিং ক্রমাগতই প্রাধান্য পাচ্ছে।

* বর্তমান নাম ‘হগসমিল’

কয়েকদিন আগে মিস্টার হাওলারের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়েছিল আর্থারের। মিস্টার হাওলার চাষাভুষো মানুষ, সাধারণত অর্থারকে দেখলে হাসি মুখে পাশ কাটিয়েই যান কিন্তু সেদিন রীতিমত গজগজ করতে করতে যাচ্ছিলেন। কী হয়েছে, সবকিছু ঠিক আছে কিনা জানতে চাইলে হাউমাউ করে ওঠেন। ওর জমির উপর নাকি রীতিমত অত্যাচার করেছে কোন এক পাগল আঁকিয়ে। শস্য মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। এবার উনি যাবেন মেজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানাতে। কাণ্ড শুনে আর্থার এক প্রকার নিশ্চিত যে এই কাজ জনেরই।

ব্যাটের উপর বল নাচাতে নাচাতেই দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে চলে আর্থার। 'জনি'র সঙ্গে দেখা হবে ভেবে বেশ আনন্দ হয় ওর। বছর দেড়-দুই হল 'জনি'র সঙ্গে দেখা হয়নি। ওর হাতে বানানো ক্রিসমাস কার্ডও পায়নি গতবছর।

***

ইয়ুল খুবই সরু নদী, দৈর্ঘ্যও খুবই কম। মাত্র ছয় মাইল। কিংস্টনের ইয়ুল এলাকা থেকে শুরু হয়ে কিংস্টন স্টেশনের কাছে গিয়ে টেমসে মিশেছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ কম বলে, একে নদীর বদলে, স্ট্রিম বা নালাও বলা চলে, কিন্তু নালা বললে যে চিত্র আমাদের মনে ভেসে ওঠে এ ঠিক তার উল্টো। স্বচ্ছ জল। দুই পাড়ে ফুটে থাকে অসংখ্য ফুল - নানা রঙের, নানা বাহারের। কুলকুল করে বয়ে যায় ঠাণ্ডা জল। আর তাই এই নদী কিংসটনবাসীদের বড় আপন।

সেই ইয়ুল নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে, একটু উঁকিঝুঁকি মারতেই খুঁজে পাওয়া গেল বন্ধুকে। কিন্তু দূর থেকে বন্ধুর কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে ফেললো সে।

নদীর পাড়েই একটা উইলো গাছের আড়ালে কাঠের তেপায়া ইজেলে বিশাল বড় ক্যানভাস রাখা। কাছেই পড়ে আছে একটা বাক্স, চারদিকে রঙ-তুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আর তার বন্ধু সেই সব ছেড়ে নদীর ধারে হাঁটু মুড়ে, একটা ছোট্ট পেয়ালায় নদীর জল তুলে দুই মরাল-মরালীকে তাক করে জল ছোঁড়ার চেষ্টা করছে আর হুশহুশ করছে।

"জনি! করছটা কী?"

আচমকা ওর নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে ঘাবড়ে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে জলে পড়ার উপক্রম হয় জনের। কোনোরকমে টাল সামলায়। আর্থার! এখানে? আর্থারকে দেখেই অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। যেগুলোকে এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা ও করছিল বিগত দুই মাস! তবু নিজেকে সামলে নেয় জন।

এক গাল হেসে নদীর ধার থেকে উঠে আসে ও। "আরে আর্থার! তুমি এখানে? কেমন আছো? আরে বাপরে! বিশাল লম্বা হয়ে গেছো তো!" বলতে বলতেই জড়িয়ে ধরে আর্থারকে।

"অনেক দিন পর দেখলে তাই ওই রকম মনে হচ্ছে!" আর্থার যোগ করে।

"হ্যাঁ, সত্যিই! তা তুমি এখন এখানে?"

"আচ্ছা! আমি এখানে?" অবাক হবার ভাণ করে আর্থার। হেসে বলে, "এক, আমি এই ইয়ুলের ছেলে। দুই, তুমি এখানে এসেছো অথচ একবারও দেখা করনি আমাদের সঙ্গে! অভিযোগ তো আমাদের করা উচিত!"

"না না, সেই রকম কোনো ব্যাপার না, আসলে একদমই সময় পাইনি। আর পাবো কী করে, তোমাদের এখানের হতচ্ছাড়া মাছিরা নাজেহাল করে রেখেছে। তার উপর হাওয়া। একদিন তো ক্যানভাসটাই উড়ে যাচ্ছিল। সেই সামলাতে গিয়ে ওই চাষের জমিতে কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছিল, তা এক ভদ্রলোক তো খুব ঝামেলা করে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবেন বলে হুমকিও দিয়ে গেলেন। আর তার উপর এই দুই রাজহাঁস প্রেম করার আর জায়গা পায় না। ঠিক যে জংলা লতাপাতাগুলো আমি আঁকব, সেখানেই ওরা উৎপাত শুরু করবে।"

জনের অভিযোগগুলো শুনতে শুনতে হাসি আর থামে না আর্থারের। "আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি! কিন্তু তুমি তো রবিবার চার্চেও যাচ্ছ না। আজ রবিবার সেটা মনে আছে তো? আজকে ডিনারের জন্য তোমায় নিমন্ত্রণ করবে ভেবেছিল মা, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বলে আমাকেই বলে পাঠিয়েছে যেন তোমায় ধরে বেঁধে নিয়ে আসি!"

"ওহ! আচ্ছা। না, চার্চে যাওয়া হচ্ছে না আসলে। এমনিতে রবিবার একটু বিশ্রাম নিয়েই কাটাই কিন্তু এই আঁকাটা নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি

তাই সেটাও হচ্ছে না এই ক'দিন। আর মাথায় আরেকটা আঁকাও ঘুরছে, সেটা নিয়েও রাতের দিকে নানা পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি আসলে। বৃষ্টি শুরু হবার আগে এগুলো করে উঠতে পারলে ভালো হয় আর কি!"

"দেখি কী আঁকছো!"

দেখে প্রথমে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারে না আর্থার। নদীর জল আর তার পাশে গজিয়ে ওঠা নানা ফুল আর জংলার ছবি এঁকে চলেছে ওর বন্ধু। কিন্তু একটু মন দিয়ে দেখতেই ও বুঝতে পারে প্রতিটা গাছ, আগাছা, ফুল যেন জীবন্ত! যেন ফুঁ দিলেই ছবির মধ্যে থাকা জলাশয়ের জলটায় তরঙ্গ ছড়িয়ে যাবে, ফুলগুলোও মাথা নাড়াবে। "এটা কী আঁকছো?"

"ওফেলিয়া। অবশ্য এখন তো শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আঁকছি। তবে হয়ে যাবে এটা। এটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এর প্ল্যান আমার হয়েই গেছে! চিন্তায় আছি পরের ছবিটা কী আঁকবো সেই নিয়ে।"

[চিত্র ১ - 'ওফেলিয়া' - জন এভারেট মিলেয় – তখনও শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডটাই হয়েছে, 'ওফেলিয়া'র মডেলের খোঁজ তখনও মেলেনি]

"হ্যাঁ, সেটাও হয়ে যাবে। আমরা জানি! তোমার কাছে কোনো ছবিই

কোনো ব্যাপার না! রয়াল একাডেমি তো আর এমনি এমনিই এগারো বছরের জন এভারেট মিলেয়কে ভর্তি নেয়নি! তুমি জিনিয়াস! তোমাকে নিয়ে আমরা খুবই গর্বিত বন্ধু!" হেসে ওঠে আর্থার। হেসে ফেলে জনও।

"সে সব এক প্রাচীন ইতিহাস! এখন আমরা লড়ে চলেছি। স্রোতের বিরুদ্ধে ভায়া। দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারি!"

"আচ্ছা আচ্ছা, কোনো চিন্তা নেই, সব ঠিক হবে। এবার চলো! সব গুছিয়ে নাও!"

জনও রঙ-তুলি কাঠের বাক্সে গোছাতে থাকে। আর্থারও ব্যাট-বলটা ঘাসের উপর থেকে তুলে নেয়! নতুন চকচকে লাল বলটা নজর কাড়ে জনের।

"নতুন?"

"হ্যাঁ, দারুণ বানিয়েছে এটা!"

আবার উঠে বসে জন। "অনেক দিন ক্রিকেট খেলি না! দেখি, ছোঁড়ো তো বলটা আকাশের দিকে, ক্যাচ নিই।"

আর্থার জোরে ছুঁড়ে দেয় বলটা। জন নিজেকে জায়গায় নিয়ে আসে ক্যাচটা নেবার জন্য। কিন্তু বলটা লুফে নিতে গিয়েই বুঝতে পারে ভুল হয়ে গেছে। বলের সিমটা এসে ধাক্কা মেরেছে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখের ডগায়। ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে জন!

***

বাঁ হাতের ব্যান্ডেজটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে জন।
বলটা লাগার সময় মনে হয়েছিল যেন আঙুলটাই ভেঙে গেছে। কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু নখটা উপড়ে গেছে। আপাতত ক'দিন কাজ বন্ধ। ঘরেই বন্দি।

সেদিন এতো কাণ্ডের পর আর ডিনারে যাওয়া হয়নি লেম্প্রিয়েরদের বাড়ি। উল্টে আর্থার আর জনের বন্ধু উইলিয়াম হলম্যান হান্ট দু'জনে মিলে ওকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে, ব্যান্ডেজ করানো হয় আঙুলে।

লেম্প্রিয়েরদের বাড়ি যে যেতে হয়নি সেটা এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। শাপে বর হয়েছে বলা যায়। ওই বাড়িতে গেলেই অনেক পুরোনো স্মৃতি উঠে আসত। অবশ্য এখনও যে সেগুলো উঠে আসছে না তা নয়। এখানে আসার পর থেকেই সব স্মৃতি আবার টাটকা হয়ে গেছে।

শুধু একটা নামই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে জনের। ফ্যানি!

ফ্যানি লেম্প্রিয়ের। আর্থারের দিদি। বছর পাঁচেকের বড় আর্থারের থেকে। জনের সমবয়সি।

এবং, জনের কিশোর বয়সের প্রেম।

খুব মিষ্টি হাসি ফ্যানির। গলার স্বরও খুব সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো লাগতো সেটা হল ওর সান্নিধ্য। ওর কাছে দাঁড়ালেই ওর গা থেকে একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ভেসে আসতো। ওর সঙ্গে কথা বললে পেটের মধ্যে কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠতো। কতবার শুধু ওর ছবি আঁকবে বলে গোটা পরিবারের ছবি এঁকেছে। নিজের আঁকার খাতা ভরিয়েছে ওর ছবি এঁকে।

বুকের ভিতরটা চিনচিন করে ওঠে জনের।

ফ্যানির বিয়ে হয়ে গেছে। হেনরি বেক-এর সঙ্গে। জন যদ্দূর শুনেছে, হেনরির বয়স ফ্যানির দ্বিগুণ!

নাহ! অসহ্য হয়ে উঠছে চিন্তাগুলো। ছবি না এঁকে চুপচাপ বসে থাকলে এই সব চিন্তাই ঘুরপাক খেতে থাকবে। আর ঘরের মধ্যে একা বসে থাকা যাবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে জন।

***

লজের ছোট্ট, বদ্ধ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খুব ভালো লাগে জনের।

খুব সুন্দর মিঠে একটা রোদ উঠেছে আজ। আকাশের মেঘগুলোও যেন প্রাণভরে শ্বাস নিচ্ছে আর জনের মতোই উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে

চলেছে।

চারপাশের সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে করতে কখন যে সার্বিটন ছাড়িয়ে ইয়ুলের দিকে এসে পড়েছে জন, খেয়াল নেই। এমনিতে ইয়ুল খুবই সুন্দর জায়গা। এর আগে জন কতবার এসেছে এই ইয়ুলে। এখানে আসার জন্য তর সইতো না ওর। জায়গাটার টানে, ফ্যানির টানেও।

জন বুঝতে পারে, বাইরে বেরোলেও ওর মনটা সেই ফ্যানির চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই ইয়ুল ছাড়িয়ে একটু চড়াইয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করে ও। আগে কোনোদিন আসেনি এদিকে। মানসিক ক্লান্তিকে দূর করতে একটু কায়িক পরিশ্রম দরকার, তাই এই চড়াইকে স্বাগত জানায় জন মনে মনে।

বেশ খানিকটা পথ একা একা ঘোরার পর দিনের আলো কমে আসতে শুরু করলে লজে ফেরাই মনস্থ করে জন। কিন্তু ইয়ুল দিয়ে না ফিরে অন্য রাস্তা ধরে সে। দুয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানতে পারে এই এলাকার নাম উওস্টার পার্ক। সামনেই একটা ফার্ম আছে ওই নামে। সেখানেই এদিকওদিক কিছুটা যাবার পরে একটা জায়গায় এসে থমকে যায়। একটা বিশাল বড় বাড়ি। বাড়ির চেয়ে কারখানাই বলা চলে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর সেই বাড়ির সামনেই একটা অদ্ভুত সুন্দর দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আইভি ও অন্যান্য লতা-গুল্মে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে সেই দেওয়াল, তবু এক মনোমুগ্ধকর, নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে সেই দেওয়াল। স্থির নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে থাকে জন।

কতক্ষণ এইভাবে একটা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জন, খেয়াল করতে পারে না। কিন্তু সেই ধ্যান ভেঙে যায় কিছু ফিসফিস আওয়াজে। দেওয়ালের পাশ দিয়ে চুপিসাড়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখে, এক যুবক আরেক যুবতীর গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের দৃষ্টি দু'জনের চোখে নিমজ্জিত। কোনো কথা না বলেও কত কথা বয়ে চলেছে উভয়ের দৃষ্টি বেয়ে। যুবকটির ঠোঁট যুবতীর ঠোঁটে নেমে এলে জন ধীর পায়ে সেখান থেকে সরে আসে।

দেওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে এসে আবার রাস্তায় ওঠে জন। চাপা একটা উৎকণ্ঠা হচ্ছে ওর ভিতরে ভিতরে। চারদিক কেমন নিশ্চুপ হয়ে

এসেছে। কী যেন একটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর ভিতর থেকে। খুব গম্ভীরভাবে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে ও। হাঁটতে হাঁটতে যখন ও প্রায় উওস্টার পার্ক ফার্মের কাছে এসে পৌঁছায়, তখন পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করে। ও ওর দ্বিতীয় ছবির বিষয় পেয়ে গেছে। ভালোবাসার গল্পই হবে ওর দ্বিতীয় ছবির বিষয়। এক যুবক-যুবতীর প্রেম!

***

জন যখন লজে এসে পৌঁছায় তখন ও রীতিমত হাঁপাচ্ছে! হান্ট ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে লজে। ওর ছবি আঁকায় কোনো বিরতি নেই। জনকে ওই রকম পাগলের মতো হাঁফাতে দেখে হান্ট অবাক হয়।

“আবার ক্রিকেট খেলতে গেছিলে নাকি?”

জন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হান্টের দিকে মুখ করে বসে। “না না, ওসব নয়। শোনো, আমি সেকেন্ড ক্যানভাসটায় কী আঁকবো সেটা পেয়ে গেছি!”

“বাহ্, দারুণ তো! তো, কী সেটা?”

“বলছি বলছি, কিন্তু তারও আগে শোনো, আমরা এই লজ ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আমাদের থাকার নতুন জায়গা পেয়ে গেছি! এই লড়ঝড়ে লজের থেকে বহুগুণ ভালো।”

“কোথায় সেটা?”

“উওস্টার পার্ক ফার্মে।”

“আচ্ছা! সে ঠিক আছে, তুমি দেখে এসেছো যখন তখন আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না, আর এই লজের চেয়ে যেকোনো কিছুই ভালো।” হেসে ওঠে দু’জনেই।

“আচ্ছা, তোমার শেফার্ড-এর ছবি কেমন চলছে?” (পরবর্তীকালে এই ছবিই ‘হায়ারলিং শেফার্ড’ নামে বিখ্যাত হয়।)

[চিত্র ২ - 'হায়ারলিং শেফার্ড' - উইলিয়াম হলম্যান হান্ট - তখনও শুধুই ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ চলছে]

"ভালোই! দেখছো তো?" জানালার ধারেই রাখা আছে ক্যানভাসটা, সেদিকেই আঙুল দেখায় হান্ট। হয়েই এসেছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা। "আচ্ছা, আমারটা ছাড়ো, তোমার দ্বিতীয় ছবিটা বলো।"

"আমার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে প্রেম। আমি এক যুগলের ছবি আঁকতে চাই, তাদের ভালোবাসাকে ফুটিয়ে তুলতে চাই ক্যানভাসে!"

হান্ট এতক্ষণ জনের দিকে ঝুঁকে ওর কথা শুনছিল। এখন একটু পিছিয়ে বসে। মুখে কিছু বলে না। চুরুটটা পকেট থেকে বের করে ধীরে ধীরে জ্বালায়।

জন অধৈর্য হয়ে পড়ে। "কী? কিছু বলবে তো?"

হান্ট উঠে দাঁড়ায়। তাড়াহুড়ো করে না। টেবিলের উপর থেকে একটা তুলি তুলে নিয়ে নিজের ক্যানভাসটায় প্রলেপ দিতে থাকে। একটা সাদা ভেড়ার লোমগুলো ও ঠিক করছে তুলি দিয়ে।

হান্ট আর জন, দু'জনই ওদের নিজেদের কাজের সবচেয়ে বড় সমালোচক। এভাবেই ওদের বন্ধুত্ব মজবুত হয়েছে। কারণ ওরা একে

অপরকে নিজেদের মনের কথা কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলতে পারে। পৃথিবীর সবাই কী বলল, ওদের কাছে তার চেয়েও বড় হল জন কী বলল, হান্ট কী বলল!

কিন্তু অনেক সময় এটা মুশকিলও হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ওরা পরস্পরের নাড়িনক্ষত্র খুব ভালোভাবেই জানে। সব সময় সত্যিটা বলতে অসুবিধা না থাকলেও সোজাসুজি বলা সমীচীন মনে হয় না। বন্ধুত্বের খাতিরেই একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়, একটু মাত্রা কমিয়ে বলতে হয়। কারণ, শুধুমাত্র সমালোচনার উদ্দেশ্যেই তো সমালোচনা করা নয়, সেই রকম দায়হীন সমালোচনার কোনো জায়গা নেই ওদের মনে। কীভাবে একে অপরের থেকে ভালোটা বের করে আনবে সেটাই তো লক্ষ্য।

জন হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ে, পা ঝুলিয়ে। বাঁ হাতটা টনটন করছে। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে। চোখ বন্ধ করতেই আবার দেখতে পায় ওই যুবক-যুবতীকে, যুবকের ঠোঁট নেমে আসছে যুবতীর ঠোঁটে। দৃশ্যটা এখন যেন ও আরও পরিষ্কার দেখছে। দৃশ্যটা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মেয়েটির ঠোঁটে। চারদিক থেকে কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। ঠোঁট থেকে চোখটা উপরে তুলতেই চমকে ওঠে জন, "ফ্যানি!"

"কী?" হান্ট ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়!

একটুর মধ্যেই চোখটা লেগে গেছিল। জন উঠে বসে। "না, কিছু না!"

"কোন কথাটা তোমার 'ফানি' বলে মনে হল?" হান্ট অবাক হয়, কিছুটা বিরক্তও।

"কোন কথাটা? এই রে। কিছুই শুনিনি যে! চোখটা লেগে গেছিল!"

"আশ্চর্য! কিচ্ছু বলার নেই তোমাকে।"

"না না, বলো, প্লিজ। এই বিষয়টা নিয়ে এগোনো যেতে পারে তো?"

"হুম। সেটাই তো বলছিলাম এতক্ষণ। বলছি যে, বিষয়টা ঠিক

ততটা মনোগ্রাহী না।”

দমে যায় জন, “কেন একটু বুঝিয়ে বলো।”

“দেখ, তুমি বললে, এক যুগলের ছবি আঁকতে চাও, কিন্তু তাদের গল্পটা কী?”

“কোনো গল্প নেই, তাদের ভালোবাসাটাই তাদের গল্প।”

“তাহলে, আমার মতে এটা যথেষ্ট নয়।”

“কেন? কেন তোমার মনে হয় যে একটা ভালোবাসার গল্প যথেষ্ট নয়, একটা সাদামাটা ভালোবাসা কি তাহলে ভালোবাসা নয়? তাদের ভালোবাসা অন্য পাঁচটা অসম্ভব ভালোবাসার থেকে কিছু কম?”

“না বন্ধু, যথেষ্ট নয়। আমাদের জীবনে তো ওই রকম রোমিও-জুলিয়েট-এর মতো ভালোবাসা হয় না সাধারণত। আমরা ক’জন নিজের ভালোবাসার জন্য সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারি? জীবন দিতে পারি? জীবন দেওয়া ছাড়ো, ক’জন মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে পারি? পারি না বন্ধু। কারণ আমাদের জীবনেও শুধু ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। আমরা ভালোবাসার আড়ালে খুঁজি নানান নিরাপত্তা, সামাজিক স্বীকৃতি। যাদের কাছে ভালোবাসাটাই যথেষ্ট তারা সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে ভালোবাসার জন্য। আর যেহেতু আমাদের জীবনে অনেক অসম্পূর্ণ সাদামাটা ভালোবাসা থাকে, তাই ছবিতে আমার মতে শুধুই যে কোনো একটা ভালোবাসার দৃশ্য যথেষ্ট নয়।”

“মানে একটা ছবিতে শুধু ভালোবাসাটা ফুটিয়ে তুলি, তাহলেই যথেষ্ট নয়?”

হান্ট এবারে একটু বিরক্ত হয়, কিন্তু সামলে নেয়। কথা বাড়ায় না। সে নিজেই বা ভালোবাসার কী বোঝে! আর জন তো ওর চেয়েও ছোট, সবে বাইশে পড়েছে। একটু থেমে বলে, “ভেবে দেখো। ছবিটা যখন অসংখ্য সংবেদনহীন দর্শক আর সমালোচক দেখবে তখন তাদের কাছে শুধু ভালোবাসাটাই যথেষ্ট হবে তো?”

জনের কানে কিছুই যায় না। শুধু প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে থাকে।

শুধু ভালোবাসাই কি যথেষ্ট নয়?

***

বেশ কিছুদিন হল জন আর হান্ট উওস্টার পার্ক ফার্মে চলে এসেছে। ‘ওফেলিয়া’র ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ একরকম শেষই হয়ে গেছে, কিছু ছোটোখাটো মেরামতি ছাড়া। তাই রোজ আর ইয়ুলের ধারে যেতে হচ্ছে না। দ্বিতীয় ছবির জন্য সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে কোনো অসুবিধা নেই আর।

জন এখন মাঝে মাঝেই সেই পোড়ো-কারখানার সুন্দর দেওয়ালের কাছে চলে আসে। এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনের মধ্যে কল্পনা করতে থাকে দেওয়ালটাকে নিয়ে। কল্পনায় সে আলিঙ্গনরত অবস্থায় এক যুবক-যুবতীকে দেখতে পায়। কিন্তু কোনো মতেই তাদের ভালোবাসার দৃশ্যকে এমনভাবে ভেবে উঠতে পারে না যাতে ছবির মধ্যে অত্যধিক কিছু না দিয়েও, শুধু তাদের ভালোবাসার জোরেই ছবিটা হয়ে উঠবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। হান্টের কথাগুলোই মাথায় ঘুরতে থাকে।

[চিত্র ৩ - ‘আ হিউগেনো’র প্রস্তুতিমূলক ড্রয়িং - জন এভারেট মিলেয়]

অন্যদিকে জন যখন হান্টকে ওই দেওয়াল আর তার পাশের পোড়ো-বাড়িটা দেখতে নিয়ে আসে, হান্টের একটা দরজা পছন্দ হয়ে যায়। তাই এখন ক'দিন দু'জনেই একই বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

[চিত্র ৪ - 'দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' - উইলিয়াম হলম্যান হান্ট - বাঁদিকের এই দরজাটার ছবিই তখন ছিল, ছবিতে যীশুর আবির্ভাব তখনও হয়নি। এই ছবি পরবর্তীকালে খুবই খ্যাতি অর্জন করে]

উওস্টার পার্ক ফার্মের দিকে আসার পর, জন আর ওই চুম্বনরত যুবক-যুবতীকে পোড়ো কারখানার দিকে দেখেনি। দেখলে তাদের মডেল হতে বলতো। উল্টে, অন্য দুই গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে দেখা হলে, তাদের 'ওফেলিয়া'র জন্য মডেল হবার কথা বলে জন। মেয়েগুলো খিলখিল করে হেসে উঠলেও, মানা করে না জনকে। তারা কথা দেয় যে, সুযোগ পেলে আসবে ফার্মে। কিন্তু এখনো অবধি এসে উঠতে পারেনি। জন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

এই অধৈর্য, এই অস্থিরতাটা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে জনের মধ্যে। যতদিন না মাথার মধ্যে কাঙ্খিত ছবিটা ফুটে ওঠে, ততদিন এই অস্থিরতা চলবে। যতদিন না মনের মধ্যে প্রশ্নের উত্তরগুলো পাবে জন, ততদিন এভাবেই ওকে কুড়েকুড়ে খাবে। সেটাই ওর ধাত। ও চেনে নিজেকে।

ঠিক একই রকম অস্থিরতার মধ্যে ও কাটিয়েছিল বছর দেড়েক আগেও। ফ্যানিকে যখন ও হাতে এঁকে ভ্যালেন্টাইন্স কার্ড পাঠিয়েছিল, তার উত্তর না আসা অবধি এই রকমই অস্থিরতা হয়েছিল ওর ভিতরে ভিতরে।

ফ্যানি ওর সমবয়সী বন্ধু। লেম্প্রিয়ের ভাই-বোনদের মধ্যে ফ্যানিই ওকে সবচেয়ে ভালো বুঝত। যেকোনো বই পড়ে ভালো লাগলে, ফ্যানি সবার আগে জনকে বলত। নতুন কোনো সুর শিখলেই পিয়ানোতে তা বাজিয়ে শোনাত জনকে। জনের কোঁকড়ানো চুলগুলো ওর খুব ভালো লাগত। ফ্যানি নিজের চুলও কোঁকড়ানো করে নিয়েছিল। দেখা হলেই, দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেত, তবু কথা ফুরাত না দু'জনের। মিসেস লেম্প্রিয়ের এসে ওদের থামাত।

কিন্তু কিশোর বয়সের এই প্রেম যে স্বীকৃতি পাবে না, তা ধীরে ধীরে দু'জনকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নানান আকার-ইঙ্গিতে, নানান কথাবার্তায়। লেম্প্রিয়েররা অভিজাত বংশের, উচ্চবিত্ত। সেই জায়গায়, জন শুধুই একজন আঁকিয়ে, রোজগারও সামান্যই।

ওদের ভালোবাসা যথেষ্ট ছিল না সমাজের জন্য। শুধু ভালোবাসা হয়তো কখনোই যথেষ্ট নয়! তাই হয়তো জনও ধীরে ধীরে হার মেনে নিয়েছিল। আর সেই হারের কাঁটা এখনও ওর গলায় বিঁধে আছে।

তাই কি ওর হান্টের যুক্তি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে? তাই কি ও জোর করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, ভালোবাসাই যথেষ্ট? নিজের অসম্পূর্ণতাকেই কি জোর করে ঢাকতে চাইছে নিজের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে?

কারণ যা-ই হোক, জনের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এখন এমন একটা কাহিনী খুঁজে বের করা যেখানে এটাই বোঝা যায় যে, ভালোবাসাই যথেষ্ট। তাই, দিনের বেলা সে দেওয়াল ও তার পাশের লতাপাতার ছবি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ক্যানভাসে তুলে ধরে, আর রাতের বেলা বসে ভাবতে থাকে দেওয়ালের সামনে কাদের ভালোবাসার ছবি আঁকা হবে।

দিনে ও রাতে, ব্যস্ততায় বা আলস্যে, একটাই প্রশ্নের উত্তর তাড়া করে বেড়ায় ওকে, শুধু ভালোবাসাই কি যথেষ্ট নয় কাউকে ভালোবাসার জন্য?

***

১৬ই অক্টোবর, ১৮৫১। উওস্টার পার্ক ফার্ম, সারি কাউন্টি, ইংল্যান্ড।

প্রায় চার মাস হতে চললো লন্ডন থেকে সারিতে এসেছে জন।

জনের ছোটবেলা কেটেছে জার্সি দ্বীপে। কিন্তু মাত্র এগারো বছর বয়সে লন্ডনের রয়াল একাডেমিতে সুযোগ পায় জন। এখনো সবচেয়ে কম বয়সে রয়াল একাডেমিতে সুযোগ পাওয়ার রেকর্ড ওরই আছে। তাই জার্সি যতই পছন্দের হোক, লন্ডনে চলে আসতে বাধ্য হয়। আর তারপর থেকেই লন্ডনের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে ওরা।

এদিকে লন্ডন হল গিয়ে পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ততাময় শহর। বহুদিক থেকে বহু মানুষ এসে ভিড় করছে শহরে। কাজের সন্ধানে। অবশ্য কাজের কোনো অভাব নেই। শহর জুড়ে গড়ে উঠছে নানা কলকারখানা। শিল্প বিপ্লব যাকে বলে একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। এর ফলে, ভিড় ও দূষণের ঠেলায় লন্ডনবাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। যাঁরা একটু অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাঁরা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন লন্ডনের বাইরে। একটু নিশ্চিন্ততার খোঁজে, একটু বুক ভরে শ্বাস নিতে।

লন্ডনের ঠিক বাইরেই, দক্ষিণে অবস্থিত সারি কাউন্টি তাই অনেকেরই খুব প্রিয় গন্তব্য। তবে শুধু বিত্তবান না, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কবি, লেখক, আঁকিয়েদেরও খুব প্রিয়। গ্রীষ্মকালে তাই ইতিউতি এঁদের দেখা যায়। কখনো তাঁরা আকাশের দিকে চেয়ে, বা দীঘির জলের দিকে চেয়ে, বা জলে ভাসমান সাদা রাজহাঁসগুলোর দিকে চেয়ে, কখনো বা শুধুই ফসলভরা মাঠের মাঝে কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্ত রেখার দিকে চেয়ে, কখনো বা আবার ঠায় একটা ভগ্নপ্রায় দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সাধারণ গ্রাম্য মানুষগুলোর বেশ মনোরঞ্জন হতো তা বলাই বাহুল্য।

কাজের দিক থেকে দেখলে এই তিন-চার মাস ভালোই গেছে জনের। 'ওফেলিয়া'-র ব্যাকগ্রাউন্ড শেষ করে ফেলেছে এর মধ্যেই, অন্যটার কাজও চলছে। কিন্তু এখন মনোরম গ্রীষ্মকালের পর শীত উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিও লেগে আছে। তাই বাইরে কাজ করা ক্রমাগত মুশকিল হয়ে উঠছে। উপায় না পেয়ে, ঘরে বসেই আঁকাআঁকি করতে হচ্ছে। এদিকে ওরা যে বাড়িতে উঠেছে,

তার মালকিনের বাচ্চা মেয়ে দু’টো এসে জনের আঁকা দেখে। জন কিছু মনে করে না। শুধু শর্ত দিয়েছে একটা, চুপ করে বসতে হবে। ছোটটার নাম লাভিনিয়া আর বড়টার নাম আবার ফ্যানি। জন যতই এক ফ্যানিকে মন থেকে একটু দূরে সরাতে চায়, আরেক ফ্যানি এসে উপস্থিত হয়। ভেবে খারাপও লাগে, আবার হাসিও পায় জনের।

কাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, একটুও বেরোতে পারেনি। আজ তাই বৃষ্টি একটু ধরলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে জন। যাত্রা শুরু করে ওর পছন্দের দেওয়ালের দিকে। এই দেওয়ালটার কী টান ও জানে না, কিন্তু কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে রেখেছে ওকে সব সময়। দেওয়ালের কাছে পৌঁছে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেওয়ালের প্রতিটা অংশের খুঁটিনাটি লক্ষ করে, মনে রাখার চেষ্টা করে। বাড়িতে গিয়ে এগুলোই কাজে লাগবে আঁকতে।

দেওয়ালের উপর দিকটায় আইভি লতা জড়িয়ে আছে। একে অপরকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। যেন দুই অবিচ্ছেদ্য প্রেমিক-প্রেমিকা। এই কারণেই আইভি লতার সঙ্গে বন্ধুত্বের, বিবাহের যোগাযোগ প্রাচীন কাল থেকেই। সেই সঙ্গে জন এটাও জানে যে আইভি লতা বেড়ে ওঠে কবরস্থানে, ধ্বংসাবশেষের উপর। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও, অমোঘ মৃত্যুর উপর চিরন্তন, চিরঞ্জীব প্রেমের প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকে বহুকাল। এই রকম একটা চিরন্তন ভালোবাসারই ছবিই তো ও আঁকতে চাইছে। কিন্তু সেই গল্প ধরা দিচ্ছে কোথায়? চিন্তার স্রোতে হারিয়ে যেতে থাকে জন। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।

চটক ভাঙে একটা চিকচিক শব্দে। তাকিয়ে দেখে, দেওয়ালের মাঝের একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে একটা সাদা-ধূসর স্টোট(এক প্রকার নেউল)। এরা খুব চালাক আর ছটফটে প্রাণী। এই নির্জন পরিবেশে হঠাৎ করে একজন সঙ্গী পেয়ে, বেশ ভালো লাগে জনের। হাঁটুর উপর বসে প্রাণীটাকে লক্ষ করতে থাকে। চুকচুক করে ডাকলে, সেও উঁকিঝুঁকি মেরে জনের দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু জন এগোলেই দৌড়ে পালিয়ে যায় প্রাণীটা। আর তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। বাড়ির দিকে হাঁটা লাগায় ও।

বাড়ি ফিরে সারাদিন আইভি লতা এঁকে কাটায় জন। কাজের মধ্যে থাকলে, মাথা ঠিকই থাকে। কিন্তু রাতের দিক হলেই, মাথায় ভিড় করে

আসে নানান চিন্তা। ‘ওফেলিয়া’র জন্য একজন ভালো ‘সিটার’ খুঁজতে হবে। ছবিটা শেষ অবধি কেমন দাঁড়াবে সেটা নিয়েও চিন্তা আছে। ঠিক সময়ে শেষ হবে তো? পরের বছরের এক্সহিবিশন যদিও দেরি আছে, তবু, চিন্তা তো হয়ই। লোকের কেমন লাগবে, সেটাও একটা ব্যাপার। তার উপর এখনো দ্বিতীয় ছবির চরিত্রগুলোই খুঁজে পায়নি। নিজের অসমাপ্ত ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেওয়াল আর আইভি লতাগুলো এখনো অবধি খুব ভালোই এগোচ্ছে। দেওয়ালের মাঝখানটা, যেখান থেকে স্টোটটা বেরিয়ে এসেছিল, সেই জায়গাটা এখনো খালি। শীত এখনো পুরোপুরি পড়েনি, কিন্তু এর মধ্যেই স্টোটটার লোমগুলোর প্রায় সাদা হয়ে এসেছিল।(*) হঠাৎই একটা কথা ভেবে চমকে ওঠে জন। সকালে স্টোটটার পিঠের দিকে একটা গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখেছিল তখন, সেটা খুবই চেনা লেগেছিলো। কিন্তু কোথায় দেখছিলো মনে পড়েনি। এখন হঠাৎ মনে পড়ে, ফ্যানির ঠিক ওই রকম ‘ফার’(পশুর লোমের) টুপি ছিল, যাতে একই রকম একটা দাগ ছিল। টুপিটার কথা মনে পড়তেই ভিড় করে আরও কিছু স্মৃতি।

ওরা সেদিন অনেকক্ষণ হেঁটেছিল, একসাথে। ইয়ুলের চার্চ থেকে ওদের বাড়ির রাস্তায়। খুব সুন্দর একটা হালকা হওয়া বইছিল। অনেক কিছু বলার ছিল সেদিন দু’জনের। কিন্তু কেউই কিছু বলে উঠতে পারেনি। শুধুই বুকের মধ্যে শ্বাসের বাড়াকমা চলছিল। দু’জনেই নিজের বুকের শব্দ যাতে অন্যজন শুনতে না পায় তার চেষ্টা করে চলেছিল। কিন্তু পারছিল না। আবার ধরা পড়ে যেতেও ইচ্ছে করছিল। জনের খুব ইচ্ছে করছিল, ফ্যানির হাতটা ধরতে। কিন্তু একরাশ কুণ্ঠা ওকে আটকে দিচ্ছিল।

শেষে যখন নীরবতা এক রকম অস্বস্তিকর পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল, তখন ফ্যানি বলেছিল, ওর এই ‘ফার’ টুপিটা ওর গ্র্যান্ডপা এনে

---

* স্টোটদের লোমের রং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টায়। গরমকালে এদের লোমগুলো বাদামি রঙের থাকে, শীত পড়তে শুরু করলে সেগুলো ঝরে পড়ে, রঙ ক্রমশ হালকা হতে হতে সাদা হয়ে যায়। এর কারণ স্টোটরা শিকারী প্রাণী, লোমগুলো সাদা হয়ে গেলে শীতকালে বরফের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, শিকার করা সুবিধাজনক হয়।

দিয়েছে। লন্ডনের কোন এক বিখ্যাত দোকান থেকে। সেই হিউগেনো(*) দোকানিরা বহু বছর ধরে এই কাজে আছে। ওদের অনেকেই ইংল্যান্ডে পালিয়ে এসেছিল ফ্রান্স থেকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন ফ্রান্সে ক্যাথলিক আর হিউগেনোদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল তখন।

এই হিউগেনোদের কথা মনে পড়তেই বিদ্যুৎ খেলে যায় জনের শিরদাঁড়া দিয়ে। এতো দিন যে প্রেমের গল্প ও খুঁজছিল, তা ওর সামনেই ছিল। মনে পড়ে যায় ওর দেখা এক অপেরার কথা যার নাম ছিল:

"লে ইউগেনোস!" (দ্য হিউগেনোস)

***

২৪-এ আগস্ট, ১৫৭২ । প্যারিস ।

সেন নদীর ধার দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে চলেছে ভলেন্তিনা।

এই মাঝরাতে রাস্তাঘাট শুনশান। মাঝে মাঝে নানা রাতচরা পাখি ডেকে উঠছে ইতিউতি। পরশু পূর্ণিমা ছিল, তাই চাঁদের আলোয় পৃথিবী ধুয়ে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত সৌন্দর্য এই মায়াবী রাতের! কিন্তু ভলেন্তিনা আলোর বদলে সেন নদীর ধার বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর ছায়াকে সম্বল করে এগিয়ে চলেছে। আলোর দরকার ওর নেই, এই রাস্তা ওর নখদর্পণে। আর এই মাঝরাতে একজন একলা মেয়ের জন্য গা ঢাকা দিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। এমন নয় যে মাঝরাতে ও এই প্রথমবার

---

* রোমান ক্যাথলিক চার্চ তো আমরা সবাই জানি, খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয়গুরু পোপ দ্বারা পরিচালিত চার্চই হল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। কিন্তু নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সময় খ্রিস্টীয় ধর্মেও অনেক পরিবর্তন আনা হয়। ক্যাথলিক চার্চের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে নানান "প্রোটেস্টান্ট" শাখার উৎপত্তি হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শাখাটি হল "লুথেরানিজম", যার অনুসারীদের বলে "লুথেরান" কারণ এই শাখার প্রবর্তক হলেন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ মার্টিন লুথার, যাঁর নাম আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু তিনি ছাড়াও আরেকজন পরিবর্তনকামী ধর্মীয় নেতা ছিলেন, ফরাসি ধর্মতত্ত্ববিদ জন কেলভিন (বা জাঁ কভ্যাঁ)। এই জন কেলভিনের ফরাসি অনুসারীদের হিউগেনো বা কেলভিনিস্ট বলা হতো।

বেরিয়েছে কিন্তু এই রাতের পৃথিবী কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা ওর খুব ভালোভাবেই জানা। কিন্তু আজ কোনো উপায় ছিল না। আসতেই হতো ওকে।

বেশ কিছুটা জোর কদমে চলার পর একটু দম নেয় ভলেন্তিনা। দূরে বাঁদিকে, নদীর উল্টো পারে নত্রদাম ক্যাথিড্রাল দেখা যাচ্ছে। আর একটু গেলেই ডানদিকে সেন্ট জুলিয়েন চার্চ। ওখানেই অপেক্ষা করার কথা রাওলের।

খুব সন্তর্পনে আলো মাখা রাস্তাটা পেরিয়ে সেন্ট জুলিয়েন চার্চের পিছনের গোরস্থানটায় ঢুকে পড়ে ভলেন্তিনা। চার্চের উত্তর দেওয়ালের কাছে একটা বড় সাইপ্রাস গাছ আছে, সেখানেই সাধারণত দেখা করে থাকে ভলেন্তিনা রাওলের সঙ্গে। আজও সে রকমই কথা আছে।

নাহ, রাওল এখনো এসে পৌঁছায়নি! কেন দেরি করছে কে জানে! তিনবারই ছিল তো আলোর সংকেত? ভুল করেনি তো? আজ ভুলের কোনো ক্ষমা নেই, এতটাই জরুরি এই সাক্ষাৎ। অধৈর্য হয়ে ওঠে ভলেন্তিনা। এমনিতে সে খুব সাহসী মেয়ে, আর পাঁচটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মতো ভীতু ও নয়, কিন্তু আজ যেন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উফফ! রাওলটা আসছে না কেন? অস্থির হয়ে দেওয়াল বরাবর পায়চারি করতে থাকে ভলেন্তিনা।

মিলনস্থল হিসেবে এই জায়গাটা উৎকৃষ্ট। বুদ্ধিটা অবশ্য ভলেন্তিনাই দিয়েছিল।

এই চার্চটা আগে ক্যাথলিক চার্চ ছিল, কিন্তু বছর দশেক আগে ক্যাথলিক আর হিউগেনোদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীন চার্চটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই থেকে চার্চটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এখন এখানে না তো ক্যাথলিকরা আসে, না হিউগেনোরা। আর সেই ধর্মযুদ্ধ এখনো থামেনি। প্রতিনিয়ত যুযুধান দুই দল পরস্পরের ক্ষতি করার অভিসন্ধি করে চলেছে। আর সেই নিয়েই আজ তড়িঘড়ি দেখা করতে আসা ভলেন্তিনার। কিন্তু রাওল কোথায়? পায়চারি করতে করতে দেওয়ালের একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে পিছন ঘুরতে গিয়েই দেখে একজোড়া চোখ! ভলেন্তিনা ভয়ে আঁতকে উঠতে গেলে এক হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে, অন্য হাত দিয়ে কাছে টেনে নেয় রাওল। ভলেন্তিনা বাহুডোরে আবদ্ধ অবস্থাতেই রাওলের বুকের মধ্যে কিল মারতে থাকে। চুপিসাড়ে

কখন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রাওল বুঝতেই পারেনি ভলেন্তিনা।

“ছাড়ো, এতো দেরি করে এলে? কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!”

“বলো, হঠাৎ আজ দেখা করতে চাইলে? কালকেই তো বার্থেলোমিউর পরব(ফিস্ট), বলেছিলে তার আগে দেখা হবে না! তর সইলো না বুঝি?”

ভলেন্তিনা গম্ভীর হয়ে যায়। রাওলকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সব কিছু ফিরে আসে। শরীরটা অবসন্ন লাগে খুব ভলেন্তিনার। রাওলের বুকে মাথা দিয়ে চুপ করে থাকে। চোখের জল সামলাতে পারে না।

“কী হল?”

উত্তর দিতে গিয়ে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না ভলেন্তিনার।

“কী হয়েছে? আমি এসেছি তো।” বলে চলে রাওল, “আসলে আসার পথে এত রাতেও বেশ কিছু জমায়েত দেখলাম, তাই দেরি হল সাবধানে আসতে গিয়ে। যা বুঝছি, আবহাওয়া ভালো নয়। অনেকেই খুব ক্ষেপে আছে রানীর উপরে। রানী পোপের অনুমতি ছাড়াই এভাবে নিজের ক্যাথলিক মেয়ের বিয়ে একজন হিউগেনোরে সঙ্গে দিয়ে অনেকেই চটিয়ে দিয়েছেন। সাঁ-ব্রি মহাশয় নিশ্চয় রাগে নিজের চুল ছিঁড়ছেন?” নিজের খুনসুটিতে নিজেই হেসে ফেলে রাওল।

অন্য সময় হলে ভলেন্তিনা হয়তো হেসে ফেলতো। কারণ ওর বাবা সত্যিই খুব রেগে গেছে রানীর উপর। একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক মানুষের কাছে এই বিয়ে এক মারাত্মক ব্যভিচার, অধার্মিক আচরণ। চুল না ছিঁড়লেও, গত তিন-চারদিন গোটা ঘরে পাগলা ষাঁড়ের মতো দাপিয়ে, ফুঁসিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু আজ যে কাণ্ড ও দেখে এসেছে ঘরে, তাতে ওর হাসি উড়ে গেছে। যতই সাহসী হোক, ভিতরে ভিতরে আজ খুব নড়ে গেছে ও। এই সব কথা ভাবতেই আরও অসাড় হয়ে যায় ও। রাওলের বুকের উপর থেকে নড়তেই ইচ্ছে করে না। ওর বুকে কান পেতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদণ্ড জিরিয়ে নিতে চায় ও। নিজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ভলেন্তিনা। একটু, সামান্য একটু নিভৃতি চাই ওর। এর চেয়ে বেশি বড় কিছু দাবিও তো নেই ওর জীবনের প্রতি, শুধু একটু

শান্তি। আর এই মুহূর্তে, এই মায়াবী-আলোছায়ায়-আচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ, নির্জন গোরস্থানে, রাওলের বুকের শব্দ শুনতে শুনতে কিছুটা হলেও সেই শান্তি পাচ্ছে ও। সেটাই ও আরেকটু, সামান্য আরেকটু উপভোগ করতে চায়। ও জানে, বেশি সময় নেই সেন্ট জার্মেইন(*) চার্চে মাতিন্স(*) প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠতে, কিন্তু আরেকটু উপভোগ করতে চায় ও।

রাওল ভলেন্তিনাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর কোনো কথা বলে না। চুপ করে যায়। ও বুঝতে পারে না ভলেন্তিনার কী হয়েছে আজকে, কিন্তু ওকে বিরক্ত করে না। ভলেন্তিনাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই একটু দেখা হবার জন্যই তো ও অপেক্ষা করে থাকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আর আজ যখন সুযোগ হয়েছে তখন সেটাকে যেতে দিতে চায় না, ধরে রাখতে চায়, যতক্ষণ সম্ভব।

চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত এই গোরস্থানটা। চারপাশের বড় বড় গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে কবরগুলোর উপরে। হালকা হাওয়া চলছে আর তাতে গাছের পাতাগুলো নড়ে উঠছে, সৃষ্টি হচ্ছে অদ্ভুত মায়াবী এক আলোর খেলা। দেখতে বেশ মজা লাগে রাওলের। জায়গাটা নিস্তব্ধ তবু কান পাতলে যেন ফিসফিস শুনতে পায় রাওল। ওর খালি মনে হয় জায়গাটা নির্জন নয়, ওদের চারপাশে জেগে আছে বহু প্রাণ। মাটির নিচে না হোক, মাটির উপরে তো বটেই। প্রতিটা কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিচিত্র সব ফুল গাছ, কোনোটা ছোট তো কোনোটা বড়। আলো-আঁধারিতে ওদের আরও বেশি জীবন্ত মনে হয়। সঙ্গে ভেসে আসে মনমাতানো এক সৌরভ। বুকটা ভরে ওঠে রাওলের। মনে হয়, আর কী চাই জীবনে? সবই তো আছে। মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ভলেন্তিনাকে আর গাছ-পাগল এক মালীকে।

ওরা দু'জন ছাড়া, আর ওই একজনকেই এই কবরস্থানে আসতে দেখেছে ওরা। এর আগে অনেকবার, যখন ভোরের দিকে রাওল আর ভলেন্তিনা বাড়ি ফেরে তখন ওই মালীকে ঢুকতে দেখেছে এখানে। লোকটা বয়সে ওদের থেকে খুব বড় হবে না, কিন্তু এই বয়সেই

---

* সেন্ট জার্মেইন = ফরাসি ভাষায় 'সাঁ যার্মাঁ'।

* মাতিন্স = খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ভোরের প্রার্থণাকে মাতিন্স(matins) বলে। ফরাসি ভাষায় matin বা মাত্যাঁ হল ভোর।

লোকটা কত রকম অদ্ভুত কথা বলে। অথচ কোনোদিনও ওদের নাম-ধাম জানতে চায়নি, কোনোদিনও প্রশ্ন করেনি, এত রাতে বা এত ভোরে ওরা এখানে কী করছে। উল্টে ওরা প্রশ্ন করলে কী মিষ্টি করে সব উত্তর দিয়েছে। নাম জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, জাঁ রোব্যাঁ। এর চেয়ে বেশি ওরাও জিজ্ঞেস করেনি ভয়ে, যদি ওদের কথাও জিজ্ঞেস করে বসে। কিন্তু গাছ নিয়ে, ফুল নিয়ে কত কথা নিজেই বলে চলে। লোকটা বলে, সবার মধ্যেই নাকি এক-একটা ফুল গাছ আছে, মানুষকে খালি সেটায় জল দিয়ে যেতে হবে। মানুষ মরে গেলেও নাকি ফুলের সেই গুণগুলো থেকে যায়। কিছু মানুষ বেঁচে থাকাকালীন সেই ফুলগাছের সন্ধান পেয়ে যায়, কিছুজন পায় না। তাদের জন্যই জাঁ এই কবরস্থানে আসে। প্রতিটি কবরের উপর ও নানা রকম বীজ ছড়িয়ে দেয়, রোজ জল দেয়, কবরের মানুষটার গুণগুলো নিয়ে কোনো একটা ফুলগাছ গজিয়ে ওঠে, সেটাই নাকি ওই মানুষটার গাছ ছিল।

"আর যে কবরগুলোয় বীজ ছড়িয়েও গাছ ওঠেনি?" প্রশ্ন করেছিল ভলেন্তিনা।

"হয়তো ওদের যে গাছ, সেই গাছের বীজ আমি এখনো ছড়াইনি ওদের উপরে, তাই ওঠেনি। ওদের জন্যই আমি আমার খোঁজ চালিয়ে যাবো। নতুন নতুন গাছের, নতুন নতুন বীজের।"

আজ হঠাৎ ভলেন্তিনাকে জড়িয়ে ধরে ওই ফুলগাছগুলোকে দেখতে দেখতে রাওলের মনে হয়, ভলেন্তিনার মধ্যে কী গাছ? আর ও নিজেই বা কোন গাছ? যদি এরপর কোনোদিন জাঁ-র সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয় এতো সৌন্দর্যময় একটা রাতের সাক্ষী থাকার জন্য। ভাগ্যিস ভলেন্তিনা এই জায়গা বেছেছিলো ওদের দেখা করার জন্য। কেন এই জায়গাটাই, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি রাওল। ও শুধু 'হ্যাঁ' বলেছিল ভলেন্তিনার প্রস্তাবে। ভলেন্তিনা যা বলে তাতেই ও 'হ্যাঁ' বলে। এর কারণ শুধু এটা নয় যে ভলেন্তিনা বেশিরভাগ সময়ই যা বলে তা খুব ভেবে-চিন্তে বলে আর একদম ঠিকটাই বলে, বরং এটাও একটা কারণ যে ভলেন্তিনার পাগলামিগুলোর সঙ্গে, উদ্ভট বুদ্ধিগুলোর সঙ্গেও ওর নিজের ইচ্ছেগুলো মিলে যায়। তাই 'না' বলার দরকারই পড়েনি কোনোদিন।

একজন গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে হয়েও একজন হিউগেনোর প্রেমে পড়া অবশ্যই ভলেন্তিনার উদ্ভট কাণ্ডকারখানাগুলোর

একটা। কিন্তু প্রথম থেকেই ওরা বুঝতো, ওদের প্রেম আর পাঁচটা প্রেমের মতো নয়। কারণ ভলেন্তিনা আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। প্রেমে পড়া এক জিনিস, আর প্রেমের জন্য সব কিছু করতে পারা আরেক জিনিস। ভলেন্তিনার মধ্যে সেই জিদটা ও দেখেছে। ভরসা পেয়েছে। তা না হলে, গোটা দেশে যখন এক যুগ ধরে ক্যাথলিক আর হিউগেনোদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ, হানাহানি, দাঙ্গা চলছে, তখন ওদের এই স্রোতের বিপরীতে চলা, ওর একার জোরে কখনোই সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না ভলেন্তিনা সাহসী না হলে, নানান বুদ্ধি না খাটালে।

এই রাতের বেলা দেখা করা, ওর বাড়ির থেকে নির্দিষ্ট সময়ে আলোর সংকেত পাঠানো, সবই ভলেন্তিনার বুদ্ধি। অবশ্য, অন্যান্য দিনে ওরা আরেকটু ভোরের দিকেই দেখা করে থাকে। চারবার আলোর সঙ্কেত মানে তাই। সকালের প্রার্থনার ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে সেন্ট জার্মেইন থেকে, তখনই ওরা বেরোয়। কিন্তু আজ ছিল তিনবার। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল রাওল, চারনম্বর আলোর সঙ্কেতের জন্য। কিন্তু যখন দেখলো সেটা আসেনি, তখন বুঝেছিল নিশ্চয় কিছু গড়বড় হয়েছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছাবে ভেবেছিল, তত তাড়াতাড়ি আসতে পারেনি। কারণ, প্যারিসের অবস্থা খুব থমথমে এই ক'দিন। মাত্র কয়েকদিন আগেই রানী কাতেরিনা দে মেদিচি ক্যাথলিক আর হিউগেনোদের মধ্যে বেড়ে চলা সংঘর্ষের ইতি টানতে নিজের মেয়ের সঙ্গে হিউগেনো নেতার বিয়ে দেন। কিন্তু তাতে হয়ে যায় হিতে বিপরীত। ক্যাথলিকদের কিছু প্রতিপত্তিশালী নেতা চোরাগোপ্তা হামলা চালায় হিউগেনোদের এক সামরিক নেতার উপর। এখন যুদ্ধ থামার বদলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। যদিও রানী চেষ্টা করছেন মধ্যস্থতা করার কিন্তু গতিবিধি মোটেই ভালো ঠেকছে না। মনটা আবার অস্থির হয়ে ওঠে রাওলের। আর ওর বুকে কান পেতে থাকা ভলেন্তিনাও বুঝতে পারে এই পরিবর্তনটা।

নিজের মনটাকে শক্ত করে নেয় ভলেন্তিনা। রাওলের সঙ্গে দেখা হবার আগে অবধি হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু রাওলকে জড়িয়ে ধরে, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মনের অস্থিরতাটা কিছুটা কেটেছে। এবার যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা সেটার পালা।

"শোনো!" রাওলের দিকে তাকিয়ে বলে ভলেন্তিনা, "সময় বেশি নেই।"

"কীসের?"

"দাঙ্গার। বিশাল বড় এক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কাল দুপুরে বার্থেলোমিউর পরব চলাকালীন মধ্যস্থতা হবার কথা। কিন্তু লোকজন ক্ষেপে আছে। মধ্যস্থতা কেউ চায় না। তাই আজ রাতেই তোমাদের অঞ্চলে হামলা হবে। আজ সকাল থেকে প্রচুর লোককে আসতে দেখেছি আমাদের বাড়িতে। কেন বুঝিনি। কিন্তু রাতের খাবারের পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে আমি চুপিচুপি লাইব্রেরিতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি বাবার বৈঠকখানায় ল্যাম্প জ্বলছে। ভিতর থেকে চাপাস্বরে বাক-বিতণ্ডা চলছে। আমি লুকিয়ে শুনেছি ওদের কথা। তোমরা পালাও রাওল। ওরা তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে ভলেন্তিনা।

"দাঁড়াও দাঁড়াও! কী হয়েছে একটু ধীরে ধীরে বলবে? কে পরিকল্পনা করেছে, কী পরিকল্পনা করেছে?"

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ভলেন্তিনা বলতে থাকে, "আমি শুনলাম যে ওরা বলছে আমাদের অঞ্চলের সব বাড়িতে তালা আর কড়া পাহারা দিয়ে দিতে। আমি ভাবলাম হয়তো ক্যাথলিকদের উপর হামলা হবে তার থেকে বাঁচার জন্য পরিকল্পনা চলছে, কিন্তু আরেকটু শুনতেই বুঝলাম যে, ক্যাথলিক দলের সব পুরুষরা যখন হামলা চালাবে তখন যাতে ক্যাথলিক বাড়ির মহিলা-বাচ্চারা নিরাপদ থাকে তার জন্য আমাদের বাড়িতে বন্দি করে রাখা হবে, যাতে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। ওরা তোমাদের অঞ্চলগুলোকে ঘিরে ফেলেছে যাতে কেউ বেরোতে না পারে। চারদিকে লোক জড় হওয়া শুরু হয়ে গেছে ওই জন্যই। এ কোনো পাহারার ব্যবস্থা না, এটা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা। সব ক্যাথলিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে 'গিস'রা(*)। আরো অনেক দিক থেকে অস্ত্র মজুত হয়েছে এই দু'দিনে। প্যারিসের বাইরে থেকে অনেক লোকও এসেছে। সবাই ভাবছে সেন্ট বার্থেলেমিউর পরবের জন্য বাইরে থেকে লোক আসছে, কিন্তু এরা এসেছে দাঙ্গায় মদত দিতে। গিসদের চক্রান্ত এটাও যে সবাই যেন ভাবে যে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রানীরই হাত। তাই ঠিক হয়েছে হত্যাকাণ্ডের সময় রানীরই নাম নেওয়া

* ফরাসি অভিজাত পরিবার, যুদ্ধোন্মাদ ও গোঁড়া ক্যাথলিক

হবে, জয়ধ্বনি দেওয়া হবে। তাহলেই এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। রানীর ব্যভিচার ওরা মোটেও মেনে নেয়নি। আর কিছুক্ষণ পরেই, সেন্ট জার্মেইন চার্চে মাতিঙ্গের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সব ক্যাথলিক চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠবে পর পর, ঘোষণা হয়ে যাবে দাঙ্গার।" দম নেয় ভলেন্তিনা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাওল।

"তুমি এটা আমায় এখন বলছ? এদিকে আলো ফুটতে তো বেশি দেরি নেই। আচ্ছা, আমি আসছি, সবাইকে সাবধান করতে হবে।" দৌড়ে যেতে চায় রাওল, কিন্তু আটকে যায়। ওর ডান হাতটা ভলেন্তিনা দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে! ওর চোখে জল।

"না, তুমি যেও না। আমি যদি এসেই বলে দিতাম তাহলেও কিছু হতো না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে চারদিকে ঘেরাও হয়ে গেছে, প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই নেওয়া ছিল। এখন শুধু ঘণ্টার অপেক্ষা। তুমি যেও না। তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।"

জীবনে এই প্রথমবার ভলেন্তিনার উপর খুব রাগ হল রাওলের। ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে সব কিছু জেনেও। ও বাড়িতে থাকলে অন্তত কয়েকটাকে শায়েস্তা করতে পারতো। ওর কাকার কাছে ও যে এত বছর তলোয়ার চালানোর তালিম নিল, সেটা দেখাতে পারতো ওই দাঙ্গাকারীদের।

কিন্তু ভলেন্তিনা ঝাপসা চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছে ওর হাত। ওই অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে গলে যেতে ইচ্ছে করে রাওলের। এর আগে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি ভলেন্তিনাকে। বরং ওদের দেখা হলেই দু'জনের মুখে ফুটে উঠত এক গাল হাসি। ভলেন্তিনার সেই হাসি মুখটাই সব সময় মনে পড়ে রাওলের। হাতটা হয়তো জোর করলেই ছাড়িয়ে নিতে পারবে কিন্তু ওই সজল চোখ দু'টোর টানে, ওই ভালোবাসাময় মুখটার টানেই আটকে গেছে রাওল।

কিন্তু হঠাৎই ওর মনে পড়ে যায় যে ওর কাকা ক'দিন হল প্যারিসেই নেই। সুতির ব্যবসার কাজে বেরিয়েছে, কবে ফিরবে ঠিকও নেই। এখন ওর খুড়তুতো বোনগুলোকে কে বাঁচাবে ওই নরখাদকগুলোর হাত

থেকে! ভেবেই আঁতকে ওঠে রাওল। ওর নিষ্পাপ নিরীহ বোনগুলো তো জানেই না কে ক্যাথলিক, কে হিউগেনো।

"ছেড়ে দাও ভলেন্তিনা। আমার বোন দু'টো ঘরে আছে। ওরা ছোট, আমাকে যেতে হবে।"

ভলেন্তিনা জানতো এমনটাই হবে। তবু, ভালোবাসার জন্য একটু স্বার্থপর তো মানুষ হতেই পারে। একবার চেষ্টা করে দেখলো। নিজের ভালোবাসাকে অবধারিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে দেখে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কারোর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

গলা শুকিয়ে গেছে ভলেন্তিনার। তবু কোনোরকমে বলে ওঠে, "আমি তোমাকে আটকাবো না।" ধীরে ধীরে হাতটা আলগা করে দেয় ওর, "কিন্তু তুমি এই কাপড়টা বেঁধে নাও।" নিজের জামার ভিতর থেকে একটা সাদা পট্টি বের করে আনে ভলেন্তিনা।

"এটা দিয়ে কী হবে?"

"আজ যখন এই হত্যাকাণ্ড চলবে, তখন এই সাদা কাপড় দেখেই ওরা বুঝবে কারা ক্যাথলিক, কারা নয়।" নিজের বাঁ হাতের দিকে দেখায় ভলেন্তিনা। এতক্ষণ অন্ধকারে এটা খেয়াল করেনি রাওল। কিন্তু এখন আলো উঠতে শুরু করেছে, দেখতে পায়। "এটা পরে থাকলে ওরা তোমায় কিছু করবে না। আমিও পরেছি দেখো।" বাচ্চাদের মা-রা যেমন আমিও খাচ্ছি দেখো বলে বাচ্চাদের খাইয়ে দিতে যায়, তেমনি ভলেন্তিনাও ধীরে ধীরে সাদা কাপড়টা রাওলের বাঁ হাতে পরিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু রাওল গিঁটের মাঝে একটা আঙুল দিয়ে আটকে দেয় ভলেন্তিনাকে।

"এটা পরা মানে তো এটাই বোঝায় যে আমিও ক্যাথলিক। তাই না? তাহলে তো এই যে এত লোককে মারার পরিকল্পনা হয়েছে, আমিও সেটারই অংশীদার হয়ে উঠলাম। আর যারা নিরীহ কিছু মানুষকে মারছে, তাদের সঙ্গে নিজেকে কী করে এক করে নিই তুমিই বলো? আমি তো কোনো কিছুই মানি না, কাকার ভাষায় আমি উৎকৃষ্ট জাতের 'এরেতিক'(hérétique/heretic)। আর আমি যেটা মানি না, সেটা কী করে হয়ে যাই বলো তো?"

আজ যেন ভলেন্তিনার সঙ্গে কোনো কথাতেই সহমত হতে পারছে না রাওল। এতদিন সে যেটা ভেবে এসেছে তাহলে কী সেটা ভুল?

ভলেন্তিনা জানে রাওল যা বলছে ঠিক। ও জানে আজ ওর মন আর মাথা একই কথা বলছে না। কিন্তু ও এটাও জানে যে আজ সেটাই করা উচিত যেটা জরুরি, সেটা ভুল হলেও। মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে ভলেন্তিনা।

"আমি জানি তুমি ঠিক বলছো, কিন্তু দয়া করে আজকে আমার কথা শোন। আমি তোমায় আটকাতে চাই না, কিন্তু আমার ভালোবাসার স্বার্থে, তুমি এই কাপড়টা হাতে বেঁধে নাও।"

"না, তা হয় না ভলেন্তিনা।"

"কেন হয় না? আমার ভালোবাসার কি কোনো দাম নেই তোমার কাছে? আমার ভালোবাসা কি যথেষ্ট নয় তোমার জন্য?"

রাওল কোনো কথা বলে না।

ও জানে, এই প্রশ্নের উত্তর কী। ও জানে ভলেন্তিনার ভালোবাসাই ওর কাছে যথেষ্ট। তাই তো ওর আর কিছু চাই না। ওর যেন সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে। এই প্রত্যাশাহীন পরিপূর্ণতাই ওর শক্তি, ওর ভয়হীনতার প্রমাণ।

কিন্তু ভলেন্তিনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো মানসিক অবস্থা এই মুহূর্তে ওর নেই। সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। আর ও জানে, আর কেউ না বুঝুক, ভলেন্তিনা বুঝবে। ঠিকই বুঝবে। এখন না হোক, পরে হলেও বুঝবে।

ভলেন্তিনাকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে একটা চুমু খায় রাওল। ভলেন্তিনা একবার শেষ চেষ্টা করে সাদা কাপড়টা বেঁধে দেবার কিন্তু রাওল সেটা খুলে ভলেন্তিনার হাতে দিয়ে দৌড়ে চলে যায় সেখান থেকে। পিছন ফিরেও তাকায় না। ভলেন্তিনা স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায় রাওলের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে। দেওয়াল ধরে ধীরে ধীরে বসে পড়ে ওখানেই।

***

লন্ডনের রয়াল একাডেমি অফ আর্টসের চুরাশিতম প্রদর্শনী শুরু হয় ৩রা মে, ১৮৫২।

ইংল্যান্ডে বসবাসকারী আঁকিয়েদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক প্রদর্শনী হল লন্ডনের রয়াল একাডেমির বাৎসরিক প্রদর্শনী। ইংরেজ আঁকিয়েরা সারা বছর প্রস্তুতি নেন এই প্রদর্শনীতে আঁকা পাঠানোর জন্য। যশ বা অর্থ, যেটাই লক্ষ্য হোক না কেন, রয়াল একাডেমির প্রদর্শনী ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর শুধু আঁকিয়েরা না, সাধারণ মানুষও মুখিয়ে থাকে এই প্রদর্শনীর জন্য। তবে এই বছর সবাই যেন একটু নিরুৎসাহী।

গত ডিসেম্বরে মারা গেছেন জে. এম. ডাব্লিউ. টার্নার, ইংরেজি চিত্রকলার মহীরুহ। বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন আরেক দিগ্গজ উইলিয়াম এটি। এই বছর অংশগ্রহণ করছেন না আরও কিছু স্বনামধন্য আঁকিয়ে। স্বভাবতই প্রত্যাশার পারদ নিম্নগামী। আয়োজকরাও ঠিক আশাবাদী নন এবারের প্রদর্শনী নিয়ে।

তবু, কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই, লোকের ঢল নামতে শুরু করেছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভিড় হচ্ছে, বেশ ভালো রকমের ভিড় হচ্ছে। আর তাও আবার প্রদর্শনীর প্রধান কক্ষ ইস্ট রুমে না, ওয়েস্ট রুমে। লোকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে যারা তারাও কুণ্ঠাবোধ করছে, অন্যদেরও দেখার সুযোগ করে দিতে হবে যে। এদিকে ছবিটির থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। অগত্যা জায়গা ছেড়ে দিয়ে আবার ভিড়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে আবার ফিরে আসছে লোকজন। সাড়ে তিন ফুট বাই দুই ফুট সাইজের সেই ক্যানভাসটার নিচে লেখা আছে এক বিশাল নাম যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়:

"একজন হিউগেনো, সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসে, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে রোমান ক্যাথলিকদের ব্যাজ পরতে অস্বীকার করছে।
(দ্রষ্টব্যঃ দ্য প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন ইন ফ্রান্স, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২)"

শুধু লম্বা নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি আঁকিয়ে, সঙ্গে আছে লম্বা একটা উক্তি:

"ভোরের বেলা যখন 'পালাই দে জাস্টিস'-এর(কোর্টহাউস) ঘণ্টা বেজে উঠবে, তখন প্রতিটি অনুগত ক্যাথলিক যেন তার বাহুতে একটা

সাদা কাপড় বেঁধে নেয় আর একটা সাদা ক্রস লাগিয়ে রাখে টুপিতে। — 'ডিউক অফ গিস'-এর আদেশানুসারে।"

[চিত্র ৫ - আ হিউগেনো - জন এভারেট মিলেয়]

এই ছবিতে ভলেন্তিনার মডেল হিসেবে পোজ দিয়ে ছিলেন অ্যান রায়ান আর রাওলের মডেল হিসেবে আঁকিয়ে জন এভারেট মিলেয় বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদ্ আর্থার লেম্প্রিয়েরকেই।

ভাইকে ছবির মধ্যে দেখতে, বা এক প্রিয় মানুষের আঁকা ছবি দেখতে, বা এক অধরা ভালোবাসার ছবি দেখতে হয়তো প্রদর্শনীতে এসেছিলেন ফ্যানিও। হয়তো নিজেদের ছোটবেলার প্রেমকে দেখেছিলেন ওই যুগলের মধ্যে। কে বলতে পারে!

ফ্যানি সত্যিই এসেছিলেন কিনা হলফ করে বলা যায় না, কিন্তু যেটা

বলা যায় সেটা হল, 'আ হিউগেনো' দেখে লন্ডনের শহুরেবাবুরা সেদিন থম মেরে গিয়েছিল আর মেমরা লুকিয়ে চোখের জল মুছেছিল। আর এই আঁকা যেন অনেকটা ছোট গল্পের মতো। একবার দেখে দেখা হয় না, এই ছবির গল্প শেষ হয়েও ঠিক শেষ হয় না। সবার মনেই কিছু প্রশ্ন রয়ে যায়:

কী পরিণতি হয়েছিল ওদের ভালোবাসার? ওরা কি পেরেছিল ভালোবাসা দিয়ে ঘৃণাকে জয় করতে?

***

২৪-এ আগস্ট, ১৫৭২ । প্যারিস ।

সেন নদীর ধারে একটা উইলো গাছের উপর ভর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ভলেন্তিনা। শরীরটা এতটাই অবসন্ন যে গাছটাকে ছেড়ে দিলেই মাটিতে পড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে ওর। বাড়ি খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু কিছুতেই আর এগোতে ইচ্ছে করছে না। কীসের জন্য বাড়ি ফিরে যাবে সেটাই ও বুঝতে পারছে না।

আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে, লাল রঙটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎই ঝুপ করে একটা আওয়াজ হল নদীর জলে আর তাতেই চটক ভাঙলো ভলেন্তিনার। নদীতে কী পড়ল দেখার জন্য তাকাতেই আঁতকে উঠলো ভলেন্তিনা। নদীর অন্য পাড় ধরে ভেসে যাচ্ছে একটা মানুষের দেহ। এবার আর আকাশের রঙের জন্য না, মানুষের রক্তে লাল হতে শুরু করেছে সেনের জল। আর এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেন্ট জার্মেইন চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠলো। সেটা শুনেই ভলেন্তিনার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ বয়ে গেলো। কোনোরকমে নিজের সমস্ত শক্তিকে একজোট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ভলেন্তিনা।

নাহ, বাড়ি গেলে ওর চলবে না। বাড়িতে ওর কিছু নেই। এই পৃথিবীতে একমাত্র যে ওকে বোঝার চেষ্টা করেছে, সেই রাওলকেই ওকে বাঁচাতে হবে। কীভাবে ও জানে না, কিন্তু আপাতত ও যেখান থেকে এসেছে সেই সেন্ট জুলিয়েন চার্চের দিকেই দৌড়াতে শুরু করলো ভলেন্তিনা।

ওর ভালোবাসা রাওলের কাছে যথেষ্ট না হলেও, রাওলের

ভালোবাসাই ওর জন্য যথেষ্ট। আর কিছু ওর চাই না।

***

বছর বাইশের জাঁ রোব্যাঁ গাছ ভালোবাসে। গাছের সান্নিধ্য ভালোবাসে। গাছেদের মধ্যে থাকলে ও এমন এক প্রশান্তি অনুভব করে যা ও আর অন্য কোথাও পায় না।

ওর এই ভালোবাসা এমনই মাত্রায় পৌঁছেছে যে ও পৃথিবীর কোথায় কী চলছে, সেই সম্পর্কে প্রায় কোনো খোঁজ খবরই রাখে না। অথচ, পৃথিবীর কোথায় কোন গাছ জন্মায়, সেই নিয়ে ওর বিস্তর জ্ঞান। সারাদিন সেই নিয়েই ও পড়াশুনা করে। তবে শুধু পড়াশুনা নয়, সেই সঙ্গে খবর রাখে ওর কোনো পরিচিত বণিক কোনো নতুন দেশে যাচ্ছে কিনা। খবর পেলেই ও হাজির হয়ে যায় নিজের আবদার নিয়ে। বিদেশ থেকে ওর জন্য এনে দিতে হবে বীজ। এই আপনভোলা, সরল মনের ছেলেটাকে কেউ না-ও বলতে পারে না। সুযোগ পেলেই এনে দেয় বীজ।

কে কখন প্যারিসের বাইরে যাচ্ছে, সেই খবর রাখলেও নিজে কোনোদিনও প্যারিসের বাইরে পা রাখেনি। এমন নয় যে সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাহলে ওর গাছগুলোকে কে দেখবে? যেন প্যারিসের সমস্ত গাছের দায়িত্ব ওর। আর শুধু পরিচর্চা নয়, গাছের বর্ণনা, অবস্থান, স্বাস্থ্য, সব কিছুই ও লিখে রাখে নিজের নোটবইয়ে। ওর এইসব নোটবইয়ের পাহাড় সামলাতে হিমশিম খায় ওর বাবা। কিন্তু রাগ করে না। কারণ, আর কেউ না বুঝুক, ওর বাবা বোঝে ওর এই ভালোবাসার কারণ, এই আসক্তির কারণ।

ছোটবেলায় জাঁ-র জন্মের সময় ওর মা মারা যায়। বোঝার মতো একটু বয়স হলে একদিন ও ওর বাবার কাছে ওর মায়ের ব্যাপারে জানতে চায়। তখন ওর বাবা ওকে সেন্ট জুলিয়েন চার্চ সংলগ্ন কবরস্থানে নিয়ে আসে। সেখানে এসে ওর বাবা দেখে ওর স্ত্রীর কবরের পাশেই, মাথার কাছে এক ছোট গাছ গজিয়েছে। আর তাতে থোকাথোকা ফুল ধরেছে। সেই ফুল ঝরে পড়েছে কবরের উপর। ছোট জাঁ মৃত্যুর মানে বোঝে না, তাই তাকে ওর বাবা বোঝায় যে এই গাছটিই ওর মা। এইভাবেই মানুষ আবার ফিরে আসে এই সুন্দর পৃথিবীতে, পৃথিবীকে করে তোলে আরও সুন্দর।

সেই থেকে রোজ সকালে ও আসে এই সেন্ট জুলিয়েন চার্চে। জল দেয় ওর মায়ের গাছে। পাশাপাশি আরো অনেক কবরের উপর নিজে থেকেই সে সব গাছ উঠেছে তাতে জল দেয়। যে সব কবরের উপরে বা পাশে গাছ জন্মায়নি, তাদের উপরে ও ছড়িয়ে দেয় নানান বীজ, যতদিন না গাছ জন্মাচ্ছে। ও মনে করে এই ভাবেই মানুষের মুক্তি হয় এই জগৎসংসারে। লোকে ওকে পাগল বলে, টিটকারী করে। কিন্তু ও সেই সব কর্কশ শব্দ শুনতে পায় না। শুনতেও চায় না। প্যারিস শহরের দৈনন্দিন হৈহট্টগোল ওর কানে পৌঁছায় না। ওর মনপ্রাণ জুড়ে থাকে গাছেদের ফিসফিস, ওদের স্নেহের ডাক, কারোর আবার লাজুক হাসি।

তাই জাঁ রোব্যাঁ গাছ ভালোবাসে। গাছেদের সান্নিধ্য ভালোবাসে। গাছেদের মধ্যে থাকলে ও মমত্ব অনুভব করে। গাছেরাও ওকে ছেলের মতো ভালোবাসে।

***

অন্যদিনের মতো আজকেও ভোরের বেলায় সেন্ট জুলিয়েন চার্চের কবরস্থানে গাছে জল দিতে এসেছে জাঁ। আজ ভোরের ঘণ্টা বাজার আগেই এসে পড়েছে। কারণ আজ সেন্ট বার্থেলোমিউর পরব। শহরে প্রচুর লোক এসেছে। একটু পরেই রাস্তায় মানুষের ঢল নামবে। আজ যত তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে বাড়ি যাওয়া যায় ততই ভালো। মানুষের ভিড়ভাট্টা অসহ্য লাগে ওর।

বেশ কয়েকটা গাছে জল দেবার পর, জাঁ জুলিয়েন চার্চের উত্তর মুখে অর্থাৎ কবরস্থানের দক্ষিণ দেওয়ালের কাছে ওর মায়ের কবরটার কাছে পৌঁছায়। সেখানে কার্নেশন ফুলের গাছটা ভরে আছে হালকা গোলাপি রঙের ফুলে। চারদিকে একটা অদ্ভুত সুবাস। জাঁ সেই গাছের পাশে এসে বসে। ধীরে ধীরে সেই ফুলগুলোর গন্ধ নেয়। ওর কাছে এই গন্ধই হল মাতৃত্বের গন্ধ। জাঁ বইয়ে পড়েছে যে যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে দুঃখে মা মেরি কেঁদে ফেলেন, সেই অশ্রুবিন্দু মাটিতে পড়লে কার্নেশন ফুলের(*) রূপ নেয়। তাই ওর মায়ের কবরের পাশে এই ফুল গাছের বেড়ে ওঠাকে দৈব লক্ষণ বলেই মনে হয় জাঁর।

---

* আজও মাতৃদিবসে কার্নেশন ফুল দেওয়ার রীতি আছে; ফ্রান্সে প্রিয় জনের মৃত্যুতেও শোক জ্ঞাপনার্থে এই ফুল দেওয়া হয়।

সেন্ট জার্মেইন চার্চের ঘণ্টা বাজছে। ভোর হয়ে গেছে। এবার রাস্তায় ভিড় বাড়তে শুরু করবে। দূরে বেশ কিছু হট্টগোলও শোনা যাচ্ছে যেন। জাঁ ওঠে পড়ে। গাছের নিচে এদিক-ওদিক পড়ে থাকা ফুলগুলোকে তুলে নিয়ে মায়ের কবরের উপর রাখে। নিচু হয়ে ফুল তুলতে গিয়ে জাঁ লক্ষ করে যে একটু দূরেই সাইপ্রাস গাছটার নিচে একটা সাদা কাপড় পড়ে আছে। কৌতূহলবশত সেই কাপড়টাকে দেখার জন্য দেওয়ালের কাছে আসতেই ছোট বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। এত সকালে কোথায় বাচ্চা কাঁদছে খোঁজার চেষ্টা করে। একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারে কান্নার আওয়াজ আসছে চার্চের ভিতর থেকে, কিছুটা পিছনের দিক থেকে। খুব সন্তর্পনে এগিয়ে যায় জাঁ।

দেওয়াল পেরিয়ে চার্চ চত্বরে ঢুকতেই কে যেন ওর উপরে হামলে পড়ে। অতর্কিত আক্রমণে ঘাবড়ে যায় জাঁ। তাকিয়ে দেখে সেই জোয়ান ছেলেটা, যে মিষ্টি একটা মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝেই এখানে আসে সকালের দিকে। তাহলে কি মেয়েটাকে আঘাত দিচ্ছে ছেলেটা?

মুঠো বাগিয়ে উঠে পড়ে জাঁ।

রাওলও ঘাবড়ে যায় জাঁকে দেখে।

"আপনি?"

"আগে বলো কে কাঁদছে? কাকে মেরেছ তুমি? কী করছো এখানে?"

"না না, আমি কাউকে মারিনি, আমি বুঝতে পারিনি আপনি।"

জাঁ তাকিয়ে দেখে জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে ছেলেটার। জামায় আর হাতে রক্তের দাগ! চোখ-মুখ বসে আছে। রেগে যায় জাঁ।

"কাউকে মারোনি? তাহলে হাতে রক্ত কেন?" রাওলকে সরিয়ে চার্চের পিছন দিকে যাবার চেষ্টা করে জাঁ। রাওল মানা করে না। উল্টে ওর সঙ্গে সঙ্গেই আসে।

চার্চের পিছনের দিকে, একটা থামের আড়ালে একজন মহিলা আহত অবস্থায় পড়ে আছে, তার জামা কাপড় রক্তে ভিজে আছে। আর তাকে জড়িয়ে ধরে দু'টো বাচ্চা মেয়ে খুব কাঁদছে। মহিলা কোনোরকমে

নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না।

"কী হয়েছে ওর?"

"আপনি কি কিছুই জানেন না?" অবাক হয় রাওল।

"না, কেন?"

"হিউগেনো অঞ্চলগুলোকে ঘিরে ফেলেছে গিস-এর লোকেরা। আমাদের টেনে বাড়ি থেকে বের করে খুন করছে লোকজন। আমার বাড়ি একটু দূরেই, আমি চেষ্টা করছিলাম বাড়ির দিকে যাবার কিন্তু পারিনি। কাছেই একটা গলির মধ্যে একে পড়ে থাকতে দেখি। বাচ্চাগুলোকে আগলে পড়ে ছিল। আমি কোনোরকমে লুকিয়ে এদের এখানে নিয়ে এলাম। এদিকে তো খুব একটা কেউ আসে না। ক্যাথলিকরা পুরো পাগল হয়ে গেছে রক্তের নেশায়!" এক নাগাড়ে বলে যায় রাওল।

জাঁ চমকে ওঠে, "আমিও তো ক্যাথলিক!"

রাওল ঘাবড়ে যায়। একটু ভয়ও পায়। "তাহলে, সাদা কাপড় পরে নেই যে হাতে?"

"কোন সাদা কাপড়?"

রাওল বুঝতে পারে এই লোকটা কিছুই জানে শহরে কী চলছে। কিন্তু কিছু বোঝানোর আগেই কবরস্থানের দিক থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে রাওল থেমে যায়। চার্চের সামনের দিক থেকেও কিছু লোককে চিৎকার করতে করতে যেতে শোনে। রাওল জাঁকে ইশারা করে পিছিয়ে যেতে। দু'জনে এসে বাচ্চা দু'টোর মুখ চেপে ধরে যাতে কাঁদতে না করে।

মহিলাটার দিকে তাকিয়ে দেখতেও কষ্ট হয় জাঁর। মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে জামা ভিজে গেছে। নাক, মুখ, কানে চাপচাপ রক্ত। অথচ পাশে বসে থাকা বাচ্চাগুলোর সামান্যই কিছু চোট লেগেছে। নিজের প্রাণ দিয়ে বাচ্চাগুলোকে আগলে রেখেছিল এক মা। ভেবেই কান্না পায় জাঁর। মানুষ কত নৃশংস হতে পারে ভেবেই গা গুলিয়ে ওঠে ওর।

এদিকে একটা পায়ের শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। জাঁ আর রাওল দু'জনেই বাচ্চা দু'টোকে ইশারা করে চুপ করার কিন্তু

ওরা এতই ছোট যে কান্না থামাতে পারে না, উল্টে আরও জোরে কেঁদে ওঠে। ওরা বাচ্চা দু'টোর হাত ধরে চার্চের আরও পিছনের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তখনই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ওরা।

"রাওল?"

রাওল তাকিয়ে দেখে ভলেন্তিনা। "ভলেন্তিনা! তুমি এখানে? বাড়ি যাওনি?"

ভলেন্তিনা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে রাওলকে। "আমি জানি না কোথায় গেলে তোমাকে পাবো তাই তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানেই এসেছি।"

রাওল বাচ্চাটার হাত ছেড়ে ভলেন্তিনাকে জড়িয়ে ধরে। "ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে ভলেন্তিনা। আমি বাড়ি অবধি পৌঁছাতে পারিনি। আমার বোনগুলোকেও মেরে ফেলবে। আমি কোনোরকমে এই ক'টাকে টেনে টেনে এখানে এনেছি। তুমি কিছু একটা ভাবো। শয়তানগুলো আশেপাশেই আছে, আমরা একটু আগেই ওদের উল্লাস শুনেছি। কিছু একটা ভাবো।"

ভলেন্তিনা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে একটু ঘুরে দাঁড়াতেই ওদের মায়ের মৃতদেহটা দেখে শিওরে ওঠে। রাওলকে দেখে দৌড়ে আসার জন্য এতক্ষণ চারপাশের কিছুই খেয়াল করেনি সে। এখন দূরেই একটা ঝোপের আড়ালে জাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা বাচ্চা।

"উনি ক্যাথলিক, কিন্তু উনি কিছুই জানেন না!" রাওল বলে ওঠে।

ভলেন্তিনা এগিয়ে আসে জাঁর দিকে। "আপনার বাড়ি তো কাছেই?"

"হ্যাঁ, ওই দু'টো গলি পরেই।" চার্চের পিছনের বড় রাস্তার দিকে ইশারা করে জাঁ।

"আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন?"
"হ্যাঁ।"

“তাহলে এই বাচ্চা দু’টোকে নিয়ে চলুন।”

“কিন্তু আমাকে যে বাড়ি ফিরতেই হবে, যেভাবেই হোক, আমার বোন দু’টোর কাছে পৌঁছাতেই হবে।” রাওল বলে ওঠে।

“কিন্তু...” ভলেন্তিনা থেমে যায়। ও জানে, রাওলকে আটকানোটা ওর সাধ্যের বাইরে। সে চেষ্টায় একবার ও ব্যর্থ হয়েছে, দ্বিতীয়বার ও আর রাওলকে হারাতে চায় না। উল্টে আটকানোর চেষ্টা না করে, অন্তত ও যদি রাওলের সঙ্গে যায় তাহলে কিছু উপকার করতে পারবে। একটু ভাবে ভলেন্তিনা। জাঁয়ের দিকে ফিরে বলে, “আপনি বাচ্চা দু’টোকে নিয়ে বাড়ি যান।” তারপর নিজের বাঁহাত থেকে সাদা কাপড়টা খুলে জাঁয়ের হাতে পরিয়ে দেয়। “আমাদের তিনজনের মধ্যে আপনার বাড়িই সবচেয়ে কাছে। এই মা-হারা বাচ্চা দু’টোকে বাঁচান। আপনাকে কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন আপনি ক্যাথলিক, আর আপনি তো সত্যিই ক্যাথলিক। যান, তাড়াতাড়ি। সাবধানে। আশা করছি অসুবিধা হবে না।”

“আর তোমরা?”

“আমাদের নিয়ে চিন্তা করবেন না।” রাওলের হাতটা ধরে ভলেন্তিনা। “আমাদের সঙ্গে আবার কোনো এক ভোরে এখানেই দেখা হয়ে যাবে আপনার। যান এখন, দেরি করবেন না।”

জাঁর ইচ্ছে করে না এই পাগল ছেলে-মেয়ে দু’টোকে ফেলে যেতে কিন্তু বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিরুপায় বোধ করে। বাচ্চা মেয়ে দু’টোকে দুই কোলে নিয়ে চার্চের পিছনের গলিটা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করে জাঁ। রাওল আর ভলেন্তিনা সেদিকে তাকিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

“তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। কিন্তু তোমার জানা দরকার।” ভলেন্তিনার হাত দু’টো নিজের হাতে নেয় রাওল। হাত দু’টোয় আলতো চুমু খায়। “তোমার ভালোবাসাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর সেই জন্যই আমি এতো নিশ্চিন্ত, আমার না পাওয়া কিছু নেই, আমার হারানোরও ভয় নেই।”

ভলেন্তিনা রাওলের গালে আলতো করে হাত বুলায়। “উত্তর আমি নিজের মনের মধ্যেই পেয়ে গেছি। খানিক আগেই।” ভলেন্তিনা রাওলের

ডান হাতটা শক্ত করে ধরে।

"নাও, এখন চলো, তোমার বোনরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

চার্চের সামনের দিকে, বড় রাস্তায় ওঠে ওরা। নানান দিক থেকে আর্তচিৎকার আর উল্লাসধ্বনি ভেসে আসছে। ওরা একে অপরকে ইশারা করে প্রস্তুত হবার আর তারপরে কেউ দেখে ফেলার আগেই জোরে দৌড় লাগায় এক রক্তমাখা গলির দিকে, রাওলের বাড়ির উদ্দেশে।

***

২৪শে আগস্ট, ১৬০১। প্যারিস।

পুব আকাশে সূর্য সবে উঠেছে। প্যারিসের সেন্ট জুলিয়েন চার্চ সংলগ্ন বাগানে, একটা ছোট্ট চারাগাছের সামনে বসে আছে এক পঞ্চাশোর্ধ্ব লোক। পাশেই বসে আছে বয়স কুড়ির এক যুবক।

চারাটার পাতাগুলোয় পরম মমতায় হাত বুলাচ্ছে বয়স্ক লোকটা। আর চারার গোড়ায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে যুবকটা। কয়েকটা পায়ের শব্দে ওরা ফিরে তাকায়। দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে সেই বাগানে ঢুকছে আরেকজন বয়স্ক লোক, সঙ্গে দুই যুবতী। ওদের দেখে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে মাটিতে বসে থাকা বয়স্ক লোকটার। চোখে মুখে সেই খুশির ছাপ ফুটে ওঠে।

"দেখে যান নানজিস মহাশয়! কেমন সুন্দর চারা গজিয়েছে!"

"অবশেষে! আপনি করে দেখিয়েছেন জাঁ রোব্যাঁ মহাশয়! আপনি করে দেখিয়েছেন!" নানজিস মহাশয় স্মিত মুখে ওর পাশে এসে বসেন। দুই যুবতীও বসে।

"কেমন অদ্ভুত সমাপতন দেখুন, তিরিশ বছরে পড়ল আজকেই। কাল বিকেলের দিকে এসে যখন দেখলাম চারা গজিয়েছে, আনন্দে দিশাহারা লাগছিলো। তাই আপনাদেরও ডেকে পাঠালাম।"

"ভালো করেছেন ডেকে।" চারপাশে তাকিয়ে দেখেন নানজিস মহাশয়।

সামনের সেন্ট জুলিয়েন চার্চটার অবস্থা খুবই খারাপ। ভেঙে পড়তে পারে যেকোনো দিন। কিন্তু পাশের এই জায়গাটায় দারুণ সুন্দর বাগান গড়ে তুলেছেন জাঁ রোব্যাঁ। কে বলবে আগে এই জায়গাটায় একটা পোড়ো কবরস্থান ছিল!

এই বাগানের মালিক ও মালী দুইই জাঁ রোব্যাঁ। বছর চারেক হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক স্কুল খুলেছে পাশেই। তাই এই বাগানে নানা ওষধির গাছ লাগানোর দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। শুধু এটা নয়, প্যারিসজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান বাগানের দায়িত্ব ওঁর। তার উপর, রাজা-রানীর নিজস্ব বাগানের দায়িত্বও ওঁর। গাছ-পাগল এই লোকটাকে এখন সবাই সমীহ করে চলে। ওঁর গাছের প্রতি ভালোবাসা, জ্ঞান, সবেরই মর্যাদা উনি পেয়েছেন ধীরে ধীরে।

“খুব সুন্দর গুছিয়েছেন বাগানটা!”

“এই মাটিটুকুর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে, আপনি তো জানেনই। মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা, সময়ের কালগহ্বরে চলে যাওয়া মানুষগুলোই জেগে উঠেছে। সুন্দর করে তুলেছে এই বাগানকে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।” ভাবুক হয়ে পড়েন জাঁ। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই বীভৎস দিনের স্মৃতি।

***

বাচ্চা মেয়ে দু’টোকে দুই কোলে নিয়ে প্রাণপণ ছুটে ছিল সেদিন জাঁ। বাড়িতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওদের পাড়ার দিকটা খালিই ছিল, তবু ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ এসে খোঁজ করবে মেয়েগুলোর। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। এই রকম বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে আগে কোনোদিনও পড়েনি জাঁ।

এদিকে মেয়েগুলো তো কেঁদেই চলেছে। তাদের কিছু খাবার, জল দিয়ে শান্ত করায় জাঁ। না জানি আরও কত নিষ্পাপ শিশুর একই হাল। ভেবেই বুকটা কেঁপে ওঠে ওর। নাহ, ওকে আবার বেরোতে হবে। যদি আরো কয়েকটাকে বাঁচাতে পারে।

মেয়ে দু’টোকে চুপ করে বসে থাকতে বলে আবার ফেরত এসেছিল জাঁ সেই সেন্ট জুলিয়েন চার্চ চত্বরে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছিল। চার্চের

চারদিকে তখন অনেক লোক, ভগবান আর রানীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে মৃত্যু-উদযাপন করে চলেছে কিছু লোক। তাদের কারোর হাতে মাস্কেট, কারোর হাতে তলোয়ার। চার্চের ভিতর থেকে মৃতদেহগুলোকে টেনে বের করে আনছে ওরা। হয়তো ওই নিরীহ মানুষগুলো ভেবেছিল এই পোড়ো চার্চে আশ্রয় নিলে বেঁচে যাবে কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।

মৃতদেহগুলোকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাশেই সেন নদী। সেখানেই ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল দেহগুলো। সেন নদীর জল আজ মানুষের হিংসায় লাল, মানুষের ধর্মান্ধতায় দূষিত।

ওই ভিড়ের মধ্যেই সাঁ-ব্রিকে দেখতে পায় জাঁ। এই লোকটা সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি। জাঁ যতবার ওকে চার্চে দেখেছে আগে, প্রতিবারই দেখেছে যে লোকটা ভিড়কে উত্তপ্ত করছে, নিজের ঘৃণা অন্যের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন লোকটার জামাভর্তি রক্তের দাগ। কতজনকে নিজের হাতে মেরেছে আজ তার হিসেবে নেই। এখন সগর্বে তার পেয়াদাদের কীর্তি পর্যবেক্ষণ করছে। রক্তমাখা মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্ত ক্রূরতা বাসা বেঁধেছে।

ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে চার্চের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে জাঁ। ওকে কেউ পাত্তাও দিচ্ছে না। তেড়েও আসছে না। যে ভয়টা নিয়ে ও বাইরে এসেছিল, সেটা কেটে গিয়ে এক নিদারুণ অনুভূতি হয় ওর।

একটা সাদা কাপড়ের কত শক্তি!

একটা অর্থহীন চিহ্ন কীভাবে একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের আচরণকে বদলে দিতে পারে, সেটা ভেবেই ও অবাক হয়, শিউরে ওঠে। এ কীরকম বুদ্ধির পরিচয়! এর চেয়ে তো নির্বোধ হওয়া ভালো।

ভিতরে ঢুকে দেখে মেঝের চারিদিকে অসংখ্য রক্তের রেখা গাছের শিকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মানুষের ঘৃণার মতোই ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে, গেঁথে বসেছে মনের অনেক গভীরে।

এখনো বেশ কিছু মৃতদেহ ভিতরে পড়ে আছে। আগের মৃতদেহগুলো নদীতে ফেলা হয়ে গেলেই ওরা আবার ফেরত আসবে এইগুলোকে নিয়ে যেতে।

ওরা ফিরে আসার আগেই জাঁ কাছে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর নাকের পাশে হাত রেখে দেখতে শুরু করে। যদি কেউ এখনো বেঁচে গিয়ে থাকে কোনোক্রমে। রক্তের রেখাগুলোকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে এক মৃতদেহ থেকে আরেক মৃতদেহের কাছে যায় ও।

চার্চটা অন্ধকার। শেষ কবে এখানে মোমবাতি জ্বলেছে, শেষ কবে এখানে প্রার্থণা হয়েছে, কেউ জানে না। ভাঙা শার্শিগুলো থেকে যেটুকু আলো ঢুকছে ভিতরে তা এক অদ্ভুত আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন দান্তে ও ভার্জিলের সঙ্গে নরকদর্শনে বেরিয়েছে ও। তফাৎ শুধু একটাই যে, এটা নরক না, এটা পৃথিবী। এখানে নিরীহরা শাস্তি পাচ্ছে, মরে পড়ে আছে, আর পাপীরা উল্লাসে মত্ত।

মনটা ভারী হয়ে ওঠে জাঁর। এক দণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেই ওর খেয়াল হয় আরও বেশ কিছু দেহ এখনো পড়ে আছে দূরে। যদি একজনও এখনো বেঁচে থাকে! চার্চের অল্টারের দিকে দৌড়ে যায় জাঁ।

কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে যায় ও। ওই জামা তো ওর চেনা! "হে ভগবান!" দম বন্ধ হয়ে আসে জাঁর।

কাছে গিয়ে দেখে, ভলেন্তিনা মরে পড়ে আছে, ওর পিঠে রক্ত। ওর সামনেই পড়ে আছে রাওল। ওর বুকে রক্ত। দু'জনে মৃত্যুর সময়ও হাত ধরে আছে দু'জনের। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে জাঁর। দুই হাতে মুখ চেপে বসে পড়ে। কিন্তু বাইরে লোকজনের আওয়াজ শুনে নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেয় জাঁ। ওদের দেহগুলো কোনোমতেই সেনের জলে ভেসে যেতে দেবে না ও। কিন্তু এদিকে লোকগুলো এসে গেছে দেহগুলোকে নিয়ে যেতে।

এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না জাঁ। ভলেন্তিনা আর রাওলের হাতগুলো নিজের দুই হাতে ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। দুই মৃতদেহকে দুই হাতে টেনে নিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ কাজ না, কিন্তু নিজের মধ্যে কেমন যেন দৈববল অনুভব করে জাঁ। ওর পাশ দিয়েই অন্য লোকগুলো এগিয়ে যায়। নিজেদের লোক ভেবে জাঁকে কিছু বলে না। অন্য দেহগুলোর দিকে এগিয়ে যায় ওরা।

দেহ দু'টো নিয়ে কোনোরকমের চার্চের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে জাঁ। চারপাশটা দেখে নেয়। নাহ! আপাতত কেউ নেই। কেউ দেখে ফেলার আগেই, নদীর দিকে যাওয়ার বদলে দেহ দু'টোকে টেনে

নিয়ে যায় কবরস্থানের ভিতরে। সেখানে ঝাঁকড়া একটা ঝোপের আড়ালে দেহ দু'টোকে লুকিয়ে রাখে। চারদিক থেকে নানা গাছ-পাতা-ফুল-ঘাস জড় করে দেহ দু'টোকে ভালভাবে ঢেকে দেয়। এখন নয়, কিন্তু রাতের বেলা ও ফেরত আসবে। ওদের ভালোবাসা, ওদের আত্মত্যাগকে ব্যর্থ হতে দেবে না জাঁ।

***

কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু যতই কঠিন হোক, কাজটা জাঁকে করতেই হতো।

জাঁ ভেবেছিল অন্ধকার থাকবে চারিদিক, কিন্তু না, চারিদিক ভেসে যাচ্ছিল চাঁদের আলোয়। গাছগুলোও জেগে আছে ওর সঙ্গে। মাথা নুইয়ে ওদের শোকবার্তা পৌঁছে দিচ্ছিল জাঁর কানে।

জাঁ কবর খুঁড়ে চলেছে প্রেমিকযুগলের জন্য। ওর মায়ের কবরের থেকে সামান্য একটু দূরে, চার্চের দেওয়ালের কাছে যেখানে আইভিলতাগুলো উঠেছে, যেখানে সাইপ্রাস গাছটা দাঁড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে করেই এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছে জাঁ কারণ সাইপ্রাস হল শোকের প্রতীক। আর আইভিগুলো হল চিরন্তন প্রেমের প্রতীক। থাক, এখানেই শায়িত থাক ওরা যাদের কাছে ভালোবাসাই সব ছিল, যাদের কাছে ভালোবাসাই যথেষ্ট ছিল, যারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও ভালোবাসাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

***

'রাওল' আর 'ভলেন্তিনা', এই দু'টো নাম ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না জাঁর। ওদের বাড়ির খবর খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু খোঁজ পেয়েছিল।

সাঁ-ব্রি যে দাঙ্গার অন্যতম হোতা ছিল, সেই দাঙ্গাতেই প্রাণ হারিয়েছিল ওর মেয়ে ভলেন্তিনা। রাওল সেদিন ওর কাকার মেয়ে দু'টো বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু রাওলের সেই কাকার খোঁজ পেয়েছিল জাঁ। যে সব ব্যবসায়ীরা দূর দূর থেকে বীজের সন্ধান এনে দিত জাঁকে, তাদেরই একজন নানজিস মহাশয়। নিজের মেয়ে দু'টোকে হারালেও, আরও

দু’টো মেয়ের দায়িত্ব উনি নেন। নিজের মেয়েদের মতো করেই বড় করেন।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে এর পরে। প্যারিস ও ফ্রান্সের অনেক বদল হয়েছে। রাজা-রানী পাল্টেছে। ক্যাথলিক ও হিউগেনোদের মধ্যে সংঘর্ষ পুরোপুরি না থামলেও স্তিমিত হয়েছে। দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শোকতপ্ত সাইপ্রাস গাছটাও পড়ে গেছে। পরিত্যক্ত কবরস্থানের জায়গায় নতুন বাগান গড়ে উঠেছে। তবু সেই অভিশপ্ত দিনের সাক্ষীরা যারা আজও বেঁচে আছে ক্ষত নিয়ে তারা ফিরে ফিরে আসে। একই জায়গায়। এক ভালোবাসার গল্পকে জাগিয়ে রাখতে, জিইয়ে রাখতে।

বহু চেষ্টার পর, নানান বীজ ছড়ানোর পর, এত বছরে প্রথম চারা গজিয়েছে রাওল ও ভলেন্তিনার কবরের উপর। ‘নতুন পৃথিবী’ থেকে আনা আকাসিয়া তথা বাবলা প্রজাতির গাছ। জাঁর কাছে এই গাছের জন্ম এক শুভ ইঙ্গিত। কারণ এই আকাসিয়া গাছের কন্টকময় ডাল দিয়েই বানানো হয়েছিল প্রভু যীশুর মুকুট, বাইবেলে পড়েছেন জাঁ। অন্যের পাপ, অভিসন্ধিকে নিজেদের ভালোবাসার পবিত্রতা দিয়ে যারা জয় করতে চেয়েছিল, তাদের জন্য কাঁটার মুকুটই তো জুটেছে স্থান-কাল-পাত্রভেদে। তার উপর এই আকাসিয়া গাছ গোপন প্রেমেরও প্রতীক। সব মিলিয়ে এই ঘটনাকে জাঁর এক দৈব লক্ষণ বলেই মনে হয়। মনটা ভরে ওঠে আজ। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে মায়াবী এক রাতের ছবি - পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া এক যুগলের হাসি-মাখা মুখ দু’টো। অজান্তেই আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে জাঁ-এর গাল বেয়ে।

***

চারিদিকে ঝলমলে রোদ উঠেছে। এই সবুজের মধ্যে থাকলে, নির্মল পরিবেশে পরিশুদ্ধ হাওয়া আর সুবাসের মধ্যে থাকলে অদ্ভুত এক শান্তি জাগে মনে। আর আজ তো সেই প্রশান্তি দ্বিগুণ হয়ে গেছে নতুন চারাটার সংস্পর্শে থেকে।

“আমাদের জীবন পাল্টে দিয়েছিলো এই দুই জন মানুষ যাদের আমরা চিনতামও না।” জাঁ বলে ওঠেন।

মেয়ে দু’টিও সম্মতি জানায়। “ভলেন্তিনা আর রাওল আমাদের

জীবনের ভাগ্যের কাঁটা বদলে দিয়েছিল। ওদের সংস্পর্শে এসে আমরা ভাগ্যবান। ওরা সেদিন না থাকলে আজকে আমরা থাকতাম না। ওরা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। আমার বিশ্বাস এই গাছটাও সেই সৌভাগ্যকেই বহন করবে।"

বাকিরাও সম্মতি জানান। আরেকটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে মন চায় সবার। কিন্তু সকাল হয়ে গেছে। দৈনন্দিন কাজে ফেরার পালা এবার।

নানজিস মহাশয় উঠে পড়েন। উঠে পড়ে যুবতী দুইজনও।

"নানজিস মহাশয়, আর তোমরাও, আজ আমার বাড়িতেই প্রাতঃরাশ সেরে যাও। আমাদের খুব ভালো লাগবে।"

জাঁর প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে উঠে পড়েন তিনিও। উঠে পড়ে ওঁর ছেলে ভেস্পাজিয়াঁ-ও। বাবার মতোই গাছ ভালোবাসে সে। ওর উপর এই গাছটার আর বাকি সব বাগানের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান জাঁ।

অনেক দিন পর জাঁর মনে হচ্ছে, জীবন খুবই সুন্দর। এই পৃথিবী খুব সুন্দর। কারণ এতে ভালোবাসা আছে বলে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা আছে বলেই। কিছু মানুষের কাছে ভালোবাসাই যথেষ্ট বলে।

***

ভালোবাসাই যথেষ্ট*

ভালোবাসাই যথেষ্ট: যদিও এই পৃথিবী যাচ্ছে ক্ষয়ে ক্রমাগত
আর এই জীবন-জঙ্গল জুড়ে নিঃশব্দ অভিযোগ অবিরত
যদিও আকাশ-ভরা আলোর খেলা দেয় না ধরা বদ্ধ চোখে
তবু ফুটে থাকে সূর্যমুখী, শালুকের দল এই আকাশেরই নিচে
যদিও ছেয়ে গেছে হিমাচল কালো মেঘে, সমুদ্র এক অজানা অন্তরালে
ঢেকে গেছে আজ যা ছিল ভালো, যা ছিল শুভ, হেতুহীন জঞ্জালে

তবু কাঁপে না ওদের হাত, পা ওদের যায় না জড়িয়ে
এই ক্লান্তিকর গহন শূন্যতায় ভয় ওদের দেয় না নড়িয়ে
আবদ্ধ ওদের ঠোঁট, নিবদ্ধ ওদের চোখ ওরা নেয় না সরিয়ে
ভালোবাসাই যথেষ্ট এই জগৎ-পারাবারে

*[*মূল কবিতাটি জন এভারেট মিলেয়-এর বন্ধু কবি-আঁকিয়ে উইলিয়াম মরিসের, নাম "Love is enough"। সেই কবিতার অপটু অনুবাদ/উপস্থাপনা এই অধমের।]*

***

পশ্চাৎকথন

১৫৭২ সালের ২৪এ আগস্ট সেন্ট বার্থেলোমিউ দিবসের প্রাক্কালে, প্যারিস সহ ফ্রান্সের আরও অনেক জায়গায় হিউগেনোদের উপর হামলা চালায় ক্যাথলিকরা। ফরাসি ধর্মযুদ্ধে চলাকালীন এই গণহত্যায় শুধুমাত্র প্যারিসেই মৃত্যু হয় অন্ততপক্ষে তিন হাজার মানুষের।

[চিত্র ৬ -'সেন্ট বার্থেলোমিউ'স ডে ম্যাসাকার' - ফ্রাঁসোয়া দুবোয়া]

ফ্রাঁসোয়া দুবোয়ার আঁকা ছবিটি (চিত্র ৬) এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতাকে কিছুটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তিনি একজন সমসাময়িক শিল্পী এবং এই গণহত্যার পর দেশছাড়া হন। ছবিটি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, রানীও এই হত্যাকাণ্ড পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন। বহুকাল অবধি এই ঘটনার জন্য রানী কাতেরিনা দি মেদিচিকেই দায়ী করা হতো কিন্তু বর্তমানকালে রানীই যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এমনটা মানা হয় না।

এই ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের উপর ভিত্তি করেই ১৮৩৬ সালে 'লে ইউগেনোস' নামক একটি গ্র্যান্ড অপেরার নির্মাণ করেন জ্যাকোমো মেয়েরবিয়ার। এই অপেরাটি খুবই জনপ্রিয় হয় এবং এটিই জন এভারেট মিলেয়-এর 'আ হিউগেনো' ছবির অনুপ্রেরণা। এই ছবিটির জনপ্রিয়তা জনকে ব্রিটিশ শিল্পজগতে তথা সামগ্রিক পশ্চিম ইউরোপের শিল্পজগতে একটা পাকাপাকি স্থান করে দেয়। ক্রমে জনই হয়ে উঠবেন ব্রিটিশ চিত্রকলার মুখ এবং আজও লন্ডনের 'টেট ব্রিটেনে' গেলে বাইরে

তাঁর মূর্তিটি স্বমহিমায় দণ্ডায়মান। প্রসঙ্গত, জন ও তাঁর দুই আঁকিয়ে বন্ধু, উইলিয়াম হলম্যান হান্ট ও দান্তে গেব্রিয়েল রোসেটি, এই তিনজনে মিলে শুরু করেন "প্রি-রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড" যা ব্রিটিশ শিল্পের ধারাকেই বদলে দেয়।

এখানে এটাও বলা জরুরি যে পরবর্তীকালে আরও অনেক বিখ্যাত ছবিই আঁকবেন জন এভারেট মিলেয় কিন্তু সেই সব ছবির অনেকগুলোর মধ্যেই 'আ হিউগেনো'-র ছাপ খুবই স্পষ্ট, প্রেম ও বিরহের সহাবস্থান লক্ষণীয়। কোনোভাবে এই ছবিই জড়িয়ে যাবে জনের আঁকিয়ে জীবনের সঙ্গে, ওতপ্রোতভাবে।

[চিত্র ৭ - জন এভারেট মিলেয় - ১৮৫৪ নাগাদ]

[চিত্র ৮ - জন এভারেট মিলেয় - টেট ব্রিটেন মিউজিয়ামের বাইরে - নিজের তোলা]

জনের জীবনের গল্পটা কিছুটা কল্পনাশ্রিত হলেও, জনের জীবন সম্পর্কে দেওয়া তথ্যগুলো সত্যাশ্রয়ী। এই ক্ষেত্রে জন-এর ছেলে জে. জি. মিলেয়ের লেখা 'দ্য লাইফ অ্যান্ড লেটার্স অফ জন এভারেট মিলেয়' বইটিই আমার পথপ্রদর্শক।

ভলেন্তিনা আর রাওল-এর গল্পটা কাল্পনিক এবং জনের ছবির মতোই 'লে ইউগেনোস' অপেরার ছায়া এতে পড়েছে। সঙ্গত কারণেই এই দুই প্রধান চরিত্রের নাম ও গল্পে বর্ণিত সামান্য কিছু ঘটনা মূল অপেরাকে অনুসরণ করে কিন্তু জন এভারেট মিলেয় যে 'লে ইউগেনোস' অপেরা দেখেছিলেন, তার থেকে এই গল্প আলাদা।

[চিত্র ৯ - জাঁ রোব্যাঁ - ১৬০৮ নাগাদ]

জাঁ রোব্যাঁ(Jean Robin) একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের এক স্বনামধন্য উদ্ভিদবিদ। এই গল্পের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিতান্তই আমার কল্পনাপ্রসূত। ১৫৭২ সালে গণহত্যার সময় তাঁর বয়স বাইশ ও তিনি প্যারিসের বাসিন্দা তাই তাঁর প্যারিসে থাকা মোটেও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এবং সেই গাছটি যেটি জাঁ রোব্যাঁ সেন্ট জুলিয়েন চার্চের পাশে লাগিয়েছিলেন, তা আজও আছে। এটিই প্যারিসের প্রাচীনতম গাছ। পরবর্তীকালে গাছটির নামও দেওয়া তাঁর নামে - ইংরেজি নাম 'রবিনিয়া' (Robinia), বিজ্ঞানসম্মত নাম 'রবিনিয়া সিউডোআকাসিয়া' (Robinia pseudoacacia) এবং 'রবিনিয়া' গাছেদের একটি বংশ (genus) হিসেবেও পরিচিত।

প্যারিসের এই গাছটির ব্যাপারে কথিত আছে যে, এই গাছে হাত

দিলে ভাগ্য ফিরে যায়। অবশ্য, এই লোককথার জনপ্রিয়তার চাপে গাছটার চারিপাশে এখন বেষ্টনী দিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। প্যারিস যদি যান, তাহলে নত্রদাম ক্যাথিড্রালের কাছে, সেন নদী পেরোলেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত বইয়ের দোকান ‘শেক্সপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি’। তার পাশেই, ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, সেন্ট জুলিয়েন চার্চের বাগানে (রেনে ভিভিয়ানি স্কোয়ারে) আজও দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রাচীন গাছ, না জানি আরও কত না বলা গল্প নিয়ে।

[চিত্র ১০ - রবিনিয়া গাছ - রেনে ভিভিয়ানি স্কোয়ার - প্যারিস]

[এই লেখায় ব্যবহৃত সব ছবিই ‘পাবলিক ডোমেইনে’ উপলব্ধ, শুধুমাত্র টেট ব্রিটেন মিউজিয়ামের বাইরে জন এভারেট মিলেয়-এর মূর্তিটির ছবি আমার নিজের তোলা।]

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - সাবর্ণ্য চৌধুরী

"আবার সেই! একটা কথা বললে কানে যায় না দেখি!"

"যান যান বাজে বকবেন না!"

কথা কাটাকাটি কানে আসতেই, হাতের আলু-পেঁয়াজগুলো দুম করে ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে জানলায় উঁকি দিয়েছিলেন মিসেস মজুমদার। যা ভেবেছিলেন, ফের লেগেছে সামনের বাড়ির বুড়ো সেনগুপ্ত আর এপাশের বাড়ির দত্তবাবুর মধ্যে।

"আপনাকে আর কতবার বলব, এরকম বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাবেন না?"

"আরে মশাই, ফোনটা বাড়িতে ফেলে গেছি বলে নিতে এসেছি, দু-মিনিটের ব্যাপার। তা নিয়ে এত চেল্লাচ্ছেন কেন?"

"দু-মিনিট হোক আর দু-সেকেন্ড হোক, আমার জানলার সামনে গাড়ি পার্ক করবেন না। আমি পছন্দ করি না!"

"রাস্তাটা কি আপনার একার নাকি! চলে যাব এক্ষুনি, ঘুরিয়ে নিয়ে সাইড করে রেখেছি, গেট আটকাইনি... এত ফালতু ঝামেলা করেন বলেই কেউ আপনাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, জানেন!"

"অসভ্য অভদ্র লোকের মতো কথা বলবেন না। রাস্তায় গাড়ি পার্ক করা ক্রাইম জানেন? আমি পুলিশে খবর দেব বলে রাখছি..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ যা পারেন করুন! যত্তসব!"

শব্দ করে অমলেন্দু দত্তের নীল সান্ত্রো বেরিয়ে গেল গলি থেকে। সেনগুপ্ত কটমটে চোখে এদিকে চেয়ে আছে দেখেই মিসেস মজুমদার

সুড়ুৎ করে গলা টেনে নিয়ে আলুর ঝুড়িতে ফিরে গেলেন।

রোজের ব্যাপার। হয় দত্তবাবু, নাহয় স্যান্যালদের কেউ, না হলে ওদিকের ফ্ল্যাটের একতলার ভাড়াটেরা, নয়তো দোতলার কাজের মেয়ে রিনি, নয়তো ঝাড়ুদার মিঠুন, জোম্যাটো ডেলিভারি বয়, ফিরিওয়ালা... খিটখিটে বুড়োর রোজ কারও না কারও সঙ্গে লেগেই আছে।

সময়ে বিয়ে-থা না করলে যা হয় আর কী!

***

"পয়সাটা নেবেন।"

টেবিলের উপর একটা বই খুলে বিরসবদনে বসে ছিলেন তপোব্রত সেনগুপ্ত। শ্যামলের কথায় মুখ তুললেন।

"সব পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ, যা যা বলেছিলেন - পাউরুটি, ডিম, টক দই। মুড়ি এখনো এক কৌটো আছে, তাই আর আনিনি।"

"ছাতু?"

"আছে, ডাব্বায় তোলা ছিল। বার করে কৌটোয় ঢেলে দিয়েছি।"

তপোব্রত ফেরত পয়সা গুনে নেন।

"কফি কর, আর আজ ওয়াশিং মেশিনটা চালা, আর একটাই ফ্রেশ পাজামা আছে।"

"দোতলার ঘরে চাদরটা পালটে দেব কি?"

তপোব্রত একটু চিন্তা করেন। মেঘলা যাচ্ছে, বৃষ্টি শুরু হলে ঘরের ভিতরে চাদর শুকোতে দিতে হবে। সে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার।

"বাদ দে। তোয়ালেটা দিয়ে দে বরং বাথরুম থেকে নিয়ে।"

শ্যামল ছোকরাকে দেখতে মোটে ভালো না। কেমন চোয়াড়ে চেহারা, কথাবার্তায় চালিয়াতি ভাব। প্রথমবার দেখে একটুও পছন্দ হয়নি তপোব্রতর। কিন্তু এ-ই মনে হচ্ছে শেষমেশ টিকে যাবে।

যা দিনকাল! পুরোনো রাত-দিনের চাকর মধুসূদন বয়স হয়ে পাকাপাকি দেশে চলে যাবার পর বেশ আতান্তরে পড়েছিলেন তপোব্রত। তাঁর রিটায়ার করতে তখনও এক বছর বাকি, সেন্টার থেকে যে ব্যাটাকে আনলেন সে কয়েক সপ্তাহ ভালোমানুষ সেজে থেকে শেষে টাকা চুরি করে পালাল। আর সেন্টারে যেতে ভয় করছিল, এমনিই খুঁজছিলেন।

দু-বেলা হোম ডেলিভারিতে খাওয়ার অভ্যাস সেই তখন থেকেই। ব্রেকফাস্টটা নিজে করে নেন।

সব কাজ নিজে করা দুষ্কর বলে মাঝে পাড়ার অন্য কাজের মেয়েদেরও রেখে দেখেছেন, কাজের ছিরি নেই, সময়ের ঠিক নেই,

বললে বলে, ‘দাদু আপনি তো বাড়িতেই আছেন সারাদিন”... আর বেশি বললেই মুখ ঘুরিয়ে, “তাহলে অন্য লোক দেখে নিন’ বলে বেরিয়ে যায়।

আবার সেন্টারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন অগত্যা। কিন্তু দু-বার দু-জনকে পাল্টানোর পর তারা বলল লোক দেওয়া যাচ্ছে না, উনি নাকি অনেক ফ্যাচাং করেন। সে যে কী ভোগান্তি গেছে দিনের পর দিন! অবশেষে এই মোড়ের দোকানে খাতা কিনতে গিয়ে হা-হুতাশ করছিলেন, আরেকটা লোক এসেছিল দোকানে তখন, সে শুনে বলল একজন চেনা আছে। তপোব্রতর তখন কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরার দশা, যা মাইনে বলল তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। সেই এল শ্যামল।

ছোকরাকে দেখে পছন্দ না হলেও, সে নিয়ে ভাবার আর অবস্থা ছিল না তাঁর। তাছাড়া কাজ করে ভালো, রেগেমেগে গালিগালাজ করলেও গায়ে মাখে না, জিনিসপত্রের হুঁশও খুব টনটনে। ফলে ভালোই আছেন বলা যায়।

***

“ডিং ডং!”

শ্যামল ইস্ত্রি করছিল। চট করে হাত ধুয়ে, রান্নাঘর থেকে সকালের ধুয়ে রাখা টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। কিন্তু না, রাতের টিফিনক্যারি নিয়ে বাসব বলে ছেলেটা নয়। এক মাঝারি চেহারার ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, রগের কাছে টাক পড়েছে, বাকি চুলেও ভালোই পাক ধরেছে, পাঞ্জাবি আর জিনস দুটোই জীর্ণ। শ্যামল চেনে এঁকে, আসেন মাঝেমধ্যে। তপোব্রতর একমাত্র ভাই, দেবব্রত।

“আসুন দাদা।“

“আছে তো? ফোন করা হয়নি আর...”

ইশারায় পড়ার ঘরের দিকে দেখিয়ে দেয় শ্যামল। ওই ঘরের জানলার সামনে পাতা টেবিলেই যে তপোব্রতকে পাওয়া যাবে, সে দেবব্রতও জানে। সে পর্দা সরিয়ে ডাক দেয়, “দাদা... একটু এলাম রে...”

শ্যামল আবার ইস্ত্রিতে ফিরে যায়। সব শার্ট প্যান্ট ফতুয়া পাজামা পরিপাটি করে পাট করে নিয়ে চলে যায় দোতলায়। দেওয়াল জোড়া কাবার্ডের একটা পাল্লা খুলে তুলে রাখে।

বেলটা তখনই বাজে আবার। দৌড়ে নেমে দরজা খোলে শ্যামল, সকালের টিফিন ক্যারিয়ার ফেরত দেয়, রাতেরটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে।

পড়ার ঘরের পর্দা টানা, পাশ দিয়ে আসতে আসতে পা থমকে যায়

তার।

“বাজে কথা বলছিস কিন্তু দাদা। তুই একা মানুষ, গুছিয়ে নিতে অসুবিধে...”

“তোকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া উচিত আমার। নেহাত নিজের ভাই বলে...”

“... বাড়াবাড়ি করিস না ...”

“মনা, তোকে বলে দিলাম। এ নিয়ে তুই আর আমার সঙ্গে কোনও কথা বলবি না...”

“... সেটা ভেবে দ্যাখ...”

“তোর ছেলে তখন ভাবেনি কেন? তুই ভাবিসনি কেন? এখন যত...”

ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। তর্কাতর্কি বোঝা যায়, বিষয়টা পরিষ্কার হয় না।

দেবব্রত এবার খুবই নিচু গলায় কথা বলছেন। শব্দগুলো স্পষ্ট নয়।

“না, না, আমি বলেছি না। ব্যস, ফাইনাল।“

প্রায় চীৎকার করে ওঠেন তপোব্রত। শ্যামল আর দঁড়াতে সাহস পায় না, একদৌড়ে রান্নাঘরে চলে আসে।

ঠাস্ করে একটা আওয়াজ আসে। দেবব্রত চলে গেলেন সম্ভবত। শ্যামল দ্রুত হাতে রান্নাঘরের বাকি ধোয়ামোছা তোলাপাড়া সেরে নেয়। তার যাবার সময় হয়ে গেছে।

হাত মুছে বেরিয়ে এসে টের পায়, দেবব্রত এখনও যাননি। গলা শোনা যাচ্ছে, একটু বা তড়পানির মতোই। তপোব্রতরও রাগী গলা পায় একবার। কিন্তু ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ফলে কারও কথাই আর বোঝা যাচ্ছে না।

শ্যামল একটু দোনামনা করে। ও কি অপেক্ষা করবে? চা-টা লাগে যদি?

ধুৎ! লাগলে ফোন করে মোড়ের দোকান থেকে আনিয়ে নেবে, নয় নিজে করে নেবে। ওর টাইম ওভার। আলগোছে একটা “আমি এলাম!” বলে হাঁক হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ির হাওয়াই চটি ছেড়ে জুতো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যায় সে।

***

মিসেস মজুমদারের বসার ঘরের জানলা দিয়েও এদিকটা দেখা যায়, তবে রান্নাঘরের মতো অত সোজাসুজি নয়। তাই কাজ শেষ হয়ে গেলেও, একটা চায়ের কাপ নিয়ে রান্নাঘরের জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

বাঃ, দাঁড়াবেন না? দত্তবাবু এখনও ফেরেননি তো, যদিও ফেরার সময় হয়ে গেছে। গাড়ি ভিতরে তোলেন নাকি আজও রাস্তায় রাখেন, সেটা না দেখে মিসেস মজুমদার যান কী করে!

শ্যামল চলে গেল, দেখলেন। বুড়োর এই নতুন কাজের লোকটা বেরিয়েই ধাঁ করে নিজের সাইকেলে উঠে চলে যায়, কোনও দিকে তাকায় না। দেমাকী আছে। এ বাবা, এ আবার কে? ওহো বুড়োর সেই ভাইটা! কখন এল? এরকম কিছু মিস করে গেলে ভারি দুঃখ হয় মিসেস মজুমদারের।

একী, অমন বিচ্ছিরি মুখ করছে কেন? পেট কামড়াচ্ছে নাকি? ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে দেখছেই বা কেন অমন করে?

মিসেস মজুমদারের বেজায় ইচ্ছে হচ্ছিল বেরিয়ে গিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু মোবাইলটা তখনই বেজে উঠল। মিসেস সমাদ্দার আবার এমন মুখরোচক একটা খবর দিলেন ফোনে, ছাড়াও যায় না... ফোন রেখে দেখেন সব মিস হয়ে গেছে। দত্তবাবুর গাড়ি ফিরে এসেছে, ভিতরে ঢুকিয়েছেন আজ, গেটের ওপারে দেখা যাচ্ছে। রাস্তা সুনসান, কোথাও কেউ নেই।

সামনের সেনগুপ্ত-ভিলাও খালি।

ঠিক খালি বলা ঠিক নয়, পর্দা ফেলা জানলার ওপারে বুড়ো পায়চারি করছে, দেখা যাচ্ছে। এবার জানলার দিকে এগিয়ে আসছে। পর্দার সরিয়ে এদিকেই চেয়ে আছেন দেখে মিসেস মজুমদার আর সেখানে দাঁড়ান না।

***

শ্যামল রোজকার মতো নিজের চাবি দিয়েই খুলে ঢুকেছিল। তপোব্রতকে সাতটার আগে ঘুম থেকে ডাকা নিষিদ্ধ। অভ্যাসমতোই, এঁটো বাসনপত্র মেজে, চা বানিয়ে নিয়ে উপরে উঠেছিল সে।

উঠে দেখে দরজা খোলা, বিছানা খালি।

টানটান নিভাঁজ বিছানা, কাল যেমন ঝেড়ে পেতে দিয়ে গেছিল।

হতভম্ব হয়ে নিচে নেমে এসেছিল সে। ছোট্ট বাড়ি, দেখার জায়গা আর ক'টাই বা! আর বাবু তো সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন পড়ার ঘরের ঐ টেবিলেই।

গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখল...

***

"তাহলে তুমিই সবার আগে দেখেছিলে?"

ইন্সপেক্টর অরুণের প্রশ্নে ঘাড় নেড়েছিল শ্যামল।

"কিছুতে হাত দাওনি তো?"

এর উত্তরেও ঘাড় নেড়েছিল সে, এবার না বুঝিয়ে।

ঘরে দ্রুত চোখ বোলাচ্ছিল অরুণ। পুরোনো ধাঁচে সাজানো ঘর, কাঠের হাতল দেওয়া সোফা সেট, শো কেসে নানারকম বাহারি জিনিস, দেওয়ালে গোটা চারেক বেশ সুন্দর পেইন্টিং। জানলার সামনে একটা চওড়া পালিশ করা কাঠের টেবিল, গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলের উপর মাথা রেখে এলিয়ে পড়ে আছেন তপোব্রতবাবু। মাথার পিছনে একটা ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন, রক্ত গড়িয়ে পড়ে শুকিয়ে আছে খোলা বইটার উপরে।

"দরজা তুমি চাবি দিয়ে খুলেছিলে সকালে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কাল যাবার সময়ে কে বন্ধ করেছিল?"

"করতে লাগে না স্যার। টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়।"

"ভাই কখন আসবে বলেছে?"

"এই আসছে স্যার। দূরে থাকেন, সময় লাগছে তাই।"

গত চব্বিশ ঘন্টার সব ঘটনাবলী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার পর শ্যামলকে আপাতত ঘর থেকে যেতে বললেন অরুণ।

মনোজ এসে দাঁড়িয়েছে।

"কী পেলে?"

মনোজ অল্প কথার মানুষ। তার এতক্ষণের ফোনালাপের ফলাফল জানাতে মাত্রই মিনিট পাঁচেক সময় নেয়।

অরুণের ভ্রূ আরেকটু কোঁচকায়।

ভদ্রলোকের কারও সঙ্গেই তেমন সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র আত্মীয় বলতে ঐ ভাই, যে আসছে। তার সঙ্গেও গতকাল কথা কাটাকাটি হয়েছে বন্ধ ঘরে, শ্যামলের কথামতো।

ভদ্রলোককে শেষ জীবিত দেখেছেনও ওই ভাই-ই।

ডাক্তার এক্স্যাক্ট টাইম তো বলতে পারবেন না। রেঞ্জ যা বলছেন, তাতে ভাইটির পক্ষে কাজটা অসম্ভব না।

মোটিভও মনোজ বার করে নিয়েছে। এ বাড়ির ভাগ। ভাইটি অকর্মণ্য, বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছে। এটা পৈতৃক সম্পত্তি, দুই ভাইয়ের সমান ভাগ। কিন্তু বাবা চাইতেন তাঁর বহু কষ্টে বানানো বাড়ি যেন বিক্রি না হয়, দাদাটিও তাই ধরে বসেছিলেন। ফলে এ নিয়ে মাঝে মাঝেই দু-ভাইয়ে কথা কাটাকাটি হত। কালও এ নিয়েই মনোমালিন্য চলছিল ধরেই নেওয়া যায়।

"ভাইয়ের টাকার টানাটানি পড়েছে কি?"

"খোঁজ নিচ্ছি স্যার, তবে হ্যাঁ, অবস্থা ভালো নয়। সামান্য একটা চাকরি করে, বৌ আছে, একটা ছেলে, বখাটে টাইপের, কলেজে পড়ে বটে তবে পড়ার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

"থাকে কোথায়? এখানে থাকে না কেন?"

"থাকে মানিকতলার কাছে। এখানে থাকে না কেন তা জানি না স্যার। তবে ওটাও শ্বশুরবাড়ির ভাগ। অনেক ঘরের শরিকী বাড়ি আর কী!"

"হুম। এলে আগে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

যতক্ষণ না দেবব্রত আসছে, শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে একদফা সারা বাড়ি ঘুরে দেখেন অরুণ। শোবার ঘর গুছোনো ব্যাচেলারের নিস্তরঙ্গ জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাবেকি বড়ো সাইজের একেনে খাট, দেওয়াল জোড়া কাবার্ড, খোলাই ছিল—খুলে দেখলেন পরিপাটি ইস্ত্রি করা জামাকাপড় ভাঁজ করা। একটা স্ট্যান্ডে ঘড়ি, বই, টুকটাক মেমেন্টো। বাথরুম সাদামাটা। অন্যদিকের ঘরটা একেবারেই ব্যবহার হয় না মনে হল, শ্যামল বলল এটা বাবুর বাবা-মা'র ঘর ছিল, ওর নাকি ঢোকা বারণ ছিল। ছিটকিনি বন্ধই থাকে এখন, শুধু পুজোর আগে একবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঝাড়ামোছা করিয়েছিলেন। ওপরে আর ঘর নেই, একটা ছোটো খোলা ছাদ আছে বাকি অংশে। নিচু পাঁচিল, ন্যাড়া একদম, একটা গাছও নেই।

"ছাতে রাত্রে চাবি পড়ে?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি নিজে লাগিয়ে যাই যাওয়ার আগে।"

"কিন্তু আজ তো খোলা! কাল বন্ধ করোনি?"

শ্যামল ইতস্তত করে। ঠোঁট চেটে বলে, "করেছিলামই তো মনে হচ্ছে। বাবু হয়তো তারপর রাতে দরজা খুলে পায়চারি করতে গেছিলেন ছাতে।"

"যেতেন এরকম?"

"জানি না ঠিক। আমায় তো এত কথা বলেননি কখনও... তবে এমনিতে দেখেছি দিনের বেলা বাগানে হাঁটতেন..."

"দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাবেন, এত ভুলো মানুষ ছিলেন কি?"

শ্যামল একটু হাসে, "তা ... মাথায় কিছু পড়ার ব্যাপারে চাপলে অনেক ভুলে টুলে যেতেন বইকি! পড়ুয়া মানুষ যেমন হয়।"

কাল দরজা বন্ধ করতে ভুলেই গেছিলেন কি তবে? এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট। চেক করতে হবে। যদিও দোতলার ছাত, কিন্তু বাড়ির যা ডিজাইন, তাতে পাঁচিলে উঠে কার্নিশ বেয়ে কোনও জোয়ান লোকের ছাতে উঠে আসা খুব কঠিনও নয়।

যদিও, খামোকা আসবে কেন কেউ! নিচ থেকে তো বোঝা সম্ভব নয়

উপরে দরজা খোলা আছে।

নোট করে রাখলেন ব্যাপারটা অরুণ। তারপর একতলায় নেমে এলেন। একদম পিছনদিকে আরেকটা শোবার ঘর। সেটা গেস্ট রুম হিসেবে ব্যবহার হত, জানা গেল। বৈশিষ্ট্যহীন ফিকে সবুজ রঙের ঘর, জানলায় মোটা পর্দা টানা। তার পাশের ছোটো ঘরটা তপোব্রতর স্টাডিরুম, বইপত্রে ঠাসা র‍্যাক দুদিকে, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো।

রান্নাঘরটা খোলা ধরণের, একটা আর্চ করা সামনে। সেটার একদিকে ওয়াশিং মেশিন, অন্যদিকে ইস্ত্রির বোর্ড। এসবই শ্যামল চালাত, জেনেছেন। সেখানে দাঁড়িয়েই চোখ বুলিয়ে নিলেন। নাঃ, ছেলেটা একদম পরিপাটি গুছিয়ে কাজ করে বটে, এক ব্যাচেলার আর এক ছোকরা চাকরের সংসারে এমন তকতকে রান্নার জায়গা আশা করেননি তিনি। পরিচ্ছন্ন গ্যাসের ওভেন, তাকে তাকে সাইজ অনুযায়ী বাটিঘটি সাজানো, বেসিনের কল চকচকে, এমনকি পাশে জল ঝরার জায়গায় থালা গ্লাসের সঙ্গে সঙ্গে তেলের কৌটো পলাও ধুয়ে উপুড় করে, ছোটো নোড়াটি ধুয়ে কাত করে রাখা। গুছুনে কাজ।

দেবব্রত এই সময়ে এসে পৌঁছল। সঙ্গে তার স্ত্রীও এসেছেন। হুলুস্থূল পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। পাড়াপ্রতিবেশী যাঁরা এতক্ষণ পুলিশের গাড়ি দেখে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন তাঁরাও এবার ঢুকে এলেন বাগানের গেট ঠেলে। বাধ্য হয়েই সেদিকে ছুটে গিয়ে সবাইকে বাড়ির ভিতরে আসতে বারণ করতে হল অরুণকে, তড়িঘড়ি সামনের রাস্তাটুকুও ঘিরে নিতে হল দড়ি দিয়ে।

খুন!!!

শব্দটা ফিসফিস থেকে সোচ্চারে ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায় দাঁড়ানো জটলার মধে। এমনকী সবার মধ্যমণি দেবব্রতর স্ত্রীর তীক্ষ্ণ গলায় ডুকরে ডুকরে ওঠা কান্নাও কেমন যেন মিইয়ে গেল এরপর।

***

"আপনি এ বাড়িতে থাকেন না কেন?"

দেবব্রতকে নিয়ে ভিতরে এসেছিলেন অরুণ। প্রথমেই এই প্রশ্ন তিনি সম্ভবত আশা করেননি, কেমন ঘাবড়ে গেলেন।

"আমি... মানে... হয়েছিল কী, বিয়েটা একটু কমবয়সেই করে ফেলেছিলাম, আমার আসলে তত পড়াশোনার মাথা ছিল না দাদার মতো। ব্যবসার ঝোঁক ছিল। বাবা... প্রথমে ক্যাপিটাল দিয়েছিলেন, সাপোর্ট করতেন বেশ। হঠাৎ কেমন বিগড়ে গেলেন। আমিও... বিয়েটা একটু আচমকাই করা হয়ে গেছিল, খরচখরচাও বাড়ল, বাজারও মন্দা,

সব মিলিয়ে কাজটা দাঁড়াচ্ছিল না। আরেকটু ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করা গেলেই হত, কিন্তু বাবা বেঁকে বসলেন যে আর টাকা দেবেন না। তখনও বিয়ের কথা বাড়িতে জানাইনি, ভেবেছিলাম একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে রুম্পাকে নিয়ে আসব, তখন আর বাবা 'না' করবেন না।

তারপর এই টাকা নিয়ে অশান্তি... দাদা বাবাকে উস্কাতো বুঝলেন! সে তখনও পড়ছে, আমি রোজগারে নেমে গেছি সেই হিংসে... বিয়ের কথাটা দাদাকে বলেছিলাম, সে পত্রপাঠ বাবাকে জানিয়ে দিল। বাবা রেগে আগুন হয়ে আমায় বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। একবস্ত্রে। ভাবুন।"

"আপনাদের মা?"

"আমার ছোটোতেই গত হয়েছেন। মা থাকলে কি আর আমার উপর এমন অবহেলা অত্যাচার হতে পারে? সারা জীবন, ভাবতে পারবেন না কী সয়েছি..."

"অর্থাৎ দাদাকে আপনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, তাই তো?"

দেবব্রত হঠাৎ কেমন ঘুম থেকে ওঠার মতো চমকে ওঠে এ কথায়।

"আরে না না। তা কই বলেছি! যত যাই হোক, নিজের পরিবার! আমি শুধু বোঝাচ্ছিলাম কেন আমি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

"হুঁ, তারপর?"

"তারপর আর কী! বের করে দিলেন রাস্তায়, তা শ্বশুরমশাই শাশুড়িমা খুব ভালোবাসতেন আমায়, তাঁরাই আশ্রয় দিলেন। তাঁদের অবস্থাও ভালো নয়, তাই ব্যবসার শখ ছেড়ে শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর কারখানাতেই কাজে লেগে গেলাম। তাই নিয়ে আবার শালাদের সঙ্গে অশান্তি...তা সে যাহোক এখন একটা থিতু ব্যবস্থা হয়েছে ওদিকে, ওবাড়ির বাবা থাকতে থাকতেই সব ভাগবাটোয়ারা করে গেছেন। কিন্তু নিজের বাবার মন আর ফিরল না, যদ্দিন বেঁচে ছিলেন আমার মুখ দেখেননি।"

"কিন্তু বাড়ির ভাগ তো দিয়ে গেছেন?"

"এঁ... তা গেছেন। সেদিকে বঞ্চিত করেননি বটে। তবে আমার থাকার অধিকার নেই এখন...দাদা যদ্দিন চাইবেন এবাড়িতে বসবাস করবেন, তারপর বাড়ির আদ্ধেক আমার ভাগের।"

"উইলের কথা জানলেন কী করে?"

"বাবার কাজের পর দাদাই বলেছিল।"

"আচ্ছা! যাক, তা গতকাল আপনি কেন এসেছিলেন?"

"এমনিই... অনেকদিন দাদার খোঁজ নেওয়া হয়নি, তাই। একা থাকে, বয়সও হচ্ছে তো... মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাই। দাদা অবশ্য কখনও আমাদের ডাকখোঁজ করেনি...সে আর কী করা!"

টেনে টেনে হাসে দেবব্রত একটু। নিজের নার্ভাসনেস চাপা দিতেই

সম্ভবত।

“আর কিছু না?”

“আর কী হবে?”

বুলেটের মতো প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন অরুণ, “এই বাড়ি বিক্রি করা নিয়ে আপনি দাদাকে চাপ দিচ্ছিলেন না?’

দেবব্রতর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

“বিক্রি... আমি... বলতাম বটে স্যার, কিন্তু চাপ দিইনি, বিশ্বাস করুন। বিক্রি হলে আমার খুব সুবিধে হত, এইটুকুই বলতাম। চাপ দেবার মতো জোর আমার কই বলুন...”

“আপনার দাদা কিছু উইল করেছেন কিনা জানেন?”

“না, বলেনি তো কিছু!”

“যদি না করেন, সব আপনিই পাবেন একমাত্র জীবিত আত্মীয় হিসাবে।“

দেবব্রত আরও সিঁটিয়ে যায় কেমন, জিভ বুলোয় ঠোঁটে, “সে... আমি জানি না স্যার।“

“তাহলে, দাদা মারা যেতে আপনার সুবিধেই হল বেশ।”

এবারে আক্ষরিক অর্থেই হাঁউমাউ করে ওঠে দেবব্রত, “এসব আমি কিছু ভাবিনি স্যার, মাইরি বলছি...”

অরুণ জবাব দেয় না।

***

বাড়ির সামনে খুন, পুলিশ, সারাদিন ধরে ব্যারিকেড করা! মিসেস মজুমদারের জীবনে এমন উত্তেজনাময় দিন আর আসেনি, এটা হলফ করে বলা যায়। ব্যারিকেডের ঠেলায় কার্যত তাঁদের নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও যে ব্যাহত হচ্ছে, মিস্টার মজুমদার সেটা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রবল ধমক খেয়েছেন।

সেই কখন থেকে তিনি অপেক্ষা করছিলেন, কখন পুলিশ তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আসে। কে জানে, হয়তো এতক্ষণে খবর চলে গেছে, রিপোর্টাররাও এই এসে পড়ল বলে। একটু ভালো একটা শাড়ি পরে, চুলটুল আঁচড়ে নিয়েছিলেন—বলা তো যায় না, হয়তো টিভি থেকেও এল কভার করতে! শহরের অভিজাত পল্লীতে বয়স্ক রিটায়ার্ড অধ্যাপক খুন কি আর রোজ রোজ হয়?

দরজায় বেলটা বাজতেই পুরো বুলেটের মতো ছিটকে গিয়ে দরজা খুললেন তিনি। মিস্টার মজুমদার হাতের খবরের কাগজটুকু রাখারও সময় পাননি তখনও।

সিনেমায় যেমন দেখায় তেমন ছিপছিপে, চনমনে, সানগ্লাস পরা কোনও অফিসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না অবশ্য। যিনি ছিলেন তাঁর চেহারা লম্বার দিকে, ভালো শক্তপোক্ত স্বাস্থ্য, এমনি চশমা পরা। অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "জানেনই তো নিশ্চয় কী হয়েছে। আপনারা একদম সামনে থাকেন তাই আগে আপনার কাছেই এলাম। এই বাড়িতে, বা এই রাস্তায় কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন কি গতকাল, বা লাস্ট কয়েকদিনের মধ্যে?"

"অস্বাভাবিক বলার মতো তো কিছু দেখিনি। কে খুন করল, অফিসার? আহা অমন বইমুখো মানুষটা..."

"খুব বই পড়তেন বুঝি?"

"করবেনই বা কী আর? বুড়ো মানুষ। সারাদিন ঐ টেবিলে বসে পড়াশুনো করতেন। বেরোতেনও না বেশি। আহা, সাতে নেই পাঁচে নেই। কে খুন করল এমন লোককে? চোর ডাকাত ঢুকছে নাকি পাড়ায়?"

"আপনি বোধহয় ওঁর সারাদিনের রুটিন দেখতে পেতেন?"

"ওমা! পাব না? আমার রান্নাঘর তো ঐ দেখুন, ঠিক ওঁর পড়ার ঘরের উলটোদিকে! সারাদিন কাজ করতে করতে দেখতাম তো... ঐ টেবিলে মুখ গুঁজে বসে আছেন, নয় এই বাগানে একটু পায়চারি করছেন... ওঁর কাজের লোকটা রোজ আসত যেত...না চাইলেও চোখে পড়ে যেত, সারাক্ষণ কি চোখ নামিয়ে চলাফেরা করা যায়!"

অরুণ বুঝে নিল, অর্থাৎ এঁর চোখ সারাক্ষণ ঐ জানলা দিয়ে বাইরেই পড়ে থাকে। এমন জীবন্ত সিসিটিভি পাওয়া পুলিশি তদন্তে বেশ সুবিধার কথা।

"আপনি বেশ হুঁশিয়ার মনে হচ্ছে। একটু বলুন তো সেদিন এ বাড়িতে কাকে কাকে আসতে যেতে দেখেছেন... মানে আপনার চোখে পড়েছে। বা উনি বেরিয়েছিলেন কিনা...?"

"বেরোননি মনে হয়। তার আগের দিনই তো বেরিয়েছিলেন, রোজ রোজ বেরোন না। ঐ ছোকরা চাকরটাই যা লাগে নিয়ে আসে-টাসে। গতকালও গেছিল বাজারের ব্যাগ হাতে বিকেলে। তার আগে উনি বাগানে ঘুরছিলেন দেখেছি। তারও আগে বলব? সকালে?"

"না, না, ঠিক আছে। আপনি বিকেল থেকেই বলুন। বিকেলে বাগানে ঘুরছিলেন, দেখে সুস্থই মনে হয়েছিল তো?"

এইখানে অরুণ খেয়াল করল, ভিতরের টাকমাথা দোহারা চেহারার ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ একটা খবরের কাগজ হাতে ধরে সোফায় বসে এদিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়েছিলেন, তিনি গুটি গুটি উঠে এসে মহিলার পিছনে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে না তাকালেও ভদ্রমহিলা সেটা টের

পেয়েছেন মনে হল, গলা আপনা থেকে নরম হয়ে একধাপ নেমে এল।

"একদম ফিট। হাঁকডাক করছিলেন ... নর্মাল, নর্মাল— উনি অমনই করতেন সব কথায়। তারপর ভিতরে গেলেন। ছেলেটা বাজার করতে গেল। উনি টেবিলে বসে পড়ছিলেন। দেখিনি, তবে ঘরে পাখা চলছিল। তারপর আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ বাইরে চোখ পড়তে ওঁর ভাইকে বেরোতে দেখলাম বাড়ি থেকে। না তার আগে ছোকরা চাকরটা বেরিয়ে গেল, তারপর ভাই বেরোল।"

"ভাইকে চিনতেন আপনি?"

"আমরা কতদিনের বাসিন্দা জানেন এখানে? পুরোনোদের সবাইকে চিনি। ভাই তো আসত মাঝেমধ্যে।"

"সদ্ভাব ছিল দুই ভাইয়ের?"

মিস্টার মজুমদার গলা খাঁকারি দিলেন। তাঁর দিকে আড়চোখে চেয়ে মিসেস মজুমদার বললেন, "তা জানি না। তবে অসদ্ভাবের কিছুও দেখিনি। আলাদা থাকত এইমাত্র। সে তো আজকাল কতজনেই থাকে!"

"কটা হবে তখন? ভাই যখন বেরোল?"

"অ্যাঁ... তা সাতটা নাগাদ... এক্স্যাক্ট তো মনে নেই। শসা কাটছিলাম। ছুরিটার ধার একদম কমে গেছে, কবে থেকে বলছি ওকে একটা নতুন লাগবে..."

অরুণ প্রসঙ্গটা ডিঙিয়ে যায়, "ভাই কি বেরিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল?"

"তাড়া...? না না, বরং একটু থেমে থেমেই গেল তো। ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়ির দিকে।"

অরুণ পয়েন্টটা নোট করেন।

"আর কেউ এসেছিল? বা আর কেউ বেরিয়েছিল ওবাড়ি থেকে?"

"নাঃ! কেউ না। রাতের রান্না করলাম, তারপর ও ঘরে গিয়ে টিভি চালালাম। এমনিতে খুব একটা টিভি দেখি না, ঐ সময় কাটানো আর কী! আমার বসার ঘর থেকেও দেখুন এদিকটা দেখা যায়। ছোটো গলি, এদিক ওদিক থেকে লোক এলে চোখে পড়েই যায়। আমি রাস্তার দিকে খেয়াল রাখছিলাম, কেউ আসেনি।"

"হুম! আপনারা কটা অবধি জেগে ছিলেন?"

"তা... সাড়ে দশটা হবে! বেশি রাত জাগলে আবার ওঁর অম্বল হয় কিনা..."

"গলিতে অজানা অচেনা কাউকে দেখেননি, তাই তো?"

"নাঃ, উটকো কেউ আসেনি। ঐ দুধওয়ালা, জমাদার, ইস্ত্রি... এইযযাঃ! তুমি আমার শাড়িটা এনেছিলে ইস্ত্রি করিয়ে?"

শেষটা মিস্টার মজুমদারের দিকে ফিরে। ভদ্রলোকের জন্য মায়া

হচ্ছিল অরুণের।

"তাহলে কেউ আসেনি। আপনি কিছু আলাদা আর বলতে পারবেন কি, স্যার?"

মিস্টার মজুমদার দ্রুতগতিতে মাথা নেড়ে না বলেন। মিসেস মজুমদার আবার ঝংকার দিয়ে ওঠেন, "ও আবার বলবে কি! চোখের সামনে পড়ে থাকা জিনিস দেখতে পায় না!"

"আচ্ছা ম্যাডাম, আমি চলি। একটা অনুরোধ, কিছুমাত্রে অস্বাভাবিক কিছু মনে পড়লেই আমাদের জানাবেন প্লিজ, সে যত তুচ্ছই মনে হোক না কেন!"

মজুমদার-নিবাস থেকে প্রায় পালিয়ে বাঁচেন অরুণ।

***

শুভেন্দু দত্তর বাড়ির ব্যাপারস্যাপার আবার মজুমদার নিবাসের উলটো মনে হচ্ছে। মিস্টার দত্তই পুলিলশের সঙ্গে যা কথা বলার বলছেন, তাঁর স্ত্রী উঁকি মেরে দেখছিলেন শুরুতে, অরুণ একবার তাঁর কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই প্রবলভাবে তিনি যে এসবের বিন্দুবিসর্গ জানেন না, তিনি বাড়ি থেকে প্রায় বেরোনই না আর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন...এটুকু বলেই সুট করে উধাও হয়েছেন।

তবে শুভেন্দু দত্ত বেশ সোজাসাপটা জানিয়ে দিয়েছেন, সেনগুপ্ত অতি খারাপ প্রতিবেশী ছিলেন। ওর জ্বালায় গাড়ি নিয়ে বেরোনোই দায় হয়ে উঠেছিল তাঁর।

"ইম্পসিবল লোক মশাই! আরে, বেরিয়ে খেয়াল হয়েছে আধার কার্ডটা ফেলে এসেছি বাড়িতে, ঘুরিয়ে নিয়ে শুধু দাঁড় করিয়েছি, যাব নিয়ে আসব বেরিয়ে যাব... কী অশান্তিটাই না করল মশাই! মারা গেছেন, খারাপ বলতে নেই... কিন্তু একটুও সভ্যতাভব্যতা জ্ঞান ছিল না লোকটার, যাই বলুন!"

অরুণ হাসি চেপে তার আসল কৌতূহলের কথায় চলে যায়।

"আপনার তিনতলার ঘর থেকে তো ওঁর দোতলার ছাতটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কিছু চোখে পড়েছে কি?"

"ছাতে? কই না তো!"

"ধরুন উনি বেরিয়ে পায়চারি করছেন বা এমন কিছু?"

শুভেন্দু দত্ত খানিকটা যেন নিজের অনিচ্ছাতেই ঘাড় নাড়েন।

"নাঃ! দেখিনি। ওই তিনতলার ঘরটায় আমি বেশ অনেক রাত অবধি টিভি দেখি... তারপর জানলা টানলা বন্ধ করে শুতে নামি। অবশ্য সিরিজে মজে ছিলাম তো, কিছু হলেও চোখে পড়া মুশকিল!"

"হুম! এমনি অন্য সময়েও কখনও দেখেছেন এরকম, রাত্রে ছাতে ঘুরতে বা কিছু?"

"নো। নেভার।"

অরুণ খাতা বন্ধ করে যেতে উদ্যোগী হন।

"ছাত নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন স্যার? শুনলাম তো স্টাডিতে বডি পাওয়া গেছে! ছাতে আর কিছু ছিল নাকি?"

"ছাতের দরজাটা আমরা খোলা পেয়েছি। তাই চেক করা হচ্ছে... কিছু মনে পড়লে, যত সামান্যই মনে হোক, জানাবেন, কেমন?"

"ছাতে কিছু ছিল না তাহলে?"

অরুণ ঝট করে ঘুরে চায়, গলায় হালকা কাঠিন্য এনে বলে, "কেন, কী থাকতে পারে বলে আপনার মনে হচ্ছে?"

শুভেন্দু দত্তর এতক্ষণের স্মার্টনেস সেই চাউনির সামনে উবে যায়। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলে, "না মানে সেরকম না। আসলে সকালে দেখলাম শ্যামল ছাতের দরজায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে... "

"দেখছে মানে? ঝুঁকে পড়ে দেখছে?"

"না... মানে, সেরকম না। একদৃষ্টে চেয়ে কী যেন ভাবছিল..."

"দরজা খোলা ছিল তখন?"

"হ... হ্যাঁ। খোলাই তো ছিল। শ্যামল এসে দাঁড়াল। আসলে আপনি প্রশ্ন করতে মনে পড়ল। তখন অত খেয়াল করিনি।"

***

'সকালে ছাতে কী দেখতে গেছিলে শ্যামল?"

খরচোখে চেয়ে ছিলেন অরুণ। শ্যামলের একটুও বিকার দেখতে পেলেন না। নিরুত্তাপ গলায় বলল, "কী আবার স্যার। উপরে গেছিলাম, ছাতের দরজা খোলা দেখে উঁকি মেরেছিলাম। তখন অত অকিছু ভাবিওনি ওটা নিয়ে, আপনাকে বলতেও ভুলে গেছি। আপনি কী করে জানলেন?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় অরুণ।

"মানে তুমি ওপরে গেছিলে যখন, তখন দরজা খোলা ছিল?"

"হ্যাঁ। বাবু ওখানে আছে কিনা দেখতে উঁকি দিয়েছিলাম একটুক্ষণ।"

"কিছু ছিল ছাতে?"

"নাঃ! একদম খালি, যেমন থাকে।"

***

"কত বছরের দোকান তোমার?"

"তা স্যার, ইগারো হল।"

"শ্যামলকে তুমিই এনে দিয়েছিলে না সেনগুপ্তবাবুর বাড়িতে? কদ্দিন চেনো ওকে?"

"আমি না বাবু! আমার চেনা একজন, নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। তাঁর কেমন চেনা ছিল।"

"কী নাম? কোথায় থাকেন?"

"নাম তো জানি না স্যার! মুখচেনা ছিল, বাস্! আর পাবেন কী করে, তিনি তো বিদেশে ছেলের কাছে চলে গেছেন গত মাসেই!"

"শ্যামল আসত জিনিসপত্র কিনতে? কেমন লোক মনে হত?"

"আসত স্যার। ওই তো সব কেনাকাটা করত! লোক আর কী বলি বাবু, সে কম কথার মানুষ। আসত , জিনিস নিত, চলে যেত। হ্যাঁ, তাড়া দিত না। বেজারমুখে দাঁড়িয়ে থাকত। জিনিস দিলেই দাম মিটিয়ে চলে যেত। হাঁ, দাম একদম ফেলে রাখত না। সব গুনে মিটিয়ে যেত প্রতিবার।"

"আর সেনগুপ্ত বাবু?"

"উনি আজকাল আর বিশেষ আসতেন না। বেরোতেনই না খুব একটা। মাঝেসাঝে। একটা সিগারেট, কি ডট পেন আর কাগজ... এইসব। আগে আসতেন, শ্যামল জয়েন করার আগে, খুব ঝামেলা ফেস করেছেন তখন, কাজের লোক টিকত না, নিজে পেরে উঠতেন না সব... আমায় বলেছিলেন দেখে দিতে, আমি আরও পাঁচজনকে বলেছিলাম। সেই থেকে শ্যামল এল।"

"কে মারতে পারে কিছু আন্দাজ...? উনি নাকি সবার সঙ্গে ঝগড়া করতেন?"

"না বাবু। ছোটোমোটো ঝগড়াবিবাদ কোথায় না হয়! কিন্তু এপাড়ায় সবাই ভদ্রলোক আছে স্যার। অমন কাজ কেউ করবে না।"

আশপাশের আরও কিছু বাড়িতে কথা বলে অরুণ আর তার দল চিন্তিতমুখে তখনকার মতো জিপে উঠে পড়ল।

***

মিস্টার মজুমদারের আজ কপালটাই খারাপ। সকাল থেকে ভুল হচ্ছে। বাথরুম থেকে বেরোনোর পর আনমনে ভেজা তোয়ালে ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশে বিছানায় রেখে গেছেন, চা বানিয়ে চাপাতার কৌটো ভালো করে বন্ধ করেননি, আবার এখন দোকান করে আসার সময়ে তিনটে আইটেম আনতে ভুলে গেছেন।

বয়স নেহাতই বাড়ছে মনে হয়।

স্ত্রীর গজগজানির মধ্যে আর চা চাইতেও ভরসা হল না। বাকি তিনটে জিনিস নিয়ে আসার অছিলায় বাস স্টপ থেকে চা খেয়ে আসবেন ভেবে বেরোতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন পুলিশের জীপটা আবার এসেছে। সীল করা বাড়িটার সামনে দাঁড় করানো, একটা কনস্টেবল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃথাই এত বছর সংসার করেননি মিস্টার মজুমদার।

"ওগো শুনছ!" ডাক তুলে ভিতরে মিলিয়ে যাওয়ার ঠিক সাত মিনিটের মাথায় বসার ঘরের জানলায় মিসেস মজুমদারের মুখ সেঁটে যেতে দেখা গেল।

সে মুখে হালকা লিপস্টিকের প্রলেপও দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু, আজ আর পুলিশগুলো এদিকে আসার নামই করল না! ঘন্টাখানেক পরে তিনজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, সবাই মিলে জীপে উঠে চলে গেল! মিসেস মজুমদার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না।

মিস্টার মজুমদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। আজ তাঁর ভাগ্যে আরও বকুনি খাওয়া আছে!

***

দুদিন পর, নিজের ডেস্কে বসে ছিলেন অরুণ। পি এম এ-র রিপোর্ট কাল রাতে পেয়েছেন; যেমন বলেছিলেন ডাক্তার তেমনিই, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে কোনও একটা সময়ে খুন করা হয়েছে। দেবব্রত শেষ একা ছিলেন দাদার সঙ্গে, তাঁর কথামতো তিনি সাতটার আগেই বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু মিসেস মজুমদারের মতে তিনি গেছেন সাতটার পর। যদিও ঘড়ি দেখেননি, তবু, ব্যাক্তিগতভাবে অরুণ মিসেস মজুমদারের সঙ্গেই একমত।

রিপোর্ট বলছে ভোঁতা কিছু ভারি অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছিল, যাকে বলে 'ব্লান্ট ইন্সট্রুমেন্ট'।

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং ফরেনসিক এখনও অবধি যা যা জানাতে পেরেছে তার ফল দেবব্রতর বিরুদ্ধে কেসটা একদম সলিড করে তুলেছে আরও।

প্রথমত, পড়ার ঘরে, দরজার হাতলে বা বসার ঘরে তিনটে মাত্র আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এখনও অবধি, সে তিনটে মৃত ব্যক্তি, শ্যামল আর দেবব্রতর সঙ্গে ম্যাচ করছে।

দ্বিতীয়ত, শ্যামল যে সময়ে বেরিয়ে গেছে বলছে, তার অল্প পর

থেকেই তার বেশ শক্তপোক্ত একটা অ্যালিবাই আছে। সে নিজের সাইকেল সারাতে গ্যারেজে নিয়ে গেছিল, গ্যারেজের লোক তো বটেই, সেই সময়ে থানারই এক কনস্টেবলও ওখানে একই কাজে গেছিল, সে-ও বলছে ওকে দেখেছে। মৃত্যুর সময়টা তার অন্তত আরও আধ ঘন্টা পরে।

তৃতীয়ত, এবং এটাতেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন অরুণ, দেবব্রতর অবস্থা একেবারে ভরাডুবির মুখে। কারখানায় কাজ নেই, মাইনে হয় না বললেই চলে, এদিকে বাজারে বিশাল দেনা। ছেলেটি সম্ভবত একেবারেই বখে গেছে, কুসঙ্গে পড়েছে, নেশাপত্রও করে। ফলে টাকা ওড়ায়ও ঢের। দেবব্রত বকাবকি করেও শাসন করতে পারেননি, আর তাঁর স্ত্রী ছেলেকে রীতিমতো প্রশ্রয় দেন বলে জনশ্রুতি। বাড়ি বিক্রির ভাগ পাওয়াটা দেবব্রতর কাছে এখন বিশাল প্রলোভনই বটে।

ইতিমধ্যে দেবব্রতকে আরও দু-দফা জেরা করা হয়েছে থানায় ডেকে। লোকটা প্রথমে চোটপাট করছিল, তারপর ভয় খেয়ে কাকুতিমিনতি করতে লাগল। পরের বার দেখা গেল গুম হয়ে গেছে, 'আমি কিছু জানি না'র বাইরে কোনও কথাই আর মুখ দিয়ে বেরোল না।

তপোব্রতর বাড়ি ছেনে ফেলা হয়েছিল। দেবব্রতদের বাড়িও খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হল। সংসারের দারিদ্র্য, ছেলেটির সিগারেট আর মদের নেশার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না উল্লেখযোগ্য। দেবব্রত কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে, তার স্ত্রী দেখা গেল জাঁদরেল মহিলা, নির্বিকার ভাবে পুলিশকে তদন্তে অ্যাসিস্ট করলেন, এবং চলে আসার সময়ে কাছে এসে জানতে চাইলেন দাদার উইলের খোঁজ কিছু পাওয়া গেছে কিনা। উইল নেই শুনে বিলক্ষণ খুশিও হলেন।

বয়ান অনুযায়ী দেবব্রত ওখান থেকে বেরিয়ে বাসে উঠেছেন, বাড়ি এসেছেন সোজা। এই পুরো রাস্তা একেবারে হই-হট্টগোলে ভরা বাসরাস্তা, চায়ের ঠেক আর বাজার। অমন ভর সন্ধ্যায় লোকজনে ভরা ব্যস্ত অঞ্চলে মার্ডার ওয়েপন হাপিস করা খুব কঠিন। বাড়ি নিয়ে এসে তারপর কোথাও গিয়ে ফেলে এসেছে এটা হতে পারত, কিন্তু পরদিন থেকেই এ পরিবারের উপর পুলিশ চোখ রেখে চলেছে। তিনজনের কেউই সেভাবে পাড়ার বাইরে যায়নি এর মধ্যে। এক যদি না সেই রাত্রেই কিছু করে থাকে।

অরুণ বুঝতে পারছিল মার্ডার ওয়েপনটা খুঁজে বার করতে না পারলে চার্জ দাঁড় করানো মুশকিল। অথচ এত খুঁজেও সেটা চোখে পড়ছে না।

কেন?

এ কি তবে তেমন জটিল কোনও মার্ডার? বইতে যেমন সব পড়া

যায়... যেমন কিনা, আততায়ী জমাট বরফের চাঙড় দিয়ে মারল... তারপর সে বরফ ফেলে দিল বাথরুমে, জল হয়ে গলে বেরিয়ে গেল?

দেবব্রতকে দেখে মনে হয় না তার ঘটে এত বুদ্ধি আছে।

অবশ্য উচ্চস্তরের অপরাধীর কৌশলই তো নিজেকে লুকিয়ে রাখা...

নাঃ! আরেকবার অকুস্থলে গেলে যদি কিছু আইডিয়া আসে! বেরয়ে পড়ল অরুণ।

***

পড়ার ঘরে চোখ বোলাতে বোলাতে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন অরুণ। 'ব্লান্ট ইন্সট্রুমেন্ট' হিসাবে ব্যবহার করা যায়, ঘরভর্তি সেরকম জিনিস। মেটালের ফুলদানি, কোনারকের পাথরের চাকা, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পাথরর গণেশ— কত কিছু সাজিয়ে রাখা। সব আজ তুলে নিয়ে যেতে হবে। তবে খুনী সঙ্গে করে অন্য কিছু নিয়েও এসে থাকতে পারে।

দেবব্রতর খবর বার করতে বেশি খাটতে হয়নি, পাড়ায় গিয়ে কিছু প্রশ্ন করতেই গলগল করে খবর উগরে দিয়েছে পড়শীরা। আজ এপাড়াতেও আরও খুঁটিয়ে খোঁজখবর করবে ভেবেই এসেছিল অরুণ, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোমাত্র মিসেস মজুমদার যে এমনভাবে তাঁর উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেটা আশঙ্কা করেননি।

"কী... কী... কী বুঝলেন? কে মেরেছে?"

"সেটা তো এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না। আপনার আর কিছু মনে পড়েছে কি?"

"না। নাঃ! আচ্ছা চাকরটার কাজ নয়, না?"

"আপনিই তো বললেন সে আগেই বেরিয়ে গেছিল? ভাই পরে বেরোল?"

"তা বটে। তা বটে। তাহলে তো হতে পারে না..."

"শ্যামল কি পরে ফিরে এসে থাকতে পারে?"

"সাড়ে দশটা অবধি তো মোটেও না। আমি টানা রাস্তার দিকে খেয়াল রেখেছিলাম তো... কেউ আসেনি!"

অরুণ হঠাৎ টের পায়, এই খটকাটা তার সেদিনও লেগেছিল, কিন্তু ঠিক ধরতে পারেনি তখন কেন।

"আপনি রাস্তার দিকে অমন খেয়াল করছিলেন কেন মিসেস মজুমদার? আপনাদের কাছে কারও আসার ছিল?"

মিসেস মজুমদারের সপ্রতিভতা এই কথায় একটু টাল খায়, তিনি একটু অপ্রস্তুত গলায় বলেন, "না আসলে মনে হচ্ছিল হয়তো সেনগুপ্ত বু... বাবুর কাছে কেউ আসবে। মানে উনি যেভাবে জানলা দিয়ে

দেখছিলেন...”

“কী?!! কে জানলা দিয়ে দেখছিলেন?”

“সেনগুপ্তবাবু তো। ভাই চলে যাবার খানিক পর দেখি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন।“

অরুণের মুখ ভ্রূকূটিকুটিল হয়ে উঠল।

“পরিষ্কার দেখেছেন? উনিই?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ! দিব্যি চিনি ওঁকে আমি, এতকাল দেখছি! চোখাচুখিও হল একবার, সেজন্যই তো তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে চলে গেলাম! কী না কী ভাববেন শেষে!”

একটু কষ্ট করেই অবশেষে মিসেস মজুমদারের নাগাল থেকে ছাড়া পেয়ে জীপে উঠল অরুণ।

দেবব্রত বেরিয়ে গেছে সাতটা নাগাদই, এবং তারপরেও সেনগুপ্তবাবুকে জীবন্ত দেখা গেছে!

সব কেঁচে গেল যে!

***

পড়ার ঘরের কোনও জিনিসেই কিন্তু রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল না।

অরুণের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল।

এদ্দিন সাসপেক্ট বোঝা গেছিল ভাবছিলেন, খালি ওয়েপন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মিসেস মজুমদারের সেদিনের কথায় দুম করে সাসপেক্টও হাপিশ হয়ে গেল। ক্রমাগত যেন পিছিয়ে যাচ্ছে তদন্তটা!

ধুৎ!

সব ফাইলপত্র ছবি ভিডিও এভিডেন্স তুলে এনে নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করে বসল অরুণ। বাইরে অনেক খোঁজা হয়েছে, মনের মধ্যে খোঁজা দরকার এবার।

নোটগুলো বার বার করে পড়া। ছবিগুলো যতভাবে সম্ভব জুম করে করে দেখা। ভিডিও করা হয়েছিল পুরো বাড়ির, স্লো মোশনে, সেটা দেখতে থাকা বার বার।

তার মন সমানে বলে চলেছে, যে খুনের সূত্র এর মধ্যেই, চোখের সামনেই আছে কোথাও।

ঘন্টার পর ঘন্টা। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে এবার, আধখোলা চোখের সামনে আবারও ভিডিও চলছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে ওরা, ওয়াশিং মেশিন, ইস্ত্রির প্লাগটা...

ঝট করে উঠে বসল অরুণ। হামলে পড়ে ভিডিও স্টপ করে দিল।

***

শ্যামলের চোয়াড়ে মুখে সতর্কতার ছাপ অরুণের চোখ এড়ায় না।

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক হয়েছে। ছোকরার ছোটোখাটো চুরিচামারির কেস জানা গেছে। পুলিশ অবধি গড়ায়নি কখনও, কিন্তু হাতটান আছে।

"ওবাড়ির ঘরের সব কাজকর্ম তুমিই সামলাতে তো?"

"হ্যাঁ। আমি এসে চা জলখাবার দিতাম, বাকি ঘরদোর সাফ, কাপড় কাচা তোলা ইস্ত্রি... বললাম তো আপনাকে সেদিন।"

"রান্নাবান্না?"

"ঐ জলখাবারের টোস্ট কি কর্নফ্লেক্স, বিকেলে মুড়ি নয় ছাতু। বাকি তো হোম সার্ভিস আসত, বাসব দিয়ে যেত। আমার টিফিন আমি নিয়ে আসতাম। ওদের টিফিন ক্যারি, বাবুর থালা বাসন সব আমি মেজে দিতাম। "

"সেদিন সকালেও মেজেছিলি তো?" অরুণ হুট করে তুমি থেকে তুই-তে চলে যান। ট্রিকটা কাজে লাগে, শ্যামলের আপাত স্মার্টনেস নিমেষে হাওয়া।

"হ্যাঁ...হ্যাঁ।"

একটা ছবি এগিয়ে দেন অরুণ। বেসিন, পাশে ধোয়া বাসন রাখা।

"সেদিন সকালের ছবি। এই সব মেজেছিলি তো?"

"...হ-হ্যাঁ।"

শ্যামলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়ান অরুণ। সামনে গিয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কেটে কেটে বলেন, "যে বাড়িতে রান্না হয় না, খাবার আসে বাইরে থেকে, সেখানে হঠাৎ শিল-নোড়া মাজার দরকার পড়ল কেন বাবা শ্যামল? তাও শুধু নোড়াটা?"

"আ-আমি... আমি... চায়ে আদা দিয়েছিলাম। সেটা থেঁতো করতে নিয়েছিলাম..."

"তাহলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া চাপাতার মধ্যে একটুও আদা নেই কেন? চায়ের কাপে যে চা ছিল, তাতেও তো আদা ছিল না বলছে রিপোর্ট!"

শ্যামল বাঁশপাতার মতো কাঁপতে থাকে। তারপর আর্তনাদের মতো বলতে থাকে,

"সরি স্যার। মিথ্যা বলেছি স্যার, ভয় পেয়ে গেছিলাম স্যার। ওটা বেসিনে পড়ে থাকতে দেখে আমি ধুয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম বাবু কিছু করেছেন আগের দিনে। আমি ভাবিনি স্যার... প্লিজ আমায় এইবারটি মাপ করে দিন স্যার... ভয়ে ভুল বলে ফেলেছি স্যার..."

অরুণ বজ্রহস্তে শ্যামলের চুলের মুঠি চেপে ধরেন।

***

শ্যামলকে লক আপে চালান করা হয়েছে। গ্রেফতারের খবরটা কী করে যেন কাগজের লোকেরা জেনে ফেলেছিল, তিনের পাতায় ছোট্ট করে এসেছিল সেটা।

খবরটা যে মিসেস মজুমদারের চোখ এড়াবে না, সেটাতে অরুণ আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু সেটা পড়ে ভদ্রমহিলা যে উৎসাহে ফুটতে ফুটতে থানা অবধি ধাওয়া করবেন এটা সে একেবারেই আশা করেনি। একা আসেননি, সঙ্গে করে মিস্টার মজুমদারকেও এনেছেন।

"তাহলে কাজের লোকটাই তো? বলেছিলাম আপনাকে তখনই!"

মিস্টার মজুমদার অরুণের দিকে চেয়ে মৃদু কাঁধ ঝাঁকান।

"তারপর? সব স্বীকার করিয়েছেন তো? আপনাদের পাল্লায় পড়লে আর যাবে কোথায়! কথায় বলে পুলিশে ছুঁলে..."

"আঃ, রেবা!"

মিস্টার মজুমদার মৃদু আপত্তির গলায় বলেন। মিসেস মজুমদার থতমত খেয়ে থামেন, তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠেন, "তুমি জানো না। ওঁরা অনেক কিছু পারেন। থা-আ-র্ড ডিগ্রি! তাই না অফিসার?"

অরুণ এবার উঠে দাঁড়ায়।

"আপনি কি কিছু বলতে এসেছিলেন? আমার আসলে কাজ আছে, থানাটা ঠিক এমন গল্প করার জায়গা তো নয়..."

"বলতে এসেছি তো! সেইজন্যই তো আমায় ঢুকতে দিল, ইনি তো বাইরে থেকে চলেই যাচ্ছিলেন দরজার পুলিশটা 'কী চাই' বলাতে! শুনুন, একটা কথা মনে পড়েছে।"

দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে অরুণ বলে, "বলুন কী।"

"আজ কাগজ পড়তে পড়তে মনে পড়ল। এটা আপনার কাজে আসবে, শ্যামলের ব্যাপারেই।"

অরুণ আগ্রহী হতে বাধ্য হল এটা শুনে।

"হয়েছিল কী, সেদিন, মানে যেদিন খুনটা হল, সক্কালবেলা দেখি ওবাড়ির ছাতের দরজা খুলে শ্যামল বেরোচ্ছে। খুব সন্দেহজনক ভাব।"

"অন্যদিন খুলত না?"

"মোটেই না। একদম সেই দুপুরে খুলত, জামাকাপড় শুকোতে দিতে হলে দিত। সেদিন একেবারে হুট করে... বলুন, মনে পাপ না থাকলে কেন করবে অমন কেউ?"

অরুণের ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছিল।

"ও-ই খুলল বুঝলেন কী করে? হতেও তো পারে খোলা ছিল, ও খালি এসে পাল্লা খুলেছে?"

“ইম্পসিবল। ও দরজাটা একটু জ্যাম আছে বুঝলেন, ছিটকিনি খুলেই খুলে দেওয়া যায় না, একটু ধাক্কা দিতে হয়। স্পষ্ট বুঝলাম শ্যামল ভিতর থেকে দরজা খুলল, ধাক্কা দিল, তারপর খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি, এদিক ওদিক দেখছিল। বলুন, সন্দেহজনক না?”

মজুমদারদের বিদায় করে ভিতরের ঘরে এসেছিল অরুণ পায়ে পায়ে।

শ্যামলকে লক আপে ঢোকানোর আগে তার কাছে থাকা সব জিনিসই বার করে নেওয়া হয়েছিল নিয়মমাফিক। মানিব্যাগ, মোবাইল, চিরুণি, দু সেট চাবির রিং, সাইকেলের চাবি, পানপরাগের প্যাকেট।

অলসভাবে চোখ বোলাচ্ছিল অরুণ। মনটা খচখচ করেই যাচ্ছে।

কোথায় যেন কী একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মিসেস মজুমদারের তথ্য খুব যে নতুন তা না। যথেষ্ট জেরা হয়েছে, শ্যামল স্বীকারও করেছে সকালে দরজা সে-ই আসলে খুলে দিয়েছিল, বেসিনে নোড়া, বাবুর অমন দশা দেখে তার মাথার ঠিক ছিল না, দেখতে গেছিল ছাতে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। তারপর বন্ধ করতে ভুলে গেছিল নার্ভাসনেসে।

কিন্তু মিসেস মজুমদারের মুখ থেকে শুনতে শুনতেই খটকাটা জোরদার হয়েছে অরুণের।

রাত্রে, খুন করার পরেই তো উঠে গিয়ে ঐ দরজাটা খুলে দিয়ে আসতে পারত শ্যামল!

অত রাত্রে, কেউ টের পেত না।

খামোকা দিনের আলো বেশ ফোটা অবধি, আশপাশের লোকজন উঠে পড়া অবধি অপেক্ষা করে তারপর করবে কেন?

যেরকম ঠাণ্ডা মাথায় পরিচ্ছন্ন ভাবে খুনটা হয়েছে, তাতে নার্ভাস হয়ে এই কাজটা করতে ভুলে গেছিল বলতে মন সায় দিচ্ছে না।

এক যদি আদৌ না ভেবে থাকে। যদি না সকালেই প্রথম দরজা খুলে দেওয়ার কথা মাথায় এসে থাকে।

কিন্তু...

মনের খচখচানি যায় না।

আসলে এত বছরের অভিজ্ঞ কানে, শ্যামলের কান্নাকাটির মধ্যে কেমন যেন পাকা অপরাধীর সুর একদমই খুঁজে পায়নি অরুণ। কেমন যেন খাঁটি কান্নাই মনে হয়েছে।

অথচ আর কী-ই বা হতে পারে? ওর কাছে বাড়ির চাবি অবধি থাকত। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ফিরে এসে নিঃশব্দে চাবি খুলে ঢুকে যাওয়া ওর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। আর ঐ নোড়া... ওরই গুছিয়ে রাখা রান্নাঘরের জিনিস...

হ্যাঁ, রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। খুনের অস্ত্র নিয়ে আর সন্দেহ নেই।

তবু...

তপোব্রতর বাড়ির চাবিটা হাতে তুলে নেন তিনি। অন্যমনস্কভাবেই হাতে নাচাতে থাকেন সেটা।

বড়ো চাবিটার একটা দাঁত বড়ো আর ধারালো খাঁজকাটা। হাতে বেমক্কা খোঁচা লাগতে কিছু একটা মনে পড়ে সম্বিৎ ফেরে অরুণের।

কিছুদিন আগেই অবিকল এমনভাবে এমন খোঁচা খেয়েছিল না সে?

"সুনীল!"

হাঁক ছেড়ে প্রায় ছুটেই নিজের কামরায় ফিরে যায় সে।

***

গটগট করে ঘরে ঢুকে সব ছেড়ে তাকে তুলে রাখা গোল মর্চে ধরা ডাব্বাটা থেকে চাবির গোছাটা বার করে নেওয়ামাত্র দেবব্রত একেবারেই ভেঙে পড়ে। চাবিটা মেলানো যে পুলিশের কাছে জলভাত এবং বাকি 'দুইয়ে দুইয়ে চার'টা যে যেকোনো কোর্ট করে নেবে, এই কথাগুলো অরুণ ঝাঁঝালো ভাবে তার মাথায় ঢোকাতেই সে সব বলে দেয়।

চাবিটা তার কলেজজীবনের। বাবা দুই ছেলেকে নিরিবিলিতে নিজের মতো আসা যাওয়া করবে বলে দিয়ে রেখেছিলেন। বিয়ের পর সেটা সে দিয়ে দিয়েছিল তার স্ত্রীকে। বোধহয় প্রেমের প্রমাণস্বরূপ। বাড়িতে বলেছিল হারিয়ে গেছে।

তারপর তো বাড়ি থেকেই বিতাড়ণপর্ব ঘটল। কিছুটা রাগে, কিছুটা হারানো চাবি কী করে ফিরে পেল বলবে তা ভেবে না পেয়ে চাবিটা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। সেই থেকে ওটা রয়েই গেছে পুরোনো আরও দশটা জিনিসের সঙ্গে।

তল্লাসির সময়ে দেবব্রতর স্ত্রী এটাকে তাঁর বাবার চাবির গোছা বলেছিলেন। অরুণের তখন তা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ ছিল না।

এই চাবির কথা দেবব্রত ভুলেও গেছিল, আর ছেলে যে এর কথা জানে সেটাও সে জানত না। জানল দাদাকে দাহ করে আসার পরদিন রাত্রে, স্ত্রীর বেফাঁস কথায়। সেই থেকে মনে মনে জ্বলছে, কিন্তু ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ছেলেটি বাড়িতে পুলিশ তল্লাশির পর থেকেই বেপাত্তা, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগও হয়নি তার।

বাকিটা রুটিন ওয়ার্ক ছিল। ছেলেটির ব্যাপারে খোঁজ করতেই জানা গেল সে বেজায় অন্ধকার জগতে ফেঁসে আছে, এই মাসের মধ্যে একটা বড়ো পরিমাণ টাকার ব্যবস্থা করে ধার না চোকালে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হত।

বাবাকে চাপ সে-ই দিচ্ছিল জেঠুকে বলেকয়ে বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করানোর জন্য। সেদিন যখন বাবা আবারও সে চেষ্টায় ব্যর্থ হল, তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। রাত্রে মায়ের বাক্স থেকে চাবি নিয়ে, দুহাতে চুলে রঙ করার গ্লাভস এঁটে সে ঢুকে এল বাড়িতে। তার জেঠু তখনও পড়াশুনো করছিলেন, সম্ভবত টেরই পাননি তার নিঃসাড় উপস্থিতি। রান্নাঘর থেকে নোড়াটা তুলে এনে এক আঘাত, তারপর সেটার রক্ত ধুতে ধুতে বাইরের কুকুরের চীৎকারে প্যানিক করে বেসিনেই ফেলে রেখে দিয়ে পলায়ন।

ছেলেটি নিজেই এসে ধরা দিয়েছিল পরদিন, তার উদ্দেশ্য সফল হল না যখন, তখন বাইরে ছাড়া থেকে নিশ্চিত খুন হয়ে যাওয়ার চেয়ে জেলের ভাত খাওয়া ভালো – সম্ভবত এই ভাবনা থেকে।

***

মিসেস মজুমদার চিংড়ি মাছ আধভাজা অবস্থাতেই গ্যাস নিভিয়ে বেরিয়ে এলেন। শক্ত হয়ে যেতে পারে, সে যাকগে। বাড়ির সামনে আবার পুলিশের জিপ—এ কি ছাড়া যায়?!

দুজন নামল জীপ থেকে।

“ভিতরে যাবেন তো?” নরম গলায় বলল অরুণ।

“নাঃ!” একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়ল মলিন পোশাকের লোকটা, “দাদা... অমন তো হতে পারতাম না আমি কখনও, বাবা ঠিক সন্তানকেই বেছে নিয়েছিলেন। ও বাড়িতে আমায় মানায় না। তা সব ঠিক যেমন বললেন তেমন হবে তো স্যার?”

“চালু হোক, দেখে নেবেন। আপনারও তো ডিউটি শুরু হবে তারপর!”

দেবব্রত হাসেন। হাসিটায় ব্যথা মিশে।

অরুণ চোখের কোণে দেখল সামনের বাড়ি থেকে মিসেস মজুমদার পায়ে পায়ে এসে হাজির হয়েছেন।

“দেখলুম আপনারা এসেছেন তাই... কী ব্যাপার হল, আরও কিছু আছে বুঝি?”

কেস মিটে গেছে। কাগজে বেরিয়েছিল সব, ছোটো করে হলেও। আসামী জেলে। তারপরেও পুলিশ আবার এলে অবাক তো হবেই লোকে! অরুণ হাসে, বলে, “হয়নি এখনও, হবে। এই বাড়ি এক ইন্সটিটিউট কিনে নিয়েছে, দুঃস্থ বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে তারা। দোতলায় তাদের পড়ালেখা শেখার স্কুল হবে, আর নিচে একদম ছোটো যাদের বাপ-মা দিনমজুরি করে, দেখভাল করার কেউ নেই তাদের জন্য

ডে কেয়ার সেন্টার। পড়ার ঘরটা হবে লাইব্রেরি। শ্যামলকেও ওঁরা বহাল করেছেন কেয়ারটেকার হিসেবে। আর ইনি এখানে বাচ্চাদের লাইব্রেরিয়ান হিসাবে জয়েন করছেন, আসা-যাওয়া করবেন। “ দেবব্রতকে দেখিয়ে বলেন অরুণ।

মিসেস মজুমদার হঠাৎ কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যান এ কথায়, ‘কে কিনল, কতয় কিনল’ গোছের প্রশ্নগুলো ভুলে গিয়ে বলে ওঠেন, “আমায় আপনাদের এখানে কিছু কাজ দিন না ভাই? আমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতাম, জানেন? সারাদিন তো বসেই থাকি...বাচ্চাগুলোকে শেখাই যদি...?”

অরুণ মুচকি হেসে জীপে ওঠে।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - সায়ন কুঁতি
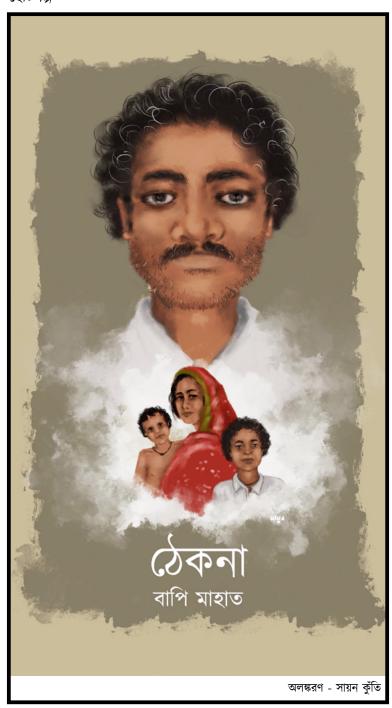
"চাষমোড়, চাষমোড়, চাষমোড়...আগাঞ আস আগাঞ আস, যারা যারা নাইমভে আগাঞ আস।"

কন্ডাক্টরের আওয়াজ শুনে রথু সিট ছেড়ে উঠে পড়ে। ওপরে রাখা থলিটা হাতে নিয়ে বাসের গেটের দিকে এগিয়ে যায়। একটা কুড়ি টাকার মলিন নোট এগিয়ে দেয় কন্ডাক্টরের দিকে। ফেরত পয়সা জামার পকেটে ঢুকিয়ে বাস থেকে নেমে দাঁড়ায় সে। বাসটা হর্ন দিতে দিতে সামনের বাঁকে ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে যায়। সামনে তাকিয়ে বেশ কয়েকটা দোকান দেখতে পায় রথু। অপেক্ষাকৃত ছোটো দোকানটায় গিয়ে প্রবেশ করে সে। দোকানদার অত্যন্ত নিপুণ কায়দায় মশলা মাখা আলুর চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা দলাগুলো গুলে রাখা বেসনে ডুবিয়ে রাখছে, কিছুক্ষণ পরেই আবার তা তুলে ছেড়ে দিচ্ছে কড়াইয়ের গরম তেলে। ছোটো ছেলে বীরুর গরম চপ বড্ড পছন্দের। রথু জামার পকেট থেকে একমাত্র পঞ্চাশ টাকার নোটটা বার করে দোকানদারের দিকে এগিয়ে দেয়।

-"... গোটা চারেক জিলাপি দিঞে দাও, আর দুটা চপ।... কতনা হছে?"

- "চব্বিশ টাকা।"

কাগজের ঠোঙা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে ভরে দোকানদার এগিয়ে দেয় রথুর দিকে। রথু ক্যারিব্যাগটা হাতের থলিতে ভরে হাঁটতে শুরু করে। পিচ রাস্তা পেরিয়ে গ্রামের মেঠোপথ ধরে সে। এখান থেকে মিনিট চল্লিশ হাঁটলেই চাঁপাইটাঁড়, রথুর শ্বশুরবাড়ি। রথু যতোই সামনে এগোতে থাকে ভয়টা যেন তার বুকে ততোই জাঁকিয়ে বসে। হিরুর প্রাণহীন শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা সন্ধ্যার মুখটা মনে পড়তেই রথুর হাঁটার গতি কমে যায়। পাগুলো যেন অবশ হয়ে আসে রথুর। কোনোরকমে টলতে টলতে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়ায় সে। কদিন ধরেই রোদের তাপটা প্রচুর বেড়েছে, হঠাৎ করে চারপাশে তাকালে মনেই হবে না যে এটা পৌষের শেষ, এখনো পৌষ পরব পার হয়নি। কিছুক্ষণ জিরিয়ে রথু আবার হাঁটা শুরু করে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই পৌঁছে যায় সে। বীরু বাইরে রাস্তায় খেলছিল। বাপকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে আসে। রথু পরম স্নেহে সাত বছরের ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। বাপের হাতে থলি দেখতে পেয়ে বীরু থলিতে হাত দেয়।

- " নতুন জামা আনে দিঞেছিস হামকে বাবা?"

- " আর বলিন্না বাপ, ই বছর ন দোকানগুলাই একটাও ভালো জামা নাই। একটাও পছন্দ নাই হল্য। তখন নাই লিলি বুঝলিস।"

বীরুর মুখ দেখে রথু বুঝতে পারে ছেলে কষ্ট পেয়েছে। চরম কষ্টে ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরে রথু। চোখের জল কোনোমতে আটকায় সে।

-" আসছ্যে বছর এক জোড় লিবি বুঝলিস বাপ। একটা লাল আর একটা হইলদা। ইবারের রঙগুলাও যুতের ছিল নাই।"

অভিমানী বীরু তবু মুখ ফুলিয়েই থাকে। রথু কোল থেকে তাকে নামিয়ে নীচে বসে। থলি থেকে চপ, জিলাপি বার করে ছেলের হাতে দেয়। এবারে বীরু যেন একটু খুশি হয়। রথু ছেলের গাল টিপে দিয়ে বলে,

- "আর শুন্, পোরশু তকে শিলাইয়ে মেলা দেখাতে নিয়ে যাব। বুঝলিস। মেলায় যেটা বলবি ঐটাই কিনে দিব।"

বীরুর মুখ এবার আনন্দে ভরে ওঠে।

-"একটা গাড়ি কিনবো বাবা...আর...আর একটা মোবাইল। সেই গান বাজে ঐ গিলা।"

-" হঁ তো তাই লিবিস বাপ। তর যা মন হবেক সব লিবিস।"

রথু বীরুকে কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মনের ভেতর চাপা ভয়টা সে আবার টের পায়। বাঁশের ফড়কি দেওয়া দরজা ঠেলে সে ভেতরে প্রবেশ করে। ছোটো শালা উঠোনে বসে শেষ বেলার রোদ পোয়াচ্ছিল। রথুকে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভেতরে গিয়ে খাট নিয়ে আসে, বাইরে পেতে রথুকে বসতে দেয়। খাটে বসে রথু এদিক ওদিক তাকায়। তার চোখ সন্ধ্যাকে খুঁজতে থাকে। কিছু উপায় না পেয়ে শেষে ও ছোটো শালাকেই জিজ্ঞেস করে।

-" আর তুমার মা রাজেশ? দিদিকেও নাঞ দেখত্যে পাছি তুমার?"

-"মাঞ তো গম রাখা গেলছ্যে। বেলাডুবুই আসব্যেক। আর দিদি ঐ থাল বাটি গুলা ধুতে গেইলছ্যে, বাড়ি নামর গড়্যাটাকে। থামত, হামি ডাক্যে দিছি। তুমি বস্য টুকু।" বলে রাজেশ বেরিয়ে যায়। রথু মনে মনে আগাম ঝড়টার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এক দু'বার তার মনে হয় এতদিনে সন্ধ্যার রাগ বোধহয় কমেছে। যাই হয়ে যাক এবার বীরু আর সন্ধ্যাকে নিয়েই বাড়ি ফিরবে সে। রথু মনে মনে এসব সাত পাঁচ ভাবতে থাকে। বাঁশের ফড়কি দরজা খোলার আওয়াজে তার সম্বিত ফেরে। থালা বাসন হাতে সন্ধ্যাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে রথু। ঘরে ঢোকার আগে সন্ধ্যার সাথে রথুর চোখাচোখি হয়। সন্ধ্যার এই দৃষ্টি রথু ভালো করে চেনে। মনে মনে রথু প্রমাদ গোনে। রথু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ভাবে সন্ধ্যা হয়তো বেরিয়ে আসবে, ওর সাথে কথা বলবে। কিছুক্ষণ পর রাজেশ ও ফিরে আসে। রথুর মুখ দেখেই রাজেশ পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে। রাজেশ ঘরে যেতেই রথু সন্ধ্যার চিৎকার

শুনতে পায়।

-"ঐ লকটাকে কেনে ঢুকতে দিয়েছিস রে? উয়াকে যাতে বল। আমি উয়ার মু ও নাঞ দেইখব্য... যাত্যে বল উয়াকে..।"

রথু দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাজেশের ধীর গলা তার কানে আসে।

- "দেখ দিদি, এতনাদিন ত রাগ কইরেই কাটালি, আর কতদিন এমনি করবি। উ লকটার কথাটাও টুকু ভাব।"

-" কিসকে ভাইবভ? কিসকে ভাইবভ বল ন রে। একটার আমার জীবনটা লিল, আরেকটা যদ্দিন আছে তদ্দিন উয়ার শান্তি নাই, শান্তিয়ে বাঁইচতে দিবেক নাই নকিরে..."

সন্ধ্যা এবার ঝরঝর করে কেঁদে ওঠে। রথু বুঝতে পারে না কি করবে। ভেতরে এসে সে সন্ধ্যার পেছনে দাঁড়ায়। কথাগুলো যেন গলার ভেতর দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে সে কয়েকটা কথা বলে।

-" বীরু না থাইকে ঘরটা শুনশান হয়ে গেলছ্যে। তর্...তরা না থাইকল্যে আমি কি নিয়ে থাইকব্য বল ন সন্ধ্যা।

-" কেনে? একটাকে তো লেগেছিলিস। কথা রাখ্যে আলি উটাকে?"

রথুর মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বীরু বাইরে থেকে ছুটে আসে, মা'কে ওভাবে কাঁদতে দেখে ছুটে গিয়ে সে মা'কে জড়িয়ে ধরে। বীরুর হাতে জিলাপি দেখে সন্ধ্যার রাগ আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়। বীরুর হাতের জিলাপি ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয় সে। বীরুর আধ খাওয়া জিলাপি রাস্তার ধূলায় গিয়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে। রথু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যা নিজেকে সামলে আবার রথুকে প্রশ্ন করে, -" আগের মাসে বীরাকে যখন ডাক্তার ঘর লেগলি তখন কোথায় ছিলিস? এখন পিরিত দেখাতে আসেছিস?"

- "তখন হামার ঠিন একদম পয়সা ছিল নাই সন্ধ্যা, বিশ্বাস কর.. আমি তরাকে নিয়ে যাতে.."

-"দু পয়সার মুরাদ নাই আর নিয়ে যাবিস? খাওয়াবিস কি? একটাকে তো মরালিস ঐ করে... আরেকটার জীবনটা না লিলে শান্তি নাই তর?" সন্ধ্যা আবার ঝরঝর করে কেঁদে ওঠে। রথু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। শান্তনা দেওয়ার ও কোনো ভাষা খুঁজে পায় না সে। বেরোনোর আগে বীরুর কাঁধে হাত দিতে যায় সে। সন্ধ্যা ছিটকে পিছিয়ে যায়। রথু বুঝতে পারে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। বিয়ের পরপরই বুঝতে পেরেছিল সন্ধ্যার অভিমানী মনের কথা। এত সহজে সন্ধ্যার অভিমান ভাঙবে না রথু বুঝতে পারে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে রথু আরেকবার সন্ধ্যার কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। রাজেশ চাষমোড় অব্দি যায়

সাইকেলে রথুকে ছেড়ে দিতে। বাসে ওঠার আগে রাজেশ রথুর হাত ধরে বলে,

-" দিদির রাগটা তো হামরা জানি বহনোই। উটা বেশিদিন থাকবেক নাই। তুমি এক কাজ করঅ ন, খুলির মুড়ায় চপ পকড়ির দোকানটা ঘুরে খুলঅ, এখন সবাই গাঁয়ে ঘরে আছে, ভালোই চলবেক.."

-"পুঁজিয়েই যে নাই হে অতনা। দেখছি তাও, কোনো ত করতেই হবেক।"

-" দেখঅ নঅ,ধীরে সুস্থিরে কর ঠিক দাঁড়াই যাবেক। হামি কদিন বাদে দিদিকে আরেকবার বইলব্য। সরস্বতী পূজার আগেটাই তখন পোঁছাই আইসব উয়ারাকে।"

রথু মাথা নেড়ে শেষ বেলার বাসে উঠে পড়ে। মাস ছয়েক আগের একটা দৃশ্য চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে। আগের বছর একরকম জোর করে সন্ধ্যার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বড় ছেলে হীরুকে নিয়ে সুদুর চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়েছিলো। করোনা কালে দীর্ঘ একমাস লক ডাউনে আটকে থেকে হাতের জমা টাকা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে বাকি টাকা চাইতে গিয়ে বারবার ঠিকাদারের কাছ থেকে ফিরে আসতে হচ্ছিল। ট্রেন বন্ধ,বাড়ি ফেরার ও উপায় নেই। দৈবক্রমে একদিন ঝাড়খণ্ড গামী একটা ট্রাক পেয়েছিল। পাশের গ্রামের কিছু জনের সঙ্গে হীরুকেও সে ট্রাকে তুলে দিয়েছিল। ভেবেছিল ঠিকাদারের থেকে বাকি পাওনা নিয়ে সে একবারেই বাড়ি ফিরবে। উড়িষ্যা পার হওয়ার সময়ই অন্য আরেকটি ট্রাক হীরুদের ট্রাকে এসে ধাক্কা মারে। ট্রাকে যারা ছিল কেউ বাঁচেনি। হীরু সমেত আরো চার জন নাবালকের চেহারা শনাক্ত করা যায়নি। দুদিন পর রথু হীরুর প্রাণহীন শরীরটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সন্ধ্যা হীরুর শরীরটা আঁকড়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ। দুদিন সন্ধ্যার মুখ থেকে কোনো কথা বার হয়নি। তিনদিনের দিন বীরুকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। রথু আটকাতে গেলে সন্ধ্যা একটাই কথা বলেছিল, -" একটার জীবন তুমি নিয়েছ, বীরাটার জীবন আমি তুমাকে লিতে দিব নাই।"

রথু বীরুকে ছিনিয়ে নিতে গেলে সন্ধ্যা মরা ছেলের দিব্বি দিয়েছিল। রথু আর ওদের আটকাতে পারেনি। মাঝে বেশ কয়েকবার রাজেশের ফোনে ফোন করেছে, সন্ধ্যা কথা বলতে চায়নি। মাঝখানে একটা রব উঠেছিল সরকার থেকে বাইরে যাওয়া সব শ্রমিককে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে ব্যবসা করার জন্য। এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে বাকি যা ছিল প্রায় সব শেষ করে ফেলেছিল রথু। পঞ্চাশ হাজার কেন,পঞ্চাশ টাকাও পায়নি সে।

কয়েকদিন আগে রাজেশের ফোন পায় রথু। বীরুর জ্বর-কাশি।

চারিদিকে চলা আতঙ্কের কথা ভেবে রথুর শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছিল। যাবো যাবো করেও শেষে সন্ধ্যার দিব্বির কথা ভেবে রথু যেতে পারেনি। পাছে বীরুর অমঙ্গল হয়। যা টাকা বাঁচিয়ে রেখেছিল পুরোটাই রাজেশের হাতে গিয়ে সে তুলে দিয়েছিল। রাজেশকে বলেছিল সন্ধ্যাকে যেন না বলে। বলা যায় না, রথু টাকা দিয়েছে শুনে সন্ধ্যা যদি সেই টাকায় না নেয়।

কয়েকদিন আগে রাজেশের ফোনে খবর নিয়েছিল রথু। বীরু এখন পুরোপুরি সুস্থ, সন্ধ্যাও আগের থেকে অনেকটা স্বাভাবিক। কাল বাদে পোরশু মকর। ঘরের কাছে শিলাইয়ে এত বড় মেলা।রথু আর নিজেকে আটকাতে পারেনি। জামা প্যান্টগুলোর পকেট হাতড়ে একটা পঞ্চাশ আর দুটো কুড়ি টাকার নোট পেয়েছিল। সেগুলো জামার পকেটে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ভাবেনি এরকম একটা ঘটনার মুখোমুখি তাকে হতে হবে।

বাড়ি ফিরেই রথু ভাবতে থাকে। ঘরের পেছনে পুরোনো ঠেলা গাড়িটা রাখা আছে। বাইরে যাওয়ার আগে রথু ঠেলায় করে আশপাশের গ্রামে ছোলা, বাদাম, ঝালমুড়ি, আলু কাবলি বিক্রি করত। রথু সেটাই আবার শুরু করবে ভেবে নেয়।

পরদিন সকালে রথু ঠেলাটা নিয়ে আলিম মিস্ত্রির দোকানে যায়। আলিম সব দেখেশুনে ছশো টাকা খরচ হবে বলে। রথুর চোখে আরো একবার দুঃস্বপ্ন এসে ভিড় করে। শেষমেষ আলিমের সঙ্গে মিলে নতুন ফ্রেমের বদলে একটা কাঠের ঠেকনা লাগিয়ে ঠেলাটাকে আগের অবস্থায় দাঁড় করায়। মেলার শেষে এসে দুশো টাকা দেবে বলে রথু। আলিম বলে দেয় রথুকে ঠেলায় বেশি মাল যেন সে না তোলে।

বিকেলে সমস্ত জরুরি জিনিস এনে ঘরে রাখে রথু। কাল সকাল থেকেই শিলাইয়ের মেলা। প্রচুর ভিড় হবে। রথুর দুচোখে রাতভর ঘুম নামে না। কাল ভালো বিক্রি বাটা হলে ঠেলাটাকে ভালো ভাবে সেরে আবার আগের মতো ব্যবসা শুরু করবে সে। তারপর সন্ধ্যা আর বীরুকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। এসব ভাবতে ভাবতে রথুর দু চোখে ঘুম নেমে আসে।

পরদিন সকাল সকাল মকর স্নান করে অল্প মুড়ি খেয়েই রথু ঠেলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছোলা, বাদাম, আলু কাবলি, ফুচকা সহ তেলে ভাজার ও বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বেরিয়েছে সে। শিস দিতে দিতে রথু প্যাটেল মারে। সন্ধ্যার আগেকার হাসিমুখটা তার চোখের সামনে ভেসে

ওঠে, উঠোনে ছুটে বেড়ানো বীরুকে দেখতে পায় রথু। হঠাৎ ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ। রাস্তার ডানদিকে বড়ো একটা গর্ত ছিল। নিজের মনে ঠেলা চালাতে গিয়ে রথু খেয়ালই করেনি। যেদিকে চাকার ওপর কাঠের ঠেকনা লাগানো সেদিকের চাকাটাই গর্তে পড়েছে। রথু ছুটে সিট থেকে নেমে আসে। সেদ্ধ আলুগুলো বেশ কয়েকটা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভাজা ছোলা বাদাম অনেকটা পড়ে গেছে। রথু ছুটে এসে ছোলা, বাদামের থলিগুলো নামায়। আলুগুলো তুলে আবার স্টিলের গামলায় রাখে। তারপর কাঠটাকে আবার আগের জায়গায় বসানোর চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টায় সার হয়। লোহার ফ্রেমের জায়গায় কাঠের ক্ষমতা কতোটুকু! মালপত্র চাপাতেই আবার কাঠটা সরে যায়। এবারে আগের থেকেও বেশি পরিমানে ছোলা বাদাম ছড়িয়ে পড়ে, সেদ্ধ আলুগুলো এবার গতি বাড়িয়ে আরেকটু দূরে গড়িয়ে যায়। সূর্য এখন মধ্য গগনে। মেলা দেখতে যাওয়া লোকজনের বাইক পাশ দিয়ে হুশ হাশ করে বেরিয়ে যায়। রথু ঘামতে থাকে। বীরুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আবার। প্রাণপণে সে কাঠটাকে আগের জায়গায় বসানোর চেষ্টা করতে থাকে..

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - জয়িতা সরকার
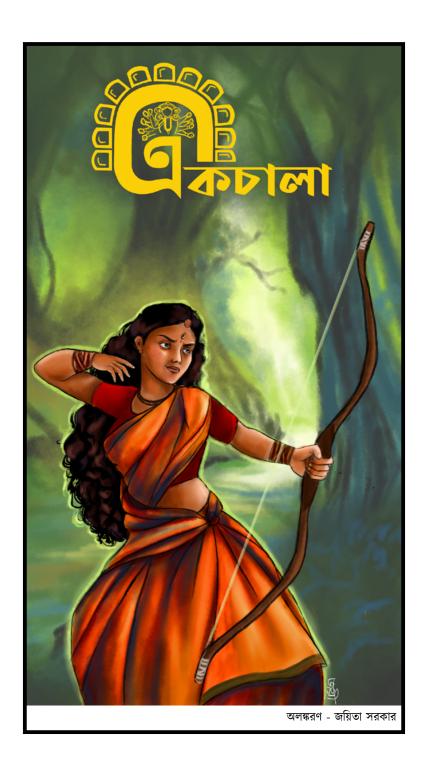
কুড়োনো বেলার গান

অমিতাভ দাশশর্মা

আমার সেই যে শিশু গাছ-
ভিতর বাগানে ছিল মায়ার ছায়ায়।
শব্দের ব্যাকরণে দখল ছিল না
তবে, প্রত্যয় শিখেছিল খুব।
আকাঙ্ক্ষা সার আর আশা-জল সিঞ্চনে
বাড় ছিল, বাড়াবাড়ি কিছুই ছিল না।
ঐ গাছের সঙ্গে যত খেলা
কত রোদেলা দুপুর, মেঘলা বিকেল
আর মনকেমনের ভালোলাগা—
ঘুরে ঘুরে নানা সুরে
বুনে বুনে চলা যত রূপকথা
চঞ্চল চঞ্চল চড়ুয়ের দল
চন্দন ফোঁটা দিয়ে সাজানো সকাল
ছড়িয়ে জড়িয়ে ছিল, ছিল আমাদের

আলকাতরার মত বিঘন সে রাতে
সেই গাছ খুন হল —
এমন এক প্রেমিকের হাতে
যার চোখে চামড়া ছিল না,
তাই বুঝি দেবী-ঘট
অনায়াসে ক'রে নিল পানের পাত্র।
দেবী তার পরম সহায়।
লালমাথা অন্ধকার —
পেয়ে গেল আলো আবডাল।
শীৎকারে ঢেকে গেল শাঁখের আওয়াজ
লক্ষ্মীপেঁচার মুখে নুড়ো জ্বেলে
বাদুড়েরা করেছিল উল্লাস—
পুড়ে যাচ্ছিল শুনে আমার শ্রবণ।
আমার নিহত গাছ বুক ক'রে

পুজো-ঘর থেকে দূরে, আরও দূরে
সরে সরে গিয়েছি ক্রমশ...

বুকের মধ্যে মৃত গাছ
কখন যে হয়ে গেছে রক্ত-মাণিক!
তার গর্বে তখন অন্ধ আমার
মাটির ওপর কোনো পা পড়ে না।
ভেসেই থাকি, আর ভেসেই চলি
আকাশ-ফুলের ভরা বাগান থেকে
লুটেপুটে নিতে থাকি স্বপ্ন-মধু।
তার মৌতাতে শিথিল আমাকে
ফাঁকতালে পেয়ে গেল রাতের বাঘিনী।
আমার লবণটুকু চেটে নিয়ে
আমাকে সে ফেলে গেল
এমন বিপিনে, যার অন্তরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি ওড়ে।

দুই হাতে মুঠো ক'রে ধ'রে
দেখেছি সেগুলো সব ঠুনকো কাচের।
ছুটে ছুটে হয়রান আমার দু'পায়ে
কেমন জড়িয়ে গেল সন্ত্রীতা হরিণশাবক
ওদের হৃদয় আমি কখনও খাইনি
শুধু, টুঁটিতে শ্বদন্ত গেঁথে তেষ্টা মিটিয়েছি।
যদিও খিদের মুখে
পাখি ধ'রে খাওয়াটাই ছিল দস্তুর
কিন্তু, পাখির নখ বিঁধে গেল আকাঙ্ক্ষায়
দিবসগন্ধা ফুটে ওঠে —
গোটা বনভূমি আর শেষতক বন-ই থাকে না,
সটান সেঁধোয় গিয়ে ফ্রেমের ভেতর...

তাই, পাখি ধরা ফেলে
বের হয়ে আসি বন থেকে।
নগরের পথে পথে ঘুরে
রক্ত-মাণিকটাকে জনে জনে দেখিয়ে বেড়াই।
রীতিমতো অনেকেই মুদ্রা ছুঁড়ে দেয়...
দিন ওঠে, দিন নামে

ফ্রেমহীন আমার আকাশে,
আলো ঢলে আসে
আমি আজও মুদ্রা কুড়োই...

নিষেধ মুদ্রা।

দিশা

সাবর্ণ্য চৌধুরী

তারাদের চলাফেরা হয়ে গেলে
বস্তা ভরা আলো জ্বলে ওঠে,
হাল্কা শিশির আর এক উঠোন শিউলি;
পা ফেলতে পারি না আমি, সামলে চলি
মাড়িয়ে ফেলার ভয় করে খুব;
এই মাটির উঠোনে শরৎ খেলে গেছে আগেই
পা ভিজেছে, এবার শুধু মন ভেজার অপেক্ষা।

জলের মধ্যে অনেকগুলো তরঙ্গ হয়,
একটা একটা করে আসে আর পাড়ে মিশে যায়;
তোমার আমার পথ চলার মতই খানিকটা,
গভীরে যেতে খুব ভয় হয় আমার
ডুবে যেতে রাজি, তবে ভেসে ওঠার কামনাকে ভয় করে
একটা শ্যামাপোকা এনে দিতে পারো
আগুনে আহুতি দেওয়ার সাহস নেব শুধু!

ঘুমঘোরে পাড়ের কান্না শুনেছি,
আগেও শুনেছি যদিও, শূণ্য হাতে পাড়ে বসে কেঁদেছি
কত জলদস্যুর আঘাতের কান্না;
লুটেছে বার বার, আমিও পালিয়ে বেড়িয়েছি পাড়ের থেকে
খুঁটিপোঁতার ভয়টা আমার ভীষণ রকম;
রাতের লুণ্ঠন শেষ হয়েছে খানিক আগেই,

চপচপে রক্তে ভেজা মাটির উপর দাঁড়িয়ে একপ্রস্থ
হতাশা ঝেড়েছি; আর ভেবেছি মা দূর্গার মতো শক্তি পেতে
শরতের কাছে কী অর্ঘ্য সাজাই;
একটা জোনাকি এনে দিতে পারো
অন্ধকারেও দিশা খোঁজার উপায় জেনে নেব!

শূন্যতার ওজন

অরুন্ধতী রায়

অন্ধকারের গন্ধ মাখা হাত ছুঁয়েছে চাঁদ যে,
সাদাকালো গুলিয়ে ফেলে ছাই করেছে আজ সে।
না মেটানো হিসেবগুলো রাতজাগা স্বপ্ন হয়ে ফিরে
গভীর যত অল্প কথা লুকিয়ে গল্প শেষের পরে।
মাথার উপর ছাদ খুঁজেছে, তার ওপরে তারা...
ছুঁয়ে থাকার কথা ভুলে হাত ছেড়েছে যারা।
আকাশ হটাৎ সরছে বুঝি মাথার ওপর থেকে;
ভাঙছে বাসা, মিথ্যে আশার ঘোলাটে মেঘ ঢেকে।
পাগলা হাওয়া ধাক্কা দিয়ে সাজানো তাসের ঘরে,
সুর ছাড়া সব গান উড়েছে কালবোশেখি ঝড়ে...
লেখার পাতায় আঁকিবুকি, মনখারাপের ধুলো
এলোমেলো ছড়িয়ে গেছে সহজ হিসেব গুলো।
রং ফ্যাকাসে, ঘুন ধরেছে, টুকরো খসে পড়ে;
পুরোনো ক্ষত দেখলে ছুঁয়ে গভীরে রক্ত ঝরে।
স্বপ্নে ঠোঁটে হাত ছুঁয়েছে অবুঝ কোনো দাবি
ছেড়ে আসার তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছে চাবি!
যোগ বিয়োগের টুকরোগুলো মুঠোয় বন্দী রেখে
অবসাদের ওজন বেশি আকাশ ভাঙার থেকে।

নদী

সুব্রত কুমার আচার্য্য

আমি একটা নদীকে বয়ে যেতে দেখতে চাই
আমার বুকের উপর দিয়ে
কী জানি
কেন তাকে হতে হবে নদী
এই শান্ত শুষ্ক রুক্ষ উপত্যকার ভিতরে
বইবে চিরে চিরে
গলাবে আছে যত জমানো ভালোবাসা
বরফের
তার কলকল ধ্বনি
ভাঙবে আছে যত বেষ্টনী মনপাহাড়ের

কেমন হবে সেই নদী
কী জানি
হয়তো একটু খরস্রোতা
অনেক উঁচু পাহাড় থেকে পড়বে ঝাঁপিয়ে
আমার বুকে
তার আত্মঘাতী প্রবঞ্চনাকে
নেব বুক ভরে অনেক আশায়
চলে যেতে দেব বয়ে
লজ্জানিমগ্ন হয়ে
থাকবো পড়ে আমি মহাকালের মতো শুয়ে

কী জানি
সে কেমন নদী হবে
মনের দিগন্তে পাতবে আঁচল তারায়
ভাঙবে আমায় উল্কা-আঁচড়ে
বা চোখের চপলতায়
তীব্র জোয়ারে উঠবো মেতে আমি
আবার কোনো নতুন সভ্যতায়
সময় হলেই সে নেবে টেনে আমায়
কোনো অনাহূত বন্যায়
বা ভ্রমের বালিকাদায়

ডুববো আমি আবার
তার ছন্নছাড়া, বিষণ্ণ কোনো ভাটায়

আমিও যেতে চাই বয়ে
অন্তঃসলিলা হয়ে
তার পাথুরে বুকের নদীখাত ছুঁয়ে
ধীরে ধীরে
আমার মতো, তাকেও বিদীর্ণ করে

এভাবেই বয়ে যাবো
সময়ের সর্পিল বলয়ে
একে অপরের হয়ে, বা না হয়ে।

চর

পিয়া সরকার

আমাদের ভাঙাচোরা পথ শেষ হলে,
নক্ষত্র নিশান দেয় গোপনে।
নদীর বুকে সাজো সাজো রব,
লণ্ঠনে লণ্ঠনে মাতামাতি
জলদস্যুর দল পতাকা উঠায়
লুণ্ঠন শেষ। ভোর হলে ওরা ঘুমঘোরে যাবে।

তুমি আমি সন্তর্পণে ধার ঘেঁষে হাঁটি,
জলাজমি মচ মচ করে, নদীতে কুমীর
এভাবেই তো পালিয়ে থেকেছি কতদিন,
হাতে উঁচিয়ে নি খড়্গ, তপ্ত রক্তে ঝনঝন কাঞ্চন।
সূচাগ্র বর্শার ফলায় মাছ গেঁথে খেয়েছে গৃহী।
আমরা কপটে হেসেছি। আঙুলে আঙুল বেধে গেলে বুকে পলি
জমে যায়। চরে বাসা বাধে বাড়ি।

রাত আর দিনের হিসেব মেলে না বলেই
ঘুম ভেঙে বারবার দস্যু হই। শিয়রে কোলাহল করে মেছো গন্ধ,
তেলচিটে কড়াই আর সাবান-মাখা একজোড়া দস্তানা।

ভোর হলে আমরা ঘুমঘোরে যাই।
বাড়িতে বাড়িতে মৎস্য-ব্রত উদযাপিত হয়।

ভীরু

পিয়া সরকার

তুমি বললে,
আমি তোমার, অথবা তার, কিংবা তার

এ অরণ্য মদালস হস্তি-হস্তিনীর,
গাছেরা এখানে দেওয়াল বই তো নয়,
আকাশে চাঁদ, সলমা-চুমকি তারা
আসলে আলেয়া জলাভূমির,
জ্বলে যায়, অথবা নিভে জ্বলে ওঠে
সকলে স্বাধীন

তুমি বললে এ তোমার বড় ভুল
এ ঘড়াতে রাখো শরীর,
দু-চারটি মন্ত্র,
অথবা ফুল-বেলপাতা,
সহজ উপচে পড়া যায়
বৃথাই কঠিন করে ভাবো

তুমি বললে লাগাম ধরো সাহসিনী,
এ পথ ধুলোট,
দাবড়ে নাহয় চাবকে যেভাবে হোক
চালাও অশ্বমেধ
মনে রেখো, মণিটি মুকুটে স্থির থাকা চাই
নীলকান্ত, উজ্জ্বল
আমি বাধ্য তাপসী,
ঘরবার করি,
ঘোড়া জুতি,
ঘড়া ভরি,
মুকুট-ও সামলাই

তবু, সুযোগ পেলে অরণ্যে নিখোঁজ সুড়ঙ্গের
দেওয়াল ভরে আঁক কাটি, রঙেতে ছোপাই
দু পা পিছিয়ে চোখ ভরে দেখি,
যদি ফের ডেকে ওঠে বিলুপ্ত ডোডো!

কবিতার জন্ম

প্রদীপ্ত ঘোষ

কপালে জ্বলজ্বল করছে নিষেধের লাল আলো ।
ওর ওপারে যাওয়া মানা ;
এতটুকু ব্যস, আর নয় -
এখানেই ইতি।
পঙক্তি শেষ। যতি।

মায়ার পিছল পথ বলেছিলে বারবার হেসে।
সরণি বেঁকে যাবে জানা,
তবুও যে হেঁটে যাওয়া... লোভ।
কথাদের অনন্ত খেই।
বলেছিলে, লাভ নেই।

বন্ধ্যা মেঘ বয়ে যাবে, ভেজাবে না মাটি।
ব্যর্থ চাতক হতে ভালো লাগে?
বলেছিলে, এই থাক। আর নয়।
এরপর যা কিছু - অলীক।
বেশ তবে ; কবিতা জন্ম নিক।

কপালের লাল আলো
মায়াগলা পথ
বাঁজা মেঘ
এই সব কিছুই কি নয়?
কতবার ফিরিয়ে দিলে,
ডুবে গেলে, হেরে গেলে
কবিতার জন্ম হয়?

শহরে শীত নামে
সাবর্ণ্য চৌধুরী

শহরের যে দিকটায় কেউ যায় না
সেই দিকেই তোমার সাথে হাঁটতে যাওয়ার কথা ছিল;
একটা শীত শীত ভাব, কিছু সবুজ ঘাস
আর অনেকটা শিশিরে পা ভিজিয়ে নিয়ে
একবার তোমার চোখে তাকিয়ে ও মনের গভীরতা মাপার ইচ্ছা ছিল আমার;
তুমি জিগিয়েছিলে ওই দিকেই কেন? লোক থাকে না বলে?
কেউ যায় না ওপাশে, নাগরিক ক্লান্তি নেই;
ক্যাকোফোনির ক টুকুও না;
অনেকদূরে যেতে হবে না আর তোমার দিকে তাকাতে।

তুমি খুব সুন্দরী জানো!
হয়ত সবাই বলেছে আগে, কিন্তু কেউ বুঝি এক গোছা রঙ্গণ এনে
তোমার খোঁপায় গুঁজে দেয়নি কখনো;
আমি জানি, কেউ দেয়নি;
এই রঙ্গনের রঙের মতো অমন গূঢ় ভালোবাসা আর কারই বা আছে বলো!
জানি এসব শুনে লজ্জা পাচ্ছ, কথা ঘোরানোর অজুহাতে চুপ করে আছো;
দুজনের মাঝে এই যে নিস্তব্ধতা, সেটা যেন প্রাণ দিচ্ছে আমাদের;
সময় পাচ্ছি দুজন দুজনের ঘ্রাণটুকুতে বুক ভরে নিতে।

হাজার হাজার লোকের ভিড়ে একা হওয়া যায় বলো?
ক্রমাগত কথার আওয়াজ, কুকুর গুলোর খিদের চোটে ডাক আর পরের পরে গাড়ির হর্ণ,
কীভাবে মাপব তোমার মনে গভীরতা?
এই শান্ত একলা জায়গাতে কেমন একটা নির্লিপ্ততা আছে,
আছে অনেকটা শান্তি, আর তোমার আমার চাহনি;
সূর্য নামবে, আমরাও বাড়ি ফিরব আস্তে আস্তে;
শহরে যে হাওয়া বয়না কখনো সেই হাওয়া একবার এসে হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে;
সহসা কিছু উষ্ণতা বিনিময়ের অছিলায় কাছে টানব তোমায়;
তুমি আসবে, আমার চোখে দেখবে আর পথ হাঁটবে নতুন এক গন্তব্যে;
ঝিঁঝিঁর ডাকে, আর তোমার কথায় এভাবেই বারে বারে শীত নেমে আসুক
এই শহরে, এই মনে; বারে বারে।

অনুপস্থিতির সুখ (The bliss of absense)

জোহান উলফগাং ফন গোয়েথে

(অনুবাদঃ সাবর্ণ্য চৌধুরী)

হে যৌবন, শুদ্ধতম আনন্দের রশ্মি
পান করো তোমার প্রিয়জনের চোখ থেকে সারাদিন,

আর রাতের আঁধারে তার ছবি আঁকো,
কোন প্রেমিকের জানা নেই ভালোবাসার ভালো নিয়ম কী
তবু নিগূঢ় ভালোবেসে যায়,

যখন সে চোখের দৃষ্টি থেকে অনেকখানি দূরে।

শাশ্বত শক্তি, দূরত্ব, সময়,
যেন তারার অসীম শক্তিসম,

শান্তির সেই আলতো রক্তর দোলা,
আমার ইন্দ্রিয় কোমলতা চুরি করে,
তবুও আমার বুকটা হালকা লাগে,,

আর নিত্যই আমি সুখী হই আরো।

যদিও আমি তাকে ভুলতে পারি না,
তবুও আমার মন মোহমুক্ত,

আমি শান্তভাবে ভেসে যেতে পারি;
অপ্রত্যাশিত মোহ
আকাঙ্ক্ষা আরাধনায় পরিণত হয়,

আমার ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়।

মেঘ ঘনায় না, আলো আসে আর,
ঔজ্জ্বল্যে ভাসায় ইথারের অঞ্চল।

সূর্য যখন নিজের দিকে টানে আমায়,
যেমন আমার হৃদয় জুড়ে প্রশান্তি খালি।
হিংসা আর শঙ্কা থেকে মুক্ত আমি,

আমি তাকে একা ভালবাসি!

মৌন-শিকার

সুদীপ্ত নস্কর

সময় বাঁকে
ছাড়লে যাকে
কি হিল্লোলে সে তোমাকে; ভুলতে চেয়েও, ভুললো না।

নষ্ট ফাটা
তকমা আঁটা
এঁফোড় ওফোঁড় তাপ্পি সাটা; ছিন্ন হৃদয়
ব্যর্থ-ক্রুশে উলবোনা।

ইউটোপিয়া
স্নিগ্ধ প্রিয়া
ঠোঁট ছোঁয়ানো জ্বর ফোবিয়া। জ্যোৎস্না মাখা আর্সেনিক।

হায় হেরি প্রাণ
ঘায়েল জওয়ান
গাইছে দ্যাখো পুরুষ-মহান! মেজাজ যেন দার্শনিক।
দুর্বলতা
ও সমঝোতায়
যাবজ্জীবন কবর পোতা। আঙুল আঙুল ভুল-ত্রুটি।
এক অভিনয়
শান্ত-বিনয়
অফিস পাড়া দশ থেকে নয়। শো'য়ার আগে ভাত রুটি।
চলছে কাকা
কলের চাকা
দগদগে ঘা' আঘাত ঢাকা। জীবন শেখায় ভণ্ডামি।

সর্বনাশের
এ সার্কাসে
ব্র্যাম স্ট্রোকারের উপন্যাসে মৌন শিকার হই আমি।

কলরব

প্রদীপ্ত ঘোষ

পায়ে পায়ে জড়িয়েছে সুতো,
থাকবার শুধু ছলছুতো ;
তুমিও বোঝোনি অভিপ্রায়?

সংযম থেকে বিচ্যুত,
ছন্দের লয় বড় দ্রুত...
নীরবেও চোখেদের সায়।

কথার টানেই আরো কথা,
হেতু নেই, তবু কথকতা।
অলক্ষ্যে দূরত্ব কমে;

মনের মিথ্যে সমঝোতা,
চাপা দেওয়া বৃথা আকুলতা...
সব তাল মেলে না যে সমে।

তবুও হাজারো অনুভূতি,
মন গড়া কত প্রস্তুতি!
এরা কি সবই মিছে তবে?

সহসা পলাশে লাজবতী
ভুলে গিয়ে নিষেধ বিরতি,
তুমিও মেতেছ কলরবে।

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
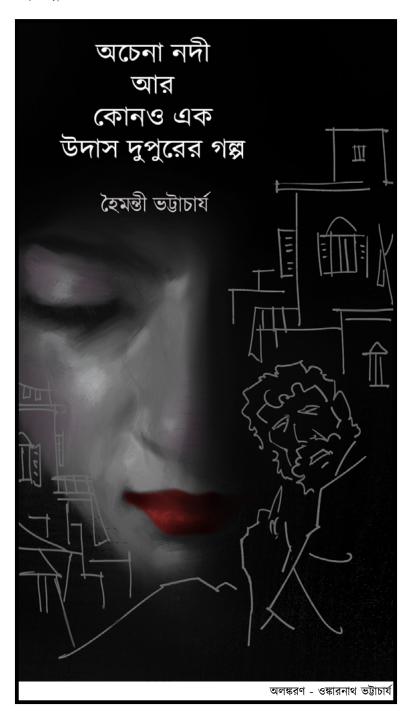
তিন ইঞ্চির ভোঁতা ফলা। তার ওপর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মত লাল মরচে। বাকি যে ধাতব অংশে এখনো আস্তরণ পড়েনি, বেলা এগারোটার সূর্য তাতে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। চামড়ার নীচে থাকা মেদকলার পরত ভেদ করে শিরা দিয়ে যে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, সেটা সটান ফুঁড়ে দেবে। ভোঁতা ছুরিতে উঠে আসবে কাটা কাটা মাংস।

"মেরে ফেলব শালা, খুন করে ফেলব" খসখসে শীতল কণ্ঠ ঠিক ঘাড়ের কাছে। চমকে উঠে একলাফে সরে গেল বছর পঁচিশের ছেলেটা।

চায়ের দোকানের একদিকে বিড়ি ধরানোর দড়ির জ্বলন্ত লাল প্রান্তটা তখনও দুলছে।

দাঁড়িয়ে বসে থাকা লোকগুলো হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

"শালা পাগলা!"

কানে পয়সার মত গোল ঘাওয়ালা কুকুরটা একবার তাকিয়ে আবার একটা বৃত্তের মত ঘুমিয়ে পড়ে রাস্তার একপাশে।

লোকটা একবার ছুরিটা শূন্যে ঘুরিয়ে চোখে গনগনে আক্রোশ নিয়ে সবার দিকে তাকায়, তারপর খসখসে গলায় বলে, "খুন করব।" ছোট্ট ছোট্ট ফেনার টুকরোর মত থুতু ছিটকে পড়ে চারপাশে।

পরণে মধ্যবিত্ত পোশাক, গালে বড়জোর দিন তিনেকের বাসী দাড়ি ছোট্ট ছোট্ট আলপিনের মত উঁচু হয়ে আছে। লোকটার মস্তিস্ক বিকার আব্রু ভুলে যাওয়ার স্তর অবধি পৌঁছয়নি। যতটা বোধের আলো বাঁকা রেখায় মনের ঘোলাটে দিকে পড়ছে তাতে একটা অব্যক্ত জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে । লালা লেগে থাকা কালচে ঠোঁটে, জমাট হলদে পিঁচুটিপড়া চোখের লাল শিরাগুলোয় রাগ খোদাই করা।

গরম সসপ্যানে ফ্যাটানো ডিম ছড়িয়ে পড়ে লোভনীয় গন্ধ ছড়ায়। তার ওপর পাউরুটির টুকরো এসে বসে।

পাগলটা লোভীর মত চেয়ে থাকে। তারপর ছুরিটা জামার পকেটে রেখে একটা ভাঁজ করা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে, খসখসে গলায় বলে "একটা ডিম রুটি''।

পায়া আলগা হয়ে টলটল নড়তে থাকা বেঞ্চে বসতেই পাশের লোকগুলো সিঁটিয়ে সরে যায়। ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা গপাগপ খায়। জামার বুক ভিজিয়ে জগ থেকে আলগোছে জল খায়। তারপর গটগট এগিয়ে যায়।

গোল হয়ে শুয়ে থাকা কুকুরটা। লোকটা হঠাৎ একটা লাথি মারে ওর ঘুমন্ত গায়ে।

"কেউউই গররর" শ্বদন্ত বেরিয়ে আসে হিংস্রভাবে। মুখোমুখি দুটো ফুঁসতে থাকা চোখ। মুহূর্তের মধ্যে কামড়ে ধরেছে পাতলুন। আর একটু গভীরে গেলেই মাংসের ওপর গেঁথে যাবে ধারালো দাঁত।

"এই যা যা", গরম জল ছিটকে এল খানিকটা। সরে গেছে কুকুর। লোকটা তখনও কাঁপছে রাগে। তারপর রাস্তায় বসে পড়ল।

"পিকনিকে গিয়ে নিজের বাপটাকে চোখের সামনে ডুবে মরতে দেখল যে নদীর জলে। তাতেই মাথাটা গেছে।"

"বাপটার কতা আর বলার নাকি? স্বভাব চরিত্তির যা ছিল! বাইরে কত যে নচ্ছারপনা করে বেড়াত।''

"তবু বাপ তো।"

"জ্যান্ত যখন ছিল, তখন তো মারপিট হত বাপ ছেলেতে।"

"অন্য দুই ছেলে দিব্যি দাঁড়িয়ে গেছে। এটাই এমন।"

পাগলটা তখনও বসে। রুক্ষ চামড়ার ওপর নখ দিয়ে চুলকোনোর সাদা সাদা আঁচড়ের দাগ ।

সূর্যটা আরো গনগনে এখন।

***

কড়াতে পুঁইশাকের তরকারিটা ধরে যাচ্ছে তলায়। চড়চড় আওয়াজ হচ্ছে।

"ওরে কাজল, দেখ রে। আমি জল দিয়ে দিয়েছি। নামা এসে।"

বাড়িওয়ালি কল্পনাদির চিৎকারে কাজল তাড়াতাড়ি এল। একফালি বারোয়ারি বারান্দার ওপর বসানো ছোট্ট স্টোভের ওপর থেকে সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা সাবধানে নামাল।

আঙুলে এখনো কাঁচা নেলপলিশ। কাজল ফুঁ দিয়ে শুকোতে গিয়ে দেখল কয়েকটা নখে পাশের দিকটা অল্প ঘেঁটে গেছে। দড়িতে মেলা নাইটিগুলো সাবধানে কাঁধে ফেলে নীচের দিকে চোখ গেল। টানা রিকশা যাচ্ছে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দিকে। পিলপিলে পিঁপড়ের মত ভিড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায়। ঠিক উল্টোদিকে ছোট্ট গুমটি বিড়ির দোকানের সামনে পরপর গুটখার প্যাকেটের স্ট্রিপ দোল খাচ্ছে। সামনে কমলি, সীতাদি, শবনমরা দাঁড়িয়ে। কয়েকজন আসছে, ফিসফিসিয়ে কথা বলছে, দরে পোষাচ্ছে না, অন্য দরজায় চলে যাচ্ছে।

কাজল স্নান সেরে বিকেলে নামবে। দু'শ টাকা পার ঘণ্টা। প্রথমে পাঁচশ বলে যদিও, তারপর দর দস্তুর চলে। খদ্দের আড় চোখে ওর ক্ষেতের কপির মত ঠাসগোল বুক, টাইট করে পরা শাড়ির নীচের স্তর পড়া চর্বির পেট মেপে নেয়।

"কাজল চ্যান সেরে নে, মেথর আসবে আজ।"

কাজল সরু বারান্দা দিয়ে বাথরুমের দিকে এল। আজ হঠাৎ মেঘলা, বেলা বোঝা দায়। কুলকুলে ঘাম হচ্ছে এদিকে। পাঁশুটে আকাশের গায়ে কালশিটের মত কয়েক টুকরো মেঘ। ওদের পাঠানখালীর বাড়ির উত্তরদিকে আকাশমণি গাছের ওপরে মেঘ দেখলেই চটপট শুকোতে দেওয়া বড়ি তুলে নিত। রক্ষাকালীর থানের সামনে জুয়ো খেলতে বসা হারানদারা বাড়ি যেত তড়িঘড়ি। এখন বোন কী করছে! মনে হয় সাইকেল সমেত লঞ্চে নদী পার হচ্ছে কলেজ যাবার জন্য। কাজল মনে মনে হিসাব করতে লাগল পুজোর আর কদিন বাকি। গিয়ে কদিন থাকবে বাড়িতে। মায়ের মাড়ির ঘা থেকে মুখ ফুটবলের মত ফুলে গিয়ে চোখ ঢেকে দিয়েছে। বোন ছবি পাঠিয়েছিল। কী হয়েছে কে জানে! গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে। জমানো টাকাগুলো সব হয়ত খরচ হয়ে যাবে।

নীচে গোলমাল। কাজল থমকেছে। পুজোর বাঁশ পোতা হচ্ছে।

দূর্বারের দিদিরা আছে তদারকিতে। সকলে চাঁদা দেবে। কাজল পঞ্চাশ টাকা ধরে রেখেছে।

নীচে হলটা কী! চোখ পেতে দেখে কাজল যা বুঝল রেট নিয়ে গণ্ডগোল। "আমরা বেইমানি করি না", বাংলাদেশি মেয়েগুলো চেল্লাচ্ছে।

"ওই ওই মোবাইল কেড়ে নিয়ে রাখ।"

কাজল কাঠ হয়ে গেল। খোকনের গলা। ঝামেলা চলুক, থামলেই গটগট করে উঠে এসে কাজলের ঘরে হুজ্জুতি শুরু করবে। টাকা নিজেই বের করে নেবে বালিশের তলা থেকে। অবশ্য এখানকার মেয়েদের বাঁকা গোছের কাস্টমারের হাত থেকে খোকনরাই বাঁচায়। কাজলের ঘরেই তো একবার কী ঝামেলা। খোকনরাই সামলেছিল।

কাজল এখন এখানকার ভাষায় 'ধোবি', ডবকা, ডাঁসা। তারপর 'আঁটি' হয়ে যাবে, বয়স বাড়বে, রেট পড়বে। গতর থাকতেই গুছিয়ে নিতে হবে।

নীচে মারপিট লাগল বলে। খোকন অস্তিন গুটিয়ে তৈরি। ঐদিকেও তাত বাড়ছে। ক্রমশ ধুঁইয়ে উঠছে গণ্ডগোল।

"এই ছাড়ো, যাও বলছি যে যার কাজে, কী হয়েছেটা কী.."

কলকলানি এক মিনিটে শান্ত।

"এই এন.জি.ও বাবু, ছেড়ে দে খোকন।"

কাজল বারান্দার সিমেন্টের জাফরি কাটা কার্নিশে বুক ঠেকিয়ে নীচে তাকাল। খোকন কেঁচো হয়ে সরে গেছে। উল্টোদিকের লোকগুলোও। মুখে তড়পাচ্ছে, কিন্তু তাতে পড়তি আঁচ।

কে লোকটা? কাজল দুহাতে মাথার চুল জড়ো করে হাত ঘুরিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে দেখার চেষ্টা করল। লোকটা আবার প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই তো মুখ তুলে তাকিয়েছে।

মিন্টুদির স্টোভে প্রেসার কুকার বসানো আছে। একরাশ ধোঁয়া

ছেড়ে সিটি পড়ল। পুরোনো টেবিল ফ্যান ঘুরছে ভনভন। নাকি বান ডাকল মাতলা নদীতে। মাড়িয়ে যাওয়া বিষাক্ত চন্দ্রবোড়ার মত মরণ কামড়ের আক্রোশে ফুলে উঠছে ঘোলা জলের উদলা বুক। রাক্ষুসে নিঃশ্বাসে ঢলে পড়ছে ইমারত।

এই মুখ, এই চোখ, এই নাকের গঠন তো ভোলার নয়। অস্মিত স্যার। পাঠানখালী বুনিয়াদী স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ডে নিখুঁত ভারতের ম্যাপ আঁকা অস্মিত স্যার। একই রকম চেহারা। ছিপছিপে, ফর্সা, লাল ঠোঁট। কয়েকটা রুপোলি চুল শুধু পার্থক্যের ঘরে বসবে। কাজল মুহূর্তের মধ্যে বারান্দায় মেলা গামছা আর সায়ার আড়ালে চলে গেল। বুকের মধ্যে ঢাক বাজছে। স্যারই, আর কেউ নয়। স্যার দেখেনি ওকে ভাগ্যিস।

ঘরে এসে চুলের গোড়ায় গোড়ায় তেল মাখতে মাখতে মনে হল, আচ্ছা, অস্মিত স্যার দেখলে চিনতে পারত? কাকে চিনত? সেই সোমারানী মাণ্ডি, বরবটির মত রোগা মেয়েটা, স্যারের তাকে মনে নেই নির্ঘাৎ। কত ওরকম ছাত্রী ছিল! সেফটিপিন লাগানো স্কার্ট পরে স্কুলে যাওয়া, চাপা কলে লাফ দিয়ে দিয়ে মেটে গন্ধ লাগা জল খাওয়া, নাকে ঠোঁটে গালে ঠাণ্ডা ছোঁয়া, এসব আগের জন্মের কথা। সেই চেহারার সাথে কাজলের আজকের চেহারার কোনো মিল নেই।

ছোট্ট খোপের কুলুঙ্গিতে শিবঠাকুরের সামনে টুনি বাল্বের মালা জ্বলছে নিভছে। চারটে রঙের বাল্ব, লাল নীল হলুদ সবুজ। সবুজ টুনিগুলো জ্বলছে না। কাজলের ভাগ্যটাতেও কয়েকটা আলো নিভে গেছে। কোনোদিন সেই আলোগুলো আর জ্বলবেও না। তবুও ভালো আছে কাজল। খারাপ নেই। গ্রামে এর চেয়ে খারাপ ছিল। এই যে পায়রার খোপের মত ঘরটা, ভাড়া মাসে দুহাজার। কুঁচকিতে খোস, মলম লাগিয়ে কাজল ফিনফিনে পাতলা শাড়ি পড়বে। কমদামী মেকআপে সাজবে। সব কমদামীও নয়। টাকা জমিয়ে কেনা কয়েকটা দামী লিপস্টিক আছে। খদ্দের ধরার জন্য না, একা একা সাজবার জন্য কেনা । ঘন করে ঠোঁট আঁকে। তারপর ঠিক গেটের সামনে দাঁড়ায়।

সোঁদা গন্ধ। মাটির বুক থেকে ভাপ টেনে তুলে কয়েকফোঁটা জল পড়েছে পিচধুলোর রাস্তায়। জলের কুঁচি ঘরের একমাত্র ছোট্ট জানলার রেলিংয়ে পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। সন্দেশখালীর বাড়ির পাশের মাছের ভেড়ির ভাগ করা পুকুরেও হয়ত ফোঁটায় ফোঁটায় এগিয়ে আসছে বৃষ্টি। পদ্মপাতাগুলো দুলে উঠছে।

***

হলুদ চামরের মত লেজওয়ালা বেড়ালটা থালার দিকে মুখ বাড়াল। তারপর থালার পাশে পড়ে থাকা মাছের বড় কাঁটাটা মুখে নিয়ে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নিচের দোকানের চাতালে নেমে গেল।

লোকটা খাচ্ছে। লম্বাটে গ্রিলের ছায়াটা তেরচা হয়ে পড়েছে লোকটার গায়ে, ভাতের থালায়।

অর্ধেক ভাত ফেলে লোকটা উঠে বারান্দার কোণে বালতি থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে।

"কীরে অর্ধেক ভাতই তো পড়ে রইল।" সাদা শাড়ি পরা বৃদ্ধা দরজায়।

লোকটা তাকিয়ে হাসল। আজ গাল পরিপাটি কামানো।

"ওষুধ খাবি, খা এখনই।" বৃদ্ধা কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, "একটা দিনও ওষুধ বাদ দিতে ডাক্তার বারণ করেছে। আর তুই খাস কদিন, গুনে বলা যাবে।"

লোকটা নির্বিকার। আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে জড়িয়ে থাকা খাবার বের করছে। বেড়ালটা এখন পায়ের কাছে।

"তোর জন্য আমার মরেও শান্তি নেই। কে দেখবে তোকে! তুই মর, মরলে বাঁচি।" একটানা বলে চলেছেন বৃদ্ধা। গলা সামান্য উঁচু হবার আগেই বৃদ্ধা সতর্ক। বাড়ির আরেক অংশে মেজো ছেলের মেয়ের আজ জন্মদিন। গলা শোনা গেলে তেড়ে আসবে, "আবার এসেছে পাগলটা। বলি কোনো হোমে দিতে। তাড়াও ঘাড় ধরে।"

বৃদ্ধা ভেতরে চলে গেলেন। বাড়ির ভেতর থেকে হাসি হল্লা ভেসে আসছে। ভালো রান্নার গন্ধ বারান্দায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

লোকটা বারান্দায়। জিভে জল আসছে। ঐদিকে যাবার নিয়ম নেই। মেজদা তেড়ে আসবে। তারপর কলার ধরে টানতে টানতে বের করে

দেবে ঘর থেকে। বাইরে এনে এলোপাথাড়ি চড় বসাবে পিঠে ঘাড়ে।

উল্টোদিকের বারান্দায় মেলা ছোট্ট ছোট্ট প্যান্ট কাঁথা হাওয়ায় দুলছে। একটা শাঁখা নোয়া পরা হাত সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে প্যান্টগুলো। হাওয়ায় সবটুকু ভিজে যাতে শুকোয় ভালো করে।

"এই এই" লোকটা চোখ পাকিয়ে তেড়ে গেল। কয়েকটা কাক উড়ে গেল কার্নিশ থেকে।

কাপড় সরিয়ে দুটো কাজল পরা চোখ উঁকি দিয়েছে। ফর্সা কপালে বাসী সিঁদুর। চোখের দৃষ্টিতে কী আছে? নরম শীতলপাটি? নাকি একরাশ ঘেন্না? অক্ষম অযোগ্য মানুষের প্রতি কোনটা থাকে?

"শালা ", বেড়ালটার একটা পা অব্যক্ত আক্রোশে মুচড়ে ধরল লোকটা। প্রাণীটা হাঁচড় পাঁচড় করছে।

ওপাশের চোখদুটো জলে টলটলে। মকরমুখ বালা বাজুতে টাইট করে আটকে হাতটা আলগোছে জল মুছে নিল। তারপর ঘরে ঢুকে ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা।

লোকটা কান পাতল। কোনো কান্না...কোনো ফোঁপানি...যদি শোনা যায়। নাহ। একদিন এই বালতির ভরা জলে পূর্ণিমার চাঁদ উথলে পড়ত। তুলসী গাছের পেছনে ঝুপসি হয়ে আঁধারটা দুলত। ছোট্ট ছোট্ট ঝিকমিকে তারা দিয়ে তৈরি একটা আস্ত আকাশ নেমে আসত সন্ধ্যের বারান্দায়।

পায়ের কাছটায় ভিজে লাগছে। বেড়ালটা লেজ তুলে নিজের মনে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা রাগতে গিয়েও রাগল না। বসে পড়ে ওর সাদা লোমে আঙ্গুল ডুবিয়ে গাইতে লাগল,

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না..."

***

মেডিক্যাল কলেজের প্রথম গেটটা বন্ধ। কাজল হাঁটতে হাঁটতে পরের গেটের দিকে এগোল। ঠা ঠা গরমের খুলিপোড়া দুপুরে হাসপাতালে আসতে কার ভালো লাগে! কিন্তু আসতেই হল। আগেও হয়েছিল একবার। হারপিস। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ঘষ্টানিতে নরম ফোস্কাগুলো গলে যাচ্ছে। সব থেকে জ্বালা করে পেচ্ছাপের জল লাগলে। লঙ্কাবাটার মত রি রি করে। কত টাকা এখানে খসবে কে জানে! মায়ের চিকিৎসার জন্যও তো রাখতে হবে।

একটু দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে বিড়ি বের করে ধরালো। এন.জি.ওর দিদিরা পই পই করে বলে টুপি ব্যবহার করতে। একেকটা কাস্টমার এমন। কতদিনে সারবে কে জানে! আর তার ওপর খোকন। শুয়োরের মত ঘোৎ ঘোৎ করে একগাদা চুনো মাছ এনে ফেলে বলবে "দুপুরে এখানে খাব"। বাপের কেনা বাঁদি যেন। নূরী পদ্মারা আবার ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, "তোকে ভালোবাসে রে।" যা না ওদের ভালোবাস না। ঢলাঢলি কর না। খোকনের অমন পীরিতের গোড়ায় পাত কুড়োনো শকড়ি ফেলে কাজল।

পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ঘামে লেপ্টে যাওয়া শাড়ি। একতাল কাদার মত ছায়াটা ফুটপাথে সাথে সাথে যাচ্ছে।

"নদী আছে তোমার কাছে?" সামনে একটা লোক। ফর্সা লম্বা, চোখদুটোতে আনমনা পাগলামি। কাজলের ভয় করল না। ভালো ঘরের ছেলে। কত দুঃখে যে মানুষ পাগল হয়! মা বলত অতি বড় শত্তুরকেও 'পাগল হ' বলে গাল দিতে নেই।

"মস্করা করো দুপুর রোদে? তা কেমন নদী চাই?"

লোকটা আগুন আগুন চোখে তাকালো, "লাশ ভাসবে। ছুরি দিয়ে টুকরো করা লাশ।"

তারপর খুব ফিসফিস করে বলল,"দেখবে ছুরি, এই দেখো।"

পকেট থেকে একটা জংপড়া ছুরি বের করে সামনে আনল।

কাজল হেসে বলল "এই দিয়ে?"

সামনের মেট্রো স্টেশনের গেট দিয়ে ভিড় উপচে পড়ে সেন্ট্রাল এভিনিউতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সামনের লোকটা এদিক ওদিক দেখছে।

"বিড়ি খাবা?" কাজল চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা চুপ। কাজল নিজেই আরেকটা ধরালো।

"নদী নেই তোমার কাছে?"

"নদী আছে আমাদের সেই গাঁয়ে। মাতল নদী। আমার বাপটা সেই নদীতে নৌকা করে জঙ্গলের কোন ভেতরে চলে যেত।"

বাবার কথা বলতে বুকটা টনটনায়। লোকটাকে কুমিরে খাবলে খুবলে খেল। সুন্দরী গাছের ঢিবি ঢিবি শেকড়ে গেঁথে পড়ে ছিল কুমিরের এঁটো লাশ।

"এই শোনো সেই মাতলা নদীতে লাশ ভাসত গো। যখন বান ডাকত। ঢোবর ফোলা আধ পচা লাশ। তার পাড়ের বাড়িগুলোতে ভাত রাঁধা হত সেই গন্ধ দিয়ে। ডাল মেখে গন্ধ লেবু চেপে খাওয়া হত।"

কাজল পা চালালো। লোকটা তবু আসছে সঙ্গে সঙ্গে । পাগলের নাকি সুখ দুঃখ নেই। লোকটার মুখে সত্যিই ঠিক দুঃখ লেগে নেই। তবে কী যেন একটা আছে। চোখের ভাঁজে, ঠোঁটে। পীরিত করে পাগল হয়ত। হাসি পেল কাজলের। পীরিত! অস্মিত স্যার যখন স্যারদের বসার ঘরে বসে থাকত, কাজল টুক করে উঁকি মেরে দেখে নিত। চোখে অল্প কাজল পরত। কত কী ভাবত, সিনেমার হিরোর মত লাগত স্যারকে। যদি একটা দিনও পাত্তা দিত! মনেই পড়ে না কোনদিন কথা বলেছে। ও না, সে একদিন। বোতলটা ধরিয়ে বলল, "একটু জল এনে দেবে?"

কাজল, না তখন তো সোমারাণী, কতক্ষণ ধরে জল ভরল। গা বেয়ে উপচে পড়া জল মুছে স্যারের টেবিলে বোতলটা রেখেই দৌড়।

কোন ক্লাস তখন! সেভেন হয়ত! এইটের পর তো যাওয়াই হল না আর স্কুলে।

স্যার এখন এন.জি.ও বাবু। কাজল শুনেছিল স্যার ওই চাকরি ছেড়ে কলকাতায় অন্য চাকরি পেয়েছে। যদি দেখে ফেলে! চিনে ফেলে!

"আহ" , হোঁচট খেতে খেতে কাজল বেঁচে গেছে। আচমকা হাতটা ধরে ফেলেছে লোকটা। ভাবতে ভাবতে চোখ আকাশে তুলে হাঁটলে যা হয়।

"তুমি যাও না নিজের কাজে। আমার পেছনে কীসের চক্করে?" কাজল মরিচমাখা গলায় বলে।

"নদীর গল্প বলবে না? লাশ ভাসা নদী।"

"তুমি কি বাচ্চা নাকি, গল্প শুনবে? শোনো তালে, নদীর ধারে হ্যাজাক জ্বেলে যাত্রা হয়। সে কত্ত ভিড়। শোনাই যায় না সকলে এত চেল্লায়। বোনটা কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত জানো। কত্ত হিরো আসত। বিরাট মাঠ। তারপর প্যান্ডেল ভেঙে দিলে সেখানে রবি দাদুদের গরু বাঁধা থাকত।"

সেদিনের মত হীরেকুচি বৃষ্টি যদি আজ হত! কাজলের হঠাৎ মনে হল। অত কম নয়, অনেক জোরে বৃষ্টি। এই রাস্তাটাই হয়ত নদী হয়ে যেত। সেই গাঁয়ের নদীর মত।

"তুমি ফিরবে না?"

শুকনো রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে লোকটা বলল, " না"।

***

প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা প্রায় শেষ। এ পাড়ার পুজো এ বছর তিনে পা দিল। প্রথম বছর মায়ের দশ হাতে শাঁখের শাঁখা পরানো হয়েছিল।

কাজলের মা প্লাস্টিকের শাঁখা কিনে পরত। কোনোদিন ভাঙত না। খাঁজে খাঁজে ময়লা পড়ে রোঁয়া উঠে যেত, তাও না। বাবা মারা যাবার

পরেও ভাঙা গেল না। খুলে ফেলে দিল কাদা থকথকে বাঁশবনে।

খোকন বেশ খাটছে পুজোয়। কোন একটা চ্যানেলের লোক এসেছে। বেশ বয়েৎ ঝাড়ছে মাইকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাকালো। বদনী। আড়বহরে ব্যাটাছেলে, কিন্তু মেয়েদের মত রকম সকম। ওদের এই মহল্লায় চাহিদা বাড়ছে।

"কী রে আজ নামবি না?" বদনী হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"না, ঘাও হয়েছে যে। যন্তন্না।"

খোকন উঠে এসেছে ওপরে। দিব্যি ভদ্দরলোকের মত সাজগোজ। কাজল পাত্তা না দিয়ে বদনীর সাথেই গল্প করতে লাগল হেসে হেসে।

"কটা ট্যাকা লাগবে, দে।"

কাজলের হাতে এখন টাকা নেই বিশেষ। একটা মলম কিনতে হয়েছে। কী দাম! তাছাড়াও কয়েকটা ওষুধ। সবগুলো হাসপাতালে ছিল না। ভালোই খরচ হয়েছে জমানো টাকা থেকে।

খোকনের এই মুহূর্তে টাকার সেরকম দরকার ছিল না। কিন্তু গত তিন চারদিন ধরে কাজল একটু যেন ছাড়া ছাড়া। খোকনকে দেখেও এড়িয়ে গেছে। কথা শুরু করে একটা ঝগড়া পর্যন্ত টানলে আবার মেঘের বুকটা ফেঁসে গিয়ে চড়চড়ে রোদ বেরিয়ে আসবে। তাই তেরিয়া ভঙ্গিতে বলল, "গতমাসে যেটা ধার দিলাম?"

এ মাসেই চাইবার কথা ছিল না। কাজল শান্তভাবে বলল, "আচ্ছা কটা দিন পর দিই?"

খোকন কথার উত্তাপ বাড়াচ্ছে। কাজল শান্ত। ঝগড়া জমল না। তরতর করে নেমে গেল খোকন। দুচারটে খিস্তি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। জিভে তখনও শিয়ালদার হোটেলের কচুরির ঝাল লেগে। টাকরা পুড়ে গিয়েছিল খেতে গিয়ে, নোনতা লাগছে। একটা চোঁয়া ঢেকুর গলার কাছে এসে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

কাজল তাকিয়ে দেখল ওর নেমে যাওয়া। সামনের জটলা প্যান্ডেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অস্মিত স্যার নেই আজ। কদিন ধরে আসছে না। যে কবার নীচে তাকিয়েছে, একবারও দেখতে পায়নি।

হাতটা সামনে মেলে ধরল কাজল। অজস্র রেখা। হাতের সাদাটে চামড়ার নীচে নীল শিরা বেয়ে রক্তের দরিয়া। একই সমান পথে বয়ে চলেছে। ঠাণ্ডা খোলসছাড়া সাপের মত চকচকে মাতলা নদী যেমন বইত। পাড়ের কলাগাছগুলো ক্ষ্যাপা হাতির মত মাথা নাড়ছে। নদীর চেরা রুপোলি বাঁক। অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া গেলে! একটা ছুরির টানে আরেকটা অন্য পথে!

কাজলের চোখের সামনে একটা ছুরি, চকচক করে উঠেছে।

"তুমি?" কাজল অবাক।

"খুন করে দেব", পাগলটার গালে পুরু হয়ে থাকা দাড়ি। ঠোঁটের কোণে শুকনো থুতু জড়িয়ে আছে। চোখের মণিতে পেছনের গ্রিলের নকশার ছায়া।

কাজল খুঁটিয়ে দেখল। লোকটার চোখে খিদে। যে খিদে নিয়ে খদ্দেররা আসে তেমন খিদে নয়। এই খিদেতে এক থালা ভাতের একটাও পড়ে থাকে না। শুধু আঙুলের টানা নক্সা থাকে ফাঁকা স্টিলের থালায়। চৌকির নীচে ওবেলার ভাত আছে, ছোট্ট বাটিতে একটু বেঁচে যাওয়া তরকারি।

"এসো তো, এসো।" টানতে টানতে লোকটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল কাজল।

***

"খুন করতে চাও? কাকে?'',কাজল আনমনা।

দেওয়ালের তাকে শিবঠাকুরের ছবির সামনে গুণে গুণে চারটে নকুলদানা রাখল। আগেরবার ঢাকনিটা ঠিক মত বন্ধ করেনি হয়ত, কয়েকটা লালপিঁপড়ে হাত বেয়ে নামছে। কামড় বসাতে পারে, বিষ ঢেলে।

লোকটা ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। পিঠের সাথে প্রায় লেগে যাওয়া ক্ষুধার্ত পেটটা এখন কাজলের রান্না করা ভাত আর তরকারি দিয়ে ভরা। সাপটে থালা চেটে খেয়েছে লোকটা। নিঃশ্বাসের সাথে বুক আর পেটটা ওঠানামা করছিল। কাজল যত্ন করে বুকের কাদাগুলো মুছে দিয়েছে। তারপর দাড়িতে খড়খরে হয়ে যাওয়া গালে একবার হালকা করে গালটা ঘষে নিয়েছে। অভ্যস্ত শরীরে এখন ভরা মাসের বর্ষা আসে না, প্রথম মাটি ভেজা জল যে সোঁদা গন্ধটা ছড়ায় সেটা বুকের অলি গলিতে আর মোচ্ছবের মত খুশির মাতন ধরায় না। অস্মিত স্যারকে আল বেয়ে সাইকেল নিয়ে যেতে দেখে বুকের মধ্যে যেমন ধারা হত, কী একটা যেন খলবলিয়ে খেলে বেড়াত আবিদ মিঞার জলকরের রঙিন চারামাছের মতো। সেই কতকাল আগে।

লোকটার চোখদুটো খোলা। দ্রুত ওর লোমশ গাল থেকে মুখটা তুলে নিয়েছে কাজল।

"কাকে জানি না তো।"

কী শান্ত গলায় বলছে! সেয়ানা পাগল। কাজল মনে মনে হাসল।

"তুমি কী চাও? নদীর গল্প বলবে বলে ডেকে আটকে রাখবে আমায়?" লোকটার চোখে অদ্ভুত ভয়।

কাজল হাসল। তারপর এগিয়ে এসে খেলার ছলে গায়ে শরীর ছুঁইয়ে বলল, "আমাদের মত মেয়েরা গল্প কি আর জানে গো? এই এইটা কাজই শুধু জানে।"

"কোনটা?"

কাজলের মাথা গরম হয়ে আসে। গতকাল রাতে মদ খেয়ে এসে লাথি মেরে স্টোভটা তুবড়ে দিয়েছে খোকন। সারাতে হবে। কেরোসিন গড়িয়ে পড়ছে। খুব কষ্ট করে ভাত ডাল রেঁধেছে আজ। যদি আগুন লেগে যেত! সেখানেই শেষ নয়, হাত ধরে টেনে এনে এলোপাথাড়ি চড় মারতে মারতে টাকা চাইছিল। "দেব না" বুকে জমানো নিঃশ্বাস সবটা খরচ করে বলেছিল কাজল।

"দেখ কী করি"।

চৌকির নীচে শাড়ির প্লাস্টিকে জমানো টাকাগুলো আর নেই। বোন ফোন করবে আজ অথবা কাল। মায়ের গালের জমে ওঠা মাংসপিণ্ডে দুগ্ধছাতুর মত সাদা সাদা পুঁজের ফোস্কা গজাচ্ছে।

"এইটা" কাজল লোকটার গা ঘেঁষে আরও ঘন হয়।

লোকটা নির্বিকার।

উঠে গিয়ে চৌকির নীচ থেকে কাচের বোতল বের করে গ্লাসে মদ ঢালে কাজল। তারপর লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "চলো আজ তোমায় নদী দিই। একটা গোটা নদী।"

কাজলের গোটা শরীরটা নদী হয়ে গেলে কেমন হয়! বোতলের শেষ বিন্দু অবধি চুষে নিয়েছে ও। ওর শরীরে একটা একটা করে পলাশ গাছ জন্মাচ্ছে। তসর মথের গুটিগুলো দুলছে। দাঁতে আঁচল চেপে ব্লাউজের সবকটা হুক খুলে ফেলল । তারপর শাড়িটা উড়ে গেল দূরে। উরুসন্ধির একতাল থলথলে মাংসপিণ্ডের ওপর ও একটানে লোকটাকে টেনে নিল। ঝিম ধরা চাঁদের আলোয় কীর্তন-ভাঙা ভিড়ে দাঁড়িয়ে চেটেপুটে খিচুড়ি খাবার খিদে নিয়ে লোকটার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। হাত থেকে ভরা গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রাখল।

"নদী কখনো তোমার কাছে আসবে না গো। তুমি নদী করে নাও না আমায়।"

হাতভরা স্তন নিয়েও লোকটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে। কাজলের দাঁতের আদর বসে যাচ্ছে ওর রোমশ বুকে। কাজল আরো গতিশীল হতে চাইল। ফেটে যাচ্ছে গোপন ভিজে জমিতে জন্মে ওঠা বিষাক্ত ফোস্কাগুলোয়।

লোকটা সাবধানে সরিয়ে দিল কাজলকে। কাজলের নেশা চড়ে গেছে আজ। জ্বলন্ত চোখে হিসহিস করে বলল, "নদীর গল্প শুনবে না? সেই লাশভাসা নদী? রক্ত মাংসের গন্ধেই গা গুলিয়ে উঠছে বুঝি! যাও বেরোও। বেরোও বলছি।"

বিকেল পাঁচটা, মহল্লার গমগমে সময়। ঘেমো জামার গন্ধ, চকচকে মুখ, বিড়ির ধোঁয়া।

কাজল আস্তে আস্তে দরজা খুলে পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। পরনের শাড়িটা কোনোভাবে জড়ানো।

লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে। নামছে সরু ঘুপচি সিঁড়ি বেয়ে।

***

শহরে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। কয়েকদিন টুপটাপ বৃষ্টির লোভ দেখিয়ে আকাশ খ্যাল খ্যাল করে হেসে উপচে দিচ্ছে আগুনে রোদ। চামড়ায় ফোস্কা পড়ার মত গরম। সারা দুপুর নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়েছে শহরটা। ক্রমশ কমলালেবুর রঙ ধরা বিকেল গড়াচ্ছে। এই সময়ে এত গরম অন্য বছর থাকে না।

টানা রিক্সা টুং টুং করে ট্রাম রাস্তার ওপর সচল হল। ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোর চারপাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্যান্ডেলে ঠাকুরের মুখ খবরের কাগজে ঢাকা। হুক করে নেওয়া তারে ঝোলানো হলুদ বাল্বের আলোয় শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। আঠা আর বাঁশের গন্ধে আগমনী মাখছে বিকেলের হলুদ শহরটা।

ঠিক সন্ধ্যেবেলা যখন সবে দোকানের হলুদ বাল্বের চারপাশে কালো কালো পোকা ঘুরতে শুরু করেছে, একটা খুন হয়ে গেল আচমকা। নিষিদ্ধপল্লীতে তোলা আদায় নিয়ে আকচাআকচি নতুন নয়। সেরকমই। চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল খোকন। ভরা রাস্তায় সবার চোখের সামনে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন। তারপর বাইক নিয়ে হাওয়া। লাশটা নিয়ে গেছে পুলিশ।

"আমাদের খোকন...", চোখে কাপড় দিয়ে টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে ডুকরে উঠল কাজল। সকলের নাকের ডগা কমবেশি লাল। কাজলের মত অনেকেরই হয়ত ছোঁয়াচে কান্নাই। কাঁদতে হয় বলে, নাহলে বেমানান লাগবে ভিড়ে। চারপাশে অনেক নারীকণ্ঠ একসাথে বলে উঠল, "এলাকার নিরাপত্তা দাবি করছি আমরা।"

কাজল ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার উপচে যাওয়া হাইড্রান্টের জলে চটি সমেত পা ধুল। খোকনের লাশটা দেখে চমকে গেছিল সবাই। ফালা ফালা কাটা। কাজলের কেন যেন মনে হচ্ছিল ওই পাগলটার হাতের জংধরা ছুরিটা দরকার ছিল আজ। হাতে পেলে আরও চিরে

চিরে দিত ও লাশটা। অনেক বার ছুরি চালাত, মরা সাড়হীন চামড়ার ওপর। আশ মিটিয়ে।

ভিড়ের দিকে আরেকবার তাকিয়ে চমকে উঠল কাজল। চ্যানেলের মেয়েটার সাথে অস্মিত স্যার কথা বলছে। চোঙার মত মাইক ঠিক স্যারের চাপা ঠোঁটের নীচে। ওই ভিড়ে আবার দাঁড়াতে হবে। ভিড়ে মিশে থেকে। অস্মিত স্যারের থেকে খানিকটা দূরে। কাজল পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

আজ সারা শহর টিভির পর্দায় এই ছবি দেখবে। অস্মিত স্যারের পাশে ভিড়ে মিশে থাকা একটা ঝাপসা মুখ। স্যারের চোখে পড়বে ? নাকি ভিড়ের দিকে তাকিয়েও দেখবে না!

কাজলকে এবার ঘরের দিকে এগোতে হবে। গোছাতে হবে ব্যাগ। সব জিনিসপত্র মনে করে নিতে হবে। জমানো টাকা, নতুন শাড়ি, নাইটি, একটা শতরঞ্চি, বোনের জন্য ইমিটেশন হার দুল আরও অনেক কিছু।

আকাশে টুকরো টুকরো কালো মেঘ দলা পাকাতে পাকাতে পুরো আকাশজোড়া। বৃষ্টি হবেই। বাদলা হাওয়ায় দুলে উঠে আছড়ে পড়বে ফোঁটাগুলো। আর সেই নদী খোঁজা লোকটা? এই কদিনে একবারও আসেনি । কী খাচ্ছে? কোথায় আছে? কে জানে!

***

"মাতা খারাপ হয়ে আচে লোকটার। কাজলি, তোর ঘরে আসত না?" কল্পনাদি বিড়িটা টিপ করে ঠিক ম্যানহোলের ঢাকনার ওপর ফেলল।

কাজল দুটো ব্যাগ নিয়ে তৈরি। সামনের রাস্তার ওপর চক দিয়ে ঘের আঁকা ছিল। ঠিক যেখানে খোকনের রক্তে মাখা শরীরটা পড়েছিল। ঝুপপুস বৃষ্টি হয়েছে গতকাল। চকের দাগ, শুকনো রক্ত সব ধুয়ে সাফ। রাস্তার পিচ উঠে যাওয়া গর্তে বৃষ্টির জল জমে ছোট্ট ছোট্ট জলাশয়। কাদাগোলা হলদেটে।

লোকটা মাটিতে উবু হয়ে বসে। জামাটা ছেঁড়াখোঁড়া। দুটো আঙুলে

নখ উপড়ানো। রক্ত জমে আছে ঠোঁটে। পড়ে গিয়েছিল হয়ত। কিংবা মার খেয়েছে। এতটা হতশ্রী এর আগে লাগেনি তো। কিন্তু হাতে এখনো ছুরিটা ধরা। কাজল দুটো ভারী ব্যাগ সামলাতে সামলাতে একদৃষ্টে দেখতে লাগল।

একটা বাইক গেল কিছুটা জল ছিটিয়ে। কাজলের চটির ওপর ছিটকে আসে খানিক। এই জলে একটা মরা মানুষের রক্তের কণা লেগে আছে। আঁশটে গন্ধ, নাকটা খুব কাছে নিয়ে গেলে পাওয়া যাবে।

লোকটা কাঁপা হাতে ছুরিটা রাস্তার পিচের ওপর ঘষল। এলোমেলো খাবলা হয়ে থাকা গোল জমা জলগুলো আলাদা আলাদা, দূরে দূরে । একটার সাথে জোড়া নেই আরেকটা। লোকটা কি চাইছে? জুড়তে?

"তোর টেরেন কটায়? যাবি না দাইড়ে ওর খ্যাপামি দেখবি?"

কাজলের সত্যিই আর সময় নেই। এরপর দেরি হলে ট্রেন মিস করে যাবে। কতবছর পর বাড়ি যাওয়া। তবু জিজ্ঞাসা করল, "যাবা নাকি আমার সাথে নদী দেখতে?"

লোকটা তখনও ছুরি ঘষে চলেছে কালচে ভিজে পিচের ওপর। এবার মুখ তুলে বলে উঠল, "নদী বইবে, ঠিক এখানে।"

কাজল দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করছে । আস্তে আস্তে সত্যিই একটা নদী তৈরি হবে । কাজলের মন বলছে। ও যখন ফিরবে ততদিনে তাতে জল থৈ থৈ করবে। নাহলে কাল বৃষ্টি এল কেন? আর এই লোকটা কেন আজই ফিরে এল? এ কদিন রোজ হাঁড়িতে একজনের ভাত পড়ে থেকেছে।

আর দেরি করা যাবে না। কাজল পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ব্যস্ত রাজপথের দিকে।

লোকটা তখনও ছুরি ঘষে চলেছে । হঠাৎ হাত থামিয়ে লোকটা চোখ তুলে তাকায় পথের দিকে।

কাজলের দূরে আবছা হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে লোকটার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে, যে হাসিতে ঠোঁটের বাঁক কান্নার মত

দেখায়। তারপর গান ধরে,

"সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে
তবু তোর মনের নাগাল পাইলাম না
আমি আর বাইতে পারলাম না,
মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

সূচিপত্র
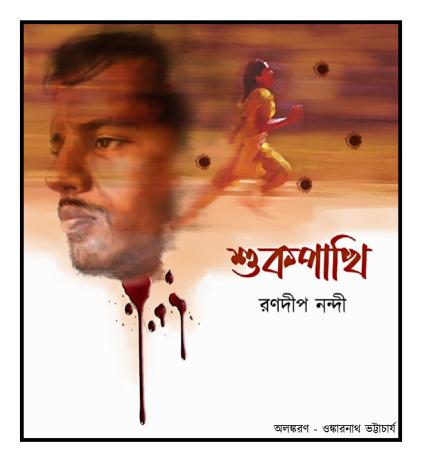
শূন্য

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। গোধূলি পেরিয়ে সন্ধের আলো মরচে পড়া তলোয়ারের রং ধরেছে। শহর কলকাতা থেকে অনতিদূরে বরানগর সংলগ্ন কুটিঘাটে গঙ্গার বুকে তিরতির করে কাঁপছে একখানা মাছধরা নৌকো। মাঝি খুব অলস হাতে বৈঠা ঠেলছে আর গুনগুন করে গান ধরেছে। শব্দ বোঝা যায় না বটে, কিন্তু সে সুর বড় মিঠে। ভাটিয়ালি মিঠে সুর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়। বুকের ভিতরটা নিমেষে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় অবলীলায়। নৌকাটাও যেন সেই সুরেরই মূর্ছনায় শরীর দুলিয়ে সঙ্গত দিচ্ছে। মাছের জাল জড়ো করে রাখা একপাশে, মাঝে ছোট্ট একফালি ছাউনি। কাঁচা মাছের উগ্র

গন্ধে পাকস্থলী গুলিয়ে বমি উঠে আসছিল মেয়েটার। সে ওই ছাউনির ঠিক নিচেই বসে আছে নির্বাক হয়ে। দুই হাঁটুর মাঝে থুতনিটাকে গুঁজে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে পড়ে থাকা জালটার দিকে। একটা মাছের পোনা সেই জালে আটকা পড়েছে। বাকি মাছগুলো জাল থেকে বের করে নৌকার গলুইয়ে রাখা বালতিতে জড়ো করা হলেও ওই মাছখানা আটকা রয়ে গিয়েছে জালের ফাঁদে। সে বেচারা প্রাণপণে ছটপট করছে জাল ছিঁড়ে বেরোতে, কিন্তু ততই আরও বেশি করে জড়িয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্ম নাইলনের জালের ঘেরাটোপে। হঠাৎ মেয়েটার সম্বিৎ ফেরে গম্ভীর একটা কণ্ঠে। মাঝি গান থামিয়ে প্রশ্ন করেছে, "কিরে, কী ভাবছিস? বাড়ির জন্য মনখারাপ করছে?"

"ধুর! কী যে বলো না বরেনদা।"

"এই দেখো, কী বলার কী আছে! মন খারাপ থাকতে পারে না?"

"না বরেনদা, পারে না। মন খারাপ মানেই পিছুটান। আমরা যে এখন যুদ্ধে নেমেছি। আর তুমিই তো বলো, কামান, বন্দুক বা যোদ্ধাদের সাহস নয়, একটা যুদ্ধ জেতায় সৈনিকদের পিছুটানহীনতা। যে পক্ষের সৈনিকদের ঘরে ফেরার তাড়া যত উগ্র, সেই পক্ষের পরাজয়ের সম্ভাবনাও ততই প্রবল।"

"সে তো বটেই। তবু হঠাৎ কি মনে পড়ে যায় না যে বাড়িতে একজন মানুষ এখনও তোর পথ চেয়ে বসে আছে?"

"হয়। রোজ পড়ে। আর জানো তো, সেই গ্লানি মাঝে মাঝেই আমার ঘুম কেড়ে নেয়। তারপরেই নাকে এসে ঝাপটা মারে বারুদের সুবাস, পচা মাংসের দুর্গন্ধ। তখন এই ক্ষণিকের দুর্বলতাটার জন্য বুকের মধ্যে গ্লানি জমা হয়, নিজের ওপরেই ঘেন্না জন্মায়।"

উত্তর দেয় না মাঝি। ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মাঝ গঙ্গায় ভেসে চলা কচুরিপানাগুলোর দিকে। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠে। পাড়ের কাদামাটিতে জুতোর গমগমে আওয়াজ, সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কান ফাটানো গুলির শব্দ। মাঝি মুহূর্তে সচকিত হয়ে মেয়েটার দিকে ফিরে চিৎকার করে ওঠে, "পালা। গুলি করছে ওরা।"

"না, আমি পালাবো না।"

"বোকামি করিস না। তোর বুকে যে আগুনের ফুলকিটা আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি তা এত সহজে নিভিয়ে ফেলিস না। তুই সেই ফুলকি দিয়েই হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালবি।"

ইতিমধ্যেই একটা গরম সিসার টুকরো আলতোভাবে ছুঁয়ে যায়

মেয়েটাকে। মেয়েটা এবার চারপাশে খুব সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দেয় গঙ্গার কালচে সবুজ জলের আড়ালে। ডুব সাঁতার কেটে অকুস্থল থেকে অনেক দূরে চলে যেতে যেতে শুনতে পায় অনেকগুলো গরম সিসার গুলি এসে ধাক্কা মারছে একটা নরম শরীরে। আক্রান্ত মানুষটার মুখ থেকে একটা আর্তনাদ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কয়েক মুহূর্ত, তারপরই সেই মাঝির ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ছিটকে পড়ে জলের রাজত্বে। সেই মুহূর্তে মেয়েটা জলে নিমজ্জিত অবস্থাতেই একবার শিউরে ওঠে। তার চোখের জল মিশে যায় গঙ্গার বহমান ধারায়।

এক

মিশমিশে অন্ধকারের চাদরে ঢেকে আছে গোটা শহর। সম্ভবত আজ অমাবস্যা। চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কোনও এক দুর্বোধ্য কারণে ঝিঁঝিও যেন ডাকা থামিয়ে কিছুর অপেক্ষা করছে। কিসের, তা প্রতিমা জানেনা। সে আপাদমস্তক শাল জড়িয়ে খুব লঘুপায়ে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তার পাশে সরু ফুটপাথ ধরে কালচে হলুদ আলোছায়ায় নিজেকে আত্মগোপন করে। মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছে। শরীরটাকে কোনও অন্ধকার কোণে মিশিয়ে দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। আর সামান্য কিছুটা দূরে গেলেই গন্তব্য। সামনের মোড় থেকে ডানদিকে ঘুরে ঠিক তিনটে বাড়ির পর নীল দরজা। ব্যাস!

হঠাৎ দূরে একটা চাপা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায় প্রতিমা। মুহূর্তে লুকিয়ে পড়ে রাস্তার পাশে রাখা একটা ডাস্টবিনের পিছনে। হ্যাঁ! ঠিকই শুনেছিল সে। কয়েকটা ভারী বুটের শব্দ। রাতের সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে এগিয়ে আসছে এদিকেই। প্রতিমার বুকের মধ্যে একটা বৈশাখী মেঘ যেন গুড়গুড় করে ওঠে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। বুটের শব্দগুলো এগিয়ে আসছে এদিকেই। একসময়ে সেগুলো এসে পড়ে একদম সামনে। কয়েকজন উর্দিধারীর ছায়া এসে পড়েছে প্রতিমার শরীরের ওপর। যদিও তারা তাকে দেখতে পায় না। বন্দুক তুলে ধরে কিছুক্ষণ দুদিকে তাকিয়ে আবার এগিয়ে যায় সামনের দিকে। জুতোর আওয়াজটা মিহি হতে হতে দূরে বাতাসে মিলিয়ে এলে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায় প্রতিমা। এগিয়ে চলে সামনের গলির দিকে।

দুই

খাওয়া শেষে কলতলায় হাত ধুচ্ছিল অমৃত। প্রায় সাতদিন হতে চলল শহর জুড়ে কার্ফু চলছে। বাজার দোকান সব বন্ধ। ঘরে টাকা কিছু আছে বটে, কিন্তু সেই টাকা খরচা করে খাবার কেনার কোনও উপায় নেই। ঘরে চাল, ডাল, সবজি কিছুই নেই। শুধু একটু মুড়ি আর ছাতু পড়ে আছে, তাই দিয়েই রাতের খাওয়া সেরেছে সে। হঠাৎ দূরে কাঁঠাল গাছের আবছায়ায় কিছু যেন একটা নড়ে উঠল। চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায় অমৃত। কুকুর? কিন্তু সদর দরজা তো ভেজানো ছিল... বাম হাতে ধরা জলের ঘটিটা নামিয়ে রেখে ডান হাত বাড়িয়ে একটা সরু বাঁশের লাঠি তুলে নেয় সে। কুকুর বেড়াল বলে তো মনে হচ্ছে না। দিনকাল ভালো না। উদ্যত লাঠি হাতে সাবধানী পায়ে এগিয়ে যায় সে অন্ধকারের দিকে। চাপা গলায় প্রশ্ন করে, "কে?"

বেশ কিছুক্ষণ কোনও উত্তর আসে না। কিন্তু ততক্ষণে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি চোখে পড়েছে অমৃতর। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চমকে উঠে দুহাতে শক্ত করে লাঠিটা ধরে এক ঝটকায় মাথার ওপর তোলে সে। এবার বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে, "কে? কে ওখানে?"

"আমি।"

"প্রতিমা? তুমি!"

ছায়ামূর্তি অন্ধকারের আশ্রয় ছেড়ে অমৃতের সামনে এসে দাঁড়ায়। অমৃত পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির। অমাবস্যারও একটা খুব মিহি ধূসর আভা থাকে। সেই আভাই ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিমার প্রসাধনহীন রুক্ষ গালে। শালের ঘোমটা খসে পড়েছে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে অমৃতের দিকে। হাওয়ায় কোঁকড়ানো চুলগুলো উড়ছে ইতস্তত।

"আমায় আজকের রাতটা এখানে থাকতে দেবে? আমি দাওয়ায় শুয়ে পড়ব। কাল ভোরের আগেই চলে যাব।"

"কেন? কী ব্যাপার?" চোয়াল শক্ত করে প্রশ্ন করে অমৃত।

"ওরা আমায় পাগলা কুকুরের মত খুঁজছে। একবার হাতে পেলে..."

"কেন? আবার এই বাড়িতে কেন? তোমার বরেনদার কাছে যাও। যার হাত ধরে সংসার ছেড়েছিলে, আমায় ছেড়েছিলে সেই তোমায় বাঁচাবে।"

"বরেনদাকে ওরা মেরে ফেলেছে অমৃত। ষোলোটা গুলি করেছে।

ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সারা শরীর।" কথাটা বলতে গিয়ে গলা বুজে আসে প্রতিমার।

"বেশ করেছে। বিপ্লবের নামে তোমরা রোজ কত মানুষকে খুন করছ সেটা একবার চিন্তা করেছ? আজ প্রেমিক মরেছে বলে কষ্ট উথলে উঠছে?"

"তোমায় আমি অনেকবার বলেছি বরেনদা আমার প্রেমিক নন। আমার গুরু। আমার রাজনৈতিক গুরু।"

"গুরু! হেহঃ" অমৃত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

"ঠিক আছে ছাড়ো। আমি চলে যাচ্ছি।"

"না। এত রাতে কোথাও যেতে হবে না। বাইরে রাস্তাঘাট নিরাপদ না। আজ রাতে থাকো, কাল ভোরের আলো ফোটার আগে যেন..."

"হুম। জানি।" নরম গলায় বলে প্রতিমা।

দাওয়ায় হেলান দিয়ে রাখা মাদুরটা পেতে শুতে যাচ্ছিল প্রতিমা, অমৃত ঘরের ভেতর থেকে কড়া গলায় বলল, "তুমি আইনত এখনো আমার বিবাহিত স্ত্রী। তোমার দায়িত্বজ্ঞান না থাকলেও আমার আছে। ভিতরে এসো।"

প্রতিমা কিছু একটা বলতে চায়। ঠোঁটদুটো সামান্য কেঁপে ওঠে, কিন্তু মুখ থেকে আওয়াজ বেরোয় না। অমৃতের স্থির ভাবলেশহীন চোখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে ঘরে ঢুকে আসে।

তিন

রাত আরও গভীর হয়েছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিনের চালে ঝমঝম আওয়াজ হচ্ছে। বৃষ্টি হলেই বাতাসে একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় অমৃত। আজও সেই গন্ধটা নাকে আসছে। সেইসঙ্গে আরও একটা মৃদু গন্ধ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার চোখে মুখে। ভীষণ চেনা গন্ধ। একটা অজানা অস্বস্তিতে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করে প্রতিমা।

"কিছু না।"

"বলো!"

"আচ্ছা, তোমার আমাদের বিয়ের দিনের কথা মনে আছে?"

"থাকবে না আবার? সারাদিন না খেয়ে খালি পেটে অতক্ষণ আগুনের সামনে বসে থাকা। তারপর সারারাত সে কী বমি..."

"হ্যাঁ সে এক কেলেঙ্কারি কান্ড!" হাসতে থাকে অমৃত। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে ওঠে, "জানো তো, ফুলশয্যার রাতে ওই

রজনীগন্ধার গন্ধ ছাপিয়ে আমি একটা অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছিলাম। তোমার গন্ধ। তোমার ঘাম, চুলের তেল সবকিছু মিলিয়ে একটা মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ। তারপর কেন জানি না, কিছুদিন যেতে সেই গন্ধটা আর পেতাম না। বৃষ্টি নামলে যখন জানালার পেছনে মুস্তাফিদের পুকুর থেকে একটা নোনতা গন্ধ উঠে আসত, সেটা পেতাম। আমাদের সদর দরজার পাশে তোমার পোঁতা বেলফুলের গাছটায় যখন সাদা সাদা ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফুটত, তার গন্ধ পেতাম। কিন্তু তোমার সেই গন্ধটা আর পেতাম না। তারপর একদিন গভীর রাতে তুমি চলে গেলে হঠাৎ। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল কী যেন নেই... প্রথমে ভাবলাম শুধু তুমি নেই। খানিক পরে বুঝলাম শুধু তুমি নও, সেই গন্ধটাও নেই। যেদিন ছেড়ে গেলে সেদিন খেয়াল করলাম গন্ধটা আমার সঙ্গেই ছিল এতদিন। শুধু অভ্যেস হয়ে গেছিল বলে বুঝতে পারিনি। যেদিন বুঝতে পারলাম সেই গন্ধটার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আর নেই। "

"খুব কষ্ট হয়েছিল?"

"হয়েছিল। যদি যাওয়ার সময় সবটুকু নিয়ে যেতে তাহলে এত কষ্ট হত না জানো তো। কিন্তু তুমি তো শুধু তোমাকেই নিয়ে গেলে। ওই যে আলনায় রাখা তোমার শাড়িগুলো, এই ক্লিপটা বা ধরো টেবিলের ওপর রাখা ওই চিরুনি আর আয়নাটা, ওগুলো তো নিয়ে গেলে না।"

"অমৃত আমি যে বিয়ের দিনই তোমায় বলেছিলাম আমি থিতু হয়ে সংসার করার মেয়ে নই, কোনোদিনই ছিলাম না। বুর্জোয়ারা আমাদের সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেশটাকে ভাগাড় বানিয়ে দিচ্ছে। কাউকে তো তাদের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে বলো? তুমি যখন বিয়ের জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলে তখনই আমি বলেছিলাম আমায় বিয়ে করলে সারা জীবনে তুমি শুধু কষ্টই পাবে। তুমি বলেছিলে আমার লড়াইয়ে তুমি বাধা দেবে না, আমায় চেঞ্জ করার চেষ্টা করবে না। তাও তুমি সেটাই করলে। নিজের মতো গড়ে নিতে চাইলে আমাকে।"

অমৃত উত্তর দেয় না, শুধু মৃদু হাসে। চোখের দৃষ্টি উদাসীন। অমৃতের এই হাসিটা চেনে প্রতিমা। অমৃতের এই হাসিটা ভয় পায় প্রতিমা। কেন জানে না, কিন্তু তার মনে হয় যেদিন মধ্যরাতে সে ঘর ছেড়েছিল, সেদিন আগেই কোনোভাবে টের পেয়েছিল অমৃত। রাতের খাওয়া সেরে যখন এঁটো বাসন ধুয়ে রাখছিল প্রতিমা, তখন হঠাৎ পেছনের দাওয়া থেকে তাকে নাম ধরে ডেকেছিল সে। ফিরে তাকিয়েছিল প্রতিমা। কোনও কথা বলেনি অমৃত। শুধু এভাবেই হেসেছিল, তারপর ধীরপায়ে উঠে চলে গিয়েছিল ঘরে।

"আচ্ছা অমৃত, তুমি আমায় কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না, না?" দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে প্রতিমা। তাক থেকে অমৃতর কবিতার খাতাটা তুলে নেয় হাতে। হলদে পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখে।

"ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? আসলে কী জানো তো প্রতিমা, সেই কলেজ জীবনে যখন তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, তখনই আমার অবচেতন মন জানত তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা দুটো স্বত্তা রয়েছে। একজন শান্ত, নরম ফুরফুরে হাওয়ার মত। বর্ষামুখর দিনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে জানালার বাইরে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখি, সেইরকম। আর অন্যজন উত্তাল কালবৈশাখী, মুহূর্তে ছারখার করে দিতে পারে ব্রহ্মাণ্ড। তোমার সেই বিপ্লবী সত্ত্বাটাকে আমি হয়ত কোনোদিন আপন করে নিতে পারি নি। ভয় পেয়েছি, এড়িয়ে গেছি। সেক্ষেত্রে দোষ আমারও কিছু কম ছিল না।"

"তুমি যাকে ফুরফুরে হাওয়া বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি মনে করেছিলে সে ছিল ওই কালবৈশাখীর আগের থমথমে নিস্তব্ধতা। ওই নিস্তব্ধতা আঁকড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়, কিন্তু সংসার করা যায়না।"

চার

মেঝেতে বিছানা করে নিয়েছে প্রতিমা। গায়ের শালটাকে পেতেছে লম্বা করে। শোয়ার আগে কোমরের কাছ থেকে একটা পিস্তল বের করে বালিশের পাশে রাখে সে সন্তর্পণে। সেদিকে তাকিয়ে অমৃত চমকে ওঠে, কুঁকড়ে সরে যায় খাটের একপাশে। প্রতিমার দৃষ্টি এড়ায় না সেটা। সে হেসে ফেলে। বলে, "ভয় পাচ্ছো কেন? এটা তো আমারই একটা অংশ। এই যেমন আমার চুলের ক্লিপ..."

"অস্ত্র কখনও প্রসাধন হতে পারে না প্রতিমা। হিংসা কখনও পরিধান হতে পারে না।"

"হিংসা নয়, বিপ্লব।"

"সত্যিই কি কিছু পার্থক্য আছে?"

"নেই? আজ আমাদের মত কিছু মানুষের জন্য সমাজের একদম তলানিতে থিতিয়ে পড়া কিছু হতভাগ্য মানুষ আবার মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। বুর্জোয়া শ্রেণীশত্রুরা বুঝতে পারছে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে আসছে। বৈষম্য আর অত্যাচারের অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়ে নতুন ভোরের সূর্য উঠছে অমৃত। আর মাত্র কয়েকদিন। জাস্ট কয়েকটা দিন ব্যাস। তারপর সবকিছু শান্ত হয়ে যাবে। কালবৈশাখী থেমে যাবে চিরকালের মত। বর্ষা নামবে। সেই যে

বলছিলে ঝিরঝিরে বৃষ্টি..."

"কিন্তু একজন সামান্য নিম্নমধ্যবিত্ত প্রাইমারি স্কুলমাস্টার আর একজন হতভাগ্য স্বামীর কাছে সেই বিপ্লব মানে তার জীবনটা তছনছ হয়ে যাওয়া ছাড়া কিচ্ছু না বিশ্বাস করো। অবশ্য সে-ও অপেক্ষা করে আছে ওই ভোরের জন্য। না কোনও সার্বিক সাম্যতা বা কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্য নয়, সে রোজ অপেক্ষা করে করে একজন মানুষের জন্য। তার কাছে এই বিপ্লব, সাম্য, অধিকার কিছুই ম্যাটার করে না। সে শুধু স্বপ্ন দেখে একদিন এই ঝড় থামলে সেই মানুষটা আবার তার কাছে ফিরে আসবে।"

প্রতিমা উত্তর দেয় না। চুপ করে শুয়ে থাকে ছাদের দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পর বলে, "আচ্ছা, তুমি তো অন্য কাউকে... মানে বছর দুয়েক তো হয়ে গেল।"

"ধুর! একজন মানুষের সঙ্গে সংসার করা মানে তো শুধু হাত ধরে ফুটপাথে হাঁটা বা গঙ্গার ধারে কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকা নয়। সেই মানুষটার সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট বোঝাপড়া, দু তরফেই কিছুটা কম্প্রোমাইজ। আস্তে আস্তে মানুষটা আমাদের অভ্যেস হয়ে যায়, একটা ভীষণ কম্ফোর্টের জায়গা হয়ে যায়। ওসব অনেক হ্যাপা বাবা! আমার মতো অলস লোকের ওসব পোষাবে না।" কথা শেষ করে হাসতে থাকে অমৃত।

প্রতিমা চোখ বোজে। মাথার ভিতর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ, টেবিল ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ আর অমৃতের উপস্থিতির আওয়াজ। এই একটা আওয়াজ বোধহয় কোনও নির্দিষ্ট শব্দে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রতিমা জানে প্রত্যেকটা মানুষের যেমন একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, তেমনি একজন নির্দিষ্ট মানুষের আশেপাশে থাকলে তার যে একটা শব্দ পাওয়া যায়, তাও প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের নিঃশ্বাস নেওয়ার গতি, বুকের ধুকপুকানি, মুদ্রাদোষে আঙ্গুল মটকানোর আওয়াজ সবকিছুই একে অপরের থেকে আলাদা। তাই চোখ বুজেও সে অনুভব করতে পারে তার পাশে অমৃতের উপস্থিতি।

পাঁচ

রাতের ঘনত্ব কমছে। আর কিছুক্ষণ পরেই পূবদিকের আকাশে মেঘের চাদর ছিন্ন করে লালচে হলুদ সূর্য উঁকি মারবে। বৃষ্টিও সারারাতের অক্লান্ত আক্রমণের পর আত্মসমর্পণ করেছে। বড় কাঁঠাল গাছের পাতা

চুঁইয়ে টিনের চালে ঝরে পড়া জলের বিন্দুর টুপটাপ আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। একটু পরেই পাখি ডাকতে শুরু করবে। প্রতিমা উঠে দাঁড়ায়। মেঝেতে পাতা শালটা জড়িয়ে নেয় শরীরে। হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রটা লুকিয়ে ফেলে বুকের কাছে পোশাকের কোনও খাঁজে। তারপর এগিয়ে আসে অমৃতের দিকে। অমৃত বিছানায় শুয়ে, চোখ বন্ধ। মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

প্রতিমা অমৃতর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমি জানি আজ থেকে দুবছর আগের সেই রাতে তুমি জেগে ছিলে, আজও জেগে আছো। কিন্তু প্লিজ চোখ খুলো না। তুমি চোখ খুললে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। ভালো থেকো। সময়মতো খাওয়া দাওয়া করো, আর রাতের ওষুধটা খেয়ে নিও মনে করে। আজ আসি। আমি আবার ঠিক ফিরে আসব অমৃত। যদি সম্ভব হয় অপেক্ষা করো, যদি না করো তাতেও ক্ষতি কিছু নেই। তবে ভোর আসবে, আসবেই। দেখে নিও অমৃত।"

প্রতিমা প্রায় ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে। অমৃতর দু-চোখ তখনো বন্ধ। শুধু ঠোঁটের কোণে লেগে আছে একছিটে মনখারাপি হাসি। আর চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে উষ্ণ জলের ধারা। হঠাৎ বাড়ির বাইরে মোড়ের মাথা থেকে মুহূর্তের ব্যবধানে পরপর কয়েকটা শব্দ ভেসে আসে। ভারী বুটের আওয়াজ, সিসার বুলেট ছুটে যাওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ, সঙ্গে একটা ভোঁতা আর্তনাদ। সেই স্বরটা ভীষণ চেনা অমৃতর। চমকে উঠল সে। কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। ইচ্ছে করল ছুটে যেতে ঘরের বাইরে। কিন্তু ততক্ষণে অদ্ভুত এক সর্বনাশা ক্লান্তি গ্রাস করেছে তাকে। মনে হচ্ছে কোনও অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে তার চৈতন্য। দূরে জানালার পাল্লার ফাঁক গলে ভোরের নরম রোদ এসে পড়েছে চোখেমুখে। বাইরে পুলিশের সাইরেন, ভারী বুটের ছুটোছুটি আর চাপা গুঞ্জনে মিশে গেছে দূরের কোনও নাম না জানা মাজার থেকে ভেসে আসা ভোরের আজান। অমৃত ধীরে ধীরে আবার দু-চোখ বুজল। বড় ঘুম পায় তার।

সূচিপত্র

অন্য গদ্য
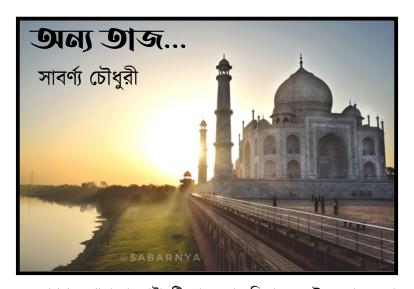
ব্যাগপত্র গোছানো মোটামুটি শেষ। কাল বিকাল হলেই রওনা দেওয়া যাবে ছোট্ট হিয়ার মনের ইচ্ছা পূরণ করতে। প্রায় অনেক বছর ধরে তার ইচ্ছা বেড়াতে যাওয়ার। কিন্তু যাব,যাচ্ছি এই করে করেই আর হয়ে ওঠে না তন্ময়দার। সরকারি অফিসে কাজ নেই এই ধারণাটা যে ঠিক কতটা ভুল, সেটা তন্ময়দাকে দেখলেই বোঝা যায়। ঘড়ি ধরে ঠিক পৌনে নটায় বেরনো বাড়ি থেকে আর ফিরতে ফিরতে সেই রাত সাড়ে আটটা কি নটা; এর মধ্যেই জীবন ঘুরপাক খায়। শেষ কবে পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন সেটা বোধহয় বৌদি ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখেছে। অনেক বলে কয়ে এতো দিন পর একটা প্ল্যান হয়েছে। ট্রেনের টিকিট কেটে এনে বৌদির হাতে দেওয়ার পর বৌদির তো হার্টফেল হওয়ার যোগাড়। তা যাই হোক, বাইরে যে যাওয়া হচ্ছে এটাই অনেক। মার্চ মাস, গরমটা কলকাতাতে একটু একটু জানান দিলেও দিল্লি আগ্রা যাওয়ার জন্যে বেশ ভালো মরসুম। তাই সব ভেবে চিন্তেই একদম দিল্লি আগ্রার প্ল্যানটা সেরে ফেলেছেন তন্ময়দা। শুক্রবার রাতের ট্রেন ধরে আগে আগ্রা, তার পর সেখান থেকে দিল্লি হয়ে অমৃতসরের লঙ্গর খেয়ে একদম প্লেন ধরে বাড়ি ফিরবে— মোটামুটি এরকমই প্ল্যান। তাই দাঁড়ি পাল্লা মেপে সব পনেরো কেজির মধ্যে রেখেছে তন্ময়দা, যাতে সহজে চেক-ইনে পাচার করে দেওয়া যায়। যাওয়ার আগের দিন রাতে বাড়ির সবাই মিলে খেতে বসার আগে হিয়া তন্ময়দা কে জিজ্ঞাসা করলো-

"বাপি তুমি আগ্রা গেছ আগে?"

"হ্যাঁ দেখেছি তো। তবে অনেক দিন হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, তাহলে ওই অ্যালবামের লোকটা কি তুমি?"

"হ্যাঁ, ওটা আমিই তো।"

"ইসসস ছিঃ! কি বাজে দেখতে, মোটা কালো গোঁফ, লম্বা লম্বা চুল আর খ্যাংড়া কাঠির মতো চেহারার ওই লোকটা তুমি? ইসসস..."

"হা হা হা... ওটা আমিই মা।"

"না, আমার বাপিকে অনেক ভালো দেখতে। ওটা তুমি না।"

বিয়ের আগে অর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করাকালীন বেশ কয়েকবার তন্ময়দা গেছিল দিল্লিতে। সেখান থেকেই এক দু'বার হয়তো তাজমহলেও গেছিল, সেই ছবিগুলোই রয়ে গেছে। হিয়া বোধহয় একবার খুলে দেখেছে; সেই থেকেই এসব কথা। হিয়ার ব্যাখ্যা যে একদম সঠিক সেটা কোনভাবেই বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজ কাজ করে করে তখন তন্ময়দার কী চেহারা, কিছুই মাথায় থাকে না, সংসারেও মন নেই। ছেলের এরম হাল দেখে জ্যেঠু-জ্যেঠিমা একটা বউ আনলেন ঘরে, তাতে যদি ছেলের মতি ফেরে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কাজের নেশাটা ছাড়ানো গেল না বটে, তবে অপরূপা বউয়ের চক্করে সংসারে একটু মতি এলো। বৌদি ঘষে মেজে এখন তন্ময়দাকে একদম শুধরে দিয়েছে। আগের আর এখনকার তন্ময়দার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

কিছুক্ষণ পর হিয়া আবার জিজ্ঞাসা করলো,

"বাপি, তোমার কেমন লেগেছিল তাজমহল?"

"সে অনেক বড় ঘটনা, এখন শুনতে গেলে তো রাত হয়ে যাবে। কাল সকালে উঠতে পারবে না আর স্কুলেও যাওয়া হবে না।"

"না না না... হবে না। আমি এখনই শুনবো।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আগে খাওয়াটা শেষ করে নে তার পরে।"

গল্প শোনার লোভে, বৌদিকে বিন্দুমাত্র না জ্বালিয়ে হিয়ার খাওয়া শেষ। বাকিরাও খাওয়া শেষ করার পরে সবাই মিলে চললো শোবার ঘরে।

শোবার আগে গল্প শোনা যে কোনো বাচ্চারই নিত্য নৈমিত্তিক দাবি; হিয়াও সেই দাবি থেকে সরবার পাত্রী না। শোবার আগে যথারীতি তন্ময়দাকে গল্প শোনাতেই হয়। এবারের বিষয় তাজমহল। ঘরের বাকি আলোগুলো নিভিয়ে অল্প করে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে, বিছানার পাশের ল্যাম্পটা জ্বেলে হিয়াকে কোলের কাছে নিয়ে বসল তন্ময়দা।

"বাপি বাপি, তুমি কেন গেছিলে আগ্রা?"

"তখন তো আমি কলকাতার অফিসে কাজ করতাম, ওদের কাজ ছিল এসব পুরনো বাড়ি,ঘর, বড় বড় মন্দির এসব নিয়ে দেখা শোনা করা। তো এরম একটা কাজেই আমায় একবার দিল্লি যেতে হয়েছিল। তো সেখানেই..."

"বাপি দিল্লিতে কি অনেক মন্দির আছে? বড় বড় বাড়ি আছে?"

"হ্যাঁ আছে তো। তাই জন্যেই তো আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিল। বাড়ি, মন্দির এসব গুলো ঠিক আছে কিনা সেগুলো দেখার জন্যে। তো আমরাও গেছি। এবার এক মাসের লম্বা কাজ ছিল, কিন্তু আমরা মোটামুটি দিন পঁচিশের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলার জন্যে হাতে প্রায় দিন তিন চার ছিল। তাই ওই কটা দিন আর কি করবো, সামনেই আগ্রা; আর ইতিহাস বইতেই দেখেছি তাজমহলের ছবি। তাই আর লোভ সামলাতে পারিনি, একদম ট্রেনের টিকিট কেটে হুশ করে চলে গেলাম আগ্রায়।"

"কিন্তু বাপি তুমি যে বল লোভ করা পাপ...!! তাহলে তুমি যে লোভ সামলাতে না পেরে চলে গেলে? মানে তুমি তো পাপ করলে।"

ইতিমধ্যে বৌদি, তন্ময়দাকে আকস্মিক একটা বাউন্সারের মুখে পড়ে যেতে দেখে আর হাসি সামলাতে পারলে না। প্রাণখোলা আওয়াজে হেসে উঠতেই হিয়া মায়ের দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টাল

সামলে নিয়ে তন্ময়দা আবার স্বমহিমায় বর্তমান।

"না মা, এ লোভ সে লোভ না। এটা হল জানার লোভ। এই যে ধর স্কুলে পড়াচ্ছে টু প্লাস টু মানে ফোর। এটা নিজে হাতে করে না দেখলে ভালো লাগে?"

"না তো। না দেখলে কিভাবে ভালো লাগবে?"

"সেই জন্যেই তো। আমিও নতুন জিনিস জানার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই এই লোভটা থাকা ভালো।"

"আচ্ছা। তার পর কী দেখলে?"

"আগ্রা শহরটা বেশ সুন্দর একটা শহর, এদিক অদিক গেলেই কিছু কিছু করে ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া যায়। যেমন সেই মোঘল যুগের কত কত দুর্গ, কত অস্ত্রশস্ত্র, আরো অনেক অনেক সৌধ পাওয়া যায় এদিক সেদিক। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও শির জাগিয়ে বসে আছে সেই তাজমহল। বুঝলি, এই সৌধের এমনিই টান। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে দিনে দিনে শুধু তাজমহল দেখবে বলে।"

"আচ্ছা। তার পর?"

"আমাদের প্ল্যান ছিল ওই তাজমহলটাই দেখা আর তার সাথে গোগ্রাসে বাকি জায়গাগুলোকেও ঢুঁ মারা যাতে দু'দিনের মধ্যে ঘুরে আবার ফিরে আসতে পারি দিল্লি। কিন্তু সে আর হল কই, রেস্ট নেওয়াও হল না, একবারে হানটান করতে করতে দিল্লি পৌঁছালাম, তার ঘন্টা খানেক পরেই ট্রেন ধরে আবার বাড়ি।"

"কিন্তু তুমি যে বললে হাতে পাঁচ দিন সময় ছিল, দুদিন ঘুরলে আর যাওয়া আসাতে আরো একদিন, তাহলে তো আরো দু দিন থেকে যায় হাতে, তাহলে এরম ছোটাছুটি করলে কেন?"

"আমার তো তিন দিন কেটে গেল শুধু তাজমহল দেখতেই। বাকি দিনে বাকি গুলো সামলাতে গিয়েই দেরি..."

"তাই...!!! এতো সুন্দর তাজমহল?"

"হ্যাঁ রে। একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি না। শ্রীকৃষ্ণের পর হয়তো এই দুনিয়ার দ্বিতীয় কোনো বস্তু যার জন্যে মানুষ এরম ভাবে পাগল।"

"আমায় আরো কিছু গল্প বলো না বাপি। আমি আরো শুনবো।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, আজ আর না। বাকিটা ট্রেনে যেতে যেতে বলবো।"

"না না না, আমি আজই শুনবো। তুমিই তো বললে জানার লোভ সব সময় ভালো, ওই লোভে পাপ নেই। তাহলে আমি তো এখন জানতে চাইছি তুমি বলছো না কেন?"

"ইয়ে মানে..."

পাশে শুয়ে শুয়ে বৌদি আবার একটা মুচকি হাসি দিল। তন্ময়দা নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছে। হাসতে হাসতেই তন্ময়দার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসির রেশ যেন আরো বেড়ে গেল।

"ওহ বাপি, বলো না, বলো না।"

"হ্যাঁ যেটা বলছিলাম..."

"হুম বলো। একদম শুরু থেকে বলো।"

"দিল্লি থেকে আগ্রা ট্রেনে ওই ৪-৫ ঘন্টা মত লাগে। আমরা তো আগে থেকে সেরম ভাবে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে যাইনি, আর অনলাইন টিকিট কাটাও ছিল না যে বুক করে নেব, তাই কাজ যেদিন শেষ হল সেদিনই দুপুর বেলা বেরিয়ে ওই দিন রাতের টিকিট কাটলাম। এমনি জেনারেল কম্পার্টমেন্টের। জেনারেলে এমনি ভিড় হয় কিন্তু যেখানে কাজ করতাম সেখানেরই এক কলিগের একজন চেনা জানা ছিল, তিনিই কটা সিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। এমনিতেই তাজমহলের জন্যে আগ্রা মোটামুটি বেশ জমজমাটি থাকে। তো আমরা ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশানে নামলাম। এটা মূল শহর থেকে একটু বাইরের দিকে, তাই শহরের মধ্যে আসতে গেলে একটা অটো চাই। তো বেশ খানিকক্ষণ দেখার পর একটা অটো পাওয়া গেল, আর

সেখান থেকেই সোজা চলে গেলাম আমাদের অফিসের গেস্ট হাউসে। আমাদের যাওয়ার সময়টা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই বিশেষ অসুবিধা হয়নি। আমরা পৌঁছালাম ওই ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ। গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে জানলাটা খুলেই..."

"তাজ দেখতে পেলে?"

"না না, তখনও কিন্তু আগ্রা বেশ ভালো অন্ধকারে ডুবে আছে। আগ্রায় আসলে ভোর হয় আমাদের এখানের থেকে বেশ কয়েক ঘন্টা পরে। তো সাড়ে চারটেতে এখানেও তেমন ভালো দেখা যায় না আর ওখানে তো বেশ ভালো রকম অন্ধকার। তার ওপর ওরম কালো... সে আর দেখা যায় নাকি।"

"ওহ আচ্ছা। তারপর।"

"শীতকালে যেহেতু একটু দেরিতে সূর্য ওঠে, তাই জন্যে তাজমহলের গেটও খোলে একটু দেরি করে। ওই ধর সাড়ে ছটা করে। তো আমি আর সেই রাতে ঘুমাতে পারিনি, সোজা চলে গেছি সকাল সকাল গেট খোলার আগেই।"

"তারপর..."

"গিয়ে দেখি খুব একটা না হলেও ওই ভোরবেলার অনুপাতে বেশ বড় লাইন রয়েছে, বেশিরভাগই বিদেশী। দেশী আর বিদেশীদের জন্যে যথারীতি আলাদা লাইন, যেহেতু টিকিটের ভাড়াটা আলাদা, তাই। ঢোকার জায়গাটা একটু অদ্ভুত রকম।"

"কেন কিরকম?"

"আসল যেটা তাজমহল সেখান দিয়ে ঢোকার কোন রকম জায়গা নেই। ঢুকতে হয় অন্য একটা জায়গা দিয়ে। সেখান দিয়ে ঢোকার পর একটা ভীষন সুন্দর বাগান পড়ে। তার মাঝে একটা সাদা শ্বেত পাথরের বেদি আছে, সেই বেদি পেরোলে একটা বিশাল উঁচু, প্রায় ধর এক তলা বাড়ির সমান একটা বিশাল বড় বেদি আছে। সেই বেদির পরেই শুরু হয়ে যায় যমুনা নদী। ওই নদীর উপর দিয়ে একটা ঝুলন্ত ব্রীজ আছে। সেই ব্রীজ পেরোলেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের তাজমহল।"

"আচ্ছা। তো বাবা নদীর ওপারেই তো এসব কিছুর ব্যবস্থা করতে পারে। তাহলে তো এতোটা আর ঘুরতে হয় না।"

"হ্যাঁ সেটা ঠিক বলেছ, কিন্তু তাতে একটা সমস্যা হত।"

"কী সমস্যা বাবা?"

"এই দেখো। ওই দিক দিয়ে যদি যাওয়া আসার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে অনেক হোটেল হত ওই দিকে, ঠিক এই দিকে গেটের সামনেটায় যেমন আছে। তাতে দিন রাত লোকের যাওয়া আসা, গাড়ি ঘোড়া, জ্যাম ঝঞ্ঝাট এসব থেকে আরো পলিউশান হত, আর তাতে তাজমহলের অনেক ক্ষতি হত। এই সব পাথর গুলো এই ধুলো বালিতে খুব নষ্ট হয়ে যায়।"

"আচ্ছা... কী বুদ্ধি বল বাবা...!"
"হা হা হা... তা ঠিক বলেছিস বটে।"

গল্প বলা থামিয়ে দিয়ে হিয়াকে ঘুম পাড়ানোর একটা আপ্রাণ চেষ্টা করলো তন্ময়দা। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হল না, আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল গল্প। কিছু বলতেও পারছে না, বলতে গেলেই নিজের জালে জড়িয়ে দেবে তকে হিয়া।

"আচ্ছা আমায় তাজমহলের গল্প বল।"

"সে বিশাল বড় গল্প, এভাবে বলতে গেলে তো রাত ফুরিয়ে যাবে রে। কি করে বলি বলতো।"

"না না, আমি জানি না। তোমায় বলতেই হবে।"

"কিন্তু কাল যে স্কুল আছে। কি মুশকিল... কই গো তুমি একটু বল না কিছু।"

ওদিকে বৌদিও হাত তুলে দিয়ে গোগ্রাসে গল্পগুলো গিলছে। তাই এখানে আর কিছু বলার জায়গাই নেই। বাধ্য হয়েই আবার ফিরে যেতে হল নিজের জায়গায়। শুরু হল গল্প বলা।

"ও বাপি, বলো না।"

"হুম বলছি দাঁড়া। একটু ভেবে নিতে দে। কোথা থেকে শুরু করবো।"

"আচ্ছা।"

"হুম শোন। সম্রাট আকবরের সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্য আকার আয়তনে বাড়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক দিক থেকেও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। একের পর এক বিয়ের মাধ্যমে আকবর মোঘলদের পরম শত্রু রাজপুতদেরও নিজের কাছে নিয়ে আসছিলেন আস্তে আস্তে। কিন্তু শুধু সাম্রাজ্য বাড়ালেই তো হয় না, বেড়ে যায় অনেক ভরণ পোষণের দায়িত্ব। সাথে সাথে খরচা পাতিও বেড়ে যায়। আর ঐশ্বর্যের দিক থেকে বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো হলেও রাজপুতদের থেকে তেমন রাজস্ব পাওয়া যেত না। তার ওপর আবার এই বার বার রাজনৈতিক কারণে বিয়ের জন্যে প্রচুর খরচা, সব মিলিয়েই দিনে দিনে রাজকোষ আরো দুর্বল হতে শুরু করে। আকবর মারা যাওয়ার পর সেই ব্যাটন সে পড়ে জাহাঙ্গীরের উপর। আর তার পরেই আসে শাহজাহানের কাছে, আর সেই সময়েই..."

"বাপি এই শাহজাহানই তৈরি করেছিল না তাজমহল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুই কী করে জানলি?"

"মা-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মা বলেছিল। এর পর কী হলো বলো না..."

"একে রাজকোষের এই হাল, তারপরে শাহজাহান হলো সৌন্দর্যের প্রেমিক। ব্যাস! তাই নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবে একটা স্মৃতিসৌধ বানানোর চিন্তা ভাবনাও করে ফেললেন। এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী। কিন্তু কি আর করা যাবে, প্রেম একদিকে আর বাকি সব একদিকে। তাই কিছু অল্প কিছু প্ল্যান করেই নেমে পড়লেন কাজে। রাজকোষের কথা ভেবেই প্ল্যান করা হল যে যতটা কম খরচে পুরোটা মিটিয়ে ফেলা যায় ততই ভালো। সেই জন্যেই যমুনা নদীর ধারটা বেছে নেওয়া হল।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"যমুনা নদীতে তখন অতি বৃষ্টির জন্যে প্রতি বছর বন্যা হত। তাই নদীর দু'ধারের জায়গা গুলোকে বাঁচানোর জন্যেই ওই জায়গাটাকে বাছা হয়। আর তা ছাড়াও প্রতি বছর বন্যাতেই প্রচুর খাবার নষ্ট হতো, সেই জন্যে ওসব জায়গা থেকে রাজস্ব আদায় করা বেশ চাপের ব্যাপার হয়ে যেত। তাই ওই জায়গাতেই তাজমহল বানানোর কথা ভাবা হয়। প্রথমটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ভাবা হয় সস্তায় কিভাবে বানানো যাবে। এখন যেভাবে টেন্ডার ডাকা হয় তো সেভাবে তখন দেশে বিদেশের নামি দামি সব আর্কিটেক্টদের ডাকা হলো। সব দিক বেয়ে চেয়ে শেষমেষ বেছে নেওয়া হয় মিমার শিনানকে। মিমার শিনান তখন মধ্য প্রাচ্যের একজন তরতাজা জোওয়ান ছেলে। চুলে পাক ধরেনি ঠিকই কিন্তু হাতের কাজে মোটামুটি সবদিকে তাক লাগিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে এক প্রকার। তাই তাকেই তলব করা হল এই বিশাল কাজের জন্যে।"

"আচ্ছা... কিন্তু এই লোকটাকেই কেন নিল?"

"কী করে তোকে বোঝাই বল তো, আসলে টেন্ডারের নিয়মটাই এরম, যে সবথেকে কম দামে ভালো জিনিস করে দিতে পারবে তাকেই নেওয়া হয়।"

"আচ্ছা, কী করে বুঝলো যে ও ভাল করতে পারবে?"

"এখানে আসার আগে ও যে সমস্ত কাজগুলো করেছিলো সেগুলোই ওর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। এতো সব প্রশ্ন করিস না তো, যেটা বলছি সেটা শোন।"

"আচ্ছা বলো।"

"তো নদীর ধারের বন্যা কবলিত জমিটাকেই ভালো ভাবে ব্যবহারের কথা ভেবে সেখানেই তাজমহল বানানোর কথা ভাবা হয়। আর রাজকোষের কথা ভেবে ব্ল্যাকস্টোনের। আসলে এই ব্ল্যাকস্টোন আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রধানত রাজপুত অঞ্চল থেকেই এগুলো পাওয়া যেত। তাই খরচা আর পুরোনো রাজস্বের কথা ভেবেই এই তাজমহল বানানো হয়। প্রায় দীর্ঘ বারো বছরের চেষ্টায় শেষমেশ যখন তাজমহল বানানো হয় ততদিনে অনেক কিছু বদলে গেছে। সেই তাজমহল দেখার জন্যে শাহজাহানও আর বেঁচে নেই, রয়ে গেছে তার স্ত্রী মুমতাজ। স্ত্রীর জন্যে বানানো স্মৃতিসৌধ আর দেখা হলো না তার।

ওই কালো তাজমহলের মধ্যেই রাখা হয় শাহজাহানের মৃতদেহ।”

“তার মানে ওর মধ্যে ভূত আছে...! আমি যাবো না।”

“হা হা হা। হ্যাঁ সে থাকতেই পারে। সেটা তো না গেলে বুঝতে পারবি না। তাই ঘুরতে তো যেতেই হবে। আর ওখানে তো আমি থাকবো। তাই তোর কোনো ভয় নেই।”

“আচ্ছা। তাহলে যাবো আমি।”

“তারপর শোন না। শাহজাহান তো মারা গেল, কিন্তু শাহজাহানের মনে একটা ইচ্ছা ছিল যে নদীর এপারে আর একটা তাজমহল বানানো হবে, তবে সেটা শ্বেতপাথরের, শুভ্র তাজ। আর দুই তাজের মধ্যে একটা ব্রীজ থাকবে যেখান দিয়ে তাদের পূর্ণিমার রাতে মিলন হবে। কিন্তু শাহজাহান তো আর নেই কিন্তু তার সেই ইচ্ছাপূরণের জন্যেই মুমতাজ শুরু করল ব্রীজ বানানোর কাজ। ততদিনে সম্রাট হয়ে মসনদে বসেছে ঔরঙ্গজেব। রাজকোষের দৈন্যদশা দেখে তখনি ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, মা মুমতাজকে বন্দী করে রাখা হয়। সেখান থেকেই বন্ধ হয়ে যায় তাজের কাজ। আর আজ সেই কালো তাজই আমরা দেখতে পাই, সাদা তাজ আর দেখা হলো না রে, বুঝলি...”

“হুম, কিন্তু মা কে বন্দী করলো কেন? এটা তো ভুল, মা কে কেউ বন্দী করে?”

“না করে না তো, করা উচিতও না।”

“তাহলে? ও যে করলো?”

“হুম, সেদিন না করলে আজ হয়তো এই দিনটাই দেখতে পারতিস না। আবার শুভ্র তাজ বানাতে দিয়ে হয়তো পথে বসতে হতো, সাথে সাথে হয়তো ইতিহাসেরও অনেক পালাবদল হয়ে যেত। আমরাও হয়তো এভাবে থাকতে পারতাম না।”

“হুম।”

বেশ অনেকক্ষণ ধরে গল্প শোনার পর হিয়া বেশ অনেক কিছুই বুঝলো বা বোঝার চেষ্টা করলো, তার পর একটা বিশাল করে হাই তুলে হঠাৎ বলে বসলো,

"আচ্ছা বাবা ওখানে গরু আছে?"

এটা শুনে একটা প্রকাণ্ড চড়া হাসি হেসে তন্ময় দা বললো, "হ্যাঁ আছে। তাই বেশি দূরে দূরে যাবি না, আমাদের সাথে সাথেই থাকবি। অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়।" "হুম" বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো হিয়া।

তন্ময়দা আর বৌদি বুঝলো আগের মাসের সেই গরুর তাড়াটা এখনো ভুলতে পারেনি হিয়া।

ছবি - সাবর্ণ্য চৌধুরী

[টিকা টিপ্পনিঃ- ইতিহাস নিয়ে লেখা যদিও তবু একটু অন্যভাবে ইতিহাসটাকে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই বদলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তাজমহল কিন্তু আদতে শ্বেতপাথরের তৈরি, ধবধবে সাদা রঙের। কালো পাথরের তাজমহল বানানোর কথা হয়েছিল, কিন্তু সেটা আর করা যায়নি। দ্বিতীয়ত, তাজমহল আসলে যমুনার দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে। উত্তর পাড়ে কৃষ্ণতাজ হওয়ার কথা ছিল। তৃতীয়ত, তাজমহল বানানোর কাজটা সম্পন্ন করেন ইশা আফেন্দি, যিনি আসলে মিমার শিনানের প্রিয়তম শিষ্য। মিমার শিনান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতে আসার নিমন্ত্রণ পেলেও বয়সের কারণে আসতে পারেননি। পরে ইশা আফেন্দি আসেন, কিন্তু সেটা শাহজাহানের আমলে। চতুর্থত, তাজমহলে আসলে মুমতাজের সমাধি রয়েছে, শাহজাহানের সমাধি যদিও রাখার কথা ছিল কৃষ্ণতাজে তবুও সেটা আর না হওয়ার জন্যে ওই মুমতাজের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। পঞ্চমত, তাজমহলের আশে পাশে কোন সেতু নেই, বানানো হত যদি কৃষ্ণতাজ তৈরি হতো। আর ঔরঙ্গজেব নিজের বাবা শাহজাহানকে নজরবন্দী করেছিলেন, নিজের মা কে না।]

সূচিপত্র

ব্যাটিংয়ের ব্যবসা

ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

অলঙ্করণ - অনির্বাণ ঘোষ

ব্যাটিং থাকত আমাদের পাশের পাড়ায়। প্রথম যেদিন ওর সাথে আলাপ হয়, নামটা শুনে ঘাবড়ে গেছিলাম। ব্যাটিং! এ আবার কেমন নাম? ব্যাটিং মানে তো ব্যাট করা। এ আবার কারও নাম হয় নাকি? শুনেই সে চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠেছিল, 'কেন হবেনে? মাইক গ্যাটিং হতে পারে, আর পল ব্যাটিং হতে পারেনে? আমি পল ব্যাটিং, ব্যাটিং পাল।'

মাইক গ্যাটিং তখন নামকরা ক্রিকেটার। ব্যাটিং তার খুব ভক্ত। ওদের পদবী পাল। ব্যাটিং, পালকে কায়দা করে পল উচ্চারণ করত আর সেটাকে তার নামের আগে ব্যবহার করত। পাড়ার মাঠে বন্ধুদের সাথে খেলতে নেমে শুধু ব্যাট করেই কেটে পড়ত। ফিল্ডিং এর জন্য ডাকাডাকি করলে, চোখ টোখ লাল করে বলত, 'আমার নাম পল ব্যাটিং! ওনলি ব্যাটিং, নো ফিল্ডিং।' বলেই বাড়ির দিকে ছুট লাগাত। বন্ধুরা এজন্য মাঝে মাঝে ওর ওপর রেগে যেত। কিন্তু ব্যাটিং ব্যাটটা ভালো করত বলে, আবার ওকে খেলতে ডাকতো। এইভাবে ব্যাটিং-ব্যাটিং শুনতে শুনতে সবাই ওর আসল নামটা ভুলেই গেল। পাড়ায়, বেপাড়ায় সবাই ওকে ব্যাটিং বলেই ডাকতে লাগলো।

ব্যাটিংরা চার পাঁচ ভাই। সেজদা ছাড়া অন্য দাদারা প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করেন। সেজদার লোহার ব্যবসা। সব ভায়েদের মধ্যে তার আর্থিক অবস্থাই একটু ভাল। ব্যাটিংয়ের বাবা নেই। মা আছে। সে সবার ছোট ভাই। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিকে আটকে গেছে।

একদিন বিকেলবেলা। আমরা পাড়ার রকে বসে আড্ডা দিচ্ছি, ব্যাটিং এল। এসেই বলল, 'আমি ঠিক করে ফেলেছি, সেজদার মত আমিও ব্যবসা করব। চাকরি ফাকরি করে জীবনে বড় হওয়া যাবেনে। বুঝলি? একটা সুন্দর বাড়ি করব। সামনে বাগান থাকবে। মায়ের জন্য একটা হেবি করে ঠাকুরঘর বানাব। মা সারাদিন খালি পুজো করবে। আর আমি সারাদিন বাগান করব।' আমাদের মধ্যে বিল্টু একটু বিচক্ষণ। সে আবার দু' বছর নরেন্দ্রপুর না কোথায় পড়াশোনা করেছে। কথা বলে ভেবে চিন্তে, অনেক সময় নিয়ে। ব্যাটিং এর এইসব প্ল্যান শুনলেই, সে তার একটা না একটা ফাঁক-ফোঁকর বের করে ফেলে। ব্যবসার কথায় ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, 'সারাদিন বাগান করবি যদি, ব্যবসা করবি কখন? তোর সেজদাকে দেখেছিস? বাগান তো অনেক দুরের কথা, সে রোজ বাজার যাওয়ারও সময় পায় না। দাঁত মেজেই গোলায় ছুটছে। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। ব্যবসা এমনি এমনি হয় না বাপি!' বলে চোখ বন্ধ করে আবার কী ভাবতে লাগল। বিল্টুর কথায় ব্যাটিং খেপে গেল। আমাদের সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'শোন, ব্যবসা আমার রক্তে আছে। আমি করবোই। আমার গুরু

বলেছে, একটা গেলাসে আদ্দেক জল আছে। কেউ দেখছে গেলাসটা আদ্দেক খালি, কেউ দেখছে আদ্দেক ভর্তি। যে দেখছে আদ্দেক ভর্তি, বাকিটা ভরলেই গেলাস ভরে যাবে, সে হল ব্যবসাদার। বুঝলি?' আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম। এবার বলে বসলাম, 'আর যে দেখছে গেলাসটা আদ্দেক খালি, সে কী?' শুনে ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে হেসে ব্যাটিং বলল, 'সে হচ্ছে বিল্টু। ওর দ্বারা জীবনে ব্যবসা- ফ্যাবসা হবেনে বুঝলি? ও নেগেটিভ লোক।' কথাটা শুনে বিল্টু সামান্য চোখটা খুলে বলল, 'বেশ তো পজিটিভ বাবু। তুমি ব্যবসা করো। করে দাঁড়াও। বাড়ি বানাও। আমরা তোমার গৃহপ্রবেশে গিয়ে লুচি খাবো।' বলেই আবার চোখের শাটার ডাউন করল। বিল্টুর দিকে তাকিয়ে ব্যাটিং শিম্পাঞ্জি আর ভাল্লুকের মাঝামাঝি একটা মুখভঙ্গি করল। তারপর গুম খেয়ে বসে রইল।

দু-তিনদিন ব্যাটিংয়ের আর দেখা নেই। কেসটা কী হল জানার জন্য সেদিন দুপুরে, ওদের বাড়ি চলে গেলাম। গলির ভেতর বাড়ি। গলিতে ঢুকতেই দেখি ব্যাটিংয়ের মেজদা সাইকেল নিয়ে আসছেন। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'অ! তুমিও খবর পেয়ে গেছ?' ঘাবড়ে গেলাম। কিসের খবর? অসুখ বিসুখ নাকি?

'না, মানে কদিন দেখা হয়নি তো- তাই।'

দাদা খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'দেখা হয়েই কি চারটে হাত বেরোত? যাও না। গিয়ে দেখো তোমার বন্ধুর কীর্তি। বড়দা আর সেজর আদরে বাঁদর হয়েছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।' বলে সজোরে প্যাডেল মেরে বেরিয়ে গেলেন। আমি গুটি গুটি বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

পুরোনো ধাঁচের পাচিল ঘেরা একতলা বাড়ি। কাঠের সদর দরজা। সেটাকেও ব্যাটিং এমন কায়দা করে রেখেছে, ঠেলে ঢুকলে আবার আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। রাত বারোটার আগে তাতে খিল পড়ে না। সারাদিন ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে কেউ না কেউ ঢুকছে, বেরোচ্ছে। পারফেক্ট অবারিত দ্বার। টুক করে সামান্য ঠেলে উঠোনে ঢুকে পড়লাম। ক্যাঁচ শব্দে দরজা আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ইঁট পাতা উঠোন। ডানদিকে পরপর খান চারেক ঘর। বাঁদিকে ছাদে ওঠার ন্যাড়া সিঁড়ি। ওপরে একখানা টালির চালের ছোট ঘর। সেটা ব্যাটিংয়ের। নিচে দাদারা আর মা থাকে। খুব গরমের সময় ব্যাটিং নিচে পালিয়ে আসে। তা না হলে সারাদিন ওই টঙের ঘরে।

উঠোনে কেউ নেই। দাদারা কাজে বেরিয়ে গেছে। মা বোধহয় শুয়ে আছে। চাপা গলায় ডাকলাম, 'এই ব্যাটিং! কোথায় তুই?' কোনও উত্তর

এলো না। নিস্তব্ধ বাড়ি। এবার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে একটু জোরে ডাকলাম, 'এই ব্যাটিং? তুই কি ছাদের ঘরে?' এবার একটা শব্দ এল। কিন্তু সেটা কিছুতেই ব্যাটিংয়ের নয়। আর শব্দটা এল বাড়ির পেছন দিক থেকে। ওদিকে শুনেছি ব্যাটিংদের খানিকটা বাগান আছে, তবে ওদিকে কখনো যাইনি। এবার গলা তুললাম।

'ব্যাটিং! কোথায় রে তুই? বাগানে নাকি?' এবার অরিজিনাল ব্যাটিং এর গলা শোনা গেল।

'আরে হ্যাঁ রে। উঠোনের পেছন দিক দিয়ে চলে আয়। আমি বাগানে।'

উঠোন ধরে এগিয়ে শেষ ঘরের পাশ দিয়ে একটা গলিরাস্তা বাগানে মিশেছে। বাগান বলতে সেরকম আহামরি কিছু নয়। ব্যাটিংয়ের মা গুচ্ছের তুলসী আর গাঁদা ফুলের গাছ বসিয়ে রেখেছে। ছেলেরা বেস্পতিবার পুজোর ফুল তুলসী আনতে ভুলে গেলে ওই দিয়েই ম্যানেজ করে। সেইখানে ব্যাটিং উবু হয়ে বসে আছে। আমি তার পিঠ দেখতে পেলাম। ব্যাটিংয়ের আড়ালে কিছু একটা আছে মনে হল। আবার সেই শব্দটা হল, আর একটা বোঁটকা গন্ধ পাওয়া গেল।

'ক'দিন ধরে তোর পাত্তা নেই। দুপুরবেলা বাগানে বসে আছিস কেন? কী করছিস এখানে?' বলতে বলতে আমি ব্যাটিংয়ের দিকে এগোতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে একগাল হাসল।

'হেব্বি ব্যাপার। দেখবি আয়। যা জিনিস জোগাড় করিচি ন্যয়, এইবার সবাই বুঝবে। কত ধানে কত চাল, বুঝিয়ে দেবে ব্যাটিং পাল। এই দ্যাখ।' বলে ব্যাটিং একটু সরে বসতেই আমি হাঁ হয়ে গেলাম। ব্যাটিংয়ের ওপাশে দড়িতে বাঁধা একটা কালো ছাগল। মাঝে মাঝে সে মুখ দিয়ে একটা বুররর–বুররর শব্দ বের করছে আর ছোট্ট লেজটা নাড়াচ্ছে। ওই শব্দই একটু আগে আমি শুনেছিলাম। অভ্যেস নেই বলে বুঝতে পারিনি ছাগলের প্রলাপ।

'এই মরেছে! কার ছাগল? কোথায় পেলি?'

'কার আবার? আমার! আমার ছাগল।'

'তোর! তুই ছাগল নিয়ে কী করবি?'

'ব্যবসা করব।'

'ও, মাংসর দোকান খুলবি?'

'না রে শালা। ওসব রক্ত ফক্ত আমার পোষাবেনে। আমি ছাগলের দুধ দোব বাড়ি বাড়ি। ছাগলের দুধের হেব্বি ডিমান্ড। পাড়ার বউদিরা খুব খোঁজে।'

'কত দিয়ে কিনলি?'

'কিনিনি। সেজদার গোলার দারোয়ান সুখলাল, এটা ওর। চেয়ে এনিচি। বলিচি ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দোব। সে তো

কিছুতেই দেবেনে বুঝলি? খালি বলছে, ছোটাবাবু, ইসকো হামার শশুর বাড়িসে দিয়েছে। ইজ্জত কা সওয়াল। আমি তখন ব্যাটাকে অন্য চাল দিলুম।'

'কী চাল দিলি?'

'বললুম, ছাগল না দিলে সেজদা কে বলে দোব তুমি গোলা থেকে বাবরি ঝেড়ে দাও। খিক খিক খিক! ব্যস! মাল চুপ!'

'কিন্তু তুই তো আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসবি বলছিস। তাহলে ব্যবসা করবি কী করে?'

'আরে সে এখন নাকি? আগে এই ছাগলের দুধ বেচে আরো অনেক ছাগল কিনব, তারপর।'

'আসার সময় তোর মেজদার সঙ্গে দেখা হল। মনে হল খচে আছে।' ব্যাটিং একটু বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'আরে আর বলিসনি। ছাগল এনিচি বলে গোটা বাড়িই খচে আছে। শুধু সেজদা ছাড়া।'

'সেজদার ছাগলে মত আছে?'

'আরে ও নিজে ব্যবসা করে ন্যয়? বোঝে। মা-কে ওই তো বোঝাল। বলল, শখ হয়েছে। করতে দাও। নাহলে মা বলছিল বাড়ির মধ্যে এসব রাখা যাবেনে। ছাগল নাকি এদিক ওদিক খুব হাগে। হ্যাঁরে? সত্যি?'

আমি ছাগলের দুধের ব্যাপারটা শুনেছি। কিন্তু হাগার ব্যাপারে কিছুই জানি না।

বললাম, 'ক'দিন এনেছিস এটাকে?'

'কাল সন্ধেবেলা।'

'এখনো হাগেনি?'

'না। একবার-ও হাগেনে। মায়ের ভয়ে বাগানেই বেঁধে রেখেছি। হাগলে তো এখানেই হাগত। দ্যাখ না? তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

'আমি ছাগলের হাগা চিনি না।'

'আরে শালা হাগা দেখলেই তো হাগা বলে বোঝা যায়। অত চেনাচিনির কী আছে? আমি সিওর, এ খজরা ছাগল কাল থেকে একবার-ও হাগেনে।'

'কী খেতে দিয়েছিস ওকে?'

'ওইটেই তো মুশকিল হয়ে গেছে। কাল থেকে কিচ্চু খাচ্ছেনে।'

'এই রে! না খেলে হাগবে কী করে? সুখলাল কে জিজ্ঞেস করিসনি কী খায়?'

'আরে তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল ছিলুনি। তারপর জম্মকাল শুনে এইচি ছাগলে কী না খায়, পাগলে কী না বকে। তাই ভাবলুম এ হয়তো যা দোব তাই খেয়ে নেবে। কিন্তু এখন দেখছি এ তেমন ছাগল নয়।'

'নাও ঠ্যালা! এবার কী খাইয়ে হাগাবি?'

'সেইটেই ভাবছি। কাল রাতে রুটি দিলুম, খেলুনি। বাড়িতে ডিমের ঝোল হয়েছিল, আধখানা ডিম ঝোলে চটকে বাটি করে ধরলুম- সে ঢুঁ মেরে ফেলে দিল। শালা ডিমটাই নষ্ট। নিজের ভাগ থেকে দিয়েছিলুম মাইরি।'

'আরে, ছাগল-গরু এরা হল তৃণভোজী প্রাণী। মাছ মাংস ডিম এদের দেয় না। ঘাস-লতা-গাছ-পাতা এসবই ওদের খাবার। "ছাগলে ফুলগাছ খাইয়া গেল।" বইতে পড়িসনি?'

'আরে, সে হলে তো এতক্ষণে মায়ের গ্যাঁদা গাছের ছাদ্দ করে দিত। একটাও ছোঁয়নে দ্যাখ!'

ব্যাটিংয়ের পাশেই বাগানে গাঁদা ফুলের গাছগুলো অক্ষত অবস্থায় হালকা-হালকা দুলছে। ছাগল সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

'মনে হয় গাঁদা গাছ তেতো। তাই ছোঁয়নি।'

'অমনি? তেতো? তুই চিবিয়ে দেখিচিস?'

'যাঃ! আমি কেন চিবোব? আমি কি ছাগল? কেটে ফেটে গেলে থুতু দিয়ে গাঁদা ফুলের পাতা লেবড়ে দিয়েছি।'

আমাদের আলোচনা মনে হয় ছাগলটার ভাল লাগছিল না। সে একটা কাঁপা কাঁপা আওয়াজ ছাড়ল। ব্যা-হ্যা-হ্যা–হ্যা! ব্যাটিং অমনি শশব্যস্ত হয়ে তার দিকে ফিরে খুব আদুরে গলায় বলতে লাগল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে সোনা? খিদে পেয়েছে? খাবে? কী খাবে বলো? যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াব। শুধু তুমি পোচুর দুধ দিও। আমার ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলেই আমি তোমাকে রূপোর ঘন্টা গড়িয়ে দোব। গলায় নিয়ে টুনটুন করে ঘুরে বেড়াবে, মানিক আমার।' ব্যাটিংয়ের আদরের আতিশয্যে ছাগল ঘাবড়ে গিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল।

'কী বুঝছিস ব্যাটিং? কী দিলে খাবে মনে হয়?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনি মাইরি।' ব্যাটিংকে খুব অসহায় দেখাল।

'জীবজন্তুদের মনের কথা বোঝা খুব শক্ত।' আমি গম্ভীর হয়ে বললুম।

'তুই তো কুকুর পুষতিস, একটু চেষ্টা করে দ্যাখ না?'

'আরে কুকুর আর ছাগল এক হল?'

'জন্তু তো দুটোই। একটু দ্যাখ। পেরে যাবি। মাইরি গুরু। আমার ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে আমি তোকেও ঘন্টা গড়িয়ে দোব।'

'ভাগ শালা! আমি ছাগলের মতো গলায় ঘন্টা বাঁধব?'

'আরে ছাগলের মতো কেন বাঁধবি? তোর মুখটা মোটেই ছাগলের মতো নয়। বরং একটা গরু-গরু ভাব আছে।'

'রইল তোর ছাগল। আমি চললুম।'

'এই, এই। খচে যাসনি। ইয়ার্কি মারছিলুম।' ব্যাটিং খপ করে

আমার হাত ধরে ফেলল।

‘আমি কোথায় তোর হেল্প করতে চাইছি, আর তুই আমাকে গরু-ছাগল বলছিস?’

‘না না, আরে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব একটু না করলে জমে? তুই একটু দ্যাখ ওস্তাদ, ছাগলটা ঠিক কী চাইছে।’

ব্যাটিংয়ের পাশে উবু হয়ে বসে ছাগলটার দিকে তাকালাম। খুব সিরিয়াস প্রাণী। মুখের ভেতর কোথাও কোনও ছ্যাবলামির চিহ্ন নেই; বরং একটা অদ্ভুত কাঠিন্য। সুন্দর মেয়েদের পয়সাওলা বাপের মুখে ঠিক এই ভাব থাকে। রক্তিম হলুদ দুটো চোখ সিরিয়াল কিলারের মত শান্ত অথচ নিষ্ঠুর। এর সাথে কুকুরের তুলনা? অসম্ভব। কুকুরের চোখে কতরকম অভিব্যক্তি খেলা করে। এর চোখ ভাবলেশহীন। এ ছাগল যে কী চাইছে তা বোঝা আমার বাপেরও অসাধ্য। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি দেখে ছাগলটা হঠাৎ একটা বুরররররর শব্দ করে হাল্কা মাথা নাড়া দিল। ব্যাটিং অমনি আমার কাঁধ খামচে ধরে, ‘ওই দ্যাখ, বলছে, বলছে। কিছু একটা বলছে। একটু বোঝার চেষ্টা কর।’ বলে চেঁচিয়ে উঠল। ব্যাটিংয়ের চিৎকার অথবা আমার গরুর মত মুখ কিংবা দুটোই হয়তো ছাগলের খুব বিচ্ছিরি লেগেছিল। আচমকা টক-টক করে ছাগলটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর পাঞ্জাব লরীর স্পীডে ছুটে এল আমাদের দিকে।

খটাং – করে হাঁটুতে কিছু লাগল। মনে হল হাতুড়ি। বাপরে! বলে চেঁচিয়ে উঠেই আমি ব্যাটিংয়ের ঘাড়ে উল্টে পড়লাম। ব্যাটিং ‘উরিশশালা!’ বলেই গাঁদা গাছের ওপরে! মচ-মচ করে পাঁচ ছটা গাছ মাটিতে কেতরে গেল। প্যাচাৎ করে খানিকটা কাদা জল ছিটকে এল ব্যাটিংয়ের মুখে। ব্যাটিংয়ের মা রোজ বাগানে জল দেয়। বাগানদেবী আজ ঋণ শোধ করলেন। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের কাদা টাদা মুছে ব্যাটিং বলল, ‘ওঠ।’ কথাটার মানে ধরতে পারলাম না। হাঁটুর ব্যথায় মাথা কাজ করছে না।

ভ্যাবলার মত বললাম,’কোথায় উঠব?’

‘আমার ওপর থেকে ওঠ হারামজাদা।’ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ব্যাটিং।

আমি বেশ ওজনদার, ব্যাটিং রোগাপাতলা। তার ওপর বেকায়দায় পড়েছে। কোনোরকমে নিজেকে টেনে তুললাম। আমার শুধু হাঁটুতে লেগেছে, তার সর্বাঙ্গে। ব্যথার সঙ্গে জলকাদাও। মুখে কাদা-টাদা মেখে তাকে পাড়ার পঞ্চা মাতালের মতো দেখতে লাগছে। রোজ সন্ধেবেলা এইরকম চেহারায় পঞ্চাকে তার বউ নর্দমা থেকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে যায়।

‘কোথাও কেটে কুটে যায়নি তো ব্যাটিং? তাহলে গাঁদাগাছের পাতা

খেঁতো করে একটু থুতু দিয়ে-'

'চুপ মার! শালা, ঢ্যামনা ছাগল!'

'খিস্তি করছিস কেন ভাই? আমার কী দোষ?'

'তোকে নয়, ছাগলটাকে বলছি। শালা ওরম তেড়ে এসে গুত্তে দেবে কে জানত।'

'ছেড়ে দে ভাই। অবলা জীব। তার ওপর উপোসী। মাথার ঠিক নেই মনে হয়।'

'অবলা? কে অবলা? কিসের অবলা? যে ছাগলের মালিক-চাকর জ্ঞান নেই সেরম ছাগল আমি পুষবোইনি শালা। আমি ওকে কেটে ক্লাবে ফিস্টি দোব। উরি – বাবা রি – ইইই!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ব্যাটিং যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে।

এইবার ছাগলটার দিকে চোখ গেল। সে ঘাড় হেলিয়ে খুনির চোখে আমাদের দেখছে। ব্যাটিং যে দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধেছিল সেটা খুব লম্বা নয়। গোঁত্তা খেয়ে আমরা ছিটকে পড়ায় দূরত্ব আরো একটু বেড়ে গেছে। তাই কাছে আসতে পারছে না। কিন্তু এক ঢুঁ মেরে সে খুশি নয় এটা বোঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই শরীর বাঁকিয়ে দড়িতে টান দিচ্ছে। ঢুঁ-এর ঝোঁক চেপে গেছে। বললাম, 'খুব দড়ি টানছে ব্যাটিং! খুলে ফুলে যায় যদি—?'

বলতে না বলতেই সেটা ঘটল। দড়িটা ব্যাটিং পাঁচিলের দেওয়ালে একটা '৲' মার্কা হুকে পেঁচিয়ে রেখেছিল। সেটা হঠাৎ ঠস করে দেওয়াল থেকে খসে পড়ল। বু-র-র-র-র! শব্দে আবার ধেয়ে এল কালো আতঙ্ক! এবার সোজা ব্যাটিংয়ের দিকে।

হাঁটুর ব্যথা ফ্যাথা ভুলে পাঁই পাঁই করে ছুটলাম দরজার দিকে। পেছন থেকে একটা ধপাস শব্দ, সেই সঙ্গে ব্যাটিংয়ের চিৎকার। উঠোন পেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গিয়ে আমার বিবেক দংশাল। বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে, মানে শিংয়ের মুখে ফেলে পালানো বন্ধুর কাজ নয়। হয়তো সারাজীবনের মতো বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। ব্যাটিং আমাদের ফিস্টে ভাল চাঁদা দেয়। পরে অন্য বন্ধুরাই হয়তো আমাকে ভীতু-টিতু বলে যা-তা করবে। আর তাছাড়া বাঘ ভাল্লুক তো নয়, ছাগল। সেরকম বুঝলে না-হয় লাফিয়ে পাঁচিলে উঠে পড়ব। এইসব ভাবতে ভাবতে বুকে বল এসে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠোনে একটা শ্যাওলাধরা আধলা ইঁট দেখতে পেলাম। সেটাকে তুলে নিলাম। মরার আগে মেরে মরব। ইঁটটা নিতেই নিজেকে বেশ সাহসী মনে হল। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে আবার এগোলাম বাগানের দিকে। কিন্তু ব্যাটিং আর চেঁচাচ্ছে না কেন? ও ছাগল তো এক ঢুঁ-এ শান্ত হবার পার্টি নয়। বিশেষ করে যখন দড়ি খুলে গেছে। এতক্ষণে ব্যাটিং এর উপর্যুপরি আর্তনাদ কানে আসার

কথা! তাহলে কি? মনে হতেই সারা শরীর ঠান্ডা! না, না! এসব কী ভাবছি? এ হতে পারে না। এরকম হতেই পারে না। উঠোন পেরিয়ে, শেষ ঘরের দেওয়ালের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে মাথা বাড়ালাম। আরে এ কী! এ কী দেখছি! এমন বিচিত্র দৃশ্য কেউ দেখেছে কি না আমার জানা নেই!

বাগানের মধ্যে বিভ্রান্ত ব্যাটিং পা ছড়িয়ে থেবড়ে বসে। আশেপাশে বিধ্বস্ত গাঁদাগাছ। ছাগলটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই হিংস্র ভাবটা আর নেই। বরং অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আর তূরীয় আনন্দ সেই ইস্পাতকঠিন ছাগবদনে। গাঁজাখোরের মতো চোখ দুটো আধবোজা। মুখটা সামান্য আকাশের দিকে তুলে সে কিছু একটা চিবোচ্ছে। চিবিয়েই চলেছে। ইঁটটা বাগিয়ে ধরে চেঁচালাম, 'ব্যাটিং, ঠিক আছিস তো?' রোবটের মতো ধীরে ধীরে সে ঘাড় ঘোরাল। চোখের চাউনিটা ঠিক সুস্থ মনে হল না। ছাগলটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'শেষ, সব শেষ। সব শেষ করে দিল ওই ঢ্যামনা ছাগল।' খুব ঘাবড়ে গেলাম। ছাগলটা কী চিবোচ্ছে যে ব্যাটিং এমন হাহাকার করে উঠল? 'তোকে কামড়ে টামড়ে দিয়েছে নাকি?' বলে ভাল করে ব্যাটিংয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গর দিকে নজর ফেললাম। নাঃ। রক্তারক্তির কোনও চিহ্ন নেই। তাহলে? করেছে টা কী?

'কী চিবোচ্ছে ওটা?'

'কাছে এসে দ্যাখ শুয়ার। ওখান থেকে বক্তিতা মারাচ্চিস কেন? আমার ব্যবসা চৌপট হয়ে গেল রে!'

'কাছে গেলে যদি গুঁতোয়? তোকে ক'বার গুঁতিয়েছে?'

'ওই, একবারই। এখন আর গুঁতুচ্ছে না। চিবুচ্ছে।'

'কী চিবুচ্ছে? তোর হাত-পা? না অন্য কিছু–' বলতে বলতেও রাশ টেনে ধরলাম। এখন ঘেঁটে আছে। কী বুঝতে কী বুঝবে! ধীরে ধীরে ব্যাটিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইঁট হাতে রেডিই আছে। ছাগলের বাচ্চা বেগড়বাঁই করলেই দোব বসিয়ে। ছাগল কিন্তু আমাকে পাত্তাই দিল না। একচোখে বারেক দেখে নিয়েই আবার চবর-চবর চিবোতে লাগল। এবার দেখলাম, ব্যাটিং আর ছাগলের মাঝখানে বাগানে লম্বা হয়ে আছে একটা সাদা কাপড়। সরু কালো পাড়। আংশিক ছিন্নভিন্ন-চর্বিত। আমি সেদিকে তাকিয়েছি দেখেই ব্যাটিং ভেউভেউ করে উঠল।

'মায়ের থান। পাঁচিলে শুকুচ্ছিল। হারামজাদা টেনে নাবিয়েছে। সব্বনাশ হয়ে গেল রে!'

'সেরেছে! জ্যেঠিমার কাপড় নাকি? কেড়ে নিলিনা কেন?'

'কাড়তে গেলেই গুঁতুতে আসছে। ছেড়ে দিলে গুঁতুচ্ছে না। চিবিয়েই

যাচ্ছে শালা।’

‘যাক, এ একরকম ভাল হল। গুঁতুতে এলেই মুখে কাপড় ধরে দিবি।‘

‘হ্যাঁরে, আমার বাপের কাপড়ের ব্যবসা আছে ন্যয়?’

‘জ্যেঠিমার কাপড়ের ওপর দিয়ে গেছে ভাল। তোর কিছু চিবিয়ে দিলেই হয়েছিল।‘

‘আরে ভাই, তুই বুঝতে পারছিসনি। এরপর বাড়িতে মা আর এই ছাগলের ব্যবসা করতে দেবে? আসল সব্বনাশ তো সেটাই।’

‘তোর এর পরেও ছাগল নিয়ে ব্যবসা করার সাহস আছে?’

‘তাহলে? একে কি এমনি এমনি পুষব?’

‘যার ছাগল তাকে ফেরত দিয়ে আয়। সুখলালকে।‘

‘বলছিস?’

‘হ্যাঁ। এসব ব্যবসা ভাল নয়। গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে জীবন যাবে। তার ওপর জ্যেঠিমা বিকেলে উঠে কাপড়ের এই হাল দেখলে, তোর কী হাল করবে সেটা ভাব। একদিন আধদিন মেনে নেবে হয়তো, কিন্তু দুদিন ছাড়াই কাপড় চিবিয়ে দিলে?’

খুব চিন্তিত হয়ে মাথা নামিয়ে ব্যাটিং ঘাড় নাড়ল। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘এত কথা বিল্টুদের বলিনিস। আমার হেবি পোঁদে লাগবে শালারা।’

‘বলব না। আমার হাঁটুতে ওষুধ লাগাতে হবে। যা ঝেড়েছে তোর ছাগল।’

‘আমার নয়। ওকে আমার ছাগল বলবিনি। ও শালা সুখলালের ছাগল। সে নিজেও যেমন ছাগল, এটাকেও বানিয়েছে ছাগল।’ কাঁইকাঁই করে উঠল ব্যাটিং।

‘চল তাহলে। এক্ষুনি একে বিদেয় কর। দুজনে গিয়ে দিয়ে আসি।’

ব্যাটিং উঠে দড়ির একদিক ধরে টান মারল। অমনি বু-উ-উ-উ-উ আওয়াজ ছেড়ে সে হাঁটতে লাগল। কিন্তু মুখ থেকে কাপড় ছাড়ল না। জ্যেঠিমার থান ছাগলের মুখে ঝুলতে ঝুলতে চলল।

‘ব্যাটিং, কাপড়টা?’

‘ও ওর মুখেই থাক। কাড়তে গেলেই আবার গুঁতুবে। এ কাপড় বাড়িতে রাখা যাবেনে। রাখলেই হাজার ঝামেলা। মা-কে বলব হাওয়ায় উড়ে টুড়ে গেছে। আরো একটা ফ্যায়দা আছে বুঝলি?’

‘ছেঁড়া কাপড়ের আবার ফ্যায়দা কী?’

‘বলিচি না, ব্যবসা আমার রক্তে। সুখলালকে এইটে দেখিয়ে বলব কাপড়ের দাম দে। না হলেই সেজদাকে বলে দোব বাবরির কথা।’

‘এ তো ব্ল্যাকমেল?’

‘না। ব্যবসা। বেশি না বকে চল তো। এবার মা উঠে পড়বে।’

অবারিত দ্বার ঠেলে তিনজনে বেরোলাম। সামনে দড়ি ধরে ব্যাটিং। তারপর কাপড় মুখে ছাগল। পেছনে আধলা হাতে আমি। বিচিত্র শোভাযাত্রা।

‘একটা ব্যাপার কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি ব্যাটিং।‘

‘কী?’

‘ছাগল আসলে তৃণভোজী-ফোজি কিচ্ছু নয়। বইতে মনে হয় প্রিন্টিং মিস্টেক আছে।’

‘তাহলে?’

‘ছাগল হল থানভোজী। থান কাপড়-ই এদের আসল খাবার বুঝলি?’

‘হুম্মম। চুপ করবি না জুতো খাবি?’ ব্যাটিং অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল।

তিনজনে হেঁটে চললুম সুখলালের বস্তির দিকে।

আমরা দুজনে নিঃশব্দে। ছাগল ‘চবর-চবর’ শব্দে।

সূচিপত্র

যাত্রা
সপ্তর্ষি বোস
অলঙ্করণ - সাবর্ণ্য চৌধুরী

১

পুরনো ডায়েরিগুলো নিজের হাতে নষ্ট করতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু... আর উপায় কী!

প্রোফেসর তরফদারের হাতে এই মুহূর্তে সময় নেই বললেই চলে। পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায়ও তাই নেই; যাতে করে এই তথ্য, গবেষণার কাগজপত্র ওদের হাতে না চলে যায়। ওরা অত্যন্ত চতুর। আর ওরা যাদের পাঠিয়েছে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃসাহসী কিছু এজেন্ট, ভাড়াটে খুনি।

মোবাইল ফোনের সিম কার্ডটা আগুনে ছুঁড়ে দেওয়ার আগে একটু ইতস্তত করলেন প্রোফেসর। আর একবার নিশ্চিত হয়ে নিলে কি ভালো করতেন? নাঃ, থাক। আজ তাঁকে যারা খবর দিয়েছে তাদের সঙ্গে তিনি নিজেই একসময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন ঠিকই— কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ এরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। কেউ তিরিশবছর আগে কলেজের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আবার কেউ তাঁর গবেষণা জীবনের শুরুর দিকের দীর্ঘদিনের সঙ্গী। বছরপাঁচেক আগে যখন এদের কাউকেই জানতে না দিয়ে তিনি হঠাৎ করেই দেশে ফিরে এলেন আর উড়িষ্যার এক সমুদ্রশহরে বসতি শুরু করলেন, তারপর থেকে এদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে কদাচিৎ। তারপর, আজ ভোরবেলা আচমকা অন্য গোলার্ধ থেকে একটা ফোন...

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেন প্রোফেসর, বিকেল চারটে কুড়ি। আর ঠিক তিন ঘন্টার মধ্যে সাউথের একটা মেইল ট্রেন আছে। রিজার্ভেশন নেই। না থাকাই মঙ্গল। তবে এসি টু টিয়ারে উঠে পড়তে পারলে কিছু একটা ব্যবস্থা তিনি করে ফেলতে পারবেন। সঙ্গে টাকা থাকলে, এই দেশে সুবিধার অভাব হয় না বলেই তিনি এতদিন প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু... ট্রেনটা কোনও কারণে মিস হলেই! মিস হলে যে ঠিক কী হবে সেটা ভাবতে তাঁর একটু হলেও ভয় করছে। এমন নয় যে জীবনের তিপন্নটা বছর তিনি খুব নিরামিষ কাটিয়েছেন। তবে কিনা একসঙ্গে তিনটে মহাদেশের পাঁচটা মহাশক্তিধর ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে এর আগে বোধহয় কাউকে লড়তে হয়নি।

ভুল তিনি একটা করেছিলেন। আর সেটা করেছিলেন বছর পাঁচেক আগে। ইউরোপের স্থায়ী নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ ছেড়ে যখন তিনি

এই দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে সেই হবে যথেষ্ট। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাঁকে অন্তত তিনটে কোম্পানিতে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়েছিল তাঁর ফরমুলেটেড ড্রাগটির বিষয়ে। তিনি বহুদিন আগেই অনুমান করেছিলেন আবিষ্কার হলেও ট্রায়ালে এই ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য যে পরিমাণ মানবজীবনের আহুতি প্রয়োজন হবে তার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। একাধারে জীবনদায়ী অথচ তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বলিত এই ওষুধটির ফান্ডিং হিসেবে দুনিয়ার তাবড় কয়েকটি ফার্মেসি বহুজাতিক এতদিন ধরে প্রোফেসরকে পেমেন্ট করেছে পাউন্ড এবং ডলারে।

বিকেলের দিকে খরগপুরের এক অধ্যাপক বন্ধু ফোন করে এই ট্রেনটার হদিস দিলেন। বললেন, "সাউথের দিকে যায়, নতুন ট্রেন, সপ্তাহে তিনদিন। আজকের দিনটা ফাঁকাই থাকার কথা।"

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল, কলকাতায় যে ইউনিভার্সিটিতে অতিথি শিক্ষকের কাজ করেন তিনি তাদের একটি ল্যাবরেটরিতে চড়াও হয়েছিল কিছু দুষ্কৃতী। সেখানে কিছু পাওয়া না গেলেও এরা যে ওষুধের হদিস না পেলে তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না সেটা বেশ বুঝতে পারছেন প্রোফেসর। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠছে না বুঝতে পেরে অর্থাৎ তিনি এই ওষুধ কারও হাতে তুলে দেবেন না বুঝতে পেরেই বিপক্ষ বাঁকা পথ নিয়েছে। তাঁকে খুঁজতে যারা আসছে তারা এই বিশ্বের কুখ্যাত কিছু দুষ্কৃতী! এরা কাজ করে বড় বড় কর্পোরেশন এবং রাজনৈতিক দলের হয়ে। এরা কখনো খালি হাতে ফেরে না। ওষুধটা ওদের চাই-ই চাই। শেষমেষ তার গবেষণার আসল কাগজপত্র পাওয়া গেলে সেটা নিয়ে এতগুলো কোম্পানি কিভাবে রফা করবে সেটা প্রোফেসর জানেন না কিন্তু এটা খুব ভাল করেই জানেন যে সেইটা হওয়ার আগে বা পরে তাকে এরা নিকেশ করবেই। তাই পুরনো নতুন যত ডায়েরী আছে, যেখানে তার গত দশবছরের গবেষণার কিছু না কিছু নোট লেখা আছে, সবই পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আর তারপরেই, পালাতে হবে।

২

ইন্টারনেটটা এত স্লো হয়ে পড়ল হঠাৎ করে যে শ্রুতিগল্পটা আর শেষ করা হল না অতীনের। এতক্ষণ ইউটিউবের একটা চ্যানেল "সত্যি যদি এমন হয়" থেকে একটা থ্রিলার শুনছিল সে। বিভিন্ন নতুন গল্প

প্রতিদিন আপলোড হয় এখানে। কে লেখক, কে পড়ছে জানা নেই কিন্তু গল্পগুলো খুবই ভালো বলতে হবে।

ইন্টারনেট মানুষের জীবন কতটা অন্যরকম করে দিয়েছে ভাবতে ভাবতে আরেকটা স্টেশন পেরিয়ে গেল অতীন। ট্রেনটা কলকাতা থেকে অনেকটাই দূরে চলে এসেছে। খানিকটা পশ্চিমে চলে আসার দরুণই সম্ভবত, শীতের বিকেল পাঁচটা পেরিয়ে যাবার পরেও, সূর্যের আলোর অল্প আভা দিগন্তে দেখা যাচ্ছে। একেই টু টায়ার তায় ফাঁকা ট্রেন, কম্বলটা গায়ে মুড়িয়ে নিয়ে জানলার আরেকটু কাছ ঘেঁসে বসলো সে। পর্দাটা সরিয়ে দিল সামনের বার্থের দিকে। সেখানে অবশ্য আছেন একজন। মাঝবয়সী ভদ্রলোক খড়্গপুর পেরোনোর পর থেকেই ল্যাপটপে চোখ আর হেডফোনে কান দিয়ে বসে আছেন। চোখে রিমলেস চশমা, গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট, চোখ দুটো কেমন যেন বিড়ালের মত মিটমিটে। দৃষ্টিটা মোটেই পছন্দ নয় অতীনের, এদিকে তল্পিতল্পা দেখে মনে হচ্ছে ইনিও শেষ স্টেশনের যাত্রী। উপরের বার্থে কেউই আসেনি এখন পর্যন্ত এমনকি একটা বার্থ সম্ভবত চার্টেও ফাঁকা ছিল! একটু বেরোনো যাক ক্যুপে ছেড়ে। ট্রেনে উঠবার সময় পাশের ক্যুপেতে একজন সুন্দরীকে দেখেছিল মনে পড়ল তার। তার বয়সীই হবে। বাঙালি হলে আলাপ জমানো যাবে'খন।

৩

সদ্য কৈশোর পেরোনো একটি ছেলে কলকাতা থেকে চেন্নাই যাওয়ার ট্রেনে উঠেছে, আইআইটিতে তার সেমিস্টার শুরু হবে। ট্রেনে ওঠার পরেই তার ক্যুপে সিটের নিচে একটা বেওয়ারিশ ট্রলি পাওয়া যায়, আর সেই ট্রলির ভেতরে একটা প্লাস্টিকে মোড়া লাশ! আরপিএফ কে জানানোর পরে কটক স্টেশনে ঘন্টাখানেক ট্রেন দাঁড়ায়। রুটিন কিছু তদন্ত করে, কামরাটা পাল্টে যাত্রীদের আবার রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হয় বটে কিন্তু তার পরেও কিছু রহস্যজনক ঘটনা ঘটতে থাকে ট্রেনের মধ্যে। ছেলেটির প্রথম থেকেই গোয়েন্দার মতো হাবভাব, কিছুক্ষণ পরে পাশের ক্যুপের একটি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং প্রথম দেখাতেই প্রেম! বিশাখাপত্তনম আসতে না আসতেই ছেলেটি আর মেয়েটি একসঙ্গে বাথরুমে ঢুকে প্রথমে সিগ্রেট খায়, তারপর খায় চুমু। অবশেষে ট্রেন চেন্নাই ঢুকবার আগে ছেলেটি বুঝতে পারে যে খুন এবং অন্যান্য ঘটনাগুলোর পিছনে এই মেয়েটিই দায়ী।

সবমিলিয়ে গল্পটা খুব ভালো না হলেও সিনেমাটা ব্লকবাস্টার হিট হয়। কিন্তু পরিচালক শ্রীনাথ মুখার্জি ঠিকই জানেন তিনি জিনিসটা বানিয়েছিলেন খাজা। গুচ্ছের টেকনিক্যাল ভুল, যুক্তির ফাঁকফোকর এসব তাঁর সিনেমায় আজকাল বড্ড বেশি। তবে বাংলায় এই ধরনের সিনেমা তিনি ছাড়া কেউই বানায় না তাই যাই বানান তাই সুপারহিট।

এই মুহূর্তে তিনি নিজের পরিচালিত এই সিনেমাটাই ল্যাপটপে চালিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন গত তিন ঘন্টা যাবৎ। এবং তিন ঘন্টায় তিনি সিনেমাটার মাত্র চল্লিশ মিনিট দেখতে পেরেছেন! এর চেয়ে বেশি দেখতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। বাণিজ্যিক ছবির সফল নির্দেশক শ্রীনাথ বোকা একেবারেই নন, তিনি ভালোই জানেন এবারে একটা ভালো কিছু বানাতেই হবে। একেবারে নতুন কিছু। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ল্যাপটপ থেকে চোখটা তুললেন তিনি। সামনের বার্থের ছেলেটি কিছুক্ষণ হল পাশের ক্যুপের দিকে গেছে। সেখানে একটি মেয়ের আর তার গল্প জমেছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ধীর আলাপ, টুকরো হাসির শব্দ। উপরের বার্থ এখন অব্দি ফাঁকা। এই সময় ফোনটা করে ফেলা যাক, পরবর্তী ছবির গল্পটা রেডি করে নিতে হবে।

৪

বিদেশি থ্রিলার পড়তে বসলে সায়নী দাশগুপ্তর সময়ের খেয়াল থাকে না। আর খেয়াল থাকে না চুনো মাছের টক খেতে বসলেও। ঘটনাচক্রে আজ দুপুরবেলা দুটোই ছিল মেনুতে। বাঁ হাতে সদ্য প্রকাশিত পেপারব্যাকটা ধরে, ডান হাতে ভাতের সঙ্গে মাছের টক মেখে খেতে খেতে, বেলা গড়িয়ে কখন সন্ধে হয়ে গেছে সেটা তিনি খেয়াল করেননি।

গল্পটা একবার পড়তে শুরু করলে আর ছাড়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা অধিকাংশ ইংরেজি থ্রিলার পেপারব্যাকের মতো বড় বড় কর্পোরেশন, পাওয়ার পলিটিক্স, কর্পোরেট ক্রাইম — এইসব নিয়ে সুতো বোনেননি লেখক। বরং গল্পের শুরুটা একেবারেই সাদামাটা। একটি টিনএজার মেয়ে প্রথম একা যাচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেনে। সঙ্গীতের ছাত্রী মেয়েটি ট্রেনে যেতে যেতে প্রথমে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটা স্ট্যাটাস আপডেট করেছিল। তাতে লিখেছিল, "প্রিয় বন্ধুরা আপনারা আমার কমেন্টবক্সে একটা করে শব্দ লিখুন, আর আমি তাই নিয়ে আপনাদের গান গেয়ে শোনাবো!" নেহাতই সময় কাটাতে আর মজার ছলে দেওয়া স্ট্যাটাস। কিন্তু সেখানে কয়েকশো কমেন্টের

ভিড়ে একটা মাঝ বয়সী লোকের কমেন্ট ছিল অন্যরকম। লোকটার প্রোফাইল পিকচারে দেখা যাচ্ছে ফ্রেঞ্চকাট, হালকা ঘোলাটে কাচের রিমলেস সানগ্লাস, পরনে কালো লেদার জ্যাকেট। আর সেই অন্যরকম কমেন্টটাই চোখে পড়ে যায় সাইবারক্রাইম সেলের এক দুঁদে গোয়েন্দার। সেই থেকে শুরু হয় তদন্ত, সেখান থেকে খুলে যায় বিস্তৃত অপরাধের জাল। প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং গল্প! পাতা থেকে চোখ তোলা যায় না, তবে চোখ তুলতেই হল।

কারণ একটা ফোন এসেছে। ফোনটা এসেছে সায়নীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীনাথ মুখার্জির নম্বর থেকে, এই মুহূর্তে বাংলার এক নম্বর চিত্রপরিচালক। পরের ছবিটা উনি বানাতে চান লকড রুম মার্ডার নিয়ে। এর আগে শ্রীনাথের দুটো ছবির গল্প সায়নী লিখেছিল তবে সেসব অনেক আগের কথা। ইদানীং নিজের ছবির গল্প বাঙালি পরিচালকরা নিজেরাই লেখেন। শ্রীনাথ তো বটেই। কিন্তু পরপর দুটো সিনেমা সমালোচকদের মতে হিট উইকেট হওয়ার পরে সে আবার ফিরতে চায় তার বন্ধু কলমচির কাছে।

তবে শ্রীনাথ চাইলেও সায়নী তাকে মার্ডার মিস্ট্রি দিতে রাজি নয়। তাড়াহুড়ো করে বানানো ছবিগুলোয় যেভাবে 'লজিক্যাল মিসটেক' এর ছড়াছড়ি আজকাল তাতে করে সে গল্পলিখিয়ে হিসেবে তার সুনাম বাজিতে ফেলতে রাজি নয়। অবশেষে রফা হল এই যে, সায়নী তাকে নিজের মতো একটা গল্প লিখে দেবে, আর শ্রীনাথ তার উপর নিজের মতো করে চিত্রনাট্য বানাতে পারবে। অনেকদিন আগে একটা স্পাই থ্রিলারের প্লট সায়নী ভেবেছিল, যেটা এই মুহূর্তে শ্রীনাথের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবার ঘাই মারল তার মাথায়। কিন্তু এক্ষুনি এটাকে লিখে ফেলতে হবে, অন্তত কয়েকটা লাইন। নাহলে আবার কখন কোথায় হারিয়ে যায় বলা মুশকিল। ফোনটা কানে নিয়েই সায়নী ল্যাপটপ অন করল, শ্রীনাথের কথা আর শোনা যাচ্ছে না। নেটওয়ার্কের সমস্যা। লিখবার জন্য 'গুগল ডকস' এ গিয়ে, বোল্ড লেটারে টাইপ করল, "যাত্রা : স্টোরিলাইন"। তারপর কয়েক লাইনের গ্যাপ দিয়ে শুরু করলো লেখা

"পুরনো ডায়েরিগুলো নিজের হাতে নষ্ট করতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু... আর উপায় কী!"

সূচিপত্র

ক্লিট: নারীর অরগাজমের উৎস নাকি এলডোরাডো?

অনির্বাণ ঘোষ

Frenzy of Exultations by Władysław Podkowiński

১৯২৪, কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক,

মধ্যরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পাশের ঘরের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন যুবতী। তার পুরুষ সঙ্গীটি তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। যুবতীটি টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। এই লেখাটির জন্য সকালবেলা অবধি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কিছুক্ষণ আগের অভিজ্ঞতা টাটকা থাকাকালীন লিখে ফেলার প্রয়োজন। প্রতিরাতেই তিনি এটা করেন। গত পনেরোদিনের অন্য রাতগুলির মতো আজকেও যদিও বা নতুন কিছু লেখার নেই, তবু লিখতেই হবে। যুবতীটি অভ্যস্ত দ্রুত হাতে লিখতে লাগলেন-

যৌনক্রীড়ার সময় - শুরু আনুমানিক রাত্রি এগারোটা, স্থায়ী হয় পনেরো মিনিটের জন্য।

সঙ্গমের আগের ক্রীড়া- দশ মিনিট।
সঙ্গম চলেছে -আনুমানিক চার মিনিট।
পুরুষ সাবজেক্টের অরগাজম- হয়েছে।
নারী সাবজেক্টের অরগাজম- হয়নি।

এই ক'টি লাইন লেখার পরে আরো কিছু লিখলেন যুবতী, প্রাথমিক ক্রীড়া চলাকালীন তার শরীরের কোন অঙ্গ স্পর্শ করেছেন পুরুষটি, সেই স্পর্শ কতটা সংবেদনশীল ছিল, এই সব। লেখা শেষ করে আলো নিভিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকার পরেও ঘুম এল না। কয়েক মাস আগে তার লেখা গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞানীমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছে। এ.ই. নার্জানির নাম এখন ইউরোপের প্রায় সব বায়োলজিস্টরা জানেন, বিশেষত যারা যৌনতা বিষয়ে গবেষণা করছেন। প্রথমত একজন মহিলা গবেষক, তার ওপরে গবেষণার বিষয় নারীর যৌনতৃপ্তি, যে বিষয়ে এর আগে করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্রটি ছিল এক ইহুদী, পুরুষ মনোবিদের, নাম সিগমুন্ড ফ্রয়েড। ১৯০৫ সালে ফ্রয়েড তার প্রবন্ধ, যা কি না বিজ্ঞানী মহলে এখন 'লেকচার সিরিজ' নামে বিখ্যাত তাতে লিখেছিলেন-

'নারীর চরম যৌনতৃপ্তির উৎস তার যোনিপথ। ক্লিটোরিস কেবলমাত্র বয়ঃসন্ধীকালের মেয়েদেরই শারীরিক আনন্দ দেয়, তারপরে বিবাহিত জীবনে তার চরম আনন্দের একমাত্র পথ যৌনসঙ্গম,এই সঙ্গমে কোনো নারী যদি চরম আনন্দ না পান তাহলে সেই নারীটি যৌনতায় অক্ষম, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।'

এর প্রায় দুই দশক পরে নার্জানি দু’শো বিবাহিতা নারীর সাক্ষাৎকার নিলেন, তাদের প্রত্যেকের যৌনাঙ্গের পরীক্ষা করলেন। এর পরে তার গবেষণার রিপোর্টে লিখলেন,

‘যৌন ক্রীড়ার সময়ে চরম আনন্দের মূহূর্তে পৌঁছনোর জন্য নারীর ক্লিটোরিসের উত্তেজনা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। আমার গবেষণায় আমি লক্ষ করেছি যে যোনিপথ এবং ক্লিটোরিসের মধ্যের দূরত্ব দেড় থেকে চার সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়। যে সব মেয়েদের এই দূরত্ব দেড় থেকে আড়াই সেন্টিমিটারের মধ্যে তারা শতকরা ৭০ ভাগ সময়ে অরগাজমের উপলব্ধি হয়। বাকিদের যৌন সঙ্গমকালীন অরগাজম একেবারেই হয় না।’

এভাবে ফ্রয়েডকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস এর আগে কেউ কখনও দেখায়নি। যুবতীটি নিজে ফ্রয়েডের খুবই ঘনিষ্ট। তাদের মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ চলতে থাকে। নার্জানি তার গবেষণাটিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কয়েক মাস আগে নিজের ওপরে একটি অস্ত্রোপচার করান। হলবন নামের এক সার্জেন করেন অপারেশনটি, নার্জানির নিজের ক্লিটোরিসটিকে তার যোনিপথের দেড় সেন্টিমিটারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। বিজ্ঞানীমহলে এই অপারেশনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে, তারা অপেক্ষায় আছে এর হলবন-নার্জানি প্রসিডিওরের ফলাফল জানার জন্য। অপারেশনের পনেরো দিন পর থেকে নিয়মিত যৌনসঙ্গমে রত হচ্ছেন নার্জানি, তার সঙ্গী কয়েকদিন পরপর বদল হয়, এ ব্যাপারে তার স্বামীর সায় আছে, বিয়ের আগেই তিনি হবু স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আদতে পুরুষদের ভালবাসেন, বিয়েটা হয়েছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য। কিন্তু অপারেশনের পর থেকেই নার্জানি খেয়াল করছেন যে তার ক্লিটোরিসের সংবেদনশীলতা আগের থেকে অনেক কমে গেছে, এখন স্বমেহনেও অরগাজম পেতে অসুবিধা হয় তার, সঙ্গমে কোনোকালেই তিনি চরম আনন্দ পাননি। দু'বার অপারেশনটি করার পরেও কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া গেল না তাহলে।

সেই রাতে নার্জানি জেগে রইলেন। তার পরের গবেষনাপত্রটিতে লেখা হবে যে হলবন-নার্জানি অপারেশন বিফল হয়েছে ক্লিটোরিসের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে। শুধুমাত্র যোনিসঙ্গমে নারী কখনই অরগাজম পেতে পারেন না। নার্জানিকে কেউই চোখে দেখেননি, ছদ্মনামের আড়ালে থাকা নারীটির পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছু বছর পরে। বেঁচে থাকাকালীন তাঁর আসল পরিচয় জানতেন যে হাতে

গোনা কয়েকজন বৈজ্ঞানিক তাঁদের মধ্যে একজন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এই মেয়েটির প্রতিপত্তি এবং অর্থের বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাৎসী অস্ট্রিয়া থেকে সপরিবারে লন্ডনে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন ফ্রয়েড। এ.ই. নার্জানি আসলে গ্রীস এবং ডেনমার্কের রাজকন্যা, মন্টেকার্লোর বিপুল সম্পত্তির মালকিন, ব্রিটেনের প্রিন্স ফিলিপের জ্যেঠিমা এবং এক পৃথিবী বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক তার প্রপিতামহ। কোপেনহেগেনের প্রাসাদের একটি ঘরে নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে থাকা যুবতীটির আসল নাম মারি বোনাপার্টে।

মারি বোনাপার্টে যখন এইসব গবেষণাপত্র লিখছেন ততদিনে 'ফেমিনিজম' শব্দটির সৃষ্টি হয়ে গেছে, ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে নারী স্বাধীনতার ঢেউও ছড়িয়ে পড়েছে এর মধ্যেই। নিউইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডনে নিয়মিত ভাবে দেখা যাচ্ছে 'সাফ্রাজেট'দের। ভোট দেওয়ার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে চাকরী পাওয়ার সুযোগ, খবরের কাগজে সাংবাদিকতার সমান অধিকার এমন নানা দাবীদাবার জন্য সরব হয়েছেন নারীবাদীরা। আজ ২০২২ সালে এই প্রবন্ধ পড়ার সময়ে পাঠক আপনি হয়ত ভাবছেন এই সবই তো ইতিহাস। সাফ্রাজেটরা যে তাদের দাবী আদায়ে সফল হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি, ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে প্রথম ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় মহিলারা। তারপর পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, আজ থেকে আশি বছর আগে ফেমিনিস্টদের যা দাবী ছিল আজ অনেক অংশেই স্বাভাবিক সমাজব্যবস্থার অঙ্গ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেমিনিজমের বোধও এগিয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে। আজও কর্মক্ষেত্রে 'জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি' নিয়ে সরব হন ফেমিনিস্টরা, ইংল্যান্ডের বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠানে 'ইক্যুয়াল পে গ্রেড' না থাকার জন্য কয়েকমাস আগেও উত্তাল হয়েছিল সোসাল মিডিয়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখনও প্রতিনিয়ত নিজেকে বুঝতে শিখছে, নিজের অন্ধকার দিকগুলোকে চিহ্নিত করে এগিয়ে আসছে সমাজসংস্কারে।

কিন্তু নারী যৌনতার কী হল? সেটাও তো তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশ। যৌনতাকে বাদ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের কথা তো ভাবাই যায় না! মারি বোনাপার্টের সেই বিখ্যাত পেপারটি প্রকাশ হওয়ার পর আরো ১০০ বছর কেটে গেছে। তাহলে এখন মেয়েদের যৌনজীবন কেমন? সাম্প্রতিককালের গবেষণায় কী পাওয়া গেল? নিশ্চই উপরে আলোচিত বাকি বিষয়গুলোর মতো এই 'সেক্সুয়াল ইক্যুয়ালিটি'র ক্ষেত্রেও বর্তমানে সচেতন সমাজ অনেকটা এগিয়ে এসেছে?

২০১৭ সালে আমেরিকা প্রকাশিত একটি রিসার্চ পেপার অনুযায়ী প্রতি চারজন নারীর মধ্যে মাত্র একজন সঙ্গমের সময়ে নিয়মিত ভাবে অরগাজম পান। কেবলমাত্র যোনিসঙ্গমের মাধ্যমে অরগাজম পাওয়া মেয়েদের সংখ্যা ১৮ শতাংশ। তাদের পুরুষসঙ্গীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ৯০ শতাংশ। আলো কই? এ তো অন্ধকার! এই 'অরগাজম গ্যাপ' নিয়ে ফেমিনিস্টরা কি সরব নন? যথেষ্টই আলোচনা হয় এই বিষয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে সেই আলোচনা বাকি নারীবাদী সংবাদগুলির সঙ্গে মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় জায়গা করে নিতে পারে না। তার কারণ সামাজিক ট্যাবু। খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় যতটা স্বচ্ছন্দে ‘মেয়েদের সমান চাকরীর সুযোগ দেওয়া হোক’ শীর্ষক প্রতিবেদন লেখা যায় ততটা সহজে ‘প্রতিটি মেয়ে তাদের সঙ্গীর কাছে প্রতিবার সেক্সের সময় অরগাজম দাবী করুক’ এই শিরোনামে কলাম ভরানো যাবে না। কারণ যৌনতার বিষয়ে অতি-আধুনিক সমাজের মানসিকতা আজও মধ্যযুগীয়। এই বিষয়ে যে খবরগুলি আপনি পাবেন সেগুলো খবর না, ক্লিক বেট নিউজ- ‘সঙ্গিনীকে বিছানায় সুখী করার ১০টি উপায়’ অথবা ‘গার্লফ্রেন্ডকে বিছানায় খুশি করার জন্য এই পাঁচটি খাবার আপনাকে খেতেই হবে’।

এখানে অনেকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। এক, ভ্যাজাইনাল সেক্সে এত কম মেয়ের অরগাজম হয়? এটা সত্যি? দুই, যদি এটা সত্যিই হয় তাহলে কই মেয়েদের তো এই নিয়ে কথা বলতে দেখি না। প্রকাশ্যে হয়ত তারা এই নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায়, কিন্তু আমার স্ত্রী বা প্রেমিকাটি তো আমাকে প্রতিবার সেক্সের পর বলে না, ‘এই এবারে আমার অরগাজম হয়নি।’ আসুন এবারে এই দু'টো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে জানাই যে ভ্যাজাইনাল সেক্স, মানে পরিষ্কার বাংলায় পুরুষের লিঙ্গ নারীর যোনির মধ্যে প্রবেশ করে আগুপিছু করার যে যৌন ক্রিয়া, তাতে মেয়েটির অরগাজম পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য! বিশ্বাস করুন, পেনিস যতই মোটা বা লম্বা হোক না কেন, ওই দণ্ডটি ভ্যাজাইনায় সারাদিন লাফালাফি করলেও আপনার সঙ্গিণীর অরগাজম হবে না। আশা করি এবারে আপনার মনোযোগ পেয়েছি, এখন একটু অ্যানাটমি আর ফিজিওলজির পাঠ নিন। যতটুকু এখানে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক ততটুকুই সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনাকে 'বোর' করার অভিপ্রায় আমার একদমই নেই।

অরগাজম একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেক্সের ক্রিয়া চলাকালীন চরমতম যে আনন্দের মুহূর্ত তাকে অরগাজম বলে ধরা হয়। অরগাজমের সময়ে শরীরে এন্ডরফিন, ডোপামিন, অক্সিটোসিন জাতীয় কিছু হরমোনের ক্ষরণ বেশি হয়। এর ফলে মানসিক শান্তি আসে। ডিপ্রেশন কমাতে সাহায্য করে অরগাজম, আবার এর ফলে ঘুমও ভাল হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি সময়ে অরগাজম হয় বীর্যপাতের মধ্য দিয়ে। তাই পুরুষের অরগাজম চোখে দেখা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'কোড' করা বলে। কিন্তু মহিলাদের অরগাজমের অনুভব পুরুষদের মতো হলেও তার কোনো কোড নেই, অর্থাৎ নিশ্চিত ভাবে বীর্যপাতের মতো কোনো ঘটনা দেখা যায় না। কখনও যোনিপথের ক্ষরণ বেশি হয়, কখনও তলপেটে, কোমরে মোচড় (পেল্ভিক কন্ট্রাকশন) অনুভব করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষ সঙ্গীটির নিশ্চিতভাবে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। তবে দু'টি ক্ষেত্রেই একটি মিল আছে।

অরগাজমের ভিত্তিটি দাঁড়িয়ে রয়েছে স্নায়ুর উত্তেজনার উপরে। শরীরের বিভিন্ন সংবেদনশীল অংশে স্পর্শ পেলে এই উত্তেজনা বাড়ে এবং তা একসময় চরমে পৌঁছে অরগাজমের অনুভূতিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে থাকে সেই সময়ের মানসিক অবস্থা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি যৌন আকর্ষণের মাত্রা, রক্তে নির্দিষ্ট কিছু হরমোনের ওঠানামা। কিন্তু অরগাজমের প্রাথমিক শর্তই হল স্নায়ুর যথেষ্ট পরিমান উত্তেজিত হওয়া।

পুরুষদের লিঙ্গের সামনের স্ফিত অংশে যাকে গ্লান্স বলা হয় এবং লিঙ্গের গায়ে (শ্যাফট) কয়েক লক্ষ স্নায়ু এসে শেষ হয়েছে, এদের বলে নার্ভ এন্ডিং। এই স্নায়ু দিয়েই যৌনতার সময়ের আনন্দ বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। পিচ্ছিল যোনিপথে আসা যাওয়া করার সময় এই স্নায়ুগুলির উত্তেজনাই একসময়ে অরগাজমে নিয়ে যায় পুরুষকে। অর্থাৎ পুরুষের অরগাজমের জন্য পেনিসকে এইভাবে ব্যবহার করতেই হবে। পুরুষের স্বমেহন বা ম্যাস্টারবেশনের পদ্ধতিও এই নিয়মে বাঁধা।

মেয়েদের যোনি বা ভ্যাজাইনা কিন্তু এরকম নয়। যোনিছিদ্রের নিচের দিকের কিছু অংশে এমন কিছু নার্ভ এন্ডিং আছে, কিন্তু যোনির ভিতরের দেওয়ালে এমন স্নায়ুর সংখ্যা ভীষণই কম। এতই কম যে স্পর্শ অনুভূতইই হয় না। ভ্যাজাইনার দেওয়ালে বা তার ঠিক উপরে থাকা সারভিক্সে অপারেশন করার জন্য তাই গায়নোকোলজিস্টদের কোনো অ্যানাস্থেসিয়ার ব্যবহারই করতে হয় না! তাহলে মেয়েরা তো

বেশ বুঝতে পারে যে যোনিপথে কিছুর প্রবেশ হচ্ছে, সেটা কী করে হয়? ওই দেওয়ালে চাপ অনুভব করার জন্য কিছু স্নায়ু আছে, যোনিপথ প্রসারিত হলে সেই স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এই চেতনা পৌঁছায় যে ওখানে কিছু একটা আছে, কিন্তু এই স্নায়ু যৌন আনন্দ দিতে অক্ষম।

তাহলে জি-স্পট? সে কি মিথ্যে? আর এই যে ১৮ শতাংশ মেয়েরা ভ্যাজাইনাল ইন্টারকোর্সের সময়ে যে অরগাজম পাচ্ছে সেটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? এবারে এই আলোচনায় আসি। এর জন্য ভ্যাজাইনাকে ত্যাগ করে তার একটু উপরে এবং আশেপাশের দিকে তাকাতে হবে। মারি বোনাপার্টে একশো বছর আগে যা বলে গিয়েছিলেন তাই সত্যি। ক্লিটোরিস ছাড়া মহিলাদের অরগাজম অসম্ভব।

গ্রীক ভাষায় ক্লিটোরিস শব্দের একটা অর্থ হল চাবি। গ্রীকরা আজ থেকে প্রায় তিনহাজার বছর আগেই জানত যে ওইখানেই নারীর যৌন তৃপ্তি লুকিয়ে আছে। এই ক্লিটোরিসটা আসলে কী?

খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে পুরুষের পেনিসের প্রতিসম অঙ্গ হল মেয়েদের ক্লিটোরিস। আকারে খুবই ছোট হলেও ক্লিটোরিসেও পেনিসের মতো পেশী থাকে, উত্তেজিত হলে ক্লিটোরিসেও রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং তা পেনিসের মতোই শক্ত হয়ে ওঠে, এবং পেনিসের মতোই ক্লিটোরিসেও অজস্র স্নায়ুপ্রান্ত বা নার্ভ এন্ডিং থাকে, এর সংখ্যা প্রায় ৮০০০! প্রতি বর্গমিলিমিটারে হিসাব করলে ক্লিটোরিসে থাকা নার্ভ এন্ডিং এর সংখ্যা পেনিসের সবচেয়ে সংবেদনশীল সামনের অংশ গ্লান্স পেনিসের থেকেও প্রায় ৫ গুণ বেশি।

নারীর যৌনাঙ্গের একেবারের উপরের দিকে আচ্ছাদনের মতো অংশটি হল হুড, তার নিচে খুবই ছোট সামান্য দানার মতো অংশটি হল ক্লিটোরিস। এই ক্লিটোরিসের শুধু সামনে এগিয়ে থাকা অংশটুকুই কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায়, একে বলে ক্লিটোরাল গ্লান্স, একদম পেনিসের মতোই নামকরণ। বাকি অংশ যেটা চামড়ার নিচে থাকে তার নাম বডি। বডি থেকে দুই দিকে দুটি অংশ নেমে আসে, যাদেরকে বলা হয় ক্রুরা। ক্লিটোরিসের উপরে থাকা হুডটি তৈরি হয় যোনির যে ভাঁজ থেকে তার নাম লেবিয়া মাইনরা। লেবিয়া মাইনরার বাইরে থাকা আকারে বড় ভাঁজটি হল লেবিয়া মেজরা। ক্লিটোরিসের নিচেই থাকে মূত্রনালী, তার নিচে থাকে যোনিছিদ্র, যেখান থেকে ভ্যাজাইনাল টানেল বা যোনিপথের শুরু। ক্লিটোরিসের দু'টি ক্রুরা এই যোনিপথের উপরের

দুই পাশে থাকে। ক্লিটোরিসে থাকা স্নায়ুগুলি গ্লান্স থেকে শুরু হয়ে বডি বেয়ে দুই ক্রুরার পৌঁছয়, আবার কিছুটা উপরের দিকে হুডেও বেশ কিছু স্নায়ু ছড়িয়ে থাকে।
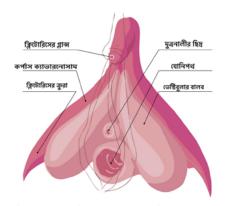
কর্পাস ক্যাভারনোসাম পেনিসেও থাকে, এর মধ্য দিয়ে রক্তসঞ্চালনের ফলে পেনিস দৃঢ় হয়। একই ঘটনা ক্লিটোরিসের ক্ষেত্রেও ঘটে।

মূল চিত্র - ইন্টারনেট

ক্লিটোরিসকে দুইভাবে উত্তেজিত করা সম্ভব। একটি হল ডিরেক্ট বা সরাসরি, যা সম্ভব হয় ক্লিটোরিসের গায়ে ঘষা লাগার মাধ্যমে। অন্যটি হল ইনডিরেক্ট অথবা পরোক্ষ ভাবে, এটি সম্ভব হয় ক্লিটোরিস থেকে বেরিয়ে আসা স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে। উপরের অনুচ্ছেদেই লিখলাম যে ক্লিটোরিসের উপরে থাকা হুড এবং দুই ক্রুরার মধ্যেও স্নায়ু থাকে যা ক্লিটোরিস থেকেই আসে। তাহলে এই স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করতে পারলেই ক্লিটোরিসকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে অরগাজমে পৌঁছানো সম্ভব। এই কারণেই কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাল সেক্সের মাধ্যমে অরগাজম পাওয়া যায়।

সেক্সের প্রক্রিয়া চলাকালীন পুরুষ যৌনাঙ্গের উপরের অংশে ঘষা লেগে ক্লিটোরাল হুড অথবা লেবিয়া মাইনরা উত্তেজিত হয়। দেখা গেছে সঙ্গমের দু'টি বিশেষ অবস্থায় এইটি হওয়ার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। একটি বহুল প্রচলিত মিশনারি পজিশন, অন্যটি দ্বিতীয় স্থান লাভকারী 'ওম্যান অন টপ'। স্বর্ণপদক এবং রৌপ্যপদক জয়ী এই দু'টি পজিশন এত জনপ্রিয় হওয়া কারণ হয়ত এবারে বোঝা গেল। এখানে আপনার লাজুক মনে হয়ত প্রশ্ন আসবে, তাহলে পিছন থেকে যোনিসঙ্গমও তো অনেক নারীর কাছেই ভীষণ প্রিয়, এটা কেন?

ক্লিটোরিসের স্নায়ুর কিছু অংশ ক্রুরার মধ্যে দিয়ে যায় আগেই বলেছি। আবার এও বলেছি যে এই দু'টি ক্রুরার যোনিপথের ছাদের দুই পাশে থাকে। তাই এই ছাদের একটি খুব ছোট অংশে খোঁচা লাগলে ক্রুরার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে তা ক্লিটোরিসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই হল গিয়ে আপনার 'জি-স্পট'! ১৯৫০ সালে জার্মান গাইনিকলজিস্ট আর্ন্সট গ্রাফেনবার্গ (Ernst Gra°fenberg) বলে বসেন যে যোনিপথের উপরের দিকের ছাদের অংশে একটি নির্দিষ্ট অংশ আছে যেটি ভীষণভাবে সংবেদনশীল, কারণ সেখানে স্নায়ুর সংখ্যা খুবই বেশি। মাত্র ৩০ বছর হল গ্রাফেনবার্গ ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। যোনিপথের গোটাটাতেই স্নায়ু ভীষণ কম থাকে। ছাদের অংশের সংবেদনশীলতা ওই খোঁচা লাগার কারণে ক্রুরার উত্তেজিত হওয়ার ফলে ঘটে।

সুতরাং পরোক্ষ উপায়ে অর্থাৎ কেবল যোনিসঙ্গমের সময়ে ১০০ জন নারীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন অরগাজম পাবেন। কারণ ক্লিটোরাল হুডে বা লেবিয়া মাইনরায় বা যোনিপথের ছাদের ঠিক ওই বিন্দুসম অংশে যে ঘষা লাগবেই, এবং সেই ঘর্ষণ নিয়মিত ক্রমাগত ভাবে হয়েই যাবে এমন গ্যারান্টি তো কোনো পুরুষই দিতে পারবেন না। তাহলে তারা কি ক্লিটোরিসের পরিচয় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন?

একদমই তাই নয়। সঠিক নাম না জানলেও ওই কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অংশটি যে নারী শরীরে মারাত্মক সংবেদনশীল তা প্রায় প্রত্যেক পুরুষই জানেন, যৌনতায় কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকলেই এই জ্ঞানটুকু লাভ করা যায়। পুরুষ জানেন যে ওই অংশটিকে স্পর্শ করলে যোনিপথ পিচ্ছিল হয়। প্রকৃতি সঙ্গমের প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার জন্য এই পদ্ধতিটির সৃষ্টি করেছিলেন, এতে পুরুষলিঙ্গ সহজে যোনির মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। এবারে সঙ্গমের আগে চলতে থাকা প্রাথমিক ক্রীড়া বা ফোরপ্লের সময়ে নারীর শরীরের অন্যান্য সংবেদনশীল অংশের মতো ওই ক্লিটোরিসেও স্পর্শ করে সঙ্গিনীকে উত্তেজিত করে তোলে পুরুষ, যোনি ভিজে এলেই শুরু হয়ে যায় তার সঙ্গম। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার বীর্যপাত হলেই লিঙ্গ শিথিল হয়ে যোনিপথ থেকে বেরিয়ে আসে, পুরুষটি তৃপ্ত হয়ে শুয়ে থাকেন। মেয়েটির কী হয়? তার ক্লিটোরিসটি কিন্তু ওই ফোরপ্লের কারণে উত্তেজিত হয়ে রয়েছে তখনও। তখনও তাতে রক্তপ্রবাহের মান যথেষ্ট বেশি। এই সময়ের অনুভূতিটা একজন পুরুষের লিঙ্গ শক্ত হয়ে রয়েছে, মনে কামের ভাব প্রবল, কিন্তু বীর্যপাত হচ্ছে না, এমন। একজন পুরুষ নিশ্চই এই অনুভূতির কথা জানেন।

তাহলে পুরুষটি নিয়মিত ভাবে তার সঙ্গিনীটিকে অরগাজম পাওয়ানোর ব্যাপারে কেন তৎপর হন না? সে তো তার শত্রু নয়। এই অজ্ঞতার কারণ কী? মেয়েটিই বা কেন তার সঙ্গীকে জানায় না তার মনের কথা? এইবার সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

ফেমিনিজমের পক্ষে প্রবলভাবে সওয়াল করার সময়ে পেট্রিয়ার্কি অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রকে একটা ঘৃণ্য পশু বা কদাকার দৈত্য হিসাবে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। সেই চেষ্টা অনর্থক, নারীবাদের প্রাথমিক ভাবনার বিরোধী। মানবজাতির আদিকাল থেকে প্রকৃতিগত ভাবে পুরুষেরা নারীদের তুলনায় কিছু শারীরিক এবং মানসিক সুবিধা পেয়ে এসেছে, এই আপাত অবিচারের জন্য পুরুষেরা দায়ী নয়। কিন্তু কয়েক হাজার বছর ধরে চলতে থাকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গতিপ্রকৃতি সেই সুবিধাগুলোকে বহু অংশে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে তা মানববাদের কাছে অন্যায্য। নারী পুরুষের মতো মাংসপেশী বহুল শরীরের অধিকারী নয়, তাই সে শারীরিক শ্রম জনিত কাজ পুরুষের তুলনায় কম পারে। মানব শিশু অন্যান্য বেশ কিছু স্তন্যপায়ী পশুর তুলনায় বেশ কয়েক মাস আগে জন্ম নেয়, তাই তাকে মায়ের উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল থাকতে হয়। প্রতিমাসে তিন থেকে পাঁচদিনের রজঃস্রাবের ব্যথা ভোগ করতে হয় মেয়েদের, সেই ক'দিনে তাদের কার্যক্ষমতা কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। এই তফাতগুলো মেনে নিতেই হবে, এগুলি পুরুষ নিজে বানায়নি। কিন্তু এর জন্য নারী ভোট দিতে পারবে না, অফিসে সে একজন পুরুষ কলিগের সমান মাইনে পাবে না, পিরিয়ডের সময়ে কাজ না করতে পারলে তার মাইনে কাটা যাবে বা ছুটি দেওয়া হবে না... এইগুলিকে চাইলেই বদলানো সম্ভব, বদলেছেও।

এমন আরো হাজারো বিষয় নিয়ে 'ইক্যুইটি'র পথে হাঁটছেন নারীবাদীরা। এই সঙ্গে 'সেক্সুয়াল ইক্যুয়ালিটি'র কথাও চলে আসছে। তাহলে আসুন বোঝার চেষ্টা করি কেন যৌনতায় নারী এবং পুরুষ সমান অধিকার পাচ্ছে না। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত হয় আট পাতার একটি প্যামফ্লেট। প্যামফ্লেটটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, লক্ষ্য পুরুষ এবং নারীর মধ্যে 'অরগাজম গ্যাপ' কমিয়ে আনা। প্ল্যামফ্লেটটির শিরোনাম ছিল 'দা মিথ অফ ভ্যাজাইনাল অরগাজম', লেখিকা প্রখ্যাত আমেরিকান ফেমিনিস্ট অ্যান কোয়েট। অ্যান এই অরগাজম গ্যাপের কারণ হিসাবে দেখিয়েছিলেন সহস্রবছর ধরে চলে আসা একটি মিথকে - যোনিসঙ্গমেই নারীর অরগাজম সম্ভব। কেন এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এলেন পুরুষেরা? এর পাঁচটি কারণ

বলেন অ্যান। সেই কারণগুলি পঞ্চাশ বছর পরেও আজও একইরকম প্রাসঙ্গিক।

১. পুরুষের অরগাজমের জন্য যোনিসঙ্গম প্রয়োজনীয়। কারণ যোনিপথের সিক্ততা এবং ঘর্ষণের ফলে একজন পুরুষ যৌন তৃপ্তির চরম শিখরে পৌঁছতে পারেন।

২. অদৃশ্য নারী: যৌনতায় নারীকে নিজের সমান না ভাবতে পারা। পুরুষটি প্রথমেই ভেবে নিয়েছেন যে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে মেয়েটি কীভাবে আনন্দ পাবে। এতে মেয়েটির মত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যাতে মেয়েটি কোনো মত দিতে না পারে তার জন্য তার গভীরে এই চিন্তাকে প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে যে সে যেন তার যৌন-ইচ্ছা নিয়ে কোনো কথা না বলে, এ তার লজ্জার বিষয়। কয়েকশ প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই শিক্ষার ফলে একসময় তার শরীরের আনন্দের অধিকারও সে পুরুষের উপরেই ন্যস্ত করল। তাই সেই নারী একান্তে স্বমেহনে নিজেকে খুশি করতে পারলেও পুরুষসঙ্গীটির কাছে প্রতিবার যৌনতার সময়ে অরগাজমের প্রত্যাশা আর করেন না। তার কাছে অরগাজম একটি 'হ্যাপি অ্যাক্সিডেন্ট' মাত্র।

৩. পেনিস এবং পুরুষত্ব: পুরুষের কাছে কেবল তার লিঙ্গ পরিচয়ই তার পেনিস দিয়ে হয় না। শিশ্নটি তার মননের একটি অংশ। পুরুষ নিজেকে খুঁজে পায় তার ভারী গলার স্বরে, বুকে ছড়িয়ে থাকা চুলে, বলিষ্ঠ মাংসপেশীতে, এবং অবশ্যই তার শিশ্নে। শিশ্নের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ তার ইগোতে ইন্ধন যোগায়, তার নিজের উপরে আস্থা তৈরিতে সাহায্য করে। তাই পুরুষ ভাবে তার শিশ্নটি যেমন তার নিজের অরগাজমের বাহক তেমনই নারীর তৃপ্তিও তাতেই সম্ভব।

৪. যৌনতায় পুরুষের অসাড়তা: পুরুষ জানে যে যৌনক্রীড়ায় সে চরম তৃপ্তি লাভ করে সেই যোনিসঙ্গমে তার সঙ্গিনী আনন্দ পেলেও অরগাজম পান না। অথচ তার গর্ভধারণের চিন্তা রয়েই যায়। প্রকৃতি যখন মানব জননের প্রক্রিয়াটির জন্ম দিয়েছিলেন তখন তার লক্ষ্য ছিল বংশবিস্তার। এই দ্বাবিংশ শতাব্দীতে এসে দাঁড়িয়ে এই ধারণা কিন্তু বিলুপ্ত। এখন বিভিন্ন প্রকারের গর্ভনিরোধক পদ্ধতি বেরিয়েছে, যাতে যৌনতার আনন্দ লাভ করা যাবে অথচ সন্তানধারণের চিন্তাও থাকবে না। নারী যদি জানেন যে কেবলমাত্র ক্লিটোরিসের মাধ্যমেই সে প্রতিবার অরগাজম পেতে সক্ষম হবে তাহলে তো আর তার পুরুষের

প্রয়োজনই থাকবে না! সমাজের জন্য সন্তান উৎপাদন করার কোনো দায় তো তার নেই! সেই কারণে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ক্লিটোরিস কেটে নেওয়ার ভয়ানক প্রথাও চলে এসেছে, যাতে সেই নারী কোনভাবেই নিজেকে যৌনসুখ না দিতে পারে। ভারতবর্ষও এর বাইরে নয়। 'খতনা'য় যে কত মেয়ের যৌনাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার সংখ্যা অজানা।

৫. সমলিঙ্গের যৌনতা: নারীর অরগাজমের জন্য যে কেবলমাত্র পুরুষেরই প্রয়োজন তা কিন্তু নয়। একজন নারীও সেই কাজটি করতে পারেন। এভাবে মেয়েরা যৌনতার জন্য মেয়েদেরই বেছে নিতে থাকলে বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে হওয়া যৌনতা হ্রাস পাবে।

তাহলে মেয়েরা কেন তাদের অতৃপ্তির কথা প্রকাশ্যে না জানালেও তাদের যৌনতার সঙ্গী, প্রেমিক অথবা স্বামীর সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করেন না? তার কাছে প্রায় প্রতিটি যৌন ক্রীড়ার সময়ের সমাপ্তি ঘোষিত হয় পুরুষের বীর্যপাতের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ তার কাছে পুরুষের অরগাজম একটি স্বাভাবিক ঘটনা, অথচ তার নিজেরটি না হলেও সে চুপ থাকে, কেন?

'আমি বিছানায় খুব ভাল' এই আস্ফালন যত সংখ্যক পুরুষের মধ্যে দেখা যায় তার সিকিভাগও মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ তার ধারনা বিছানায় যৌনতার সময়ে তার প্রত্যক্ষভাবে কোনো কাজ নেই, বেশিরভাগটাই পুরুষ সঙ্গীটিই করে। তাই অরগাজমের 'পুরস্কার'টি পুরুষটির প্রাপ্য। তার কপালে কখনও সেটি জুটে গেলে তা সৌভাগ্যের বিষয়, সেই 'হ্যাপি অ্যাক্সিডেন্ট'। তাই প্রতিবার যৌনতার পরে তার অতৃপ্তির বোধ জন্মায় না, জন্মালেও নিজেকে পুরুষসঙ্গীটির তুলনায় 'প্যাসিভ' ভাবার কারণে সে চুপ করে থাকে। জার্নাল অফ সেক্সুয়াল মেডিসিনে প্রকাশিত ২০১৬ সালের একটি স্টাডিতে দেখা গেছে ৬৭% মহিলা, অর্থাৎ প্রতি তিনজনের মধ্যে দু'জন তাদের পুরুষসঙ্গীটিকে তাদের অতৃপ্তির কথা জানান না, তার কারণ হল এতে পুরুষটির আত্মবিশ্বাস আহত হবে। মেয়েদের কাছে তাই যৌনতা সংসারকে ধরে রাখার একটি মাধ্যম। তাদের কাছে সঙ্গম নির্ভরতার জায়গা। এইভাবে নারীচিন্তায় যৌনতার সঙ্গে প্রেম, মায়া মিশে গেছে। পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয়। প্রবল অশান্তির পর রাতে দম্পতির মধ্যে দারুণ যৌনসহবাস হল। মেয়েটির কাছে এই মিলন তাকে মানসিকভাবে স্বস্তি দেয়, তার সংসারটি ঠিক আছে, এই ভাবনা তাকে

আস্বস্ত করে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা পুরুষটি কিন্তু হয়ত শুধুমাত্র শরীরের খিদে মেটানোর জন্যই সেই রাতে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে এই ঘটনা চক্রাকারে ঘটতেই থাকে।

এতক্ষণ এই 'অরগাজম গ্যাপ'-এর সমস্যার কথাই আলোচনা করে গেলাম। তাহলে এর সমাধানের উপায় কী? একটি শব্দে এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় 'যৌনশিক্ষা' বা 'সেক্স এডুকেশন'। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সমাধানের মধ্যেও একটি গভীরতর সমস্যা লুকিয়ে আছে। আমাদের কাছে সেক্স এডুকেশনের সংজ্ঞাটার কথা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই শিক্ষা আবর্তিত হয় 'সেফ সেক্স' এর ভাবনার চারপাশে। অর্থাৎ কীভাবে যৌনরোগ প্রতিরোধ করা যাবে, কীভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণকে আটকানো যাবে, কীভাবে যৌনতার সময়ে শারীরিক কোনো ক্ষতিকে এড়ানো যাবে এইগুলি হল সেক্স এডুকেশনের বিষয়। পশ্চিমের দেশের স্কুলগুলিতে এই বিষয় নিয়ে পড়ানো বেশ কিছু বছর আগে শুরু হয়েছে। কয়েক বছর হল এই দেশেরও কিছু কিছু স্কুলে সেক্স এডুকেশনের ক্লাস হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষা ছাত্রজীবনে অপরিহার্য। এই শিক্ষা নিশ্চিত করবে তরুণ অথবা তরুণীটি ভবিষ্যতে সুস্থ, স্বাভাবিক যৌন জীবনযাপনের পথ। নাকি করবে না? সুস্থ যৌন জীবনের মধ্যে যৌনতার আনন্দ বা 'প্লেজার'ও কি এসে পড়ে না? এই শিক্ষা একজন তরুণ বা তরুণী কী ভাবে পাবে?

যৌনতার শারীরিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে তা হল পর্নগ্রাফি। এই বছরে পর্নগ্রাফি ওয়েবসাইট 'এক্স-ভিডিওজ'-এর একমাসের ভিউয়ার সংখ্যা ৩৩২ কোটি! 'পর্নহাব'-এর একমাসের ভিউয়ার ২২৫ কোটি! সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রথম দশটি ওয়েবসাইটের মধ্যে এই দু'টি সাইট আছে। এই বছরেরই এপ্রিল মাসে 'জার্নাল অফ সেক্সুয়াল মেডিসিন'-এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। গবেষকেরা এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঁচটি পর্নগ্রাফির ওয়েবসাইটকে বেছে নিয়ে তাদের পঁচিশটি সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভিডিওগুলিকে খুঁজে বার করেন। তাদের গবেষণায় দেখা যায় যে ভিডিওগুলির মধ্যে ৯টিতে(৩৬%) নারীর অর্গাজম দেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ৫টিতে(২০%) অর্গাজম হয়েছে ক্লিটোরিসের উত্তেজনার মাধ্যমে। অন্যদিকে ২২টি(৮৮%) ভিডিওতে পুরুষের অর্গাজম হয়েছে! এখানেও সেই একই তফাত। যারা এই পর্নোগ্রাফি দেখছেন তাদের কাছে এটিই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তারা আবার এই ভিডিওগুলিতে

এটাও দেখেন যে সেক্সের সময়ের মেয়েটির আওয়াজ বোঝায় যে তার অর্গাজম হয়েছে। পুরুষটির অর্গাজমের সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক সময় মেয়েটিও আওয়াজ করে ওঠে, যেন তারও একই সঙ্গে অরগাজম হল। সত্যিই কি তাই হয়?

২০১৯ সালে 'আর্কাইভ অফ সেক্সুয়াল বিহেভিয়র' নামের জার্নালে বেরোনো একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে ৫৩% মহিলারা যৌনতার সময়ে তাদের অর্গাজমকে 'ফেক' করেন অর্থাৎ অর্গাজমের অভিনয় করেন। আগেই লিখেছি যে মেয়েদের অর্গাজমকে 'কোড' করা যায় না। তাই এই অর্গাজমকে তাদের ফেক করার উপায় হল মুখ দিয়ে অমন আওয়াজ করা। এতে পুরুষটি তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। অনেক সময়ে নারীটি এমন অভিনয় করেন কারণ তাকে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, যৌনতার অনুভূতিটা তখন তার মোটেই ভাল লাগছে না।

তাহলে যৌনতায় যে আনন্দ বা প্লেজার নিহিত থাকে তার সঠিক শিক্ষা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যমটিও একই ভুলে ভরা। এরপরে তো আর যুবক বা যুবতীটিকে দোষ দেওয়া যায় না, তাদের মধ্যে 'অরগাজম গ্যাপ' থাকতে বাধ্য। এই তফাতকে কমিয়ে আনার উপায় উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কথাটা বোকা বোকা শুনতে লাগলেও সত্যি। যৌনতার সঙ্গে আসা রোগ এবং গর্ভধারণের ব্যাপারে বর্তমান সমাজ যতটা সচেতন ততটাই অমনোযোগী যৌনতার আনন্দের ব্যাপারে। 'সেক্সুয়াল প্লেজার' কথাটা শুনলেই মনের মধ্যে জিভ কেটে নেওয়া হয় একবার। এর শিক্ষা পর্নগ্রাফি থেকে হবে না, কারণ সেগুলি সেই ধরণেরই ভিডিও দেখিয়ে যাবে যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষ দেখতে চাইবেন। স্কুলের যৌন শিক্ষাতেই খুব প্রাথমিক ভাবে হলেও এই খামতিটাকে মেটানোর প্রয়োজন। নারীর যৌনাঙ্গের ছবিতে শুধু ক্লিটোরিসকে মার্ক করে দিয়েই দায় সারলে চলবে না, তার ব্যবহার নিয়ে দু'টি বাক্যব্যয়ও করতে হবে বই কী! বাড়িতে বাবা-মারও দায়িত্ব আছে এখানে, তাদের নিজেদের যৌনতার বোধ যথেষ্ট থাকলে তারাও লজ্জা কাটিয়ে উঠে তাদের মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে তৎপর হতে পারেন।

এই প্রবন্ধ শেষ করি দেশেরই একটি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে। ২০১৭ সালে করা ডিউরেক্সের সার্ভে অনুযায়ী প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জন মহিলা নিয়মিত অর্গাজম পান না, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে আটজনই

অরগাজম পান। 'ব্রুট ইন্ডিয়া' নামের মিডিয়া চ্যানেল 'ক্লিটেরেসি' অথবা ক্লিটোরিস জনিত শিক্ষার জন্য তিনটি ভিডিও পাবলিশ করেছিল ফেসবুকে, তাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকল এই প্রবন্ধের শেষে। এই ব্যাপারে আরো জানতে টুইটারে এই হ্যাশট্যাগে সার্চ করতেও পারেন-

#OrgasmInequality.

'Brut India' র লিঙ্ক-

https://fb.watch/fsX22QGr-Z/
https://fb.watch/fu45xWvFHl/
https://fb.watch/fu46ANilcA/

তথ্য সূত্র

1.Debby Herbenick et al. Women's experiences with genital touching,sexual pleasure, and orgasm:results from a US probability sample of women ages 18 to 94. Journal of sex and marital therapy. 2017.
2. Noelle Miller. Girls getting off: Darwin and the big O.
3. A Dubinskaya et al. Misrepresentation of female sexual behavior in Pornography. Journal of Sexual Medicine. April 2022.
4. Anne Koedt, The myth of the vaginal orgasm. New England free press.1970.
5. Michaela Lebedikova. How much screaming is an orgasm: the problem with coding female climax. Porn Studies. March 2022.
6. Robert King et al. Are there different types of female orgasm? Archives of sexual behavior. August 2010.
7. Durex India-global sex survey. 2017.

সূচিপত্র

অলঙ্করণ - ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

১
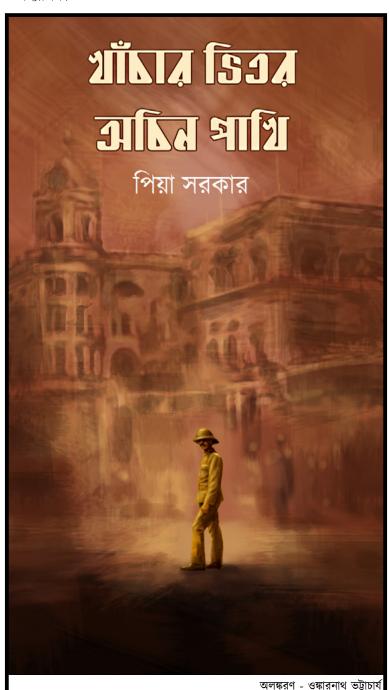
লালবাজারে টেগার্ট সাহেবের আজ শেষ দিন। তিরিশ বছরের পুলিশ জীবন পেরিয়ে শেষমেষ সেক্রেটারি অফ স্টেটের মতো আপাত নির্ঝঞ্ঝাট, গালভারি একটা পদ পেতে চলেছেন। নিউ মার্কেটের মতো ব্যস্ত থানাতে অবশ্য এই ঐতিহাসিক পালাবদলের কোনো ছাপ পড়েনি। বিরাট ধর্মতলা অঞ্চলের যাবতীয় চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি, যানবাহন ঠোকাঠুকি, রাওনি কুলিদের হাতাহাতি, মাতালদের হুজ্জুতি, জুয়াচোরের জালিয়াতি ইত্যাদি নানারকম অভিযোগের বয়ান লিখতে লিখতে দুজন লিখিয়ে বাবু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে, বানের জলের মত কংগ্রেসী পিকেটারদের লাইন লেগেছে থানায়। ধর্মতলার বিলাতি জামাকাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে এক দঙ্গল নারী ও দশ-বারো বছরের বালকদের ধরে, লরির ভিতর হাঁস-মুরগীর মত পুরে নিয়ে আসা হয়েছে থানায়। সাধারণ অপরাধীদের তুলনায় এদের সংখ্যা বেশি। এরা কেউ জামিন চায় না, জেল ভরাতে চায়। পরিস্থিতি এমন হয়েছে, হাজতেও আর জায়গা নেই। শেষমেষ থানার বড়বাবু, মেঝে থেকে পাঁচ-ফুট উচ্চতায়, দেওয়ালে দড়ি বেঁধেছেন। এই দড়ির নীচে যাদের মাথা, তাদের আবার লরিতে পুরে শহর থেকে দূরে কোথাও একটা ছুঁড়ে ফেলে আসা হবে। আর যাদের উচ্চতা পাঁচ-ফুট ছাড়িয়েছে, তাদের ভরে দেওয়া হবে হাজতের কুঠুরিতে।

থানার ফোন ঘন ঘন বাজছিল। বড় সাহেব অর্থাৎ ডেপুটি-কমিশনার ডেইলি রিপোর্টের জন্য মিনিটে মিনিটে তলব করছেন। সেসব কিছুক্ষণ আগে ডাকে রওয়ানা হয়েছে। নানা হট্টগোলের মধ্যে কালো, শীর্ণ, ঘর্মাক্ত এক বিহারি ঘ্যান ঘ্যান করে পাশের টেবিলে রিপোর্ট লেখাচ্ছে—বাবু সাহেব! কোই আদমি মেরা রিক্সা লেকে ভাগা হুজুর! কিরায়াকা রিক্সা হ্যায়, মালিক তন করা হ্যায় হুজুর; দানাপানি বন্ধ হো যায়েগা হামরা। কুছ কিজিয়ে হুজুর।

অ্যাংলো সার্জেন্ট খেঁকিয়ে উঠে বললো, —ক্যা বোলতা তুম? রিক্সা? কাঁহাসে চোরি হুয়া হ্যায়?

তার উত্তর দেওয়ার আগেই, বাইরের করিডর থেকে পাহারাদার সান্ত্রী চেঁচিয়ে ঘোষণা করলো—বড়াবাবু আ গয়া।

থানার বড়াবাবু অর্থাৎ ইনচার্জ শিবপ্রসাদ লাহার এসময়ে আসার কথা নয়। সব থানার বড়বাবুদের আজ লালবাজারে হাজিরা দেওয়া

বাধ্যতামূলক। কী প্রয়োজনে শিবপ্রসাদ হঠাৎ থানায় এসে পড়লেন, সে কথা ভেবে দপ্তরী এবং অফিসাররা খানিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। লাহা সাহেব থানায় ঢুকেই ধপাস করে সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাদ্রমাসের গরমে তাঁর উর্দি ভিজে চুপচুপ করছে। অন্যদিন লাহাবাবুর প্রতাপে জুয়াচোর থেকে বাটপাড় কোণের দিকে সেঁধিয়ে যায়। খিস্তিখামারি, চড়চাপড়, কখনও সখনও আরও দু-চার ঘা দিয়ে হাতসুখ করে তারপর শিবপ্রসাদ লাহা, রসিয়ে দু ভাড় গরম চা খান। আজ সেদিকের পথ মাড়ালেন না। বরং বিমর্ষ ভঙ্গিতে মাথার টুপি খুলে রেখে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

উমেশনাথ, খানিকক্ষণ ধরে পিকেটারদের নাম-ধাম রেজিস্টার করে ডায়েরি লিখছিলেন। এ তাঁর রোজকারের কাজ। কংগ্রেসী পিকেটারদের আচরণ ধরা-বাঁধা। কেউই নিজের নামটুকু বাদে আর কোনো পরিচয় দিতে আগ্রহী নয়, এমনকি কোনো জবানবন্দী দিতেও এরা উৎসাহী নয়। হাজতবাস-ই একমাত্র মোক্ষ বিচার ক'রে, আগুনের দিকে উড়ন্ত পতঙ্গের মতো এরা ভাবলেশহীন। নাম লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে ক্লান্তমুখগুলোর দিকে তাকান উমেশনাথ। মুখে কিছু বলেন না। অতীতের কথা ভেবে ক্লান্ত লাগে। সদ্য সদ্য লালবাজার থেকে থানায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। মেদিনীপুর জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যাজিস্ট্রেট পেডি হত্যাকারী, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য বিমল দাশগুপ্ত তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, তিনি আদৌ আর লালবাজারের ডিটেকটিভ হওয়ার যোগ্য নন। (উমেশনাথের আত্মপ্রকাশ কাহিনী- ১৪২৮ সালের মায়াকানন শিশু কিশোর পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত) থানায় বসে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মত পেটি ক্রাইমের কিনারা করা এবং রিটায়ার না করা অবধি দিস্তে দিস্তে ফার্স্ট রিপোর্ট লেখা– এই তাঁর ভবিতব্য। মাইনেও কমেছে দশ টাকা। দেশে সংসার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কাজ শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশে এসেছিলেন, তা ঘানি টানার মত একঘেঁয়ে এই চাকরিতে কোথায় যে মুখ লুকিয়েছে, তা বলা দায়।

উমেশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সরল মুখ। তাদের শ্রান্ত চোখগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তবু, যন্ত্রের মত ডায়েরিতে হাত চালিয়ে যান উমেশ। নিজেকে কড়া শাসন করেন। 'সিমপ্যাথাইজার' নামের দাগটি একবার গোপন নথিতে পড়ে গেলে সহজে তা তোলা মুশকিল। প্রচুর উন্নতি করার জেদ আর সহমর্মী হয়ে ওঠার প্রাণগত ইচ্ছা, এই দুইয়ের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলে। অবশেষে জেদ জয়ী হয়। পিছন থেকে যে বা যারা উমেশকে টেনে

ধরে, তাদের এক ধাক্কায় সরিয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে চান। তাঁর হাত ঘষঘষ করে কলম পিষে চলে। প্রতিদিনের মতো আজও লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

শিবপ্রসাদ লাহার চোখ, ক্ষিপ্র গতিতে অফিসারদের মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তার থেকে রক্ষা পেতে চটপটে, কর্তব্যনিষ্ঠ একজনকে চাই। ডেপুটি কমিশনার তিনদিনের সময় দিয়েছেন। কেসটা সমাধান করে তাঁকে দিতেই হবে। গত দশ বছরে, কঠিন কোনো তদন্ত করেননি বললেই চলে। তর্জন-গর্জনের শিল্পটি একবার আয়ত্ত হলে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। এটাই এ লাইনের নিয়ম। বয়সের ভারে যত শ্লথ হয়েছেন শিবপ্রসাদ, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লোক চিনে নেওয়ার ক্ষমতা। থানার এক- একজন অফিসারকে তিনি হাতের রেখার মত চেনেন। তাঁর চোখ একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে স্থির হতে সময় লাগল না। লালবাজারের সদ্য প্রাক্তন এই অফিসারটিকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ডিসি। তবু, এঁর হাত-পা চালানো, চৌখস ভঙ্গিতে রিপোর্ট লেখা, নির্মেদ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা বুঝিয়ে দেয় ইনি অন্যদের থেকে আলাদা। শোনা যায় তার নামের মধ্যপদ অর্থাৎ চন্দ্র শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে প্রথমপদ এবং পদবী জুড়ে সাহেবরা নতুন নামকরণ করেছেন—ইউ–মেস–নট!

উমেশনাথ সেসময় পঞ্চাশ জন পিকেটারের রিপোর্ট দু-পাতায় ধরিয়ে, ডায়েরি বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। শিবপ্রসাদ লাহার বিশাল চেহারায় সামনের আলোটুকু আটকে গেলে, তিনি চোখ তুলে বড়বাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

—একটা খুন হয়েছে। ঠিকানা, ১০২/ ৩ চৌরঙ্গী রোড। ট্রাম ডিপোর পিছন দিকের পাড়া। বাড়ির মালিকের নাম, উইল্টার প্রমথনাথ ম্যাকডিসন। বাঙালি খ্রিশ্চান। বড় ব্যবসায়ী। আপাতত ব্যবসার কাজে বোম্বেতে আছেন। খুন হয়েছেন তাঁর শালা। খুনটা বীভৎস এবং অদ্ভুত। তিন দিনের বেশি সময় নেই হাতে। লালবাজার থেকে একজন সার্জেন্ট আর দুজন হাবিলদার পাঠিয়েছে। আর তুমি দুজন হাবিলদার নিয়ে এখনই চলে যাও– অ্যান্ড রিপোর্ট মি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল।

উমেশনাথ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বড়বাবুকে কড়া ভাবে সেলাম ঠুকে চিরাচরিত কায়দায় বলে উঠলেন, "ইয়েস স্যার।"

২

বড়বাবুর দেওয়া অ্যাড্রেসে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগবে না। ধর্মতলার ঐ চত্তরে আগেও হাঁটতে হাঁটতে বহুবার গিয়েছেন উমেশ। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও, এই অঞ্চলটা পুরোপুরি হোয়াইট টাউনের অন্তর্গত ছিল বলেই জানা যায়। এখনও সেই বিলিতি ছাপ রাস্তাঘাটে রয়ে গেছে। পথঘাট মনোরম, দুপাশে অজস্র গাছের সারি। মুক্ত বাতাস ফুসফুসে ভরে দীর্ঘক্ষণ পথ চলা যায়। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে , জায়গাটা হোয়াইট টাউন থেকে ধীরে ধীরে গ্রে-টাউনে পরিণত হয়েছে। মনে মনে একবার বাড়ির মালিকের নাম আওড়ালেন উমেশ। উইল্টার প্রমথনাথ ম্যাকডিসনের মত অনেক প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বাস করেন এখন এদিকে। সারি সারি বাড়ি দেখা যায় রাস্তার দুধারে। গঠনশৈলি দেখে যদিও নেটিভ সাহেবদের বাড়ি আলাদা করে চেনা যায়। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি নয়, সাবেকি ধরণের ইটের বাড়ি।

প্রমথনাথ ম্যাকডিসনের সম্পর্কে হাতে তথ্য খুব সামান্য—কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর একাধিক কারখানা রয়েছে, নানাবিধ ব্যবসায় হাত পাকিয়েছেন, এবং কলকাতার উঠতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। বয়সে নবীন এই ব্যবসায়ীর পারিবারিক পরিসর সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেননি বড়বাবু। তাঁর নিজেরই অবশ্য এ তদন্তে আসা উচিত ছিল। খুনের তদন্তে ইন্সপেক্টর আসবেন এটাই প্রোটোকল। কিন্তু টেগার্টের সম্মানে ডিসি বিরাট পার্টি রেখেছেন আগামীকাল। সেসবের ব্যবস্থার মূল দায়িত্ব বড়বাবুর ঘাড়ে। আই.জি. পি এমনকি খোদ ভাইসরয়ের সঙ্গে টেগার্টের দহরম মহরম। তাঁর রিটায়ারমেন্টের দিনে তাই তাঁকে খুশি করার জন্য মুখিয়ে উঠেছে বিলিতি পুলিশ-অফিসারেরা। ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি চলে এল উমেশের। তিনি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে করবেনটাই বা কী! বরং তদন্তে মনোযোগ দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

মোটর গাড়িটা গ্রান্ট রোড দিয়ে ঢুকে টিপু সুলতান মসজিদের দিকে এগোলো। চৌরঙ্গী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং ধর্মতলা স্ট্রিট যে ছেদবিন্দুতে মিশেছে, সেখানেই মসজিদের বিরাট জমি। মসজিদের পিছন দিকে পশ্চিম মুখ করে হাঁটলে চৌরঙ্গী রোডের নিভৃত পাড়া। মোটর গাড়িটা মসজিদের সামনেই ছেড়ে দিলেন উমেশ। দুজন হাবিলদার লাফ দিয়ে নেমে তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। কুড়ি কদম হাঁটতেই গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করতে অসুবিধা হল না। দোতলা বাড়ি,

বয়সে প্রাচীন, গঠনশৈলীটি আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে আলাদা। দুটি গোলাকার থামের উপর, উপরের ঝুলবারান্দা ধরে রাখা রাজকীয় সদর দরজা। বড় বড় জানালা, জানালার উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি, কারুকাজ করা জাফরি বসানো। জানালার নীচে সিমেন্টে বাঁধানো আলসে। বাইরের দেওয়ালে লাল রঙ করা, জানালা এবং দরজায় সবুজ। বাড়ির মালিক বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণে যে যত্নবান তা সহজেই বোঝা যায়।

দুয়ারে দুজন হাবিলদার দাঁড়িয়েছিল–লালবাজার থেকে পোস্টেড। উমেশ গিয়ে দাঁড়াতেই তারা উঠে দাঁড়াল।

চওড়া সদর দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে উমেশনাথরা একটা বিরাট উঠোনে গিয়ে পড়লেন। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা এই একটাই। শান বাঁধানো উঠোনের মধ্যিখানে ফোয়ারা বসানো, সাদা পাথরের পরী মূর্তি কাঁখে কলস নিয়ে অপূর্ব বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে গিয়ে সদর দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাড়িটির গঠন মোটামুটি বোঝা যায়। ইংরাজি ইউ প্যাটার্নের বাড়ি। বামদিকের, ডানদিকে আর মধ্যিখানের উইং মিলিয়ে একতলায় মোট ছটা ঘর। উঠোনের বাকি অংশে গাছপালা লাগানো। দেশী বিদেশী সবরকম প্রজাতির গাছ রয়েছে। উঠোনের এককোণে চৌবাচ্চা, আর চারধার জুড়ে উঁচু পাঁচিল উঠেছে। প্রায় সাত ফুট হবে উচ্চতায়, মানুষ ডিঙানো অসাধ্য। একতলা এবং দোতলা সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সদর দরজার পাশ দিয়ে একখানি সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। দোতলাতে কটি ঘর সেটা একতলায় দাঁড়িয়ে বোঝা সম্ভব নয়। অকুস্থল কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই, গেটের দুজন হাবিলদার দোতলার দিকে দেখিয়ে দিল।

দোতলায় ওঠার মুখে আরেকটি দরজা। সেটি পেরিয়ে ঢুকলে একটা হলঘর পড়ে, বিলিতি কায়দায় টেবিল এবং চেয়ার দিয়ে সাজানো; বাইরের লোকজন এলে ভদ্রস্থ আড্ডার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ঝুলবারান্দাটি এই বসার ঘর সংলগ্ন। ঝুলবারান্দার দিকে আরেকটি দরজা খুলেছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে দাঁড়ালে নীচের রাস্তা দেখা যায়। ঘরের দেওয়ালে একাধিক বিদেশী পেন্টিং ঝুলছে। গৃহস্বামীর রুচির মনে মনে তারিফ করলেন উমেশনাথ। হলঘরটি থেকে বেরিয়ে একটি প্রকাণ্ড লম্বা এবং প্রশস্ত করিডর কাম বারান্দা, চক-মেলানো মেঝে। বারান্দার ডানদিক জুড়ে গোলাকার থাম ছাদ অবধি উঠে গেছে। বারান্দায় মজবুত লোহার গ্রিল বসানো। চিকের পর্দা টাঙিয়ে রোদ আটকানোর ব্যবস্থা রয়েছে। করিডরটি যেখানে বেঁকে অন্দরমহলের দিকে বেঁকে গেছে, সেখানে একটি ঘরের সামনে যে সার্জেন্টকে দেখতে পেলেন, তাঁর মুখ আগে থেকেই

চেনা উমেশের। গিরীশ গোস্বামী, বয়সে ছোট হলেও, যুক্তিবুদ্ধিতে দড়। লালবাজারে একসঙ্গে কাজ করেছেন কিছুদিন। উমেশকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে ছেলেটা। গিরীশকে দেখে একপ্রকার হাঁফ ছাড়লেন উমেশ। মনে মনে আশঙ্কা ছিল, কোনো উন্নাসিক অফিসার এসে উমেশের সঙ্গে আদৌ সহযোগিতা করবেন কিনা। নাক-গলানো অথবা ছড়ি-ঘোরানো এই দুটোর কোনোটাই তাঁর তদন্ত চলাকালীন পছন্দ নয়। গিরীশের সঙ্গে সে সমস্যা হবে না। বরং মিলে মিশে কাজ করা যাবে।

উমেশ কাছাকাছি পৌঁছাতেই গিরীশ মৃদু হেসে করমর্দন করল। দুজনে একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। চৌকাঠের কাছে দরজার পাল্লাটি ফ্রেম থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে। উমেশ বুঝলেন, মৃতদেহ উদ্ধারের সময়ে দরজা ভাঙতে হয়েছে। ঘরে ঢুকে চোখ সওয়াতে একটু সময় লাগল। ঘরে ঢোকার দরজা একটিই, জানালাও একটি মাত্র। আপাতত সেটি বন্ধ। ঘরটি ফলে অন্ধকার হয়ে আছে। দেওয়ালে অল্প পাওয়ারের বাল্বের আলো সেই অন্ধকার কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ঘরটি বড়সড়, আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি পাতা খাটে বিছানা ওলটপালট হয়ে আছে। খাটের পাশেই চেয়ার উল্টে পড়ে আছে। মেঝেতে একাধিক পায়ের ছাপ। দুটো চটি উপুড় হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ছোট একটি বেড-সাইড টেবিলের ঠিক নীচেই একটি কাচের গ্লাস ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। বোঝাই যায়, এই ঘরে গত রাতে তীব্র হাতাহাতি হয়েছে। আর সেই হাতাহাতি শেষ পর্যন্ত যার হত্যায় গড়িয়েছে, তার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে চৌকি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, জানালার সামনে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই উমেশ কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন।

ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। হাওয়াতে একটা দমবন্ধ ভাব, আঁশটে একটা গন্ধ। মৃতদেহে পচন শুরু হয়ে গেছে। উমেশ রুমাল বার করে নাক ঢাকলেন। চরিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। প্রায়ান্ধকার ঘর, বিক্ষিপ্ত আসবাব, বিছানার ওলটপালট অবস্থা...সমস্ত পরিবেশের মধ্যে মৃত্যু এসে তার ভয়ানক ছাপ রেখে গেছে।

—ছেলেটির মৃত্যু অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থায় হয়েছে উমেশদা। গিরীশ বলে উঠল।

উমেশ আরও দুপা এগিয়ে মৃতদেহের সামনে গেলেন। জানালার দিকে পা, খাটের দিকে মাথা দিয়ে, সামান্য কোণাকুণিভাবে চিত হয়ে পড়ে আছে ডেডবডি। মিষ্টি অথচ টোকো একটা গন্ধ আসছে শরীর

থেকে। মৃতের বয়স আনুমানিক পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ বছর; চিত হয়ে থাকা শরীরের দুপাশে দুই হাত ছড়ানো, চোখের পাতা খোলা, মণি সিলিংয়ে নিবদ্ধ। চেহারাটি জীবিতকালেও বিশেষ সুন্দর ছিল বলে মনে হয় না। ছোট কপাল, থ্যাবড়া নাক, জোড়া ভুরু। মৃত্যুর কদর্য ছোবলে চেহারাটা এখন ভয়ানক হয়েছে। নিহতের পরনে ঢিলা একটি ফতুয়া এবং ধুতি। ফতুয়ার হাতায় এবং বুকের কাছে বিভিন্ন জায়গায় কাপড় ফালাফালা হয়ে গেছে। রক্তের ছাপ সর্বত্র। হাতে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। করতলেও রক্তের ছাপ। সবকটি তাজা ক্ষত লম্বাটে আকৃতির। ছুরির আঘাত বলেই মনে হচ্ছে। মূল আঘাতটি অবশ্য অন্যত্র। গলায় প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা গভীর ক্ষত থেকে পুরু রক্তের ধারা নেমে মেঝেতে এসে জমাট বেঁধেছে। ক্ষতের দৈর্ঘ্য দেখলে আন্দাজ হয়, জুগুলার ভেন কাটা পড়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে সে শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিয়েছে। মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন উমেশ। কেন যেন তার মনে হল, এই মুখটি আগে কোথাও দেখেছেন।

—বডিকে নড়ানো হয়নি তো? উমেশ আত্মগতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। পুলিশ সার্জেনকে খবর দেওয়া হয়েছে। এমনিতে লোকাল ডাক্তার এসে দেখে ডেড সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে গেছে। পুলিশের ডাক্তার আসলে পোস্ট-মর্টেমের ব্যবস্থা হবে।

উমেশ চারদিকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎই দেওয়ালের একদিকে নজর পড়াতে চমকে উঠে বললেন—এই ছাপটা খেয়াল করেছ?

জানালার পাশের দেওয়ালে, পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগের একটা ছাপ দেখা যায়। উমেশ এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আঙুলের ছাপগুলো চেপে পড়েছে দেওয়ালে। হাতটা যেন টাল সামলাতে না পেরে দেওয়ালের উপর পড়ে ছাপ রেখে গেছে।

গিরীশ ছাপটা আগেই খেয়াল করেছিল। তৎপর হয়ে সে বলে উঠল—হ্যাঁ। ঘরে ঢুকেই দেখেছি। কিন্তু খুনী না নিহত, কার আঙুলের ছাপ সেটা বুঝতে পারছি না। খুব একটা কাজেও লাগবে বলে মনে হয় না। যেরকম অস্পষ্ট, তাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসবে কিনা বুঝছি না। কিন্তু এসব আসল কথা নয়, এই খুনের রহস্যটা কিন্তু অন্য জায়গায়।

উমেশ মৃতদেহর পাশে উবু হয়ে বসে একমনে ক্ষতগুলি পরীক্ষা করছিলেন। গিরীশের কথায় তার মুখের দিকে তাকালেন। সুদর্শন, নিপাট ভদ্র ছেলেটির চোখমুখ থমথম করছিল।

—কী ব্যাপার বলোতো? উমেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এদিকটায় আসুন।

গিরীশ উমেশকে জানালার দিকে নিয়ে গেল। জানালাটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট, প্রস্থে চার ফুট হবে। বিশালাকার জানলাটির মধ্যিখান বরাবর কাঠের ফ্রেম বসানো। কাঠের ফ্রেমের উপরে ও নীচে খড়খড়ি দেওয়া কাঠের পাল্লা, ফ্রেমে তিন ইঞ্চি অন্তরে মোটা লোহার শিক বসানো। উপরের পাল্লা ও নীচের পাল্লা আলাদা করে খোলা বন্ধ করা যায়। খড়খড়িগুলো আপাতত বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। পাল্লা চারটিও ছিটকানি দিয়ে শক্ত করে আটকানো।

–জানালাটা দেখছেন? গিরীশ প্রশ্ন করলো।

–হ্যাঁ।

–কাল রাতে যখন দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, তখনও জানালাটা এমনই বন্ধ ছিল।

–মানে! উমেশ চমকে তাকালেন।

–মানেটা খুব জটিল। দরজা যখন ভাঙা হয়, তখন চার জন দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই ঘর থেকে আসবাবপত্র উল্টানোর শব্দ পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর আগে নিহতের আর্তনাদ শোনা গেছে। ওরা চারজন জড়ো হয়ে বারবার দরজা ধাক্কানোতেও দরজা না খোলায়, দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন ওরা। কিন্তু শেষ অবধি, ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পাননি। আততায়ী এক হোক বা একাধিক, দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত যেন মিলিয়ে গেছে। ডেডবডি কিন্তু হুবহু এই অবস্থায় পড়েছিল।

উমেশ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবলেন। তারপর চৌকির দিকে তাকিয়ে বললেন, —হয়ত ঐ চৌকির তলায় লুকিয়ে ছিল। ঘর থেকে

সবাই বেরিয়ে যেতে, সুযোগ বুঝে পরে বেরিয়েছে।

গিরীশ তীব্র আপত্তি করে বলে উঠল, —সম্ভব নয়। যারা ঢুকেছিল, তারা প্রত্যেকে ঘরের প্রতিটি কোণা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। একাধিক লোক একইসঙ্গে মিথ্যে কথা তো বলবে না উমেশদা।

—তাহলে এই ঘর থেকে ঢোকা বা বেরোনোর অন্য পথ আছে নিশ্চয়ই। কোনো গুপ্ত পথ; কোনো গোপন কুঠুরি–মেঝে, দেওয়াল এগুলো ভালো করে লক্ষ করতে হবে। উমেশ চেয়ার থেকে উঠে চারধারে তাকালেন।

—সবটাই খুঁটিয়ে দেখেছি। দেওয়ালগুলো একেবারে নিরেট। চোরাগোপ্তা কুঠুরি থাকার সম্ভাবনা নেই। মেঝেটাও তাই। আদ্যিকালের সিমেন্টের মেঝে। কিন্তু কোথাও এতটুকু চিড় বা জয়েন্টের দাগ নেই উমেশদা।

—ছাদে যাওয়ার রাস্তা?

—সিঁড়ির ঘর বন্ধ ছিল। তালা দেওয়া।

—আশ্চর্য! পুরো ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল? এ তো অসম্ভব সম্ভাবনার কথা বলছো! উমেশ চিন্তিত স্বরে বললেন।

৩

—যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম বিনয়ভূষণ দত্ত। বাড়ির গিন্নীর মাসতুতো ভাই। কুমিল্লায় দেশের বাড়ি। কলকাতায় কাজকর্মের সন্ধানে আসা। জামাইবাবু প্রমথনাথের নানা রকমের ব্যবসা। তার মধ্যে একটির হিসেবনিকেশ রাখতেন বিনয়। অবিবাহিত। গত চারমাস ধরে কলকাতায় প্রমথনাথের বাসায় থাকছিলেন।

বাড়ির বৈঠকখানায় দুটো চেয়ারে উমেশ আর গিরীশ বসে প্রাথমিক আলোচনা সারছিলেন। এই বিপর্যয়ের মধ্যেও অন্দরমহল থেকে দু কাপ চা এসে পৌঁছেছে। চায়ের কাপ টেবিলে রেখে, গিরীশের কথায় সামান্য অবাক হয়ে উমেশ বললেন

—নিহতের নাম কী বললে? বিনয়ভূষণ দত্ত? হিন্দু?

—হ্যাঁ। প্রমথনাথের স্ত্রী সুচিত্রা জন্মসূত্রে হিন্দু। পরে ধর্মান্তর হয়ে...
—আই সি!তারপর? উমেশ নিজস্ব নোটবুকটি খুলে ঘটনাক্রম লিখে রাখছিলেন।

—গতকাল মধ্যরাতে, একটা ঝনঝন শব্দে সুচিত্রা দেবীর ঘুম ভাঙে। ঘুমের ঘোরে খানিকক্ষণ, শব্দ কোথা থেকে আসছে তা আঁচ করার চেষ্টা করেন। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে আবার একটা চিৎকার শুনে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে বোঝেন যে বিনয়ের ঘর থেকে আসবাবপত্র উল্টানোর আওয়াজ আসছে। তিনি দরজা ধাক্কান। ভিতর থেকে গোঙানির আওয়াজ আসছিল। বারবার দরজা ধাক্কানোর পর তিনি একতলায় নামার দরজা খুলে নীচে নেমে, বিশ্বনাথকে ডাকেন। গিরীশ নিখুঁত ভাবে ঘটনাক্রম বর্ণনা করছিল।

—বিশ্বনাথ কে? উমেশ লেখা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এ বাড়ির পুরোনো চাকর।
.----দোতলায় আর কে কে ছিল?
—-এক বয়স্কা জেঠিশাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নয়।
—আচ্ছা। তারপর?

–দুজনে যখন উপরে উঠে আসেন, ঘর থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ আসছিল না। দুজনেই আন্দাজ করে যে বিনয়ভূষণের ঘরে কোনো অনর্থ হয়েছে। দুজনে আবার দরজা ধাক্কায়, নাম ধরে ডাকে। কিন্তু কোনো জবাব আসে না। বিশ্বনাথ এর পর দরজা ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দেয়। সুচিত্রা রাজি হন। বিশ্বনাথ নীচ থেকে গিয়ে আরও দুজনকে ডেকে আনে। দরজা ভাঙা হয়। দরজা ভাঙতে বেশ সময় লাগে। ছিটকিনি এবং খিল দুটোই লাগানো ছিল। প্রত্যেকে ঘরে ঢুকে ঐ বাল্বটাই জ্বলতে দেখে, যেটা আপনি জ্বলতে দেখেছিলেন। বিশ্বনাথ সুইচবোর্ড হাতড়ে বড় বাল্বের সুইচ দেয়। আলো জ্বলতে, ঘরের অবস্থাটা সবাই দেখতে পায়, তারপরেই জানালার সামনে বিনয়ভূষণের রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে সকলের নজর যায়। মৃতদেহ দেখার পর ঘরে আততায়ীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু আদৌ কিছু পাওয়া যায়নি।

—এই পুরো ঘটনাগুলো তোমাকে বলল কে? উমেশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন।

গিরীশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল–ঐ চাকরদের জেরা করে যতটুকু জেনেছি।

—সময়টা তখন কত হয়েছিল ওরা কেউ বলতে পেরেছে?

—না। তবে, সুচিত্রা দেবী বলেছেন তখন আড়াইটে বাজছিল।

—কিভাবে জানলেন সেটা?

—বিনয়ের ঘরের আওয়াজ শুনে যখন ওর ঘরের দিকে যান তখন দেওয়ালের ঘড়ি দেখেছিলেন।

—তারপর কী হয়?

—বিশ্বনাথ থানায় খবর দিতে যায়। থানায় কেউ ছিল না। জমাদার বলে সকালে আসতে। বিশ্বনাথ নাম ঠিকানা লিখিয়ে চলে আসে।

—পায়ে হেঁটে? এ বাড়িতে ফোন নেই?

—আছে। কিন্তু বাড়ির ফোন খারাপ।

—আচ্ছা। মানে ভোরবেলার ডিউটি অফিসার রিপোর্ট পাঠিয়েছে লালবাজারে। সেটা দেখে কর্তাদের টনক নড়েছে। তুমি কটায় পৌঁছালে এখানে?

—আপনি আসার আধ ঘন্টা আগে।

—হুম, আচ্ছা, এই যে জেঠিশাশুড়ির কথা বললে, তিনি কোনো শব্দ পাননি?

—না। বাতের ব্যথায় ঘুম হয় না বলে তিনি আফিম খেয়ে ঘুমান। তিনি কিছু শুনতে পাননি।

—হুম। জানালাটা যে বন্ধ ছিল, সেটা কে লক্ষ করেছিল?

—প্রত্যেকেই। সুচিত্রা দেবী, বিশ্বনাথ এবং অন্য দুই ছোকরা চাকর।

—পুলিশে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি সুচিত্রাদেবীর?

গিরীশ একটু চিন্তা করে বলে, —সম্ভবত হ্যাঁ। প্রমথনাথকে 'তার' অবশ্য বিশ্বনাথ করেছে।

উমেশের লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। নোটবুক বন্ধ করতে করতে তিনি বললেন—বাহ। বেশ চটপটে তো পুরাতন ভৃত্য! তা বাড়ির মালিক কবে আসছেন?

—পরশু সকালে পৌঁছাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। গিরীশ উত্তর দিল।

—এই প্রমথনাথ ম্যাকডিসনের কী কী ব্যবসা জানা গেছে?

—অনেক ধরণের ব্যবসা উমেশদা। মূলতঃ কেমিকাল আর মেশিনারির ব্যবসা। দুটো কারখানা হাওড়ায় আর একটা বরানগরে। বরানগরেরটা নতুন। দেড়বছর হল। কাচের জিনিসের কারখানা। স্ত্রীয়ের নামে নাম, সুচিত্রা গ্লাসেস। এই অবধি বলে গিরীশ সামান্য উসখুশ করে উঠল।

—তুমি কী কিছু বলবে? উমেশ বললেন।

—প্রমথনাথ ম্যাকডিসনের সম্পর্কে রিপোর্ট খুব একটা ভালো নয়, লালবাজার সূত্রে জানতে পেরেছি।

—কীরকম?

—-তিন বছর আগে ওঁর হাওড়ার ফ্যাক্টরিতে পুলিশের রেড হয়। যে অফিসার তদন্ত করেছিলেন, তিনি ছুটিতে। আসলেই পুরো খবর দিচ্ছি।

—বেশ তাই দিও। আচ্ছা এই বিনয়ভূষণ কোন ব্যবসা দেখত?

—বরানগরেরটা। আপিসের যাবতীয় কাজকর্ম সামলাতো।

—কিন্তু সে তো মাত্র চারমাস। কারখানা তো হয়েছে বলছ দেড় বছর আগে। এতদিন কে দেখাশুনা করত?

—সুচিত্রা দেবী নিজে। কিন্তু ওঁর একটি সেলাই-স্কুল আছে। উনি

সেখানকার হেড-দিদিমণি। সময় দিতে পারছিলেন না বলে প্রমথনাথ, বিনয়ভূষণকে এই কাজে লাগান।

—বলো কী! মহিলাকে তো বেশ ওজনদার মনে হচ্ছে। ব্যবসা সামলানো তো পাকা মাথার কাজ। উমেশ বিস্মিত হয়ে বললেন।

গিরীশ সামান্য হেসে বলল—পাকা মাথা কিনা বলতে পারবো না উমেশদা। তবে, শিক্ষিত মহিলা। বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেছেন।

—বিনয়ভূষণের সঙ্গে কারুর কোনো শত্রুতা, কোনো ঝুট-ঝামেলার খবর পেয়েছো?

—এখনও সেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠতে পারিনি। সবাইকে প্রাথমিক ভাবে জেরা করেছি, বিশেষ কিছু পাইনি।

—হুম। ঠিক আছে। প্রমথনাথ ফিরলে কাল ওঁর জবানবন্দী নিতে হবে। ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাকিদেরটা তো বটেই। আচ্ছা আর একটা কথা, খুনের অস্ত্রটা, মানে ছুরিটা কোথাও পাওয়া যায়নি, না?

--না উমেশদা, ঘরে কোথাও নেই। আমরা বাড়ির বাইরেটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও সে ছুরির হদিশ নেই।

—রাস্তায় দেখেছো? এই ঘরের জানালা তো বাইরের রাস্তার দিকে মুখ করে খোলে? উমেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু রাস্তা থেকে কিছু উদ্ধার হয়নি।

—প্রত্যেকের ঘর তল্লাশি হয়েছে? রক্তমাখা কোনো জামাকাপড় পাওয়া গেছে?

—তল্লাশি করেছি উমেশদা। কিন্ত কোথাও কিছু ছিল না।

গিরীশ ঘাড় নাড়িয়ে এবার উমেশের দিকে তাকায়, বলে—রহস্যটার কিছু বুঝতে পারলেন? আমি তো যত ভাবছি, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

উমেশ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গিরীশের দিকে তাকিয়ে বললেন— খাঁচা থেকে পাখি কিভাবে পালালো, সেই রহস্যের থেকেও আরেকটি রহস্য আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে গিরীশ।

—কী?

উমেশ সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, —বুঝতে পারছো না? এই ভাদ্র মাসের গরমে, বিনয়ভূষণের ঘরে একমাত্র হাওয়া চলাচলের জানালাটি বন্ধ ছিল। কেন তার উত্তরটি আমাদের আগে ভাবতে হবে।

—কিভাবে এগোলে কাজ হবে বুঝতে পারছেন? গিরীশ উমেশের পিছন পিছন নামছিল।

—এখনও বিশেষ কিছু বুঝিনি, তবে বোঝার ইচ্ছা যখন আছে, আশা করি বুঝতে পারব। চলো রাস্তার দিক থেকে একবার ঘুরে আসি-উমেশ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন।

উইল্টার ম্যাকডিসন প্রমথনাথের বাড়িটির সদর দরজার পাশে লাগানো একটি মার্বেল ফলক পড়লে বাড়িটির অতীত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মায়। বাড়ির নির্মাণকাল ১৮৪০ সাল। নির্মাতা অলিভার সমরেন্দ্রনাথ ম্যাকডিসন। নিশ্চয়ই প্রমথনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তখন থেকেই খ্রিশ্চান নাম বহাল ছিল, অর্থাৎ এই পরিবারে খ্রিশ্চানিটিতে দীক্ষার ইতিহাস একশ বছরের কাছাকাছি। উমেশ মনে মনে নানা হিসাব করতে করতে সদর দরজার থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এগোলেন।

সদরের লকটি পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল। ফ্রেমের সঙ্গে মজবুত বিলিতি ইয়েল লক লাগানো রয়েছে। দরজা ভিতর থেকে একবার বন্ধ করে তালা দিয়ে দিলে, চাবি ছাড়া কোনোভাবেই ভেতর বা বাইরে থেকে তালা খোলা সম্ভব নয়। তালার দুটি চাবি, একটি থাকে বিশ্বনাথের কাছে, অন্যটি সুচিত্রা দেবীর কাছে। গিরীশ, উমেশের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, দরজা গতকাল সন্ধে সাতটায় বন্ধ হয়েছে। বিনয়ভূষণের ফ্যাক্টরি থেকে ফেরার পর। বিশ্বনাথ নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছে। তারপর দরজা খোলা হয়েছে থানায় খবর দিতে যাওয়ার সময়।

উমেশ গিরীশের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। দরজা থেকে বেরিয়ে কুড়ি কদম হাঁটার পর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে স্থির হয়ে

গেলেন। বাড়িটির ডান দিক থেকে দ্বিতীয় জানালার ঠিক নীচে।

দোতলার দিকে মাথা উঁচিয়ে, গিরীশকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটাই তো বিনয়ের ঘর?

—হ্যাঁ।

বিনয়ভূষণ দত্তের ঘরের বন্ধ জানালাটি পূর্বদিকে খোলে। বিনয়ের জানালা বাদে রাস্তার উপর থেকে যতগুলি দেখা যায়, তার সব কটাই খোলা, বিনয়েরটি বাদে।
রাস্তা থেকে জানালার উচ্চতা খুব কম করে হলেও চোদ্দ ফুট, একটা রেন পাইপও এদিকটায় নেই—এমনকি একটা কাক পাখি উড়ে এসে বসবে দেওয়ালের গায়ে, তেমন একটাও জায়গা নেই। উমেশ চিন্তিত স্বরে বললেন —রাস্তাটা দেখছি প্রায় ছফুট চওড়া।

—রাস্তার চওড়া দেখছেন কেন? গিরীশ একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

উমেশ সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। উল্টোদিকের বাড়ির দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই বাড়িটা কার?

—কোনো এক সাহেবের। সকালে গিয়েছিলাম কথা বলতে। সাহেবের তখনও খোঁয়াড় কাটেনি। দরজা থেকেই ভাগিয়ে দিলেন, গিরীশ মুখ বেঁকিয়ে বলল—আপনি একবার যাবেন নাকি?

—হুম, দরকারে নিশ্চয়ই যাবো । এদিককার পালাগুলো আগে একটু ...কথা বলতে বলতে উমেশ হঠাৎ থেমে গেলেন। রাস্তার উপর একটা বিন্দুতে তাঁর চোখ আটকে গিয়েছিল। একটু অবাক ভঙ্গিতে বললেন—এটা দেখেছো?

পিচের রাস্তার উপর একটা জায়গায় বাদামি রঙের একটা সরলরেখার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন উমেশ।

—কী এটা? গিরীশ প্রশ্ন করল।

উমেশ রাস্তার উপর উবু হয়ে বসে, বাদামী লাইনটার উপর আঙুল

ঘষে দেখলেন। গিরীশের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইটের গুঁড়ো। তারপর, আচমকা উঠে পড়ে, আরেকটু ডানদিকে এগিয়ে গেলেন।

—এখানেও রয়েছে! কী অদ্ভুত! উমেশনাথ প্রায় তিনফুট দূরত্বে থাকা দাগদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—দাগদুটো কি টাটকা? গিরীশ প্রশ্ন করলেন।

উমেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলেন, বললেন—টাটকা। কিন্তু ইট এমনি বসিয়ে রাখলে এমন দাগ পড়ার কথা নয়, যদি না ভারি কিছু ওর উপর চাপানো হয়। ওই দিকের বাড়িটার সামনে দেখো, ইটের পাজা রাখা আছে। কিন্তু ওখান থেকে এখানে ইট আসবে কেন!

গিরীশ কিছুক্ষণ দাগদুটোর দিকে, তারপর উমেশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—
ইটের মাচা-টাচা বানিয়ে উঠেছিল নাকি!

উমেশ গিরীশের কথার ভঙ্গিতে হেসে বললেন—এত উঁচু ইটের মাচা! তারপর অতগুলো ইট নিয়ে আবার সাজিয়ে রাখল?

—তাও বটে! কিভাবে যে ঘরে ঢুকল, বেরোল! সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। গিরীশ বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল।

—কেনই বা ঢুকল, কেনই বা বেরোল! সেটাও ভাবো।

গিরীশ একটু দমে গিয়ে বলল—হুম। তা ঠিক!

উমেশ এই অতি উৎসাহী অল্পবয়স্ক অফিসারের দিকে তাকিয়ে হাল্কা হেসে বললেন—আরে জানতে হলে তো বাকি তদন্তটুকু করতে হবে। ওদিকে বরানগরের কারখানাতে একবার ঘুরে আসতে হবে। আপাতত বাকি বাড়িটুকু ঘুরে দেখবে চলো। আর একটা কথা, গতকাল রাতে যে টহলদার ছিল, তাকে একবার হাজির হতে বলা যায়? জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

৪

হাবিলদার গণপত রাই লম্বা সেলাম ঠুকল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং চৌরঙ্গি রোডের মুখটায় তার পোস্টিং থাকে। রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টে অবধি। ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে একবার ভিতরের পাড়াগুলোয় সে টহল দিয়ে আসে। সেদিন রাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতেই সে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। সে থাকতে একটি দুষ্ট মাছিও গলবে না, এমন শপথ নিয়ে সে চৌকিদারি করে বলে জানালো।

উমেশ সামান্য হেসে বললেন—এ পথে বোধহয় সারারাতই গাড়িঘোড়া চলে?

—বিলকুল চলে সাব। ফিরঙ্গিলোগ, দেশি বাবু লোগ সব মৌজমস্তি করকে লৌটতে হ্যায়। গণপত এক নিঃশ্বাসে উত্তর দিল।

—ভালো করে ভেবে বল গণপত। সামান্য কোনো ঘটনা হলেও চলবে।

গণপত মাথা নাড়িয়ে বলল—না হুজুর।

—ও পথে তো সবাই গাড়িতে ফেরে। কাউকে হেঁটে ফিরতে দেখেছো? উমেশ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

গণপৎ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—অ্যায়সা কোই নহি থা হুজুর... সির্ফ এক ফিরঙ্গি সাব, বহুত পিয়ে হুয়ে থে; মেন রোড মে গাড়ি সে উতরে। দোস্তলোগ কে গাড়ি থা শায়েদ। ফির পয়দল চলকে মেরে তরফ আনে লগে। ঠিক সে চল নহি পা রহে থে। উল্টে তরফ সে রিক্সা আ রহা থা, উসকো রোকনে কে লিয়ে বোলে।

—তারপর?

—উও রিক্সাওয়ালানে যানে সে ইনকার কিয়া। ফিরঙ্গি বহত গুস্সে মে আয়া,অওর উসকো মারনে কে লিয়ে হাত উঠায়া। রিক্সাকা চক্কে কা স্ক্রুপ ঢিলা হো গয়া থা সাহাব। রিক্সাওয়ালে নে হাত জোড়া। গরীব আদমি। উসকা দোষ নহি থা। তো ম্যায়নে ফিরঙ্গি কো সমঝায়া, অওর ইশারে সে রিক্সাওয়ালে কো ভগায়া।

—রাত কটা বাজে তখন?

—সাড়ে তিন–চার বজ রহা হোগা সাহাব।

—এত রাতে রিক্সা কোথায় যাচ্ছিল খোঁজ নাওনি?

—পুছাথা। টিরেটা বাজার সে এক ফিরঙ্গি সাব কো লেকে আয়া থা হুজুর। ঘর পে ছোড়কে লওট রহা থা। চণ্ডু মিলতা হ্যায় না উধর... সাহাবলোগ...

গণপত জিভ কেটে চুপ করল।

উমেশ প্রশ্ন করলেন—

রিক্সাওয়ালা কেমন দেখতে ছিল?

—কেয়া মালুম হুজুর! দুবলা পতলা সা থা। লম্বা ইনশান। চেহরা নহি দেখা। অন্ধেরে ঠিক সে খয়াল নহি কিয়া।

উমেশ আর কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। গণপত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সালাম ঠুকে বলল—হুজুর!

উমেশ হাত নাড়িয়ে তাকে যেতে বললেন।

গিরীশ পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। গণপত চলে যেতে সে বলল—মনে হচ্ছে উল্টো দিকের মেজাজি সাহেব আর কাল রাতের মাতাল, একই লোক উমেশদা।

—নিঃসন্দেহে। উমেশ ভাবতে ভাবতে বললেন।

—আমি আগেই বলেছিলাম যে গণপত কাজের কথা কিছু বলতে পারবে না।

—হুম। কিন্তু ইটের দাগদুটো বড় ভাবাচ্ছে হে। উমেশের ভুরু কুঁচকেই ছিল।

—আপনি ঠিক কী ভাবছেন বলুন তো?

—আসলে ভাবছি ঘরে ঢোকার দুটো পথ। একটা দরজা দিয়ে, দুই জানালা দিয়ে। দরজা আর জানালা ভিতর থেকে বন্ধ। ছাদের দরজাও

বন্ধ। কিন্তু দোতলা অবধি না পৌঁছালে তো ঘরে ঢুকতেই পারবে না।
বাড়িতে কি মই-টই আছে? উমেশ প্রশ্ন করলেন।

গিরীশ একগাল হেসে বলল–না। এই সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় এসেছিল। তাই আগেই খোঁজ নিয়েছি। মই কেনা হবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু হয়নি।

—হু। কিন্তু তবে কী হতে পারে...

—মই কাঁধে করে খুনী আসতে পারে না উমেশদা? কিংবা ধরুন রণ-পা?

—এই ভরা শহুরে এলাকায় রণ-পায়ে হেঁটে এসে...! না, না! অত গোদা সমাধান নয় গিরীশ। এমন কিছু যা চোখের সামনে আছে, অথচ ধরতে পারছি না।

—কী হতে পারে সেটা? গিরীশ উমেশের দিকে তাকিয়ে বলল।

—কী জানি, আরেকটু গবেষণা লাগবে হে। কিন্তু এখন এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে, চলো বাকি বাড়িটা ঘুরে দেখেনি।

বাড়ির একতলায় যে ছটি ঘর দেখলেন উমেশরা, তার চারটি বন্ধ অবস্থায় থাকে। বাকি দুটির একটিতে থাকে বিশ্বনাথ, এবং অন্যদুটির একটিতে রাঁধুনি হরি এবং বালক চাকর দীনু। দীনু মূলতঃ বাইরের কাজকর্ম করে, এছাড়াও দুবেলার ঠিকে ঝি ঝর্ণা আসে। বাসন মেজে এবং ঘর মুছে চলে যায়।

বিশ্বনাথের এ বাড়িতে বহুদিন আছেন। বাকি দুজন অপেক্ষাকৃত নতুন। দোতলার ছটি ঘরে বৈঠকখানা বাদে, বিনয়ের ঘর, লাইব্রেরি কাম প্রমথনাথের অফিস-ঘর, দম্পতির শয়নকক্ষ, জেঠিশাশুড়ির ঘর, এবং বিরাটাকার রান্নাঘর রয়েছে। এছাড়াও দোতলাতে দুটি বাথরুম, ভাঁড়ার ঘর আছে। বাথরুম দুটির একটি বিনয়ের ঘরের থেকে বেরিয়ে করিডর বরাবর হাঁটলে বাদিকে, অন্যটি অন্তঃপুরে। বৈঠকখানা এবং বিনয়ের ঘর পাশাপাশি, অন্দরমহলের ঘরগুলি করিডর থেকে ঘুরে বাঁদিকে। বাইরে থেকে বাড়িটিকে যেরকম বনেদী মনে হয়, ভিতরে ঢুকলে সেই আভিজাত্যের ব্যাপারটা আরো ভালো ভাবে অনুভব করা

যায়। বৈঠকখানা ঘরসহ বাকি সব জায়গাতেই প্রাচুর্যের ছাপ। বারান্দায় টবে বাহারি গাছ, দুর্মূল্য স্ট্যাচু, সুদৃশ্য ফুলদানি ইত্যাদি সাজানো।

বিনয়ের ঘরে ডাক্তার লেম্যান, পুলিশের হাউস-সার্জেন এসে কাজ করছেন। নীচে মুর্দাফরাসরা অপেক্ষা করছে, লেম্যান সবুজবাতি দিলেই বিনয়ভূষণ দত্তের মৃতদেহ লাশকাটা ঘরে যাবে। বিনয়ের ঘরে না ঢুকে, উমেশ আর গিরীশ অন্দরমহলের দিকে গেলেন। করিডরের মুখটাতেই ছিপছিপে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মাঝবয়সী যে ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, সে-ই সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ। গিরীশ আগে থাকতেই বাড়ির লোকেদের এক প্রস্থ এজাহার নিয়ে রেখেছিল, সকলেই ভিতরে পরের পর্বের জন্য অপেক্ষা করছিল।

উমেশকে দেখে বিশ্বনাথ হাত জোড় করে নমস্কার করল। উমেশ দেখলেন, লোকটির চোখে শঙ্কা থাকলেও আতঙ্কের লেশ মাত্র নেই। জবানবন্দির খাতা বার করে উমেশ তার যে তথ্যগুলো লিখলেন—

নাম-বিশ্বনাথ হালদার। বয়স-আনুমানিক বিয়াল্লিশ বছর– বাড়ি-তালখোলা গ্রাম, মেদিনীপুর। প্রথমনাথের বাড়িতে আছেন- তিরিশ বছর। বাবা এখানেই কাজ করতেন, তিনিই কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে বেশ কিছুদিন মালিকের হাওড়ার মেশিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছেন। কিন্তু বাড়িতে নির্ভরযোগ্য লোকের অভাব বলে এখন বাড়িতেই থাকেন। আলপিন থেকে আলকাতরা যখন যেরকম প্রয়োজন পড়ে, বিশ্বনাথ সামলান। আগে একাই এত বড় বাড়ির সব ধরণের গৃহকর্মের দেখভাল করতেন, এখন বয়স হওয়ায় মালিক দয়াপরবশ হয়ে আরও একজন ফাই ফরমায়েশ খাটার চাকর রেখেছেন।

—যিনি খুন হয়েছেন, বিনয়ভূষণ দত্ত, কেমন লোক ছিলেন? জবানবন্দি লিখতে লিখতে আচমকা প্রশ্ন করলেন উমেশ।

বিশ্বনাথ সামান্য চমকে উমেশের দিকে তাকালো। তারপর বললেন —কেমন লোক ছিলেন আমি কিভাবে বলি হুজুর! চুপচাপ থাকতেন। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

—হুম। গতকাল রাতে তাঁকে বাড়ির বাইরে যেতে বা বাড়িতে ঢুকতে শেষ কে দেখেছে?

—আজ্ঞে আমিই।

—কটা নাগাদ ফিরেছিলেন?

—সাতটা বেজে গিয়েছিল, বিশ্বনাথ একটু ভেবে বলল।

—রোজ কটার সময় ঢোকেন?

—বৌদিমণি প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেলাই-স্কুল থেকে ফেরেন, আর ঐ সময় নাগাদই বিনয়বাবুও ফেরেন। কোনো কোনো দিন পাঁচ দশ মিনিট এদিক ওদিক হয়।

—কাল দেরি হয়েছিল কেন জানো?

—আজ্ঞে না হুজুর।

—কাল দুজনের মধ্যে বৌদিমণি আগে ঢুকেছিল?

—হ্যাঁ। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

—আর বিনয় ঢোকার পর দরজা কতক্ষণে বন্ধ হয়?

বিশ্বনাথ একটু ভেবে বলল—সঙ্গে সঙ্গেই হুজুর।

—তারপর আর কেউ বাড়ির বাইরে বেরোয়নি?

—আজ্ঞে না।

—বাজে কথা। তুমি নিজে রাতে দরজা খুলে বেরিয়েছিলে; দু-তিনজন সাক্ষী আছে। উমেশ অন্ধকারে একটা তীর ছুঁড়ে দিলেন।

বিশ্বনাথের চোখে ত্রাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। আমতা আমতা করে সে বলল—আজ্ঞে, আমার গ্যাসের ব্যাথার ব্যামো আছে। পাড়ার মোড়ে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম।

—আগে বলোনি কেন?

—ভুলে গিয়েছিলাম হুজুর।

—সে সময় সদর দরজা কে বন্ধ করেছিল?

—আজ্ঞে আমিই। বাইরে থেকে তালায় চাবি দিয়ে গেছিলাম।

—সদর দরজার চাবি তোমার কাছে থাকে?

—হ্যাঁ হুজুর। বিশ্বনাথ সামান্য ইতস্ততঃ করে ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বার করে দেখায়।

—এই চাবি কাউকে কখনো দিয়েছিলে?
বিশ্বনাথ আঁতকে উঠে বলল—আজ্ঞে চাবি কাউকে কেন দেব?

—ভেবেচিন্তে উত্তর দাও। সদরের দরজার চাবি তোমার কাছে থাকে। বিনয়বাবুর ঘরে লোক নিশ্চয়ই হাওয়া গলে ঢোকেনি। তুমি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেছো!

—এসব আপনি কী বলছেন! বিশ্বনাথ উমেশের দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

—ঠিকই বলছি। হয় তুমি সদর দরজার চাবি কাউকে দিয়েছিলে, অথবা নিজেই দরজা খোলা রেখে লোক ঢুকিয়েছো।

বিশ্বনাথ প্রতিবাদ করে উঠে বলল—আপনি অসম্ভব কথা বলছেন হুজুর। দরজা গতকাল একমিনিটের জন্যও খোলা ছিল না। কোনোদিনই থাকে না। দাদাবাবুর কড়া হুকুম।

—বিনয় কি ফিরে সোজা নিজের ঘরে চলে যান?

– আজ্ঞে।

—বিনয়বাবুর ঘর কি তালা দেওয়া থাকে?

—সবসময়। নাইতে গেলেও ঘরে তালা দিয়ে যান।

—গতরাতে যে সময় বৌদিমণি তোমাকে ডাকেন, সে সময় তুমি কী করছিলে?

—ঘুমিয়েছিলাম। বৌদিমণি দরজা খুলে নেমে এসে চিৎকার করে ডাকায় উপরে উঠে আসি।

—মানে তুমি উপরের সাড়াশব্দ, আর্তনাদ, কিছুই শুনতে পাননি?
বিশ্বনাথ দুদিকে মাথা নাড়িয়ে না বলে।

—কাল রাতে ঘরে প্রথম পা রাখে কে?

—হরি। বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করে উত্তর দিল। যখন দরজা ভাঙছিলাম তখন সবার আগে ও-ই ছিল।

—শেষে কে ঢোকে?

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করে বলল—আমি।

—ঘরে ঢুকে তোমরা কোনদিকে গেলে?

—ঘরে হাল্কা আলো জ্বলছিল। চোখ সইতেই, বৌদিমণি চিৎকার করে উঠল। আমরা তাকাতে দেখি জানালার সামনে বিনয়বাবু...

—তারপর?

—তারপর আমরা তিনজন ছুটে গেলাম ওদিকে। বৌদিমণি ওখানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন।

—কোথায় দাঁড়িয়ে?

—আজ্ঞে দরজার কাছে।

—তারপর?

—আমরা তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের বড় বাতি-টা জালালাম।

কোনোদিকে কেউ নেই। ঘরের দরজা বন্ধ, জানালা বন্ধ। খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখলাম, খাটের কোণে দেখলাম...কোথাও কিছু নেই!

—খাটের তলা কখন দেখেছিলে?

—সঙ্গে সঙ্গে হুজুর। আমি, দীনু আর হরি তিনজনেই দেখেছিলাম। বিশ্বনাথ উত্তর দিয়ে উঠল।

—সে সময় বৌদিমণি কী করছিলেন?

—আজ্ঞে, খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

—ডেডবডির কাছে যাননি?

—আজ্ঞে না।

—বিনয়ভূষণের ঘর কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করত?

—ঠিকে ঝি ঝর্ণা।

—তুমি কখনও ঐ ঘরে ঢুকতে না?

—বিনয়বাবু না ডাকলে ঢুকতাম না। বিনয়বাবু পছন্দ করতেন না। বৌদিমণিও বারণ করেছিলেন।

-

--বিনয়বাবু কি প্রতিরাতে জানালা বন্ধ করে শুতেন?

—আজ্ঞে না।

—খুলে শুতেন কিনা সেটা কিভাবে জানলে? তুমি তো ঢুকতে না?

—রাস্তার দিক থেকে এ ঘরের জানালা দেখা যায়। ভোরে দুধ আনতে যেতাম, বিনয়বাবু সেসময় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতেন।

—হুম। গতকাল রাতে বিনয়বাবুকে তুমি শেষ কখন দেখো?

—খাবার দিতে যাওয়ার সময়। তাঁর খাবার প্রতিদিন রাত নটায় পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

—তিনি ঘরেই খাবার খেতেন?

—আজ্ঞে।

—এ বাড়ির প্রত্যেকে ঘরেই খাবার খান বুঝি?

—না হুজুর। বৌদিমণি আর দাদাবাবু এঁরা টেবিল চেয়ারে খান। জেঠিমা অসুস্থ, তাঁকে বৌদিমণি নিজেই খাইয়ে আসতেন।

—বিনয়বাবু কোনোদিন খাওয়ার টেবিলে অন্যদের সঙ্গে বসেননি?

—বসতেন মাঝে সাঝে। উৎসব পার্বণে।

—এমনিতে সময় কাটাতেন কিভাবে? ছুটিছাটার দিনে?

—আজ্ঞে, তার বসে থাকার অভ্যেস ছিল না। হয় বাইরে বেরোতেন বা খুট-খাট করে যন্ত্রপাতি ঘাঁটতেন।

—যন্ত্রপাতি?

—নানা জিনিস বানানোর শখ ছিল। যন্ত্রপাতি খারাপ হলে সারিয়ে দিতেন।

—কিন্তু যন্ত্রপাতি তো ঘরে কিছু দেখলাম না!

—ছিল না। দাদাবাবুর একটা বাক্স আছে। ব্যবহার হয় না। অবসরে ওটাই ঘাঁটতেন। নানা ধরণের কল বানাতেন।

—বটে? কীরকম? উমেশ বুঝলেন টুলবক্স দিয়ে যন্ত্রপাতি বানানোর কথা বলছে বিশ্বনাথ।

—টিনের পাত কেটে নারকেল খুরপি বানিয়ে দিয়েছিলেন, হাতে ঘষে ঘষে নারকেল কুরতে সুবিধা হয়। দাদাবাবুর কারখানার জিনিসও দরকারে সারিয়ে দিতেন। খুব মাথা পরিষ্কার ছিল হুজুর! বিশ্বনাথ মাথা নীচু করে বলল।

—তোমার দাদাবাবুর সেই বাক্সটা আমাদের জমা দেবে। উমেশ বলে উঠলেন।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

—আচ্ছা, গতকাল রাতে এমন কোনো ঘটনা চোখে পড়েছে যা একটু আলাদা, অন্যদিনের মতো নয়?

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করে বলল—
সেরকম কিছু তো আলাদা করে মনে পড়ছে না...তবে, কাল মাছের ঝোলে শুকনো লঙ্কা বাটা দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও উনি হরিকে ডেকে গাল দেননি দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম।

—হরি মানে এ বাড়ির রাঁধুনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিনয়বাবু বুঝি খাবার ভালো না হলে খুব বকাবকি করতেন?

—ঠিক তা নয়। ঝাল খেতে পারতেন না একদম। ঝাল খাবার বেড়ে দিলে হরির উপর রাগারাগি করতেন। ওরটা ঝাল দেওয়ার আগে আলাদা করে তুলে রাখা হতো। হরি কাল তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল।

—আচ্ছা!

উমেশ জবানবন্দির খাতায় লিখতে লিখতে থমকে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তাঁর মুখ নির্বিকার হয়ে রইল। কিছুক্ষণ থেমে সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করলেন এবার বিশ্বনাথকে।

—দেশের বাড়ি যাও কত ঘন ঘন?

—খুব কম যাওয়া হয়। দাদাবাবু কলকেতা থাকলে পুজোর সময় যাই।

—দাদাবাবু কতদিন অন্তর বাইরে যান?

—আজ্ঞে ঠিক থাকে না হুজুর, যখন যেমন কাজ পড়ে। তবে, কোনোদিনই চার পাঁচ দিনের বেশি বাইরে থাকেন না। এবারে একটু বেশি সময়ের জন্য গেছেন। আর তার মধ্যেই এই অনর্থ ঘটে গেল।

—তোমার দেশের বাড়িতে কে কে আছেন?

—সকলেই। দুই ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি।

—যাও না কেন?

—এখানে সংসার অচল হয়ে পড়বে। বৌদিমণি একলা মেয়েমানুষ। বিশ্বনাথের গলাটা সামান্য দ্রব হয়ে আসে।

—তুমি তো হিন্দু? খ্রিশ্চান বাড়িতে কাজ করো, জাতের ভয় নেই?

বিশ্বনাথ এ প্রশ্নে সামান্য হেসে বলল—ভাতের কী আর জাত হয় হুজুর! বাবা যখন ছিলেন, তখন মানতেন। আলাদা রান্না করে খেতেন। এখনও দীনু আর হরি স্বপাকে আলাদা খায়, আমি আর ওসব পারি না।

—বিনয়বাবুরও বোধহয় জাত খোয়ানোর ভয় ছিল না, তাই না?

বিশ্বনাথ মাথা নাড়িয়ে বলল—
তিনি তো কোনোদিন স্বপাকে রান্নার কথা বলেননি হুজুর। মুর্গিও খেতেন বাকি সবার সঙ্গে।

—ঠিক আছে। এখন এসো। প্রয়োজনে আবার ডেকে পাঠাবো।

গিরীশ বিনয়ের ঘরে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল—লেম্যান সাহেবের কাজ হয়ে গেছে উমেশদা। মৃত্যুর সময় আনুমানিক রাত একটা থেকে তিনটে। জুগুলার ভেন কেটে মৃত্যু। ডাক্তার বললেন, পাকা হাতের কাজ। একবার ও ঘরে যাবেন নাকি?

–হুম। চলো।

—কেমন বুঝলেন বিশ্বনাথকে? গিরীশ প্রশ্ন করল।

—বলা মুশকিল হে! লোকটা হয় খুব চতুর অভিনেতা অথবা নিপাট ভালোমানুষ। উমেশ জবানবন্দীর খাতা বন্ধ করতে করতে বললেন।

৫

—বিনয় কি চেয়ারটা খাটের পাশে রাখতো? উমেশ উল্টানো চেয়ারটার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—খাটের একটু দূরে। বিশ্বনাথ দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

খাটের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন উমেশ। হেডবোর্ডের কাছে একটা জায়গায় রক্তের গোলাকার একটি ছাপ ফুটে উঠেছে।

—এই রক্তের দাগটা দেখেছো গিরীশ?

গিরীশ দাগটি খেয়াল করেনি আগে। কাছে গিয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে সে বলল—হাতাহাতি করার সময় লেগেছে বোধহয়।

—অথচ বিছানায় এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই। খুব আশ্চর্য না! উমেশ চিন্তামগ্ন স্বরে বললেন।

—হয়ত বিছানার উপর শুয়ে ছিল। খুনী তখন হামলা করেছে, তখন বাধা দিয়েছে...তখন কোনোভাবে ছিটকে...

—হুম, উমেশ গিরীশের কথায় ঠিক সন্তুষ্ট হলেন না। বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা বিশ্বনাথ, ঘরে কোনো হেরিকেন বা মোমবাতি জাতীয় কিছু থাকত না? বাতি চলে গেলে কী করতো?

বিশ্বনাথ এর উত্তরে এদিক ওদিক তাকালো। বলল—হেরিকেন নয়, তবে মোমবাতি ছিল। বোধহয় ঐটার মধ্যে রাখতেন।

বিছানার ধারের ছোট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন উমেশ। টেবিলটা চৌকোনো, দুটো ড্রয়ার রয়েছে উপরে নীচে। প্রথম ড্রয়ারটা টানতেই একটা টাকা রাখার বটুয়া, চারটে রঙিন পেন্সিল, একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ, কিছু খুচরো পয়সা আর একটা সাদা আধজ্বলা

মোমবাতি দেখা গেল। দ্বিতীয় ড্রয়ারে বিশেষ কিছু নেই, দু তিনটি পুরোনো খবরের কাগজ ছাড়া।

পেন্সিল চারটে তুলে উল্টে পাল্টে দেখলেন উমেশ। বটুয়াটা খুললেন। সাকুল্যে বারোটি টাকা পড়ে আছে। ভাঁজ করা সাদা কাগজটি এবার খুললেন উমেশ।

—এটা কী জিনিস! গিরীশ উমেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

উমেশ কাগজটাকে ধরে দরজার বাইরে আলোর দিকে নিয়ে গেলেন। পকেট থেকে আতসকাচ বার করে খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর আবার ভাঁজ করে ঘরে নিয়ে এলেন।

—কী দেখলেন বললেন না তো?

উমেশ কাগজটা গিরীশের দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজটা খুলতে কিছু আঁকিবুকি দেখতে পেল গিরীশ। লাল নীল পেন্সিলে কটা আঁচড় কেটে দু তিনটি বৃত্ত, চার-পাঁচটি সরলরেখা আঁকা রয়েছে। তার পাশে কিছু কিছু সংখ্যা লেখা।

—কিছু বুঝলে?

—কই না! গিরীশ চোখ কুঁচকে লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছিল। উমেশের প্রশ্নে সে অপ্রস্তুত হল।

উমেশ ঠোঁট টিপে কিছুক্ষণ চিন্তা করে ভাঙা দরজাটার দিকে গেলেন, ছিটকিনি আর ফ্রেমের কব্জা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ছিটকিনি আলগা হয়ে ঝুলছিল, কব্জাদুটি ফ্রেম থেকে প্রায় উপড়ে এসেছে। দু-একটা স্ক্রু এখনও খুলে আসেনি বলে ফ্রেম থেকে পাল্লা আলাদা হয়ে যায়নি। সাধারণ দরজা, বেশ শক্তপোক্ত, চাইনিজ লকও লাগানো নেই যে বাইরে থেকে টেনে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। দরজাটাকে দুপাশ থেকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে উমেশ নিশ্চিন্ত হলেন যে দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল।

গিরীশ চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সকালে সে নিজে পুরো ঘর খানাতল্লাশি করেছে। উমেশের দ্বিতীয়বার তল্লাশিতে সে বিরক্ত

হচ্ছিল কিনা, তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। ঘরের কোণে একটা তোরঙ্গ আর ছাতা রাখা ছিল। উমেশ তোরঙ্গ খুলে নেড়েচেড়ে দেখলেন। জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। বিনয়ের ছাড়া জামাকাপড় ভাঙা দরজার পিছনে একটা হ্যাঙারে ঝুলছিল। সেসব নামিয়ে প্যান্টের পকেট চেক করলেন। বিড়ি আর দেশলাইএর প্যাকেট বেরোলো, এ বাদে কিছু খুচরো পয়সা।

উমেশ জুতো ছেড়ে এবার খাটের তলায় সেঁধিয়ে গেলেন। একটু পরে খাটের তলা থেকে তাঁর গলা শোনা গেল—খাটের তলাটা বেশ ইন্টারেস্টিং, বুঝলে গিরীশ। ঠিক করে ঝাড়া মোছা হয় না। বিনয়ভূষণ কারখানায় কি রোজ খালি হাতে যেতেন, না থলে জাতীয় কিছু থাকতো?

—খালি হাতে যেতেন হুজুর, বিশ্বনাথ উত্তর দিল।

—গতকাল যখন ফিরেছিলেন, তখনও হাত খালি ছিল?

—আজ্ঞে হুজুর।

উমেশ হাঁটু গেঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এবার জানালার দিকে গেলেন, প্রতিটি পাল্লা এবং গরাদ টেনে টেনে পরীক্ষা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

গিরীশ সামান্য গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, —বলেছিলাম উমেশদা। এই ঘর একেবারে বদ্ধ খাঁচা। ঢোকা তো যাবে, বেরোনো অসম্ভব। এসব রহস্য শুধু গল্পে উপন্যাসে পড়া যায়।

—আমার বিশ্বাস পৃথিবীর যে কোনো রহস্যেরই যে কোনো অঙ্কের সমস্যার মতই সমাধান করা সম্ভব। এটাও হবে। শুধু সঠিক পদ্ধতিতে এগোতে হবে।

—আজকের তদন্তের অগ্রগতিতে আপনি সন্তুষ্ট?

—খুবই। বেশ কিছু জিনিস জানতে পেরেছি।

—যেমন?

—যেমন ধরো দেওয়ালের উপরে ঐ হাতের ছাপটা, নিহতের নয়, বরং খুনীরই। বিনয়ের সঙ্গে যে খুনির ধস্তাধস্তি হয়েছিল সে তো বিনয়ের অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল। টাল সামলাতে না পেরে, দেওয়াল ধরে ফেলেছিল। ছুরিতে লেগে থাকা রক্তে তখন তার হাতও রক্তাক্ত।

—কী করে বুঝলেন?

—কেন! এ তো খুব সহজ। ছাপটা ডান হাতের। প্রতিটি আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হলেও আঙুলগুলো যে স্বাভাবিক তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিনয়ভূষণের ডান হাতের অনামিকাটা কিন্তু স্বাভাবিকের থেকে ছোটো।

—ওহ!

—ঘাবড়িও না, উমেশ গিরীশের পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, আপাতত হাবিলদারেরা এই ঘরের সবকটা জিনিস সিল করুক আর ততক্ষণ আমরা সুচিত্রা দেবীর জেরাটা সেরে ফেলি চলো।

৬

সুচিত্রা ম্যাকডিসনের বয়স তিরিশের কোঠা ছুঁই-ছুঁই, পরনে কমলা রঙের তাঁতের একটি আটপৌরে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুরের হাল্কা রেখা। হাতে শাঁখাপলার বদলে তিন গাছি করে সোনার চুড়ি। গলায় একটি সরু মফ-চেন। মাথার চুল ঘন কালো, ধাপে ধাপে পাতা কেটে এমন হালফ্যাশানে সাজানো যে ছোট্ট কপালটি ঢাকা পড়ে গেছে। তবে চুলের সজ্জাটি বাসি। কাল রাত থেকে চুলে চিরুণী পড়েনি তা বোঝা যাচ্ছে। চুলের সাজসজ্জা দেখলে সুচিত্রাকে যতটা আধুনিকা মনে হয়, পোষাক আষাকে সেই পারিপাট্য নেই। বরং তার চেহারাটিতে এমন একটি কাঠিন্য আছে যে একঝলকে দেখলে তার বয়স ২৭/ ২৮ নয়, কিঞ্চিৎ বেশি মনে হয়। এই কাঠিন্যটি বাড়ির বিপর্যয়ের জন্য আকস্মিক আরোপিত হয়েছে, না গঠনগত সৌষ্ঠবটিই এমন তা এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত লাগছে মেয়েটিকে। গিরীশ আর উমেশকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর চোখে আতঙ্কের যে চোরা স্রোত বয়ে গেল, তা উমেশের নজর এড়োলো না। হাত উঠিয়ে সে নমস্কার করল কিন্তু হাত তোলার সময় আঙুলগুলি কেঁপে উঠল।

উমেশ একটা চেয়ার টেনে সামনে বসে বললেন—আপনার এই শোকের সময়ে বিরক্ত করছি। সামান্য ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

সুচিত্রা উত্তরে চোখ তুলল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

উমেশ একটু গলা খাঁকড়িয়ে বললেন–আপনি তো কুমিল্লার মানুষ, জাতে হিন্দু। প্রমথনাথ বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা এবং বিয়ে...মানে কৌতূহল হচ্ছে আর কী!

—আমি জন্মগতভাবে হিন্দু হতে পারি, কিন্তু খ্রিশ্চান হয়েছি ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে, সুচিত্রা মুখ না তুলেই বলল।

—একটু খুলে যদি বলেন।

—আমার বাবা মা যেসময় মারা যান, সেসময় আমার বয়স দশ। গরীব পরিবার, দায়িত্ব নেওয়ার কেউ ছিল না। বিড়াল, কুকুরে ছিঁড়ে খেত, যদি না ফাদার মার্টিন সেসময় ধর্মপ্রচারের কাজে গিয়ে আমাদের গ্রামে পৌঁছাতেন। খাওয়া জুটছে না দেখে ফাদার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। জ্যাঠারাও আমাকে তুলে দিতে এক মুহূর্তও চিন্তা করেননি। ফাদারই পরে আমাকে কলকাতায় আনেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে মিসেস হজের যে মেয়েদের স্কুলটি ছিল, সেখানে ভর্তি করেন। অবৈতনিক স্কুল ছিল, কিন্তু সেখানেই খাওয়া-পরা, পড়াশুনা, সেলাই এবং গান- বাজনা শেখার সুযোগ হয়েছিল। স্কুল পাশ করলাম। বেথুন কলেজে ভর্তি হলাম। সাধারণ ছাত্রী ছিলাম। মোটামুটি ফল হলো। ফাদার মার্টিন, তখন আর্কডায়াসেস এর বিশপ মুলেম্যানের ঘনিষ্ঠ। বিশপ-ই আমাকে একটা সেলাই স্কুলে কাজ দেন। তখনকার হেড-দিদিমণি রিটায়ার করলে, আমি হেড হই।

—প্রমথনাথ বাবুর সঙ্গে কিভাবে দেখা?

—বড়দিনের সময়, গির্জায় হোলি মাসে গিয়ে।

—আচ্ছা। কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—সাত বছর।

—সন্তানাদি হয়নি?

—না।

উমেশ লক্ষ করলেন, উত্তর দেওয়ার সময় সুচিত্রা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

—আপনার মাসির পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

সুচিত্রা মাথা উঠিয়ে উমেশকে দেখল। তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি।

—বলছি আপনার মাসির পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে? উমেশ আবার বলে উঠলেন।

—পরিবার বলতে এক বিবাহিতা বোন, ময়মনসিংহে থাকে।তাকে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। 'তার' করার মত উপযুক্ত ঠিকানা পাইনি। লোক পাঠিয়েছি। সুচিত্রার বদলে গিরীশ উত্তর দিল।

—আপনার মাসিমা-মেসোমশাই কি গত হয়েছেন?

সুচিত্রা উপর নীচে মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলল।

—আপনি খ্রিশ্চান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যোগাযোগ রেখেছিলেন?

—মাসিমা রেখেছিলেন। একমাত্র মাসিমার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল। সুচিত্রা কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। সদ্যমৃত মাসতুতো ভাইয়ের স্মৃতিতে, অথবা একমাত্র আত্মীয়ের সহৃদয়তার কথা স্মরণ করে, তা বোঝার চেষ্টা করলেন উমেশ।

কান্নার দমক কমলে সুচিত্রা বলল—

আমার কলকাতায় চলে আসা আর খ্রিশ্চান হওয়া নিয়ে যদি কেউ আন্তরিক দুঃখ পেয়ে থাকেন, তিনি ছিলেন আমার মাসিমা। কিন্তু সেসময় তাঁর কিছু করার ছিল না, তিনি অন্যের অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন। পরে মেসোমশাই কাজ নিয়ে কলকাতায় চলে আসলে মাসিমা আমাকে খুঁজে বার করেন। হেদুয়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। মেসোমশাই পছন্দ করতেন না, কিন্তু মাসিমা তাঁকে লুকিয়ে আমার স্কুলে আসতেন, খোঁজখবর রাখতেন, পুজোয় জামা দিতেন।

—পরে ওরা কুমিল্লায় ফিরে যান?

—হ্যাঁ, মেসোমশাই পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করতেন, উনি মারা গেলে ওঁরা দেশে ফিরে যান।

—এটা কতদিন আগের কথা?

—চার-পাঁচ বছর হবে।

—আপনার মেসোমশাই পছন্দ করতেন না...তা আপনার মাসিমা আপনার বিয়েতে আসেননি?

—বিয়েতে আসেননি, আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছিলেন। তারপর চিঠিতে যোগাযোগ ছিল।

—আর আপনার মাসতুতো ভাই বিনয়ভূষণ দত্ত?

—কলকাতায় চাকরি খুঁজছিল। তাই কুমিল্লা থেকে...
সুচিত্রা থেমে থেমে উত্তর দিল।

—আপনার মাসিমার এই দুই ছেলেমেয়ে?

—হ্যাঁ।

—ইনি ছোট না বড়?

—ছোট।

—এই বীভৎস কাণ্ড কে ঘটালো, কেন ঘটালো কিছু বলতে পারবেন?

সুচিত্রা মাথা নাড়িয়ে না বলল।

—আপনার ভাইয়ের কোনো বদসঙ্গ, বদ-অভ্যাস ছিল?

—বদসঙ্গ?

—-মানে কোনোরকম কুসঙ্গে পড়েছিলেন কখনো? জুয়াজোচ্চোরি, ঠগ, জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিলেন কোনোদিন।

—আমি ঠিক জানি না। সুচিত্রা আতঙ্কিত ভঙ্গিতে বলল।

—কাল বরানগর থেকে দেরি করে কেন ফিরেছিল বিনয়? জানেন?

—কারখানার কিছু কাজ ছিল। কিছু জিনিস গুদামে জমা দিতে হতো। ওখানেই দেরি হয়েছে বোধহয়। সুচিত্রা একটু ভেবে উত্তর দিলেন।

—বাড়ি ফেরার পর আপনার সঙ্গে কথা হয়নি?

—হ্যাঁ। টুকটাক কথা হয়েছিল।

—আপনি কাল সেলাই-স্কুলে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোথায় আপনার স্কুলটা?

—শোভাবাজারে।

উমেশ হাত বাড়িয়ে তাঁর নোট-বুকটি বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, এখানে আপনার স্কুলের ঠিকানাটা লিখে দিন। সুচিত্রা ত্রস্ত হাতে তার ঠিকানাটি লিখে দিল।

—বেশ। এবার একটু অন্য প্রশ্ন করি সুচিত্রাদেবী। উমেশ নোটবই নিজের হাতে নিয়ে বললেন।

সুচিত্রা সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে তাকালো।

—কাল রাতে যখন আপনি বিনয়বাবুর ঘরের সামনে গিয়ে দরজা ধাক্কান, ভিতর থেকে কোনো শব্দ পেয়েছিলেন?

সুচিত্রা একটু ভেবে বলল—হ্যাঁ, অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ।

—জানালার পাল্লা খোলা, আসবাবপত্র উল্টে যাওয়া, ফুলদানির ভাঙচুর এসব কিছুর আওয়াজ?

—পেয়েছিলাম। সম্ভবত ঘুমের মধ্যে। বিনয়ের আর্তনাদও। কিন্তু আমার ঘুম ঠিক মতো ভাঙেনি।

—ঠিকমতো ভাঙেনি বলতে?

—গতকাল আমার মাথার যন্ত্রণা হওয়ায়, ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। ঘুমটা গাঢ় হয়েছিল। তাই বোধহয়...

—মাথার যন্ত্রণায় কি প্রায়শই ভোগেন?

—মাঝে মাঝে...

—হুম। আপনার এই ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনে আবার ঘুমিয়ে পড়া, আর বিছানা থেকে উঠে বিনয়ের ঘরের দিকে যাওয়া...এর মধ্যে কতটুকু সময়ের পার্থক্য হবে? উমেশ কাটা কাটা প্রশ্ন করলেন।

সুচিত্রা চকিত দৃষ্টি তুলে তাকালো, একটু চিন্তা করে বলল—ঠিক খেয়াল নেই, তবে পুরোপুরি ঘুমের আমেজ কাটতে দেখি ঘড়িতে আড়াইটে বাজে।

—হুম। কি ওষুধ খেয়েছিলেন?

—নাক্সভম, সুচিত্রা ইতস্ততঃ করে বলল।

—একটু দেখতে পারি শিশিটা?

সুচিত্রা একটু বিরক্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠল। দেরাজের উপর একটি বেতের ঝুড়ি থেকে নাক্সভমিকার শিশি এনে দিল। উমেশ শিশিটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিলেন।

—বরানগরে প্রমথনাথ বাবুর ফ্যাক্টরির নাম কী?

—সুচিত্রা গ্লাসেস।

—বিনয় সেখানে কী ধরণের কাজ করতেন?

—দপ্তরের সব ধরণের কাজ। প্রোডাকশনও দেখত।

—কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

—ইন্টার পাশ করেছিল।

—গত রাতে যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা হয়, আপনি ডেডবডির কাছে গিয়েছিলেন?

—না।

—কেন জানতে পারি?

—রক্ত দেখলে আমার মাথা ঘোরে। আমি দরজার কাছেই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

—সেসময় করিডরের বাতি জ্বলছিল?
সুচিত্রা চোখ তুলে উমেশের দিকে তাকাল। প্রশ্নের গূঢ় অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পরে বলল, হ্যাঁ।

—একতলায় নামার সিঁড়ির দরজাও খোলা ছিল?

সুচিত্রা খাটো কণ্ঠে উত্তর দিল —হু।

—আপনি দরজা ধাক্কানোর পরও যখন বিনয় দরজা খোলে না, তখন আপনি কী করেন?

—নীচে যাই, বিশ্বনাথদার নাম ধরে ডাকি।

—কতক্ষণ ধরে আপনি দরজা ধাক্কিয়েছিলেন?

সুচিত্রা মাথা নীচু করে ভেবে উত্তর দিল—দশ মিনিট মতো হবে।

—দশ মিনিট তো অনেক সময়! অতক্ষণ না দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিচে গেলেন না কেন?

—বুঝতে পারছিলাম না কী করবো! মাথাটা ঠিকমত...

—হুম। আপনি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথকে ডাকছিলেন না ঘরের সামনে গিয়ে?

সুচিত্রা একটু অবাক হয়ে বলল—সিঁড়িতে।

—তারপর কী হয়?

—তারপর ওরা উপরে আসে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে...ওদের সঙ্গে আমিও...সুচিত্রা কথা শেষ করতে পারলো না। ওর মুখের উপর গত রাতের বিভীষিকা ভর করে এলো।

উমেশ জবানবন্দি লেখা বন্ধ করলেন। মাথা থেকে টুপিটি খুলে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন–আপনার ঘরটি একবার দেখা যাবে?

সুচিত্রা নিশ্চুপ রইল। মৌনম সম্মতিং লক্ষণম ধরে নিয়ে উমেশ উঠে ঘরের চারপাশে একবার তাকালেন।

সুচিত্রার ঘরটি বেশ বড়। বিনয়ের ঘরের জানালার আকারের দুটি জানালা রয়েছে। দুটি জানালাই পূর্বদিকে খোলে। দেওয়ালে প্রমথনাথ এবং সুচিত্রার বিয়ের ছবি, প্রভু যীশুর ছবি, সেলুলা কাপড়ের উপর ক্রশস্টিচের কাজ করা সিনারি ঝোলানো রয়েছে। প্রমথনাথকে এই প্রথম দেখলেন উমেশ। বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের শক্তসমর্থ যুবক, ব্যবসায়ী শব্দটি শুনলে বাঙালি মানসে যে ভুঁড়িসম্বল, থলথলে চেহারাটি ভেসে আসে, প্রমথনাথ তার একদম বিপ্রতীপে। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা আত্মবিশ্বাসী হাসিটি তাকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। তীক্ষ্ণ চোখ, লম্বা নাক, সরু ঠোঁট দেখে তাঁকে বিচক্ষণ, নিয়মনিষ্ঠ মনে হয়। সুচিত্রার ছবিটিও হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। দুজনের ছবিটির নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন উমেশ। সুচিত্রার ঘরটি বাকি বাড়ির মতো নিপুণভাবে সাজানো। ঘরের কোনো কোণায় ধূলোময়লার অবশেষটুকু নেই। ছত্রী দেওয়া সুবিশাল খাটে সাদা চাদর পাতা, তাতে লাল নীল এমব্রয়ডারির নকশা তোলা। ঘরের এক কোণে দেরাজ, কাঠের আলমারি, এমনকি হালফ্যাশনের ড্রেসিং ইউনিট রয়েছে।

উমেশ পায়ে পায়ে দেরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেরাজের উপর একটি বেতের ঝুড়িতে সেলাইয়ের জিনিসপত্র রাখা, পাশের একটি ট্রেতে টুকটাক ওষুধপত্র রয়েছে। ওষুধপত্রগুলি আরেকবার নেড়েচেড়ে দেখলেন। তাকে তিন চারটি বইও রয়েছে দেখলেন উমেশ। কবিতা এবং উপন্যাসের সবকটি। বাংলা-ইংরাজি মেশানো; একটিতে পেজমার্ক দেওয়া আছে দেখে সেই পাতাটি খুললেন। চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস—কিন্তু পেজমার্কটিতে একটি ইংরাজি কবিতার কয় লাইন লেখা–

"...An empty room, cobwebbed and comfortless.
Yet this alone out of my life I kept
Unto myself, lest any know me quite;
And you did so profane me when you crept
Unto the threshold of this room tonight
That I must never more behold your face.
This now is yours. I seek another place."

কার লেখা বুঝতে পারলেন না উমেশ! এক কালে তাঁরও কবিতা পড়ার শখ ছিল। ইংরাজি কবিতা কোনোদিন পড়েননি অবশ্য। এখন কাজের চাপে বাংলা কবিতা পড়াও ভুলেছেন।

সুচিত্রাকে উমেশ প্রশ্ন করলেন—আপনার বুঝি গল্প, কবিতা পড়ার খুব শখ?

—হুম। সুচিত্রা অস্ফুটে উত্তর দিলেন।

বইটি তাকে রেখে উমেশ সেলাইয়ের জিনিসপত্রগুলো দেখতে শুরু করলেন। গোলাকার কাঠের ফ্রেমে একটি সাদা আদ্দির কাপড় লাগানো। অকলঙ্ক সাদা ঠিক বলা যায় না, কারণ তাতে এখনও কোনো ডিজাইন গেঁথে না তোলা হলেও, অস্পষ্ট রেখা দেখা যায় পেন্সিলের। উমেশ ফ্রেমটি তুলে একবার রোদের দিকে ধরলেন, তারপর রেখে দিলেন। সুচিত্রাকে তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না।

সুচিত্রার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না এবং ভাঁড়ার ঘর পেরোলে তিন নম্বর ঘরটি জেঠিশাশুড়ির। উমেশ দরজায় করাঘাত করলে ভিতর থেকে কোনো শব্দ এলো না। উমেশের মনে পড়ল, ভিতরের অধিবাসিনী কানে শুনতে পান না। তিনি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের মধ্যস্থলে পাতা খাটের উপর শীর্ণকায়া বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন। উমেশ কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। উমেশ দেখলেন, বয়সের আন্দাজে জেঠিশাশুড়ির দৃষ্টি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ।

—কী চাই? তিনি প্রশ্ন করলেন।

একটা ছোট প্রশ্ন করার ছিল। উমেশ কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন।

—তুমি কি পুলিশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী হয়েছে? বৃদ্ধা সামান্য উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিছু না। সামান্য চুরি। উমেশ বৃদ্ধাকে উদ্বিগ্ন করতে চাইছিলেন না।

—চুরি! তা হবে! চাকরবাকর সংসার চালালে এ আর আশ্চর্য কী! তা আমাকে কী প্রশ্ন করবে? আমি তো হাঁটতে চলতে পারি না। এ ঘর থেকে বেরোতেও পারি না।

—কাল রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়েছিল? উমেশ প্রশ্ন করলেন।

—কী বললে? ঘুম? বৃদ্ধা কানটা এগিয়ে নিয়ে আসলেন।

—হ্যাঁ?

—তা বৌমার সাজসজ্জা দেখে একটু উড়েছিল বটে। কিন্তু পরের দিকে এসেছিল।

—আপনি বৌমাকে পছন্দ করেন না বুঝি? উমেশ প্রায় কানে কানে বললেন।

বৃদ্ধা মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন —পছন্দ করব না কেন! তবে বাপের বাড়ির ছোঁড়াকে স্বামীর বাড়িতে তোলা...এসবে আমার মত

নেই। আর ছোঁড়াও তেমন সুবিধের নয়।

—কেন এ কথা বলছেন?

—ছোঁড়ার দৃষ্টি ভালো নয়। ঝর্ণার দিকে কুনজর ছিল।

—আপনি দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ। ঘর মুছতে আসলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। আমার ঘরের দরজা খোলা থাকলে তো গোটা বারান্দা দেখা যায়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে উমেশ বললেন—বিনয়ের সঙ্গে আপনার কোনোদিন কথা হয়েছে?

—তার কি সে সহবত ছিল? সে সোজা নিজের ঘরে ঢুকত। ঘরেই থাকত, আবার সকালে কাজে চলে যেত। যত গুজগুজ নিজের দিদির সঙ্গে! এতই যখন ম্লেচ্ছদের ঘেন্না পাস, তো সে বাড়িতে থাকা কেন বাপু!

এমন সময় গিরীশ বিনয়ের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সিল করে জেঠিমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। উমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থাকলেন।

সন্ধে নেমে আসছিল। গিরীশ হাতঘড়ি দেখছিল,উমেশকে দেখে সে বলে উঠল
—ছটা বাজে, বাড়ি যাবেন না উমেশদা?

—হ্যাঁ। এই যাবো; উমেশ সামান্য হেসে বললেন, বাকিদের পরে দ্বিতীয়বার জেরা করা যাবে, কী বলো?

উঠোন পেরিয়ে বেরোনোর সময় একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন উমেশ। একটা সরু বাঁশের কঞ্চির উপর তিনকোণা কাঠের ফ্রেম গলিয়ে তলায় দুটো চাকা লাগানো হয়েছে। চাকাদুটোর একটা খুলে গেছে। বিশ্বনাথ নাট টাইট করে খুলে যাওয়া চাকাটা লাগাচ্ছে। কঞ্চিটার উপর দুটো হুক গাঁথা।

—এটা কী জিনিস? উমেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন।

—-চৌবাচ্চা থেকে বারবার জল না এনে একেবারে দু বালতি বিনা পরিশ্রমে বয়ে আনার সুন্দর ব্যবস্থা। ঐ দুটো হুকে বালতি ঝুলিয়ে আনা যায়। গাছে জল দেয় বিকেলে।

—চমৎকার! উমেশ যারপরনাই উল্লসিত হয়ে বললেন।

গিরীশ উমেশের কানে কানে বলল—বিনয়ের কীর্তি বোধহয়।

৬

রাস্তায় আজ প্রবল ভিড়। বেশির ভাগই ঘোড়ার গাড়ি আর রিক্সা। দু চারটে মোটর গাড়ি দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার। চিৎপুরের দিকে দলে দলে পুণ্যার্থীরা পুজো দিতে চলেছে। দেবী চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে মঙ্গলবার সন্ধেবেলা বিশেষ পুজো হয়। নেহাতই, ট্রামে চেপেছেন বলে ভিড়ের ধকল নিতে হচ্ছে না উমেশদের।

গিরীশের আর উমেশের বাসা একই পথে পড়ে। গিরীশ একটু আগে নামবেন, কলুটোলায়। ট্রামের জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল; সারাদিনের গরমের পর একটু স্বস্তির অবকাশ। উমেশ অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছিলেন।

–কেসটা নিয়ে খুব চিন্তা করছেন? গিরীশ প্রশ্ন করল।

—ওই আর কী! উমেশ ফিকে হেসে বললেন।

—বাড়ির লোকজনকে কেমন বুঝলেন?

উমেশ সিগারেট একটা টান দিয়ে বললেন—দেখো, বাড়িতে দুজন মুখ্য লোক। সুচিত্রা দেবী আর প্রমথনাথ বাবু। তাদের একজনের দেখা পাইনি। কিন্তু সুচিত্রা...তোমার ওঁকে কেমন লাগল?

—কেন? ভালোই তো। বোধহয় খুব ভয় পেয়েছেন।

—হুম। কিন্তু ভয়ের অভিঘাতটা খুব প্রবল...শোক এখনও সেভাবে

ভারাক্রান্ত করেনি। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। স্বামী এখানে উপস্থিত নেই। চোখের সামনে একটা বীভৎস ঘটনা দেখেছেন...তার পর শুধু খুনের বীভৎসতা নয়, অদ্ভুত একটা পদ্ধতি...! উমেশ ভাবতে ভাবতে বললেন।

—কী রকম মনে হচ্ছে আপনার? ঘরে খুনী ওভাবে ঢুকল কী করে?

—দেখো গিরীশ, প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, খুনী বোধহয় বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছিল। বিশ্বনাথের বয়ান অনুযায়ী, বিনয় সর্বদা ওর ঘরে তালা দিয়ে রাখতো। অতএব ভেবেছিলাম, ওর ঘরের খাটের তলাই একমাত্র জায়গা যেখানে খুনী লুকোতে পারে। বাড়ির লোক দরজা ভাঙার সময় কোনো এক সুযোগে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতেও পারে। কিন্তু এখন আর সেরকমটা ভাবছি না।

—কেন?

—বিনয়ের খাটের তলায় ধুলোর পুরু আস্তরণ রয়েছে। কেউ এসে লুকিয়ে থাকলে তার শরীরের ছাপ থাকত।

—তার মানে খুনী হাওয়ার সঙ্গে মিশে ঘরে ঢুকেছে, আর ঘর থেকে বেরিয়েছে?

উমেশ হেসে ফেলে বললেন—আরে হাওয়া ঢুকতেও তো ঘুলঘুলি লাগে। সেই ঘুলঘুলিটা খুঁজতে হবে।

গিরীশ হতাশ কণ্ঠে বলল—দিনের শেষে নাই তো মোটিভ বোঝা গেল, না মোডাস অপারেন্ডি বোঝা গেল, আর না কোনো সন্দেহভাজনদের কোনো তালিকা তৈরি হলো। আমরা শূন্য পেলাম উমেশদা।

—বিনয়ভূষণের কাজের জায়গায় কাল একবার যাও। খোঁজ নাও।

—সে নাহয় যাবো। কিন্তু একটা কথা বলুন-বাড়ির কাউকে কি আপনি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন?

—কাউকেই বাদ দিচ্ছি না। বাড়ির প্রতিটি ঘরের চাবি গৃহকর্ত্রীর কাছে থাকে। সেই চাবি কে ব্যবহার করতে পারে সেটা ভাবার চেষ্টা করছি।

—বাড়ির বাইরের কারুর যোগসাজশ থাকতে পারে না?

—হুম। পারে।

—কার যোগসাজশ ছিল বলে মনে হয়?

—তা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। দেখো একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, বিনয়ভূষণের খুনের একমাত্র উদ্দেশ্য খুনটুকুই ছিল না। আততায়ীকে বিনয়ের ঘরে ঢুকতে হয়েছিল কোনো বিশেষ প্রয়োজনে। তা নাহলে, খুনটা এভাবে হতো না।

—আপনি বলছেন, অন্যত্র হামলা করেও মারতে পারতো?

—না। তা বলছি না। বলছি এটাই যে এই খুনী তার পরিচয় এবং খুনের উদ্দেশ্য দুটোই সমান ভাবে লুকোতে চেয়েছিল।

—ঠিক বুঝলাম না।

উমেশ একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, খুনটা কিভাবে করা হয়েছে সেটা একটু ভাবো। খুন করেছে ছুরি দিয়ে? কেন? যেখানে বাজারে দেশী পিস্তল এত সুলভে পাওয়া যায়? একটা গুলি করেই যেখানে লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া যায়, সেখানে খুনী এত ঝুঁকি নিয়ে গেরস্ত বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে ছুরি মেরে খুন করে গেছে।

—কিন্তু কেন?

—সেই কেনরই তো উত্তর খুঁজছি।

গিরীশ একটু ভেবে বলল—
আপাতত যা যা জানা গেল, সেটুকু যদি গুটিয়ে নিয়ে আসি তাতে আলাদা করে কারুর কোনো স্বার্থ দেখতে পাচ্ছেন?

—নাহ! কিন্তু মনের মধ্যে তিনটে কাঁটা খচখচ করছে।

–কী কী?

—প্রথমত কুমিল্লার লোক তরকারিতে ঝাল খায় না কেন? দ্বিতীয়ত বিনয়ের মানিব্যাগের কাগজে কাটা আঁকিবুঁকির অর্থ কী? আর তৃতীয় কাঁটাটি হলো সবথেকে তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম!

—সেটা আবার কী?

—ক্ষম্পেক শব্দের অর্থ জানো গিরীশ?

—নাহ!

—মঙ্গলকাব্য পড়েছো? আঁচড়িল কেশপাশ নানা পরবন্ধে/ তৈলযুত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে/ কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি/ দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি?

—কী সব বলছেন বলুন তো!

উমেশ আর উত্তর দিলেন না। গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। গিরীশ নামার আগে শুধু একবার বললেন —বিনয়ের ঘর থেকে যে জিনিসগুলো সিল হয়েছে সেগুলো থানায় পাঠিয়েছো তো?

গিরীশ একটি হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিয়ে ট্রাম থেকে নেমে গেল।

পরের দিন সকাল হতে চিৎপুর রোডের উত্তরাংশে ঢুঁ মারলেন উমেশনাথ। পরিচিত পাড়া, কাজের প্রয়োজনে প্রায়শই আসেন উমেশনাথ। এ তল্লাট, বিশেষতঃ মেছুয়াবাজারের খালাসিটোলা, বৌবাজার, ওদিকে পূর্বে মির্জাপুর পর্যন্ত এলাকা অপরাধ আর অপরাধীর আঁতুড়ঘর। অন্যমনস্ক হয়েছ কী, সাধারণ পথচারীর জানমাল খোওয়ানোটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ফিরিঙ্গিরা এই অঞ্চলকে ব্ল্যাক টাউন বললেও, উমেশনাথের বিশ্বাস, অপরাধবিজ্ঞানে হাত পাকাতে, শহরের এই অংশে থাকার কোনো বিকল্প হয় না। বেলা গড়িয়ে এগারোটা বেজেছে বলে, ফুটপাতের দোকানগুলির সামনে বেশ ভিড়। ফেরিওয়ালারা সুর করে, ছড়া বেঁধে খদ্দেরদের দৃষ্টি আর্কর্ষণের চেষ্টা করছে। মাথা থেকে ঝাঁকা নামিয়ে কিছু বিহারি মজদুর, তাদের দৈনিক মজুরির জন্য অপেক্ষা করছে। মুটেদের পাশ কাটিয়ে তিনি রাস্তা পার হলেন।

চিৎপুরের রাস্তাও এখন সরগরম। ঘন ঘন ভেঁপু বাজিয়ে একের পর এক ল্যান্ডো গাড়ি চলেছে। এখানকার ফুটপাথ বিচিত্র। পাশাপাশি হেঁটে চলছে কত বিচিত্র সাজপোশাকের মানুষ। তাদের অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণী। ফেরিওয়ালা, দোকানের কর্মচারী, বিভিন্ন শ্রেণীর দালাল আর বেকার ভবঘুরের দল যেমন চলেছে, তেমনি চশমা নাকে, লপেটা পায়ে, টেরি কাটা বাবু থেকে শুরু করে, ফিটফাট বিলিতি পোশাক পরা কালো সাহেবের দল ওয়াকিং স্টিক হাতে, শহরের পথে ঘাটে নরক গুলজার করছেন।

মিনিট পাঁচেক পরে, চিৎপুর আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের আলোকিত বৃত্তের বাইরে পা রাখলেন উমেশনাথ। প্রথমবার যখন এসেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেন এক অন্ধকার জগৎ হাঁ করে গিলে খেতে আসছে তাঁকে। সর্পিল, অন্ধকার এবং ঘিঞ্জি গলিপথ জুড়ে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন বস্তি। সেই বস্তির সিংহভাগ জুড়ে দেহব্যবসায়িনী আর মজুর সম্প্রদায়ের বাস। দেশী মদের ভাঁটিখানা থেকে পেট গোলানো টক গন্ধ উঠে আসছে। সন্ধে নামলে জুয়াখেলা, চণ্ডুর নেশার ধোঁয়ায় মজে থাকে এই অঞ্চল। তবে উমেশনাথের আসার কারণ আলাদা। মাতাল, বেপরোয়া দেশীয়দের দলে মিশে থাকে পুলিশের বেশ কিছু সোর্স। ইম্পেরিয়াল পুলিশ ফোর্সের ভারতীয় সার্জেন্টদের বিস্তর ভরসার জায়গা ওটি। সম্ভাব্য চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির খবর আগেভাগেই পাওয়া যায়।

আধ ঘন্টার একটু বেশী সময়, সোর্স মোহন বিশ্বাসের সঙ্গে কাটিয়ে গরানহাটার পথ ধরলেন উমেশ। বিনয়ের চেহারাটি দেখার পর থেকে মস্তিষ্কের একটি তারে সামান্য বিদ্যুৎক্ষরণ হয়েছে তাঁর। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না এর কারণ। মোহন বিশ্বাসকে সেই দায়িত্ব সঁপে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। মোহন এক দিনের মধ্যে খবর যোগাড় করে দেবে বলে কথা দিয়েছে। বিনয় দত্তের কাগজটাও ভাবাচ্ছে, সেটিকেও পরিচিত একটি দোকানে দেখাতে চান। গতকাল কাগজটিকে নিজের পকেটে ভরে নিয়েছিলেন। রাতে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাগজটাকে খেয়াল করেছেন। আতস-কাচের তলায় ফেলে যত দেখেছেন, তত অবাক হয়েছেন। লাল আর নীল পেন্সিলে কতগুলি বৃত্ত আর লম্বা কতগুলি রেখা আঁকা। স্কেল এবং কম্পাস ছাড়া এমন নিখুঁত আঁকা সম্ভব নয়। কিছু হিসেব-নিকেশ করা হয়েছে যা সাধারণ বলে মনে হয় না। পাতার একদম মধ্যিখানে সবথেকে বড় যে বৃত্তটি আঁকা হয়েছে, তার আবার একটি অন্তর্বৃত্ত আছে। প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি সরলরেখা টেনে বৃত্তের ব্যাসার্ধ লেখা আছে। উমেশ নিজে ইন্টার

অবধি বিজ্ঞান পড়েছেন, কিন্তু আঁকাগুলো দেখলে মনে হয়, জ্যামিতিক অঙ্কণে নিপুণ কেউ ছবিটি এঁকেছে। কাগজটি প্রমথনাথের কারখানার অফিস-প্যাড থেকে ছেঁড়া হয়েছে, ওয়াটারমার্ক দেওয়া দামি কাগজ। রোদের বিপরীতে ধরলে এস.জি লেখা দেখা যায়। এস.জি অর্থে সুচিত্রা গ্লাসেস। পাতার উপর পেনসিলের রেখাগুলিও নতুন। কাচের বাসনের কারখানার দপ্তরী হঠাৎ কেন জ্যামিতিক আঁকাবুঁকি করতে শুরু করল, এটা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল উমেশের কাছে।

গরানহাটার দু'তিনটি পরিচিত দোকান ঘুরেও বিশেষ কোনো লাভ হল না। কাঠের দোকানগুলিতে কারিগরদের থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। উমেশের ধারণা ছিল তারা এমন মেকানিকাল ড্রয়িং দেখলে হয়ত কী প্রয়োজনে তা আঁকা হয়েছে তা বলতে পারবে। কিন্তু বিধি বাম। সবথেকে বড় দোকানটির হেড-কারিগর ছুটিতে, ছুটকো ছাটকা যারা আছে, তারা কেউ ঠিক করে কিছু বলতে পারে না। বিশেষত সমকেন্দ্রিক দুটি বৃত্ত দেখে সকলের কপালে ভাঁজ পড়ছে। হেড-কারিগর এসে পৌঁছালে থানায় একবার হাজিরা দিতে বললেন উমেশ।

গরানহাটা থেকে বেরিয়ে উমেশ যখন থানায় এসে পৌঁছালেন, তখন দুপুর বারোটা বেজে গেছে। গিরীশ কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছে। উমেশ প্রশ্ন করলেন—তোমার কাজ হল?

গিরীশ সামান্য চিন্তান্বিত স্বরে বলল–গিয়েছিলাম, খোঁজখবরও নিলাম। কিন্তু কিছু কাজ হল কিনা তা তো বুঝতে পারছি না।

—যা জানতে পারলে, দেখতে পারলে তাই বলো।

—সুচিত্রা গ্লাসেসের কারখানাটা বরানগরে গঙ্গার ধারে উমেশদা। বেশি বড়ো নয়। এক একর জমির উপর কারখানা। কাচের প্লেট, গ্লাস, কাপ-সসার, ফুলদানি তৈরি করে। ঢুকে দেখি, চারিদিকে বালির স্তুপ। সেই বালি গলিয়ে নাকি কাচ বানায়! চারিদিকে উঁচু পাঁচিল আছে, বিশাল এক ফটক। আর সেই ফটক পেরিয়ে ছোট একটা গুমটি ঘর। সেখানেই বিনয় বসত, কোম্পানির আপিসঘর বলে দেখালো সবাই।

আমি যখন পৌঁছালাম তখন ক্যাশিয়ারবাবু আপিসঘরে ছিলেন। বয়স্ক মানুষ। হরিদেব পোদ্দার নাম। তাঁকে বিনয়ের কথা বলাতে

আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন। শোক পেলেন কিনা বলতে পারি না, তবে বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন। বিনয়ের মৃত্যুর খবর ওরা কেউ পাননি।

—স্বাভাবিক। ফোন খারাপ। কে-ই বা খবর দেবে! উমেশ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে মাথা রেখে গিরীশের কথা শুনছিলেন।

—হ্যাঁ তা তো বটেই। এদিকে গতকাল বিনয়ের ফ্যাক্টরি থেকে বেরোতে দেরি হয়েছিল একথা হরিদেব পোদ্দারও বললেন। গুদামে কীসব জমা রেখে রসিদ নিয়ে আসতে আসতে অনেক বেলা হয়ে যায়। কাল তার খাওয়াও হয়নি।

—বিনয় কেমন ছেলে ছিল, কী বললেন হরিদেববাবু?

—খুবই প্রশংসা করলেন। বললেন খুবই কর্মদক্ষ ছেলে ছিল। চার মাসে কাজকর্ম একেবারে রপ্ত করে ফেলেছিল। মেশিন চালানো, কোন ধরণের কাচে কী পরিমাণ বালি আর কেমিকাল মিশবে–এসব একেবারে নখদর্পণে ছিল। কথা কম, কাজ বেশির ছেলে।

—কী ধরণের কাজ হয় দেখলে?

—ওরে বাবা! সে তো বিরাট কর্মযোগ। বিশাল বিশাল ফার্নেসে বালি গলাচ্ছে। তারপর সেই গলানো বালির সঙ্গে সোডা মেশাচ্ছে, সীসা মেশাচ্ছে। গলানো কাচ থেকে তারপর বোতল-টোতল তৈরি করে।

—বাহ! বাহ! এ সুযোগে তোমার বেশ দেখা -টেখা হয়ে গেল। তা ও তল্লাটে কারখানা কীরকম দেখলে?

গিরীশ হেসে বলল—ও বাবা! ওই তল্লাট তো কারখানায় ভর্তি। মেশিনারি, কাচ, ফার্মাসিউটিক্যাল। সুচিত্রা গ্লাসেসের একদম পাশেই আরেকটা কারখানা, সিমেক্স গ্লাসেস। বিলিতি বাবুদের...বুঝলেন কিনা। সেই কারখানাটি আরও বড়ো। চাকচিক্যও বেশি। তার পাশে, আমাদের দেশি কারখানা ছোট হলেও, দেখে বেশ গর্ব হচ্ছিল।

—কী নাম বললে? সিমেক্স গ্লাসেস? উমেশ এতক্ষণে মুদিত চোখ মেলে বললেন।

—হ্যাঁ। কেন নাম শুনেছেন নাকি? গিরীশ প্রশ্ন করল।

উমেশ সামান্য ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে করতে বললেন—নামটা যেন কোথায় বেশ শুনেছি।

—শুনতেই পারেন। বিলিতি বাবুদের কারখানা বলে কথা। ও ভালো কথা, লালবাজারের যে খোঁজটা নিতে বলেছিলেন, ওটার খবর পেয়েছি। ফিরতি পথে একবার লালবাড়ি ঢুঁ মেরেছিলাম।

—কী শুনে এলে? সেই অফিসার ছুটি থেকে ফিরেছে?

গিরীশ মুখের হতাশ ভঙ্গি করে বলল– হ্যাঁ। তবে যা শুনলাম, তাতে প্রমথনাথ লোকটা খুব একটা সুবিধার মনে হলো না।

—কীরকম?

—এটা তিন বছর আগের কথা। হাওড়ায় যে মেশিনারি ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে গন্ডগোল বেঁধেছিল। স্টেটসম্যান খবর করেছিলো।

—বিশদে বলো।

—প্রমথনাথ নাকি চারটে কোম্পানি থেকে মাল সাপ্লাইয়ের অর্ডার তুলেছিলেন, মার্কেট থেকে টাকাও তুলেছিলেন বিস্তর। কিন্তু অর্ডার সাপ্লাই দিয়েছিলেন দুটো কোম্পানিতে। বাকি দুটোকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আজ নয় কাল করে ঘোরাচ্ছিলেন। তাতে বিস্তর জল ঘোলা হয়। কোম্পানিগুলো পুলিশ কেস করে।

—তারপর!

—তারপর চাপে পড়ে অর্ডার মিটিয়ে দিলে কেস রফা হয়।

উমেশ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন—এই মার্কেট থেকে টাকা তোলার ব্যাপারটা কী?

—প্রমথনাথের কোম্পানিগুলোর কোনোটাতেই বিলিতি ইনভেস্টর নেই উমেশদা। মার্কেট থেকে পুঁজি ওঠে।

–মানে দেশীয় লোকেদের থেকে?

—হ্যাঁ। এই করে করে এই কবছরে লোকটা ভালোই গুছিয়ে নিয়েছে। প্রথমে এজেন্ট দিয়ে সরাসরি মার্কেট থেকে টাকা তুলত। এখন তো শেয়ার-টেয়ারও ছেড়েছে শুনেছি।

—নতুন কারখানা মানে সুচিত্রা গ্লাসেসের কীরকম পরিস্থিতি? ব্যবসা চলে? উমেশের চোখ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিল।

—শুনে এলাম তো ভালোই। গ্ল্যাক্সো কোম্পানি থেকে নাকি ফিডিং বোতল বানানোর বরাত পেয়েছে, তার জন্য জমি কিনবে নতুন। বরানগরের কারখানা আরও বাড়াবে বলে পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এই খবরগুলো নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন কেন? কোনো বিশেষ কারণ আছে?

—আছে বইকী! বিনয়ের ভূষণটা আসলে কী, সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি! উমেশ রহস্যময় হেসে বললেন।

—মানে?

—মানে আবার মঙ্গলকাব্য। টন্‌টান ঠন্‌ঠান ঢাল চলে ঢন্‌ঢন্/ ঝন্‌ঝান্ ঘন রণনাদ/ দেখিতে বিপরীত চৌদিকে চমকিত
মানুদা ভাবে পরমাদ।

গিরীশ মাথা নাড়িয়ে বলল–নাহ। মাঝে মাঝে আপনি এমন হেঁয়ালি করেন না, উমেশদা! আপনি আজ আর নতুন কিছু পেলেন?

—আপাতত সরলরেখা আর বৃত্তের রহস্য সন্ধানে আছি। কিন্তু গরানহাটার হেড-কারিগর ছুটি থেকে না ফিরলে বিশেষ এগোতে পারছি না।

—মনে হয় বৃথাই মাথা ঘামাচ্ছেন। কাচের বাসনের কোনো নতুন ডিজাইন ভেবে বোধহয় এঁকে রাখছিল।

উমেশ কোনো উত্তর দিলেন না। গিরীশ কিছুক্ষণ মুখ বেজার করে ঠাণ্ডা চা শেষ করে বলল—আমি এবার পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট আনতে যাবো। আপনার কী পরিকল্পনা?

—দুটো। সুচিত্রার সেলাই স্কুলে একবার যাওয়া, আর ঐ পাড়ার ওষুধের দোকানগুলোতে একবার ঢুঁ মারা।

—সেখানে আবার কেন?

—ওই...যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই...উমেশ হেসে বললেন।

—কোনটা যে ছাই, কোনটা যে রতন তা আপনিই জানেন, গিরীশ একই রকম বেজার মুখে বলল, আগামীকাল সকালের দিকে প্রমথনাথ ঢুকছেন। মনে আছে তো? আমি কাল সকালের দিকে যেতে পারছি না। টেগার্টের চরণে নজরানা দিতে পাঠাচ্ছে লালবাড়ি থেকে। দুপুরে থানায় আসবো।

উমেশ ঘাড় নাড়িয়ে হেসে বললেন– মনে আছে। কাল সকালবেলা যাবো।

৭

এসপ্ল্যানেড থেকে বাঁদিকে ঘুরে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের রাস্তা ধরলেন উমেশ। হাতের ঘড়িটা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সারিয়ে ফিরতি পথে প্রমথনাথের বাড়ি যাবেন হেঁটে, এরকমই মনস্থির করে রেখেছিলেন। রাস্তার ধারে মার্চেন্ট অফিসের বিল্ডিংগুলোর গর্বিত মাথাগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন তিনি। ডানদিকে চোখ ফেরালে চৌরঙ্গি স্কোয়ারে স্টেটসম্যানের ঝাঁ-চকচকে বাড়িটা চোখে পড়ে। এই স্টেটসম্যানই কিনা সেই স্টেটসম্যান! মাত্র কুড়ি বছর আগেই তো, জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাতেই তো চিঠি লিখেছিলেন। নাইটহুড যে উনি ত্যাগ করতে চান, সেই ঘোষণাও তো এই চিঠিতেই। স্টেটসম্যান সেই চিঠি ছেপেছিল। অথচ এখন সেই খবরের কাগজই ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক! গত বছরে সম্পাদকের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়ে গেছে। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে!

মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম লাগছিল উমেশের। গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সারা রাত কেসের কথা চিন্তা করেছেন। যে কোনো খুনের তদন্তে দুদিক থেকে এগোনো যায়, হয় মোটিভ নাহয় মোডাস অপারেন্ডি। কিন্তু কোনো দিকেই ঠিকঠাক সূত্র না পেলে হতাশ আর হতোদ্যম লাগে।

এই পুরো ঘটনায় সুচিত্রার ভূমিকা কী হতে পারে তা নিয়ে বহুবার

ভেবেছেন উমেশ। তিনি কি কিছু জানেন! কোথায় যেন একটা আতঙ্ক তাড়া করছে মহিলাকে। চরিত্রটার সম্পর্কে ভাবতে গেলে সেই আতঙ্কিত মুখটির কথাই আগে চোখে ভাসে। তিনি কি খুনীকে চেনেন! খুনের পদ্ধতি দেখে তো শক্তসমর্থ যুবাপুরুষের কাজ মনে হয়; সুচিত্রা নিজে জড়িত না থাকলেও খুনীকে কি আড়াল করার চেষ্টা করছেন? কী স্বার্থ তাঁর? সেলাই-স্কুল থেকেও যা তথ্য পেয়েছেন সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানতে হবে। আর বিনয়...সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। কাজের খোঁজে কলকাতায় এসে দিদির বাড়ি থাকত। কে শত্রু হতে পারে ওর? জেঠিমার কথা সত্যি হলে ওর চরিত্রের দোষ ছিল। ঘরের ভিতর যে কুনজর দেয়, বাইরে তার কীরকম ব্যবহার থাকতে পারে? প্রণয় ঘটিত কোনো ব্যাপার হতে পারে কী...সুচিত্রা কী ভাইয়ের চরিত্রের ব্যাপারে কিছু জানতেন না! নাকি স্নেহের বশে সেসব এড়িয়ে যেতেন!

বিনয়ের চরিত্রটিকে ঠিকঠাক বুঝতে পারলে কেসের সমাধান একটু সহজ হত।

কিন্তু সে পথে সবথেকে বড় সমস্যা হল এই বদ্ধ ঘরের রহস্য!

গিরীশকে যতই হাসি-ঠাট্টা করে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করুন না কেন, আসলে ঐ রহস্যটি যে এই খুনের চাবিকাঠি তা উমেশ বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলেন।

লকড-রুম মিস্ট্রির কথা বিদেশি নভেলে কটা পড়েছেন বটে আগে, কিন্তু কোনোটাই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। মনে পড়ে, একবার একটা নভেলে পড়েছিলেন, রাস্তার ওপারের বাড়ির থেকে বন্দুকে করে ছুরি ছুঁড়ে খুন করেছিল খুনী। অন্য একটায় বোধহয় পড়েছিলেন, দরজায় সুতো বেঁধে দরজা বন্ধ করে তারপর সুতোয় আগুন দিয়ে প্রমাণ মিটিয়েছিল খুনী। পড়তে পড়তে চমকিত হলেও করতে হলে কতটা বাস্তবসম্মত হবে তা আশঙ্কা হয়। কিন্তু বিনয়ের ঘরটা! যদিও কোনোভাবে জানালা অবধি উঠল খুনী, শিক গলে ঢুকবে কীভাবে! জানালার ছিটকিনি গুলো নাড়িয়ে দেখেছেন উমেশ। একটু ঢলঢল হয়েছে বটে, খড়খড়ি দিয়ে তার জাতীয় কিছু ঢুকিয়ে খোলা যেতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনার পথে বাধা দুটি—শিক এবং জানালার উচ্চতা। মই কি কোনোভাবে জোগাড় করা সম্ভব ছিল! নাকি, সম্পূর্ণ ভুল পথে চিন্তা করছেন নিজে। দরজা যখন ভাঙল ওরা, তখন কী কোনোভাবে ঘরের কোণে লুকিয়েছিল খুনী! সুচিত্রা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখকে ধোঁকা দিয়ে কী আদৌ বেরোনো সম্ভব! নাকি...

দেখকে হুজুররররর...

কানের কাছে একটা লোক চিৎকার করে উঠল। উমেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নেমে এসেছেন কখন! একটা রিক্সাওয়ালা রিক্সা নিয়ে তাঁর গায়ের উপর উঠে যাচ্ছিল প্রায়। উমেশ সরে যাওয়াতে সে কোনোমতে টাল সামলাল। রিক্সায় বিপুলদেহ বাঙালি বসে। লম্বা হাতল টেনে ধরে রিক্সার উল্টে যাওয়া আটকালো চালক। রিক্সাটি বাহারি। তার হ্যান্ডলের থেকে রঙ বেরঙের ঝালর ঝুলছে। রিক্সাটা উমেশকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেকে এগিয়ে গেল। উমেশ কিছুক্ষণ দৃশ্যটার দিকে স্বপ্নের মত তাকিয়ে রইলেন।

মিনিট বিশেক পরে উমেশ যখন প্রমথনাথের বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তখন বেলা বারোটা বাজে। দরজায় একইরকম ভাবে হাবিলদারের পোস্টিং ছিল। ভিতরে ঢুকে এগোতেই উঠোনের এক প্রান্তে দীনুকে দেখতে পেলেন উমেশ। চোদ্দ-পনের বর্ষীয় বালক, মুণ্ডিতমস্তক, হাড় জিরজিরে চেহারা। গত পরশুর সুবাদে মুখ চেনা ছিল। আজ হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন উমেশ। দীনু এসে তার বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকালো।

—তোর নাম দীনু তো?

সে ঘাড় কাত করে উত্তর দিল–যে আজ্ঞে।

—বিনয়বাবু, মানে যিনি মারা গেলেন, তার সঙ্গে তোর খাতির ছিল?

—না গো বাবু। ভাব করার চেষ্টা করেছিলাম, ভাব করেনি।

—খুব রাগি লোক ছিল বুঝি?

দীনু মাথা নাড়িয়ে বলল
—কই না! তবে কথা কইতে চাইতো না। বৌদিদির সঙ্গে খালি কথা বলত। খুব ঠাট্টা করত বৌদিদির সঙ্গে। মজার মজার কীসব কথা বলতো...আর বৌদিদি খালি গোঁসা করতো।

—তুই কী কী কাজ করিস এ বাড়িতে?

—সব রকমের, চিঠি পোস্ট, সদয়পাতি তোলা, বিশু কাকার পিঠে তেল মাখিয়ে দেওয়া, গাছে জল দেওয়া, বৌদিমণির জন্য দুধ গরম

করে দেওয়া, দা-বাবুকে টিপিন পৌঁছে দেওয়া...দীনু কর গুণে গুণে বলছিল।

—চিঠি পোস্ট করতে পারিস! বাহ!

—সোজা তো! পোস্ট-আপিসে গিয়ে টিকিট লাগিয়ে লাল বাক্সে ফেলে দিতে হয়।

—আপিসের সব চিঠি পোস্ট করতিস বুঝি?

—আপিসের চিঠি, বৌদিদির চিঠি, বিশুদার বাড়ির চিঠি সঅব...

—বৌদিদি চিঠি লিখতো?

—লিখতো তো...অনেক লিখতো।

—কাকে লিখতো রে? উমেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

দীনু দাঁত বার করে বলল—কী যে বলেন! আমি কী পড়তে জানি! যা লিখতো, আমি টিকিট মেরে পাঠিয়ে দিতাম।

—কেন তোর বিশুকাকা তো লেখাপড়া জানে? চিঠি লিখতে পারে যখন। শিখিসনি কেন?

দীনু আবার দাঁত বার করে বলল—কী যে বলেন! বিশুদা তো কতকিছু জানে। হরিদাও কত্ত জানে! বিনয়দার কাছে সব শিখতো তো বসে বসে ওরা।
বিনয়দারও খুব বুদ্ধি ছিল। কথা কইতো না বেশি, কিন্তু হাত এক্কেরে বিশ্বকম্মা!

দীনু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু উপর থেকে সুচিত্রা ডাকল তাকে। সে ছুটে দোতলায় উঠে গেল।

দোতলায় উঠে ঘরোয়া এক আন্তরিক সাংসারিক দৃশ্য দেখলেন উমেশ। বারান্দায় এক বড় থালার উপর নধর মাপের একটি কাতলা সাজানো রয়েছে। কীভাবে তা রান্না হবে, বিশ্বনাথ সেই নির্দেশ দিচ্ছে

হরিকে। হরি মাথা নাড়িয়ে সেসব শুনছে। বিশ্বনাথের মুখে হাল্কা হাসির আভাস। হরি দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, পিছন ঘুরে উমেশকে দেখে তার মুখ পাংশু হয়ে গেল। বিশ্বনাথ জোড় হাত করে নমস্কার জানালো। উমেশ বুঝলেন, প্রমথনাথের খাতিরে বাড়িতে বিশেষ রান্নাবান্না হচ্ছে। সুচিত্রাকে কোথাও দেখতে পেলেন না উমেশ। করিডর বরাবর তাকালে জেঠিশাশুড়ির ঘরের খোলা দরজা চোখে পড়ল অবশ্য।

প্রমথনাথের লাইব্রেরি কাম অফিস ঘরটি এর আগে দেখা হয়নি উমেশের। আজ ঘরে ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। মাঝারি মাপের লাইব্রেরি কাম অফিস, ঘরের এক কোণে একটি ল্যাম্পশেড, জানালায় খাদি কাপড়ের পর্দা, দেওয়াল জোড়া আলমারি, তাতে রাখা দেশি-বিদেশি বই, আলাদা একটি রাইটিং ডেস্ক, তাতে কাগজপত্রের ফাইল রাখা—সব মিলিয়ে বেশ গুছানো ব্যাপার। বাইরের ভিজিটরদের জন্য ঘরের ডানদিকে টেবিল-চেয়ার পাতা, মাঝখানে একটি বড় টেবিলের অপরপ্রান্তে একটি কাঠের চেয়ারে বসে আছেন বাড়ির মালিক স্বয়ং।

উমেশ ঢুকে নমস্কার করলেন। চেয়ার থেকে উঠে প্রতিনমস্কার করলেন প্রমথনাথ। ছবিতে দেখে যেমন প্রাণবন্ত লাগছিল, পরিস্থিতির চাপে সেই স্ফূর্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তবে খ্রিশ্চান ধর্মালম্বী বাঙালি বাবুদের মধ্যে যে আলতো বিলিতি ব্যাপারটা লেগে থাকে, প্রমথনাথের মধ্যে তা নেই। একজন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু যুবকের থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় না। থমথমে মুখে উমেশকে বসতে বললেন প্রমথনাথ। উমেশ দু-একটি সহানুভূতির কথা বলে সরাসরি প্রশ্নে চলে গেলেন।

—কদিন বাইরে ছিলেন? কোনো বিশেষ কাজে নাকি?

প্রমথনাথ বিমর্ষ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—
বম্বেতে আমার কোম্পানির একটা শিপমেন্ট ফেঁসে গিয়েছিল। সেও অনেক টাকার মাল। বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হয়। দশ দিন সময় নষ্ট হল। সামান্য কাগজপত্রের ঝামেলার জন্য এত সমস্যা করলো সরকার।

—হুম। বিনয়ভূষণ দত্ত, মানে আপনার শ্যালকের সঙ্গে আপনার কেমন সম্পর্ক ছিলো?

প্রমথনাথ সামান্য চকিত হয়ে বললেন—শ্যালক ছিল, কাজকর্মে চৌখস ছিল। তাকে একটি কাজ একবার দেখিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার

দেখাতে হতো না। মাথাটি অসম্ভব খোলতাই ছিল। অনেকবার আমার হাওড়ার ফ্যাক্টরিতেও কাজে সাহায্য করেছে। তার কাজে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম।

—আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক?

প্রমথনাথ একটু অস্বস্তি নিয়ে বললেন– দেখুন শ্যালক–জামাইবাবুর মধ্যে যে হাসিঠাট্টার সম্পর্ক থাকে তা আমাদের মধ্যে কোনোদিনই ছিল না। তার নানা রকম কারণ থাকতে পারে। আমি প্রথমদিকে সহজ হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম...কিন্তু বিনয় গুটিয়ে থাকতো। ফলে আমিও আর...

উমেশ বললেন– কিন্তু বিনয়ের এমন ব্যবহারের কারণ কী?

প্রমথনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—আমার ধর্ম অন্যতম কারণ হতে পারে। যদিও বিনয়ের ম্লেচ্ছ বাড়িতে থাকা, খাওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল না; পেটের দায়ে মানুষ অনেক কিছুই মেনে নেয় কিনা!

–মানে বলছেন আপনি খ্রিশ্চান বলে সে সহজ ছিল না।

প্রমথনাথ একটু নীরব থেকে বললেন– দেখুন সার্জেন্ট, সুচিত্রার মাসিমার সঙ্গে সুচিত্রার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু তার বাড়িতে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। সেই বাড়ির ছেলে সহজ হবে না, এটা ধরে নেওয়াই তো স্বাভাবিক, তাই না? তাছাড়া জামাইবাবু–দিদির গ্রাসাচ্ছাদনে পালিত হচ্ছে বলে তার কোনো হীনমন্যতাও থাকতে পারে।

উমেশ বললেন—সুচিত্রা গ্লাসেসের কাজকর্ম তো সুচিত্রা দেবীই দেখতেন।

—হ্যাঁ। প্রথমদিকে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিয়মিত কারখানায় যাওয়ার সময় পাচ্ছিল না। আর পরে বোধহয়, এই ধরণের কাজে তাঁর আগ্রহও ছিল না। কারখানাতে গিয়েও সে গঙ্গার দিকে, ঘাটে, কারখানার বাগানে সময় বেশি কাটাতো। কাজের ক্ষতি হচ্ছিলো। নিজেই কিছুদিন পরে যেতে চাইছিল না।

—একটা প্রশ্ন করব যদি না কিছু মনে করেন।

—হ্যাঁ। করুন না।

—সুচিত্রা দেবীর প্রতি এতটা আস্থা রাখলেন কেন? মানে স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি আস্থা, আর একজন পাকা ব্যবসায়ী হিসেবে ভরসার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। সুচিত্রা দেবীর তো কোনো অভিজ্ঞতাও নেই বোধহয়।

প্রমথনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসলেন, তারপর বললেন—

সুচিত্রার একটা এনগেজমেন্ট দরকার ছিল। সেলাই–স্কুলে তিন-ঘন্টার কাজ। সারাদিন সে ফাঁকা। কারখানা নতুন, কিন্তু পুরোনো বিশ্বস্ত লোকজন তো ছিলই। ভেবেছিলাম মাঝে মাঝে গেলে যদি ওর মন বসে। ও তো শিক্ষিত, পরিণত বুদ্ধি। হয়ত ওর ভালো লাগতে পারে ভেবে আমি ওকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তাছাড়া আমি এত ব্যস্ত, উপরন্তু এত বছর বিয়ের পরেও আমাদের কোনো...

প্রমথনাথ বাক্য শেষ করলেন না। উমেশ দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাতে আর না ঢুকে প্রশ্ন করলেন

—আপনি কুমিল্লায় কখনো গিয়েছেন?

—নাহ। সুযোগ হয়নি। তবে সুচিত্রার মাসিমা বহুবার এ বাড়িতে এসেছেন। জলস্পর্শ করতেন না, কিন্তু বোনঝিকে দেখতে আসতেন। সুচিত্রার মুখেও ওদের বাড়ির সবার কথা অনেকবার শুনেছি। বিশেষতঃ বিনয়, তার পিঠোপিঠি ভাই। কুমিল্লায় থাকতে একসাথে শৈশব কেটেছে। বিনয় বলতে সে তো অজ্ঞান ছিল।

—বিনয়কে চাকরি দেন কে? আপনি?

—হ্যাঁ। একদিন হঠাৎই সকালে এসে উপস্থিত হয়। সুচিত্রা পরিচয় করিয়ে দেয়।

—তারপর?

—বরানগরের কারখানার পোস্টটা ফাঁকা ছিল। আমিই তখন বলি বরানগরের কাজটার কথা।

—আর এখানে থাকার কথা? কে প্রস্তাব দেন, আপনি না আপনার স্ত্রী?

—আমিই প্রস্তাব দি। সুচিত্রা বরং নিষেধ করছিল। আমিই জোর করে...প্রমথনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন।

—বিনয়ের কোনো আপত্তি ছিল না?

—না। সে তো হাতে চাঁদই পেল। কলকাতা শহরে বাড়িভাড়া তো কম কিছু নয়! তাছাড়া ও এখানে থাকলে আমার নিজেরও একটু সুবিধা হচ্ছিল।

—কীরকম?

—দেখুন আমার লোকবলের অভাব। ঠাকুর্দা খ্রিশ্চান হয়েছিলেন বলে ত্যাজ্য হয়েছিলেন। জ্ঞাতিগুষ্ঠির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার বাবা অতি অল্প বয়সে মারা যান। ফলে আমার নিজস্ব ভাইবোনও কেউ নেই। মা মারা গেছেন বছর দশেক আগে। এক জ্যেঠিমা বৃদ্ধ বয়সে কেউ দেখার ছিল না বলে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এত বড় বাড়ি, যখন থাকি না, সুচিত্রাকে চাকরবাকরের ভরসায় ফেলে রেখে যেতে হয়। তাই নির্ভরযোগ্য কাউকে খুঁজছিলাম।

—আপনাদের বংশের এই ধর্মান্তকরণের ব্যাপারটা...মানে আপনার ঠাকুর্দা কিভাবে...

—আমার ঠাকুর্দা ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য ছিলেন। পরে বিলেতে আইন পড়তে যান। সেখানে খ্রিশ্চান হন।

—পরে দেশে ফিরে আসেন?

— হ্যাঁ। হাইকোর্টে বিরাট পসার করেছিলেন। সাহেব ব্যারিস্টাররাও মান্যি করে চলত। তবে খ্রিশ্চান হলে হবে কী, কেসের বেলায় স্বদেশীয়দের কেস লড়তেন বিনাপয়সায় আর সাহেবদের কাছে নগদ অর্থমূল্যে। এই বাড়ির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য, ঠাকুর্দার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমার ব্যবসার প্রাথমিক মূলধনও ঠাকুর্দা গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।

—আপনার কী কী ব্যবসা আছে?

—মূলতঃ কেমিকাল আর মেশিনারি। সঙ্গে এই কাচের কারখানা।

—তিন বছর আগে আপনার হাওড়ার কারখানায় একটা গণ্ডগোল হয়। সেটা নিয়ে আপনার কী বক্তব্য?

প্রমথনাথের চোয়াল একটু শক্ত হল। বললেন—দেখুন ব্যবসা করতে নেমে রটনা হয়। ওসব রটনা কানে করে নিয়ে আমি বসে থাকি না।

—কিন্তু যা রটে তার কিছু সত্যি তো বটে।

—আর যা রটে, তা যদি রটানো হয়?

—কে রটাবে?

—যাদের স্বার্থ আছে। যারা চায় আমার মতো কোম্পানিগুলো ধ্বংস হয়ে যাক।

—কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ ছিল সেসব আপনি নাকি সবই মেনে নিয়েছেন?

উত্তর দেওয়ার আগেই টেবিলে রাখা টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোন কোম্পানি বেশ চৌখস হয়ে উঠছে দিনে দিনে, মনে মনে ভাবলেন উমেশ। প্রমথনাথ উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন। ওপার থেকে কিছু কথা হল। কিছুক্ষণ শোনার পর প্রমথনাথের মুখের ভাব বদলাতে শুরু করল। ফ্যাঁকাশে মুখে তিনি বলে উঠলেন—কী বলছেন কী!

ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন প্রমথনাথ। উমেশ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে প্রমথনাথবাবু?

প্রমথনাথ চেয়ারে বসে দরদর করে ঘামছিলেন। জড়ানো কাঁপা গলায় তিনি বলে উঠলেন—সর্বনাশ হয়েছে সার্জেন্ট। ১৪০ পেটি মসলিন আর জ্যাকোনেটের বদলে বন্ড রসিদ পেয়েছিলাম। সেসব ভাঙিয়ে আজ ব্যাঙ্ক থেকে লোন তোলার কথা ছিল। জমি কিনব ঠিক ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে বলেছে যা রসিদ পাঠিয়েছি তা নাকি জাল!

—মানে! রসিদ কে এনে দিয়েছিল?

—বিনয়। ওর উপরই দায়িত্ব ছিল মালগুলো ওয়ারহাউজে নিয়ে যাওয়ার। সেই মতো ও মাল নিয়ে বেরিয়েও যায়। বিকেল বিকেল ফিরে ক্যাশিয়ারের হাতে রসিদ জমা দেয়। ক্যাশিয়ার হরিদেববাবু আমাকে 'তার' করে জানিয়েছিলেন...প্রমথনাথ কোনোমতে কথা শেষ করছিলেন।

—কত টাকার সিকিউরিটি ছিল প্রমথনাথবাবু?

প্রমথনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন—অনেক টাকার সার্জেন্ট। ব্যাঙ্ক থেকে অন্তত দশ হাজার টাকার লোন পেতাম।

—ওয়ারহাউজে খোঁজ করেছে আপনার কারখানার লোক?

—করেছিল। ক্যাশিয়ার বাবু নিজে গিয়েছিলেন। ওয়ারহাউজে নাকি সেই মাল পৌঁছায়ইনি!

—এ কবেকার ঘটনা? কবে ওয়ারহাউজে মাল জমা দেওয়ার কথা ছিল?

—গত পরশু।

—আর আপনার লোক ব্যাঙ্কে রসিদ কবে জমা দেয়?

—গত কাল। ব্যাঙ্কের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার বন্ধু মানুষ। তবু, ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন অনুযায়ী বন্ড রসিদ চেক করতে আজ ওয়ারহাউজে লোক পাঠায়, আর তখনই... প্রমথনাথ আর কিছু বলতে পারলেন না।

—গত কাল ব্যাঙ্কে কাগজ জমা পড়েছে...আর গত পরশু বিনয়ভূষণ খুন হন...উমেশ আপনমনে বলে উঠলেন...আপনি যে বন্ড রসিদ দেখিয়ে লোন তুলবেন কে কে জানতো?

প্রমথনাথ সামান্য চিন্তা করে বললেন–চারজন। অফিসের

ক্যাশিয়ারবাবু আর বাড়িতে আমি, বিনয় আর সুচিত্রা। এদের মধ্যে... কিন্তু সার্জেন্ট...বিনয়! সে তো আমার আপনার লোক...সুচিত্রার ভাই... অতগুলো টাকার মাল...প্রমথনাথ কথা বলতে বলতে ভেঙে পড়লেন।

—ওয়ারহাউজে ঐ দিন মাল যাবে সেকথা কে কে জানতো?

প্রমথনাথ হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে বললেন–
মাল ঐ দিন যে যাবে, হঠাৎই ঠিক হয়েছিল। দুদিন আগে মাল এসে পৌঁছায় হাতে। বিনয় জানতো, ক্যাশিয়ারবাবু জানতেন আর...আর...

—আর? উমেশ প্রশ্ন করলেন।

—সুচিত্রাকে ট্রাঙ্ককলে বলেছিলাম। ঐ দিনই সকালে ফোন করেছিলাম ওকে।

—কোন ব্যাঙ্কে লোনের আবেদন করেছিলেন?

—ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গি শাখা, এই বলে প্রমথনাথ উঠে দাঁড়ালেন—এগোরোটা বাজে। আমাকে একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে, ওরা ডেকে পাঠিয়েছে–হয়ত একবার কারখানাতেও যাবো। কিছু যদি মনে না করেন, আমাকে এবার বেরোতে হবে।

—নিশ্চয়ই, বলে উমেশ উঠে দাঁড়ালেন।
প্রমথনাথ দ্রুত চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উমেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করে থানার দিকে পা বাড়ালেন। তার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরছিল। কিন্তু ঘন কালো মেঘের মধ্যে একফালি চাঁদের মুখ দেখা গেলে যেমন পথিক নির্ভার হয়ে পথ চলতে পারে, ঠিক তেমনই তাঁর মনে হল বহু অন্ধকারের পর এক ফালি আলোর দেখা পেয়েছেন। এখন সে আলো যদি আবার মেঘের আড়ালে লুকায়, তবে তা আলোর ভবিতব্য। উমেশ সুচিত্রার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার দরকার ছিল।

দুপুরে থানায় মোস্তাফির লস্কর আসল। সে গরানহাটার সবথেকে নাম করা কারিগর। কাঠের কাজে হাত পাকিয়েছে পনের বছর হলো। উমেশের মেসে সে বহুবার কাজ করেছে। গিরীশের সঙ্গে উমেশ তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর মোস্তাফিরের দিকে বিনয়ের হাতে

আঁকা নক্সাটি তুলে দিয়ে বললেন—কী বুঝছো ওস্তাদ?

মোস্তাফির নকশাটা চোখের কাছে তুলে ধরে খুঁটিয়ে দেখে বলল—ঠিক বুঝতে পারছি না হুজুর। দেখে চোঙা ধরণের কিছু একিন হচ্ছে।

—চোঙা?

—জি হুজুর। কিন্তু যা মাপ আছে, তাতে মনে হচ্ছে খুব সরু ধরণের চোঙা।

—কত সরু?

মোস্তাফির এদিক ওদিক তাকালো। তারপর থানার হাবিলদারের লাঠির দিকে তাকিয়ে বলল—ওর চেয়ে একটু বেশি সরু। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, এখানে দুটো চোঙার মাপ দেওয়া। একটা সরু, একটা মোটা!

—কত সরু, কত মোটা?

—বহুতই কম ফর্ক হ্যায় হুজুর। এক কে অন্দর দুসরা ঘুস সক্তা হ্যায়।

মোস্তাফির নিজের বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে চলে গেল। উমেশ বহুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চেয়ারে বসে রইলেন। গিরীশ অপেক্ষা করতে করতে উসখুশ করে বলে উঠল–কেসটা খুব বিচিত্র দিকে এগোচ্ছে উমেশদা। প্রথমে খুন, এখন জালিয়াতি! আর বিনয় কিনা...নিজের লোক হয়ে... ছি...ছি! আচ্ছা ওঁর কি কোনো পুরোনো সাগরেদ থাকতে পারে? আগেও যদি একরম জালিয়াতি করে থাকে! কুমিল্লায় একবার খোঁজ নেব নাকি?

গিরীশ উমেশের দিকে তাকাল। উমেশ কিছু বলছিলেন না। একভাবে ভেবেই চলেছিলেন।

—আরে কিছু বলবেন তো নাকি! এত বড় জালিয়াতি হয়ে গেল, খুনটা কে করল, কিভাবে করল!

--জালিয়াত তো ধরা পড়েছে, খুনীও পড়বে উমেশ মন্থর ভাবে বলে

উঠলেন।

—আপনি কিছু ধরতে পেরেছেন?

উমেশ ক্লান্ত গলায় উত্তর দিলেন—কিছুটা। বাকিটা ভবিষ্যতের গর্ভে।

—মানে! গিরীশ অবাক হয়ে তাকালো।

—মানেটা সহজেই বোঝা যাবে দুটো খবর আনলে। উমেশ একই ভাবে উত্তর দিলেন।

—কী খবর?

—প্রমথনাথবাবুর সুচিত্রা গ্লাসেসের পাশে যে বিলিতি কোম্পানি আছে তার নামটা যেন কী বলেছিলে?

—সিমেক্স গ্লাসেস।

—ঠিক। কোম্পানি কেমন ব্যবসা করছে বাজারে একটু খোঁজ নাও। আরেকটা বিষয়...

—কী?

—ওই সিমেক্স কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থাৎ যারা বরানগরের কারখানায় আসত–যেত তাদের নামটা জেনে আসবে। তাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব খোঁজ নিয়ে আসবে। সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে উর্ধতন—প্রত্যেকের খবর আনবে।

—যে আজ্ঞে হুজুর। গিরীশ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে বৃষ্টি নামল। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। শিবপ্রসাদ লাহা রাউন্ড দিতে থানা থেকে বেরোচ্ছিলেন। বৃষ্টি দেখে হাতে ছাতা নিলেন। ছাতাটা একটু পুরোনো হয়েছে। রডগুলোয় তেল পড়ে না। দু-তিনবার ছাতা নাড়িয়ে ছাতা খুলতে না পেরে, বিরক্ত হয়ে মাঝের রডটা ধরে টান দিলেন শিবপ্রসাদ। নীচের রডটা হাত দিয়ে টেনে সামনের দিকে এগিয়ে

আনলেন, উপরের রডটা ঠেলা খেয়ে এগিয়ে গেল। ছাতা খুলে গেল।

উমেশ এতক্ষণ অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাইরের বৃষ্টি দেখছিলেন। বড়বাবুর ছাতা খোলার দৃশ্যে তাঁর দেহে যেন বিদ্যুৎস্পর্শ লাগলো। তিনি সোজা হয়ে চেয়ারে উঠে বসলেন।

৮

গিরীশ গত রাতে এসে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দিয়ে গেছে। তাতে নতুন করে কিছু পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর সময় আনুমানিক একটা থেকে তিনটে। জুগুলার ভেন কেটে খুন হয়েছে।

উমেশ থানায় বসে তিনদিন আগের জেনারেল ডায়েরি ঘাঁটছিলেন। তাঁর টেবিলের উপর প্রমথনাথের বাড়ির টুল-বক্স পড়েছিল। র্যাদা, হাতুড়ি, ছেনি, রেঞ্জ সবই রয়েছে বাক্সটায়। হাবিলদারকে ডেকে বাক্স সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে, উমেশ কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন। চুরি, ডাকাতি, কেপমারি...অধিকাংশেরই সমাধান হয়ে ওঠেনি। তাড়া তাড়া পাতা...তাড়া তাড়া কেস! হঠাৎই একটা পাতায় চোখ আটকালো উমেশের। রিক্সা চুরির একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মনে পড়ল, রিপোর্ট লেখার জন্য এক রিক্সাওয়ালা অ্যাংলো সার্জেন্টের কাছে দাঁড়িয়েছিল। রিপোর্টটা খুটিয়ে পড়লেন উমেশ। কোন জায়গা থেকে রিক্সা হারিয়েছিল সেটা দেখে একটু চিন্তিত হলেন। রিক্সার চালকের নাম –রামদীন পাসোয়ান, পিতার নাম- গঙ্গাদীন পাসোয়ান, বাড়ি–মুঙ্গের, বিহার, কলকাতার ঠিকানা– এন্টালি বস্তি।

হাবিলদারকে ডেকে লোকটিকে খুঁজে আনতে বললেন তিনি। তার রিক্সা যখন হারিয়েছে, তখন তাকে নিশ্চয়ই ঘরে পাওয়া যাবে–এমন একটা ক্ষীণ আশা উমেশের মনে ছিল। ঘড়ির দিকে তাকালেন উমেশ। এগারোটা বেজে গেছে। ফোনে একটা নাম্বারে কিছুক্ষণ কথা বললেন।
ফোন রাখতে না রাখতেই গিরীশ এসে থানায় হাজিরা দিল। তার পরনে ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম, হাতে বিলিতি মোরব্বার বাক্স; এক গাল হেসে সে উমেশের দিকে তাকিয়ে বলল—কাকে ফোন করছেন?

—ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মেয়েদের ইস্কুলে। উমেশ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—কী সর্বনাশ! বৌদিকে ভর্তি করবেন নাকি?

—কী যে বলো! তাঁকে তো আজ অবধি কলকাতাতেই নিয়ে আসতে পারলাম না! নামেরই সংসার...

গিরীশ উমেশের দিকে মোরব্বার বাক্স বাড়িয়ে বলল— নিন, খান। এক যাত্রায় পৃথক ফল করতে নেই। বলা যায় না, বিলিতি সাহেবের মিষ্টি খেয়ে আপনার জীবনের মিষ্টত্ব হঠাৎ বেড়ে গেল!

—কী ব্যাপার? প্রোমোশন-টমোশন হল নাকি? উমেশ মিষ্টি হাতে তুলে নিয়ে বললেন।

গিরীশ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে মুখ বেজার করল, বলল—আর প্রমোশন! এই অ্যাংলো সার্জেন্টদের সাব-ইনস্পেক্টর করবে, আমাদের কখনো করবে না। মিলিয়ে নেবেন।

—তাহলে এত মিষ্টি মণ্ডা!

–আরে আপনি পাঠিয়েছিলেন বলেই তো পেলাম। সেই সিমেক্স কারখানার ম্যানেজার ছেলেটি; ভারি আলাপী আর সদাশয় উমেশদা। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অথচ আমাদের অ্যাংলো সার্জেন্টদের মতো কোনো বারফাট্টাই নেই। বরানগরের কারখানার সব হদিশ দিলো। নাম টামের লিস্ট দিলো, সঙ্গে মিষ্টিও দিলো।

—বটে? কী বলল সে?

—ব্যবসা সম্পর্কে সব খবরাখবরই দিলো।
সিমেক্স যে ভারতের সব শহরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে, এ ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলল।

—বিনয়কে চিনত?

—বিলক্ষণ। বলল, কথাবার্তা ছিল না, কিন্তু মুখ চেনা ছিল। করিৎকর্মা ছেলে বলেই মনে হয়েছিল। সে যে এমন জালিয়াতি করবে মোটে বোঝা যায়নি।
—হুম। উমেশ গালে হাত দিয়ে শুনছিলেন।
গিরীশ চেয়ারটাকে পাশে টেনে নিয়ে এসে বলল—এবার একটু খোলসা করে বলুন না। জালিয়াতির ব্যাপারটা কী বুঝেছেন। কিসব

গতকাল বললেন...

উমেশ খবরের কাগজ পড়ছিলেন।
পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন– জালিয়াতিটাই এই কেসের প্রধান অপরাধ গিরীশ। খুনটা কাকতালীয়ভাবে হয়েছে।

—মানে খুনটা না হলেও হতো!

—নাহ! তা বলছি না। বলছি জালিয়াতিটাই এই কেসে খুনটাকে ডেকে এনেছে।

—একটু বিশদে বলুন তো উমেশদা। গিরীশ বলে উঠল।

—জালিয়াতিটা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শক্তপোক্ত পরিকল্পনার ফল গিরীশ।

–কীরকম?

—বিনয়ভূষণ যেদিন শেষ দিন কারখানায় যায়, ১৪০ পেটি মসলিন আর জ্যাকোনেট সে ওয়ারহাউজে জমা দেয়নি। ভুয়ো রসিদ তৈরি করে সে ক্যাশিয়ারের কাছে জমা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, ১৪০ পেটি মাল গেল কোথায়?

—বেচে দিয়েছে হয়ত।

—বেচে দিয়ে টাকা রাখল কোথায়? আর অত টাকা কিভাবে বাড়িতে নিয়ে এল? বাড়িতে আসার ঝুঁকিই বা নিল কেন?
গিরীশ মাথা চুলকিয়ে বলল– বুঝতে পারছি না।

—এর একটাই সহজ উত্তর হয় গিরীশ। অত মাল এক দিনে নির্বিঘ্নে অন্য কোনো জায়গায় চালান করা।

—অন্য কোনো ওয়ারহাউজে?

—ঠিক। উমেশের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

—তার মানে অন্য কোনো ওয়ারহাউজে মাল রেখে ও তো রসিদও পেয়েছিল। সেটা ভুয়ো নয়। আসল! সেই রসিদের লোভেই কী ওকে কেউ...!! কিন্তু উমেশদা, বিনয় এত বড় ঝুঁকি নিল কিভাবে? যদি ধরেও নি, সে লোভের বশে এ কাজ করেছে, কিন্তু এই মাপের জালিয়াতি করতে যে খুঁটির জোর লাগে, তা সে পাবে কই? মানে ওয়ারহাউজগুলো তো এভাবে অচেনা লোকের কাছ থেকে মাল নেবে না। শক্তপোক্ত খুঁটি ছাড়া...

—প্রশ্নটা খুঁটির জোরের নয়, প্রশ্নটা সুযোগের।

—মানে?

—মানে বিনয়ভূষণ দত্ত সুচিত্রা গ্লাসেসে কিভাবে ঢুকল ও কেন ঢুকল? উমেশ ফিকে হেসে বললেন।

গিরীশ একটু অবাক হয়ে বলল—সে তো আমরা সবাই জানি উমেশদা। সুচিত্রা দেবীর ভাইকে প্রমথনাথবাবু সুযোগ দিয়েছিলেন। সুচিত্রা দেবী অনুরোধ করেছিলেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু কেন করেছিলেন? আর কিভাবেই বা খুনী ও বাড়িতে ঢোকার চাবিকাঠি এত সহজে পেলো?

গিরীশ বিরক্ত হয়ে বলল—ধুস, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কী বলছেন, পরিষ্কার করে বলুন।

—তার আগে তুমি বলো তো, খুনী হিসেবে তোমার কার উপর সন্দেহ হয়?

গিরীশের চোখ চকচক করে উঠল। খাটো গলায় সে বলল—আমার প্রথম থেকেই একজনের উপর সন্দেহ হচ্ছে উমেশদা।

—কার উপর?

—প্রমথনাথের উপর।

—মোটিভ কী ভেবেছ?

গিরীশের উত্তর দেওয়ার আগেই টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। গিরীশ উঠে গিয়ে ফোন ধরে বলল—হ্যালো নিউ মার্কেট পুলিশ স্টেশন...কে বলছেন? ও পি.জি হাসপাতাল থেকে? কেন...কী ব্যাপার? কী বলছেন! কখন হল এসব! আচ্ছা আমরা যাচ্ছি।

ফোন রেখে গিরীশ হতভম্ব মুখে উমেশের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। উমেশ জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল?

—সুচিত্রা দেবী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন! পি.জি হাসপাতাল থেকে ডাক্তার সোম ফোন করে জানালেন। বিনয়ভূষণের হত্যার ব্যাপারটা খবরের কাগজে পড়েছিলেন, ভেবেছেন যদি পুলিশ কেস হয়।

উমেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এরকমই একটা আশঙ্কা করেছিলাম। প্রমথনাথবাবু কোথায়?

—সম্ভবত হাসপাতালেই।

—চলো তবে যাওয়া যাক।

পি.জি হাসপাতালের বিরাট চৌহদ্দি রুগীর ভিড়ে গিজগিজ করছিল। ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট শুনে, নানা কাগজপত্তরে সই সেরে উমেশ যখন ফিরলেন, তখন ফিমেল ওয়ার্ডে ভর্তি সুচিত্রার জন্য ইঞ্জেকশন আনতে গিয়েছিলেন প্রমথনাথ। হৃদযন্ত্রের গতি খুব বেশি, পেশীও শিথিল হয়ে পড়েছে, জ্ঞান নেই। পোকা মারার ওষুধ অনেকখানি খাওয়ার ফলে সারা শরীরে খিঁচুনি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তার ৪৮ ঘন্টার আগে কোনো আশ্বাস দিতে পারছেন না।

—শেষে গ্লানির দায়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন! কী দুঃখজনক! গিরীশ ফিমেল ওয়ার্ডের সামনে বাঁধানো শিরীষ গাছের তলায় বসে বলল।

উমেশের চোখমুখ থমথম করছিল। সেদিকে তাকিয়ে গিরীশ বলল—আপনি কী ভাবছেন জানি না উমেশদা। কিন্তু আমার ঘোর সন্দেহ এই জালিয়াতিতে প্রমথনাথও জড়িত। ঐ ১৪০ পেটি মাল ও নিজেই কোথাও সরিয়ে বেচে দিয়েছে। যারা ওর জন্য টাকা দিয়েছে,

তাদেরকে বলবে জালিয়াতি হয়েছে, খুন হয়েছে। টাকা কবে ফেরত দিতে পারব জানি না। আর ওর অতীতের রেকর্ড তো ওরকমই। বিনয় সব ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখাতে মেরে দিয়েছে। মাঝখান থেকে নিজের বৌটা...

উমেশ গিরীশের দিকে না তাকিয়ে দূরে বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আদৌ তিনি গিরীশের কথা শুনছিলেন কিনা, বোঝা যাচ্ছিল না। বেঞ্চে বসে বিশ্বনাথ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। গিরীশ লক্ষ করল, বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উমেশের মুখভঙ্গী ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল।

—কী ব্যাপার উমেশদা? কী হয়েছে?

উমেশ কোনো উত্তর করলেন না। গটগটিয়ে হেঁটে বেঞ্চে উপবিষ্ট বিশ্বনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—তোমাদের কি সবার একসঙ্গে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে ?

বিশ্বনাথ ফ্যালফ্যাল করে উমেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–কিছু বুঝতে পারছো না, না না বোঝার ভান করছো? উমেশ ধমকিয়ে উঠলেন।

বিশ্বনাথ একইরকম শূন্য দৃষ্টিতে উমেশের দিকে তাকিয়ে বলল–কী জানতে চান বলুন?

—আপাতত এটাই, সেদিন রাত আটটার সময় তুমি ওষুধের দোকানে গিয়েছিলে কেন?

—বলেছিলাম তো, আমার গ্যাসের ব্যথা হয়েছিল।

—বাজে কথা বলছো। তোমার পাড়ার মোড়ে ওষুধের দুটো দোকান। একটি অ্যালোপ্যাথি, অন্যটি হোমিওপ্যাথি। অ্যালোপ্যাথির দোকানে তুমি যাওনি। হোমিওপ্যাথির দোকানের কর্মচারি তোমাকে চেনে। ওখান থেকে নিয়মিত তুমি গ্যাসের ব্যথার ওষুধ কেনো। কিন্তু সেদিন তা কেনোনি।

বিশ্বনাথ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

উমেশ বন্দুকের গুলির মতো ক্ষিপ্রতায় প্রশ্ন করলেন—আর্নিকা কবে থেকে গ্যাসের ওষুধ হলো বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথের মুখে জেদের ছাপ পড়ল। চোয়াল কঠিন করে সে বলল—আপনি যা জেনেছেন, যদি তাই দিয়ে অপরাধী ধরতে পারেন, ধরুন। কিন্তু আমি কোনোভাবেই মুখ খুলব না। বৌদিমণি না ফেরা অবধি...

শেষের কথাগুলোয় তার গলা বসে গেল।

গিরীশ স্তম্ভিত হয়ে এই বাক্যালাপ শুনছিল।

অস্ফুটে বলে উঠল–কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝছি না।

উমেশ খানিকক্ষণ মুখ শক্ত করে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে তুমি বলবে না? এত বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও?

–আমি বললে এর থেকেও বড় ক্ষতি হবে।

–বেশ। উমেশ আর কোনো কথা না বলে গটগট করে হাঁটা লাগালেন। গিরীশ পিছন পিছন দৌড় দিল।

–কী ব্যাপার কিছু তো বলুন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না উমেশদা।

উমেশ দ্রুত হাঁটার ফলে ঘামছিলেন। থমকে পিছন ফিরে গিরীশের দিকে তাকিয়ে বললেন—কালই সব জানতে পারবে। আপাতত এটুকু জেনে রাখো, আমার সন্দেহ যে খুন হয়েছে সে আদৌ বিনয়ভূষণ দত্ত নয়।

–মানে! গিরীশ আক্ষরিক অর্থেই হা করে তাকালো।

—আরও একটা ব্যাপার; সম্ভবতঃ কালই প্রমথনাথকে গ্রেফতার করা হবে। এবং বিলিতিদের একাধিক পোষা খবরের কাগজে প্রমথনাথের নামে রসিয়ে আরেকটা স্ক্যান্ডাল বেরোবে। সেটার জন্যও প্রস্তুত থাকো।

গিরীশকে পিছনে ফেলে উমেশ চিৎপুর- গামী বাসে উঠে পড়লেন। তাঁর একান্তে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

৯

নিউ মার্কেট থানায় মোহন বিশ্বাস যখন এসে পৌঁছালো, তখন বেলা দেড়টা বাজে। পুলিশকে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর দিতে সে কোনোবার ব্যর্থ হয় না। সে একা আসেনি, সঙ্গে একজনকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটির সিড়িঙ্গে চেহারা, ভাঙ্গা দু-গাল , ডানদিকে সিঁথি এবং চোখেমুখে ধূর্ত দৃষ্টি দেখলে তার পেশা সম্পর্কে যে কোনো পুলিশ অফিসার আন্দাজ করতে পারবে।

—এর নাম বিকাশ স্যার। বিকাশ কর্মকার। মোহন বিশ্বাস উমেশের সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দিল।

—কোন তল্লাটে পোস্টিং? উমেশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন।

—খিদিরপুর স্যার।

–কতদিন ধরে লাইনে আছে?

—দু বছর স্যার।

উমেশ ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ মোড়ে মোড়ে গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছে। উত্তরের শোভাবাজার, চিৎপুর, নারকেলবাগান, পশ্চিমের খিদিরপুর থেকে শুরু করে পোর্ট-এলাকা এবং দক্ষিণে ভবানীপুর, এই সব তল্লাট থেকে গত দু মাসে যতগুলি বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা যে এই গুপ্তচর বাহিনীর বদান্যতায় তা পুলিশ মাত্র জানেন। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির পর স্বদেশিরা যেমন একেবারে খেপে উঠেছে, ঠিক ততটাই সতর্ক হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সরকার। প্রতিটি সন্দেহভাজন জায়গায় রেড, সাধারণ মানুষের হেনস্থা, তাদের সম্পত্তি ভাঙচুর এসব রোজকারের ঘটনা। উমেশ নিজেও দু-তিন বার গেছেন। এই গুপ্তচর বাহিনীর অধিকাংশই প্রাক্তন অপরাধী, চুরি-ছিনতাই–রাহাজানিতে সিদ্ধহস্ত শহরের অন্ধকার জগতের মানুষ। সরকার তাদের অপরাধ ভাঙিয়ে স্বদেশী ধরার পথ মসৃণ করেছে।

—যার কথা মোহনকে বলেছিলাম, তাকে চিনতে? উমেশ গম্ভীর স্বরে বিকাশকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—চিনতেন বলচেন কেন? পাখি কি উড়ে গেচে? বিকাশ ঠোঁট সরু করে একটা সিটি বাজিয়ে বলল।

—যা বলছি তার উত্তর দাও।

—আরে বলচি স্যার। এত রেগে যাচ্চেন কেন? বিকাশ খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে বলল, চিনতাম বৈকি। থ্যাবড়া নাক, জোড়া ভুরু, আর ডান হাতের আঙুল ছোট–এমন একজনই আচে লাইনে। মলয় চাকি। আবার পোফুল্ল চাকির ভাই ভেবে বসবেন না যেন! বিকাশ নিজের অশ্লীল রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল।

—মলয় চাকি...মলয় চাকি...শোভাবাজারের কোনো কেসে কি...

—অ্যাই অ্যাকদম ঠিক ধরেচেন স্যার!

শোভাবাজারে গণেশ মিত্তির লেনের ঘটনা, গত বছরের।

উমেশের চট করে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

গত বছর আগস্ট মাসের ঘটনা। ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়িতে বোমা মারে দীনেশ মজুমদার আর অনুজা সেন। টেগার্টের গাড়ির ড্রাইভার আহত হলেও টেগার্ট অক্ষত থাকেন। হাতে বোমা ফেটে মারা যায় অনুজা সেন। দীনেশ মজুমদারের খোঁজে শহর জুড়ে চিরুনি তল্লাশি হয়। শেষে শোভাবাজারের গণেশ মিত্র লেনের কোনও এক বাড়ি থেকে পরের দিন দীনেশ মজুমদারকে ধরা হয়। খোঁজ এনে দিয়েছিল মলয় চাকি। কলকাতা পুলিশের টিকটিকি। নামটা চর্চিত হয়েছিল তখন। টেগার্ট পাঁচশ টাকার অ্যাওয়ার্ড দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। লালবাজারে মলয় চাকিকে বোধহয় একদিনের জন্য দূর থেকে দেখেছিলেন উমেশ; তাই কী প্রথম থেকে মুখটা চেনা চেনা লাগছিল!

—মলয় চাকি আগে কী করত, তুমি জানো বিকাশ?

বিকাশ ফিঁচেল হেসে বলল–নিশ্চয়ই স্যার। মলয় চাকি বারুইপুরের লোক। আগে কামার বাড়িতে কাজ করতো। হেড মিস্ত্রি ছিল। লোহালক্করের কাজে মাথা খোলতাই ছিল। ফোল্ডিং চাকু, স্প্রিং দেওয়া ছুরি বানাতে পারতো। সবাই ওর কাছে মাল কিনতো। চোর, ডাকাত, স্বদেশী সক্কলে। ওই করতে গিয়েই তো ধরা পড়ল।

—বেশ। এখন তুমি আসো। এই টাকাটা রাখো।

হাতে কুড়ি টাকা নিয়ে উমেশকে সেলাম করে চলে গেল মোহন বিশ্বাস আর বিকাশ কর্মকার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থানার ফোনটা বেজে উঠল। উমেশকে অপর প্রান্ত থেকে ডেকে দিতে বলল গিরীশ। উমেশ উঠে গিয়ে ফোনটা কানে লাগালেন।

—আজকের স্টেটসম্যানটা দেখেছেন? চাপা স্বরে কথা বলছিল গিরীশ।

—কী সংবাদ?

—আপনি যা বলেছিলেন। ব্রাদার-ইন-ল ব্রুটালি মার্ডারড অ্যাট হোম, স্বদেশী বিজনেসম্যান ডিপোজিটস ফোর্জড বন্ড রিসিট টু নেগোশিয়েট লোন। ব্যাঙ্কে জাল কাগজপত্র দাখিল করে লোন চাওয়ার জন্য প্রমথনাথকে গ্রেফতার করতে ফোর্স যাচ্ছে উমেশদা। সেরকমই কথাবার্তা শুনছি এখানে।

—হুম।

—আমাদের কি কিছুই করার নেই উমেশদা? আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে—যদি বিনয়, বিনয় না হয়, তবে সুচিত্রার এই ষড়যন্ত্রে থাকার কথা। কিন্তু এভাবে...মানে কেন...কিছুই বুঝতে পারছি না! প্রথমে আমি প্রমথনাথকে খুনী ভেবেছিলাম...কিন্তু তিনি তো...আসল খুনীকেও তো ধরতে পারলাম না আমরা।
গিরীশের গলায় খেদ ঝরে পড়ল।

—খুনী কে তা আমি জানি গিরীশ। এই হত্যা রহস্যের কোনো কিছুই আর আমার কাছে অপরিষ্কার নয়।

—কিন্তু আপনি তো খোলসা করে কিছু বলছেন না।

—খোলসা হতে গেলে আন্দাজ আর বাস্তবের মধ্যে পার্থক্যটা ঝালিয়ে নিতে হয় গিরীশ। দেখা যায় অনেক সময়ই আন্দাজ মেলে না।

—কিন্তু কিভাবে খুনী ঢুকল আর বেরোলো, সেটাও কি বুঝেছেন?

গিরীশ অধৈর্য হয়ে বলল।

—হ্যাঁ। তবে সেটা আমার অনুমান। হাতে কলমে না দেখলে কোনোভাবেই নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।
—তাহলে এ রহস্যের যবনিকা কখন কিভাবে উঠাচ্ছেন?

—উঠাবো। তবে তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন।

—সিমেক্স কোম্পানি নিজস্ব সিকিউরিটি কোন ওয়ারহাউজে জমা দিয়ে রসিদ নেয়, তার একটা খোঁজ নিতে হবে।

—আজই খবর নিচ্ছি, গিরীশ সোৎসাহে বলল।

—শুধু খবর নয়, একেবারে সশরীরে হাজির হয়ে যেও। প্রমথনাথের বাসায়, আজ বিকেলে। ততক্ষণে বড়বাবুকে আমি সবটা জানিয়ে রাখি। ওদিকে ডিসি বোধহয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
উমেশ শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললেন।

—আপনি কি এখনই ও বাড়ির দিকে চললেন?

—না। আমার ছোট একটা কাজ আছে।

—কী কাজ?

—রিক্সাচালক রামদীন পাসোয়ান আসছে। তার রিক্সাটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

সন্ধে নামছিল। ১০২/৩ চৌরঙ্গি রোডের ঘরগুলিতে আজ কেউ আলো জ্বালায়নি। রাস্তার গ্যাসের বাতিরে পাশে এই সুরম্য বাড়িটির নৈঃশব্দ আর নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার দেখে সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে বাড়িটির উপর বিপর্যয় নেমে এসেছে।

উমেশনাথ আর গিরীশ সদর দরজার কাছে পৌঁছাতেই হাবিলদার দুজন পথ ছেড়ে দিল। আজ দোতলায় যাওয়ার পথ উন্মুক্ত। উমেশ

সঙ্গে করে একটি ছাতা এনেছিলেন। গিরীশ তা দেখে প্রশ্ন করলেন—ছাতা কী হবে? আজ তো আকাশ পরিষ্কার! উমেশ মৃদু হেসে বললেন—বৃষ্টি আসতেও তো পারে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে, প্রায়ান্ধকার বৈঠকখানা এবং করিডর দিয়ে কিছু দূর এগোলেন দুজন। চকমেলানো বারান্দায় প্রাণহীন শবের মতো বিশ্বনাথ বসে ছিল। উমেশ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে তাকালো।
তার চোখে আর সেই শূন্য দৃষ্টি ছিল না। বরং ঠোঁটে মর্মান্তিক একটি হাসি ঝুলছিল।
উমেশ আজ আর তাকে কিছু বললেন না।

পুলিশ আগে বিনয়ের ঘর সিল করে গিয়েছিল। সিল খুলে সে ঘরে ঢুকলেন উমেশ আর গিরীশ। গিরীশ হাত বাড়িয়ে ঘরের বাতি জ্বালাতে গেলেন। উমেশ বাধা দিয়ে বললেন–বড়ো বাল্ব নয়, ছোটটি জ্বালাও। সেদিন এই ঘরে যে পরিবেশটি ছিল, সেটাই থাকুক বরং।

গিরীশ ছোট বাতিটি জ্বালালেন।

হলুদাভ আলো ঘরটিকে উজ্জ্বল করলো না। বরং, ঘরটিকে আরও ছোট, সংকুচিত আর শীতল মনে হতে লাগল।

গিরীশ সামান্য অস্বস্তি নিয়ে বলল–বলুন, উমেশদা। আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু পুরোটা জানতে চাই।

উমেশ ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে বসেছিলেন। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন–হ্যাঁ। বলতে তো হবেই। নাহলে আসল অপরাধী ধরা পড়বে না।

গিরীশ আগ্রহভরে বলল–বলুন।

১০

উমেশ নড়েচড়ে বসে বললেন—বলব। কিন্তু একটা ছোট্ট ভূমিকা আছে। সেটা দিয়েই শুরু করছি। প্রতিটি কাহিনীর একটি পশ্চাদপট থাকে। এই কাহিনীর পশ্চাদপট
প্রমথনাথের ব্যবসা এবং তাঁর সাফল্য। তাঁর ব্যবসাটি এদেশের

অধিকাংশ ব্যবসার মতো নয়। বিলিতি ইনভেস্টর নেই, দেশী বানিয়ারা তাঁর সঙ্গে পার্টনারশিপে যায় না। তিনি নিজের দক্ষতায়, পরিশ্রমে, পারিবারিক মূলধন এবং ব্যাবসায়িক সুনামের সুবাদে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে একটি জায়গা করে নেন। এই অবধি ঠিকই ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বদেশী পথে চলা একটি কোম্পানিকে এদেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। ফ্রি মার্কেট, ফ্রি ট্রেডিং তার অন্যতম। তাছাড়া ব্রিটিশ দের শেয়ার আছে এমন সংস্থাকে যত সহজে ব্যাঙ্ক লোন দেয়, দেশীয়দের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি চায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, প্রমথনাথ একের পর এক বিজয়পতাকা গেঁথে চলেছিলেন।

তাতে সমস্যায় পড়লেন তাঁর প্রতিযোগীরা। টাকা পয়সা খরচ করেও তাঁরা প্রমথনাথের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। বাংলা খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলালে দেখবে, হাওড়ার যে ফ্যাক্টরিতে গণ্ডগোল হয়েছিল, সেখানে তৈরি পাম্প বিলিতি কোম্পানিকে গুণগত মানে আর দামে হার মানিয়ে রপ্তানির অর্ডার ছিনিয়ে নিচ্ছিল। ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত এখানেই। যেসব ইনভেস্টররা টাকা লাগিয়েছিলেন, তারা লস করতে রাজি হলেন না। বলে না হোক, ছলে-কৌশলে প্রমথনাথকে হারাতে হবে। জাপানে যাবে এমন দুটো শিপমেন্ট জোর করে আটকে, সময়মতো মাল রপ্তানি করতে না দিয়ে প্রথমে প্রমথনাথের ব্যবসায়িক প্রতিচ্ছবিটি খারাপ করার চেষ্টা হয়। খবরের কাগজে তাঁর নামে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করা হয়। কিন্তু প্রমথনাথকে দমানো গেল না।

তিনি বরানগরে সিমেক্সের কারখানার ঠিক পাশে খুলে ফেললেন সুচিত্রা গ্লাসেস। বাংলা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস থাকলে দেখতে, গত এক বছরেই সিমেক্সের অর্ধেক ব্যবসা খেয়ে নিয়েছে সুচিত্রা গ্লাসেস। গ্ল্যাক্সোর মতো কোম্পানি সিমেক্স ছেড়ে সুচিত্রাকে বরাত দিয়েছে দেখলে যে কোনো ইংরেজের চোখ চরকগাছে উঠে যাবে।

ঠিক এই বিন্দুতে এই নাটকটির মঞ্চে অবতীর্ণ হয় মলয় চাকি। সে নিজে নামে না, তাকে নামানোর জন্য মঞ্চ সাজানো হয়। মলয় চাকিকে যেন তেন প্রকারেণ সুচিত্রাতে বিশ্বস্ত কোনো পদে ঢোকাতে হবে। কিন্তু কিভাবে! সুচিত্রার কর্ণধার বাড়ির মালকিন স্বয়ং, তিনি নিজে দেখাশুনা করেন, তাঁকে সাহায্য করেন বয়স্ক ক্যাশিয়ার। কেউ-ই বিক্রয়যোগ্য নন।

খোঁজ শুরু হয় নতুন কোনো পদ্ধতির। সুচিত্রার চরিত্রের দুর্বলতা কী! না সেই চিরপুরানো একাকীত্ব! প্রমথনাথ ব্যস্ততার চাপে, স্ত্রীর প্রতি

যথেষ্ট মনোযোগী নন। যদিও, হৃদয়ের খনন করলে, তার বহুগামিতার কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা, কিন্তু সুচিত্রার ক্ষেত্রে সম্ভবত এটিই তাঁর অ্যাকিলিস হিল হয়ে উঠল। তিনি একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন। চিঠির আদানপ্রদানের বহর শুনলে আন্দাজ করা যায়, বসন্তের আঁচ সুচিত্রার সর্বত্রই লেগেছিল। কিন্তু সমস্ত মুগ্ধতাই তো উত্তুঙ্গে পৌঁছে ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। অথচ সুচিত্রার ক্ষেত্রে প্রশমন এলো না। যা এলো, তা হল আছড়ে পড়া। তরঙ্গশীর্ষ থেকে রুক্ষ জমিতে। তাঁকে ব্যবহার করে সুচিত্রা গ্লাসেসের ক্ষতির চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা যখন তিনি বুঝলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

—মানে আপনি বলতে চাইছেন...

উমেশ গিরীশকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—সুচিত্রার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। সুচিত্রার একজন মাসি ছিলেন, যিনি সুদূর কুমিল্লায় থাকতেন, যিনি মারা গেছেন এবং তিনি বাদে তাঁর পরিবারের অন্য কারুর সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচিতি নেই; মুখটুকু পর্যন্ত চেনেন না। সুচিত্রা আবেগের ঝোঁকে নিজের অতীত এবং বর্তমানের সবটুকুই তাঁর প্রেমিককে বলে ফেলেছিলেন।

—সুচিত্রার প্রেমিক কে!

—সিমেক্স কোম্পানির অ্যাংলো ম্যানেজারের নাম কী? ফ্রেডেরিক?

—হ্যাঁ! আপনি কী করে জানলেন! আমি তো বলিনি!

—সুচিত্রা একটি আদ্দির কাপড়ে তার নাম এম্ব্রয়ডারি করেছিলেন। মোহভঙ্গের পর সে সেলাই খুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু ফোড়ের বিন্দু গুলো এবং পেনসিলে লেখা অস্পষ্ট নাম সেই কাপড়ে রয়ে গিয়েছিল।

—হে ভগবান! মানে ফ্রেডেরিককে দিয়ে সুচিত্রাকে ব্ল্যাকমেল করে মলয় চাকিকে এই বাড়িতে ঢোকানো হয়?

উমেশ ঘাড় নেড়ে বললেন—এমন সুবর্ণ সুযোগ কে ছাড়বে? কুমিল্লা থেকে তাঁর মাসির গোড়া হিন্দু পরিবারের কেউ ম্লেচ্ছ সুচিত্রাকে দেখতে আসবেন, এমনটা অসম্ভব! সুতরাং মলয়ের পরিচয় ফাঁস হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর কাজ মিটলে পরে যদি হয়ও, সে দায় তো

সুচিত্রার। সিমেক্স কোম্পানির ষড়যন্ত্রকারীরা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। মলয় এ বাড়িতে ঢুকলে অতিরিক্ত সুবিধা হল, সুচিত্রাকে বেশ চোখে চোখে রাখা যাবে। বরানগরের কারখানার অভ্যন্তরীণ খবরাখবরের সঙ্গে এটা একটা উপরি লাভ। শুধু অপেক্ষা একটি সুবর্ণ সুযোগের; প্রমথর ক্ষতিটি যাতে চিরস্থায়ী হয়। সুচিত্রা নিশ্চয়ই কাকুতি মিনতি করেছিলেন, টাকাপয়সা ব্যয় করে অন্যভাবে মিটমাট করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে গোপন সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এলে, গোঁড়া ক্যাথলিক সমাজে তাঁর নামে ছি-ছি কার পড়ে যাবে, প্রমথনাথের কাছে কীভাবে মুখ দেখাবেন ইত্যাদি গ্লানিতে তিনি আত্মসমপর্ণ করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে মলয়ের সামনে এক বিরাট সুযোগ এল। সে প্রচুর টাকার মালের রসিদ পেল, যা দিয়ে ও যে কোনো ব্যাঙ্ক থেকে লোন তুলে নিতে পারবে।

—কিন্তু...তার মানে, প্রমথনাথের বন্ড সিকিউরিটি হস্তগত করা, সেগুলো ভাঙিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, এসবই সুচিত্রা জানতেন?

—জানতেন, এবং নিজের মতো করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই বাধা দেওয়ার চেষ্টাটি আমার চোখে ধরা পড়ে যাওয়াতে, বিনয়ভূষণ দত্ত ওরফে মলয় চাকির প্রতি আমার সন্দেহ জন্মায়। তা নাহলে এই কেসটা অতি সাধারণ বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা হিসেবেই থেকে যেত। উমেশ সামান্য হেসে বললেন।

গিরীশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উমেশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—দেখো, দুটো কারণে আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমত মলয়ের মুখটা দেখে আমার চেনা মনে হয়েছিল, দ্বিতীয়ত সে কুমিল্লার লোক হয়ে ঝাল খায় না দেখে অবাক হয়েছিলাম। তদন্ত যত এগোলো, তত তার চরিত্রে নানা বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য প্রকট হচ্ছিল। মোহনকে খোঁজখবর নিতে বলব, এমন একটা চিন্তা প্রথম দিনই মাথায় এসেছিল। কিন্তু সন্দেহ গাঢ় হয় সুচিত্রার কেশবিন্যাস দেখে। কপাল ঢাকা চুলের স্টাইল; কিন্তু ডানদিকের কপালে চুলের নীচে লুকানো লাল রঙের ক্ষত, সামান্য নীলচে কালশিটের ছাপ আমার চোখ এড়ায়নি। ঘরে ওষুধের ট্রেতে দেখলাম নতুন কেনা আর্নিকা; তখনও শিশির গায়ে খাম জড়ানো আছে। পরের দিন সেলাই স্কুলে খোঁজ নিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম সুচিত্রা কী ধরণের চুল বেঁধে সেদিন স্কুল গিয়েছিলেন। সাধারণ খোঁপার কথা বললেন ওরা। সন্দেহ পোক্ত হলো। বুঝতে পারলাম, এই ক্ষতটি সেদিন

সুচিত্রা বাড়ি ফেরার পর হয়েছে, এবং ক্ষতটি লুকোতে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। জেঠিশাশুড়িকে খাবার দিতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করবেনই। তাঁর কান খাটো হয়ে যেতে পারে, দৃষ্টিশক্তি এখনও প্রখর। সুচিত্রা ঐ ভাবেই চুল বেঁধে খাবার দিতে গেলেন।

—কিন্তু ক্ষতটা হলো কিভাবে?

—ক্ষতটা হলো কিভাবে তা বোঝার জন্য একটা তথ্য জানার দরকার ছিল। আর সেই তথ্য সেলাই স্কুল থেকেই পেলাম। ছাত্রীরা জানালো, দিদিমণি সেদিন কাজ দিয়ে প্রায় ঘন্টা তিনেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের পুরোনো স্কুলে গিয়েছিলেন। অথচ, খোঁজ নিয়ে দেখলাম, মিসেস হজের মৃত্যুদিন উপলক্ষে সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল।

—সুচিত্রা তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন?

—বরানগরে গিরীশ। কারণ সেদিন সকালেই তিনি জেনেছিলেন যে অত টাকার মাল মলয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মলয় যে কিছু অনর্থ করবে, সেটা বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কারখানায় তিনি যেতে চাইছিলেন না। সকলের সামনে মলয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়াতে চাইছিলেন না। আমার ধারনা তিনি সোজা ওয়ারহাউজে যান। কিন্তু মলয় ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। মসলিন আর জ্যাকোনেট অন্য ওয়ারহাউজে পৌঁছেও দিয়েছে। হতোদ্যম হয়ে সুচিত্রা ঘরে ফিরে আসেন। মলয় ফিরতে মলয়কে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন।

—তারপর?

—আমার বিশ্বাস, সুচিত্রা সেদিন মলয়ের ঘরে যখন ঢুকছিলেন, মলয়কে আসল রসিদ বার করে তোরঙ্গে ঢুকাতে দেখেন। পরের দিন সে আসল রসিদ দেখিয়ে অন্য কোনো ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতো এবং চম্পট দিতো। রসিদ দেখার পর, সুচিত্রার সঙ্গে সেদিন ঘরে মলয়ের কথা কাটাকাটি হয়, সুচিত্রা হয়ত রসিদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখনই মলয় ওঁকে ধাক্কা দেয়। মাথাটা হেডবোর্ডে গিয়ে গুঁতো খায়। হেডবোর্ডে রক্তের চাপ চাপ দাগ সে কারণেই।

—ওহ! সেইজন্যেই পরের দিনও চুল ওভাবেই বেঁধে রেখেছিলেন! তার মানে ...

গিরীশ যেন ছিঁড়ে যাওয়া দুটো তারের শেষপ্রান্তটুকু দেখতে পাচ্ছিল। আত্মবিস্মৃতের মতো সে বলে উঠল

—তার মানে...তার মানে...বিশ্বনাথ...বিশ্বনাথ সবটাই জানতো! আর্নিকা কিনতে ওই বাইরে গিয়েছিল!

উমেশের চোখের মণি জ্বলজ্বল করে উঠল, তিনি বললেন–হ্যাঁ, বিশ্বনাথের অজানা কিছুই ছিল না। প্রমথনাথের পরিবারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নহীন। সুচিত্রাকে সে অনেক বছর ধরে দেখছে, তাঁর গতিপ্রকৃতি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সুচিত্রাও বিশ্বনাথকে গভীর বিশ্বাস করতেন। সম্ভবতঃ ব্ল্যাকমেলের পর সব কিছু খুলে বলেছিলেন। তাছাড়া...উমেশ বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

—তাছাড়া কী উমেশদা?

—সে বড় গ্লানির কথা গিরীশ। মলয়ের চরিত্র ভালো ছিল না। সুচিত্রার প্রতি তার কুনজর ছিল, এমন একটা ধারণা আমি করেছি। সে মাঝে সাঝে কুপ্রস্তাবও দিত। সুচিত্রা তাতে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

– কিন্তু তার মানে মলয় খুন হল সিমেক্সের লোকের হাতে? আসল রসিদ নিয়ে, টাকা তুলে, ও পরেরদিন তার মানে পালাবার তালে ছিল। কিন্তু অপরপক্ষ যে আন্দাজ করে ফেলবে, এমন আশঙ্কা ওর হয়নি?

—নাহ! তার কারণ অপর পক্ষের প্রতি আশঙ্কা তৈরি হওয়ার কোনো কারণই ঘটেনি।

—এত পাকাবুদ্ধির ছেলে! অথচ ষড়যন্ত্রকারীদের আসল পরিকল্পনাটা বুঝতেই পারল না! ওদের হাতে খুন হয়ে যেতে হল!

—ভুল করছো গিরীশ। মলয় চাকি আদৌ বাইরের লোকের হাতে খুন হয়নি। কথাটা বলে উমেশ নীরব হয়ে গেলেন।

—মানে! কী বলছেন কী! গিরীশের গলা উত্তেজনায় কেঁপে গেল।

—ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। মলয় চাকিকে খুন করলে সিমেক্সের বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর। সিমেক্সের কর্তৃপক্ষ আর মলয়, দুজনের হাতে দুদিন সময় ছিল। যেদিন মলয় টাকা তুলে আনে, অর্থাৎ বুধবার,

তার পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্কে ভুয়ো রসিদ জমা পড়ে। ব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে ব্যাঙ্ক শুক্রবার ওয়ারহাউজে খোঁজ নিতে লোক পাঠায়। সেদিন প্রমথনাথ ফেরেন। অর্থাৎ মলয়ের কাছে পালাবার জন্য দুদিন সময় ছিল। মলয়কে দিয়ে দুটো কাজ ওরা করিয়ে ফেলেছিল। এক. প্রমথনাথের আর্থিক ক্ষতি দুই. তাঁর গ্রেফতারির ব্যবস্থা করা।

মলয়ের সঙ্গে সিমেঙ্গের কত পার্সেন্টে রফা হয়েছিল জানি না, তবে মলয়ের প্রাপ্তির পরিমাণ নেহাত কম ছিল না। যাদের সঙ্গে সাঁট বেঁধে সে কাজ করছে, তাদের ধোঁকা দিয়ে পালালে সে যে নিরাপদ থাকবে না, মলয় বিলক্ষণ জানতো। আর মলয় চাকিকে যদি খুন করতেই হত, সিমেক্স তাহলে গুমখুন করত। এভাবে গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে সরিয়ে দিলে সিমেক্সের বিপদ হতো, পুলিশি তদন্তে মলয়ের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত, এবং তদন্তের সুতো গোটাতে গোটাতে সিমেক্স অবধি পৌঁছাতো, এটা না বোঝার মতো বোকা ওরা ছিল না।

—তাহলে খুনটা করল কে? ঘরের ভিতর ঢুকল কিভাবে, বেরোলই বা কিভাবে?

—মলয় চাকির খুন একজনই করতে পারে গিরীশ। দিনের পর দিন সুচিত্রাকে ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে দেখে, নোংরা প্রস্তাব পেতে দেখে, মনিবের অপরিসীম ক্ষতি হতে দেখে যার শরীরের রক্ত বহু দিন ধরে গরম হয়ে উঠছিল। সে মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিল মলয়কে কোনো একদিন পথ থেকে সরিয়ে দেবে। তার প্রস্তুতি দীর্ঘদিন ধরে নিয়েছিল। বুধবার সব সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। সুচিত্রা সেদিন রসিদের কথা বিশ্বনাথকে বলেন। প্রমথনাথ কত বড় আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হবেন, সেকথা বলেন। সেসব শুনে আর সুচিত্রার মাথার ক্ষত দেখে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি।

—মানে! বিশ্বনাথ হালদার! উত্তেজনার ঝোঁকে গিরীশ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—হ্যাঁ গিরীশ। বিলেতে একটা কথা প্রচলিত আছে জানোতো? এ মার্ডার হ্যাজ ফোর এল—লাভ, লাস্ট, লুকর, লোদিং। এই চারটের প্রতিটাই মানুষের মনে অন্যকে খুন করার প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে। আর বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে প্রথম আর শেষ অনুভূতি দুটো মিশে গিয়েছিল।

—কিন্তু কিভাবে? মানে ঘরটা তো খাঁচার মতো বন্ধ ছিল!

–কিভাবে তার উত্তর পেতে গেলে ওই জানালাটা একটু খুলতে হবে। উমেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।
জানালা বন্ধ ছিল। ছিটকিনি তুলে নীচের আর উপরের পাল্লা খুললেন। বাইরে গ্যাস বাতির আলো উপচে ঘরের মধ্যে এলো।

নীচে উঁকি দিলে দেখা গেল, একটি হাতে টানা রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজন হাবিলদারের সঙ্গে, একজন অবাঙালি রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করছে উমেশের। উমেশ ইশারা করলেন। হাবিলদারের একজন রিক্সাটার হ্যান্ডলে দু ফুট অন্তর দূরত্বে দড়ি বেঁধে দিল। আরেকজন রিক্সাটাকে সোজা করে এমনভাবে বিল্ডিংয়ের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিল, যেন সেটি রিক্সা নয়, প্রমাণ উচ্চতার কোনো মই। রামদীন রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার চাকার নীচে, দুধারে চার-পাঁচটা ইট গুঁজে দিল।

হাবিলদার এবার রিক্সার উপর চড়ল। রিক্সা সামান্য কাত হয়ে মাটিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা রিক্সার হ্যান্ডলে মইয়ের মতো থাক বেয়ে বেয়ে সে উপরের দিকে উঠে আসতে শুরু করল। মইয়ের শেষ ধাপে সে যখন এসে দাঁড়ালো, তখন তার মাথা জানালা থেকে দুফুট নীচে। হাত বাড়িয়ে সে জানালার রড ছুঁলো, তারপর রড ধরে শরীরকে চাপ দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে আনলো। রাস্তা থেকে জানালার আলসেতে এসে দাঁড়াতে হাবিলদারের সময় লাগল দশ মিনিট।

গিরীশের চোখ গোল গোল হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে সে এই বিচিত্র ঘটনাবলী দেখছিল।

—রামদীন রিক্সাওয়ালার রিক্সা পাশের গলিতে চৌকিদারের হেফাজতে থাকে গিরীশ। তার নিজের বস্তিতে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে, সে এক ভদ্রবাড়ির চৌকিদারের জিম্মায় রেখে যেত। মইয়ের ব্যবস্থার কথা বিশ্বনাথ ভেবেছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ সে মই পাবে কোথায়! রিক্সাটার কথা সে জানতো। চৌকিদারের ঘুমের সুযোগে রিক্সা নিয়ে এসেছিল। ইচ্ছে ছিল কাজ হয়ে গেলে জায়গায় রেখে আসবে। কিন্তু সে সময় তার তাড়া ছিল। সে জানতো সুচিত্রা উঠে আসবে। তখনকার মত সে রিক্সা ফুটপাতে রেখে ঘরে ঢুকে যায়। পরে

যখন রিক্সা ফেরত দিতে যায়, মাতাল সাহেবকে পাড়ার মোড়ে দেখে। বুঝতে পারে ধরা পড়ে যেতে পারে। তখন রিক্সাওয়ালা সেজে সোজা হাঁটতে শুরু করে। রিক্সাটাকে অন্যত্র রেখে সে সোজা থানায় চলে যায়।

—রিক্সাটা পেলেন কোথায়?

—টিপু সুলতান মসজিদের পিছন দিকে। রিক্সার মধ্যে একটা রক্তমাখা ফতুয়া আর গামছা পাওয়া গেছে।

—মানে ওগুলো খুলে ফেলে খালি গায়ে ফিরে এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘরে ঢুকেছিল কিভাবে?

—সেটা আমার একটা অনুমান। দেখা যাক সত্যি হয় কিনা! উমেশ জানালার দিকে এগিয়ে এসে বললেন।

উমেশ এবার জানালার শিকে হাত দিলেন। ধার থেকে মধ্যিখানে সব কটা শিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথমে টেনে টেনে, তারপর শিকগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে। নীচের জানালার শিকগুলো যেখানে ফ্রেমে গাঁথা, সেখানে এসে উমেশের হাত আটকে গেল। চাপা কণ্ঠে গিরীশকে বললেন–টর্চটা ফেলো গিরীশ।

টর্চের আলোতে শিকগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। উমেশ জানালার বাইরে দিকে ফ্রেমের উপর একটি বিশেষ জায়গায় স্পর্শ করলেন, খটাং করে একটা শব্দ হল। শিকগুলো সামান্য নড়ে উঠল। উমেশ হাত দিয়ে মাঝের শিকটা ধরলেন। সেটি তলার ফ্রেম থেকে ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। টর্চের আলোয় দেখা গেল বাইরের শিকটা ফাঁপা, একমুখ বন্ধ। আর সেই শিকের মধ্যে আরেকটা শিক ঢুকোনো। দুটো শিকেরই উচ্চাতা আপাতভাবে এক। কিন্তু ভিতরের শিকটি ঠেলে এইমুহূর্তে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে।

—ভিতরে কি স্প্রিং লাগানো নাকি? টিপলে ঠেলে বেরিয়ে আসে? গিরীশের মুখ থেকে বাক্য সরছিল না।

—হ্যাঁ।

উমেশ জানালার ফ্রেম থেকে পরপর চারটে শিক খুলে দিলেন। ঘরে ঢোকার প্রশস্ত জায়গা তৈরি হল। আবার শিকগুলো গর্তে চেপে বসালেন। টিপকল টিপলেন। তলার শিকের ভিতর থেকে আরেকটি শিক বেরিয়ে এসে ফ্রেমে গেঁথে গেল।

গিরীশের মুখ দিয়ে অস্ফুট কিছু শব্দ বেরিয়ে এল। অসম্ভব বিস্মিত হয়ে সে বলল

—এ তো মাথায় হাত পড়ার অবস্থা উমেশদা! কিন্তু এ তৈরি করে দিল কে? আপনি না মলয়ের মানিব্যাগে এরকম একটা আঁকাঝোঁকার কাগজ পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এই জিনিস তৈরি করার বুদ্ধি মলয়ের মাথাতে এসেছিল।

—নিজের ঘরে নিজেই ফাঁদ বসিয়েছিল? কী আশ্চর্য!

—না। সে আদৌ জানতো না, তারই তৈরি করা যন্ত্র তাকে মারতে ব্যবহার হবে।

উমেশ এবার যে ছাতাটি সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেটি দেখিয়ে গিরীশকে বললেন—চিনতে পারো?

গিরীশ ভালো করে লক্ষ করে বলল– এ যে মলয়ের ছাতা। ওর ঘরে ছিল।

–হুম।

গিরীশ ছাতাটা হাতে নিয়ে বলল–এ তো আমাদের সাধারণ ছাতার মত লাগছে না উমেশদা! এই বোতামটা কিসের?

– ওই বোতামটা একটা টিপকল, ছাতার ভিতরে স্প্রিং দেওয়া। টিপকল টিপলে নীচের রড উপরের রডকে ঠেলে দেয়। হাত দিয়ে টানতে হয় না। স্বয়ংক্রিয় ছাতা বলতে পারো। এ জিনিস দেশে তো নয়ই, বিলেতেও আছে কিনা জানি না। ছোড়ার মাথা ছিল বটে! উমেশ টিপকল টিপে ছাতা খুললেন। রড নিজে থেকে সোজা হয়ে খুলে ছাতা মেলে ধরল।

গিরীশ হতভম্ব হয়ে ছাতার দিকে তাকালো। বললো—মানে এই ছাতা দেখেই বিশ্বনাথের মাথায় শিকগুলোর কথা আসে?

—হ্যাঁ। মলয় চাকির নিজের যান্ত্রিক কলাকৌশল নিয়ে গর্ব ছিল। লোকের কাছে সমাদর পেতে তার ভালো লাগত। এই বাড়িতে বসেই নানা যন্ত্রপাতির কাজকর্ম করত সে। আমার ধারণা, এমন চমৎকার ছাতার নক্সাটি সে বিশ্বনাথের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল। কিভাবে বানাতে হয়, তা উৎসাহ ভরে ব্যাখ্যা করেছিল। বিশ্বনাথ উমেশের মেশিন কারখানায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তার মাথা চৌখস। লিখতে পড়তে পারে। নক্সা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। মলয়ের আঁকা কাগজটা নিয়ে গিয়ে তারপর নিশ্চয়ই কোনো লেদ কারখানা থেকে শিক চারটে বানিয়ে এনেছিলেন। বানানো হয়ে গেলে, আবার রেখেও দিয়েছিলেন।

—কিন্তু ঘরে ঢুকে লাগালো কিভাবে? বিনয়ের ঘরে তো তালা দেওয়া থাকতো।

—থাকতো। কিন্তু সুচিত্রার কাছে চাবি থাকতো। সুচিত্রা স্নানে গেলে এক ফাঁকে তালা খুলে রাখা কি খুব কঠিন? পরে বাড়ি ফাঁকা পেলে কাজটা করে রেখেছিল। একদিনে হয়নি। পুরোনো শিকগুলো বার করে, ফ্রেমে র্যাদা দিয়ে গর্ত করে, টিপকলসহ রড বসানোর ব্যবস্থা করেছিলো। দুপুরে বাড়ি ফাঁকা হলে রোজ একটু একটু করে কাজ সারতো। জানালার বাইরের দিকের ফ্রেম বলে, কেউ খেয়াল করেনি।

—মানে সেদিন বিশ্বনাথ রিক্সা বেয়ে, শিক খুলে ওইভাবে ঘরে ঢোকে। আগে মলয়ের তোরঙ্গ খুলে রসিদ নেয়, তারপর মলয়ের দিকে এগিয়ে যায়?

—হ্যাঁ। মলয় কিন্তু তোরঙ্গ খোলার শব্দে জেগে গিয়েছিলো। অন্ধকার ঘরে বিশ্বনাথের হাতে খোলা ছুরি দেখে সে অবাক হয়ে যায়। বিছানা থেকে উঠে বিশ্বনাথকে মারতে যায়। কিন্তু সে নিরস্ত্র। বিশ্বনাথের সঙ্গে হাতাহাতি করে সে আহত হয়। তারপর বিশ্বনাথ তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে গলা কেটে দেয়। তারপর জানালার বাইরে আলসেতে দাঁড়িয়ে, শিকগুলো লাগিয়ে দেয়। বেরোনোর সময় টাল সামলাতে না পেরে জানালার পাশের দেওয়ালে হাত দিয়ে ফেলে।

খেয়াল করলে দেখবে গিরীশ, জানালার ছিটকিনিগুলো লুজ। বাইরে দাঁড়িয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তার গলিয়ে ওঠানো নামানো করা যায়। সে জানালা বন্ধ করে নেমে যায়। এখানেই একটা হঠকারিতা সে করে। সেটা না করলে শিকের রহস্যভেদ অসম্ভব ছিল।

—কীরকম?

—আমাদের রিড সাহেব কী শিখিয়ে গেছেন মনে নেই? 'সাসপিশন অলওয়েজ হন্টস এ গিল্টি মাইন্ড?' বিশ্বনাথ জানতো, এই শিকগুলোতে তার ঢোকা বেরোনোর রহস্য লুকিয়ে আছে। তার অপরাধী মনস্তত্ত্ব সেগুলোকে ঢাকতে চাইছিল। জানালা বন্ধ করে তার দুরকম সুবিধা হল। এক. তার পৌঁছানোর আগেই ঘরের ভিতর কেউ ঢুকলে আগেই জানালার দিকে চোখ যাবে না, সে পালানোর সময় পাবে। দুই. সে ইচ্ছে করেই এই ঘরের রহস্যটাকে জটিল করে গুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। এমন অভাবনীয় পদ্ধতিতে খুন দেখে, কেউ বাড়ির ভিতরের লোকের কথা চিন্তা করবে না। কিন্তু জানালা বন্ধ থাকায় আমার প্রথম সন্দেহ ওখানেই গিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। শেষে সেদিন বড়বাবুর ছাতা খাটানো দেখে...উমেশ আত্মগতভাবে বললেন। ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

—আর রসিদটা? গিরীশ প্রশ্ন করল।

—ন্যায্য মালিকের হাতে তুলে দেবে বলে যে সরিয়েছিল, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। কী বলো?

১১

রাত হয়েছিল। ভাদ্র মাসের শেষ হয়ে আশ্বিন এসেছে। এবার আশ্বিনের প্রথমেই পুজো। বাতাসে কান পাতলে দুর্গতিনাশিনীর পদধ্বনি শোনা যায়। উঠোনের বাগান থেকে উঠে আসা শিউলির গন্ধ সমস্ত শ্বাসযন্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এইসবের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে, অন্ধকার বারান্দায় যে চুপ করে বসেছিল, তার দশটি হাত খোঁজার চেষ্টা করলেন না উমেশ। তিনি চূড়ান্ত নাস্তিক, জগতে যারা সত্যিকারের দুর্গতি নাশ করেন, তাঁদের দশটি হাতের প্রয়োজন নেই বলেই জানেন।

—তোমার যে দণ্ড হবে বিশ্বনাথ? উমেশ ধীরে ধীরে বললেন। নিজের গলার কাতরতা, চেষ্টা করেও ঢাকতে পারলেন না।

বিশ্বনাথ হালদার উমেশের দিকে তাকাল, স্খলিত কণ্ঠে বলল– রসিদটা যে বৌদিমণির হাতে দিলাম, সেগুলো দিয়ে দাদাবাবুকে ছাড়ানো যাবে না?

–না বোধহয়। তবে ছাড়ানোর পন্থা আমি পেয়ে গেছি। প্রমথবাবুকে আমি ঠিক ছাড়িয়ে আনব।

বিশ্বনাথ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, তার চোখ সিক্ত, গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। সে অবস্থাতেই সে বলল– তাই করুন হুজুর। তাই করুন। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন এবার। কোনো দণ্ডেই আর ভয় পাই নে।

হাবিলদারের দুই হাত শক্ত করে বিশ্বনাথকে ধরল। তার ঋজু শরীরে বল এসেছিল। সে সহজ ভঙ্গিতে হাবিলদারের সঙ্গে হেঁটে একতলায় নেমে গেল। তার জন্য পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছিল।

–সুচিত্রা কি কিছু টের পেয়েছিলেন উমেশদা?

উমেশ এক ঝলক গিরীশের দিকে তাকিয়ে বললেন–খুনের দিন না হলেও, পরে নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ বা সুচিত্রার কেউই একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারেনি।

—কী?

—জাল রসিদ জমা দিলে যে গ্রেফতারি হতে পারে, এটা ওদের জানা ছিলো না।

গিরীশ দাঁতে দাঁত চেপে বলল।
—কাল ওয়ারহাউজগুলোয় রেড করার ওয়ারেন্ট বার করব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। দেখছি কোন ওয়ারহাউজে ও মাল রেখেছিল। সিমেক্স ব্যাটাদের নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে সেখানে।

—ওয়ারেন্ট পাবে না। উমেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

—পাবো না? কেন!

—সিমেক্সের ইনভেস্টরদের মধ্যে স্বয়ং ডিসি সাহেব আছেন। মলয় চাকিকেই কেন বেছে নিল ওরা ভেবে দেখেছো?

—কী সাংঘাতিক! গিরীশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই সে বলল—তাহলে কী হবে?

—বিষে বিষক্ষয় করতে হবে গিরীশ। আমরা প্রশাসনিক সাহায্য পাবো না, কিন্তু মলয়ের সঙ্গে সিমেক্সের যোগাযোগ হয়ত প্রমাণ করতে পারবো। সেই প্রমাণ খবরের কাগজে ফাঁস করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে যদি...

—ব্ল্যাকমেল করবেন!

উমেশ মৃদু হেসে সম্মতি দিলেন—হ্যাঁ। কিন্তু বেনামে। প্রমথনাথকে মুক্ত করতে হবে যে!

গিরীশ আপ্লুত হয়ে উমেশের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—আশীর্বাদ করুন।

সহযোগী গ্রন্থপঞ্জী-

১. যখন পুলিশ ছিলাম পঞ্চানন ঘোষাল
২. লালবাজার - নটরাজন
৩. কলকাতা- শ্রীপান্থ
৪. বাণিজ্যে বাঙালি-স্বতন্ত্রতা ম্যাগ
৫. বঙ্গনারীর কেশসজ্জা—একাল ও সেকাল—প্রলিপ্ত.ইন
৬. কলকাতা কালচার- কালপেঁচা
৭. স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম- গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
৮. অপরাধ বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড- পঞ্চানন ঘোষাল
৯. কলিকেতার রাস্তায় চলাফেরা —ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০.কলকাতার পথঘাট- প্রাণতোষ ঘটক

১১. এভ্রি ম্যান হিজ ওন ডিটেকটিভ– আর.রিড

বিশেষ কৃতজ্ঞতা—তমোঘ্ন দাশগুপ্ত, সুব্রত কুমার আচার্য্য, সিদ্ধার্থ বসু এবং ফেসবুকের মলাট গ্রুপকে, (দুষ্প্রাপ্য কিছু বইয়ের ডিজিটাল ভার্সন পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য)

(ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি ছাড়া এই গল্পে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনাবলী, চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

সূচিপত্র